Volume

02

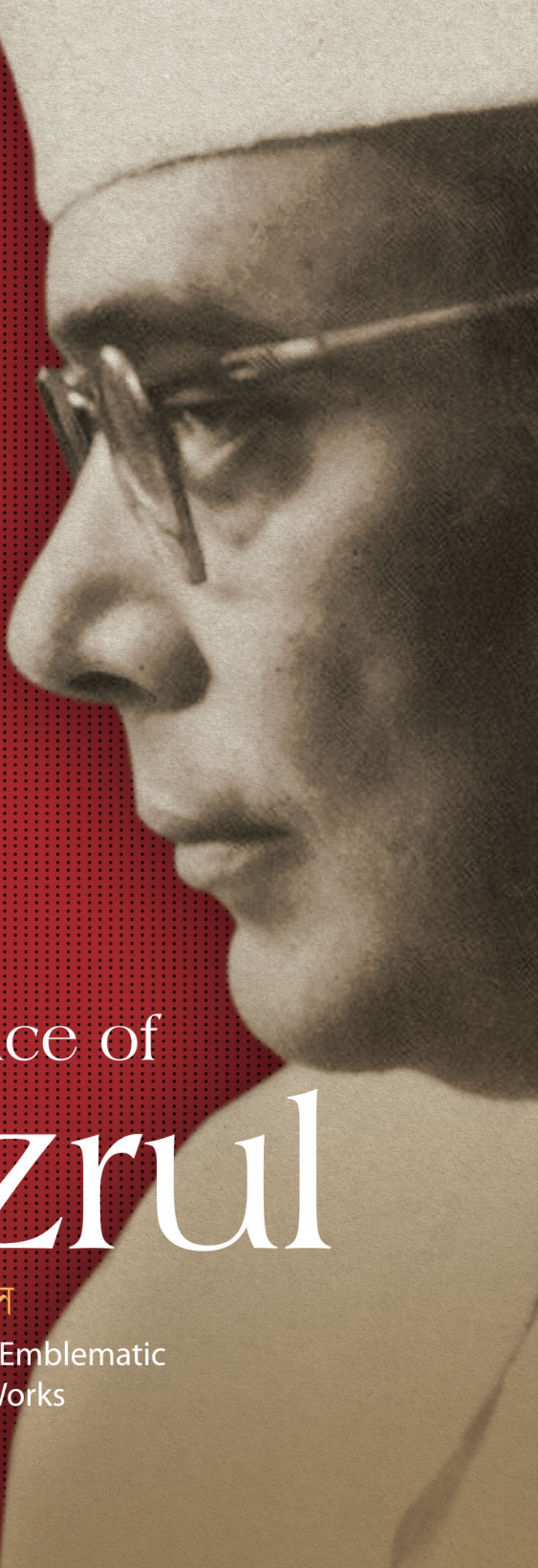

Quintessence of Nazrul

নজরুল নির্যাস

English Translation of an Emblematic Collection of the Poet's Works

Quintessence of Nazrul

Volume Two

নজরুল নির্যাস

দ্বিতীয় খণ্ড

Quintessence of Nazrul

Volume Two

নজরুল নির্যাস

দ্বিতীয় খণ্ড

National Poet Kazi Nazrul Islam Institute
Ministry of Cultural Affairs

Quintessence of Nazrul
Volume Two

First Published
January 2026

Published by
Nation Poet Kazi Nazrul Islam Institute
Kabi Bhaban
House-330-B, Road 28 (Old)
Dhanmondi Residential Area, Dhaka-1209
Bangladesh

Cover Design by
Anisuzzaman Sohel

Printed by
D S Printing and Packaging
132, Arambag, Motijheel, Dhaka

Price
BDT 2000.00 / US $ 20

ISBN
978-984-555-082-6

Dedication

To the Martyrs of the July 2024 Revolution,
which was influenced by the spirit of our
National Poet Kazi Nazrul Islam

Translation and Review Committee

Chairman

Professor Irshad Ahmed Shaheen

Members

Md. Jehad Uddin
K, M, Al-Ameen
Mohammad Zahir Uddin
Subarna Shirin
Debashis Das
Alamgir Mohammad
Nadira Bhabna
Md. Robiul Islam

Member Secretary

Md. Latiful Islam Shibli

Translators

Abdul Hakim
A Politician. Writer, Translator

Abu Rushd
Short stories writer, novelist, colmnist and translators

Alamgir Mohammad
Assistant Professor of English
Bangladesh Army International University of
Science & Technology

Bashudha Chakravarty
A journalist, essayist, translator, Calcutta.

Debashis Das
Lecturer
Department of World Religions and Culture
University of Dhaka

Fakrul Alam
Professor, Department of English, University of Dhaka

Gulsan Ara Kazi
Poet, Play Wirter, Critic, Essayist, Translator

Irshad Ahmed Shaheen
Dean, School of Arts & Culture and Head,
Department of English at University of South Asia

Kabir Chowdhury
Professor of English, Dhaka University. Critic, Essayist, Translator

Mohammad Zahir Uddin
Associate Professor and Head of The Department of English
Brahmanbaria Government college

Mizanur Rahman
A civil servant. Writer, Translator

Mohammad Nurul Huda
Poet, Critic, Essayist, Translator

Mohammad Shafiqul Islam
Professor, Department of English
Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet

Nadira Bhabna
A literary scholar, translator and cultural critic

Nashid Kamal
Singer, writer and translator

Mustofa Munir
Poet, Critic, Essayist, Translator

Mozaffar Hossain
Writer and Translator

Peter Custers
Journalist, Writer and Translator, Netherlands

Rachel Fell McDermott
Nazrul Scholar and Professor
Columbia University USA

Sajed Kamal
Poet, artist, photographer
and translator

Subrata Kumar Das
Writer and Translator

Subarna Shirin
Researcher and Translator
National Poet Kazi Nazrul Islam Institute, Dhaka

Syed Mujibul Huq
Writer and translator

William Radice
Poet, Essayist, Translator
Department of Bengali
Sclool of Oriental and African Studies, London

Joseph T. O. Connell
Translator
University of Toronto, Canada

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের বহু প্রতীক্ষিত ইংরেজি অনুবাদ *Quintessence of Nazrul* বা নজরুল নির্যাস-এর প্রথম প্রকাশনা উপলক্ষে এই ভূমিকা লিখতে পেরে আমি মহান আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলা ভাষার বিশ্বকবি নজরুল যেখানে নিজের সম্পর্কে বলছেন, 'আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের'। আর নিজেকে তিনি এতটাই ছড়িয়ে দিতে চান– 'বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির'। এই ছড়িয়ে যাওয়ার এবং ছাড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমটার নাম–ভাষা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর পর তাঁর নির্বাচিত সাহিত্যকর্মের ইংরেজি অনুবাদ করে কবির বৈশ্বিক হয়ে ওঠার এই আকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করতে পেরেছি।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতির চেতনাস্বর, মানবমুক্তির অগ্নিকণ্ঠ এবং সাম্য ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের শাশ্বত দূত। তাঁর সাহিত্যকর্ম শুধু বাংলা ভাষার সম্পদ নয়, বরং বিশ্বমানবতার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। নজরুলের রচনায় যে শক্তি, যে সৃজন ব্যাকুলতা, যে প্রতিবাদ, যে প্রেম–তা ভাষা, ভৌগোলিক পরিসর কিংবা সাংস্কৃতিক সীমানাকে অতিক্রম করে মানবজাতির সঙ্গে কথা বলে।

বিশ্বায়নের যুগে সাহিত্যের আন্তর্জাতিক পরিচিতি নির্মাণে একটি শক্তিশালী ও মানসম্মত ইংরেজি অনুবাদ অপরিহার্য। কারণ ইংরেজি হলো সেই সেতুবন্ধনের ভাষা, যার মধ্য দিয়ে একটি সাহিত্য অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই গ্রন্থের মাধ্যমে নজরুলের কাব্যের জ্যোতি, তাঁর গানের মানবিক স্পন্দন, তাঁর গদ্যের দীপ্ত সত্যবোধ, সবকিছুই আন্তর্জাতিক পাঠকের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্যভাবে পৌঁছে যাবে।

নজরুলের সাহিত্যকে বিশ্বমণ্ডলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের উচ্চমানের অনুবাদ শুধু একটি গ্রন্থ নয় বরং একটি সাংস্কৃতিক প্রকল্প, একটি আন্তর্জাতিক সেতুবন্ধন। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের গবেষক, অনুবাদক, সাহিত্য অনুরাগী এবং শিক্ষার্থীরা নজরুলকে নতুন চোখে দেখার সুযোগ পাবেন। তাঁদের গবেষণা ও অনুবাদ উদ্যোগ আরও বেগবান হবে এবং বিশ্বসাহিত্যে নজরুলের অবস্থান নতুনভাবে পুনর্মূল্যায়িত হবে।

নির্বাহী পরিচালক হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে এক গভীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছি বলে মনে করি। কারণ একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বদরবারে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা শুধু একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, এটি এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক অঙ্গীকার এবং নৈতিক কর্তব্য। নজরুলের চেতনার বিশ্বায়ন আমাদের সময়ের একটি প্রয়োজন, এবং সেই প্রয়াসে *Quintessence of Nazrul* হবে এক মাইলফলক।

এই অনুবাদ গ্রন্থটির সফল প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে একটি নিবেদিতপ্রাণ অনুবাদক দলের সমন্বিত শ্রম ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে। অনুবাদকগণ তাঁদের শিল্পবোধ, ভাষা দক্ষতা এবং গবেষণামূলক গভীরতা দিয়ে নজরুলের রচনার সৌন্দর্য সর্বোচ্চ সততায় উপস্থাপন করেছেন। তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সঙ্গে এই প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি গভীর ধন্যবাদ। এই অনুবাদ কর্মের সম্পাদনা চলমান থাকবে । প্রতিটি ভুলভ্রান্তি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

আমাদের বিশ্বাস, *Quintessence of Nazrul* নজরুলের সাহিত্যকে নতুন ভুবনে নিয়ে যাবে–মানবতার বৃহত্তর অঙ্গনে এবং বিশ্বপাঠকের অন্তরে। এই বই হবে নতুন পরিচয়ের, নতুন আলোচনার, এবং নজরুল চেতনার নতুন যাত্রার প্রথম সোপান। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের পাঠকদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছাক, তাঁর কাব্যিক মহিমা জাগিয়ে তুলুক নতুন মানবিক দিগন্ত, এটাই আমার প্রত্যাশা।

জানুয়ারি ২০২৬

মোঃ লতিফুল ইসলাম শিবলী
নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১)
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট

Preface

I express my deep gratitude to Almighty Allah for the opportunity to write this foreword on the occasion of the first publication of *Quintessence of Nazrul (Nazrul Nirjash)* the long-awaited English translation of the literary works of Kazi Nazrul Islam, the national poet of Bangladesh.

Regarding himself, the great poet of Bengali, Kazi Nazrul Islam said: "I do not belong only to this country or this society simply because I was born here. I belong to all countries and all people." He aspired to spread his essence so widely that he declared: "Surpassing the universe, I have risen alone with my head ever held high." The medium for this expansion and transcendence is language. Though it is a sombre truth that it has taken 40 years since the establishment of the National Poet Kazi Nazrul Institute, we have finally been able to fulfil the poet's aspiration of becoming global by translating his selected literary works into English.

Kazi Nazrul Islam is the voice of our national consciousness, the fiery orator of human liberation, and the eternal messenger of equality, fraternity, and justice. His literary body of works is not merely a treasure of the Bengali language but a brilliant beacon for all of humanity. The power, creative restlessness, protest, and love found in Nazrul's writings speak to mankind by transcending linguistic, geographical, and cultural boundaries.

In this era of globalization, a powerful and high-quality English translation is essential to establish the international identity of literature. English is one of the bridging language through which literature opens the horizons for translation into other languages. Through this book, the brilliance of Nazrul's poetry, the humane pulse of his songs, and the radiant sense of truth in his prose will reach international readers in a comprehensible and acceptable manner.

To bring Nazrul's literature to the global stage, a high-quality translation of this nature is not just a book but a cultural project—

an international bridge. Through this, a new generation of researchers, translators, literary enthusiasts, and students will have the opportunity to see Nazrul through fresh eyes. Their research and translation initiatives will gain momentum, and Nazrul's position in world literature will be re-evaluated.

As the Executive Director of the National Poet Kazi Nazrul Islam Institute, I feel I have fulfilled a profound historical responsibility by being associated with this significant work. Presenting a nation's cultural heritage on the world stage is not merely an administrative duty; it is a broader cultural commitment and a moral obligation. The globalization of Nazrul's consciousness is a necessity of our time, and in that endeavour, *Quintessence of Nazrul* will serve as a milestone.

The successful publication of this translated volume was made possible by the collective labour and creativity of a dedicated team of translators. With their artistic sensibility, linguistic skill, and research depth, the translators have presented the beauty of Nazrul's works with the utmost honesty. I express my sincere gratitude to them. Simultaneously, I extend deep thanks to everyone involved in this publication. The editorial work on this translation will remain ongoing. Any errors or inaccuracies will be corrected in subsequent editions.

We believe that *Quintessence of Nazrul* will take Nazrul's literature to a new realm—into the wider arena of humanity and into the hearts of global readers. This book will be the first step toward a new identity, new discourse, and a new journey for Nazrul's consciousness. It is my expectation that his message reaches readers in the international landscape and that his poetic majesty awakens new humanitarian horizons.

January 2026

Md. Latiful Islam Shibli
Executive Director (Grade-1)
National Poet Kazi Nazrul Islam Institute

Message from Reviewer

It's my honour to introduce this unique compilation of quintessential translated works by Kazi Nazrul Islam. A window into the soul of Nazrul, a poet whom injustice and despair could not silence, is opened. Nazrul's fearless voice imbued in rebellion, spirituality, human dignity and love, reaches readers, cutting across linguistic boundaries. The works capture Nazrul's defiance against oppression, his deep compassion for the marginalized and his suffering and intense emotional force.

The translators have sincerely tried to retain the rhythm, imagery, and emotional depth of the original Bangla works. Though translation reshapes language, the spirit of Nazrul's poetry, its urgency, musicality, moral courage and spirit remain intact. The many dimensions of Nazrul, the poet are revealed through diverse themes of resistance, freedom, equality, tenderness, devotion and universal love.

This compilation introduces global readers to Nazrul's literary genius and affirms his relevance and significance in today's world. He continues to inspire courage, challenge injustice, and remind us of the enduring power of the human voice when raised in truth, through his poetry. We hope that you will enjoy getting to know our national poet Kazi Nazrul Islam and his timeless creations.

Dr. Tazin Aziz Chowdhury
Professor and Chairperson
Department of English
University of Dhaka

Foreword

'*Quintessence of Nazrul*' is an anthology of English translations of some representative pieces from almost all the genres of Kazi Nazrul Islam's oeuvre. Its can be reckoned as an anthology comprising his literary creations of various types. The poet once pronounced in one of his lectures–"It's mere destiny that I made my advent here (in my native society in India), but in reality I belong to all the societies of all times." This utterance of the poet is extremely significant and makes sense why this publication has been overdue for decades.

Even a Google search will reveal a modest outline of the extra-ordinary nature of Kazi Nazrul Islam's creations as well as the spirit of the kind of life he led. In a complex vortex of inexorable social, political, economic and religious stalemate, he made his puissant and heroic appearance in Bengal–the then cultural capital of in British occupied India. Alongside his profoundly aesthetic literary pieces, he wrote vehement poems, composed fiery lyrics and also assumed the roles of Co-editor, Editor and Chief Director in various newspapers in order to spread the message of equality, independence, human liberty and to contribute to many other esstential areas of civilisation.

His advent was like thunder and soothing rainfall in simultaneity. His oeuvre bears the testimony to the fact that he made a unique combination of Dyonosian and Apollonian artistic sensibilities. This was an obvious result of the unified sensibility he sustained all his life. It was a state of realisation that powered his artistry as well as his life itself. For the first 6/7 years of his creative life, which spanned from his stint as a soldier in the First World War to the period of sensation he created in the literary and political circles in Kolkata in the first half of 1920s. He made his contributions in several capacities including those of a poet, musician, journalist, political leader, singer and so forth.

Surprisingly, the prevailing social conditions in British-ruled India like religious bigotry, poverty, inequity of various kinds,

Hindu-Muslim feuds and everything that denied human rights constitute the topics, themes and motifs of his early literary creations – obviously in the form of protest, remonstrance and revolt. Though these elements never disappeared from his contents in the years to follow, a new stream of awareness pervaded his works with the start of the second quarter of his creative life. This period roughly comprises the first five to six years of the total span. The latter stream found its manifestation in exquisite romantic, spiritual, mystical and religious contents.

Although he had already shot into fame with his highly spirited and rebellious editorials, poems and songs of protest and remonstration, his popularity brimmed over with the publication of the mighty and puissant 'Bidrohi' – a poem, with almost no or very slight debatability to be considered the greatest poem ever written in Bangla and one of the grestest in world literature. This poem, in many ways, represents Nazrul's rebel self with just a window that permits a gaze into his profounder entity, which ranges from diverse kinds of material love to the Supernal one. Apart from the predominantly rebellious overtone in the poem in which the 'I' seems to be a power which, in its melting pot, fuses the idea of individuality of quite a few modern philosophers including Frederich Nietzsche, Karl Jung, Rene Decartes, Thomas Aquinas, David Hulme and some great Greek Philosophers including Aristotle and Plato. In literature Walt Whitman, who Nazrul himself quoted, was another exponent of the vindication of self.

Kazi Nazrul Islam's 'I' or 'Myself', which is a combination of various aspects of the multifaceted human self, tries to carve and keeps fighting for an ideal universe which was, and still is, not easy or may even be impossible to establish. But his sanity never allowed him to give up the fight and this quest for perfection added another dimension at the beginning of the third quarter of his creative life. This time his journey was to seek a universe the like of which he tried to establish. From the external perspective, the difference was huge, but in effect they were the same with a difference of magnitude and depth. This is like the crevices on the skin of an orange we don't see when we view it fron a distance.

To seek and discover his ultimate self, Nazrul trode a path unknown to most of us. It is a desolate one with spiritual passersby few and far between. It is the experience in course of this journey that he speaks back to us in the form of literary creations. This makes Nazrul Islam possibly the most difficult Bengali poet to understand because his experiences range from spirituality to dialectal materialism ; from creations that inspire devout religious practice to skepticism that verge on aetheism to those who believe in 100% practice of rituals in religious practices. The diversity of the forms of his literary creation almost matches the heterogeneity of shades in his conviction. *Quintessence of Nazrul* seeks to introduce the readers to some emblematic pieces of literary works from most of the genres he covered.

In the first quarter of his creative life, the mammoth heap of cumulitive injustice, inequality and oppression all around had immersed Nazrul Islam in an ocean of anguish and agony. He deliberately decided to revolt against all anti-human forces through his writings and engagement in politics. The resistance he had to face for his ideology, conviction and revolution was huge. His books were proscribed by the Government and he was put under constant surveillance of intelligence branches. Finally, for declaring the Independence of India publicly in an editorial of his newspaper Dhumketu and other fiery publications, he was arrested, put on farcical trial and jailed. There, he went on a hunger strike which lasted 39 days protest against the barbaric atrocities of the Government against political as well as general prisoners. No oppression and no persecution could deter the poet from speaking, writing and fighting for the mass.

But the most stunning fact is that another aesthetic sensibility in Nazrul Islam had been running parallel to with his protest, struggle and remonstration. This, apparently in contrast with the high sounding protest literature, was soft, mellow and profound. But the fact that each of the two sensibilities was complementary to the other is the most important thing. His protest literature was generally high sounding and often trenchantly satirical at the mainstream politicians who were highly compromising on the issue of independence and vituperated the ruling British for adapting immoral strategies to exploit the native people. But what

remains a puzzle is how he managed to sustain the high grade aestheticism in his vociferous poetry and prose.

Kazi Nazrul Islam is said to have made his advent like a comet in the domain of Bengali literature. The popularity he achieved in almost no time is unparalleled in the history of this literature. It happened because, despite writing for the masses, often in a high sounding style, he surprisingly maintained high literary standard as well. If we consider the cases of his early masterpieces including Bidrohi, we find him maintaining a perfect balance of puissant explosion of protest and exquisite artistry. As far as his aesthetic stand is concerned, it was absolutely novel. He believed that a poet's task is to uphold the basic rights of common people in simultaneity with making literary contributions which align with the existing trends in art, literature, culture and domains beyond.

Nazrul Islam had his own ideas about poetic norms and criteria. In an epistolary declaration he said, "I really don't know if there is any mandatory definition of the Art. Even if there is any, I'm not going to abide by that." This statement is immensely important in the backdrop of what we understand by aestheticism or 'Art for Art's sake. As we all know, Art for Art's sake, a philosophy that art's value lies solely in its beauty and form, existing independently of any moral, didactic, political, or utilitarian purpose, focusing purely on self-expression and inherent artistic worth, championed by movements like aestheticism. But despite this dogmatic stand, Aestheticism never managed to go undebated as to whether art can truly be separated from human values and continued to enjoy unquestionability within specific art cirles and social quarters. Moreover, it remained quite abstruse to even a significant section of art connoisseurs. Nazrul's conviction was strong enough to reject the idea that art had nothing to do with human amelioration and would only be concerned with the appreciation of aesthetic beauty and charm. So what Kazi Nazrul Islam decided to have as his poetic ideal was to produce the kind of literary creations that made a combination of everything that embedded elements enriching human existence.

If we go through one of his literary articles titled **"Bortoman Bishwa Shaittwa"** (Contemporary World Literature), we have a feeling that all on a sudden we have been exposed to every nook and corner of the vast world of global literature and, at the same time, privileged to gaze at the panoramic view of it. Then again, we have a sensational analysis and categorization of these works and sketches of the psyche of the writers of these from the philosophical, psychological and attitudinal perspectives. Some of the writers he analytically studies and categorises in this article are Yone Noguchi, Yeats, Benavarte, Johan Boar, Knut Hamsun, Barnard Shaw, Walt Whitman, Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Alexander Pushkin, Dmitry Sergeyevich Merezhkovsky, Rabindranath Tagore, Leonid Adreyev and many others. The first time I read it was possibly like the wonder that made Keats compose 'On First Looking into Chapman's Homers. In the essay Nazrul makes three categories among the writers of his time and palpably places himself in the third, which contained the cream of both the other categories. Perhaps this is the most effective que that a reader can have to comprehend Nazrul.

In "Bidrohi", he proclaimed, "With one hand I bear the curved bamboo flute, while the other holds the war-trumpet." This expression symbolically implies that he was on this planet for meting out absolute, unsullied love, and fighting against all kinds of malevolent vices simultaneously. These two phenomena complement each other all his life – both as an artist and as a human in his personal life. His love, however, demands a denotation. It was transcendental and all the variations of it were very subtly interwoven. It starts with love for his motherland and ends up in the Almighty. Here lies his uniqueness, and this is the main reason why he was able to make a fusion of Apollonian and Dianosian sensibilities to an unprecedented degree. Even his mysticism, which assumes an all-engulfing dimension in the last quarter of his active life is a sincere and highly artistic combination of mystical sensibilities modelled on various traditions - Indian and Semitic in particular. In addition to these, his works are strewn with literary masterpieces manifesting the profundity of his self-styled mystical experiences.

His creative life lastest just over two decades as almost all his cognitive functions were dysfunctional by the age of 43. He became mute, as he had been prophesying over the years prior to his silence. He lived speechless for almost thirty four years, often showing signs that he was living in a world which we in general did not have access to, but was allowing him to have connections to occasional awareness of a few phenomena, particularly through music in our sphere of existence. He was taken to Europe a decade after the onset of severe aphasia in 1942. After much investigations in England and Austria, Professor Hans Hoff in Vienna diagnosed the ailment as Pick's disease–an early onset degenerative disease of the central nervous system. But despite his 'too early' departure from the creative world, he has continued to influence and shape the life and conviction of billions and may prove to be a trailblazer of a new world order in the highly precarious world order of today.

January 2026

Prof. Irshad Ahmed Shaheen
Dean, School of Arts & Culture and Head,
Department of English at University of South Asia

Contents

Novel
উপন্যাস

মৃত্যুক্ষুধা ৩১
Mrityukshuda 133
Translated by Alamgir Mohammad 244

Short stories
ছোটগল্প

পদ্মা গোখ্‌রো ২৪৯
King Cobra 265
Translated by Sajed Kamal 282

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী ২৮৩
The Story of a Vagabond 292
Translated by Alamgir Mohammad 301

ব্যথার দান ৩০২
The Offering of Pain 317
Translated by Alamgir Mohammad 332

রাক্ষুসী ৩৩৩
Ogress 341
Translated by Alamgir Mohammad 350

রাজবন্দীর চিঠি ৩৫১
Letter from a Political Prisoner 365
Translated by Alamgir Mohammad 379

শিউলিমালা ৩৮০
The Ballad of Shiuli 392
Translated by Alamgir Mohammad 404

সালেক ৪০৫
Salek 408
Translated by Fakrul Alam 412

Essays
প্রবন্ধ

আমার ধর্ম ৪১৫
My religion 417
Translated by Nashid Kamal 418

আমার লীগ কংগ্রেস ৪১৯
My League Congress 422
Translated by Alamgir Mohammad 425

আমার সুন্দর ৪২৬
My Beauty 432
Translated by Subrata Kumar Das 437

আমি সৈনিক ৪৩৮
I am a soldier 441
Translated by Nashid Kamal 443

আয়নার ফ্রেম ৪৪৪
Frame of a Mirror 445
Translated by Alamgir Mohammad 446

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন ৪৪৭
Awakening the Power Denied 450
Translated by Sajed Kamal 452

তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা ৪৫৩
Removing the veil from the faces of Turkish women 457
Translated by Nashid Kamal 460

ধর্ম ও কর্ম ৪৬১
Religion and Work 463
Translated by Nashid Kamal 464

নবযুগের সাধনা ৪৬৫
The Realization of the New Age 467
Translated by Sajed Kamal 467

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য ৪৬৮
Contemporary World literature 474
Translated by Nashid Kamal 479

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান ৪৮০
Role of Muslims in Bengali literature 483
Translated by Nashid Kamal 485

বাঙালির বাংলা ৪৮৬
The Bengal of the Bengalis 489
Translated by Peter Custers 492

ভাব ও কাজ ৪৯৩
Expression and work 496
Translated by Nashid Kamal 498

মন্দির ও মস্‌জিদ ৪৯৯
The Temple and The Mosque 505
Translated by Josheph T. O. Connell 512

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা ৫১৩
The Practice of Muslim Culture 520
Translated by Mozaffar Hossain & Subrata Kumar Das 526

মোহর্‌রম ৫২৭
Muharram 529
Translated by Nashid Kamal 530

রাজবন্দীর জবানবন্দী ৫৩১
Confessions of a State Prisoner 536
Translated by Nashid Kamal 541

রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন ৫৪২
Doomsday 547
Translated by Sajed Kamal 550

সত্যবাণী ৫৫১
The Word of Truth 553
Translated by Alamgir Mohammad 554

সত্য-শিক্ষা ৫৫৫
True Education 557
Translated by Alamgir Mohammad 558

হিন্দু-মুসলমান ৫৫৯
Hindu and Muslim 562
Translated by Nashid Kamal 564

Speeches and Addresses
অভিভাষণ ও প্রতিভাষণ

জন-সাহিত্য ৫৬৭
Public Literature 570
Translated by Alamgir Mohammad 573

প্রতিভাষণ ৫৭৪
A Word in Response 578
Translated by Alamgir Mohammad 582

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা ৫৮৩
A Discourse on Muslim Culture 590
Translated by Alamgir Mohammad 596

যদি আর বাঁশি না বাজে ৫৯৭
If the Flute No Longer Plays 602
Translated by Alamgir Mohammad 606

স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ ৬০৭
The Awakening of an Independent Mind 610
Translated by Alamgir Mohammad 612

Letters
পত্রাবলি

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ-কে লিখিত পত্র ৬১৫
Written to Principal Ibrahim Khan 627
Translated by Alamgir Mohammad 640

কাজী অনিরুদ্ধ-কে লিখিত পত্র ৬৪১
Written to Anirudwh Kazi 642
Translated by Alamgir Mohammad 642

নার্গিস আসার খানম-কে লিখিত পত্র ৬৪৩
Written to Nargis Asar Khanam 646
Translated by Alamgir Mohammad 648

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ-কে লিখিত পত্র ৬৪৯
Written to Begum Shamsunnahar Mahmud 658
Translated by Alamgir Mohammad 668

মিস ফজিলতুন্নেসা-কে লিখিত পত্র ৬৬৯
Written to Miss Fazilatunnesa 671
Translated by Alamgir Mohammad 672

মিসেস এম. রহমান-কে লিখিত পত্র ৬৭৩
written to Mrs. M. Rahman 675
Translated by Alamgir Mohammad 676

Plays and Dramas
নাটক-নাটিকা

আলেয়া ৬৭৯
Elf-Fire 722
Translated by Alamgir Mohammad 757

ঝিলিমিলি ৭৫৮
Louver 772
Translated by Alamgir Mohammad 784

পুতুলের বিয়ে ৭৮৫
The Doll's Wedding 800
Translated by Alamgir Mohammad 813

বিদ্যাপতি ৮১৪
Vidyapati 843
Translated by Alamgir Mohammad 868

বিয়ে-বাড়ি ৮৬৯
The Wedding House 881
Translated by Alamgir Mohammad 892

সাপুড়ে ৮৯৩
The Snake-Charmer 903
Translated by Alamgir Mohammad 911

সেতু-বন্ধ ৯১২
The Bridge 930
Translated by Alamgir Mohammad 948

Appendix 949
Kazi Nazrul Islam : A Chronology of Life 949
Sajed Kamal 949
Books by Nazrul Islam 958

Novel
উপন্যাস

মৃত্যুক্ষুধা

এক

পুতুল-খেলার কৃষ্ণনগর।

যেন কোনো খেয়ালি শিশুর খেলাশেষের ভাঙা খেলাঘর।

খোকার চলে-যাওয়া পথের পানে জননীর মতো চেয়ে আছে — খোকার খেলার পুতুল সামনে নিয়ে।

এরই একটেরে চাঁদ-সড়ক। একটা গোপন ব্যথার মতো করে গাছ-পালার আড়াল টেনে রাখা।

তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মুসলমান আর 'ওমান কাতলি' (রোম্যান ক্যাথলিক) সম্প্রদায়ের দেশি কনভার্ট ক্রিশ্চানে মিলে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে এই পাড়ায়।

এরা যে খুব সদ্ভাবে বসবাস করে এমন নয়। হিন্দুও দু-চার ঘর আছে — চানাচুর ভাজায় ঝালছিটের মতো। তবে তাদেরও আভিজাত্য-গৌরব ওখানকার মুসলমান-ক্রিশ্চান — কারুরই চাইতে কম নয়।

একই-প্রভুর-পোষা বেড়াল আর কুকুর যেমন দায়ে পড়ে এ ওকে সহ্য করে — এরাও যেন তেমনি। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে গোমরায় যথেষ্ট, অথচ বেশ মোটা রকমের ঝগড়া করার মতো উৎসাহ এবং অবসর নেই বেচারাদের জীবনে।

জাতিধর্মনির্বিশেষে এদের পুরুষেরা জনমজুর খাটে — অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চিগিরি বা ঐ রকমের কোনো-একটা-কিছু করে। আর, মেয়েরা ধান ভানে, ঘর-গেরস্তালির কাজকর্ম করে, রাঁধে, কাঁদে এবং নানান দুঃখধান্দা করে পুরুষদের দুঃখ লাঘব করবার চেষ্টা করে।

বিধাতা যেন দয়া করেই এদের জীবনে দুঃখকে বড় করে দেখবার অবকাশ দেননি। তাহলে হয়তো মস্ত বড় একটা অঘটন ঘটত।

এরা যেন মৃত্যুর মাল-গুদাম! অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্লাই! আমদানি হতে যতক্ষণ, রফতানি হতেও ততক্ষণ!

মাথার ওপরে টেরির মতো এদের মাঝে দু-চারজন 'ভদ্দর-নুক'ও আছেন।

কিন্তু এতে তাদের সৌষ্ঠব বাড়লেও গৌরব বাড়েনি। ঐটেই যেন ওদের দুঃখকে বেশি উপহাস করে।

বিধাতার দেওয়া ছেলেমেয়ে এরা বিধাতার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিত মনে পান্তা-ভাত খেয়ে মজুরিতে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে এসে বড় ছেলেটাকে বেশ করে দু-ঘা ঠেঙায়, মেজোটাকে সম্বন্ধের বাছবিচার না রেখে গালি দেয়, সেজোটাকে দেয় লজঞ্চুস, ছোটটাকে খায় চুমো, তারপর ভাত খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে — রোদে-পোড়া, ধূলিমলিন, ক্ষুধার্ত, গায়ে জামা নেই। অকারণ ঘুরে বেড়ায়, কাঠ কুড়োয়, সুতোকাটা ঘুড়ির পেছনে ছোটে এবং সেই সঙ্গে খাঁটি বাংলা ভাষার চর্চা করে।

এরাই থাকে চাঁদ-সড়কের চাঁদবাজার আলো করে। ... এই চাঁদ-সড়কেরই একটা কলতলায় জল-নেওয়া নিয়ে সেদিন মেয়েদের মধ্যে একটা ধুমখাত্তর ঝগড়া বেধে গেল।

কে একজন ক্রিশ্চান মেয়ে জল নিতে গিয়ে কোন এক মুসলমান মেয়ের কলসি ছুঁয়ে দিয়েছে। এদের দুই জাতই হয়তো একদিন এক জাতিই ছিল — কেউ হয়েছে মুসলমান, কেউ ক্রিশ্চান। আর এক কালে এক জাত ছিল বলেই এরা আজ এ ওকে ঘৃণা করে। এই দুই জাতের দুইটি মেয়েই কম-বয়সী এবং তাদের বন্ধুত্বও পাকা রকমের। কাজেই ঝগড়া ঐ মেয়ে দু'টি করেনি। করছে তারা — যারা এই অনাসৃষ্টি দেখেছে।

গজালের মা-র পাড়াতে কুঁদুলি বলে বেশ নামডাক আছে। সে-ই 'অপোজিশন লীড' করছে মুসলমান-তরফ থেকে।

অপরপক্ষে হিড়িম্বাও হটবার পাত্রী নয়। তার ভাষা গজালের মা-র মতো ক্ষুরধার না হলেও তার শরীর এবং স্বর এ দুটোর তুলনা মেলে না! — একেবারে সেকালের ভীম-কান্তা হিড়িম্বা দেবীর মতোই!

গজালের মা গজালের মতোই সরু — হাড্ডি-চামড়াসার কিন্তু তার কথাগুলো বুকে বেঁধে গজালের মতোই নির্মম হয়ে। গজাল উঠিয়ে ফেললেও দেয়ালে তার দাগ যেমন অক্ষয় হয়ে যায়, ঝগড়া থেমে গেলেও গজালের মা-র কটূক্তির জ্বালা তেমনি কিছুতেই আর মিটতে চায় না।

ঝগড়া তখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং গজালের মা বেশি চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে, 'হারাম-খোর, খেরেস্তান কোথাকার! হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন শুয়োরের মত চর্বি হয়েছে, না লা?'

গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মতো মুখ বিকৃত করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তা বলবি বৈ কি লা সুঁটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ির হারাম-রাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা।'

গজালের মা রাগের চোটে তার ভরা কলসির সবটা জল মাটিতে ঢেলে ফেলে আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, 'ওলো আগ-ধুমসী (রাগধুমসী)! ওলো ভাগলপুরে গাই! ওলো, আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো, আমার ছেলে জজ সায়েবের খানসামা ছিল — জজ সায়েবের লো, ইংরেজের!'

পুঁটের মাও খেরেস্তান, তার আর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে বলে উঠল 'আ-সইরন সইতে নারি, সিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি! বলি, অ'গজালের মা! ঐ জজ সায়েবও আমাদেরই জাত। আমরা 'আজার' (রাজার) জাত, জানিস?'

দু-তিনটি ক্রিশ্চান মেয়ে পুঁটের মার এই মোক্ষম যুক্তিপূর্ণ জবাব শুনে খুশি হয়ে বলে উঠল 'আচ্ছা বলেছিস মাসি!'

খাতুনের মা কাঁখে কলসি, পেটে পিলে আর কাঁধে ছেলে নিয়ে এতক্ষণ শোনার দলে দাঁড়িয়েছিল এবং মাঝে মাঝে মূলগায়েনের দোয়ারকি করার মতো গজালের মার সুরে মিলিয়ে দু-একটা টিপ্পনি কাটছিল। কিন্তু এইবার আর তার সইল না। ছেলে, পিলে আর কলসি-সমেত সে একেবারে মূলগায়েনের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল, এবং ক্রিশ্চানদের বৌদের লক্ষ করে যে ভাষা প্রয়োগ করল, তা লেখা তো যায়ই না, শোনাও যায় না।

এইবার হিড়িম্বা ফস করে তার চুল খুলে দিয়ে একেবারে 'এলোকেশী বামা' হয়ে দাঁড়াল, এবং কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে খাতুনের মার মুখের সামনে হাত দুটো বার কয়েক বিচিত্র-ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'তুই আবার কে লো উঝ্‌ড়োখাগী! তবু যদি ভাতারের ধুম্‌সুনি না খেতিস দুবেলা!' তারপর তার অপ-ভাষাটার উত্তর তার চেয়েও অপ-ভাষায় দিয়ে সে গজালের মা-র পানে চেয়ে বললে, 'হ্যাঁ লা ভাতার-পুত্‌খাগি! তিন বেটাখাগি। তোর ছেলে না হয় জজ সায়েবের বাবুর্চিগিরি করত, আর সে ছেলেকেও তো দিয়েছিস কবরে। আর তুই নিজে যে সেদিন আমফেসাদ বাবুর (রামপ্রসাদ বাবুর) হাঁড়ি ঠেলে রুনুন (উনুন) কেড়ে এলি! ঐ আমফেসাদ বাবু তোদের মৌলবী সায়েব নাকি লা? হাত শোঁক্, এখনো খেরেস্তানের গন্ধ পাবি!'

এর চরম উত্তর দিল গজালের মা, বেশ একটু ছুরির মতো ধারালো হাসি হেসে, 'বলি ওলো হুতমোচোখি, ঐ 'আমফেসাদ' বাবু তো আমার তলপেটে চালের পোটলা পেয়ে মাথায় চটি ঝাড়েনি! ছেলের বেয়ারাম হয়েলো (হয়েছিল), তাই ওর বাড়ি চাকরি করতে গিয়েলাম (গিয়েছিলাম), তাই বলে এক গেলাস পানি খেয়েছি ও বাড়িতে? বলুক, দেখি কোন কড়ই-রাঁড়ি বলবে!'

শেষের কথাগুলো হিড়িম্বার কানে যায়নি। সে 'ছিটেন পাড়ার' (প্রোটেস্টান্ট পাড়ার) পাদরি সায়েব মিস্টার রামপ্রসাদ হাতির বাড়ি চাকরি করতে গিয়ে সত্যিই একবার চাল চুরির জন্য মার খেয়েছিল। কিন্তু সে কেলেঙ্কারির কথাটা এতগুলো মেয়ের মধ্যে ঘোষণা করে দেওয়াতে সে এইবার যা কাণ্ড করতে লাগল — তা অবর্ণনীয়! চুল ছিঁড়ে, আঙুল মটকে, চেঁচিয়ে, কেঁদে, নেচে, কুঁদে সে যেন একটা বিরাট ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে গালির বিগলিত ধারা — অনর্গল গৈরিকস্রাব!

যত গালি তার জানা ছিল ভব্য, অভব্য, শ্লীল, অশ্লীল, সবগুলো একবার, দুবার, বারবার আবৃত্তি করেও তার যেন আর খেদ মেটে না!

'লুইস্-গানার' যেন মিনিটে সাতশো করে গুলি ছুঁড়ছে!

ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল! ঝগড়া তো নয়, মোরগ-লড়াই!

ওরই মধ্যে একটা গয়লাদের ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে পচা রে, উই শালা পচা! ছুটে আয় রে ছুটে আয়! তোর দিদিমা 'মা-কালী' হয়ে গিয়েছে!'

এই কুড়ুম-তাল ঝগড়ার মধ্যেও কয়েকটা বৌ-ঝি হেসে ফেললো!

মুসলমান তরফের একটি বৌ আর থাকতে না পেরে ঘোমটার ভিতর থেকেই বলে উঠল, 'হাতে একখানা খাঁড়া দিলেই হয়!'

তার চেয়েও সুরসিকা একটি আধ-বয়েসী মেয়ে পিছন থেকে বলে উঠল, 'কাপড়টাও খুলে পড়তে আর বাকি নেই লো!'

মুসলমান ছেলেমেয়েরা যত না হাসে, তত চেঁচায়!

ক্রিশ্চান ছেলেরা ছোঁড়ে ধুলো।

বেঁধে যায় একটা কুরুক্ষেত্তর! ...

কিন্তু দুঃখের ইন্দ্রপ্রস্থ নিয়ে এ কুরুক্ষেত্র ওখানকার নিত্যঘটনা — একেবারে 'মাছভাত'!

ঝগড়া হতেও যতক্ষণ — ভুলতেও ততক্ষণ।

দুঃখ অভাব হয়তো এদের মঙ্গলই করেছে। এত দুঃখ যদি এদের না থাকত তাহলে এমন প্রচণ্ড ঝগড়ার পরের দিনই আবার 'দিদি' 'বুবু' 'খালা' বলে হেসে কথা কইতে ওদের বাধতো!

এরা সব ভোলে — ভোলে না কেবল তাদের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত অভাব!

এই না—ভোলা দুঃখের পাথারে এরা যেন চর-ভাঙা গাছের শাখা ধরে ভেসে চলছে। দুঃখের যন্ত্রণায় মন থাকে এদের তিক্ত হয়ে, ভাষাও বেরোয় তাই কটু হয়েই,

কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখে — সে একা অসহায়, ভাসছে অকূল-পাথারে, তখন সে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় — যাকে সে এতক্ষণ ধরে অতিবড় কটূক্তি করেছে।

তাদের এ জলের জীবন-যাত্রার কি ডাঙার সুখী মানুষের মতো পরম নিশ্চিন্ত মনে বৎসরের পর বৎসর ধরে এ ওর পানে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবার উপায় আছে?

এ দুঃখের বোঝা যদি এদের এত বিপুল না হয়ে উঠতো, তাহলে এরাও এতদিন ভদ্রলোকের মতো মানুষ জাতির মহাশত্রু হয়ে দাঁড়াত — বড় বড় যুদ্ধ বাধিয়ে দিত!

দুই

গজালের মা-র ছোটছেলে প্যাঁকালে টাউনের থিয়েটারদলে নাচে, সখী সাজে, গান করে। কাজও করে — রাজমিস্তিরির কাজ।

বাবু-ঘেঁষা হয়ে সেও একটু বাবু-গোছ হয়ে গেছে। টেড়ি কাটে, 'ছিকরেট' টানে, পান খায়, চা খায়। পাড়ার মেয়ে মহলে তার মস্ত নাম। বলে, — 'যেমন গলা, তেমনি গান, তেম্‌নি সৌখিন! 'থিয়েটারে' লাচে — বাবুদের ঠিয়েটরে, ঐ খেরেস্তান পাড়ার যাত্তার গানে লয়। হুঁ হুঁ!'

সে যখন 'ফুট-গজ' 'কন্নিক' আর 'সুত' নিয়ে 'ছিকরেট' টানতে টানতে কাজে যায় আর যেতে যেতে গান ধরে, তখন পাড়ার বৌ-ঝিরা ঘোমটা বেশ একটু তুলেই তার দিকে চায়। 'ভাবী' (বৌদি) সম্পর্কের কেউ হয়তো একটু হাসেও। আর অবিবাহিতা মেয়ের মায়েরা আল্লা মিঞাকে জোড়া মোরগের গোশ্‌তের লোভ দেখিয়ে বলে, 'হেই আল্লাজি, আমার কুড়ুনির সাথেই ওর জোড়া লিখো।'

ঘরে সেদিন চা ছিল না। তাই প্যাঁকালে নেদের পাড়ার বাবুদের বৈঠকখানা হতে একটু চায়ের প্রসাদ পেয়ে এসে কাউকে কিছু না বলেই কন্নিক নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়বার যোগাড় করছিল।

তার মা একটু অনুনয়ের স্বরেই বললে, 'হ্যাঁ রে, তুই যে কাজে যাচ্ছিস বড়? এদিকে যে পাঁচি আমার মরে! দেখ না একটু কাঠুরে পাড়ার দাই মাগিকে। কাল আত্তির (রাত্তির) থেকে কষ্ট পাচ্ছে, এখনো তো কিছু হলো না।'

প্যাঁকালে তখন কন্নিক ফুটগজ সামনে রেখে থালায় একথালা জল নিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার তেল-চিটে চুলে বেশ করে বাগিয়ে টেড়ি কাটছিল। আয়নার অভাব সে কিছুদিন থেকে থালার জলেই মিটিয়ে আসছে।

চার আনা দামের একটি আয়না সে কিনেও ফেলেছিল একবার, কিন্তু একদিন চা খাওয়ার পয়সা না থাকাতে সেটা দুপয়সায় বিক্রি করে দোকানে চা খেয়ে এসেছে। এখন যা পায়, তাতে চালই জোটে না দুবেলা, তা আয়না কিনবে কি!

কিছুদিন থেকে সে রোজই তার রোজের পয়সা থেকে চার আনা আলাদা করে রাখে, আর মনে করে আজ একটা আয়না কিনবেই। কিন্তু যেই বাড়িতে এসে বাজার করতে গিয়ে দেখে, ছআনায় সকলের উপযোগী চালই হয় না, তখন লুকানো সিকিটাও বের করতে হয় কোঁচড় থেকে।

বয়স তার এই আঠার-উনিশ। কাজেই চেয়ে না পাওয়ার দুঃখটা ভুলতে আজো তার বেশ একটু সময় লাগে। কিন্তু তার আয়নার জন্য তার পিতৃহীন ছোট ছোট ভাইপো ভাইঝিগুলি ক্ষুধিত থাক্‌বে — এ যখন মনে হয়, তখন তার নিজের অভাব আর অভাবই বোধহয় না।

সেদিন ঝগড়ার ঝোঁকে হিড়িম্বা সবচেয়ে ব্যথা-দেওয়া গাল তার মা-কে যেটা দিয়েছিল, সে ঐ 'তিনবেটাখাগি'। সত্যিই তো পাহাড়ের মত জোয়ান তিন ভাই-ই তার মার চোখের সামনে ধড়ফড়িয়ে মরে গেল! তার ওপর আবার সবারই দু-চারটে করে ছেলেমেয়ে আছে; এবং তারা সর্বসাকুল্যে প্রায় এক ডজন।

এই শিশুদের এবং তার বিধবা ভ্রাতৃজায়াদের বোঝা বইবার দায়িত্ব একা তারই। কিন্তু বোঝা তাকে একা বইতে হয় না। তার মা এবং ভ্রাতৃজায়ারা মিলে ও -বোঝা হাল্কা করবার জন্য দিবারাত্রি খেটে মরে। ওতে বোঝা হাল্কা হয়তো একটু হয়, কিন্তু ক্লান্তি কমে না। ওরা যেন মস্ত একটা খাড়া পাহাড়ের গড়ানে 'খাদ' বেয়ে চলেছে, মাথার এঁটে-দেওয়া বিপুল বোঝা, একটু থামলেই বোঝা-সমেত হুড়মুড় করে পড়বে কোন এক অন্ধকার গর্তে।

গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া! কিছুদিন থেকে আবার ওর ছোট বোনটাও এসে ওদের ঘাড়ে চড়েছে! বিয়ে দিয়েছিল ওর ভাল বর-ঘর দেখেই! কিন্তু কপালে সুখ লেখা না থাকলে সে কপাল পাথরে ঠুকেও লাভ নেই! ওতে কপাল যথেষ্টই ফোলে, কিন্তু ভাগ্য একটুও ফোলে না — পাঁচির স্বামী নাকি কোন এক ক্যাওরার মেয়েকে মুসলমান করে নেকা করেছে! কিন্তু তার স্বামীর অর্ধেক রাজত্বে পাঁচির মন উঠল না। একদিন তার অনাগত শিশুর শুভ সংবাদসহ অর্ধেক রাজত্বের সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে মায়ের দুঃখের কোলেই সে ফিরে এলো।

অভাবের দিনে প্রিয় অতিথি আসার মতো পীড়াদায়ক বুঝি আর কিছু নেই! শুধু হৃদয় দিয়ে দেবতার পূজা হয়তো করা যায়, কিন্তু শুধু-হাতে অতিথিকে বরণ করা চলে না। শুধু-হাতের লজ্জা সারা হৃদয় দিয়েও ঢাকা যায় না।

পাঁচি এল চোখ-ভরা জল নিয়ে। দুঃখিনী মা তার চোখের জল মুছাবারও সাহস করলে না। বড় আদরের একটি মাত্র মেয়ে তার — তার সর্বকনিষ্ঠ কোল-পোঁছা সন্তান। বুকে সে তুলে নিল তাকে, কিন্তু তাতে শান্তি সে পেল না, বুক তার ফেটে যেতে লাগল কান্নায়, বেদনায়! মা কেঁদে ওঠল, 'ওরে হতভাগিনী মেয়ে, এ কাঁটার বুকে শুধু যে ব্যথাই পাবি মা আমার! এখানে সুখ-শান্তি কোথায়?'

মেয়ের প্রথম সন্তান পিত্রালয়েই হয় — এ-ই দেশের চিরচলিত প্রথা। অতি বড় দুঃখীও তার মেয়ে প্রথম সন্তান-সম্ভাবিতা হলে নিজে গিয়ে মেয়েকে আনে, সাধ-আরমান করে, মেয়েকে 'সাধ' খাওয়ায়। পাঁচি যখন প্রসব-বেদনায় আর্তনাদ করছিল অথচ অর্থাভাবে ধাত্রীও ডাকতে পারা যাচ্ছিল না কাল রাত্রি থেকে, তখন তার মা-র যন্ত্রণা বুঝছিলেন — যদি বেদনার বোধশক্তি তাঁর থাকে — এক অন্তর্যামী!

নিজে থেকে এসেছে বলেই — এবং মেয়ের কপাল পুড়েছে বলেই কি তার যত্ন-আদরও হবে না একটু? কিন্তু হয় কিসে? —নিঃসম্বল জননী কাঁদে, ছুটে বেড়ায়, কিন্তু করতে কিছুই পারে না।

ছেলের ওপর অভিমান করে কিছুই বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু আর সে থাকতে পারল না। ছেলের কাছে এসে কেঁদে পড়ল, 'ওরে, পাঁচি যে আর বাঁচে না।'

চা খেয়ে এসেও প্যাঁকালের উষ্মা তখনও কাটেনি। সে টেড়ি কাটতে কাটতে মুখ না তুলেই বলল, 'মরুক! আমি তার কি করব? দাইয়ের টাকা দিতে পারবি?'

সত্যিই তো, সে কি করবে! টাকাই বা কোথায় পাওয়া যায়!

হঠাৎ পুত্র মুখ তুলে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, 'রোজ ঝগড়া করবি নুলোর মা-র সঙ্গে, নইলে সে-ই তো এতখন নিজে থেকে এসে সব করত!'

নুলোর মা আর কেউ নয়, — আমাদের সেই ভীমা প্রখর-দশনা শ্রীমতী হিড়িম্বা! সে শুধু ঝগড়া করতেই জানে না, একজন ভাল ধাত্রীও।

ইতিমধ্যেই পাঁচি চিৎকার করে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল। মায়ের প্রাণ, আর থাকতে পারল না। বৌদের ডেকে মেয়েকে দেখতে বলে সে তাড়াতাড়ি হিড়িম্বাকে ডাকতে বেরিয়ে পড়ল।

হিড়িম্বা তখন তার বাড়ির কয়েকটা শশা হাতে নিয়ে বাবুদের বাড়ি বিক্রি করতে যাচ্ছিল। পথে গজালের মা-র সঙ্গে দেখা হতেই সে মুখটা কুঁচকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু গজালের মার তখন তা লক্ষ করবার মতো চোখ ছিল না। সে দৌড়ে হিড়িম্বার হাত দুটো ধরে বলল, 'নুলোর মা, আমায় মাফ কর ভাই! একটু দৌড়ে আয়, আমার পাঁচি আর বাঁচে না!'

হিড়িম্বা কথা কয়টা ঠিক বুঝতে না পেরে একটু হতভম্ব হয়ে গেল। সে একটু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এ কি ন্যাকামি লা? তুই কি আবার কাজিয়া করবি নাকি পাড়ার মাঝে পেয়ে?'

গজালের মা কেঁদে ফেলে বলল, 'না বোন সত্য বলছি, আল্লার কিরে! আমার পাঁচির কাল থেকে ব্যথা উঠেছে; ঝগড়া তোর গজালের মা-র সঙ্গেই হয়েছে, পাঁচির মার সঙ্গে তো হয়নি!'

হিড়িম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল 'অ! তা তোর পাঁচির ছেলে হবে বুঝি? তা আত (রাত) থেকে কষ্ট পাচ্ছে — আর আমায় খবর পাঠাসনি? আচ্ছা মা যাহোক বাবা তুই! আমরা হলে ধন্না দিয়ে পড়তাম গিয়ে। চ দেখি গিয়ে!'

হিড়িম্বা যেতেই পাঁচি কেঁদে উঠল, 'মাসি গো, আমি আর বাঁচব না।'

হিড়িম্বা হেসে বলল, 'ভয় কি তোর মা; এই তো এখনি সোনার চাঁদ ছেলে কোলে পাবি!'

পাঁচি অনেকটা শান্ত হলো। ধাত্রী আসার সান্ত্বনাই তার অর্ধেক যন্ত্রণা কমিয়ে দিল যেন।

একটু তদবির করতেই পাঁচির বেশ নাদুস-নুদুস একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হলো। সকলে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওলো, ছেলে হয়েছে লো! ছেলে হয়েছে যে!'

ওদের খুশি যেন আর ধরে না! ওরা যেন ঈদের চাঁদ দেখেছে!

হিড়িম্বা মূর্ছিতাপ্রায় পাঁচির কোলে ছেলে তুলে দিয়ে বলল, 'নে, ছেলে কোলে কর। সব কষ্ট জুড়িয়ে যাবে!'

পাঁচি অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগল!

নবশিশুর ললাটে প্রথম চুম্বন পড়ল না কারুর, পড়ল দুঃখী মায়ের অশ্রুজল!

গজালের মা হিড়িম্বার হাত ধরে বলল, 'দিদি, আমায় মাফ কর!'

হিড়িম্বার চোখ ছলছল করে উঠল। সে কিছু না বলে সস্নেহে খোকার কপালে পড়া তার মায়ের অশ্রুজল-লেখা মুছিয়ে দিল।

বাইরে তখন ক্রিশ্চান ছেলেদের দেখাদেখি মুসলমান ছেলেরাও গাচ্ছে —

'আমরা যিশুর গুণ গাই।'

তিন

এই সব ব্যাপারে কাজে যেতে সেদিন প্যাঁকালের বেশ একটু দেরি হয়ে গেল। তারি জুড়িদার আরও জন তিন-চার রাজমিস্তিরি এসে তাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিল।

প্যাঁকালে না খেয়েই তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে এলো। সে জানত, কাল থেকে চালের হাঁড়িতে ইঁদুরদের দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা বসেছে। তাদের কিচিরমিচির বক্তৃতায় আর নেংটে ভলান্টিয়ারদের হুটোপুটির চোটে সারারাত তার ঘুম হয়নি।

কিন্তু চাল যদি-বা চারটে যোগাড় করা যেত ধারধুর করে, আজ আবার চুলোও নেই। উনুন-শালেই পাঁচির ছেলে হয়েছে। ও-ঘর নিকুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

ঘরে তাদের চালের হাঁড়িগুলো যেমন ফুটো, চালও তেমনি সমান ফুটো। সেখানে বাসা বাঁধবার খড় না পেয়ে চড়াই পাখিগুলো অনেকদিন হলো উড়ে চলে গেছে। কিন্তু অর্থের চেয়েও বেশি টানাটানি ছিল তাদের জায়গার।

যেটা উনুন-শাল, সেইটেই ঢেঁকিশাল, সেইটেই রান্নাঘর এবং সেইটেই রাত্রে জনসাতেকের শোবার ঘর। তারই একপাশে দরমা বেঁধে গোটা বিশেক মুরগি এবং ছাগলের ডাক-বাংলো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

প্যাঁকালে না খেয়েই কাজে গেল, তার মা-ও তা দেখল। কিন্তু ঐ শুধু দেখল মাত্র, মনের কথা অন্তর্যামীই জানেন, চোখে কিন্তু তার জল দেখা গেল না। বরং দেখা গেল সে তার মেয়ের আঁতুড়-ঘরে ঢুকে তার খোকাকে কোলে নিয়ে দোলা দিতে কি সব ছড়া-গান গাচ্ছে।

একটি ছোট্ট শিশু তার জোয়ান রোজগেরে ছেলেদের অকালমৃত্যু ভুলিয়েছে। একটা দিনের জন্যও সে তার দুঃখ ভুলেছে। তার অনাহারী ছেলের কথা ভুলেছে!

প্যাঁকালে যেতে যেতে তার মা-র খুশিমুখ দেখল, বোনের ছেলেকে নিয়ে গানও শুনল। চোখ তার জলে ভরে এলো। তাড়াতাড়ি কাঁধের গামছাটা দিয়ে চোখ দুটো মুছে সে হাসতে হাসতে বার হয়ে পড়ল!

রাজমিস্ত্রী দলের মোনা প্যাঁকালের সুরকি-লাল কোটটার পকেটে ফস করে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'লে ভাই, একটা 'ছিকরেট' বের কর! বড্ডো দেরি হয়ে গেল আজ, শালা হয়তো এতক্ষণ দাঁত খিঁচুচ্ছে।'

প্যাঁকালে পথ চলতে চলতে বলল, 'ও গুড়ে বালি রে মনা, ছিকরেট ফুরিয়ে গেছে।'

আল্লারাখা তার কাছা খুলে কাছায়-বাঁধা বিড়ির বাণ্ডিলটা সাবধানে বের করে বলল, 'এই নে, খাকি ছিকরেট আছে, খাবি?'

কুড়ুচে বান্ডিল থেকে ফস করে একটি বিড়ি টেনে নিয়ে সায়েবদের মতো করে বাম ওষ্ঠপার্শ্বে চেপে ধরে ঠোঁট-চাপা স্বরে বলল, 'জিয়াশলাই আছে রে গুয়ে, জিয়াশলাই?'

গুয়ে তার 'নিমার' ভেতর-পকেট থেকে বারুদ-ক্ষয়ে-যাওয়া ছুরিমার্কা দেশলাইয়ের বাক্সটা বের করে কুড়চের হাতে দিয়ে বলল, 'দেখিস, একটার বেশি কাঠি পোড়াসনে যেন। মাত্তর আড়াইটি কাঠি আছে।'

কুড়ুচে কাঠির ও খোলের দুরবস্থা দেখে বলল, 'তুই-ই জ্বালিয়ে দে ভাই, শেষে বলবি, শালা একটা কাঠি নষ্ট করে ফেলল।'

গুয়ের ওদিক দিয়ে মস্ত নাম। ঝড়ের মধ্যেও সে এমনি কায়দা করে দেশলাই ধরাতে পারে যে, কাঠিটা শেষ হয়ে না পোড়া পর্যন্ত নিভে না!

দেশলাইয়ের খোলার ঘষা-বারুদে গুয়ে কৌশলের সঙ্গে আধখানা কাঠিটি নিয়ে একটি ছোট্ট টোকা মেরে জ্বালিয়ে ফেলেই দুই হাতের তালু দিয়ে তার শিখাকে বাতাসের আক্রমণ হতে রক্ষা করে এমন করে কুড়ুচের মুখের সামনে ধরল যে, তা দেখবার জিনিস।

বিড়িটা যতক্ষণ না আঙুল পুড়িয়ে ফেলল, ততক্ষণ এ-মুখ-ও-মুখ হয়ে ফিরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সর্দার মিস্তিরির, আর যার বাড়িতে কাজ করছে তার চৌদ্দ-পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধও হতে লাগল।

'ওমান কাতলি' পাড়ার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল তারা। একটা বিশিষ্ট ঘরের সামনে গিয়েই প্যাঁকালে গান ধরে দিলে :

'কালো শশী রে, বিরহ-জ্বালায় মরি!'

তাকে কিন্তু বেশিক্ষণ বিরহ-জ্বালায় মরতে হলো না! বাড়ির ভিতর থেকে কলসি-কাঁখে একটি কালোকুলো গোলগাল মেয়ে বেরিয়ে এল।

মেয়েটি যেন একখানা চার পয়সা দামের চৌকো পাউরুটি। কিন্তু মোটা সে একটু বেশি রকমের হলেও চোখে-মুখে তার লাবণ্য ছিল অপরিমিত, চোখ দুটি যেন লাবণ্যের কালো জলে ক্রীড়া-রত চটুল সফরি — সদাই ভেসে বেড়াচ্ছে ভুরু জোড়া যেন গাঙ-চিলের ডানা — ঐ সফরির লোভে, চোখের লোভে উড়ে বেড়াচ্ছে।

না-বলা কথার আবেশে পাতলা ঠোঁট দুটি কাঁপছে কচি নিমপাতার মতো।

নাকটি যেন মোহনবাঁশি। চিবুকের মাঝখানটিতে নাশপাতির মত ছোট্ট টোল।

শ্রাবণ-রাতের মেঘের মতো চুল।

কিন্তু মুখের ওর এত লাবণ্যকে যেন বিদ্রূপ করছে ওর বাকি শরীরের স্থূল চৌকো গড়ন।

মেয়েটি মধু ঘরামির। মধু আগে মুসলমান ছিল, এখন 'ওমান কাতলি' হয়েছে।

মেয়েটির নাম কুর্শি। বয়স চৌদ্দর কাছাকাছি। দেখে কিন্তু ষোলো-সতের বলে ভ্রম হয়। একটু বেশি বাড়ন্ত।

সর্দার মিস্তিরির মিষ্টি আলোচনা তখন দলের মধ্যে এমনি জোরের সঙ্গে চলছিল যে, তারা দেখতেই পেল না, কখন কুর্শি তাদের কচার বেড়ার ধারে চোখ-ভরা ইঙ্গিত নিয়ে এসে দাঁড়াল এবং প্যাঁকালেও হঠাৎ পিছিয়ে পড়ল।

কিন্তু কথা বলবার তারা সুযোগ পেল না। পিছনে একটা গরুর গাড়ি আসছিল — প্যাঁকালে তা খেয়াল করেনি। গাড়ির গাড়োয়ান কিন্তু মেয়েটার গতিবিধি লক্ষ

করছিল। কচাগাছের কাছে কলসি নিয়ে সাতজন্ম দাঁড়িয়ে থাকলেও যে জল পাওয়া যায় না, এ তো জানা কথা। গাড়োয়ানটা তার উৎসাহ থামিয়ে রাখতে পারল না। হঠাৎ গেয়ে উঠল :

'ছোঁড়ার মাথায় বাবরি-কাটা চুল,
হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল!'

গান তো নয়, ঋষভ চিৎকার! সে চিৎকারে ছোঁড়া-ছুঁড়ির প্রেম ততক্ষণে হৃদয়দেশ ত্যাগ করে বহু ঊর্ধ্বে উধাও হয়ে গেছে!

প্যাঁকালে অকারণে পাশের রেতো কামারের দোকানে ঢুকে পড়ে। গাড়োয়ান শুনতে পায় এমনি চেঁচিয়েই বলল, 'এই! আমার বঁড়শিটা কখন দিবি?' বলা বাহুল্য, কামারকে সে বঁড়শি গড়তে কোনোদিনই দেয় নি।

ওদিকে কুর্শি হঠাৎ কলসি নামিয়ে একটা কচার ডাল ভেঙে পাশের ছাগলটাকে অকারণে দুঘা কষিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'পোড়ামুখির ছাগল রোজ রোজ এসে বেগুন গাছ খেয়ে যাবে!'

এখানেও বেগুন গাছের উল্লেখটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।

রসিক গাড়োয়ান গান গাওয়ার মাঝে ডাইনের বলদটার ঠেশে ল্যাজ মুষড়ে দিয়ে এবং বামের বলদটার তলপেটে বাম পা'টার সাহায্যে বেশ করে কাতুকুতু দিয়ে, — জিহ্বা ও তালু-সংযোগে জোরে দুটো টোকর মেরে শেষের কলিটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল — 'ও ছুঁড়িরা মজাইল, হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল।'

যন্ত্রণায় ও কাতুকুতুর ঠেলায় বলীবর্দ যুগল ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে ছুট দিল।

প্যাঁকালে একবার হতাশ নয়নে ছাগল-তাড়না-রত কুর্শির দিকে তাকিয়ে দৌড়ে জুড়িদের সঙ্গ নিল। তখনো গাড়ি ছুটছে, কিন্তু গাড়োয়ানের মুখ ফিরে গেছে পিছন দিকে।

গাড়ির ধুলোর ভয়ে দলের ওরা পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। জনাব বলে উঠল 'উঃ শালার গলা তো নয়, যেন হাঁড়োল! ও শালা কে রে?'

প্যাঁকালে কটু কণ্ঠে বলে উঠল, 'ঐ শালা ন্যাড়া গয়লা — শালা গান করছে না তো, যেন হামলাচ্ছে।'

সকলেই হেসে উঠল।

হঠাৎ ওদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'খড়্গ্ পাচে।'

অমনি সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। যে ঐ ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারণ করলে তার গা টিপে আর একজন আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় রে?'

অদূরে সাইকেল রেখে এক ভদ্রলোক রাস্তার ধারেই একটা অপকর্ম করতে বসে গেছিলেন। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্যাঁকালে বলল, 'উ-ই যে, নীল চোঁয়ায়।'

এতক্ষণে ঐ অপকর্মরত ভদ্রলোকটিও দেখে ফেলেছিলেন, এবং এরাও তাঁকে দেখতে পেয়েছিল।

ঐ ভদ্রলোকটির বাড়িতেই এরা রাজমিস্তিরির কাজ করে।

এদের রাজমিস্তিরিদের অনেকগুলো 'কোডওয়ার্ড — সাংকেতিক বাণী আছে — যার মানে এরা ছাড়া অন্য কেউ বোঝে না। 'খড়্গ্ প্যাঁচে' বাবু বা সায়েব আসছে বা দেখছে, আর 'নীল চোঁয়ায়' ব্যবহৃত হয় এ অপকর্মটির গূঢ় অর্থে।

এর পরেই দলকে দল হঠাৎ এমন সব বিষয়ে আলোচনা জুড়ে দিলে যা শুনে তাদের অতি নিরীহ চির-দুঃখী জন-মজুর ছাড়া কিছু ভাবা যায় না।

চার

প্যাঁকালে চলে যাবার পরই তার দ্বাদশটি ক্ষুধার্ত ভাইপো-ভাইঝি মিলে যে বিচিত্র সুরে 'ফরিয়াদ' করতে লাগল ক্ষুধার তাড়নায়, তাতে অন্নের মালিক যিনি, তিনি এবং পাষাণ ব্যতীত বুঝি আর সব-কিছুই বিচলিত হয়।

সেজো-বৌ হপ্তাখানিক হলো টাইফয়েড থেকে কোনো রকমে বেঁচে উঠেছে। কিন্তু ঐ বেঁচে উঠেছে মাত্র। বেঁচে থাকার চিহ্ন শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু ছাড়া তার আর কিছু নেই। দেহের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা কবরে দেয়া ছাড়া আর কোনো কাজে লাগে না। যেন কুমিরে চিবিয়ে গিলে আবার উগলে দিয়ে গেছে।

কসাই যেমন করে মাংস থেঁতলায়, রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য এই চারটিতে মিলে তেমনি করে যেন থেঁতলেছে ওকে।

ওরই কোলে খোকা — স্বামীর শেষ স্মৃতিটুকু। মাত্র দুমাসের! জন্মে অবধি মায়ের দুধ না পেয়ে শুকিয়ে চামচিকের মতো হয়ে গেছে।

শুষ্ক ক্ষীণকণ্ঠে অসহায় শিশু কাঁদে, আর একবার করে তার কণ্ঠের চেয়েও শুষ্ক মায়ের বুকে একবিন্দু দুধের আশায় বৃথা কান্না থামায়। আবার কাঁদে। কান্না তো নয়, যেন বেঁচে থাকার প্রতিবাদ। যেন ওকে কে গলা টিপে মেরে ফেলছে।

ওর মা-ই তখন চেঁচিয়ে বলে, 'আল্লা গো, আর দেখতে পারিনে, তুলে নাও বাছাকে তোমার কাছে। ও মরে বাঁচুক।'

চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

খোকা কান্না থামিয়ে সেই নোনাজল চাটে, আবার কাঁদে।

মেয়েদের ঘর থেকে শাশুড়ি তার নবাগত নাতিকে মেয়ের কোলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসে কান্নাকটু কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, 'মর্ মর্ মর্ তোরা! এত লোককে নেয়, আর তোদেরই ভুলেছে যম।' তারপর বৌদের উদ্দেশ্য করে বলে, 'নে লা বেটাখাগীরা, তোদের এই হারামদের মাথা চিবিয়ে খা। মাগীরা শুয়োরের মতো ছেলে বিইয়েছে সব। বাপরে বাপ! জান যেন তেতবিরক্ত হয়ে গেল!' বলেই সে উচ্চৈঃস্বরে তার মৃত পুত্রদের নাম করে কাঁদে। ততক্ষণে বড়-বৌ জলের ঘড়াটা নামিয়ে বড় ছেলেমেয়ে দুটোকে ধরতে না পেরে এক বছরের ছোট মেয়েটার পিঠেই মনের সাধে ঝাল মেটাতে থাকে।

মেজো-বৌ ছাড়াতে যায়, পারে না। মেয়েটাকে ছাড়াতে গিয়ে তারও পিঠে পড়ে দু-এক ঘা! মেজো-বৌ হাসে, আর বাকি ছেলেগুলোকে পালাবার ইঙ্গিত করে।

তার নিজের ছেলেমেয়ে দুটির দিকে চেয়েও দেখে না। ওরা যেন ওদের মায়ের গুণ পেয়েছে। বাড়ির মধ্যে ঐ ছেলেমেয়ে কয়টাই যা শান্ত। খিদে পেলে চুপি চুপি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'মা, বড্ডো খিদে পেয়েছে।'

আজও মেজো-বৌ যখন বড় বৌ-এর ক্রন্দনরত ছোট মেয়েটাকে বুকে করে দোলা দিতে দিতে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তখন তার ছেলেমেয়েরা স্থির শান্তভাবে একটা কাঁচা কৎবেল ভেঙে সেইটে দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করছিল। কেবল ছোট ছেলেটি তার মায়ের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল।

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'বুবু। অ-বু-উ! মা আবার মেনিকে নেমিয়ে দেবে কোল থেকে?'

কাঁচা কৎবেলের কষায় রসে তার বুবুর জিহ্বা তখন তালুতে ঠেকেছে গিয়ে। সে কোনো-রকমে বলল, 'হু'।

মেজো-বৌ তার ছেলেমেয়ের দিকে ফিরে বলল, 'পট্‌লি, যা দেখি চারটে কাঠ কুড়িয়ে আন গিয়ে, আমি তোদের তরে ক্ষীর রেঁধে দিচ্ছি।'

মায়ের ভয়ে যে ছেলেমেয়ে কয়টির এতক্ষণ উদ্দেশ ছিল না, ক্ষীরের উল্লেখে তারা এইবার যেন মন্ত্রবলে পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

মেজো-বৌকে ঘিরে নেচে-কুঁদে তার কাপড় টেনে চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে ওরা যেন একটা পেল্লায় কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল। যেন মেজো-বৌকেই ছিঁড়ে খাবে।

এক পাল ছাতার পাখি যেন একটা পোকা দেখতে পেয়েছে।

মেজো-বৌয়ের ছোট ছেলেটি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এইবার সে আস্তে আস্তে তার ক্রন্দন-রত দাদীর কোলে এসে বসে কী ভাবতে লাগল; তারপর তার গায়ের ছেঁড়া ময়লা জামাটা খুলে দাদীর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'দাদী, চুপ কর, মা ক্ষীর রাঁধছে, তুই খাবি, আমি খাব, বু খাবে।'

তার দাদীর কান্না থামে। ঐ ক্ষুদ্র শিশু। তার বাবাও ছিল ছেলেবেলায় ঠিক এমনটি দেখতে। কার জন্য কাঁদছে সে? এই তো তার সোভান। ঐ যাদের এত করে গালি দিচ্ছিল যে, তারাই তো তার বারিক গজালে। খিদে পেলে এমনি করে কাঁদত তারা। কাঁদলে সোভান এমনি করে কোলে বসে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলত, 'মা, তুই কাঁদিসনে, আমি বড় হয়ে তোকে তিন কুড়ি টাকা এনে দেব।' কে বলে সোভান মরেছে? এ তো সে-ই এসেছে আবার তেমনি খোকাটি হয়ে। এই তো রয়েছে তার গলা জড়িয়ে ধরে। চুমায় চোখের জলে শিশুর মুখ অভিষিক্ত করে দেয়।

শিশুর ক্ষুদ্র মুখ ঝলমল করে চির দুঃখিনীর কোলে — যেন বর্ষা রাতের ম্লান চাঁদ।

শিশু হঠাৎ দাদীর কোল থেকে উঠে দৌড়ে মায়ের গায়ে মাথা হেলান দিয়ে বসে। আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কি ভাবে। চোখের সামনে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুঘু উড়ে যায়। নীল স্বচ্ছ আকাশ-রোদ লেগে যেন আরো করুণ হয়ে ওঠে। কত দূর ঐ আকাশ!

হঠাৎ সে মার আঁচল টেনে বলে, 'মা, তুই যে বলেছিলি, ক্ষীর-পরবের দিন বা-জান আসবে। আজ আমরা ক্ষীর রাঁধছি যে, বা-জান আসবে ও-ই মেঘ ফুঁড়ে! লয়!'

মা শুকনো পাতার উপর লুটিয়ে পড়ে। মুখের গান তার চোখের জলে ভেসে যায়! — শুকনো আমপাতা আপন মনে পুড়তে পুড়তে তার দিকে এগোয়।

শাশুড়ি ছুটে এসে লুটিয়ে-পড়া বৌকে তুলবার চেষ্টা করতেই মেজো-বৌ অমনি ধড়মড়িয়ে ওঠে, তারপর কাঠি দিয়ে উনুনে পাতা ঠেলে।

এইবার খোকা কিছু না বলে চুপ করে বসে থাকে।

তার দাদী বলে, 'দেখ বৌ, সোভান দিনরাত এমনি মন-মরা হয়ে থাকত ছেলেবেলা থেকেই।'

মেজ-বৌ আবার গুণ গুণ করে গান করে।

শাশুড়ি বলে, 'আ মলো যা! ছুঁড়ি যেন দিনকের দিন কচি খুকি হয়ে উঠেছে। যখনি কান্না, তখনই হাসি।' বলেই খোকাকে টেনে কোলে তুলে অকারণে উঠান ঘুরে বেড়ায়।

খোকা অনর্গল প্রশ্ন করে, 'দাদী গো, বা-জান এখন খু-ব বড় হয়ে গেয়েছে — লয়? সেই যে কয়েছিল, আমার জন্যে বিস্কুট আনবে — । হু-ই গোয়াড়ির বাজার —সে অনেক দূর! লয় দাদী? এনেক দিন লাগে যেতে আসতে। লয় দাদী? আমার লাল জামাটা লালুকে দিয়ে দিব, বা-জান আর একটা লাল জামা আনবে। লয় দাদী?

দাদী কতক শোনে, কতক শোনে না। উঠোনময় ঘুরে বেড়ায়।

সেজো-বৌ শুয়ে শুয়ে ক্ষীর-রান্না দেখে। কচি ছেলেটা ততক্ষণে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে মায়ের বুকের হাড়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

ক্ষীর-রান্না হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা যে যেখানে যা পায় — থালা, বাটি, ঘটি বদনা — তাই নিয়ে উনুন ঘিরে বসে যায়।

অপূর্ব সেই ক্ষীর! অদূরে দারোগা মির্জা সাহেবের বাড়ি। তাঁরই বাড়ির দুধ বেড়ালে খেতে না পেরে যে-টুকু ফেলে গিয়েছিল, তাই দারোগা-গিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন এদের বাড়ি। তাঁর অপার করুণা, তাই সে স্বল্প দুধে জল মিশিয়ে আধ-পোয়া দুধকে আধ সের করে ঝি'র হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই না-চাইতেই জল পেয়ে এদের সকলের চোখ দিয়ে যে কৃতজ্ঞতার জল পড়েছে, তা ঐ আধ-সের জলের অনেক বেশি।

বাড়িতে চাল ছিল সেদিন বাড়ন্ত। মুরগির সদ্য খোলা হতে ওঠা বাচ্চাগুলির জন্য যে খুদগুঁড়ার রিজার্ভ স্টোর ছিল ছটাক তিনেক, দারোগা-বাড়ির দুগ্ধ সংযোগে তাই সিদ্ধ হয়ে হলো এই উপাদেয় ক্ষীর। এই ক্ষুধিত শিশুদের এই আজকের সারাদিনের আহার।

এই তাদের ক্ষীর-পরব — ঈদ।

লবণ-সংযোগে শিশুদের সেই অপূর্ব পরমান্ন খাওয়া দেখে চক্ষে জল এল শুধু মেজো-বৌয়ের।

সে তাড়াতাড়ি কচার বেড়ার কাছে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কয়েকটা কচাপাতা নিয়ে কাঠি দিয়ে সিইয়ে তাই বাটির মতো করে তাতে খানিকটা ক্ষীর ঢেলে সেজো-বৌয়ের কাছে এনে ধরল।

সেজো বৌ উঠে বসে করুণ কণ্ঠে বলল, 'মেজো-বু, তুমি?'

মেজো-বৌ একটু হাসলে। রাহুগ্রস্ত চাঁদের কিরণের মতো ম্লান পাণ্ডুর সে হাসি।

সেজো-বৌ মেজো-বৌকে জানত। সে আর কিছু না বলে খেতে খেতে হঠাৎ থেমে বলে উঠল, 'খোকা কি এই ক্ষীর খাবে মেজো-বু?'

মেজো-বৌ বললে, 'সে কথা তোকে ভাবতে হবে না, খোকার জন্যে দুধ রেখেছি। উঠলে খাইয়ে দেবো।'

মেজো-বৌ জলের ঘড়াটা নামিয়ে রেখে হাতটা আগুনের তাতে ধরে বলে উঠল, 'উঃ কোমর কাঁকাল ধরে গেল মেজো-বৌ, কাল থেকে তুই জল আনিস আমি বরং ধান ভানব।' বলেই হাতটা সেকতে সেকতে বলতে লাগল, 'আমার হাত ফুলে গেল, গতরখাগীকে মারতে মারতে। হারামজাদীর পিঠ তো নয়, পাথর!'

ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে ক্ষীর খেয়ে মহানন্দে 'বৌ পালালো' খেলছে! ওদেরই একজন পলায়নপরায়ণা বধূ হয়ে তার না-জানা বাপের বাড়ির পানে দৌড়েছে এবং তার পিছনে বাকি সবাই গাইতে গাইতে ছুটছে —

'বৌ পালালো বৌ পালালো ক্ষুদের হাঁড়ি নিয়ে,
সে বৌকে আনতে যাব মুড়ো ঝ্যাঁটা নিয়ে।'

পাঁচ

সন্ধ্যে হব-হব সময় প্যাঁকালে হাতে চাল-ডাল, বগলতলায় ফুটগজ, পকেটে কন্নিক-সূত, আর মুখে পান ও বিড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

ছেলেমেয়ে তাকে যেন ছেঁকে ধরল।

চাল-ডালের মধ্যে একটা বোয়াল মাছ দেখে তারা একযোগে চিৎকার করে উঠল। যেন সাপের মাথায় মানিক দেখেছে।

প্যাঁকালে তার কোটের হাতায় হাত দুটো মুছে তিনটে ছোট কাগজের পুরিয়া বের করে বলল, 'আজ নলিত ডাক্তারের বাড়ির খানিকটা পলস্তারা করে দিয়ে এই ঔষুধ নিয়ে এসেছি সেজো-ভাবীর তরে। দাঁড়া, এক পুরিয়া খাইয়ে দিই আগে।'

সেজো-বৌ ওষুধ দেখে খুশি হয়ে বলে উঠল, 'ই কোন ওষুধ ছোট-মিয়ে? এলোপাতাড়ি না হৈমুবাতিক?'

প্যাঁকালে বিজ্ঞতার হাসি হেসে বলল, 'ই এলিওপাতি নয় সেজো-ভাবী, হোমিওবাতি। গুড়ের মতো মিষ্টি। খেয়েই দেখ।'

ওষুধ খেয়ে সেজো-বৌয়ের মনে হতে লাগল, সে যেন ক্রমেই চাঙ্গা হয়ে উঠছে। সে তার খুশি আর চেপে না রাখতে পেরে বলতে লাগল, 'আর দুটো দিন যদি ওষুধ পাই মেজোবুবু, তা হলে আসছে-মাস থেকেই আমি একা একরাশ ধান ভানতে পারব।'

মেজো-বৌ চাল-ডাল তুলতে তুলতে বলল, 'তাই ভালো হয়ে ওঠ ভাই আল্লা করে, আমি আর পারি না ঢেঁকিতে পাড় দিতে। আমার কাপড় সেলাই-ই ভাল, ওতে দু-পয়সা কম পেলেও সোয়াস্তি আছে।'

বড়-বৌ বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে তার ঘুঁটে-দেওয়া হাতের গোবর চেঁছে তুলতে তুলতে বললে, 'ঐ সেলাইটা আমায় শিখিয়ে দিতে পারিসনে মেজো-বৌ! তবে রিপু করাটা কিন্তু আমায় দিয়ে হবে না।'

মেজো-বৌ হাসে, আর গুন গুন করে গান করতে করতে মাছ কোটে। ছেলেমেয়েদের দল মেজো-বৌকে ঘিরে হাঁ করে মাছ কোটা দেখে আর কে মাছের কোন অংশটা খাবে, এই নিয়ে কলহ করে। যেন কাঁচাই খেয়ে ফেলবে ওরা।

বড় ছেলে-মেয়ে দুটোতে মিলে ইঁদারায় জল তুলে দিতে বলে, 'আচ্ছা ছোট চাচা, আজ মাছের মুড়োটা তো তুমিই খাবে? পটলি বলছিল, ছোট-চা আজ আমায় দেবে মুড়োটা!'

প্যাঁকালে স্নান করতে করতে কী ভাবে! শুধু বলে, 'হু'!

তার এই 'হুঁ' শুনে ছেলেটি আতঙ্কিত হয়ে উঠে বলে, 'আচ্ছা ছোট-চা, আমাকে কাল থেকে 'যোগাড়' দিতে নিয়ে যাবে? উ-ই ও পাড়ার ভুলো তো আমার চেয়ে অনেক ছোট, সে রোজ দুআনা করে আনে 'যোগাড়' দিয়ে। — আচ্ছা ছোট-চা, দু আনায় একটা মাছ পাওয়া যায় না?' — তারপর তার বোনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাল থেকে আমার একা একটা মাছ! দেখাবো আর খাব! ঐ পটলিকে যদি একটা আঁশ ঠেকাই তবে আমার নাম গোরাই নয়, হুঁ হুঁ।'

তার বোন মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে কি একটা মতলব ঠাওরায়। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমিও কাল থেকে দারোগা সায়েবের খুকির গাড়ি ঠেলব — হুঁ হুঁ! আমায় সায়েব তিন ট্যাকা করে মাইনে দেবে বলেছে! দুআনা লয় — তিন ট্যাকা। আমিও তখন ছোট-চা'কে দিয়ে জিলিবি আর মেঠাই আনাব!'

প্যাঁকালে স্নান সেরে তার বোনের আতুড়-ঘরে ঢুকে বললে, 'কই রে পাঁচি, তোর ছেলে দেখা!'

পাঁচি কিছু বলবার আগেই ওর মা ছুটে এসে বলল, 'হাঁরে প্যাঁকালে, শুধু হাতে দেখবি কি করে!'

প্যাঁকালে নিজের রিক্ততায় সঙ্কুচিত হয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা, কাল কিংবা আর একদিন দেখব এসে। আমার শালার মনেই ছিল না যে, শুধু হাতে দেখতে নেই।' বলেই সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে মেজো-বৌয়ের কাছে গিয়ে বসল।

মাছটা চড়িয়ে দিয়ে তখন মেজো-বৌ ভাতের ফেন গালছিল। এধার ওধার একটু চেয়ে নিয়ে সে বলল, 'সেজো-বৌ কিন্তু বাঁচবে না ছোট-মিঁয়ে!' বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগল, 'ওরা মায়েপোয়েই যাবে এবার। আজ সারাদিন যা করেছে ছেলেটা! মায়ের বুকে এক ফোঁটা দুধ নাই, আজ এই সব হেঙ্গামে আবার ছাগলটাও ছেড়ে ফেলেছিলাম। ঐ ছাগলের দুধই তো বাছার জান! একটুকু দুধের জন্য ছেলেটা যেন ডেঙ্গার মাছের মতন তড়ুপেছে! তবু ভাগ্যিস, দারোগা সায়েবের বিবি একটুকু দুধ দিয়েছিল। তারই একটুকু রেখেছিলাম, কিন্তু ছেলে তার দু-চামচের বেশি খেলো না। কেঁদে কেঁদে এই একটু ঘুমিয়েছে।' বলেই ভাতের হাঁড়িতে ঝাঁকানি দিয়ে ভাতগুলো উল্টে নিয়ে মুখের সরাটা একটু ফাঁক করে পাশে রেখে দিল।

প্যাঁকালে কিছু না বলে আস্তে আস্তে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ছয়

হঠাৎ সেদিন সেজো-বৌয়ের অবস্থা একেবারে যায়-যায় হয়ে উঠল। 'ছিটেন' পাড়ার নকড়ি ডাক্তার তাঁর বৈঠকখানাটা বিনি পয়সায় চুনকাম করে দেবার চুক্তিতে দেখতে এলেন। বললেন, 'গরিব লোক তোরা, বিজিট আমি নেব না বাপু — আমার বৈঠকখানাটায় একটু গোলা দিয়ে দিবি, তা দিনতিনেক খাটলেই চলে যাবে, কি বলিস?'

প্যাঁকালে চোখের জল মুছে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে ডাক্তার বাবুর দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

নকড়ি ডাক্তার নাড়ি দেখে বললেন, 'অবস্থা বড় ভাল ঠেকছে না রে, হার্টফেল করার বড্ডো ভয়।'

মেজো-বৌ ইশারায় প্যাঁকালেকে ডেকে ফিস ফিস করে বলল, 'আচ্ছা বেঁহুশ ডাক্তার তো, রোগীর কাছে তার অবস্থা এমনি করে বলে নাকি?'

নকড়ি ডাক্তার বোধহয় ততক্ষণে মেজো-বৌয়ের ইশারার মানে বুঝে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে প্যাঁকালেকে ডেকে বলল, 'ওরে, তোদের বাড়ি মুরগির বাচ্চা আছে তো? একটু ঝোল করে খাওয়া দেখি। এখখুনি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। ভাবিসনে কিছু, ও ভাল হয়ে যাবে 'খন'। বলেই হাই তুলে দুটো তুড়ি মেরে মেজো-বৌয়ের মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন গিলে খাবে! মেজো-বৌ একটু হেসে হেঁসেল ঘরে সরে গেল। বড়-বৌ বলে উঠল, 'কি লা হাসছিস যে বড়!'

মেজো-বৌ ডাক্তার শুনতে পায় এমনি জোরেই বলে উঠল, 'আখার বাসি ছাইগুলোর কিনারা হলো দেখে।' বলেই একটু হেসে আবার বলে উঠল, 'যেমন উনুন-মুখো দেবতা, তেমনি ছাই-পাশ নৈবেদ্যি।'

ডাক্তার ততক্ষণে উঠে পড়েছে। তখন রোগীর চেয়ে তার নিজের নাড়িই বেশি চঞ্চল। ...

মেজো-বৌয়ের রূপ পাড়ার নিত্যকার আলোচনার বস্তু। দুঃখের আগুনে পুড়েও ও সোনা যেন এতটুকু মলিন হয়নি। বর্ষা-ধোয়া চাঁদনির মতো আজও ঠিকরে পড়ছে রূপ। পাড়ার মেয়েরা বলে, 'মাগি রাড় হয়ে যেন ষাঁড় হচ্ছে দিনকে-দিন।'

ওর সবচেয়ে বদ-অভ্যাস, কারণ-অকারণে ও হাসে। অপরূপ সে হাসি। — যেন ফুটে-ওঠা ফুল, হঠাৎ চন্দ্রোদয়।

ডাক্তার মেজো-বৌয়ের শূন্য নিটোল হাত দুটি, এক জোড়া সাদা পায়রার মতো পা আর ঘোমটার অবকাশে সোনার বলয়ের মতো ঠোঁটসহ আধখানি চিবুক ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি। কিন্তু এতেই তার নাড়ি একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বরের রোগীর মতোই দ্রুত চলছিল।

দোরের কাছে হঠাৎ একটু থেমে ডাক্তার বলল, 'হ্যাঁরে মুরগির ডিম আছে তোদের বাড়ি? একটু ওষুধের জন্য বড্ডো দরকার ছিল আমার।'

ডাক্তার বাবু চেয়েছেন, এতেই যেন প্যাঁকালে বাধিত হয়ে গেল। সে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'এজ্ঞে, তা আছে বৈ-কি — এই এনে দিচ্ছি।' বলেই সে ঘরে ঢুকতেই মেজো-বৌ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলল, 'আণ্ডা-টাণ্ডা পাবে না ছোট-মিঁয়ে! বলে দাও গিয়ে, বাড়িতে আণ্ডা নেই। আ মলো মিনসে যেন কি-বলে — না-তাই। ও আণ্ডা কটা বিক্রি করে একবেলার দুমুঠো ভাত উঠবে বাছাদের মুখে।'

প্যাঁকালে ততক্ষণে গোটা আটেক ডিম নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। ডাক্তার স্টেথিসকোপটা তার ঝোলা-পকেট থেকে বের করে দিব্যি খুশি হয়ে ডিমগুলি পকেটস্থ করলেন।

মেজো-বৌ একটু চেঁচিয়েই বলল, 'ডাক্তারের গলায় ওটা কি ঝুলছে ছোট মিঁয়ে? মিনসে কি গলায় দড়ি দিলে?'

প্যাঁকালে এবার একটু রেগেই বলে উঠল, 'তুমি থাম মেজো-ভাবী, সব সময় ইয়ে ভাল লাগে না, হেঁ।'

মেজো-বৌ সে-কথায় কান না দিয়ে গুন্ গুন্ করে গান ধরে —

'কত আশা করে সাগর সেঁচিলাম
মানিক পাবার আশে,
শেষে সাগর শুকাল মানিক লুকাল
অভাগিনীর কপাল-দোষে।'

গান তো নয় — যেন বুক-ফাটা কান্না!

বড়-বৌ তন্ময় হয়ে শোনে আর বলে, 'সত্যি মেজো-বৌ, বড় ঘরে জন্মালে তুই জজ সাহেবের বিবি হতিস।' বলেই খুব বড় করে নিশ্বাস ফেলে।

মেজো-বৌ সে-কথায় কান না দিয়ে উনুন নিকুতে নিকুতে আপন মনে গেয়ে চলে। যেন তার শ্রোতা এ-জগতে কেউ নয়।

'নিঠুর কালার নাম করো না,
কালার নাম করিলে প্রাণ কাঁদিবে
কালায় পড়িবে মনে গো!
নিঠুর কালার নাম করো না!'

গানের সুর তার অতিরিক্ত কাঁপে — নিশীথ রাতের বাদলা-হাওয়া যেমন করে কাঁপে বেণুবনে।

বড়-বৌ সব বোঝে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে যেতে যেতে মেজো-বৌয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'আজ তুই চোখের পানিতে আখা নিকুবি নাকি?'

সেজো-বৌয়ের খোকা কেবল কাঁদে — দিবারাত্রি সে কান্নার আর বিরাম নাই। যেন পাট পচিয়ে তার ছাল-মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে — বাকি আছে শুধু হাড়-পাঁকাটি।

মেজো-বৌ এসে কোলে তুলে নেয়। বলে, 'আহা! বাছার পিঠে ঘা হয়ে গেল শুয়ে শুয়ে।' তারপর মনে মনে বলে, 'হায় আল্লাহ, এই দুধের বাচ্চা কী অপরাধ করেছিল তোমার কাছে? মারতেই যদি হয়, এমন কাঁদিয়ে না মেরে তুলে নাও বাছাকে।' তারপর বুকে জড়িয়ে চুমো খেতে থাকে।

সেজো-বৌ দেখে আর কাঁদে। বলে 'মেজোবু, তুমিই ওর মা। আমি তো চললাম, তুমিই ওকে দেখো। আর যদি ও — ও যায় — '

আর বলতে পারে না, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। পশ্চিমের দিকে মুখ করে সকল অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করে, 'আল্লা গো, অনেক অনেক দুষকুই দিলে, আর দিও না। বাছাকে যদি নিতেই হয়, আমার দুদিন পরেই নিলে।'

মেজো-বৌ খোকাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বলে, 'তুই চুপ কর সেজো! মরতে চাইলেই তোকে মরতে দেবো নাকি লা? এই বেটার রোজগার খাবি, বেটার বিয়েতে নাচবি, তারপর নাতিপুতি দেখে তোর ছুটি।' — বলেই ঘুমন্ত খোকার চোখে চুমু খেয়ে বলে, 'খোকার বিয়ে দিব কাজিবাড়িতে।'

আবার অকারণ হাসি! হাসিতে মুখ-চোখ যেন রাঙ্গা টুকটুকে হয়ে ওঠে! খোকাকে তার মায়ের পাশে শোয়াতে শোয়াতে গায় —

'যাদু আমার লাঙল চষে, দুধারে তার কাল গরু,
যাদুর বেছে বেছে বিয়ে দিব পেট মোটা মাজা সরু।'

সেজো-বৌও হাসে বালুচরে অস্ত-চাঁদের ক্ষীণ রশ্মিরেখাটুকুর মত।

সাত

দিন যায়, দিন আসে, আবার দিন যায়।

এরই মধ্যে একদিন গজালের মা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকে একেবারে মেজো-বৌয়ের পায়ের ওপর পড়ে মাথামুড় খুঁড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গালি, উপরোধ, অনুরোধ, অনুনয়, বিনয় — তার কতক বোঝা গেল, কতক গেল না।

মেজো-বৌ তাড়াতাড়ি তার শাশুড়ির মাথাটা জোর করে পায়ের ওপর হতে সরিয়ে দুহাত পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। সে এর কারণও বুঝেছিল। তবু কটু কণ্ঠেই বলে উঠল, 'একি মা, তুমি আমার পা ছুঁয়ে আমায় 'গুনায়' (পাপে) ফেলতে চাও নাকি? কেন, কি করেছি আমি?'

তার শাশুড়ি কান্না-বিদীর্ণ-কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'তা বলবি বৈ কি লা, আমার জোয়ান-পুত-খাগি। আমার বেটার মাথা খেয়ে এখন চললি নিকে করতে! — ভাল হবে না লো, ভাল হবে না। এই আমি বলে রাখছি, বিয়ের রাতেই জাত-সাপে খাবে তোদের দুই জনকেই।' —আবার চিৎকার!

তখন ভর-দুপুর! প্যাঁকালে কাজে চলে গেছে। ছেলেমেয়েরা বেরিয়েছে — কেউ কাঠ কুড়োতে, কেউ বা গোবর কুড়োতে।

সেজো-বৌ শুয়ে শুয়ে ধুঁকছে। তার পাশে খোকা, যেন গোরস্থানের নিবু-নিবু মৃৎ-প্রদীপের শেষ রশ্মিটুকু। শুধু একটু ফুঁয়ের অপেক্ষায় আছে।

বড়-বৌ উঠোন নিকোনো ফেলে স্তম্ভিত হয়ে দেখছিল, শুনছিল সব। এইবার সে ভয় ও বিষাদ-জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, 'সত্যি নাকি মেজো-বৌ?'

মেজো-বৌ আস্তে বলল, 'সত্যি নয়।'

এই দুটি কথার আশ্বাসেই শাশুড়ি যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। সে হঠাৎ কান্না থামিয়ে মেজো-বৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, 'সত্যি বলছিস মা আমার? সত্যি তুই নিকে করবিনে? তবে যে ভোলাদের ঘরে শুনে এলাম, তোকে নিকে করতে তোর বোনাই কলকেতা থেকে এয়েছে? তাই তো বলি, ঐ বুড়ো মিনসে — থাক না ওর টাকা — ওকে কি তুই নিকে করতে পরিস? তাছাড়া মা, তোর এই ছেলেমেয়ে দুটোর মায়াই বা কাটাবি কি করে বল তো? নিকে করলে ছেলেমেয়ে দুটোকে ছেড়ে দিচ্ছিনে।'

মেজো-বৌ বড় বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে অন্য কাজে গেল।

বড়-বৌ মেজো-বৌকে ভাল করেই জানত। সে জানে, মেজো-বৌ মিথ্যা বলে না এবং যা বলে, তা চিরকালের জন্যই সত্য হয়ে যায়। সে মেজো-বৌর হাসির মানে বুঝে উঠোন নিকোতে চলে গেল। যেতে যেতে সেও একটু হেসে বলে গেল, 'পাড়ার গতর-খাগীদের যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তোমারও মা তেমনি যত সব কি-বলে-না-ইয়ে —'

শাশুড়ি একটু লজ্জিত হয়েও চোখ মুছে বড়-বৌ যেখানে উঠান নিকুচ্ছিল, সেখানে এসে চুপ করে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ লা বড়-বৌ, সত্যিই ছুঁড়ি নিকে করবে না তো? ছুঁড়ির যা রূপ ঠিকরে পড়ছে এখনো, তার ওপর পাড়ার মাগনেড়ে হতচ্ছাড়ারা দিনরাত আছে ছুঁড়ির পানে হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে। আ

মলো যা! ড্যাকরারা যেন হুলো বেড়াল! ইচ্ছে করে, দিই চোখে 'লগা' ঠেলে। আর ঐ বুড়ো মিনসে — ওর বোনের সোয়ামী — মিনসে যে ওর সানি-বাপ! মিন্‌সের লজ্জা করল না কলকেতা থেকে কেষ্টনগর ছুটে আসতে ঐ মেয়ের বয়েসী বৌটাকে নিকে করতে! — ঝ্যাঁটা মার! ঝ্যাঁটা মার!'

আরো কত কি বকে যায় আপন মনে।

বড়-বৌ আজ থাকতে না পেরে একটু রেগেই বলে উঠল, 'আচ্ছা মা, তোমার কি কিছুই আক্কেল হুঁশ নেই? 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।' যা নয় তাই। মেজো-বৌকে যদি তুমি চিনতে, তাহলে এ-কথা বলতে না।' বলেই জোরে জোরে উঠান নিকোয়।

শাশুড়ি বড়-বৌয়ের রাগ বুঝতে পারে। অন্যদিন বৌ এই রকম করে কথা বললে সে হয়তো লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে তুলত। কিন্তু আজ সে সব সয়ে যেতে লাগল। তার বৌ পর হয়ে যাবে না, এই খুশি আজ যেন তার ধরছিল না। তাই আজ বৌ-এর বকুনিও অদ্ভুত মিষ্টি শোনাতে লাগল তার কানে।

কিন্তু আজ অনেক কিছু শুনেও যে এসেছে সে পাড়াতে — তা সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, পরিপূর্ণ সোয়াস্তি সে পাচ্ছিল না। এও জানতো সে যে, মেজো-বৌকে এর বেশি জিজ্ঞেস করতে গেলে সে হয়তো এখখুনি বাপের বাড়ি চলে যাবে। রায়-বাঘিনী শাশুড়ি সে, বৌদেরে কথায় কথায় 'নাকের জলে চোখের জলে' করে। কিন্তু মেজো-বৌকে কেন যে তার এত ভয়, কেন যে ওকে আর বৌদের মতো করে গাল-মন্দ দিতে পারে না, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

মেজো-বৌর দু-দুটো ছেলেমেয়ে হলেও তার শরীরের বাঁধুনি দেখে আজও আইবুড়ো মেয়ে বলেই ভ্রম হয়। বিধবা সে, তবু পান ত খায়ই, দু-একদিন চুড়িও পরে — রঙিন রেশমি চুড়ি আবার তার পরের দিনই ভেঙে দেয়। কাপড়টাও তার পরবার ঢং একটু খেরেস্তানি ধরনের। সিঁথিটা সে সোজাই কাটে হয়তো; মেয়েরা কিন্তু বলে, ও বাঁকা সিঁথি কাটে। খোঁপায় তার মাঝে মাঝে গাঁদা ও দোপাটি ফুলের গুচ্ছ দেখা যায়। হাসি তো লেগেই আছে ঠোঁটে, তার ওপর দিনরাত গুন গুন করে গান।

তবু পাড়ার কেউ ওর বদনাম দিতে সাহস করেনি আজও। ও যেন পাড়ার ছেলেমেয়ে সব্বারই আদরের দুলালী মেয়ে।

শাশুড়ি যখন-তখন যার-তার কাছে বলে, 'মা গো, আমি যেন আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে আছি!'

মেজো-বৌ সত্যিই যেন আগুনের খাপরা। রূপ ওর আগুনের শিখার মতোই লকলক করে! কিন্তু ধরতে গেলে হাতও পোড়ে। ঐ হাত পোড়ার ভয়েই হয়তো পাড়ার মুখপোড়ারা ওদিকে হাত বাড়াতে সাহস করে না।

ও যেন বসরা-গোলাবের লতা। শাখা-ভরা ফুল, পাতা-ভরা কাঁটা।

ও যেন বোবা টাকা। শুধু রূপো, খাদ নেই। বাজাতে গেলে বাজে না। লোকে জানে, ও টাকা দিয়ে সংসার চলে না। খুব জোর, গলায় তাবিজ করে রাখা যায়!...

কিন্তু এ নেকার জনরবটা নিছক মিথ্যা নয়।

মেজো-বৌয়ের বোনের সোয়ামি সত্যি বড় লোক — কলকাতার চামড়াওয়ালা। আগে তার নাম ছিল ঘাসু মিঞা, এখন সে ঘিয়াসুদ্দীন আহমদ। পূর্বে সে ঘোড়ার গাড়ি চালাত, এখন ঘোড়ার গাড়িই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

'ঘিয়াসুদ্দীন' নামে প্রমোশন পেয়ে যাওয়ার পর থেকে সে আর শ্বশুরবাড়ি মাড়ায়নি। স্ত্রী তার চির-রোগী। কাজেই বিয়ে তাকে আরো দুটো করতে হয়েছে। সে বলে, এক বিয়েতে ইজ্জত থাকে না লোকের কাছে। তার শালী — অর্থাৎ মেজো-বৌকে সে আগেই দেখেছিল। কাজেই মেজ-বৌ বিধবা হবার পর থেকেই তার শ্বশুর বাড়ির দিকে টানটা আবার নতুন করে আরম্ভ হয়েছে।

বড়লোক জামাইকে দেখে শ্বশুর-শাশুড়ি খুশির চেয়ে সন্ত্রস্তই হয়ে ওঠে বেশি। নিজেদের দারিদ্র্যের লজ্জায় সর্বদা যেন এতটুকু হয়ে যায় জামাইয়ের কাছে। অবশ্য বাইরে এ নিয়ে বারফট্টাই করতেও ছাড়ে না।

মেজো-বৌয়ের বাপের বাড়ি শ্বশুর-বাড়ির একটু দূরেই কুড়চিপোতায়। কাজেই সে যখন ইচ্ছা বাপের বাড়ি চলে যায়। শাশুড়ি এতে মনক্ষুণ্ন হলেও জোর করে কিছু বলতে পারে না। ওর সর্বদা ভয়, বেশি টান দিলেই বুঝি এই ক্ষীণ সুতোটুকু ছিঁড়ে যাবে!

শাশুড়ি-মেজো-বৌয়ে যেন ঘুড়ি খেলা চলেছে। মেজো-বৌ খেলে বেড়ায় মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে। শাশুড়ি মনে করে, হাতের বন্ধন এড়িয়ে ও চলে যেতে চায় সুতো ছিঁড়ে। তাই বাতাস যত জোর বয়, ও ততো সুতো চেপে না ধরে সুতো ছেড়েই দিতে থাকে। কিন্তু ও সুতোরও শেষ আছে! তাছাড়া ঐ পচা সুতোর জোরই বা কতটুকু — তাও তো অজানা নেই ওর। তাই তার অসোয়াস্তির আর অন্ত নেই।

অন্য বউদের নিয়ে সে ভয় নেই বলেই সে ওদের ওপর অত নির্মম হতে পারে।

রূপের একটা মোহ আছে। ওতে যে শুধু পুরুষই মুগ্ধ হয় তা নয়, দজ্জাল মেয়েও রূপের আঁচে না গলুক, নরম হয়ে পড়ে অনেকটা।

বাড়ির পশুপক্ষীগুলো পর্যন্ত যেন ওর আকর্ষণ অনুভব করে। ওদের একটা গাই ছিল, দুঃখে পড়ে তাকে বিক্রি করে দিতে হয়েছে, — সে মেজো-বৌ ছাড়া আর কারুর হাতে সহজে খেতে চাইত না।

গরুরও বোধশক্তি আছে কি না জানি না, কিন্তু যেদিন ধলী গাইটাকে কিনে নিয়ে গেল ও পাড়ার রেমো, সেদিন মেজো-বৌ আর ধলী দুজনার চোখে জল দেখা গেছিল। আজও প্রায়ই পালিয়ে আসে গাইটা। সারা রাস্তাটা যে রকম ছুটতে ছুটতে আর ডাকতে ডাকতে আসে সে, তা দেখে ও-বাড়ির সবারই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে! এসেই মেজো-বৌকে দেখে সে কি আকুলি-বিকুলি ঐ অবলা পশুর! গা-হাত চেটে চারপাশে ঘুরে তার যেন আর সাধ মেটে না।

বড়-বৌ বলে, 'মেজো-বৌ, তুই যাদু জানিস।'

যেদিন ঘিয়াসুদ্দীন কুড়চিপোতা আসত, সেই দিনই মেজো-বৌকে নিয়ে যাবার জন্য তার মা ধন্না দিয়ে বসত এসে। বেয়ানে-বেয়ানে খুব একচোট ঝগড়া হয়ে যেত। মায়ের কান্নায় মেজো-বৌ না গিয়ে পারত না। এই নিয়ে আসার উদ্দেশ্যও সে বুঝত। কিন্তু ওর ঐ রহস্যভরা স্বভাবটুকুর জন্যই সে হয়তো বা ইচ্ছা করেই যেত।

বড়-বৌ হেসে বলতো, 'আবার আসবি তো মেজো? মেজো-বৌ হেসে বলত, 'জোড়ে ফিরব বুবু।'

আট

সেদিন ঘিয়াসুদ্দিন শ্বশুর-বাড়ি এসেছে। মেজো-বৌও বোনাইকে দেখতে এসেছে। ও-ই এসেছে কিংবা বোনাই-ই আনিয়েছে — এই দুটোর একটা-কিছু হবে।

আগুন আর সাপ নিয়ে খেলা করতেই যেন ওর সাধ। ঘিয়াসুদ্দিন ওকে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলেই এত ঘন ঘন আসে। মেজো-বৌও তা বোঝে, তাই তাকে ঘন ঘন আসায় অর্থাৎ আসতে বাধ্য করে।

সে বলে, 'দুলা ভাই, তুমি তোমার গাড়িতে চড়ালে না আমায়?'

ঘিয়াসুদ্দিন যেন হাতে চাঁদ পেয়ে বলে, 'এ নসিবে কি তা আর হবে বিবি? আমার গাড়ি তো তৈরিই, তুমি চড়লে না বলে তো তা রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইল!'

মেজো-বৌ মুচকি হাসে। হাতি তো নয়, যেন দুফলা চাকু। বুকে আর চোখে দুই জায়গায় গিয়ে বেঁধে। বলে, 'অর্থাৎ আমি গাড়িতে উঠলেই গাড়ি তুলবে আস্তাবলে! বুবুকে যেমন তুলেছ!'

ঘিয়াসুদ্দিন হঠাৎ থ বনে যায়। বে-বাগ ঘোড়া হঠাৎ মুখের উপর চাবুক খেয়ে যেমন থতমত খেয়ে যায় তেমনি!

একটু সামলে নিয়ে বলে, 'আরে তৌবা, তৌবা! ও কি বদরসিকের মতো কথা বল ভাই! আস্তাবলে কেন, গাড়িশুদ্ধ মাথার ওপরে তুলব তোমায়। তোমার বুবু তো বুকে আছেনই।'

মেজো-বৌ বোনাইয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে 'আমায় রাখবে একেবারে মাথায়! এই তো? কিন্তু দুলাভাই, তোমাদের মাথা কি সব সময় ঠিক থাকে যে, ওখানে চিরদিন থাকব? আরো দু'জনকে তো মাথায় তুলে শেষে পায়ের তলায় নামিয়ে রেখেছ!'

ঘিয়াসুদ্দিনও হটবার পাত্র নয়। সে মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু ভাই, ওরা হলো নুনের বস্তা, বেশিদিন কি মাথায় রাখা যায়? তুমি হলে মাথার তাজ, তোমাকে কি তাই বলে মাথা থেকে নামানো যাবে?'

মেজো-বৌ একটু তেড়ছা হাসি হেসে কণ্ঠস্বরে মধু-বিষ দু-ই মিশিয়ে বলে উঠল, 'জ্বি হ্যাঁ, যা বলেছেন! কিন্তু ও পাকা চুলে আর তাজ মানাবে না দুলাভাই! রঙ সাদা নয়ানসুকের কিসতি-নামা টুপি পর, খাসা মানাবে!' বলেই হি হি করে হাসে।

ঘিয়াসুদ্দিন ঘেমে উঠতে থাকে। কিসের যেন অসহ্য উত্তাপ অনুভব করে সারা দেহ-মনে।

মেজো-বৌ তখনো বাণ ছুঁড়তে থাকে। শিকারী যেমন করে আহত শিকার না মরা পর্যন্ত বাণ ছুঁড়তে বিরত হয় না।

সে বলে, 'পুরুষগুলো যেন আমাদের হাতের গালার চুড়ি। ভাঙতেও যতক্ষণ, গড়তেও ততক্ষণ!'

ঘিয়াসুদ্দিন কি বলতে কী বলে ফেলে। খেই হারিয়ে যায় কথার। বলে, 'আচ্ছা ভাই, তুমি মাথায় না-ই চড়লে, পিঠে চড়তে রাজি ত?'

মেজো-বৌ এইবার হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলে, 'হাঁ, তাতে রাজি আছি। যদি চাবুক পাই হাতে!' বলেই বলে, 'সেদিন বাবুদের বাড়িতে কলের গানে একটা গান শুনেছিলাম দুলাভাই', বলেই সুর করে গায় —

'আমার বুকে পিঠে সেঁটে ধরেছে রে!'

তারপর গান থামিয়ে বলে, 'বুবু আছেন বুকে, এরপর আমি চড়ব পিঠে, তাহলে তোমার অবস্থা ঐ সেঁটে ধরার মতোই হবে যে! তাছাড়া, জান তো, একজন বুকে বসে থাকলে আর একজন পিঠে চড়তে পারে না!'

গান শুনে মেজো-বৌয়ের বড় ভাবী এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে এইবার বলে উঠল, 'কি লো, বোনাই-এর সাথে যে হাবুডুবু খাচ্ছিস রসে?'

ঘিয়াসুদ্দিন এতক্ষণে যেন কুলের দেখা পেলি বড় শালাজকে পেয়ে। এইবার সে অনেক সপ্রতিভ হয়ে বলল, 'বাবা, নদের মেয়ে ডাকসাইটে মেয়ে, এদেশে রসিকতা করে পার পাবার যো আছে? ভাগ্যিস এসে পড়েছ ভাবী, নইলে, এখুনি ডুবে মরেছিলাম আর কি!'

মেজো-বৌ তার ভাবীর দিকে একটু চেয়ে নিয়ে বলল, 'কোথায় ডুবেছিলে, খানায় না সার-কুঁড়ে? — কিন্তু অত ভরসা করো না দুলাভাই, ও কলার ভেলা! ডুবোতে বেশি দেরি লাগবে না।'

ঘিয়াসুদ্দিন হতাশ হয়ে তক্তাপোশে চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, 'না ভাবী, কোনো আশা নেই!'

ভাবী হাসতে হাসতে বলে চলে গেল, 'অত অল্পে হতাশ হতে নেই ভাই পুরুষ মানুষের। যেখানে শক্ত মাটি, সেখানে একটু বেশি না খুঁড়লে পানি পাওয়া যায় না।'

মেজো-বৌ কিছু না বলে তামাক সেজে ঘিয়াসুদ্দিনের হাতে হুঁকো দিয়ে বলল, 'এইবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দাও দেখি একটুকু, সব পরিষ্কার দেখতে পাবে।'

গিয়াসুদ্দিন হুঁকোটা হাতে নিয়ে একবার করুণ নয়নে মেজো-বৌয়ের পানে চেয়ে বলল 'যথেষ্ট পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি ভাই। ধোঁওয়া হয়ে রইলে কিন্তু তুমিই।'

বলেই জোর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হুঁকোয় মন দিলে।

মেজো-বৌ কৌতুক-ভরা চোখে একবার বোনাই-এর পানে চেয়ে উঠবার উপক্রম করতেই ঘিয়াসুদ্দিন হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, 'একটু দাঁড়াও ভাই, একটা কাজ আছে।' বলেই তার হাতের কাছের বাকসটা হতে একখানি সুন্দর ঢাকাই শাড়ি বের করে বলল, 'এইটে তোমায় নিতে হবে ভাই!'

মেজো-বৌ শাড়িটার দিকে কটাক্ষে চেয়ে হেসে বলল, 'আগে থেকেই কাপড়ের পর্দা ফেলে দিলে বুঝি? কিন্তু এ যে ঢাকাই কাপড় দুলাভাই, বড্ডো পাতলা। আমি যে বিধবা, সে গা তো এ পাতলা কাপড়ে ঢাকা পড়বে না।'

বলেই মুখ ফিরিয়ে চোখের জল মুছে চলে গেল। ঘিয়াসুদ্দিনের হাতের কাপড় হাতেই রয়ে গেল।

একটু পরেই মেজো-বৌ হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বলল, 'ওকি দুলাভাই, তুমি এখনও কাপড় হাতে করে বসে আছ? দাও দাও, মন খারাপ করতে হবে না।' বলেই কাপড়খানি হাতে নিয়ে গুন গুন করে গান করতে করতে বেরিয়ে গেল, — 'তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে, আমায় ধরতে পারলি না!'

একটু পরেই উঠানে মেজো-বৌয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'না ভাবী, আজ আসি! শাশুড়ি বোধহয় এতক্ষণ তাঁর মরা ছেলেকে নালিশ করছেন আমার নামে? ও কাপড়টা তোমায় দিলাম। এ পোড়া গায়ে কি অত রঙ চড়াতে আছে? চটে যাবে। — বিনি রঙেই কত বুড়োর চোখ গেল ঝলসে, রঙ চড়ালে না জানি কি হবে!' বলেই বোনাই-এর পানে তাকায়। তারপর ছেলে-মেয়ে দুটির হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

সারা পথ তার পায়ের তলায় কাঁদতে থাকে!

নয়

সেদিন বড়-বৌ, প্যাঁকালে, তার মা আর পাঁচিতে মিলে একটা গোপন পরামর্শসভা বসেছিল।

প্যাঁকালে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি তা কখনো পারব না। আমি কালই চললাম রানাঘাট। সেখানে রোজ চোদ্দ আনা করে পয়সা পাব।'

তার মা অনুনয়ের স্বরে বলল, 'রাগ করিস কেন বাবা? এমন তো সব গরিব ঘরেই হচ্ছে আমাদের। তাছাড়া ওর চাঁদপনা মুখ যে কিছুতেই ভুলতে পারিনে। অমন বউ পর হয়ে যাবে! আমার কপালই যদি না পুড়বে তাহলে সোভানই বা মরবে কেন, আর তোকেই বা এ উপরোধ করতে যাব কেন?'

পাঁচি মায়ের কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল, 'তা ভাই, তোমার এক আশ্চয্যি লজ্জা! অমন তো কতই হচ্ছে! একদিন ভাবী বলেছ বলে বুঝি আর ইয়ে করতে নেই! দুদিন বাধবে, তারপর আপনি সরগড় হয়ে যাবে, দেখে নিও।'

প্যাঁকালে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'তুই থাম পাঁচি। যা লয় তাই! তুই তবে কেনে নিকে করলিনে তোর ভাসুরকে?'

পাঁচি ছেলের মা হলেও তার ছেলেমানুষি করার বয়স আজো যায়নি। তার ভাসুরকে নিকে করার ইঙ্গিত শুনে সে একেবারে তেলে-বেগুনে হয়ে বলে উঠল, 'তা ইখেনে নিকে করবে কেনে, কুর্শিকে যে বিয়ে করবে খেরেস্তান হয়ে!'

প্যাঁকালে রেগে উঠে যেতে যেতে বলল, 'রইল তোর নিকে, আমি চললুম!' বলেই বেরিয়ে গেল!

বড়-বৌ বলল, 'তখনি বলেছিলাম মা, যে, এ হয় না। তাছাড়া, তোমার ছেলে রাজি হলেও সে যা মেয়ে — সে কিছুতেই রাজি হত না।'

শাশুড়ি মস্ত বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কপাল মা, কপাল! কি করবি বল! ঐ বুড়ো মিনসেই ছিল ছুঁড়ির কপালে!' বলেই তার সোভানকে উদ্দেশ করে কান্না জুড়ে দিল।

বড়-বৌ একটু রেগেই বলল, 'তোমারি মা বাড়াবাড়ি! জান যে মেজো-বৌ ও নিকেতে রাজি নয়, তবু ঐ নিয়ে দিনরাত কান্নাকাটি। তুমিই তাড়াবে এমনি করে মেজো-বৌকে।'

এমন সময় মেজো-বৌ তার বাপের বাড়ি থেকে এসে পৌঁছল। বড়-বৌ হেসে বলল, 'কি লো, জোড়ে ফিরলি, না বিজোড়ে?'

মেজো-বৌ বড়-বৌয়ের রহস্যের উত্তর না দিয়ে তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'তা তোমরা যে-রকম করে তুলছ অবস্থা, তাতে জোড়াই খুঁজে নিতে হবে দেখছি আমায়।'

বলেই শাশুড়ির দিকে চেয়ে বলল, 'মাগো মা! পাড়ায় টি-টিক্কার পড়ে গেল এই নিয়ে! কেলেঙ্কারির আর বাকি রইল না! আচ্ছা মা, এমনি করে তুমি আমায় দেশ-ছাড়া করতে চাও নাকি? তুমি জান, আমার বোন বেঁচে রয়েছে আজো। এক বোন বেঁচে থাকতে আর এক বোনকে নিকে করা যায় কি-না, যাও মৌলবি সায়েবকে জিজ্ঞেস করে এসো?' বলেই দাওয়ায় বসে পড়ে পা দুলোতে লাগল। ছোট মেয়ে রাগলে যেমন করে।

বড়-বৌ খুশি হয়ে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছিস মেজো-বৌ। দেখ ও কথাটা আমাদের কারুর মনেই ছিল না যে, এক বোন থাকতে আর এক বোনকে নিকে করা যায় না। সত্যিই মেজো-বৌ, তোর না-জানা কিছু নেই দেখছি। আমাদের হাফেজ সায়েব হার মেনে যায় তোর কাছে।' বলেই মেজো-বৌ কোন দিন কোন বিষয়ে কি ফতোয়া দিয়েছিল, তারই সালঙ্কার বর্ণনা শুরু করে দিল।

তার শাশুড়ির কিন্তু সন্দেহ আর ঘোচে না। সে কান্না থামিয়ে বলে উঠল, 'তুই থাম বড়-বৌ, অমন অনেক দেখেছি। কত জনা আমাদের চোখের সামনে এক বোনকে তালাক দিয়ে আর এক বোনকে নিকে করল। ও মুখপোড়া মিনসের মেজো-বৌয়ের বড় বোনকে তালাক দিতে কতক্ষণ?' বলেই কান্নার জের চালায়।

মেজো-বৌয়ের খোকাটি রোজকার মতো কান্না থামাতে যায়, 'দাদী গো, ছেপ কর।' মেজো-বৌ ছেলেকে হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়। বলে, 'তোর বাবা-কেলে দাদী! পোড়ারমুখো! সব তাতেই ফফর-দালি!'

খোকা ছেলেবেলা থেকেই দাদী-ন্যাওটা! যত মার খায়, তত বলে, 'ও দাদী গো, আমায় মেলে ফেললে।'

বৃদ্ধা বৌ-এর কাছ থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে মেজো-বৌয়ের বাপ-মাকে গাল দিতে থাকে! তারপর আঁচল দিয়ে খোকার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, 'দেখ বড়-বৌ, সোভান ঠিক এমনটি দেখতে ছিল, ছেলেবেলায় ঠিক এমনি করে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতো! ঠিক তেমনি আওয়াজ।'

বড়-বৌ বলে, 'ওর কপালের ঐখেনটা কিন্তু ওর বড় চাচার মতো লয় মেজো-বৌ?'

মেজো-বৌ কথা কয় না। দাওয়ায় বসে আনমনে পা দোলায় আর চাপাসুরে গান করে।

সেজো-বৌ পাশ ফিরে কাশতে থাকে। মনে হয়, ওর প্রাণ গলায় ঠেকেছে এসে। কবর দেবার জন্য বাঁশ কাটার শব্দটা যেমন ভীষণ করুণ শোনায়, তেমনি তার কাশির শব্দ।

তার পাশে শিশু আর কাঁদতে পারে না, কেবল ধুঁকতে থাকে; যেন মৃত্যুর পাখার শব্দ।

এরি মধ্যে হঠাৎ একদিন একপাল ছেলেমেয়ে চিৎকার করতে করতে ঘরে এসে বলল, 'ওগো, তোমাদের বাড়িতে পাদরি সায়েব আর মেম আসছে!' বাড়ি শুদ্ধ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল! সত্যি-সত্যিই একজন পাদরি সায়েব, সঙ্গে একজন নার্স নিয়ে ঘরে ঢুকল এসে। বৌ-ঝিরা ঘরে ঢুকে পড়ল। শুধু প্যাঁকালের মা হতভম্বের মতো চেয়ে রইল সায়েবের মুখের দিকে।

সায়েব বাংলা ভালই বলতে পারে। বলল, 'টোমরা ভয় করবে না। হামি টোমাদিগের কষ্ট শুনিয়া আসিয়াছে। টোমাডের কে পিরিটো আছে, টাহাকে ঔষুড ডিবে!'

প্যাঁকালের মা একটু মুশকিলেই পড়ল প্রথমে। পরে আমতা আমতা করে বলল, 'খোদা তোমার ভাল করবেন সায়েব। ঐ আমার বৌ আর তার খোকা শুয়ে। দেখ, যদি ভাল করতে পার। কেনা হয়ে থাকব তাহলে?'

সায়েব খুশি হয়ে বলল, 'কোনো চিনটা নাই। যিশু বালো করিয়া ডেবে। যিশুকে প্রারঠনা করো।' তারপর এগিয়ে মাটিতেই বসে পড়ে শিশুকে পরীক্ষা করতে লাগল। সায়েব একজন ভাল ডাক্তার।

নার্সকে ইংরেজিতে কী ইঙ্গিত করে সায়েব বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। মুখ তার বিষণ্ন গম্ভীর।

নার্স সেজো-বৌকে পরীক্ষা করতে লাগল। নার্সের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ বলা-কওয়া করলে কী সব। তারপর প্যাঁকালের মাকে ডেকে কতকগুলো ওষুধ দিয়ে খাওয়াবার সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে চলে গেল। বলে গেল, আবার এসে দেখে যাবে বিকেলে।

প্যাঁকালের মা খুশিতে প্রায় কেঁদে ফেলল। বলল, 'ছুড়ির কপাল ভাল মেজ-বৌ, এত ওষুধ খেয়ে ও কি আর মরে? হেদে দেখ, কতগুলোন ওষুধ দিয়েছে।'

মেজো-বৌ বলল, 'মেম সায়েব যাবার বেলায় এক টাকা দিয়ে গেছে সেজো-বৌয়ের পথ্যি কিনতে। বলছে, বেদানার রস খাওয়াতে। বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল। মেজো-বৌ কাঁদতে লাগল, 'কপালে এত দুক্ষুও লিখেছিলেন আল্লা। সেজো-বৌয়ের যাবার সময়ও ঘরের পয়সায় কিনে দুটো আঙুর কি একটা বেদানা দিতে পারলুম না! শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝ্যাঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াতকুটুমের মুখে! সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়!'

শাশুড়ি কেঁদে বলে, 'যা বলেছিস মা।'

দশ

সেদিন রবিবার। ছুটি।

প্যাঁকালে গোটা দুয়েকের সময় স্নান করতে বেরুল।

বেরুবার আগে তেলের শূন্য শিশিটা অনেকক্ষণ ধরে উল্টে রাখলে হাতের তালুর উপর। মিনিট পাঁচেকে ফোঁটা পাঁচেক তেল পড়ল। তেল ঠিক নয়, তেলের কাই। শিশিটার পিছন দিকে গোটা দু-তিন থাপপড় মেরেও যখন আর এক ফোঁটার বেশি তেল গড়ালো না, তখন তাই কোনো রকমে মুখে হাতে মাখতে মাখতে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

ঐ তেলটুকু মাথায় সে দিল না, — নিজের মাথাকে তেলামাথা মনে করেই কিনা — বিশ্ব-সংসারে তেলামাথায় তেল দেওয়ার সবচেয়ে বড় মালিক যিনি তিনিই জানেন।

গামছা তাকে বলা যায় না — একটা তেলচিটে ন্যাকড়া, তাই সে মাথায় জড়িয়ে নিলে শৌখিন বাবুদের মাথার রুমাল বাঁধার মতো করে। তাতে তার কপালের দুঃখটুকু ছাড়া মাথার বাকি সবটুকুই কোনো রকমে ঢাকা পড়ল!

এই সৌভাগ্যের জয়ধ্বজা মাথায় বেঁধে প্যাঁকালে স্নান করতে চলল ক্রিশ্চান পাড়ার ভিতর দিয়ে। মোংলা পুকুরই তার কাছে হয়, কিন্তু কেন যে সে অতটা ঘুরে গোলপুকুরে নাইতে যায়, তা আর লুকা-ছাপা নেই — ও পুকুরে নাইতে যারা যায় তাদের কাছে। প্রেমের পথ সোজা নয় বলেই হয় তো সোজা পথে যায় না।

লোকে বলে মাথার জয়ধ্বজা তার মধু ঘরামির অর্ধেক রাজত্বের ওপর দাবি বসাবার জন্য নয়, তার 'রাজকন্যা' কুর্শিকে জয় করার জন্যই। কিন্তু ঐ জয়ধ্বজার অসম্মানে সে নিজেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে — যখন কুর্শির সামনেই ঐ জয়ধ্বজা দিয়ে গা রগড়াতে হয়।

নাইতে গেলে সে কুর্শিদের ঘরের সামনে দিয়েই যায়। আজো যাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে ঘরে আগড়-দেওয়া দেখে বসে পড়ল — রাস্তায় নয় — রোতো কামারের দোকানে।

রোতো তার হাঁপর ঠেলতে ঠেলতে তাকে একবার আড় নয়নে দেখে নিল। মনে হলো, লোহা পেটার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন হাসি গোপন করছে।

প্যাঁকালে রোতোর চেয়েও বেশি ঘামতে লাগল, আগুন হতে অনেক দূরে থেকেও।

রোতো নেহাই-এর উপর একটা জ্বলন্ত লোহার ফাল রেখে প্যাঁকালের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখেছিস মাইরি, আগুন নিয়ে খেলার ঠেলা! হাতের কতটা পুড়ে গিয়েছে

দ্যাখ!' বলেই প্রাণপণে হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটায় আর হাসে। প্যাঁকালে বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

রোতো ফলাটা আবার আগুনে সেঁক দিয়ে হাঁপর ঠেলতে ঠেলতে বলে, 'মেয়েমানুষ আর আগুন — এই দু-ই সমান বুঝলি, দু'টাতেই হাত পোড়ে।'

এতক্ষণ কুর্শি কোথায় দাঁড়িয়েছিল, সে-ই জানে; হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মুখও পোড়ে রে মুখপোড়া।'

প্যাঁকালে তাড়াতাড়ি উঠে পুকুরের দিকে চলে গেল। তখনও রোতোর স্বর শোনা যাচ্ছিল, 'উ — ই প্যাঁকালে রে! তুই একটু আমার হাঁপরটা ঠেল ভাই, আমি একটু জলে ডুবে ঠাণ্ডা হয়ে আসি!'

কুর্শি কতকগুলো সাজি-মাটি-সেদ্ধ কাপড়ের বোঝা নিয়ে পুকুরের দিকে যেতে যেতে একবার টেরা চাউনি দিয়ে অভ্যর্থনা করে গেল রোতোকে। যাবার সময় বলেও গেল, 'যাসনে মিনসে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাবি। জলে ডুবলে আর উঠতে হবে না।'

রোতো হয়তো তখন মনে করে বলছিল, এ আগুনের তাতে মরার চেয়েও শীতল জলে ডুবে মরা ঢের আরাম।

রোতোর কিন্তু হাতই পুড়েছে, কপাল পোড়েনি। কুর্শি তাকে দেখতে না পারলেও ঘেন্না করে না।

গোলপুকুরে অন্য যারা চান করে, তাদের কেউই এ অসময়ে — বেলা দুটোয় চান করতে আসে না। কাজেই এই সময়টাই তাদের পক্ষে প্রশস্ত, যারা শুধু গা ধুতেই আসে না, প্রাণ জুড়াতেও আসে।

কুর্শি এসে দেখে, প্যাঁকালে তখন ঘাটের বটগাছটার শিকড়ের উপর বসে সিগারেট টানছে। প্যাঁকালে মাঝে মাঝে থিয়েটারের ইয়ার বাবুদের কাছে দু-একটা সিগারেট চেয়ে রাখে এবং সেটা কুর্শির কাছ ছাড়া আর কারুর কাছেই খায় না। আজও স্নান করতে আসার সময় কালকের চাওয়া সিগারেটটা কোঁচড়ে গুঁজে আনতে ভোলেনি।

কুর্শি প্যাঁকালের দিকে না চেয়েই ঘাটে ধপাস করে কাপড়ের রাশ আর পিঁড়িটা ফেলে বেশ করে কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে নিলে। তারপর কারুর দিকে না চেয়ে জোরে জোরেই বলতে লাগল, 'ঘাটের মড়া! রোজ রোজ আমার পেছনে লাগবে! দেবো একদিন মুখে বাসি চুলোর ছাই ঢেলে, তখন বুঝবে মজাটা!'

প্যাঁকালে আর চুপ করে থাকতে পারল না। এ উত্তরে হাওয়া তার দিকে না রোতোর দিকে বইছে, তাও সে বুঝতে পারল না। সে ফস করে নেমে এসে পাশের ঘাটের পচা খেজুর গুঁড়িটাতে বসে একটা খোলামকুঁচি নিয়ে পায়ের মরা মাস ঘষতে

ঘষতে বলল, 'তুই আজ রাগ করেছিস না কি কুর্শি? দেখছিসই তো শালারা কি রকমে চোখ লাগাতে শুরু করেছে!'

কুর্শি একটা কাপড় একটু ভিজিয়ে কাচবার জন্য দাঁড়িয়ে বলে, 'বয়ে গেছে আমার! এখন তোর কুর্শিকে না হলেও চলবে। তোর ঐ মেজো-ভাবী তো আমার মত কালো নয়। তা হোক না ছেলের মা।'

এইবার প্যাঁকালে হাওয়ার কতকটা দিক নির্ণয় করতে পারলে। সে পা ঘষা থামিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আল্লার কিরে কুর্শি, খোদার কসম, আমি ও নিকে করছিনে। আমাকে কয়েছিল মা, তা আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি মুখের মতন। আমি বলেছি, এ শালার গোয়াড়িতেই থাকব না। রানাঘাট চলে যাব কাজ করতে।'

কুর্শির হাতের কাপড় জলে পড়ে গেল। সে মুখ ম্লান করে বলল, 'সত্যি চলে যাবি নাকি?'

ওষুধ ধরেছে দেখে প্যাঁকালে খুশি হয়ে বলে উঠল, 'যাবই তো! তা না হলে যদি মেজো-ভাবীর সঙ্গে নিকে দিয়ে দেয় ধরে?'

কুর্শি কাপড়টা তুলে অনেকক্ষণ ধরে কাচে। প্যাঁকালে তার কাপড় কাচার বিচিত্র গতিভঙ্গি চোখ পুরে দেখে। চোখে তার ক্ষুধা আর মোহ নেশার মতো করে জমাট বেঁধে ওঠে! বুকের স্পন্দন দ্রুত হতে দ্রুততর হতে থাকে। তার যেন নিজেরই নিজেকে ভয় করে। অকারণে পুকুরের চারপাশে ভীত-ত্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখে — সে যেন কী চুরি করছে। মাথায় তার খুন চড়ে যায়। সে উঠে গিয়ে কুর্শির হাত চেপে ধরে। পা তার ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। চোখে কিসের শিখা লকলক করে ওঠে। সে শুষ্ককণ্ঠে ডাকে, 'কুর্শি!'

কুর্শি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'যা মাইরি, এখুনি কেউ দেখে ফেলবে। একটু হুঁশ নেই! — আগে বল, তুই রানাঘাট চলে যাবিনে।'

প্যাঁকালে সাহস পেয়ে বলে, 'এই দেখ মজিদের দিকে মুখ করে বলছি, আল্লার কিরে কুর্শি, আমি যাব না কোথাও তুই না বললে।'

কুর্শি খুশি হয়ে বলে, 'উঁহু! আমার গা ছুঁয়ে বল।'

প্যাঁকালে গা ছুঁয়ে বলে, 'মজিদের চেয়েও বুঝি তুই বড় হলি?'

কুর্শি খুব মিষ্টি করে হাসে। বলে, 'হলুমই তো।' সে হাসিতে রাজা-বাদশা বিকিয়ে যায়। প্যাঁকালে থাকতে না পেরে একটা অতি বড় দুঃসাহসের কাজ করে বসে।

কুর্শি খুশি হয়, রাগও করে। মুখটা সরিয়ে দিয়ে বলে, 'যা, ভালো লাগে না, কেউ দেখে ফেলবে এখনি।'

প্যাঁকালেও জানে, যে-কোনো লোক যে-কোনো সময়ে দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু ঐ হাসি! ঐ চোখ! ঐ ঠোঁট! ঐ দেহের দোলান। দেখুকই না লোকেরা! প্যাঁকালে যেন মাতাল হয়ে পড়ে। হুঁশ থাকে না।

স্নান করে সে বাড়ি ফেরে। সারা শরীর তার ঝিম ঝিম করতে থাকে। যেন তাড়ি খেয়েছে। মাথার দুপাশের রগ টিপটিপ করে। বিশ্ব-সংসার মুছে যায় তার চোখের সামনে থেকে। সে কেবল ভীত মিষ্টি কণ্ঠের আকুলতা শোনে আর শোনে, 'কেউ দেখে ফেলবে, দেখে ফেলবে!' — তার তাতে লজ্জা নাই, লজ্জা শুধু দেখে ফেলার লোককে।

ওদের লজ্জা যেন ওদের জন্য নয়, অন্যের জন্য।

তারা দুজনে চলে — চির-চলা রক্ত-রাঙা পথে। যে-পথ ফরহাদ-মজনু, লায়লি — শিরিঁ, গোলে-বকৌলি, মহাশ্বেতা-পুণ্ডরিক, আরো কতজনের বুকের রক্তে রাঙা হয়ে আছে। চির-যৌবনের চির-কণ্টকাকীর্ণ পথ। চিরকালের রোমিও-জুলিয়েট, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা যেন ওরা!

এগারো

'ঝড় আসে নিমেষের ভুলে।'

জীবনের কোন পথ দিয়ে কখন বিপর্যয় আসে, মুহূর্তের জন্য — নিমেষে সব ওলট-পালট করে দিয়ে যায় — বন্ধনের দড়াদড়ি কখন যায় টুটে, — কেউ জানে না।

একদিঘি ফোটা পদ্মবনের উপর দিয়ে — ঝড় নয় — শুধু একটা ঘূর্ণি হাওয়ার চলে-যাওয়া দেখেছিলাম। সেই অসহায় পদ্ম-দিঘির স্মৃতি আজো ভুলিনি। হয়তো কখনো ভুলবও না। জলের ঢেউ তার তেমনি রইল — কিন্তু পদ্মবন গেল আগাগোড়া ওলট-পালট হয়ে! কোথায় গেল রাঙা শতদলের সে শোভা, কোথায় উড়ে গেল তার পাশের মরাল-মরালী! শুধু কাঁটা-ভরা মৃণাল আর পদ্মের ছিন্নপত্র। ছিন্নদল পদ্মের পাঁপড়িতে দিঘির মুখ আর দেখাই যায় না।

ও যেন মূর্ছিতা ত্রস্তকুন্তলা বিস্রস্ত-বসনা অভিমানিনী! ওকে কে যেন দুপায়ে দলে পিষে চলে গেছে।

নিমেষের ঝড়। ...

ঘরে কাঁদে মেজো-বৌ, বাইরে কাঁদে কুর্শি। একজন ঘৃণায়, রাগে — আর একজন অভিমানে, বেদনার অসহায় পীড়নে।

প্যাঁকালে কোথায় চলে গেছে।

মেজো-বৌ রাগে নিজের হাত নিজে কামড়ে মরে নিষ্ফল আক্রোশে। এই আবার পুরুষ, বেটাছেলে! এত বড় মিথ্যার ভয়কে সে উপেক্ষা করে চলতে পারলো না। যে মিথ্যা-কলঙ্কের ঢিল লোকে তাদের ছুঁড়ে মারলে, সেই ঢিল কুড়িয়ে সে তাদের ছুঁড়ে মারতে পারলে না। অন্তত অবহেলার হাসি হেসে বুক চিতিয়ে তাদেরি সামনে দিয়ে পথ চলতে পারলো না। শেষে কিনা পালিয়ে গেল! হার মেনে! কাপুরুষ! মেজো-বৌ ভাবে, আর কি একটা সঙ্কল্প করে। অমন সুন্দর মুখ পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে ওঠে।

পুরুষ যেখানে হার মেনে পালিয়ে গেল, সেইখানে দাঁড়িয়ে সে যুদ্ধ করবে তবু হটবে না।

শাশুড়ি কাঁদে, বড়-বৌ হা-হুতাশ করে, ছেলেমেয়েরা রোজ সাঁজে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। এমনি সন্ধে হব-হব সময় সে আসত ঐ শিশুগুলির জন্যে একটা-না-একটা কিছু নিয়ে! কোনো দিন 'লেবেঞ্চুস', কোনোদিন বা বোয়াল মাছ।

মেজো-বৌয়ের আনমনা ছেলেটি আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। তারপর আপন মনেই বলে, 'তোমায় কিছু আনতে হবে না ছোট কাকা, তুমি অমনি এস।' মাকে বলে, 'আচ্ছা মা, ছোট-চা বুঝি বা-জানের কাছে চলে গিয়েছে? উখেনে থেকে বুঝি আর ছেড়ে দেয় না?'

মা ছেলেকে বুকে চেপে ধরে। বলে, 'বালাই! ষাট! উখেনে যাবে কেন? হুই রানাঘাট চলে গেছে টাকা রোজগার করতে।'

শিশু থামে না। বলে, 'রানাঘাট বুঝি বা-জান যেখেনে থাকে, তার চেয়েও দূরে? না মা?'

মা ছেলেকে ধুলোয় বসিয়ে দিয়ে উঠে যায়।

মসজিদে সন্ধ্যার আজানের শব্দ কান্নার মতো এসে কানে বাজে। ও যেন কেবলি স্মরণ করিয়ে দেয় — বেলা শেষ হয়ে এল, আর সময় নাই! ... পথ-মঞ্জিলের যাত্রী সশঙ্কিত হয়ে ওঠে!

সন্ধ্যার নামাজ — যেন মৃত দিবসের জানাজা সামনে রেখে তার আত্মার শেষ কল্যাণ-কামনা!

মেজো-বৌ পাগলের মতো ছুটে গিয়ে মসজিদের সিঁড়ির ওপর — 'সেজদা' তো নয় — উপুর হয়ে পড়ে মাথা কুটতে থাকে। চোখের জলে সিঁড়ির ধুলো পঙ্কিল হয়ে ওঠে — তার ললাটে তারই ছাপ এঁকে দেয়। কী প্রার্থনা করে সে-ই জানে। ভিতর থেকে মৌলবী সাহেবের 'তকবির' ধ্বনি ভেসে আসে, 'আল্লাহো আকবার!' মেজো-বৌ সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে, বলে, 'আল্লাহো আকবার!' কান্নায় গলার কাছে আটকে যায় স্বর।

তারপর ঘরে এসে সব ছেলেমেয়েদের চুমু খায়, আদর করে — অভিভূতের মতো। নিবিড় সান্ত্বনায় বুক ভরে ওঠে। মন কেবলি বলে, এবার আল্লা মুখ তুলে চাইবেন।

শাশুড়িকে ডেকে বলে, 'মা আমি কাল থেকে নামাজ পড়ব।'

শাশুড়ি খুশি হয়ে বলে, 'লক্ষ্মী মা আমার, পড়বি তো? আর কেউ নয় মা, শুধু তুই যদি খোদার কাছে হাত পেতে চাস খোদা আমাদের এ দুক্ষু রাখবে না — আমার প্যাঁকালে ফিরে আসবে। কই, এতদিন তো পড়ছি নামাজ, এত ডাকলাম, সে শুনল কই মা! কিন্তু তুই ডাকলে শুনবে।'

মেজো-বৌ খুশি হয়ে গান করে — অস্ফুট স্বরে।

শাশুড়ি ক্ষুণ্ন হয়ে বলে, 'মা, তুই ঐ গান ছেড়ে দে দিকিন! ওতে আল্লা ব্যাজার হন। গান করলে 'গুনা' হয়, শুনিসনি সেদিন মৌলবি সায়েবের কাছ থেকে?'

মেজো-বৌ হেসে বলে, 'কিন্তু আমি যে ওতে খুশি হই মা। আমি খুশি হলে কি তিনি খুশি হন না? আচ্ছা মা, তুমি মৌলবী সায়েবকে জিজ্ঞেস করো তো, গান করে তাকে ডাকলে, তাঁর কাছে কাঁদলে কি তিনি তা শোনেন না?

বড়-বৌ মুখ গম্ভীর করে বলে, 'কোরান পড়ে না ডাকলে কি আল্লা শোনে রে মেজো-বৌ?'

মেজো-বৌ হেসে ফেলে। তারপর আপন মনে আবার গুন গুন করে গান ধরে।

প্যাঁকালে যেদিন গভীর রাত্তিরে কাউকে কিছু না বলে চলে যায় — সেদিন বিকেল পর্যন্তও সে জানত না যে সে চলে যাবে।

সন্ধ্যায় সে ফিরছিল কাজ করে। সারাদিনের ক্লান্ত চরণ তার কখন যে তাকে টেনে কুর্শির বাড়ির সামনে নিয়ে এসেছিল, তা সে নিজেই বুঝতে পারনি। হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে সে সচকিত হয়ে দেখলে বেড়ার ওধারে কুর্শি, এধারে রোতো কামার। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল পাশের আমগাছটার আড়ালে। রোতোর কি একটা কথার উত্তরে কুর্শি কচার একটা ছোট কচি শাখা ভেঙে রোতোকে ছুঁড়ে মারলে, রোতোও হেসে হাতের একটা পান ছুঁড়ে মারলে কুর্শির বুক লক্ষ করে।

রোতোর হাত-যশ আছে বলতে হবে। পানটা কুর্শির বুকেই গিয়ে পড়ল। কুর্শি নিমেষে সেটাকে লুফে নিয়ে মুখে পুরে দিলে।

কিন্তু এরই মধ্যে চক্ষের পলকে কী যেন বিপর্যয় হয়ে গেল। হঠাৎ কোত্থেকে একটা কন্নিক এসে লাগল কুর্শির বাম কানের ওপরে, ঠিক কপালের পাশে। কুর্শি 'মাগো' বলে মাটিতে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

এরপর রোতোর আর কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

কুর্শি তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। প্যাঁকালে কুর্শিকে পাথালি কোলে করে — যেমন করে বর তার রাঙা নববধূকে বাসি-বিয়ের দিন একঘর হতে আর এক ঘরে নিয়ে যায় তেমনি করে — বুকে জড়িয়ে তাদের বারান্দায় নিয়ে এল। বাড়ির সকলে তখন বেরিয়ে গেছে কোথায় যেন।

বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর কুর্শি চোখ মেলে চাইল। চেয়েই প্যাঁকালেকে দেখে আবার চক্ষু বুজে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেঁদে উঠল, 'মাগো!'

প্যাঁকালে তার কোল থেকে কুর্শির মাথাটা বালিশের ওপর রেখে উঠতে উঠতে বলল, 'তোর বাবাকে বলিস আমি মেরেছি তোকে!' বলেই বেরিয়ে গেল — কুর্শির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার পশ্চাতে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন ঘুম হতে উঠেই কুর্শি শুনল, প্যাঁকালে চলে গেছে — ওদের বাড়িতে মারাকান্না পড়ে গেছে! শুনেই সে আবার মূর্ছিতা হয়ে পড়ল!

কোথায় কী করে লাগল হাজার চেষ্টা করেও কুর্শির বাবা-মা জানতে পারল না। কুর্শি কিছু বলে না, কেবল কাঁদে আর মূর্ছা যায়। কিন্তু সেরে উঠতে তার খুব বেশি দিন লাগল না।

মাথার আঘাত তার যত শুকাতে লাগল, ততই তার মনে হতে লাগল, যেন ঐ কন্নিকের ঘা বুকে গিয়ে বেজেছে। সে রোজ দিন গোনে আর ভাবে, আজ সে আসবেই। তার গা ছুঁয়ে দিব্যি করল যে দুদিন আগে রাগের মাথায় সে চলেই যদি যায়, তাহলেও তার ফিরতে দেরি হবে না। এ অহঙ্কার তার আছে। আর রোতোর কথা? অমন বাজে ইয়ার্কি জোয়ান বয়সের ছেলে-মেয়ের দেখাশোনা হলেই দুটো হয়। আ মরণ! এ মিনসেকে বুঝি সে ভালবাসতে গেল?

তারপরেই লুটিয়ে পড়ে কাঁদে! বলে, 'ফিরে আয় তুই, ফিরে আয়! তোরি দিব্যি করে বলছি, ওর সঙ্গে দুটো ইয়ার্কি দেওয়া ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ নাই আমার! ওকে আমি এতটুকুও ভালবাসিনে!' আরো কত কি! ছেলেমানুষের মতো যা মুখে আসে, তাই বলে যায় আর কাঁদে।

কিন্তু বেশি দিন এমন করে যায় না। ফুল ফোটে, শুকায়, ঝরে পড়ে। হৃদয়ও ফোটে, শুকায়, তারপর দলিত হয় তারি পায়ে — যাকে সে কোনোদিনই চায়নি।

এক মাস — দু'মাস — তিন মাস যায়, প্যাঁকালে আর আসে না। তবে, খবর পাওয়া গেছে যে, সে কলকাতায় কাজ করছে — রাজমিস্ত্রিরই কাজ। দুবার টাকাও পাঠিয়েছে বাড়িতে।

কুর্শি একদিন মরিয়া হয়ে প্যাঁকালের বড়-ভাবীকে জিজ্ঞেস করল — সে কখন আসবে এবং চিঠিপত্তর দেয় কি-না। বড়-বৌ মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'কে জানে কখন আসবে!' কিন্তু এ খবরটা জানা গেল যে, চিঠিপত্তর মাঝে মাঝে দেয় বাড়িতে।

কুর্শি আর শুনতে পারল না, মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

কিন্তু কিসের জন্য তার এত ক্ষোভ, তা সে নিজেই বুঝে না। কেবল অসহায়ের মতো ছটফট করে মরে। চিঠি সে কেমন করে দেবে তাকে, সে তো নিজেই ভেবে উঠতে পারে না। তবু রোজ মনে করে, বুঝি তার নামে আজ চিঠি আসবে। ক্রিশ্চান মেয়ে সে, মোটামুটি লেখাপড়া জানে, একটা চিঠিও হাতে কোনো রকমের লিখতে পারে। মাঝে মাঝে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসেও লিখতো। কিন্তু লিখেই তার সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে, মন যেন কেন বিষিয়ে ওঠে নিবিড় অভিমানে। লেখা কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে!

মাঝে মাঝে ভাবে, খুব কঠিন হয়ে থাকলে বুঝি সে না এসে পারবে না। তারপর দু-দিন তিনদিন মুখ ভার করে থাকে, রাস্তায় বেরোয়, গোল পুকুরে নাইতে যায় মুখ ভার করেই — সেখানে তিনটে বেজে যায়, কেউ আসে না। প্যাঁকালের ঘরের সামনে দিয়ে আসে যায়, এখন আর কেউ ফিরেও দেখে না। শুধু মেজো-বৌ তাকে দেখতে পেলে মুখ টিপে হাসে আর গান করে। কুর্শির শরীর-মন যেন রি-রি-রি-রি করতে থাকে রাগে।

এতদিন তার সয়েছিল এই ভেবে যে, হাজার হোক সে-ই তো অপরাধী। অমন করে পর-পুরুষের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলে কার না রাগ হয়! ভাবতেই জিভ কেটে লজ্জায় সে যেন মরে যায়! সেও তো পর-পুরুষ! রোতো যেমন সেও তো তেমনি! বিয়ে তাদের হয়নি, হতেও পারে না। তবু, মন তার এমনি অবুঝ যে, সে কেবলি কী সব অসম্ভব দাবি করে বসে তারই ওপর — বাইরের দিক থেকে যার ওপর কোনো দাবিই সে করতে পারে না।

কিন্তু যত বড়ই অপরাধ সে করুক, তারই গা ছুঁয়ে তো সে দিব্যি করে বলেছিল যে, তাকে না বলে সে কোথাও যাবে না। সে না-হয় কিছু না-ই হলো, মজিদের দিকে মুখ করে দিব্যি করেছিল! এত বড় কী অপরাধ করেছে সে যে, প্যাঁকালে মজিদেরও অপমান করতে সাহস করে সেই অপরাধের জ্বালায়!

মন তার বেদনায় নিষ্ফল ক্রন্দনে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠে। যত মন জ্বালা করে, তত বুক ব্যথা করে। সে বুঝি আর পারে না! রবিবার গির্জায় গিয়ে কাতরস্বরে প্রার্থনা করে, 'যিশু, তুমি আমায় খুব বড় একটা অসুখ দাও, যেন শুনেই সে ছুটে আসতে রাস্তা পায় না।'

সে শুকিয়ে যেতে লাগল দিন দিন, কিন্তু বড় কিছু অসুখও হলো না। প্যাঁকালেও এল না!

কুর্শি এইবার যেন মরিয়া হয়ে উঠল। এইবার সে যা-হোক একটা-কিছু করবে। এইবার সে দেখিয়ে দেবে যে, খেরেস্তান হলেও সে মানুষ। তাকে ছুঁয়ে দিব্যি করে যে

সেই দিব্যির অপমান করে, তাকে সেও অপমান করতে জানে।

সে ইচ্ছা করেই রোতো কামারের দোকানের সামনে দিয়ে একটু বেশি করে যাওয়া-আসা করতে লাগল। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে রোতো কিন্তু অতিমাত্রায় কাজের লোক হয়ে উঠেছে। এখন দিনরাত দোকানে বসে লোহা পেটে আর হাঁপর ঠেলে। কুর্শিকে দেখলে সে যেন এতটুকু হয়ে যায় — লজ্জায়, ভয়ে। কিসের এত লজ্জা, এত ভয় ঐটুকু মেয়েকে সে খুব ভাল করে যে বোঝে, তা নয়। কি যেন মস্ত বড় অপরাধের বোঝা জোর করে তার মাথাটা ধরে নিচু করে দেয়। কুর্শি তার পাশ দিয়ে হাঁটে, আর অমনি সে প্রাণপণ জোরে হাঁপর ঠেলতে থাকে। যেন সমস্ত বিশ্বটাকে সে-ই চালাচ্ছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে জ্বলন্ত লোহাটাকে নেহাই-এর ওপর রেখে পিটতে থাকে। আগুনের ফুলকিতে তার মুখ আর দেখা যায় না।

সেদিন হঠাৎ কুর্শি তার একেবারে চোখের সামনে এসে পড়ল। সে কিন্তু হেসে উঠল, 'আ মর ড্যাকরা! যেন চেনেনই না আমায়! তোর হলো কি বল তো!'

রোতো ঘেমে উঠে ভীত চোখের দৃষ্টিতে চারিদিকে চায়, তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'না ভাই, আর কাজ নেই। সেদিনের কথা মনে পড়লে আমার বুক আজো দুরুদুরু করে ওঠে! ... শালা ডাকাত! ... সে আবার আসছে কখন?'

কুর্শি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, 'আর সে আসছে না। এলে টের পাইয়ে দেবো মজাটা এইবার!'

রোতো কিন্তু কথা খুঁজে পায় না। আমতা আমতা করে বলে, 'আমি ইচ্ছে করলে শালাকে সেদিন গুঁড়িয়ে দিতে পারতুম, শুধু তোর জন্যেই দিইনি।'

কুর্শি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, 'মাইরি বলছিস, তুই তাকে মারতে পারবি এবার এলে? ঐ কচার বেড়ার ধারে — যেখেনে সে আমায় কন্নিক ছুঁড়ে মেরেছিল, ঐখেনে ওকে মেরে শুইয়ে দিতে পারবি?' উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। সে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে।

তার আন্দোলিত বুকের পানে তাকিয়ে রোতোর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সে হঠাৎ কুর্শির হাত চেপে ধরে এসে। বলে, 'এই তোকে ছুঁয়ে বলে রাখলাম কুর্শি, ওকে যদি ঐখেনে মেরে শুইয়ে না দিই, তবে আমি বাপের বেটা নই! একবার এলে হল শালা!'

কুর্শি ঝাঁকানি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'মর হতচ্ছাড়া! বড় যে আস্পর্ধা তোর দেখছি! আমার হাত ধরেন এসে! একবার মেরেই দেখিস, পিঠের ওপর খ্যাংড়ার বাড়ি কেমন মিষ্টি লাগে!' সে আর বলতে পারে না; কান্নায় তার বুক যেন ভেঙে যায়! তারপর, দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকে বিছানায় উপুর হয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

সন্ধ্যা নেমে আসে — তাদের গির্জার কালো পোশাক-পরা মিসবাবাদের মত!

বারো

একদিকে মৃত্যু, একদিকে ক্ষুধা।

সেজো-বৌ আর তার ছেলেকে বাঁচাতে পারা গেল না। ওর শুশ্রূষা যেটুকু করেছিল সে শুধু ঐ মেজো-বৌ, আর ওষুধ দিয়েছিল মেম সায়েব — রোমান ক্যাথলিক মিশনারি।

মেজো-বৌ সেজোর রোগ-শিয়রে সারারাত জেগে বসে থাকে। কেরোসিনের ডিবে ধোঁয়া উদগীরণ করে করে ক্লান্ত হয়ে নিবে যায়। অন্ধকারে বন্ধুর মতো জাগে একা মেজো-বৌ। আর পাথরের মতো স্থির হয়ে দেখে, কেমন করে একজন মানুষ আর একজন অসহায় মানুষের চোখের সামনে ফুরিয়ে আসে।

সেজো-বৌ তার ললাটে মেজো-বৌয়ের তপ্ত হাতের স্পর্শ-ছোঁয়ায় চকিত হয়ে চোখ খোলে। বলে, 'এসেছ তুমি?' তারপর শিয়রে মেজো-বৌকে দেখে ক্ষীণ হাসি হেসে বলে, 'মেজো-বু, তুমি বুঝি? তোমার সব ঘুম বুঝি আমার চোখে ঢেলে দিয়েছ?'

মেজো-বৌ নত হয়ে সেজোর চোখে চুমু খায়। সেজো মেজো-বৌয়ের হাতটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলে, 'মেজো-বু, তুমি কাঁদছ?' — তারপর গভীর নিশ্বাস ফেলে বলে, 'কাঁদ মেজো-বু, মরার সময়েও তবু একটু দেখে যাই, এই পোড়ামুখীর জন্যেও কেউ কাঁদছে। দেখ মেজো-বু, তুমি আমার জন্যে কাঁদছ, আর তাই দেখে আমার এত ভালো লাগছে — সে আর কি বলবো। ইচ্ছে করছে বাড়ির সব্বাই যদি আমার কাছে বসে এমনি করে কাঁদে, আমি তাহলে হেসে মরতে পারি। হয়তো বা বেঁচেও যেতে পারি। কিন্তু মেজো-বু, আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এই ছেলের ভাবনা? ওর মায়া কাটিয়েছি! কাল ওর বাবাকে দেখেছিলুম 'খোয়াবে,' বলল, 'খোকাকে নিতে এসেছি।' আমি বললুম, 'আর আমায়?' সে হেসে বলল, 'তোকে নয়।' আমি কেঁদে বললুম 'যম তো নেবে, তুমি না নাও!'

মেজো-বৌ কান্নাদীর্ণ কণ্ঠে বলে, 'চুপ করে ঘুমো সেজো, তোর পায়ে পড়ি বোনটি!'

সেজো মেজো-বৌর হাতটা গালের নিচে রেখে পাশ ফিরে শোয়। বলে, 'কাল তো আর আসব না মেজো-বু কথা বলতে। ঘুমোবো বলেই তো কথা কয়ে নিচ্ছি। এমন ঘুমুব যে, হু-ই 'গোদা ডাঙায়' গিয়ে রেখে আসবে তিনগাড়ি মাটি চাপা দিয়ে। যেন ভূত হয়েও আর ফিরে আসতে না পারি! ... দেখ মেজো-বু, কাল সে যদি শুধু খোকাকে নিতে আসত, তাহলে কি হাসতে পারত অমন করে? আমায়ও নিয়ে যাবে,

ও চিরকাল আমার সঙ্গে অমনি দুষ্টুমি করে কথা কয়েছে! ... তোমার মনে আছে মেজো-বু, মরার আধঘণ্টা আগেও আমায় কেমন করে বললে, 'আমি বললাম, 'খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?' সে বলল, 'আমার সামনে তুই যদি এখখুনি মরিস, তাহলে আমার মরতে এত কষ্ট হয় না! ...'

শিয়রে প্রদীপ নিবু-নিবু হয়ে আসে। শুধু মেজো-বৌয়ের চোখভরা আকাশের তারার মতো চোখের জল চিকচিক করে। বলে, 'সেজো, তোর কিছু ইচ্ছে করছে এখন?'

সেজো ধীর শান্তস্বরে বলে, 'কিছু না। আর এখন কোনো কিছু পেতে ইচ্ছে করে না মেজো-বু! কাল পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে, যদি একটু ভালো খাবার-পথ্যি পেতুম — তাহলে হয়তো বেঁচে যেতুম। খোকার মুখে তার মায়ের দু-ফোঁটা দুধ পড়ত। আর তো পাবে না বাছা আমার!' বলেই ছেলের গালে চুমু খায়।

একটা আঁধার রাত যেন ডাইনির মতো শিস দিয়ে ফেরে। গাছপালা ঘরবাড়ি — সব যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুতে থাকে। তারাগুলোকে দেখে মনে হয় সহস্র হতভাগিনীর শিয়রে নিবু-নিবু পিদিম।

এরি মাঝে মাটির ঘরের মাটির শেজে শুয়ে একটি মানুষ নিবতে থাকে রিক্ত তৈল মৃৎ-প্রদীপের মতো। তেল ওর ফুরিয়ে গেছে, এখন সলতেতে আগুন ধরেছে। ওটুকুও ছাই হতে আর দেরি নেই।

সেজো মেজো-বৌয়ের হাতটা বাঁ-বুকে জোরে চেপে বলে, 'দেখছ, মেজো-বু, বুকটা কি রকম ধড়ফড় করছে। একটা পাখিকে ধরে খাঁচায় পুরলে সে যেমন ছটফট করে বেরোবার জন্যে, তেমনি, না? উঃ! আমার যেন দম আটকে আসছে! মেজ-বু! বাইরে কি এতটুকু বাতাস নেই?'

মেজো-বৌ জোরে জোরে পাখা করে।

সেজো মেজো-বৌয়ের পাখা-সমেত হাতটা চেপে ধরে বলে, 'থাক, থাক! ও বাতাসে কি আর কুলোয় মেজো-বু? সব সইতো আমার, সে যদি পাশে বসে থাকত! আমি চলে যাচ্ছি দেখে সে খুব করে কাঁদত, তার চোখের পানিতে আমার মুখ যেত ভেসে!' আর বলতে পারে না। কথা আটকে যায়। মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেয়।

খোকা কেঁদে ওঠে। মেজো-বৌ কোলে নিয়ে দোলা দেয়, ছড়া গায় — 'ঘুম আয়রে নাইলোতলা দিয়া, ছাগল-চোরায় যুক্তি করে খোকনের ঘুম নিয়া।'

ভোরের দিকে সেজো-বৌ ঢুলে পড়তে লাগল মরণের কোলে। মেজো-বৌ কাউকে জাগাল না। সেজোর কানে মুখ রেখে কেঁদে বলল, 'সেজো! বোনটি আমার! তুই একলাই যা চুপটি করে। তোর যাবার সময় আর মিথ্যে কান্নার দুক্ষু নিয়ে যাসনে!'

সেজো শুনতে পেলে কিনা, সে-ই জানে। সে শুধু অস্ফুটস্বরে বলল, 'খোকা ... তুমি ... '

মেজো-বৌ সেজোর দুই ভুরুর মাঝখানটিতে চুমু খেয়ে বলল, 'ওকে আমি নিলাম সেজো, তুই যা তোর বরের কাছে। আর পারিস্ তো আমায় ডেকে নিস!'

মেজো-বৌ আর থাকতে পারল না — ডুকরে কেঁদে উঠল।

দূরে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভোরের নামাজের আহ্বান শোনা যাচ্ছিল — 'আস্সালাতু খায়রুম্ মিনান্নৌম। — ওগো জাগো! নিদ্রার চেয়ে উপাসনা ঢের ভাল। জাগো!'

মেজো-বৌ দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, 'অনেক ডেকেছি আল্লা, আজ আর তোমায় ডাকব না।'

সেজোর মুখ কিন্তু কী এক অভিনব আলোকোচ্ছ্বাসে আলোকিত হয়ে উঠল। সে প্রাণপণ বলে দুই হাত তুলে মাথায় ঠেকালো — মুনাজাত করার মতো করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে গেল — কিন্তু তা তখখুনি ছিন্নলতার মতো এলিয়ে পড়ল তার বুকে।

মেজো-বৌ মুগ্ধের মতো তার মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের শেষ জ্যোতি দেখল — তারপর আস্তে আস্তে তার চোখের পাতা বন্ধ করে দিলো।

প্রভাতের ফুল দুপুরের আগেই ঝরে পড়ল।

মেজো-বৌ আর চুপ করে থাকতে পারল না। চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'মাগো, তোমরা ওঠো, সেজ নেই ...'

প্রভাতের আকাশ-বাতাস হাহাকার করে উঠল — নেই — নেই — নেই!

তেরো

সেজো-বৌর খোকাকেও আর বাঁচানো গেলো না।

মাতৃহারা নীড়-ত্যক্ত বিহগ-শিশু যেমন করে বিশুষ্ক চঞ্চু হাঁ করে ধুঁকতে থাকে, তেমনি করে ধুঁকে — মাতৃস্তন্যে চিরবঞ্চিত শিশু!

মেজো-বৌয়ের দু'চোখে শ্রাবণ রাতের মেঘের মতো বর্ষাধারা নামে। বলে, 'সেজো বৌ, তুই যেখানেই থাক, নিয়ে যা তোর খোকাকে! আর এ যন্ত্রণা দেখতে পারিনে!'

খোকা অস্ফুট দীর্ণ কণ্ঠে কেঁদে ওঠে, 'মা!'

মেজো-বৌ চুমোয় খোকার মুখ অভিষিক্ত করে দিয়ে বলে, 'এই যে জাদু, এই যে সোনা, এই যে আমি!'

বাড়ির মেয়েরা ভিড় করে এসে কাঁদে। শাবককে সাপে ধরলে বিহগ-মাতা ও তার স্বজাতীয় পাখির দল যেমন অসহায়ের মতো চিৎকার করে, তেমনি।

সাপের মুখের মুমূর্ষু বিহগ-শিশুর মতোই মেজো-বৌয়ের কোলে মৃত্যুমুখী খোকা কাৎরায়।

ভোর না হতেই সেজো-বৌয়ের খোকা সেজো-বৌয়ের কাছে চলে গেল। শবেবরাত রজনীতে গোরস্থানের মৃৎপ্রদীপ যেমন ক্ষণেকের তরে ক্ষীণ আলো দিয়ে নিবে যায়, তেমনি।

দুপুর পর্যন্ত একজন-না-একজন কেঁদে বাড়িটাকে উত্যক্ত করে তোলে, তারপর গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে। শোকের বাড়ির ক্লান্ত প্রশান্তি, অতল গভীর।

ঘুমায় না শুধু মেজো-বৌ। তার ছেলেমেয়ে দুটিকে বুকে চেপে দূর আকাশে চেয়ে থাকে। গ্রীষ্মের তামাটে আকাশ, যেন কোন সর্বগ্রাসী রাক্ষসের প্রতপ্ত আঁখি। বাঁশ গাছগুলো তন্দ্রাবেশে ঢুলে ঢুলে পড়ছে। ডোবার ধারে গাছের ছায়ায় পাতি-হাঁসগুলো ডানায় মুখ গুঁজে একপায়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। একপাল মুরগি আতা-কাঁঠালের ঝোপে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

অদূরে বাবুদের শখের বাড়ির বিলিতি তালগাছগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে। তারই সামনে দীর্ঘ দেবদারু গাছ — যেন ইমামের পেছনে অনেকগুলো লোক সারি সারি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে — সামনের শুকনো বাগানটায় জানাজার নামাজ।

এমনি সময় উত্তরের আম বাগানের ছায়া-শীতল পথ দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারির মিস জোন্স প্যাঁকালের ঘরে এসে হাজির হলো। মিস জোন্স ওদের বিলিতি দেশে যুবতী, আমাদের দেশে 'আধ-বয়েসী।' পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কাছাকাছি বয়েস। শ্বেতবসনা সুন্দরী। এই মেয়েটিই সেজো-বৌ আর তার খোকাকে ওষুধ-পথ্য দিয়ে যেত।

সেজো-বৌ আর তার ছেলেকে যে বাঁচানো যাবে না তা সে আগেই জানতো এবং তা মেজো-বৌকে আড়ালে ডেকে বলেওছিল। তবু তার যতটুকু সাধ্য, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল।

সকালে এসে মেজো-বৌকে একবার সে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। এই সময়টা বেশ নিরিবিলি বলেই হোক বা মেজো-বৌয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি-গুণেই হোক সে আবার এসে মেজো-বৌয়ের সঙ্গে গল্প শুরু করে দিলে।

এ কয়দিনে মেজো-বৌও আর তাকে 'মেম সায়েব' বলে অতিরিক্ত সসংকোচ শ্রদ্ধার ভাব দেখায় না। তাদের সম্বন্ধ বন্ধুত্বে পরিণত না হলেও অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।

মিস জোন্স বাংলা ভাল বলতে পারলেও সায়েবি টানটা এখনো ভুলতে পারেনি। তবে তার কথা বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয় না কারুর।

এ-কথা সে-কথার পর মিস জোন্স হঠাৎ বলে উঠল, 'ডেখো, টোমার মটো বুডঢিমটি মেয়ে লেখাপড়া সিখলে অনেক কাজ করটে পারে। টোমাকে ডেখে এট লোব হয় লেখাপড়া শেখাবার!'

মেজো-বৌ হঠাৎ মেমের মুখের থেকে যেন কথা কেড়ে নিয়েই বলে উঠল, 'সত্যি মিস-বাবা! আমারো এত সাধ হয় লেখাপড়া শিখতে! শেখাবে আমায়? আমার আর কিছু ভাল লাগে না ছাই এ বাড়িঘর!'

মিস্ জোন্স খুশিতে মেজো-বৌর হাত চেপে ধরে বলে উঠল, 'আজই রাজি। বরো ডুখ্খু পাচ্ছো টুমি, মনও খুব খারাপ আছে টোমার এখান; এখন লেখাপড়া শিখলে টোমার মন এসব ভুলে ঠাকবে।'

মেজো-বৌ কী যেন ভাবলে খানিক। তারপর ম্লানমুখে বলে উঠল, 'আমার ছেলেমেয়েদের কী করব?'

মিস জোন্স হেসে বলল, 'আরে, ওডেরেও সঙ্গে নিয়ে যাবে যাবার সময়। এখানে ওরাও পড়ালেখা করবে, ওডের আমি বিস্কুট ডেবে, খাবার ডেবে, ওরা খুশি হয়ে ঠাকবে।'

মেজো-বৌ আবার কী ভাবতে লাগল যেন। ভাবতে ভাবতে তার বেদনাম্লান চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। এই বাড়িতে যেন তার নাড়ি পোঁতা আছে। দুটো ছেলেমেয়ের বন্ধন, তারাও সাথে যাবে, আর সে চিরকালের জন্যও যাচ্ছে না — তবু কি এক অহেতুক আশঙ্কায় বেদনায় তার প্রাণ যেন টনটন করতে লাগল।

মিস জোন্স সুচতুরা ইংরেজ মেয়ে। সে বলে উঠল, 'আমি টোমার মনের কঠা বুজেছে। টোমাকে একেবারে যেটে হবে না সেখানে। ক্রীশ্চানও হটে হবে না। টুমি শুডু রোজ সকালে একবার করে যাবে। আবার ডুপুরে চলে আসবে।'

মেজো-বৌ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তা আমি যেতে পারব মিস-বাবা! পাড়ায় দুদিন একটা গোলমাল হবে হয়তো। তবে তা সয়েও যেতে পারে দু-এক দিনে।'

মেজো-বৌর ছেলেমেয়ে দুটি বিস্কুটের লোভে উসখুস করছিল এবং মনে মনে রাগছিলও এই ভেবে যে, কেন তাদের মা তখনি যাচ্ছে না মিস-বাবার সাথে! কিন্তু মায়ের শিক্ষা গুণে তারা মুখ ফুটে একটি কথাও বলল না। খোকাটি শুধু একবার তার ডাগর চোখ মেলে করুণ নয়নে মিস-বাবার দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল লজ্জায়।

মিস জোন্স খোকাকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে তার হাতব্যাগ থেকে চারটে পয়সা বের করে তাদের ভাইবোনের হাতে দুটো করে দিয়ে বলল, 'যাও, বিস্কুট কিনে খাবে।'

মেয়েটি পয়সা হাতে করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে যেন অনুমতি চাইল। মেজো-বৌ হেসে বলল, 'যা, বিস্কুট কিনে খা গিয়ে।'

মিস্ জোন্স উঠে পড়ে বলল, 'আজ টবে আসি! কাল ঠেকে তুমি সকালেই যাবে কিন্টু!'

মেজো-বৌ অন্যমনস্কভাবে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

সমস্ত আকাশ তখন তার চোখে ঝাপসা ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে।

পাশের আমগাছে দুটো কোকিল যেন আড়ি করে ডাকতে শুরু করেছে — কু-কুক-কুক! সে ডাকে সারা পল্লী বিরহ-বিধুরা বধূর মতো আলসে এলিয়ে পড়েছে।

মেজো-বৌ মাটিতে এলিয়ে পড়ল, নিরাশ্রয় নিরবলম্বন ছিন্ন স্বর্ণহার যেমন করে ধুলায় পড়ে যায়, তেমনি করে।

চোদ্দ

পরদিন সকালে কেউ উঠবার আগেই মেজো-বৌ তার ছেলেমেয়েকে নিয়ে মিস জোন্সের কাছে চলে গেল। যাবার আগে শুধু বড়-বৌকে চুপি চুপি বলে গেল, 'শাশুড়ি বিশেষ পীড়াপীড়ি করলে বাপের বাড়ি গেছি বলো!' বড়-বৌ ক্ষুণ্ন হয়ে চুপ করে রইল। মেজো-বৌয়ের এতটা বাড়াবাড়ি তার ভালো লাগছিল না। তবু সে মেজো-বৌকে একটু বেশি রকম ভালবাসে বলেই কিছু না বলে অভিমানে গুম হয়ে রইল। কত বড় দুঃখে পড়ে মেজো-বৌ আজ মিস-বাবাদের কাছে সরে যাচ্ছে, তাও তার অজানা ছিল না। তাই আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েই রইল।

দিনকয়েক আগে থেকে তার শাশুড়িও ঠাকুরে-পাড়ার সাব-ডেপুটি সাহেবের বাড়িতে চাকুরি নিয়েছিল, তাই সকালে উঠেই সেও চলে গেল, কারুর খোঁজ খবর নেবার আর গরজ করল না। নইলে সকালেই হয়তো একটা কাণ্ড বেধে যেত!

পাড়ার অল্প দূরেই রোম্যান ক্যাথলিক গির্জা-ঘর। মেজো-বৌ গির্জার দ্বারে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন গির্জার ভিতরে খ্রিস্টের স্তব-গান গীত হচ্ছিল সমবেত নারী-কণ্ঠে। গানের কথা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছিল না, তার কাছে অপূর্ব মিষ্টি লাগছিল শুধু তার সুর আর প্রকাণ্ড হলে প্রতিধ্বনিত অর্গ্যানের গম্ভীর মধুর আওয়াজ। তার মন শ্রদ্ধায়, খুশিতে ভরে উঠছিল।

হঠাৎ তার মনে পড়ল তারই বাড়ির পাশের মসজিদের আজান-ধ্বনি। তার মন কী এক অব্যক্ত বেদনায় কেবলি আলোড়িত হয়ে উঠতে লাগল। তার মন যেন কেবলই শাসাতে লাগল, সে পাপ করছে — অতি বড় অন্যায় করছে, এর ক্ষমা নাই, এর ফল ভীষণ, তাকে অনন্তকালের জন্য অনুতাপ করতে হবে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কার ছোঁয়ায় চমকে উঠে দেখল, মিস জোন্স মধুর হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে পিছনে দাঁড়িয়ে। মেজো-বৌকে ইঙ্গিতে পিছনে আসতে বলে মিস জোন্স গির্জার পাশের বাড়ির একটা কামরায় গিয়ে ঢুকল। মেজো-বৌ কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল দেখে মিস জোন্স ভিতর হতে বলল, 'ভিতরে এসো'। মেজো-বৌ স-সঙ্কোচে ভিতরে গিয়ে দেখল, সামনের টেবিলে চা-বিস্কুট প্রভৃতি খাবার। মিস জোন্স মেজো-বৌকে তার বিছানায় জোর করে বসিয়ে বলল, 'একটু চা খাও আমার সাটে, টারপর কঠা হবে।'

মেজো-বৌ কিছুতেই রাজি হয় না খেতে। অনেক পীড়াপীড়ির পর বলল, 'মিস-বাবা, আমাদের জাত যায় তোমাদের সাথে খেলে।' মিস্ জোন্স চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে বলল, 'ও গড! আমিও টো টা জানটুম।' বলে মুখ ম্লান করে কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর বলল, 'কিন্টু টোমাদের মুসলমান ঢর্মের অনেক কিছু আমি জানি, টাটে কারুর সঙ্গে খেটে টো নিষেড নেই।' মেজ-বৌ হেসে বলল, 'তা তো আমি জানি না, আমাদের মৌলবী সাহেব আর মোড়ল তো অনেক জরিমানা করেছে খেরেস্তানদের ছোঁওয়া খাওয়ার জন্যে!'

মেম সায়েব আর কিছু না বলে মেজো-বৌয়ের ছেলেমেয়ে দুটিকে কাছে টেনে নিয়ে বিস্কুট হাতে দিয়ে বলল, 'এডের আমি চা খাওয়ালে ডোষ হবে না টো?' মেজো-বৌ হেসে বলল, 'হবে।' মেম সাহেব এইবার একটু জোরের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয় হবে না। ওরা এখনো মুসলমান-খ্রিশ্চান কিছু নয় — ওরা শিশু।'

মেজো-বৌ চুপ করে রইল। সে তখন অন্য কথা ভাবছিল।

ক্ষুধার্ত শিশু বিস্কুট হাতে করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মেজো-বৌ অস্ফুটস্বরে বলল, 'খা।'

ছেলেমেয়েদের চা খাওয়া হলে মিস জোন্স নিজে চা খেয়ে বলল, 'টোমায় জোর করে খাওয়াব না। টবে টুমি কিছু না খেয়ে অমনি রইলে। যাক্, টোমাকে ডাকব কী বলে? টোমার নাম টো একটা আছে।'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'নাম একটা ছিল হয়ত বিয়ের আগে। তা এখন ভুলে গিয়েছি। এখন আমি 'মেজো-বৌ।'

মিস জোন্স হেসে বলল, 'আচ্ছা আমি টোমায় মেজ-বৌই বলব।' বলেই মিস্ জোন্স কী ভাবল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'ডেখ মেজো-বৌ, আমি

টোমায় ভালোবেসেছি। কেন টোমায় এট ভাল লাগে জানি না। আমি টোমাকে আপন সিস্টারের মটো করে লেখাপড়া শেখাব।'

মেজো-বৌয়ের চোখ জলে টলমল করে উঠল।

প্রায় এগারটার সময় যখন সে ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাড়ি ঢুকল আবার এসে, তখন তার শাশুড়ি শিলাবৃষ্টির মেঘের মতো মুখ করে রান্না ঘরের সামনে বসে বোধহয় মেজো-বৌয়েরই প্রতীক্ষা করছিল।

মেজো-বৌ কিছু না বলে সোজা ঘরে ঢুকল গিয়ে। শুধু তার খোকা দৌড়ে তার দাদীর কোলে উঠে বলল, 'বল তো দাদি, কোথায় গিয়েছিলুম।' ভিতর থেকে মেজো-বৌ চিৎকার করে উঠল, 'খোকা, এদিকে আয়!' ছেলে ভয়ে ভয়ে মায়ের কাছে চলে গেল। শাশুড়িও এইবার শতধারে ফেটে পড়ল। ঝড়, বজ্র ও শিলাবৃষ্টির মতোই বেগে চিৎকার, কান্না ও গালি চলতে লাগল। মেজো-বৌ চুপ করে শুনে যেতে লাগল।

পনেরো

চাঁদ-সড়কে সেদিন বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। লক্ষ্মীছাড়া-মতো চেহারার লম্বা-চওড়া একজন মুসলমান যুবক কোত্থেকে এসে সোজা নাজির সাহেবের বাসায় উঠল। নাজির সাহেব কৃষ্ণনগরে সবে বদলি হয়ে এসে চাঁদ-সড়কেই বাসা নিয়েছেন।

যুবকের গায়ে খেলাফতি ভলান্টিয়ারের পোশাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। খদ্দরেরই জামা-কাপড় — কিন্তু এত মোটা যে, বস্তু বলে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের 'ফেটিগ-ক্যাপের' মতো টুপি, তাতে কিন্তু অর্ধচন্দ্রের বদলে পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি-ক্রস। তারবারি-ক্রসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ছোট্ট ত্রিশূল। হাতে দরবেশী ধরনের অষ্টাবক্রীয় দীর্ঘ যষ্টি। সৈনিকদের ইউনিফর্মের মতো কোট-প্যান্ট। পায়ে নৌকোর মতো এক জোড়া বিরাট বুট, চড়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ। শরীরের রঙ যেন ফরসা তেমনি নাক-চোখের গড়ন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন মাপ করে করে তৈরি — গ্রীক-ভাস্করের এ্যাপোলো মূর্তির মতো — নিখুঁত সুন্দর।

কিন্তু এমন চেহারাকে লোকটা অবহেলা করে করে পরিত্যক্ত প্রাসাদের মর্মর-মূর্তির মতো কেমন ম্লান করে ফেলেছে। সর্বাঙ্গে ইচ্ছাকৃত অবহেলার, অযত্নের ছাপ। গায়ে মুখে এত ময়লা যে, মনে হয় এইমাত্র ইঞ্জিন চালিয়ে এল। দাড়ি সে রাখে না, কিন্তু বোধহয় হপ্তাখানেক ক্ষৌরী না করার দরুন খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়ে মুখটা বৈঁচীকণ্টকাকীর্ণ বাগিচার মতো বিশ্রী দেখাচ্ছে।

কিন্তু এ সবে ওর নিজের কোনোরূপ অসোয়াস্তি হচ্ছে বলে মনে হয় না। সে স্টেশন থেকে পায়দলে হেঁটে এসে পিঠের কিটব্যাগটা সশব্দে মাটিতে ফেলে দিয়ে

নাজির সাহেবের ঘরের ইজি-চেয়ারটাতে এমন আরামের সঙ্গে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, যেন এ তার নিজেরই বাড়ি এবং সে এইমাত্র বাথ-রুম থেকে 'ফ্রেশ' হয়ে বেরিয়ে আসছে।

তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে এবং নাজির সাহেব তখনো ওঠেননি।

ইজিচেয়ারে শোওয়ার একটু পরেই যুবকের নাক ডাকতে লাগল।

গোটা-আটেকের সময় নাজির সাহেব দহলিজে এসে যুবককে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন। মনে করলেন, কোনো কাবুলিওয়ালা কাপড়ের গাঁটরি রেখে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নাজির সাহেব অতিমাত্রায় ভাল মানুষ। কাজেই একজন কাবুলিওয়ালা তাঁর ইজি-চেয়ারে ঘুমোচ্ছে মনে করেও তিনি কিছু না বলে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন; এবং যাতে বেচারার ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য দুরন্ত ছেলেমেয়ে ক'টিকে বাইরের ঘরে যেতে নিষেধ করলেন।

ছেলেরা এ খবর জানত না। তারা মনে করল, মানা যখন করেছে, তখন নিশ্চয়ই কোনো একটা মজার জিনিস এসে থাকবে সেখানে। ওদের দলের সর্দার আমীরের বয়স খুব জোর বছর আটেক হবে, বাকি সব তার জুনিয়র। সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কের মতো এক-এক ধাপ করে নিচে।

আমীর তার 'গ্যাং'কে চুপিচুপি কি বলল। সকলের চোখে-মুখে খুশির একটা তীব্র হিল্লোল বয়ে গেল — হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলসানির মতো। চুনীবিল্লীর মতো মুখ করে সকলে বেরিয়ে গেল। তারপর বাইরের দিক থেকে এসে ঈষৎ দরজা ফাঁক করে দেখতে লাগল। কিন্তু লোকটার চেহারা দেখে অনেকটা উৎসাহ কমে গেল। ওর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদে যেটি, সে প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, 'ওঁ বাঁবাঁ! জুঁ জুঁ!' তার একধাপ উঁচু সিনিয়র ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'উঁহু, ছেলে-ধরা, ঐ দেখ ঝুলি!' বলেই কিটব্যাগটা দেখিয়ে দিল। বাস আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে আমীর ছাড়া আর সকলে 'মার মার না পগার পার' করে দৌড় দিলে।

আমীর কিন্তু হটবার ছেলে নয়। তার উপর সে দলপতি। ভয় যতই করুক, পালিয়ে গেলে তার প্রেস্টিজ থাকে না। কাজেই সে কিছুই না বলে গম্ভীরভাবে একটা লম্বা খড় এনে সোজা নিদ্রিত যুবকটির নাকের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিল; যুবকটি একেবারে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল। আমীরের স্ফূর্তি দেখে কে! সে তখন হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়েছে।

যুবকটি কিছু না বলে হেসে পকেট থেকে একটি রিভলবার বের করে আমিরের দিকে লক্ষ করে শট করলো। ভীষণ শব্দে নাজির সাহেব মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটে এলেন। আরো অনেকে ছুটে এল। আমীর ভয়ে জড়পিণ্ডবৎ হয়ে গেছে, কান্না পর্যন্ত যেন আসছে না! তার বাবাকে আসতে দেখে সে একেবারে চিৎকার করে তাঁকে জড়িয়ে

ধরল গিয়ে। তিনি কিছু বলবার আগেই যুবকটি হাসতে হাসতে তার রিভলবারটা নিয়ে আমীরের হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলতে লাগল, 'এটা তোমায় দিলাম।' নাজির সাহেবের দিকে ফিরে বলল, 'এটা নকল রিভলবার। এটা দিয়ে অনেক পুলিশকে অনেকবার ঠকিয়েছি।'

নাজির সাহেব ও উপস্থিত সকলে যুবককে উন্মাদ মনে করে হতভম্ব হয়ে তার কার্যকলাপ দেখছিলেন। এইবার অনেকেই হেসে ফেলল। কিন্তু কারুর কিছু বলবার আগেই আমীর তার বাবার কোল থেকে নেমে যুবকটির দিকে রিভলবার লক্ষ করে বলে উঠল, 'এইবার হাম তোমাকে গুলি করেগা।'

নাজির সাহেব যুবকটির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন। একে কোথায় দেখেছেন যেন। অথচ ঠিক স্মরণও করতে পারছিলেন না। হঠাৎ পেছন থেকে 'কড়াফোন' হল, অর্থাৎ অন্দর মহলের দিককার কড়ার দরজাটার শব্দ হলো। নাজির সাহেব দোরের ফাঁকে মুখ দিয়ে জিজ্ঞেস করবার আগেই ভিতর থেকে মৃদু শব্দ এল, 'চিনতে পারছ না? ও যে আমাদের আনসার ভাই।'

নাজির সাহেব দৌড়ে এসে যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আরে তৌবা! তুমি আনসার! আচ্ছা ভেক ধরেছ যা-হোক। এ কি কাবুলিওয়ালা সেজেছ, বলতো! আরে, ভিতরে এস, ভিতরে এস!' বলতে বলতে তাকে টেনে একেবারে অন্দরে নিয়ে গেলেন।

অন্দরে যেতেই নাজির সাহেবের স্ত্রী এসে তাকে সালাম করল। যুবক হেসে বলল, 'কি রে বুঁচি, তোর চোখের তো খুব তারিফ করতে হয়। আচ্ছা, এই দশ বছর পরে দেখে চিনতে পারলি কি করে?' — এইখানে বলে রাখা ভাল, শ্রীমতি বুঁচি — ওরফে লতিফা বেগম — আনসারের 'খালেরা বহিন' বা মাসতুত বোন। আনসারের চেয়ে বয়সে সে বছর পাঁচেকের ছোট। কুড়ি বছরেই সে বুড়ি না হলেও চারটি ছেলের মা হয়েছে।'

লতিফা আঁচলে চোখ মুছে বলল, 'মেয়েরা দশ হাজার বছর পরে দেখা হলেও আপনার জনকে চিনতে পারে ভাই, ওরা তো আর পুরুষ নয়।' বলেই নাজির সাহেবের দিকে বক্রদৃষ্টি দিয়ে তাকাল।

নাজির সাহেব মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'দেখ, স্ত্রীর ভাইকে দশজন ভদ্রলোকের সামনে চিনে ফেলে সম্বন্ধটা ফাঁস করে দিলে তুমি হয়তো খুশি হতে, কিন্তু আনসার হত না।'

আনসার নাজির সাহেবের কবজিটা ধরে রাম-টেপা দিয়ে বললেন, 'চোপ শালা!'

তার টেপার তাড়নে নাজির সাহেব উঁহু উঁহু করে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'দোহাই ভাই! ছেড়ে দে! আমিই তোর শালা!'

আনসার হেসে হাত ছেড়ে দিলো।

নাজির সাহেব কবজিতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'উঃ! আর একটু হলেই হাতটা পাউডার হয়ে গেছিল আর কি! তুমি তেমনি গোঁয়ার আছ দেখছি!'

লতিফা হেসে বলল, 'এখন তোমার এই ঝুলঝোপপুর পোশাকগুলো খুলে ফেল দেখি! তৌবা, তৌবা! কি চেহারাই করেছে! কাপড়-চোপড় আছে সঙ্গে, না এনে দেবো? আগে নেয়ে নেবে, না চা আনব?'

আনসার মেঝেতেই হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বলে উঠল, 'আঃ! কী নাম শুনালি রে বুঁচি! চা! চা! আঃ! আগে চা নিয়ে আয় তো, তারপর সব হবে!' বলেই গুন গুন করে গাইতে লাগল —

কাপ-কেটলিবাসিনী সিদ্ধিবিধায়িনী
মানস-তামসমোষিণী হে!
দুগ্ধ ও শর্করা-মিশ্র শ্বেতাম্বরা
চীনা-ট্রেবাহিনী জাড্য হরে।

লতিফা চা আনতে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'পাগল!'

একটি ছোট্ট কথা! ওতেই মনে হলো, যেন লতিফা তার প্রাণের সমস্ত সুধা দিয়ে উচ্চারণ করলে ঐ কথাটি। ঘর-ছাড়া ভাইকে বহুকাল পরে কাছে পেয়ে বোনের প্রাণ বুঝি এমনি করেই তোলপাড় করে ওঠে।

চা করতে গিয়ে সেদিন একটু অতিরিক্তই দেরি হলো। সেদিন উনুনের সকল ধোঁয়া বুঝি লতিফার চোখে ভিড় করে জমেছিল এসে। সেদিন চায়ের জলের অর্ধেকটা ছিল কেটলির, আর অর্ধেকটা চোখের।

ষোল

চা খাওয়া হলে পর লতিফা বলে, 'দাদু, তুমি তোমার ঐ কাব্‌লিওয়ালার পোশাক খুলে ফেল দেখি। কী বিশ্রী দেখাচ্ছে! মাগো! ঐ ময়লা গদ্ধর পরে থাক কী করে তাই ভাবছি!'

আনসার হেসে বলল, 'গদ্ধর নয় রে বুঁচি, এর নাম খদ্দর। একটু থাম না তুই, তারপর দেখবি, কি রকম রাজপুত্তুরের মতো চেহারা করে ফেলি।'

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হাসতে লাগল।

ঘণ্টা দুই পরে শেভ করে স্নান সেরে পরিষ্কার কাপড় পরে যখন আনসার বেরুল, তখন তাকে সত্যি সত্যিই রাজপুত্তুরের মতো দেখাচ্ছিল।

নাজির সাহেব ও লতিফা মুগ্ধদৃষ্টি দিয়ে আনসারকে বারে বারে দেখতে লাগল।

লতিফার ছেলেগুলি ততক্ষণে এসে বেশ করে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। এবং আমীরের রিভলবারের আওয়াজে চাঁদ-সড়ক প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। সে বারে বারে আসে আর তার মাকে বলে, 'বুঝলে মা, আমি এইটে নিয়ে যুদ্ধ করতে যাব। মামা আর আমি ইংরেজকে একেবারে এই গুড়ুম!' বলেই তার এবং মামার শত্রুর উদ্দেশ্যে রিভলবারের আওয়াজ করে।

আনসার বলল, 'বুঝলিরে বুঁচি, ঐ রিভলবারটা নিয়ে আজ যা করেছি ট্রেনে। এক বেটা টিকটিকি আমার পিছু নিয়েছিল আজ। শুধু আজ নয়, ওরা আছেই আমার পিছনে। রাস্তায় আমার একটি বন্ধু ছিল সাথে। মাথায় একটা হঠাৎ খেয়াল চেপে গেল। আমি বন্ধুটিকে চুপ করে বললাম, 'চুপি চুপি ঐ টিকটিকি বাবাজীকে খবর দিতে, আমার কাছে রিভলবার আছে। সে গিয়ে খবর দিতেই, আর যায় কোথায়! দেখি, শ্রীমান রানাঘাট স্টেশনে এক ডজন কনস্টেবল নিয়ে হাজির। আমি নামতেই আমাকে বলল, 'আপনি থানায় আসুন, আপনাকে আমাদের দরকার আছে।' আমি বললাম, 'আমায় সেখানে চা খেতে দিবেন তো?' রেলওয়ে-পুলিশের দারোগাবাবু বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আজ্ঞে, চা-জলখাবার সব প্রস্তুত রেখেই আপনাকে নিতে এসেছি।' আমি হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ! চলুন!' তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে সার্চ করে যখন পেলে এই খেলনার রিভলবারটা, তখন তাদের মুখের অবস্থা যা হয়েছিল রে বুঁচি, তা ঠিক বলে বুঝাতে পারব না। গোবর থাকলে ছাঁচ তুলে নিতাম!' বলেই গগনবিদারী হাসি।

লতিফা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, 'আচ্ছা দাদু, তুমি এখনো ছেলেবেলাকার মতোই দুষ্টু আছ দেখছি। সে যাক তুমি এতদিন ছিলে কোথায়, বল তো?'

আনসার হেসে বলল, 'আরে, এত বড় খবরটাই রাখিসনে তুই? আজ আসছি ময়মনসিংহ থেকে। সেখানে এসেছিলাম সিলেট থেকে। সিলেট গেছিলাম ত্রিপুরা থেকে। কুমিল্লা গেছিলাম চাটিগাঁ থেকে।'

নাজির সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে থাম থাম, আর বলতে হবে না। বুঝেছি, টোঁ টোঁ কোম্পানির দলে নাম লিখিয়েছ তুমি, এই তো?'

আনসার বলল, 'কতকটা তাই! তবে একেবারে বিনা উদ্দেশ্যে নয়। ঘুরি, সাথে সাথে একটু কাজও করি।' বলেই হঠাৎ বলে উঠল, 'বুঝলি রে বুঁচি, তোমাদের এখানে কিন্তু একদিনের বেশি থাকছিনে।'

লতিফা ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এই তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাদের এখানটা তোমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল নাকি দাদু?'

আনসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলল, 'অভিমান করিস্‌নে ভাই, সব কথা শুনলে তোরাই বাড়িতে জায়গা দিতে সাহস করবিনে।'

নাজির সাহেব বললেন, 'জানি ভাই, তুমি দেশের কাজ নিয়ে পাগল! তাহলেও এত অল্পে আমার চাকরি যাবে না — সে ভয় তোমার করতে হবে না।'

আনসার বলল, 'দাঁড়াও না একটু, এখনি থানা থেকে খবর নিতে আসবে। আমার আসবার আগেই এখানে 'সাইফার টেলিগ্রাম' এসে গেছে যে, ১০৯ নম্বর যাত্রা করলে।'

লতিফা বলে উঠল, '১০৯ নম্বর কি দাদু?'

আনসার বলল, 'ও-সব বুঝবিনে তোরা। আমাদের রাজনৈতিক অপরাধীদের একটা করে নম্বর আছে — সমস্ত সি.আই.ডি. পুলিশ অফিসারের কাছে একটা করে লিস্ট থাকে। পাছে অন্য কেউ জানতে পারে তাই আমাদের নাম না নিয়ে নম্বরটার উল্লেখ করে চিঠিপত্র লেখে বা তার করে।' — বলেই আনসার হেসে বলল, 'আমাদের কি কম সম্মানরে বুঁচি! সর্বদা সাথে দুজন সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরী। কোথাও গেলে-এলে আগেই পুলিশের অফিসার অভিনন্দিত করে স্টেশনে! তারপর দুবেলা আমাদের দিন কেমনভাবে কাটছে তার খবর নেওয়া! একেবারে দ্বিতীয় লাট সাহেব আর কি!'

লতিফার কিন্তু কেন চোখ ছল ছল করে উঠল। আনসারের দিকে তার অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে বলল, 'তোমায় ছেলেবেলা থেকেই তো আমি জানি দাদু, তুমি চিরটাদিন এমনি পরের দুঃখে পাগল। তবু আজ কেমন ইচ্ছে করছে, আমার যদি শক্তি থাকত, তোমাকে এমন করে মরণের পথে এগুতে দিতাম না। কিছুতেই না। আচ্ছা দাদু, তোমার কিসের দুঃখ, বলতো? বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, বাপ-মা, ভাই-বোন — কিছুরই তো অভাব নেই তোমার; কিন্তু তোমায় দেখে কে বলবে, তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে — তোমার ঘর-বাড়ি বলতে কিছু আছে!'

আনসার বিষাদ-জড়িত কণ্ঠে বলল, 'আমি তো কোনো দিন কারুর কাছে বলিনে ভাই, যে, আমার কোনো কিছু নেই। — কেউ কোথাও নেই। দুনিয়ার সব মানুষ একই ছাঁচে ঢালা নয় রে, বুঁচি। এখানে কেউ ছোটে সুখের সন্ধানে, কেউ ছোটে দুঃখের সন্ধানে। আমি দুঃখের সন্ধানী। মনে হয় যেন আমার আত্মীয়-পরিজনের কেউ নেই! আমার আত্মীয় যারা, তাদের সুখের নীড়ে আমার মন বসল না! অনাত্মীয়ের অপরিচয়ের দলের নীড়হারাদের সাথী আমি! ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে আমি যেন আমাকে পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। তাই ঘুরে বেড়াই এই ঘর-ছাড়াদের মাঝে।'

সতেরো

শেষের দিকটায় আনসার যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলতে লাগল, 'আমি এখানে কেন এসেছি জানিস্? জেল থেকে ফিরে এসে অবধি আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে। আমি এখন ...' বলেই কী বলতে গিয়ে অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠল, 'বুঁচি, এখনো চরকা কাটিস?'

লতিফা হেসে বলল, 'না দাদু, এখন আপনার চরকাতে তেল দিবার ফুরসৎ পাইনে, তা দেশের চরকা ঘুরাব কখন।'

আনসার হেসে বলল, 'হুঁ, এখন তা হলে চরকার সুতো ছেড়ে কোলের সুতদের নিয়েই তোর সংসারের তাঁত চালাচ্ছিস। দেখ, ও ল্যাঠা ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছিস ভাই। আমি এখনই বলছিলাম না যে, আমার মত বদলে গেছে। এখন আমার মত শুনলে তুই হয়তো আকাশ থেকে পড়বি। বাঁক বোঝাই করে করে চরকা বয়ে বয়ে যার কাঁধে ঘাঁটা পড়ে গেছে, তোর সেই চরকা-দাদু আনসারের মত কি শুনবি? সে বলে, সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না।'

লতিফা সত্যি সত্যি এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল। সে বলল, 'বল কি দাদু! ওরে বাবা, চরকা নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য তুমি নাকি মাহমুদকে একদিন কান ধরে সারা ঘর নাক ঘেঁষড়ে নিয়ে গিয়েছিলে! ওমা, কি হবে! শেষে কিনা তুমি চরকায় অবিশ্বাসী হলে?'

আনসার এক গাল পান মুখে দিয়ে বলল, 'সত্যি তাই। আমি আজ মনে করি যে, আর সব দেশ মাথা কেটে স্বাধীন হতে পারছে না, আর এ দেশ কি সুতো কেটে স্বাধীন হবে?'

নাজির সাহেব বললেন, 'দোহাই দাদা, ও মাথা কাটার কথাটা যেখানে-সেখানে বলে নিজের কাঁচা মাথাটাকে আর বিপদে ফেলো না!'

আনসার হেসে বলল, 'তার মানে, কোনো এক শুভ প্রভাতে মাথাটা দেহের সঙ্গে নন-কো-অপারেশন করে বসবে — এই তো? তা ভাই, যে দেশের মাথাগুলো নোয়াতে নোয়াতে একেবারে পায়ের কাছে এসে ঠেকেছে, সে দেশের দু-একটি, মাথা যদি খাড়া হয়ে থেকে তার ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ খাড়ার ঘা-ই লাভ করে তা'হলে হেঁট মাথাগুলো অনেকখানি লজ্জা কমে যাবে মনে করি।'

লতিফা বলল, 'চুলোয় যাক তোমাদের রাজনীতি! এখন আমি বলি দাদু, তুমি চিরকালটা এমনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েই কাটাবে?'

আনসার হেসে বলল, 'চুলোয় আমার চরকাকে দিয়েছি — রাজনীতিটা দিতে পারবো না বোধহয়। তুই ভুল বললি বুঁচি, আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াইনি। বনের খেয়েই বনের বাঘ তাড়াচ্ছি! ঘরের খাওয়া আমার রুচল না, কি করবি, কপাল।'

লতিফা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যাক তুমি কারুর কথাই কোনোদিন শোননি, আজও শুনবে না। তাই ভাবছি, কি করে আমাদের মনে করে এখানে এলে!'

আনসার বলল, 'আমি চিরকালই ঠিক আছি। একেবারে বিনা কাজে আসিনি আগেই বলেছি। এখানে একটা শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে তুলতে এসেছি। প্রত্যেক জেলায়

আমাদের শ্রমিকসঙ্ঘের একটা করে শাখা থাকবে। আপাতত সেই মতলবেই ঘুরে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়। এখানে হয়তো মাসখানেক বা তারও বেশি থাকতে হবে। এই তো ময়মনসিংহ-এ দুমাস থেকে এলাম।'

লতিফা ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে নেচে উঠে বলল, 'সত্যিই দাদু! তুমি এখানে অতদিন থাকবে? বাঃ বাঃ! কি মজাটা না হবে তাহলে। আমি আজই চিঠি দিচ্ছি খালা আম্মাকে — তাঁরা সব এসে আমাদের এখানে থাকবেন এখন কিছুদিন। দাদু, লক্ষ্মীটি, এক মাস না দুমাস, কেমন?

আনসার হেসে ফেলে বলল, 'তুইও তো খোকার মা হয়েও আজো খুশিই আছিস দেখছিরে। চিঠি লেখ, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমি আমার কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকব যে, তোদের সঙ্গে হয়ত সারাদিনে একবার দেখা করতেই পারব না! আমি এখানে থাকলেও তো তোদের এখানে থাকতে পারব না! নাজির সাহেবের পিছনে টিকটিকি লেগে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।'

লতিফার হাস্যোজ্জ্বল মুখ এক নিমিষে ম্লান হয়ে গেল, — শিশুর হাতের রংমশাল জ্বলে নিবে যাবার পর তার দীপ্ত মুখ যেমন নিরুজ্জ্বল হয়ে উঠে — তেমনি!

আঠারো

এরপর দু-তিন দিন কেটে গেছে। এবং এই দু-তিন দিন আনসার গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রি, কুলি-মজুর, মেথর প্রভৃতিদের নিয়ে টাউনে একটা রীতিমতো হুলুস্থূল বাধিয়ে তুলেছে। শহরময় গুজব রটে গেছে যে, রাশিয়ার বলশেভিকদের গুপ্তচর এসেছে লোক খেপাতে। সরকারি কর্তাদের মধ্যেও এ নিয়ে কানাঘুষা চলছে। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, এমনকি কংগ্রেসওয়ালারা পর্যন্ত আনসারকে কেমন বাঁকা চোখে বাঁকা মন দিয়ে দেখতে শুরু করেছে। সেদিকে আনসারের ভ্রূক্ষেপও নাই। সে সমান উদ্যমে মোটরের চাকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বসে চা খেতে খেতে আনসার কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। গল্প সেদিন কিছুতেই জমছে না দেখে নাজির সাহেবও কেমন বিমনা হয়ে যাচ্ছিলেন। আনসার এ-কয়দিন ঝড়ের মতো এসে নাকে-মুখে যা পেয়েছে দুটো গুঁজে দিয়ে আবার তার কুলি-মজুর, মেথর-চাঁড়ালদের বস্তিতে ঘুরেছে। লতিফা রাগ করে অভিমান করে কেঁদেও কিছু করতে পারেনি। আনসার হেসে শুধু বলেছে, 'পাগলি!' সে হাসি এমন করুণ, এমন বেদনামাখা, আর এ একটি কথা এমন স্নেহ-সিঞ্চিত সুরে বিজড়িত যে, তারপর লতিফা আর একটি কথাও বলতে পারেনি। বেদনা সে যতই পাক, তার বুক সঙ্গে সঙ্গে গর্বেও ভরে উঠেছে যে, তার এই ছন্নছাড়া ভাইটি সর্বহারা

ভিখারিদের জন্যই আজ পথের ভিখারি। তাকে কাঙ্গাল করেছে এই কাঙ্গালদের বেদনা। গর্বে কান্নায় তার বুকের তলা দোল খেয়ে উঠল।

আজ সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে আনসার এসে চা চেয়ে যখন ইজি চেয়ারটায় ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল, তখন লতিফা খুশি যেমন হলো, তেমনি আনসারের ঐ ক্লান্তস্বরে কেমন একটু অবাকও হয়ে গেল। এমন বিষাদের সুর তার কণ্ঠে সে কোনোদিন শুনেনি।

চা এনে যখন সে পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল, তখন নাজির সাহেব আপনার মনেই রাজ্যের মাথামুণ্ডুহীন কীসব বকে চলেছেন, আর আনসার মাঝে মাঝে আনমনে হুঁ দিয়ে যাচ্ছে।

লতিফা হেসে বলল, 'আচ্ছা বেহুঁশ লোক যাহোক তুমি! কাকে বলছ আর কে শুনছে তোমার কথা, বলতো! কি ভাবছ দাদু, এমন করে!'

নাজির সাহেব বেচারা মাথা চুলকে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, 'অ! উনি আমাদের হবু ভাবী সাহেবার কথা ভাবছেন! আরে, আগে থেকে বলতে হয়? তাহলে কি আর এমন সময় এ বদরসিকতা করি! কিন্তু ভাই, তোমার এই মেথর-মুর্দাফরাশ-ভরা মনে যে কোনো সুন্দর মুখ উঁকি দিতে পারবে — সে ভরসা করতে কেমন যেন ভরসা পাচ্ছিনে।'

আনসারের মুখে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, কি দিল না। সে একমনে চা খেয়ে যেতে লাগল। চায়ের প্রসাদে ততক্ষণে তার বিষণ্নতা অনেকটা কেটে গেছে।

লতিফা নাজির সাহেবকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'তুমি থাম তো একটু! সত্যি দাদু, লক্ষ্মীটি, বল না — আজ তুমি এমন চুপচাপ কেন?'

নাজির সাহেব অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেপথ্যে বলার মতো করে বলে উঠলেন, 'বাঁদরকে কে পুয়াল-চায়া দিলে! ইয়া আল্লাহ! আল্লাহু আকবর!'

লতিফা ভুরু বাঁকিয়ে খর চোখে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আবার!'

এইবার আনসার হেসে ফেলে বলল, 'নাঃ, আর আমায় গম্ভীর হয়ে থাকতে দিলিনে দেখছি, বুঁচি!'

মেঘ অনেকটা কেটেছে দেখে লতিফা খুশি হয়ে আবদারের সুরে বলে উঠল, 'কী ভাবছিলে এতক্ষণ, বল না, দাদু!'

আনসার চায়ের প্রথম কাপটা শেষ করে দ্বিতীয় কাপটায় চুমুক দিয়ে বলল, 'যাঃ! ও কিছু না! এমনি কী যেন একটা ভাবছিলাম। দেখ বুঁচি এ-দেশের কিচ্ছু হবে না।'

লতিফা চালাক মেয়ে। আনসার এড়িয়ে চলতে চাইছে দেখে সে-ও বাঁকা পথ অবলম্বন করল। আনসারের ও-কথার উত্তর না দিয়ে সে সোজা প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা দাদু, রুবির খবর জান কিছু?'

আনসার চমকে উঠল। সে এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। দু-তিন চুমুকে চা খেয়ে অন্য দিকে চেয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, 'এইবার তার সাথে দেখা হয়েছিল রে বুঁচি।'

লতিফা আরো সরে এসে বললে, 'কোথায় দাদু? তোমায় দেখে সে নিশ্চয়ই চিনতে পারলে! কী বললে দেখে? তুমি কী করে চিনলে তাকে?'

আনসার ম্লান হাসি হেসে বলল, 'দেখা হলো ময়মনসিংহে। চিনতে দেরি না হলেও বিশ্বাস করতে দেরি হয়েছিল আমার। বেশ একটু দেরি ...' বলেই আনসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার দু-চুমুক চা খেয়ে শান্তস্বরে বলল, 'আমি ছাত্রদের একটা মিটিং-এ বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। বহু মহিলাও উপস্থিত ছিলেন সে মিটিংয়ে। ওরি মধ্যে দেখি একটি বিধবা মেয়ে দু-হাতে চিক সরিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ভাল বক্তৃতা দিতে পারি বলে শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেছিল, কিন্তু সেদিন স্পষ্টই বুঝলাম, আমার বক্তৃতা শুনে কেউ খুশি হয়ে উঠছেন না। আমার ছাত্র-বন্ধুরা হতাশ হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমার কথা তখন কেবলি জড়িয়ে যাচ্ছে।'

লতিফা রুদ্ধনিশ্বাসে শুনছিল বললে ঠিক বলা হয় না — গিলছিল যেন সব কথা। সে কান্না-দীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'রুবি বিধবা হয়েছে, দাদু?'

আনসার চায়ের কাপটায় ঝুঁকে পড়ে মুখটা আড়াল করে বলল, 'হুঁ!'

মনে হলো, সে বুঝি আর কিছু বলতে পারবে না। কেউ একটি কথাও বলল না, কেমন একটা বেদনাময় বিষণ্ণতায় সকলের মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। মেঘলা দিনের সন্ধ্যা যেমন নামে বন্ধুহীনের বিজন ঘরে।

চা তখন ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। তারই সবটা ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলে আনসার একটু অধিক সহজ সুরে বলল, 'তারপর দেখা হলো — অনেক কথাও হলো রুবির সাথে — রুবির বাবা-মার সাথে। — রুবির বাবা যে এখন ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রে বুঁচি!'

কিন্তু বুঁচি কিছু বলবার আগেই সে বলে যেতে লাগল, 'রুবির বাবা অবশ্য ভয়ে ভয়েই আমার সঙ্গে কথাবার্তা কইলেন। ওর মা কিন্তু তেমনি আদর-যত্ন করলেন আমায়। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ বারে বারে জলে ভরে উঠছিল।

লতিফা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, 'রুবি কী বললে, বল না দাদু!'

আনসার হেসে ফেলে বলল, 'বলছি থাম। রুবির বিয়ে হয়েছিল একটি আই.সি.এস. পরীক্ষার্থী ছেলের সাথে। ছেলেটি আমারই সহপাঠী ছিল — অবশ্য আমার বন্ধু ছিল না — নাম তার মোয়াজ্জেম। বিলেতে যাবার আগেই বিয়ের এক

মাসের মধ্যেই সে মারা যায়। সে আজ এক বছরেরও বেশি হলো! বিয়ের আগেই রুবি ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। এইবার প্রাইভেট আই.এ. দেবে। মনে হলো ওর বাপ-মায়ের ইচ্ছা, ওকে লেখাপড়ার মধ্যেই ডুবিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। এরজন্য যথেষ্ট খরচও করছেন তাঁরা। রুবিও খুব মন দিয়ে পড়ছে শুনলাম।'

বলে খানিক চুপ করে থেকে আনসার বলল, 'রুবির অন্তরের কথা অন্তর্যামী জানেন, তবে এই বৈধব্য তাকে বড় বেদনা দিতে পারেনি — এটা বেশ বোঝা গেল। স্বামীকে সে চেনেনি — আমার যেন মনে হলো, তাকে সে চিনবার চেষ্টাও করেনি। তার পড়বার ঘরে তার স্বামীর একটা ফটো পর্যন্ত নেই। অথবা সে যে বিধবা, একটু চেষ্টা করে সে একথা যেন জানাতে চায় তার আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছেদে, তার মা-বাবা কিছুতেই তাকে পাড়ওয়ালা কাপড় বা গয়না পরাতে পারেনি। পরে সাদা থান, জুতা পরে না, পান খায় না, — যাকে বলে সর্বপ্রকারে নিরাভরণা, কিন্তু এই নিরাভরণা রুক্ষবেশে তাকে যে কী সুন্দর দেখায় রে বুঁচি, তা যদি একবার দেখতিস! বৈধব্যের এত রূপ আর আমি দেখিনি!'

বলেই নিজের এই প্রশংসা-উক্তিতে লজ্জিত হয়ে সে নিম্নস্বরে বলল, 'কিন্তু বুঁচি, ও রূপকে ভক্তি করা যায়, ভালবাসা যায় না!'

নাজির সাহেব ফোঁস করে একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর ক্লিনশেভড গালের চিবুকের কল্পিত দাড়িতে বাম হাত বুলোতে বুলোতে বলে উঠলেন, 'সোবহান-আল্লাহ! সোবহান-আল্লাহ!'

লতিফা ও আনসার দু'জনেই এক সঙ্গে হেসে উঠল। আনসার নাজির সাহেবের ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে বলে উঠল, 'আরে বেওকুফ! এর মধ্যে লভটভের কিছু গন্ধ নেই!'

নাজির সাহেব ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'দেখ ভাই, তারকেশ্বরের ষাঁড়! এ ঘাড়ে এমন করে ধাক্কা মেরো না! এই ঘাড়ই হচ্ছে তোমার বোনের সিংহাসন। এ-ঘাড়ই যদি ভাঙে তাহলে উনি চড়বেন কোথায়?'

লতিফা হেসে বলল, 'শ্যাওড়া গাছে! বেশ, আমি পেত্নীই হলাম! এখন গোলমাল যদি কর, সত্যিই ভেঙে দেবো! বল ভাই দাদু, তারপর কী হলো?'

আনসার বলল, 'জানিস, একদিন আমি সোজা রুবিকে বললাম যে, এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও সে যে বিধবা, তা বুঝবার কষ্ট হতো না কারুর। সে বলল, কি, জানিস? সে বলল যে, সে তার বাপ-মাকে শাস্তি দেবার জন্যই অমন করে থাকে। তার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও নাকি তার বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা, এবং আবারও বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন তলে তলে — তার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই। সে একদিন তার মায়ের সামনেই আমায় বলল, 'দেখ আনু ভাই, যাকে কোনোদিনই জীবনে

স্বীকার করি নি কোনো-কিছু দিয়ে, সেই হতভাগ্যেরই মৃত্যু-স্মৃতি আমায় বয়ে বেড়াতে হবে সারাটা জিন্দেগি ভরে — নিজেকে এই অপমান করার দায় থেকে কী করে মুক্তি পাই, বলতে পার?'

আমি শিউরে উঠলাম। বললাম, 'তাই যদি সত্যি হয় রুবি, তবে এ-অপমান শুধু তোমাকে নয় — সেই মৃত হতভাগ্যকেও গিয়ে লাগছে। এ-নিষ্ঠুরতা করে কারুর কোনো মঙ্গল হবে না রুবি।'

রুবি তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'একে শুধু তুমিই নিষ্ঠুরতা বলতে পারলে। কিছু মনে করো না আনু ভাই — অতি বড় নিষ্ঠুর ছাড়া আর কেউ এত বড় কথা আমায় বলতে পারত না। তুমি শুধু এর নিষ্ঠুর দিকটাই দেখলে? যে নিষ্ঠুর করে তুলেছে আমায় তাকে দেখলে না!'

বলেই সে চলে যেতে যেতে বলে গেল, 'ফুল শুকিয়ে গেছে, কিন্তু কাঁটা তো আছে! ফুল থাকলে বুকে মালা হয়ে থাকতো, এখন কাঁটা — কেবল পায়ের তলায় বিঁধবে!'

'এর পরেও কত দিন দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে — কিন্তু আমি আর সাপের ন্যাজে পা দিতে সাহস করি নি। একেবারে কাল-কেউটে!'

লতিফা একটু উত্তেজিত স্বরেই বলে উঠল, 'কিন্তু তুমি চিনবে না দাদু, তুমি সত্যিই লক্ষ্মীছাড়া! ছোঁবল মারলেও ওর মাথায় মণি আছে। সাপের মাথার মণি সাত রাজার ধন, তা কি যে-সে পায়?'

বলেই সে চোখ মুছল! আনসার কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল।

আজ কেন যেন তার প্রথম মনে হলো সে সত্যিই দুঃখী। মানুষের শুধু পরাধীনতারই দুঃখ নাই, অন্য রকম দুঃখও আছে — যা অতি গভীর, অতলস্পর্শী। নিখিল-মানবের দুঃখ কেবলই মনকে পীড়িত, বিদ্রোহী করে তোলে, কিন্তু নিজের বেদনা — সে যেন মানুষকে ধেয়ানী সুস্থ করে তোলে। বড় মধুর, বড় প্রিয় সে দুঃখ!

সে হঠাৎ বলে উঠল, 'যেদিন আমি চলে আসি বুঁচি, সেদিন সে স্টেশনে এসেছিল। ট্রেন যখন ছাড়ে, তখন আমার হাতে একটা জিনিস দিয়ে বলল, 'এইটে বিয়ের রাতে — তোমায় মনে করে গেঁথেছিলাম। আজ শুকিয়ে গেছে, তবু তোমায় দিলাম।' — বলেই সে টলতে টলতে চলে গেল!

'ট্রেন ছাড়লে দেখলাম, একটি শুকনো মালা!'

নাজির সাহেব বলে উঠলেন, 'কী করলি ভাই, সে মালাটা?'

আনসার ধরা গলায় বলে উঠল, 'পদ্মার জলে ফেলে দিয়েছি।'

লতিফা একটি কথাও না বলে আস্তে আস্তে উঠে গেল।

উনিশ

চাঁদ সড়কে সেদিন ভীষণ একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল, মেজো-বৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে খ্রিস্টান হয়ে গেছে।

সত্যি-সত্যিই সে খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তবে তার একটু ইতিহাসও আছে।

মেজো-বৌ কিছুদিন থেকে খ্রিস্টান মিশনারির মিস জোন্সের কাছে গিয়ে একটু সেলাই ও লেখাপড়া শিখছিল। মিশনারিরা ওদের ধর্মপ্রচারের জন্যে হয়তো একটু গায়ে পড়েই দরিদ্র মুসলমান ও হিন্দুদের অসুখ-বিসুখে ওষুধ-পত্তর দিয়ে সাহায্য করে এবং তারা অনেককে তাদের ধর্মে দীক্ষিতও করতে পেরেছে। কিন্তু মেজো-বৌয়ের ব্যাপার একটু অন্য রকম।

মিস জোন্সের কি জন্য জানি না, প্রথম দেখাতেই মেজো-বৌকে চোখে ধরে গিছিল। শুধু চোখে নয়, হয়তো মনেও। মেজো-বৌয়ের নামে পাড়ায় একটা বদনামও আছে যে, ওকে একবার দেখলে ভাল না বেসে পারা যায় না।

মেজো-বৌ সুন্দরী। কিন্তু ওই সৌন্দর্যটুকুই ওর সব নয়। এক একজন মানুষের চোখে-মুখে এক একটা জিনিস থাকে, যার জন্য তাকে দেখামাত্রই মনটা খুশি হয়ে ওঠে, 'তুমি' বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। শ্রী, লাবণ্য, সুষমা — এর কোনো একটা নাম দিয়ে ওর মানে করা যায় না। অমনি মায়ামাখানো চোখ-মুখ মেজো-বৌয়ের!...

পাড়ার পুরুষ-মেয়ে সবাই বলতে লাগল, এইবার মাগিরা মেজো-বৌকে 'আড়কাঠি' করে সব বৌ-ঝিকে 'খেরেস্তান' করে তুলবে।

প্যাঁকালের মার চিৎকার ও কান্নায় সমস্ত পাড়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে কান্না-চিৎকারের দিবা-রাত্রির মধ্যে বিরাম ছিল না। কখনো তা অচল হয়ে তাদের ঘরের আঙিনা থেকেই দিগ-দিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হতে লাগল, কখনো বা সচল হয়ে চাঁদ-সড়ক থেকে কুর্শিপাড়া — কুর্শিপাড়া থেকে কাঠুর পাড়া — কাঠুর পাড়া থেকে হাটবাজার ঘুরে — গির্জা-মসজিদ প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগল।

মেম-সাহেবদের সে যে ভাষায় আপ্যায়িত করতে লাগল তার তুলনা মেলা ভার। ভাগ্যিস মেম-সাহেবরা আমাদের বাংলা ভাষার সব মোক্ষম-মোক্ষম গালির অর্থ বোঝে না, বুঝলে তারা মেজো-বৌকে কাঁধে করে তার বাড়ি বয়ে রেখে যেত।

কলকাতায় প্যাঁকালেকে খবর দেওয়া হলো। কুর্শি বিশেষ করে তাগিদ ও পরামর্শ দিতে লাগল ওদের বাড়ি এসে যে, এ সময় প্যাঁকালে এসে একটা 'ধুমখাত্তর' কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবে! চাই কি — সে যা পুরুষ মর্দ, মেম-সায়েবকেও ধরে নিয়ে আসতে পারে ইচ্ছে করলে।

পাড়ার মসজিদের মোল্লা সাহেব সেদিন মগরেবের নামাজের পর নিজে যেচে প্যাঁকালেদের বাড়ি মৌলুদের ও তৎসঙ্গে বে-ঈমান নাসারাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন। পুরুষ-মেয়েতে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল। মৌলুদ ও ওয়াজের পর স্থির হলো যে, কালই মওলানা হজরত পীর গজনফর সাহেব কেবলা ও মওলানা রুহানি সাহেবকে এই গোমরাহ বেদিনদের নসিহত ও দরকার হলে 'বহস' করার উদ্দেশ্যে আনবার জন্য লোক পাঠাতে হবে এবং তার সমস্ত খরচ বহন করবে পাড়ার লোকেরা। প্যাঁকালের মা আপাতত তার বাড়ির ছাগল কয়টা বিক্রি করে পনের টাকা যোগাড় করে দেবে। নইলে সে সমাজে 'পতিত' থাকবে।

আনসার সব শুনেছিল তার বোনের কাছে। কাজেই সে বেশ একটু উৎসাহ নিয়েই এ নিয়ে পাড়ায় কি হয় শুনতে এসেছিল মৌলুদের জলসাতে। সব শোনার পর একটি কথাও না বলে নাজির সাহেবের বাসায় ফিরে গেল।

বাসায় গিয়েই ইজি চেয়ারটাতে শুয়ে বললে, 'ওরে বুঁচি, বড্ডো মাথা ধরেছে, একটু চা দিতে পারবি?'

লতিফা হেসে বলল, 'না, পারব না! কী হলো দাদু ওদের সভায়, বললে না যে!'

আনসার তিক্তস্বরে বলে উঠল, 'ঘোড়ার ডিম! মেজো-বৌ হলো খ্রিস্টান, লাভ হলো পীর আর মওলানা সাহেবদের। আর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা — বেচারি প্যাঁকালের মা'র কপাল তো এমনিই পুড়েছে, যেটুকু বাকি ছিল — মোল্লাজি তা শেষ করে গেলেন। এরপরে যদি কাল শুনি যে, প্যাঁকালের ঘরগোষ্ঠী মিলে খ্রিস্টান হয়ে গেছে বুঁচি, তাহলে আমি কিছু বলব না।' — একটু থেমে আনসার বিষাদঘন কণ্ঠে বলে উঠল, 'বুঝলি বুঁচি, প্যাঁকালের মা এতো কেঁদে বেড়িয়েছে আজ কিন্তু আজ মৌলুদ শরীফ হয়ে যাবার পর এবং পাড়ার মোল্লা-মোড়লদের সিদ্ধান্ত শোনার পর থেকে তার কান্না একেবারে থেমে গেছে। আহা বেচারি! ঐ ছাগল কটাই তো ওর সম্বল — তাই তাকে কাল বিক্রি করতে হবে। নইলে ওর জাত যাবে পাড়ার লোকের কাছে।'

আনসার উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। লতিফার চোখ-মুখের দুষ্টুমির দীপ্তি কখন ম্লান হয়ে কান্না-সজল হয়ে উঠেছিল, তা সে নিজেও টের পায়নি। হঠাৎ সে আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'দাদু লক্ষ্মীটি, তুমি একবার কাল মেজো-বৌয়ের আর মেম-সাহেবের সাথে দেখা করতে পার? তোমার ভরসা পেলে ও খ্রিস্টান থাকবে না — এ আমি জোর করে বলতে পারি। আমরা অল্পদিন হলো কৃষ্ণনগর এসেছি, এর মধ্যেই ওর সাথে যে কয়টা দিন আলাপ হয়েছে, তাতে বুঝেছি — ও আর যাই হোক, খারাপ নয়। ও বড্ডো অভিমানিনী। পাড়ার লোকের যন্ত্রণাতেই সে খ্রিস্টান

হলো। জান দাদু, ও মেম-সাহেবের কাছে একটু যাওয়া-আসা করতো বলে পাড়ার লোকে ওদের একঘরে করবে বলে কেবলি ভয় দেখাচ্ছিল। শেষে এমন বদনাম দিতে লাগল, যে-বদনাম ওর ওপর দেওয়ার মতো মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। মানুষ দুঃখ-অভাবে পড়লে তার কি এমনি অধঃপতন হয় দাদু সকল দিক দিয়ে?...

আনসার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাত্রির তারা-খচিত আকাশের দিকে চেয়ে রইল। তার কেবলই মনে হতে লাগল — ঐ রাত্রির আকাশের মতোই অসীম দুর্জ্ঞেয় রহস্য-ভরা এই পৃথিবীর মানুষ।

লতিফা চা করবার জন্য ওঠে যাচ্ছিল, হঠাৎ আনসার বলে উঠল, 'সত্যিই রে বুঁচি, ক্ষুধিত মানুষ — অভাব-পীড়িত মানুষের মতো সকল দিকদিয়ে অধঃপতিত আর কেউ নয়! ক্ষুধা আছে বলেই ওরা কেবলই পরস্পরের সর্বনাশ করে। দু-মুঠো অন্নের অভাবে ওদের আত্মা আজ সকল রকমে মলিন। তুই বুঝবিনে বুঁচি, ওদের অভাব কত অতল অসীম, ওদের দুঃখ কত অপরিমেয়। আমি দেখেছি, ঐ হতভাগ্যদের দুর্দশার নিত্যকার ঘটনা — তাই তো আমার মুখের অন্ন এমন তেতো হয়ে উঠেছে। এক মুঠো ডাল-মাখা ভাত যখন খাই, তখন গলার ও-ধারে যেন ও আর পেরোতে চায় না, আটকে যায়। মনে হয় আকাশের ঐ তারার মতোই ক্ষুধিত চোখ মেলে কোটি কোটি নিরন্ন নর-নারী আমার ঐ এক গ্রাস ভাতের দিকে চেয়ে আছে। ওদের দুঃখ তুই বুঝবিনে বুঁচি। দু-মুঠো অন্নের জন্য ওরা মেথর হয়ে তোদের ঘরে-বাইরের সকল রকম ময়লা-নোঙরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। ধাঙ্গড় হয়ে — ভোর না হতেই তোদের গায়ের ধুলো দু-হাত দিয়ে পরিষ্কার করে পথে পথে। তাদের কথা বলিসনে বুঁচি — অন্তত ওদের দোষ দিসনে আমার কাছে কখনো। তুই তো মা, তুই কি বিশ্বাস করবি, যে, ক্ষুধার জ্বালায় মা তার ছেলের হাত থেকে কেড়ে খাচ্ছে? নিজের ছেলেমেয়েকে নরবলির জন্য বিক্রি করছে দু-মুঠো ভাতের জন্য? খোদা তোকে সুখে রাখুন, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা যে কী জ্বালা, তা যদি একটা দিনের জন্যও বুঝতিস, তাহলে পৃথিবীর কোনো পাপীকেই ঘৃণা করতে পারতিসনে। শুনবি একটা সত্যি ঘটনার কথা?'...

লতিফা চোখে হাত দিয়ে আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো, 'দোহাই দাদু, তোমার দু-পায়ে পড়ি, আর বলো না। এতেই আমার দম ফেটে যাচ্ছে।'

সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে টলতে টলতে উঠে গেল।

আনসার হেসে বলল, 'তোর সুখের অন্নকে এমন বিষিয়ে তোলা ভাল হয়নি রে বুঁচি! যাক, কাল আমি সত্যিই মেজো-বৌ আর মিস জোন্সের সাথে দেখা করব গিয়ে...!'

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে নাজির সাহেব আনসারকে বলে উঠলেন, 'কি হে! আজ নাকি শিকারে বেরুচ্ছ? দেখ দাদা, বাঘিনীর কাছে যাচ্ছ মনে রেখ!'

আনসার হেসে বলল, 'আমি শিকার করতে যাচ্ছিনে বেকুফ, আমি যাচ্ছি সুন্দরবনের বাঘকে — সুন্দরবনে ফিরিয়ে আনতে, সভ্য শিকারীর ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে।'

নাজির সাহেবও হেসে বললেন, 'অন্য শিকারীর হাত থেকে বাঁচিয়ে শেষে নিজেরই বাণ হেনে বসো না। দেখো, ও বড় শক্ত বাঘিনী হে, শেষে বাঘিনীই তোমায় শিকার করে না ফেলে।'

আনসার লতিফার দিকে আড়-চোখে চেয়ে একটু গলা খাটো করে বলল, 'রক্ষে কর ভাই, বাঘের বাচ্চা পুষবার সখ হয়নি এখনো আমার, এ আমার বাঘ শিকার নয়, এ শুধু কষ্ট স্বীকার!'

নাজির সাহেব একটু জোরেই হেসে বললেন, 'তোফা! তোফা! ওগো, আর এক কাপ চা দাও তোমার রসরাজ ভাইটিকে! কিন্তু দাদা, বাঘিনীর না হয় বাচ্চা আছে, কিন্তু ঐ সিংহী — যে ঘরে নিয়ে গেছে?'

আনসার হেসে উঠে বলে, 'ওকে সিংহী বলো না মূর্খ, ও হচ্ছে নীলবর্ণ শৃগালিনী। হাঁ, ওর কাছে আমার একটু সাবধানেই যেতে হবে! ওদের নখ-দন্তকে ভয় করিনে, ভয় করি ওদের ধূর্তামিকে। মিশনারির মেম!'

নাজির সাহেব ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাপ রে! মিশনারি! একে মিস, তাহে নারী! উঃ! একটা মিস ফর্চুন না হয়ে যায় আজ! আই মীন ফর্চুন ফর মিস!'

লতিফা ধমক দিয়ে বলে, 'দোহাই! তোমার আর রসিকতা করতে হবে না! বুড়োকালে ওঁর রস উথলে উঠল! তোমার আজ হলো কি বল তো!'

আনসার হেসে বলল, 'বুঝলিনে বুঁচি, ওঁর হিংসে হচ্ছে। একটুখানি মেম-সাহেবের সঙ্গে আলাপ করব গিয়ে, এ আর ওঁর সহ্য হচ্ছে না! তুই থাকতে তো ওঁর আর ওদিক পানে যাবার ভরসা নেই!'

লতিফা ওঠে যেতে যেতে বলল, 'আমি আজই দিগদড়ি দিয়ে ছেড়ে দিতে রাজি আছি দাদা-ভাই, কিন্তু ভয় নেই, ওঁকে কেউ ছোঁবে না!'

নাজির সাহেবও উঠে যেতে যেতে বলল, 'পেত্নীকে পেলে আর কেউ ছুঁতে সাহস করে!'

আনসার উঠে পড়ে বলল, 'তোমরা এখন কলহ কর, আমি চললাম।...'

* * *

গির্জায় গিয়ে আনসার শুনলে, মিস বাবাদের সঙ্গে দেখা করবার নিয়ম নেই। কিন্তু সে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। পাদরি সাহেবের সঙ্গে ঘণ্টা-খানিক তর্কের পর সে এই শর্তে রাজি হলো যে, হেলেন ওরফে মেজো-বৌকে আনসার শুধু জিজ্ঞেস করবে, সে স্বেচ্ছায় ক্রিশ্চান হয়েছে কি-না। তাকে প্রলোভন দেখিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে যে মিশনারিরা ক্রিশ্চান করে নাই, এ সম্বন্ধেও আনসার যথেচ্ছা প্রশ্ন করতে পারে। অবশ্য আনসারের খদ্দরের বহর ও তার 'এজিটেটর' নামের জন্যই সে এই সুযোগটুকু পেল। আনসারও সাহেবকে স্পষ্টই বলল, 'দেখ পাদরী সাহেব, আমি গেঁয়ো মোল্লা-মৌলবী নই যে, ধমকে তাড়িয়ে দেবে! মেজো-বৌ যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের ধর্ম নিয়ে থাকে, আমি কিচ্ছু বলব না। আর যদি অন্য কোনো উপায়ে ওর সর্বনাশ করে থাক, তাহলে এই নিয়ে দেশময় একটা হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দেব।'

সাহেব একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'নো মিস্টার! আপনে যথেচ্ছা প্রশ্ন করেন আমাদের ভোগ্নি হেলেনকে, আঠাট ভূটপূর্ব মেজো-বৌকে। ডেখিবেন, টাহাকে স্বয়ং ঈশ্বর সটপঠে ডাকিয়েছেন! আমরা কেহ নয়!'

আনসার মনে মনে সাহেবের 'সটপঠের' নিকুচি করে বলল, 'সাহেব, এখন একটু ডাকতে পার শ্রীমতি হেলেনকে?'

সাহেব নিজে উঠে গিয়ে একটু পরেই মিস জোন্স ও মেজো-বৌকে নিয়ে ঘরে ঢুকল!

আনসার চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, 'গুড মর্নিং মিস জোন্স! গুড মর্নিং মিস — আই মিন মিসেস হেলেন!'

মিস জোন্স স্মিতহাস্যে আনসারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল, কিন্তু মেজো-বৌ বেচারি লজ্জায় এতটুকু হয়ে আধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল! মিস জোন্সের সরোষ ইঙ্গিতেও সে কোনো রকমেই একটা নমস্কারও করতে পারল না।

মেজো-বৌ আনসারকে চিনত এবং একটু ভালো করেই চিনত। কতদিন দূর হতে তার দৃপ্ত চরণে তারই বাড়ির পাশে দিয়ে যাওয়া-আসা করবার সময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেছে। এমনি কেন যেন ওর ভালো লেগেছিল এই অদ্ভুত লোকটিকে! কতদিন সে বিনা কাজে লতিফার কাছে গিয়ে বসে থাকত এই লোকটিকে দেখবার জন্য — ওর জীবনের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প সব শুনবার জন্য। ও যেন আলেফ-লায়লার কাহিনীর বাদশাজাদা, যেন পুঁথির হরমুজ, মনু-মেহের! আজ তাকেই সামনে দেখে মর্মাহত সাপিনীর মতো সে কেবলি মুখ লুকাবার চেষ্টা করতে লাগল!

আনসার মেজো-বৌকে আবছা এক-আধটু দেখে থাকবে হয়তো! আর দেখে থাকলেও তার মনে নেই। তার কর্মময় জীবনে নারীমুখ চিন্তা তো দূরের কথা, দেখবারও ফুরসৎ নেই। সে জানে শুধু কার্ল-মার্কস, লেনিন, ট্রটসকি, স্টালিন,

কৃষক, শ্রমিক, পরাধীনতা, অর্থনীতি। পীড়িত মানবাত্মার জন্য বেদনাবোধ ছাড়াও যে অন্যরকম মন-বেদনাবোধ থাকতে পারে — এ প্রশ্ন তার মনে জেগেছে এই সেদিন। নারীকে সে অশ্রদ্ধাও করে না, নারীর প্রতি তার কোনো আকর্ষণও নেই। নারী সম্বন্ধে সে উদাসীন মাত্র।

আজ সে মুক্তাবগুণ্ঠিতা মেজো-বৌকে প্রথম চোখ মেলে চেয়ে দেখল। তাকে দেখামাত্র তার হঠাৎ যেন মনে হলো, এর যেন কোথায় রুবির সঙ্গে মিল আছে। রুবির কথা মনে হতেই বুকের কোনো এক কোমল পর্দায় যেন চিড় খেয়ে উঠল। আনসার কেমন যেন অসোয়াস্তি অনুভব করতে লাগল।

মিস জোন্স ইংরেজিতে বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি একে চেনেন না। চিনলে অন্যের কথা শুনে এর কাছে আসতেন না।'

আনসারও ইংরেজিতে বলল, 'ওকে জানি, তবে চিনিনে সত্য। ভয় নেই, আমি ওকে ফিরিয়ে নিতে আসিনি, শুধু জানতে এসেছি, ও স্বেচ্ছায় ক্রিশ্চান হয়েছে কি-না। আশা করি এ প্রশ্ন করলে, আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন না।'

মিস জোন্স তারাগ্রামের 'জি' সুরের মতো মিহিন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, 'কখনই নহে! আপনি অনায়াসে জিজ্ঞাস করিটে পারেন।'

ধন্যবাদ দিয়ে আনসার প্রায়-প্রকম্পিতা মেজো-বৌয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বলুন তো, আপনার হঠাৎ খ্রিস্টান হবার কারণ কি?'

মেজো-বৌ তার আনতনয়ন আনসারের মুখে তুলে ধরেই আবার নামিয়ে ফেলে বলল, 'আমি তো হঠাৎ খ্রিস্টান হইনি।'

আনসার হেসে ফেলে বলল, 'তার মানে, আপনি একটু একটু করে খ্রিস্টান হয়েছেন, এই বলতে চান বুঝি?'

মেজো-বৌ তার সেই যাদুভরা হাসি হেসে বলল, 'জি না! আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রিস্টান করেছেন!'

আনসার তার বিস্ময়-বিস্ফরিত চক্ষু মেলে এই রহস্যময়ী নারীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখল। তারপর সহানুভূতি-মাখা কণ্ঠে বলে উঠল, 'বুঝেছি, আমাদের ধর্মান্ধ সমাজ কত বেশি অত্যাচার করে আপনার মতো মেয়েকেও খ্রিস্টান হতে বাধ্য করেছে!'

দুঃখিনী মেজো-বৌর দুই চক্ষু এই দুটি দরদভরা কথাতেই অশ্রুতে পুরে উঠল। একটু পরেই টসটস করে তার গাল বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মিস জোন্স এবং পাদরি সাহেবের নিমেষে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। তা আনসারের নজর এড়াল না।

মিস জোন্স কিছু বলার আগেই আনসার বলে উঠল, 'ভয় করবেন না, আমি

আমার হৃদয়হীন সমাজে এই ফুলের প্রাণকে নিয়ে গিয়ে শুকিয়ে মারতে চাইনে। আমার শুধু একটি অনুরোধ, একে আপনারা মানুষ করে তুলবেন, তাহলে বহু মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে এর দ্বারা।'

মিস জোন্স ও পাদরি সাহেব দু-জনেই অতিমাত্রায় খুশি হয়ে বলল, 'ডেখুন বাবু, ইহারি জন্যে — এই মানুষেরি মুকটির জন্যেই তো আমাদের যিশু প্রেরণ করেচেন। আপনায় ডেন্যবাড, আমরা খ্রিস্টান হবার আগে ঠেকেই হেলেনকে বালো বালো কাজ শেখাচ্ছে!'

মেজো-বৌ হঠাৎ অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি কি আপনার সাথে দেখা করতে পারি — যদি কোনোদিন ইচ্ছে হয়?' — বলেই সে তার অশ্রুসিক্ত আঁখি দুটি পূজারিণীর ফুলের মতো আনসারের পানে তুলে ধরল।

আনসারের বুক কেন যেন দোল খেয়ে উঠল! এ কোন মায়াবিনী? সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই, যখন ইচ্ছা দেখা করবেন। আমাকে আপনার কোনো ভয় নেই। আপনার এই ধর্ম-পরিবর্তনে আমি অন্তত এতটুকু দুঃখিত নই। আপনার মতো মেয়েকে তার যোগ্যস্থান দেবার মতো জায়গা আমাদের এই অবরোধ ঘেরা সমাজে নেই। ... এ আমি আপনাকে দেখে এবং দুটি কথা শুনেই বুঝেছি!' বলেই একটু থেমে আবার বলল, 'আপনি যে ধর্মে থেকে শান্তি লাভ করেন করুন, আমার শুধু একটি প্রার্থনা, আপনারই চারপাশের এই হতভাগ্যদের ভুলবেন না — আপনার হাত দিয়ে যদি ওদের একজনেরও একদিনের দুঃখও দূর হয় — তবে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না। আপনার মতো সাহসী মেয়ে পেলে যে কত কাজই করা যায়?'

মেজো-বৌ তার চোখমুখ মুছে ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমায় দিয়ে আপনার কোনো কাজের সাহায্য যদি হয় জানাবেন, আমি সব করতে পারব আপনার জন্য!' — কিন্তু ঐ 'আপনার জন্য' কথাটা বুঝি তার অগোচরেই বেরিয়ে এসেছে। ঐ কথাটা বলবার পরই তার চোখমুখ লজ্জায় রাঙা টকটকে হয়ে উঠল।

আনসারের মনে হলো, সে যেন কোনো নদী আর সাগরের মোহনার উত্তাল তরঙ্গ-মধ্যে এসে পড়েছে! সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলল, 'আমায় হয়ত আপনি ভাল করে চেনেন না, লতিফা আমারই বোন। যদি ওখানে কোনো দিন যান, আমার সব কথা শুনবেন। আর দেখাও ওখানেই করতে পারেন — ইচ্ছা করলে।'

মেজো-বৌ ঠোঁটে হাসি চেপে বলে উঠল, 'আপনাকে আমি ভাল করেই চিনি। আমি ওখানেই দেখা করব গিয়ে। কিন্তু যেতে দিবেন তো ওখানে খ্রিস্টাননিকে?'

আনসার কিছু উত্তর দেবার আগেই মেজো-বৌর ছেলেমেয়ে দুটি কোথা থেকে

দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'মা, তুই ইখেনে এয়েছিস আর আমরা খুঁজে খুঁজে মরছি!'

মেজো-বৌ তাদের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ভারি গলায় বলে উঠল, 'এই দুটোই আমার শত্রু। এখানে এসে তবু দু-বেলা দুটো খেতে পাচ্ছি! ওদের উপোস করা সহ্য করতে না পেরেই আমি এখানে এসেছি।'

আনসার তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে মেজো-বৌয়ের ছেলেমেয়েকে একেবারে তার বুকে তুলে চুমো খেয়ে বলল, 'তোরা কি খেতে ভালবাসিস, বলতো!' দুই শিশুতে মিলে তারস্বরে যে সব ভালো জিনিসের লিস্ট দিল, তা শুনে ঘরের সকলে হেসে উঠল। কিন্তু হাসলেও আনসারের এই ব্যবহারে সকলের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। অতি সামান্য ঘরের ছেলেমেয়েদের কোলে তুলে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত যুবকের এই এত সহজভাবে চুমো খাওয়া তারা যেন দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না।

যাদুকরী মেজো-বৌয়ের মনে হতে লাগল, তার এতদিনের এত অহঙ্কার আজ ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। তাকে শ্রদ্ধা করবার মতো মানুষও আছে জগতে! সে তার চেয়েও বড় যাদুকর। তার কেবলি ইচ্ছা করতে লাগল, দুহাত দিয়ে, এই পাগলের ধুলো নিয়ে চোখেমুখে মেখে ধন্য হয়, কিন্তু লজ্জায় পারল না। আর কেউ না থাকলে হয়তো সে সত্যি সত্যিই তা করে ফেলত।

শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং তারো অতিরিক্ত কিছু তার সুন্দর চক্ষুকে সুন্দরতর করে তুলেছিল। তার সারা মুখে যেন কিসের আভা ঝলমল করছিল।

আনসার দুই চক্ষুর পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে মাধুরী যেন বুভুক্ষুর মতো পান করতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই সে সচকিত হয়ে মেজো-বৌয়ের ছেলেমেয়েদের হাতে দুটো টাকা গুঁজে বলল, 'এখন আসি।' বলে সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে এল।

আশ্চর্য, এবার মেজো-বৌও সলজ্জ হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিল! আনসারের উষ্ণ করস্পর্শে তার সমস্ত শরীরে যেন তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল। মনে হলো, এই নিমিষের স্পর্শ বিনিময়ে সে আজ ভিখারিনী হয়ে গেল! সে তার সর্বস্ব লুটিয়ে দিল।

মিস জোন্স এবং পাদরি সাহেব এ সবই লক্ষ করছিল। এইবার পাদরি সাহেব একটু অসহিষ্ণু হয়েই মেজো-বৌয়ের ছেলেমেয়েকে আদেশের স্বরে বলে উঠল, 'এই! টোমরা ও টাকা এখনি ফিরিয়ে ডিয়ে এস।'

সঙ্গে সঙ্গে মেজো-বৌ বলে উঠল, 'না, তোরা চলে আয়। তোদের ফিরিয়ে দিতে হবে না।' — বলেই ছেলেমেয়েদের হাত ধরে সেও বেরিয়ে গেল।

পাদরি সাহেব বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মিস জোন্সকে

ইঙ্গিতে ডেকে বহু পরামর্শের পর স্থির হলো, মেজো-বৌকে শিগগিরই অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে।

মেজো-বৌ রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই দেখল, একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে আনসার বিস্কুট কিনছে সামনের দোকান থেকে। সে একটু হাসল, সেই যাদুভরা হাসি। তারপর যেতে যেতে বলল, 'কাল সন্ধ্যায় বাড়ি থাকবেন, আমি যেমন করে পারি যাব।'

আনসার হেসে বলল, 'ধন্যবাদ, মিসেস হেলেন।'

মেজো-বৌ তিরস্কার-ভরা চাউনি হেনে চলে গেল।

আনসারের আজ পথ চলতে চলতে মনে হলো, এই ধরণীর দুঃখ-বেদনা-অভাব — সব যেন সুন্দর সুমধুর! এই পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছুই নেই, ও যেন-আনন্দেরই আর একটা দিক। সুরার মতো এর আনন্দ তিক্ত জ্বালাময়। এ সুরা যারা পান করেছে, তাদের আনন্দ সুখী মানব কল্পনাও করতে পারে না। তার পকেট উজাড় করে সে আজ রাস্তার ছেলেমেয়েদের বিস্কুট বিলাতে বিলাতে এলো। ঐ ময়লা কৃষ্ণকায় ছেলেমেয়ে — ওরা ওদের সুন্দর মায়ের সন্তান। ঐ যে মেয়েটি তাকে দেখে ঘোমটা দিয়ে চলে গেল, কি অপরূপ সুন্দরী সে। এই পৃথিবী যেন সুন্দরের মেলা! মনে পড়ল অমনি সুন্দর — তারও চেয়ে সুন্দর রুবিকে — মেজো-বৌকে।

তার দুচোখের দুই তারা — প্রভাতীর তারা, সন্ধ্যাতারা — রুবি আর হেলেন, হেলেন আর রুবি! ...

সে মানুষের জন্য সর্বত্যাগী হবে, সকল দুঃখ মাথা পেতে সহ্য করবে, তারা দুঃখী, তারা পীড়িত বলে নয়, তারা সুন্দর বলে। এ-বেদনাবোধ শুধু ভাবের নয়, আইডিয়ার নয়, এ-বোধ প্রেমের, ভালোবাসার।

কুড়ি

পরদিন যখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে তখন মেজো-বৌ গায়ে বেশ করে চাদর জড়িয়ে নাজির সাহেবের বাড়ির দিকে চলতে লাগল। কিসের যেন ভয়, কিসের যেন লজ্জা তার পা দুটোকে কিছুতেই মাটিতে ছাড়িয়ে উঠতে দিচ্ছিল না। গাঢ় অন্ধকারের পুরু আবরণও যেন তার লজ্জাকে ঢেকে রাখতে পারছিল না।

নাজির সাহেবের দ্বারে এসে হঠাৎ আনসারের স্বরে চমকিত হয়ে তার মনে হলো, এখনি সে ছুটে পালিয়ে যেতে পারলে বুঝি বেঁচে যায়! তার আজকার এই পরিপাটি করে বেশবিন্যাস যেন তার নিজের চোখেই সবচেয়ে বিসদৃশ — লজ্জার বলে ঠেকল। কিন্তু তখন আর ফিরবার উপায় ছিল না।

আনসারের দৃষ্টি অনুসরণ করে লতিফা মেজো-বৌকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে তার হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। লতিফা কিছু বলতে পারল না, কেবল তার চোখ কেন যেন ছলছল করে উঠল। মেজো-বৌও তার অশ্রু আর গোপন রাখতে পারছে না।

আনসার উদাসভাবে বুঝি-বা অন্ধকার আকাশের লিপিতে তারার লেখা পড়বার চেষ্টা করছিল।

নাজির সাহেবকে লতিফার হুকুমে প্রয়োজন না থাকলেও বাইরে যেতে হয়েছিল।

বহুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। কেবল লতিফার করতলগত হয়ে মেজো-বৌয়ের উষ্ণ করতল পীড়িত হতে লাগল। সে যেন হাতে-হাতে কথা কওয়া।

লতিফা ধরা-গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ছেলেদের আনলে না!' মেজো-বৌ সেই পুরানো মধুর হাসি হেসে বলল, 'না। তাহলে কি আর বসতে দিত? এতক্ষণ তার দাদির কাছে যাবার জন্য কান্নাকাটি লাগিয়ে দিত।' বলেই একটু থেমে আবার বলল, 'কি ভয়ে ভয়েই না এসেছি ভাই। বাড়ির কাছটাতে এসে পা যেন আর চলতে চায় না।'

এইবার আনসার কথা বলল, 'যাক, আপনার খুব সাহস আছে বলতে হবে। আমি তো মনে করেছিলাম,আপনি আসতেই পারবেন না।'

লতিফা হেসে বলল, 'দোহাই দাদু, ওকে আর 'আপনি' বলে লজ্জা দিও না।' তারপর মেজো-বৌয়ের দিকে ফিরে বলল, 'কি ভাই, তুমি বোধ হয় আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোট হবে, না?'

মেজো-বৌ হেসে ফেলে বলল, 'আমি তোমার বড় দিদির চেয়েও হয়তো বড় হব।'

আনসার হেসে বলল, 'তোমাদের বয়সের হিসেবটা পরেই না হয় করো দাঁত-টাত দেখে। এখন কাজের কথা হোক।'

মেজো-বৌ একটু নিম্নস্বরে বলে উঠল, 'কিন্তু কাজের কথা বলতে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে কারুর যদি বয়স ধরা পড়ে যায়?'

আনসার হেসে ফেলে বলল, 'ঘাট হয়েছে আমার। এখন বল তো তোমার মতলব কি? তুমি কি করবে?'

মেজো-বৌ নখ দিয়ে খানিকক্ষণ মাটি খুঁটে মুখ নিচু করেই বলল, 'করব আর কি! আমার যা করবার, তা তো এখন ঠিক করে দেবে ঐ সাহেব-মেমগুলোই। তারা আমায় কালই বোধহয় বরিশাল বদলি করবে।'

লতিফা হয়তো একটু বেশি জোরেই মেজো-বৌয়ের হাত টিপে ফেলেছিল; মেজো-বৌ 'উঃ' করে উঠল। লতিফা হেসে বলল, 'এত অল্পতে তোমার বেশি লাগে, তবু তুমি আমাদের — তোমার এই চিরকেলে ভিটে ছেড়ে যেতে পারবে? তাছাড়া, তুমি কি দারোগা-মুন্সেফ যে তোমায় বদলি করবে?'

মেজো-বৌ কেমন একরকম স্বরে বলে উঠল, 'দারোগা-মুন্সেফ নই ভাই, চোরাই মাল। বদলি কথাটা ভুল বলেছিলাম, সাবধানের মার নেই, তাই একটু সামলে রাখছে আগে থেকেই।'

লতিফা হো হো করে হেসে বলল, 'এরি মধ্যে চোরে-টোরে ঘরের বেড়া কাটতে আরম্ভ করেছে নাকি?' বলেই লজ্জা পেয়ে সপ্রতিভ হবার ভান করে উঠে যেতে যেতে বলল, 'একটু বস, আমি একটু চা করে আনি। নইলে ঐ লোকটির মেজাজকে তিনদিন ধরে জলে চুবিয়ে রাখলেও আর নরম হবে না।'

লতিফা চলে গেল। মেজো-বৌ গেল না, বা উঠে যাবার চেষ্টাও করল না। তার সবচেয়ে বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল তার সেদিনকার সুন্দর করে কাপড় পরার ঢঙটা। সে বুঝতে পারছিল, তার যত্ন করে আঁকা বে-তিল গালে কাজলের তিলটুকুও যেন আনসার লক্ষ করছে।

আনসার হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি আমার কথা রাখবে?'

মেজো-বৌ প্রথমে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জিত স্বরে বলে উঠল, 'কিন্তু আমার ইচ্ছা থাকলেও তো রাখতে পারব না।'

আনসার মেজো-বৌয়ের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, 'সত্যিই কি তুমি এদেশ ছেড়ে গিয়ে থাকতে পারবে?'

মেজো-বৌ আনসারের দিকে বড় বড় চোখ তুলে বলল, 'আর দুদিন আগে গেলে হয়তো এত কষ্ট হত না! কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তো আমি আর ঘরে ফিরতে পারব না। আমি আবার মুসলমান হয়ে ফিরে আসি — আপনি হয়তো এই বলতে চাচ্ছেন, কিন্তু আমায় জায়গা দেবে কে?'

আনসার নির্বাক হয়ে বসে রইল। সত্যই তো, সে স্বধর্মে ফিরে এলে আরো অসহায় অবস্থায় পড়বে। তার শ্বশুর-বাড়ির কুটিরে তার আর স্থান হবে না। দুদিনের জন্য হলেও কথার জ্বালায় গঞ্জনার চোটে টিকতে পারবে না।

হঠাৎ আনসার যেন অকূলে কূল পেল। সে সোজা হয়ে বসে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তুমি এইখানেই আলাদা ঘর বেঁধে থাক — আমি ব্যবস্থা করে দেবো যাতে তোমার দিন নিশ্চিন্তে চলে যায়।'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'আমায় আপনি আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন জানাজানি হলে আমাদের কি অবস্থা হবে — বুঝেছেন? আমি না হয় সইলাম সে সব, কিন্তু আপনি—'

আনসার মেজো-বৌয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'সে ভয় আমি করিনে। তাছাড়া আমি তো এখানে চিরকাল থাকছিনে। বৎসরে-দুবৎসরে হয়তো একবার করে আসব। অবশ্য এমন ব্যবস্থা করে যাব, যাতে করে আমি যেখানেই থাকি তোমায় যেন কোনো কষ্টে না পড়তে হয়।'

মেজো-বৌয়ের চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠল। এ তার দুঃখের অবসানের আনন্দে, না আনসারের অনাগত বিদায়-দিনের আভাসে — সে-ই জানে।

হঠাৎ মেজো-বৌ যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কান্না-কাতর কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'যাবেই যদি তবে এ ঋণের বোঝা চাপিয়ে যেয়ো না। আমিও কাল চলে যাই, তুমিও চলে যাও।'

বলেই সে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল। আনসার একটা কথাও বলতে পারল না। প্রস্তরমূর্তির মতো বসে রইল। তার কেবলই মনে হতে লাগল, ঐ দূর ছায়াপথের নীহারিকা-লোকের মতোই নারীর মন রহস্যময়।

একুশ

পরদিন সকাল না হতেই কৃষ্ণনগরে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল! দলে দলে পুলিশ এসে কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন বাড়িতে খানাতল্লাশ করতে লাগল। বহু ছাত্র ও তরুণকে হাজতে পুরল।

আনসারকে ধরবার জন্যে সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিশ সারা রাত্রি ধরে বাগানের গাছে, নাজির সাহেবের বাড়ির আনাচে-কানাচে পাহারা দিচ্ছিল, ভোর না হতেই তারা ঘুমন্ত আনসারকে বন্দি করল।

শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল, নাজির সাহেবের শালা আনসার রাশিয়ার বলশেভিক চর ও বিপ্লবী-নেতা। সে ছেলেমেয়ের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করছিল এবং তাদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করছিল।

সবচেয়ে বেশি ঘামতে লাগলেন সে সব ভদ্রলোক, যাঁরা নিজে বা তাঁদের কোনো আত্মীয় ধরা পড়ে নাই। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, 'বাবা! খুব বাঁচা গেছে! যে রকম জাল ফেলেছিল পুলিশ! মনে হচ্ছিল, গুগলি শামুক পর্যন্ত বাদ দেবে না।'

ওরি মধ্যে একজন বলে উঠলেন, 'আমরা চুনোপুঁটি ভায়া, চুনোপুঁটি, ওরা রুই কাতলাই ধরতে এসেছিল।'

আর একজন আর একটু মাত্রা চড়িয়ে বললেন, 'হাঁ দাদা, সরকার খলিফা ছেলে, ও ছুঁচা মেরে হাত গন্ধ করে না! মশা মারতে কামান দাগে না!'

স্বদেশ-ব্রতী বীরের দল গালি খেতে লাগল, তাদের তথাকথিত হঠকারিতার জন্য — তাদেরই কাছে বেশি, যাদের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করবার জন্য তাদের সুখের গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন হতে হয়তো চিরকালের জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আনসারের ধৃত হওয়ার সংবাদ শহরময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ল এবং সবাই জানতে পারল যে, আনসার এখনও বাড়িতে বন্দি অবস্থায় আছে। দলে দলে মেথর-কুলি, গাড়োয়ান-কোচোয়ান, কৃষক-শ্রমিকের দল নাজির সাহেবের বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। পুলিশের মার গুঁতো-চাবুক-লাথিতে ভ্রূক্ষেপ না করে তারা নাজির সাহেবের ঘর ঘিরে ফেলল। পুলিশ উপায়ান্তর না দেখে দু-একটা ফাঁকা আওয়াজও করল বন্দুকের। কিন্তু কেউ এক পাও পিছুল না। এরি মধ্যে একটা বৃদ্ধ মেথর চিৎকার করে বলে উঠল, 'হুজুর, আমাদের বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওর চেয়ে মার আর কি আছে? আমাদের বুকে বরং গুলি মার, আমাদের বাবাকে ছেড়ে দিয়ে যাও।'

ওর ক্রন্দন শুনে কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারল না!

বাইরে জনসঙ্ঘ ক্রন্দন—কাতর কণ্ঠে আকাশ-ফাটা জয়ধ্বনি করে উঠল! ও যেন বিক্ষুব্ধ গণ-দেবতার, পীড়িত মানবাত্মার হুঙ্কার!

আনসারের চোখের কানায় কানায় অশ্রু টলমল করে উঠল। সে তার শৃঙ্খলতাবদ্ধ কর ললাটে ঠেকিয়ে জনসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে নমস্কার করে বলে উঠল, 'আমি জানি, তোমাদের জয় হবে! তোমাদের কণ্ঠে স্বাধীন মানবাত্মার শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।'

প্রমত্ত জনসঙ্ঘকে কিছুতেই টলাতে না পেরে পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট আনসারের কাছে এসে বলল, 'আপনি যদি কিছু বলেন ওদের, তা'হলে বোধহয় ওরা যাবে। নইলে বাধ্য হয়ে আমাদের গুলি চালাতে হবে।'

আনসার হেসে বলল, 'আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু গুলির ভয়ে আমি যাচ্ছি না। গুলি যদি সত্যিই চালাবেন মনস্থ করে থাকেন, তাহলে গুলি চালান।' বলেই হেসে বলল, 'আমরা গুলিখোরের জাত। ওটা ধাতে সয়ে গেছে।'

সাহেব একটু হেসে বললে, 'গুলি সত্য-সত্যই চালাতে চাই না। কিন্তু আপনাকে তো থানায় যেতে হবে। ওরা আমাদের কর্তব্য কাজে হয়তো বাধা দেবে!'

আনসার তেমনি হেসে বলল, 'তাহলে আপনারাও আপনাদের কর্তব্য করবেন। কিন্তু তা বোধহয় করতে হবে না। চলুন।'

শৃঙ্খলাবদ্ধ আনসারকে দেখেই উন্মত্ত জনতা বিপুল জয়ধ্বনি করে উঠল। আনসার তাদের হাসিমুখে নমস্কার করে বলল, 'তোমরা ফিরে যাও! ভয় নেই, আমার ফাঁসি হবে না। আবার আমি ফিরে আসব তোমাদের মাঝে।' একটু থেমে উদগত অশ্রু কষ্টে নিরোধ করে বলল, 'আমার নিজের জন্য কোন দুঃখ নেই ভাই, কারণ আমার জন্য দুঃখ করবার কেউ নেই — '

অমনি সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'আছে, আছে! আমরা আছি!'

আনসার হেসে বলল, 'জানি, তোমরা আছো। কিন্তু তোমরা তো আমার জন্য কাঁদবার বন্ধু নও! আমি যদি পরাজিতই হয়ে থাকি, তোমরা জয়ী হয়ে আমার সে পরাজয়ের লজ্জা মুছে দেবে।'

অমনি সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

পুলিশ সাহেব অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেই আনসার বলল, 'ভয় পাবেন না, আমি ওদের ক্ষেপিয়ে তুলব না, শান্তই করব।'

তারপর জনগণের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'বন্ধুগণ! আমার বিদায়কালে তোমাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা তোমাদের অধিকারের দাবি কিছুতেই ছেড়ো না! তোমাদেরও হয়তো আমার মতো করেই শিকল পরে জেলে যেতে হবে, গুলি খেয়ে মরতে হবে, তোমারই দেশের লোক তোমার পথ আগলে দাঁড়াবে, সকল রকমে কষ্ট দেবে, তবু তোমরা তোমাদের পথ ছেড়ো না, এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ো না। আগের দল মরবে বা পথ ছাড়বে, পিছনের দল তাদের শূন্যস্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই আসবে তোমাদের মুক্তি। অস্ত্র তোমাদের নেই, তার জন্য দুঃখ করো না। যে বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে, সেই প্রাণশক্তিরই অভাব যদি না হয় তোমাদের, তোমরাও জয়ী হবে। আর অস্ত্রই বা নাই বলবো কেন? কোচোয়ান, তোমার হাতে চাবুক আছে? বুনো ঘোড়াকে — পশুকে তুমি চাবুক মেরে শায়েস্তা কর, আর, মানুষকে শায়েস্তা করতে পারবে না! রাজমিস্ত্রি! তোমার হাতের কন্নিক দিয়ে ফুটগজ দিয়ে এত বাড়ি-ইমারত তৈরি করতে পারলে, বুনো প্রকৃতিকে রাজলক্ষ্মীর সাজে সাজালে — পীড়িত মানুষের নিশ্চিন্তে বাস করার স্বর্গ তোমরাই রচে তুলতে পারবে। আমার ঝাড়ুদার, মেথর ভাইরা, তোমরাই তো নিজেদের অশুচি অস্পৃশ্য করে পৃথিবীর শুচিতা রক্ষা করছ, নিজে সমস্ত দূষিত বাষ্প গ্রহণ করে, আয়ুক্ষয় করে, আমাদের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছ, আমাদের চারপাশের বাতাসকে নিষ্কলুষ করে রেখেছ। তোমরা এত ময়লাই যদি পরিষ্কার করতে পারলে — তাহলে এই ময়লা-মনের ময়লা মানুষগুলোকে কি শুচি করতে পারবে না? তোমাদের মতো ত্যাগী করতে পারবে না? তোমাদের ঐ ঝাড়ু দিয়ে ওদের বিষ-ময়লা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না? — তুমি চাষা? তুমি যে হাল দিয়ে মাটির বুকে ফুলের ফসলের মেলা বসাও, সেই হাল দিয়ে কি এই অনুর্বর-হৃদয়, মানুষের মনে মনুষ্যত্বের ফসল ফলাতে পারবে না?

জনসঙ্ঘ মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করতে লাগল। সে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুলিশ সাহেব বাধা দিল।

আনসার হেসে বলল, 'ভয় নেই সাহেব। এ-রকম বক্তৃতা অনেক দিয়েছি, কিন্তু ঐ জয়ধ্বনি ছাড়া ওদেরকে খেপিয়ে তুলতে পারিনি। আজও পারব না। ক্ষেপানোর মানুষ আমার পিছনে আসছে! আমার মুখ তো বহুদিনের জন্যই এখন বন্ধ করে দেবে, যাবার বেলায় না-হয় একটু আলগাই করলুম। যাক, আমি আর কিছু বলব না। এবার ওদের ফিরে যেতেই বলব।'

বলেই জনসঙ্ঘের দিকে ফিরে বলল, 'আমার অনুরোধ, তোমরা ফিরে যাও। আমার পিছনে যদি যেতে হয়, তো সে পথ শুধু ঐ থানাটুকু বা তারো বেশি জেল পর্যন্ত, কিন্তু তোমাদের দেশ-লক্ষ্মীকে খুঁজতে হলে স্বর্ণ-লঙ্কা পর্যন্ত যেতে হবে। স্বর্গে উঠে যেতে হবে, পাতালে নেমে যেতে হবে!'

তারপর পুলিশের দিকে তাকিয়ে বলল :

'এই বেচারারা তোমাদের আমাদের মতোই হতভাগ্য, দুঃখী। পেটের দায়ে পাপ করে, দেশদ্রোহী হয়। ওদের ক্ষমা করো, দুদিন পরে ওরাও আসবে তোমাদের কমরেড হয়ে। যে মৃত্যুক্ষুধার জ্বালায় এই পৃথিবী টলমল করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে তার গ্রাস থেকে বাঁচবার সাধ্য কারুরই নেই। তোমরা মনে রেখো, তোমরা আমার উদ্ধারের জন্য এখানে আসোনি, তোমাদের সে মন্ত্র আমি কোনোদিনই শিখাইনি, তোমরা তোমাদের উদ্ধার কর — সেই হবে আমারও বড় উদ্ধার। তোমাদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমিও হব মুক্ত। এসেছ, নমস্কার নাও, আমার দোষ-ত্রুটি অপরাধ ক্ষমা করো, তারপর যদি আসতেই হয় আমার পথে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এসো আমার পিছনে। বিপুল বন্যার বেগে এসো, এক মুহূর্তের জোয়ারের রূপে এসো না। আমি ভেসে চললুম দুঃখ নেই, কিন্তু তোমরা এসো। নমস্কার!'

উপস্থিত সকলেই জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ললাটে কর ঠেকিয়ে সালাম ও নমস্কার করল।

পুলিশ আনসারকে নিয়ে গেল। আশ্চর্য! কেউ আর বাধা দিল না। থানাতেও গেল না। বজ্রগর্ভ মেঘের মতো ধীর-শান্ত গতিতে নিজ পথে চলে গেল।

যাবার সময় সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল — লতিফাকে নিয়ে। সে কেবলি ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছিল। আনসার যখন গেল তখনো সে মূর্ছিতা। আনসার নীরবে ধুলায় লুণ্ঠিতা তার ললাটে, শিরে বারবার হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, 'বুঁচি, ওঠ ওঠ। তুই অমন করিসনে। আমি আবার আসব।' আনসারের অশ্রু-সাগরে যেন অমাবস্যার রাতের জোয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ...

পরদিন প্রত্যুষে রানাঘাট স্টেশনে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় আনসার যখন গাড়ি বদল করছিল, তখন হঠাৎ চোখ পড়ল অদূরের কয়েকটি যাত্রীর প্রতি! তারা আর কেউ নয়, মিস জোন্স, মেজো-বৌ, প্যাঁকালে এবং কুর্শি।

মিস জোন্স এগিয়ে এসে হাসি চেপে বলল, 'আপনার এ অবস্টা ডেখে দুঃখিট, মিস্টার আনসার!'

আনসার হেসে বলল, 'ধন্যবাদ! তারপর, ওদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?'

মিস জোন্স বলল, 'বরিশালে! আপনাদের মেজো-বৌ তো কাল বেঁকে বসেছিল সে আর গির্জায় থাকবে না। আবার মুসলমান হবে, ঘরে ফিরে যাবে। সে কি কান্না, মিস্টার আনসার! কিন্তু আজ সকালে দেখি, এসে বলল, — এদেশে থাকতে চায় না। আজ কিন্তু সারাদিন কেঁদেছে ও। ওর মাথায় বোধহয় ছিট আছে, মিস্টার আনসার। হাঁ, আর আপনি শুনে বোধহয় খুশি হবেন, কাল প্যাঁকালেও আমাদের পবিত্র ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। কুর্শির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। যিশুখ্রিস্ট ওদের সুখী করুন। গুড বাঈ!'

ট্রেন এসে পড়ল। আনসার দেখতে পেল, ইঞ্জিনের অগ্নিচক্ষুর মতোই অদূরে দুটি চক্ষু জ্বলছে। মৃত্যুক্ষুধার মতো সে চাউনি জ্বালাময়, বুভুক্ষু, লেলিহান। সে চোখে অশ্রু নেই, শুধু রক্ত।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আনসার তার চোখের জলের ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেল, প্লাটফর্মে, কাকে যেন অনেকগুলো লোক আর মিস জোন্স ধরাধরি করে তুলছে।

রেলগাড়ির ধোঁয়ায় আনসারের চোখ এবং প্লাটফর্ম সব আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

বাইশ

সেই মাটির পুতুলের কৃষ্ণনগর! সেই ধুলা-কাদার চাঁদ-সড়ক। শুধু সড়কই আছে, চাঁদ নেই সবাই বলে, দুদিনের জন্য চাঁদ উঠেছিল, রাহুতে গ্রাস করেছে! বলেই আশেপাশে তাকায়। বিশ্বাসং নৈব কর্তব্য রাজকুলেষু।

সেই 'ওমানকাৎলি' পাড়া, সেই বাগান, পুকুর, পথ-ঘাট, কোঁদল-কাজিয়া সব আছে আগেকার মতোই। শুধু যারা কিছুতেই ভুলতে পারে না তারা ছাড়া আর সকলেই মেজো-বৌ, কুর্শি, প্যাঁকালে, আনসার — সবাইকে, সব কিছুকে ভুলে গেছে। স্মরণ রাখার অবকাশ কোথায় এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মাঝে।

অগাধ স্রোতের বিপুল আবর্তে পড়ে যে হাবুডুবু খেয়েছে, সে-ই জানে কেমন করে আবর্তের মানুষ এক মিনিট আগে হারিয়ে-যাওয়া তারই কোলের শিশু- সন্তানের মৃত্যু-কথা ভুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।

নিত্যকার একটানা দুঃখ-অভাব-বেদনা-মৃত্যুপীড়া অপমানের পঙ্কিল স্রোতে, মরণাবর্তে যারা ডুবে মরছে, তাদের অবকাশ কোথায় ক্ষণপূর্বের দুঃখ মনে করে রাখার? ওরা কেবলি হাত-পা ছুঁড়ে অসহায়ের মতো আত্মরক্ষা করতেই ব্যস্ত।

কিন্তু জীবনের সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে যে মৃত্যুর মুখে নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ করে, এই শেষ নির্ভরতার চরম মুহূর্তে বুঝি-বা তারাও স্মরণ-পথে ভিড় করে আসে — সেই চলে-যাওয়ার দল — যারা সারা জীবন তারই আগে পিছে তার প্রিয়তম সহযাত্রী ছিল।

শোকে জরায়-অনাহারে দুঃখে প্যাঁকালের মা শয্যা নিয়েছে। সে কেবল বলে, 'দেখ বড়-বৌ, জন্মে অবধি এমন শুয়ে থাকার সুযোগ আর আরাম পাইনি ... কাল থেকে এই একপাশেই শুয়ে আছি, মনে হচ্ছে এ ধারটা পাথর হয়ে গিয়েছে, তবু কি আরামই লাগছে! ... আর কারুর জন্যই ভাবি না, তোদের জন্যেও না, আমার জন্যেও না, কারুর জন্যেও না! ... খোদা যা করবার করবেন! পানিতে লাঠি মেরে তাকে কেউ ফিরাতে পারে না! যা হবার, তা হবেই!' — বলেই সে নিশ্চিন্তে-নির্বিকার চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে! হঠাৎ সে দার্শনিক হয়ে ওঠে, দুঃখ ভোলার বড় বড় কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয় — যা জীবনে তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। বলেই সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রশান্ত হাসিতে মুখ-চোখ ছলছল করে ওঠে। ও যেন সারা রাত্রি ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে পোড়া তৈলহীন প্রদীপের সলতের মতো নিববার আগে হঠাৎ জ্বলে ওঠা!

বড়-বৌ চোখ মোছে। জল এলেও মোছে, না এলে লজ্জায় চোখ ঢাকার ছলনায় মোছে।

এটুকু তো দুটো চোখ, কত জলই বা ওতে ধরে! যে রক্ত চুঁয়ে ঐ চোখের জল ঝরে, সেই রক্তই যে ফুরিয়ে গেছে।

মেজো-বৌয়ের পরিত্যক্ত সন্তান দুটি আঙিনায় খেলা করে; কেমন যেন নির্লিপ্তভাব ওদের কথায়-বার্তায় চলাফেরায় চোখে মুখে ফুটে ওঠে।

মাতৃহারা বিহগ-শাবক যেন অন্য পাখিদের সঙ্গে থেকেও দলছাড়া হয়ে ঘুরে ফেরে, কি যেন চায়, কাকে যেন খোঁজে — তেমনি!

খানিক খেলা করে, খানিকক্ষণ কাঠ কুড়োয়, খানিক অলসভাবে গাছের তলায় পড়ে ঘুমোয়, ঘুমিয়ে উঠে, আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে, তারপর বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরে। ঘরে এসেই কাকে যেন খোঁজে, কি যেন প্রত্যাশা করে, পায় না। বড়-বৌয়ের ছেলেমেয়েরা ভাব করতে আসে, ভালো লাগে না। বড়-বৌ আদর করতে আসে, কেঁদে ওরা হাত ছাড়িয়ে নেয়। অকারণ আখোট করে।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আস্তে আস্তে রুগনা শয্যাশায়ী দাদির কাছে এসে বসে। ছেলেটি গম্ভীরভাবে বলে, 'দাদিমা, আজ ভাল আছিস?' বৃদ্ধা হেসে বলে, 'আর দাদু, ভালো! এখন চোখ দুটো বুঁজলেই সব ভাল-মন্দ যায়।' তারপর দার্শনিকের মতো

শান্তস্বরে বলে, 'দেখ দাদু, আমি চলে গেলে তোরা কেউ কাঁদিস না যেন। মানুষ জন্মালে মরে। ছেলেমেয়ে, মা-বাপ কারুর কি চিরদিন থাকে?'

শ্রীমান দাদু এ-সবের এক বর্ণও বোঝে না, হাঁ করে চেয়ে থাকে।

মা-বাপের নাম শুনতেই ঢুলতে ঢুলতে খুকি বলে ওঠে, 'দাদি, তুই আব্বার কাছে যাবি? আচ্ছা দাদি, আব্বা যেখানে থাকে সেই বেশি দূর, না, মা যেখানে থাকে সেই বরিশাল বেশি দূর?'

শান্ত বৃদ্ধা ছটফট করে ওঠে। একটা ভীষণ যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে পাশ ফিরে শুয়ে বলে, 'ঐ বরিশালই বেশি দূর, ঐ বরিশালই বেশি দূর!'

খুকি বুঝতে পারে না। তবু ক্লান্ত-কণ্ঠে বলে, 'তাহলে আমি আব্বার কাছে যাব। আচ্ছা দাদি, আব্বার কাছে যেতে হলে কদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়! তুই তো বিছানায় শুয়ে অসুখ করেছিস, তারপর সেখানে যাচ্ছিস! আমারও এইবার অসুখ করবে, তারপরে আব্বার কাছে চলে যাব! মা ভালবাসে না, খেরেস্তান হয়ে গিয়েছে! হারাম খায়! থুঃ! ওর কাছে আর যাচ্ছি না, হুঁ হুঁ!'

বৃদ্ধা শুয়ে শুয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে। মনে হয়, কামারশালে বুঝি পোড়া কয়লা জ্বালাতে হাপরের শব্দ হচ্ছে!

দাওয়ার মাটিতে শুয়ে পড়ে জড়িতকণ্ঠে খুকি আবার জিজ্ঞাসা করে, 'হেঁ দাদি, আব্বা যেখানে থাকে সেখানে সন্ধ্যাবেলায় কী খেতে দেয়? আমি বলি দুধ-ভাত, হানপে বলে গোশত-রুটি!' ... কিন্তু দাদির উত্তর শোনার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে!

ছেলেটি জেগেই থাকে। কি সব ভাবে, মাঝে মাঝে রান্না ঘরের দিকে চায়। সেখানে অন্ধকার দেখে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে না।

কিন্তু থাকতেও পারে না। আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায়! দাদি চেঁচিয়ে ওঠে, 'অ হানপে কোথায় যাচ্ছিস রে এই অন্ধকারে?' অন্ধকারের ওপার থেকে উত্তর আসে, 'মজিদে শিন্নি আছে, আনতে যাচ্ছি।'

বড়-বৌ মসজিদের দ্বার থেকে কোলে করে আনতে চায়, সে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। বলে, 'যাব না, আমি শিন্নি খাব, আমার বড্ডো ক্ষিদে পেয়েছে গো! আমি যাব না।'

মসজিদের ভিতর থেকে মৌলবী সাহেবের কণ্ঠ ভেসে আসে। কোরানের সেই অংশ — যার মানে — 'আমি তাহাদের নামাজ কবুল করি না, যাহারা পিতৃহীনকে হাঁকাইয়া দেয়!' মৌলবী সাহেব জোরে জোরে পাঠ করেন, ভক্তরা চক্ষু বুজিয়া শোনে।

অন্ধকার ঘরে ক্ষুধাতুর শিশুর মাথার ওপর দিয়ে বাদুড় উড়ে যায় — আসন্ন মৃত্যুর ছায়ার মতো।

ঘুমের মাঝে খুকি কেঁদে ওঠে, 'মাগো আমি আব্বার কাছে যাব না! আমি তোর কাছে যাব, বরিশাল যাব।'

খণ্ড অন্ধকারের মতো বাদুড় দল তেমনি পাখা ঝাপটে উড়ে যায় মাথার ওপর — রাত্রি শিউরে ওঠে।

তেইশ

বহুদিন পরে লতিফার মুখে হাসি দেখা দিল। নাজির সাহেব অফিস থেকে এসেই ঘুমন্ত লতিফাকে তুলে বললেন, 'ওগো, শুনেছ? রুবির বাবা যে নদীয়ার ডিস্ট্রিক্ট-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন!'

এক নিমেষে লতিফার ঘুম যেন কোথায় উড়ে গেল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বলল, 'সত্যি বলছ? মিস্টার হামিদ একা এলেন, না, রুবিও সঙ্গে আছে?'

ধড়া-চূড়া খুলতে খুলতে নাজির সাহেব বললেন, 'তা তো ঠিক জানিনে। তবে কে যেন বলল, হামিদ সাহেবের ছেলেমেয়েরাও এসেছে সঙ্গে।'

লতিফার চোখ কার কথা ভেবে বাষ্পাকুল হয়ে উঠল! মনে মনে বলল, 'সেই তো এলি হতভাগী, দু-দিন আগে এলে হয়তো একবার দেখতে পেতিস!'

পরদিন বিকালে লতিফার দোরে একটা প্রকাণ্ড মোটর এসে দাঁড়াল। লতিফা দোরে এসে দাঁড়াতেই মোটর হতে এক শ্বেতবসনা সুন্দরী হাস্যোজ্জ্বল মুখে নেমে এল।

লতিফা তাকে একেবারে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলল, 'রুবি, তুই! তুই এমন হয়েছিস?' বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রুবি ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ! কাঁদবি তো এখনি চলে যাব বলে দিচ্ছি! মাগো তোদের চোখের জল যেন সাধা; কোথায় এতদিন পরে দেখা, একটু আনন্দ করবি, তা না, কেঁদেই ভাসিয়ে দিচ্ছিস।'

লতিফা চোখ মুছে বলল, 'সেই রুবি, তুই এই হয়েছিস! তখন যে তোর মতন কাঁদুনে কেউ ছিল না লো আমাদের দলে, আর এখন এমনি পাথর হয়ে গেছিস?'

রুবি লতিফার গাল টিপে দিয়ে বলল, 'পাথর নয় লো, বরফ! আবার গ্রীষ্মকাল এলেই গলে জল হয়ে যাব!' বলেই তার ছেলেমেয়েদের আদর করে, চুমু খেয়ে, কোলে নিয়ে চিমটি কেটে কাঁদিয়ে, তারপর মিষ্টি, কাপড় দিয়ে ভুলিয়ে — বাড়িটাকে যেন সরগরম করে তুললো!

পাড়ার অনেক মেয়ে জুটেছিল, কিন্তু রুবির এক হুমকিতে সব যে যেখানে পারল সরে পড়ল! বাপ! ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে!

রুবি হেসে বলল, 'জানিস বুঁচি, আমি বেশি লোক দেখতে পারিনে! একপাল লোক মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, ভাবতেও যেন অসোয়াস্তি লাগে। ওদের তাড়িয়ে দিতে কষ্ট হয়, কিন্তু না তাড়িয়ে যে পারিনে ভাই।'

বুঁচি ওরফে লতিফা হেসে বলল, 'তুই ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে, তাই ওরা অমন চুপ করে সরে গেল, নইলে এমন ভাষায় তোর তাড়নার উত্তর দিয়ে যেত যে, কানে সিল-মোহর করতে ইচ্ছে করত।'

রুবি দুষ্টু হাসি হেসে বলল, 'তাহলে তুই বেশ খাঁটি বাংলা শিখে ফেলেছিস্ এতদিনে?'

লতিফা হেসে বলল, 'হাঁ, তা আমি কেন, আমার ছেলেমেয়েরাও শিখে ফেলেছে। এমন বিশ্রী পাড়ায় আছি ভাই, সে আর বলিসনে। ছেলেমেয়েগুলোর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। কিন্তু ও কথা যাক, ছেলেমেয়েগুলোকে ছেড়ে একটু স্থির হয়ে বস দেখি, কত কথা আছে জানবার, জানাবার। যেতে কিন্তু বেশ দেরি হবে তোর, মোটর ফিরে যেতে বল, রাত্রে খেয়ে দেয়ে যাবি।'

রুবি আনন্দে ছেলে-মানুষের মতো নেচে উঠে সোফারকে গাড়ি নিয়ে যেতে বলল এবং ঝিকে ঐ সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে তার মাকে ভাবতে মানা করে রাত্রি দশটায় গাড়ি আনতে বলে দিল।

রুবি ছুটে এসে লতিফার পালঙ্কের উপর সশব্দে শুয়ে পড়ে লতিফাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'বাস, এইবার আর কোনো কথা নয়। তুই তোর সব কথা বল, আমি আমার সব কথা বলি।' বলেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ও বাবা, এখুনি আবার তোর নাজির সাহেব আসবে বুঝি? ওকে কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে বাইরে ভাগিয়ে দিবি।'

তার কথা বলার ধরনে লতিফা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, 'দাঁড়া, মিনসে আসুক, তখন তোকে ধরিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ছি। কিন্তু ভয় নেই তোর, আজ উনি শিকারে বেরিয়েছেন! ফিরতে রাত বারোটার কম হবে না।'

রুবি লতিফার পিঠ চাপড়ে বলল, 'ব্রাভো! তবে আজ আমাদের পায় কে! গ্র্যান্ড গল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।'

লতিফা হেসে বলল, 'গল্প করলে তো পেট ভরবে না। তার চেয়ে বরং চল রান্নাঘরে আমি পরোটা করব, আর তুই গল্প করবি।'

রুবি হেসে বলল, 'তাই চল ভাই, কতদিন তোর হাতের রান্না খাইনি।'

পরোটার নেচি করতে করতে রুবি বলল, 'আমি কি করে তোর খবর পেলুম জানিস?' বলেই একটু থেমে বলতে লাগল, 'একদিন কাগজে পড়লুম, তোদের বাড়িতে মিঃ আনসারকে পুলিশ এ্যারেস্ট করেছে!' বলেই রুবি হঠাৎ চুপ করে গেল।

লতিফার হাসিমুখ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলল, 'আমিও তোর কথা প্রথম শুনি দাদা-ভাইয়ের কাছে! দাদু এখন স্টেট-প্রিজনার হয়ে বন্দি আছেন, শুনেছিস বোধহয়!'

রুবি তার ডাগর চোখের করুণ দৃষ্টি দিয়ে লতিফার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, 'হাঁ, জানি। খবরের কাগজে সব পড়েছি। আচ্ছা ভাই বুঁচি, ভাই তোকে কিছু বলছিল আমার সম্বন্ধে?'

লতিফা শান্ত কণ্ঠে বলল, 'হাঁ, বলেছিল! আচ্ছা রুবি আমার কাছে লুকোবিনে, বল?'

রুবি স্থির কণ্ঠে বলে উঠল, 'দেখ ভাই বুঁচি, আমি আমার মনের কথা কারুর কাছেই গোপন রাখিনে। এরজন্য আমায় চরম দুঃখ পেতে হয়েছে, তবু মনকে চোখ ঠারতে পারিনি। তুই যা জিজ্ঞাসা করবি তা জানি!'

লতিফা রুবির দিকে খানিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই তোর স্বামীকে ভালবাসতিস?'

রুবি সহজ শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'না। সে তো আমার ভালবাসা চায়নি, আমিও চাইনি। সে চেয়েছিল আমাকে বিয়ে করে ধন্য করার দাবিতে বিলেত যাওয়ার পথ-খরচা। তা সে পেরেছিল। কিন্তু কপাল খারাপ, সইল না, বেচারার জন্য বড় দুঃখ হয় বুঁচি।' একটু থেমে আবার বলতে লাগল, 'মৃত্যুর দিন-কতক আগে সে তার ভুল বুঝতে পেয়েছিল। এই ভুলই হয়তো তার কাল হলো। আমি সেবা-শুশ্রূষা সবই করেছি, অবশ্য আমাকে খুশি করতে নয়, তাকে আর আমার বাপ-মাকে খুশি করতে। কিন্তু একদিন সে ধরে ফেলল আমার ফাঁকি! সে স্পষ্টই বলল, 'তুমি আমায় ভালবাস না, এর চেয়ে বড় দুঃখ আমার আর নেই রুবি। আমার সবচেয়ে কাছের লোকটিই সবচেয়ে অনাত্মীয়, এ ভাবতেও আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হয়তো আমি বাঁচতুম, কিন্তু এর পরে আমার বাঁচবার আর কোনো সাধ নেই।'

লতিফার যেন শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল। সে আর বলতে না দিয়েই প্রশ্ন করল, 'এ শুনেও তুই চুপ করে রইলি?'

রুবি তেমনি সহজভাবে নেচি করতে করতে বলল, 'তাছাড়া আর কি করব বল? একজন ভদ্রলোককে চোখের সামনে মরতে দেখলে কার না কষ্ট হয়! কিন্তু সে কষ্ট কোনোদিনই আত্মীয়-বিয়োগের মতো পীড়াদায়ক মনে হয়নি আমার কাছে।'

লতিফা চমকে উঠল। যেন হঠাৎ সে গোখরো সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলেছে! কিন্তু ইচ্ছা করেই সে এর পরেও আর কোনো প্রশ্ন করল না। তার মনে হতে লাগল, সে যেন ক্রমেই পাষাণ-মূর্তিতে পরিণত হতে চলেছে। যা শুনল, যা দেখল, তা যেন কল্পনারও অতীত। এমন নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি কোনো মেয়ে করতে পারে, ভাবতেও তার যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসতে লাগল।

রুবি অদ্ভুত রকমের হাসি হেসে বলে উঠল, 'শুনে তোর খুব ঘেন্না হচ্ছে আমার ওপর, না? তা আমার বাপ-মাই ঘেন্না করেন, তুই-তো তুই। কিন্তু বুঁচি, তুই শুনে আরও আশ্চর্য হয়ে যাবি যে, যেদিন আনু ভাইকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে কাগজে পড়লুম, সেইদিনই মনে হলো, আমার সুন্দর পৃথিবীকে কে যেন তার স্থূল হাত দিয়ে তার সমস্ত সৌন্দর্য লেপে-মুছে দিয়ে গেল! ঐ একটি ছাড়া, পৃথিবীতে আর কারুর জন্যই আমার কোনো দুঃখ-বোধ নেই।'

বলতে বলতে তার স্থির তীব্র চক্ষু অশ্রুভারে টলমল করে উঠল।

লতিফা একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বলে উঠল, 'কিন্তু ভাই, এ কি মস্ত বড় অন্যায় নয়?'

রুবি চোখের জল মুছবার কোনো চেষ্টা না করে ততোধিক শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠল, 'আমার হৃদয়-মনকে উপবাসী রেখে অন্যের সুখের বলি হতে না পারাটাই বুঝি খুব বড় অন্যায় হয় তোদের কাছে, বুঁচি? হয়তো তোদের কাছে হয়, আমার কাছে হয় না। আমার ন্যায়-অন্যায় আমার কাছে। অন্যকে খুশি করতে গিয়ে সব কিছু উপদ্রব নীরবে সইতে পারাটাই কিছু মহত্ব নয়! আমার বাপ-মার স্নেহ-ভালোবাসার ঋণ শোধ করতে গিয়েই তো আমি আজ এমন দেউলিয়া! আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জীবনের আনন্দের পথ বেছে নেবার আমারই কোনো অধিকার থাকবে না?' বলেই নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল, 'আমার স্বামী মহৎ, ভাগ্যবান এবং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে সারা জীবন দুঃখ পাওয়ার দায় থেকে বেঁচে গেলেন!'

লতিফার মনে হতে লাগল পৃথিবী যেন টলছে। তার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। কোনো রকমে কষ্টে সে বলতে পারল, 'মেয়েমানুষ কী করে এমন নিষ্ঠুর হয়, আমি যে তা ভাবতে পারছিনে রুবি! কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে!'

রুবি এইবার হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু সে হাসিতে কোনো রসকষ নেই। ততক্ষণে নেচি তৈরি করা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে হাত ধুতে ধুতে বলল, 'দেখ বুঁচি, পানি চমৎকার শীতল পানীয় দ্রব্য, কিন্তু সেই পানি যখন আগুনের আঁচে টগবগ করে ফুটতে থাকে, তখন তা গায়ে পড়লে ফোসকা ত পড়বেই! — কিন্তু তোর তাওয়ায় যে ধোঁয়া উঠে গেল, নে, এখন পরোটা কটা ভেজে নে!'

লতিফা যন্ত্র-চালিতের মতো পরোটা হালুয়া চা তৈরি করে রুবির সামনে ধরল।

রুবি হেসে বলল, 'এসব কিছু আমি বাড়িতে খাইনে, আজ তোর কাছে খাব।'

লতিফা বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু মেলে রুবির দিকে তাকিয়ে রইল। সে যেন কিছু বুঝতে পারছিল না।

রুবি হেসে বলল, 'নে, খা এখন। এ সবের মানে তুই বুঝবিনে। দেখছিস তো, আমি থাকি হিন্দু-বিধবাদের মতো। একবেলা খাই, তাও আবার নিরামিষ। ঘি খাইনে, চা, পান তো নয়ই। সাদা থান পরি, তেল দিইনে চুলে। এই সব আর কি! এখন বুঝলি তো?'

খেতে খেতে হেসে ফেলে বলল, 'যে স্বামীকে স্বীকার করল না, তার আবার বৈধব্য! আমারই তো হাসি পায় সময় সময়!'

লতিফা একটু ক্রুদ্ধস্বরেই বলে উঠল, 'বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে রুবি।'

রুবি সে কথার উত্তর না দিয়ে চা খেতে খেতে বলল, 'আঃ, এই একটু চা পেলে আনু ভাই কেমন লাফিয়ে উঠত আনন্দে, দেখেছিস!'

লতিফা এইবার হাঁফ ছেড়ে বেঁচে বলে উঠল, 'সত্যি ভাই রুবি, দাদু বোধহয় তোর চেয়েও চায়ের কাপকে বেশি ভালবাসে!'

রুবি গম্ভীর হবার ভান করে বলে উঠল, 'তার কারণ জানিস? বুঁচি? চায়ের কাপটা যত সহজে মুখের কাছে তুলে ধরা যায়, আমায় যদি অমনি করে হাতে পেয়ে মুখের কাছে তুলে ধরে পান করতে পেত তোর দাদু, তাহলে আমিও ঐ চায়ের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে উঠতুম!' বলেই হেসে ফেলল।

লতিফা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে বলল, 'ওমা, তুই কি বেহায়াই না হয়েছিস্ রুবি! একেবারে গেছিস!'

রুবি সায় দিয়ে বলে উঠল, 'হাঁ, একেবারেই গেছি, আর ফিরব না।'

চা খাওয়া শেষ হলে রুবি বলে উঠল, 'শুধু একজনের জন্য ঐ চা-টার ওপর লোভ হয়।'

রুবির অতিরিক্ত প্রগলভতায় ক্ষুব্ধ হয়ে লতিফা বলে উঠল, 'এতই যদি তোর লোভ, তাহলে চা-খোর লোকটাকে বেঁধে রাখলিনে কেন? তাহলে সেও বাঁচত, তুই বাঁচতিস। আমরাও বাঁচতাম।'

রুবি বিনা-দ্বিধায় বলে উঠল, 'একটা ভুল বললি ভাই বুঁচি। আমরা হয়তো বেঁচে যেতুম সত্যি, কিন্তু তোর দাদু বাঁচত না।'

লতিফা বোকার মতো খানিকটা তাকিয়ে থেকে বলল, 'তার মানে?'

রুবি লতিফার হাতে কটাস করে চিমটি কেটে দিয়ে বলল, 'মর নেকি! তাও বুঝলিনে!' তারপর একটু থেমে বলল, 'যে মরেনি তার আবার বাঁচা কি! তোর দাদু তো আমার মতো মরেনি। দিব্যি জ্বল-জ্যান্ত বেঁচে থেকে কুলি-মজুর নিয়ে মাঠে-ঘাটে চরে খাচ্ছে। আমার একটা বড় দুঃখ রইল ভাই, যার জন্যে মরলুম, তাকে মেরে যেতে পারলুম না।'

লতিফা কতটা কূল পেয়ে হেসে বলল, 'বাপ রে! কি দস্যি মেয়ে তুই! শোধ না নিয়ে যাবিনে! তা তোকে একটা খোশ-খবর দিচ্ছি ভাই। সে হয়তো মরেনি তোর মতো, কিন্তু ঘা খেয়েছে।'

রুবি একেবারে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'না, না, এ হতেই পারে না! ও শুধু মানুষেরই বাইরের দুঃখকে দেখেছে, ভিতরের দুঃখ দেখবার ওর ক্ষমতা নেই, হৃদয় বলেই কোনো কিছুর বালাই নেই ওর! ও শুধু তাদেরই দুঃখ বোঝে, যারা ওর কাছে কেবলি পেতে চায়। যে তাকে তার সর্বস্ব দিয়ে — চেয়ে নয়, সুখী হতে চায়, তার দুঃখ ও বোঝে না, বোঝে না।'

খুলে-পড়া এলোচুলের মাঝে রুবির চোখ আঁধার বনে সাপের মানিকের মতো জ্বলতে লাগল।

লতিফার চোখ দুঃখে, আনন্দে, গর্বে ছলছল করে উঠল। তার দাদুকে এমন করে ভালবাসবারও কেউ আছে। সে রুবিকে একেবারে বুকে চেপে ধরে শান্তস্বরে বলল, 'তোর অভিমানের কুয়াশায় কিছু দেখতে পাচ্ছিস্‌নে রুবি, আমিও তো মেয়ে মানুষ। আমি সত্যি বলছি, সে তোকে ভালবাসে।'

রুবির চোখের বাঁধ ছাপিয়ে জল ঝরতে লাগল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দগ্ধ দুপুরে বর্ষা নামার মতো।

লতিফা তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'আমার দুঃখ হচ্ছে রুবি, ভালবাসার এই অতলতার সন্ধান পেয়ে তার কারাবাসও বেহেশতের চেয়ে মধুর হয়ে উঠত। তুই ভালোবাসিস শুধু এইটুকুই সে জানে। তার তল যে এত গভীর, তা বোধ হয় জানে না!' বলেই রুবির গাল টিপে হেসে বলল, 'জানলে দেশসেবা ছেড়ে গিয়ে কোনদিন তোর পদসেবা শুধু করত।'

রুবি কিন্তু এর পরে একটি কথাও কইল না। অতল পাথরের ঝিনুক যেমন দিনের পর দিন ভেসে বেড়ায় ঢেউ-এ ঢেউ-এ, একবিন্দু শিশিরের আশায়, স্বাতী নক্ষত্রের শিশিরের আশায়, তারপর সেই শিশিরটুকুও বুকে পেয়েই সে জলের অতল তলে ডুবে যায় মুক্তা ফলাবার সাধনায় — এও তেমনি।

'সেও ভালোবাসে' শুধু এইটুকু সান্ত্বনাতেই যেন রুবির বুক ভরে উঠল। শুধু এই একবিন্দু শিশিরের প্রতীক্ষাতেই যেন সে তার তৃষ্ণার্ত মুখ তুলে অনির্দেশ শূন্যের পানে তাকিয়ে ছিল। তার বুক ভরে উঠেছে। তার মুখের বাণী মূক হয়ে গেছে। সে আর কিছু চায় না। এইবার সে মুক্তা ফলাবে। সে অতল তলে ডুবে গেল।

ঝিনুকের মুখে একবিন্দু শিশির! নারীর বুকে একবিন্দু প্রেম!

আকাশের এক কোণে এক ফালি চাঁদ! কোন মাসের চাঁদ জানে না, তবু রুবির মনে হতে লাগল, ও যেন ঈদের চাঁদ! ওর রোজার মাস বুঝি শেষ হলো আজ।

আকাশের কোলে একটুকু চাঁদ, শিশু-শশী। ও যেন আকাশের খুকি। সাদা মেঘের তোয়ালে জড়িয়ে আকাশ-মাতা যেন ওকে কোলে করে আঙিনায় দাঁড়িয়েছে।

অমনি খুকি ...

লজ্জায় রুবির মুখ রুবির মতই লাল হয়ে উঠল। এ কি স্বপ্ন! এ কি সুখ!

চব্বিশ

বরিশাল। বাংলার ভিনিস।

আঁকাবাঁকা লাল রাস্তা। শহরটিকে জড়িয়ে ধরে আছে ভুজ-বন্ধের মতো করে।

রাস্তার দুধারে ঝাউগাছের সারি। তারই পাশে নদী। টলমল টলমল করছে —বোম্বাই শাড়ি-পরা ভরা-যৌবন বধূর পথ-চলার মতো। যত না চলে, অঙ্গ দোলে তার চেয়ে অনেক বেশি।

নদীর ওপারে ধানের ক্ষেত! তারও ওপারে নারিকেল-সুপারি কুঞ্জঘেরা সবুজ গ্রাম, শান্ত নিশ্চুপ। সবুজ শাড়ি-পরা বাসর-ঘরের ভয়-পাওয়া ছোট্ট কনে-বৌটির মতো।

এক আকাশ হতে আর-আকাশে কার অনুনয় সঞ্চরণ করে ফিরছে, 'বৌ কথা কও। বৌ কথা কও।'

আঁধারের চাদর মুড়ি দিয়ে তখনো রাত্রি অভিসারে বেরোয়নি। তখনো বুঝি তার সান্ধ্য প্রসাধন শেষ হয়নি। শঙ্কায় হাতের আলতার শিশি সাঁঝের আকাশে গড়িয়ে পড়েছে। পায়ের চেয়ে আকাশটাই রেঙে উঠেছে বেশি। মেঘের কালো খোঁপায় তৃতীয়া চাঁদের গোড়ে মালাটা জড়াতে গিয়ে বেঁকে গেছে। উঠোনময় তারার ফুল ছড়ানো।

তিন-চারটি বাঙালি মেয়ে, কালোপেড়ে শাড়ি পরা, বাঁকা সিঁথি, 'হিল-সু' পায়ে দেওয়া, — ঐ রাস্তারই একটা ভগ্নপ্রায় পুলের উপর এসে বসল। মাথার ওপর ঝাউ শাখাগুলো প্রাণপণে বীজন করতে লাগল।

মাঝে মাঝে স্থানীয় জমিদারদের দু-একটি মোটর ফিটন যেতে যেতে মেয়েগুলির কাছে এসে গতি শ্লথ করে আবার চলে যেতে লাগল।

একটি মেয়ে ছাড়া আর সকলে মশগুল হয়ে গল্প জুড়ে দিল। একটা মেয়ে একটু দূরে নেমে ঘাসের ওপর বসে একদৃষ্টে নদীর দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল, জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সে নিজেই বলতে পারত না।

অনেকক্ষণ গল্প-গুজবের পর দলের একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মেজো-বৌ, এখানে একলাটি বসে কার কথা ভাবছ ভাই?'

মেজো-বৌ উত্তর দিল না।

মেয়েটি তখন ওঠে গিয়ে তাকে একটু জোর করেই নিজেদের কাছে এনে বসিয়ে হেসে বলল, 'জান, মেম-সায়েবের হুকুম তোমাকে চোখে চোখে রাখার! সরে পড়ো না যেন ভাই, তাহলেই গেছি!'

মেজো-বৌ ম্লান হাসি হেসে বললে, 'না, সে ভয় নেই। আর সরে পড়লেও তো ঐ নদীর জল ছাড়িয়ে বেশি দূর যাব না!'

অস্তমান তৃতীয়া চাঁদের মুখ ম্লান হয়ে উঠল তার হাসিতে। ঝাউগাছগুলোর জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

যে মেয়েটি কথা বলছিল, তার নাম মিনতি।

মেজো-বৌয়ের প্রায় সমবয়সী। হিন্দুঘরের বৌ ছিল সে। স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে খ্রিস্টান হয়ে ডাইভোর্স নিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

লেখাপড়া-জানা মেয়েদের শিক্ষয়িত্রীরও কাজ করে।

এই মেয়েটিই মেজো-বৌয়ের একমাত্র বন্ধু। চোখের জল বদল-করা সই।

অন্য দুটি মেয়ের একজন বলে উঠল, 'আচ্ছা ভাই, ওর মেজো-বৌ নাম কি আর ঘুচবে না?'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'তালগাছ না থাকলেও তালপুকুর নামটা কি বদ্‌লে যায়?'

তেমনি জোর-করা হাসি! বুকের সলতে জ্বালিয়ে প্রদীপের আলো দেওয়ার মতো।

মিনতি মেজো-বৌকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে বলে উঠল, 'তা ভাই, ওকে ঐ নামে ডাকতেই আমার তো বেশ মিষ্টি লাগে। মনে হয় বেশ ঘর-সংসার করে জা-ননদ মিলে সব আছি!'

অন্য মেয়েটি কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুর করে গেয়ে উঠল, 'হায় গৃহহীন, হায় গতিহারা!' তারপর কথায় একটু নুন-লঙ্কা মিশিয়ে বলল, 'তা ভাই, তোমাদের ঘরের

সাধ এখনো মেটেনি। তা দুধ খাওয়ার সাধই যদি জেগে থাকে, এ ঘোল খেয়ে খামকা সর্দি করছ কেন?'

মেজো-বৌ ঝালটুকু সয়ে নিয়ে বলল, 'তা ভাই, মাথায় ঘোল ঢালার চেয়ে পেটে ঘোল ঢালা বরং সইবে!'

মেয়েটির গোপন দুর্বলতায় ঘা দিল গিয়ে এই ওস্তাদি মারটুকু। সে মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল, 'মেজো-বৌও কথা শিখেছে দেখছি।'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'তার চেয়ে বল মানুষ হয়ে উঠলাম। আমরা কৃষ্ণনগরের মেয়ে ভাই, আমাদের কথা শিখতে হয় না! মায়ের পেট থেকেই কথা শিখে আসে আমাদের দেশের মেয়ে! কিন্তু তুমি রেগো না ভাই, আমি সত্যিই তোমাদের সঙ্গে মিশতে পারবার মতো হইনি। এই তো জোর করে ফ্যাশন করে শাড়ি পরাচ্ছ, বাঁকা সিঁথি কেটে দিচ্ছ, জুতোও মিললো কপালে, কিন্তু ও জুতো-শাড়ি দিয়েও কি তোমাদের মতো করে তুলতে পারলে। মেম-সায়েবদের জুতো মেম-সায়েবদের মাথায় থাক ভাই, আমি সাদা কাপড় পরে থাকতে পারলেই নিশ্বাস ফেলে বাঁচি!'

মেয়েটি একটু তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, 'তাহলে এখানে এলে কেন?' তার এই খাপছাড়া প্রশ্নে সে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে উঠল এবং সেই কারণেই ততোধিক রেগে গেল।

মেজো-বৌ তেমনি হাসিমুখে বলল, 'আমি তো মেম-সায়েব হতে আসিনি ভাই, মানুষ হতে এসেছিলাম। আলো-বাতাস প্রাণের বড় অভাব আমাদের সমাজে, তাই খাঁচার পাখির মতো শিকলি কেটে বেরিয়ে পড়েছিলুম। কিছু যে ভাল হয়নি আমার, তা বলব না। এখন যা শিখেছি, তাতে করে যেখানেই থাকি দুটো পেটের ভাত যোগাড় করবার অসুবিধে হবে না। কিন্তু কি করি, চিরজন্মের অভ্যেস, ঐ জুতোটুতোগুলো পরলে মনে হয় পায়ে এ এক নতুন রকমের শিকলি পড়ল!'

মিনতি উঠে পড়ে বলল, 'আচ্ছা, এইবার থেকে তুমি লুঙ্গি পরে থেকো, আমি বলে দেব গিয়ে! জুতোটুতো তোমার পোড়া কপালে সইবে না! এখন চল, রাত্তির হয়ে যাচ্ছে।'

সকলেই ওঠে পড়ল। ...

একটু না যেতেই প্যাঁকালের সঙ্গে দেখা হলো। সে পাদরি সাহেবের সুপারিশের জোরে এখানে এসেই ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের পিওনের পদ লাভ করেছে। এখন আর সে প্যাঁকালে নয়, তার নাম এখন জোসেফ! ম্যাজিস্ট্রেট ডাকে, 'জোসেফ!' আনন্দে প্যাঁকালে প্রায় কেঁদে ফেলে! 'হুজুর' বলে 'পড়ি কি মরি' বলে ছুটে এসে আড়াই হাত লম্বা এক কুর্নিশ ঠোকে। শ্রীমতি কুর্শি ওরফে মিসেস প্যাঁকালে মিশনারি মেমদের

ফাই-ফরমাশ খেটে দেয়, তার জন্য কুড়ি টাকা করে পায়। প্যাঁকালে পনের আর কুর্শি কুড়ি, মোট পঁয়ত্রিশ। দিব্যি হেসে খেলে সংসার চলে। কুর্শি প্যাঁকালেকে বড় একটা কেয়ার করে না, সে পাঁচ টাকা বেশি রোজগার করে। প্যাঁকালে কিছু বললে, বলে, 'আমি তোর খাই নাকি রে মিনসে? বেশি টকখাই টকখাই করিসনে।' বলে গরব করে চলে যায়।

প্যাঁকালে না খেয়েই অফিসে চলে যেতে চায়। বলে, 'আমি ম্যাজিস্টরের পিয়ন। তোর মতো কত বিশ টাকা আমার কাছার তলায় ঝোলে। তোর মেম সায়েবকে শুধোয় কে!'

ঘরের বাইরে পা দিতেই কুর্শি কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে বলে, 'যা দিকিন দেখি!' বলেই খপ করে কোঁচটা ধরে ফেলে। বলে, 'আর এক পা এগুবি তো কেলেঙ্কারি বাধিয়ে দেবো! কাপড় কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবো!' বলেই কোঁচায় হেঁচকা টান দেয়।

প্যাঁকালে অসহায় অবস্থায় সেখানে বসে পড়ে, বলে, 'ছেড়ে দে বলছি শালি! নইলে দিলুম ধুমাধুম। ... হেই কুর্শি, তোর পায়ে পড়ি। কেউ দেখতে পাবে এখুনি! আল্লার কিরে! যিশু খ্রীস্টের কিরে! মাইরি বলছি, আর কখখনো কিছু বলব না!' বলেই নাকে কানে হাত দেয়।

কুর্শি কোঁচা ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বসে পড়ে। বলে, 'চল, খাবি! খেয়ে তোর ম্যাজিস্টর খসমের কাছে গিয়ে রাগ দেখাস।'

বারো-আনা দিগম্বর প্যাঁকালে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে! তারপর খেয়ে-দেয়ে গুড়-গুড় করে অফিসে যায়। যাবার সময় বলে যায়, 'শালার মেয়ে-মানুষকে বিয়ে করার মতন গুখুরি কাজ আর নেই! তোকে যদি আর কখনো বিয়ে করি, আমার বাপের— '

কুর্শি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। বলে, 'আসতে যদি পাঁচ মিনিট দেরি করবি, তাহলে আজ মেম-সায়েবের কাছে গিয়ে শুয়ে থাকব।'

সেদিন রাস্তায় মেজ-বৌকে দেখে পূর্ব অভ্যাসমতো বলে উঠল, 'মেজো-ভাবি, তোমাকেই খুঁজছি আমি।'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'কেন, কুর্শি আজও তাড়িয়ে দিয়েছে? আচ্ছা কুকুরে-ভালবাসা তোমাদের যা-হোক!' বলেই পুরানো দিনের মতো মিষ্টি করে হাসে। অন্ধকার মেঘে বিজলির ক্ষণিক ছটা!

ঐ হাসির মানে আগে প্যাঁকালে বুঝত না। কিন্তু এখন সে ঝানু হয়ে না গেলেও ডাঁশিয়ে উঠেছে, কাজেই ও হাসিতে বেশ একটু যেন চমক ওঠে। আঁধার রাতে বিজলি আর সাপ দুটোই চমকে দেয়।

প্যাঁকালে একটু থেমে তার পাশের মেয়েগুলোর দিকে আধা-কটাক্ষে চেয়ে নিয়ে বলল, 'বাড়ি থেকে একটা চিঠি এসেছে, বিকেলে তুমি যদি একটু পড়ে দিয়ে আস।'

মেজো-বৌকে কে যেন হঠাৎ চাবুক মারল, চমকে উঠল সে! মুখ কেমন হয়ে গেল, আবছা আঁধারে ভালো দেখা গেল না। কিন্তু গলার স্বর শুনে মনে হলো, কে যেন তার টুটি টিপে ধরেছে।

মেজো-বৌ শক্ত মেয়ে। তবু সে আজ সামলাতে পারল না। কম্পিত দীর্ঘ কণ্ঠে বলে উঠল, 'চল, এখনি তোমার বাড়ি চল।'

প্যাঁকালে বলতে যাচ্ছিল, 'আজ আর না-ই গেলে, কাল — '

মেজো-বৌ বলল, 'না, না, এখখনি চল!' বলেই সে প্রায় ছুটে প্যাঁকালের বাড়ির দিকে চলতে লাগল। তার সঙ্গে যে আর কেউ ছিল, বা তাদের কোনো কিছু বলবার দরকার, সে সব ভাববারও যেন অবসর ছিল না তার।

মিনতি প্যাঁকালেকে বলে দিল, সে যেন মেজো-বৌয়ের চিঠি পড়া হলেই তাকে সঙ্গে করে রেখে দিয়ে যায়।

দূর থেকে দেখা গেল, মেজো-বৌ তেমনি বেগে ছুটেছে ঘরের পথে।

হাউই যেমন বেগে আকাশে ওঠে, তেমনি বেগেই মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে।

পঁচিশ

মেজো-বৌ ঝড়ের মতো প্যাঁকালের ঘরে এসে ডেকে উঠল, 'কুর্শি!'

মেজো-বৌয়ের এমনতর স্বর কুর্শি কখনো শুনে নাই। সে ভয় পেয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই মেজো-বৌ বললে, 'কি চিঠি এসেছে দেখি।'

কুর্শি নিঃশব্দে চিঠি এনে দিল। তারও তখন পা কাঁপছে! তারা আসা অবধি এই এক বছরের মধ্যে কারুর কোনো চিঠি পায়নি। হঠাৎ আজ বিয়ারিং চিঠি দেখে সকলেই মনে করছিল, না জানি কার কোন দুঃসংবাদ আছে এতে!

মেজো-বৌ হেরিকেনের কাছে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিঠি খুলে খানিকটা পরেই একেবার মাটিতে পড়ে চিৎকার করে উঠল, 'খোকা! খোকা বাপ আমার!'

ততক্ষণে প্যাঁকালে এসে পড়েছিল। সে আসতেই মেজো-বৌ একেবারে তার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে বলে উঠল, 'আমার খোকা বুঝি আর বাঁচে না ভাই! সে তার এই পোড়াকপালি মাকে দেখতে চায়। আমায় নিয়ে চল 'তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আমায় নিয়ে চল!' বলেই সে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল।

প্যাঁকালে, কুর্শি বহু কষ্টে মূর্ছা ভাঙালো।

আজ এক বৎসর বরিশাল এসেছে ওরা। এর মধ্যে কেউ কোনো চিঠি দেয়নি। মেজো-বৌ কিসের যেন আতঙ্কে কৃষ্ণনগরের নাম পর্যন্ত শুনলে পালিয়ে যেত। তার কেবলি মনে হতো, এই বুঝি তার খোকা-খুকির অসুখের খবর এসে পড়ল। সে দিনরাত প্রার্থনা করতো, ওরা ভাল থাক কিন্তু কোনো চিঠি যেন কোনো দিন না আসে। কিন্তু সোয়াস্তিও ছিল না তার, সে ঘুমে-জাগরণে — সবসময় যেন তার ক্ষুধাতুর শিশুদের কান্না শুনতে পেত। সে রাক্ষুসী! ইচ্ছা করেই ছেলেমেয়েদের ফেলে এসেছিল। চলে আসার দিন তাকে যেন ভূতে পেয়েছিল! তাকে এদেশ ছেড়ে যেতে হবে, শুধু এই কথাই তার মনে হয়েছিল। সে যে মা, সে কথা সেদিন সে ভুলে গিয়েছিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মেজো-বৌ আবার সমস্ত চিঠিটা পড়ল। প্যাঁকালের মা চিঠি লিখেছে — লিখেছে মানে কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। খোকার অর্থাৎ মেজো-বৌয়ের ছেলের ভয়ানক অসুখ, টাইফয়েড। বোধহয় বাঁচবে না। যে ছেলে এক বছর ধরে ভুলেও তার মায়ের নাম মুখে আনেনি, সে আজ বিকারের ঘোরে কেবলি বলছে, 'আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল!' প্যাঁকালের মাও মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু মরবার আগে সে যেন যার ছেলে তার হাতেই দিয়ে যেতে পারে। ছেলের কান্না শুনে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, আর ওর রাক্ষুসী মার মন গলবে না!

* * *

সেইদিন রাত্রেই মেজো-বৌ, প্যাঁকালে, কুর্শি কৃষ্ণনগর যাত্রা করল। যাবার আদেশ পেতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মিশনারি কর্তারা মেজো-বৌকে ভাল করেই চিনতেন। কাজেই তাঁরা আপত্তি করলেও যাওয়া বন্ধ করতে সাহস করলেন না।

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ়তর হয়ে আসছে, সেই সময় তারা কৃষ্ণনগর স্টেশনে এসে পৌঁছল। এই একটা বছরের মধ্যে কত পরিবর্তনই না হয়ে গেছে এর! মেজো-বৌয়ের শোকাচ্ছন্ন চোখের মলিন দৃষ্টির ম্লানিমা লেগে স্টেশনের কয়লা-রঞ্জিত পথ যেন আরো কালো হয়ে উঠল। তার মনে হলো, কে যেন তার স্থূল হাতের কর্কশ পরশ বুলিয়ে সেই পূবের কৃষ্ণনগরের সব সৌন্দর্য মুছে দিয়ে গেছে।

একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে ওঠেই মেজো-বৌ বলল, 'খুব জোরে হাঁকাও।' এতক্ষণ এত দূর পথে আসতে যে হৃদস্পন্দনের চঞ্চলতা তাকে অধীর করে তোলেনি, স্টেশনে নেমেই তার সেই চঞ্চলতা যেন শতগুণে বেড়ে উঠল। একবার মনে হলো, এ রাস্তার যেন শেষ না হয়। এই গাড়ি যেন এই রকম করে অনন্তকাল ধরে ছুটতে থাকে। ... হয়তো এতক্ষণে তার খোকার মুখে 'মা' ডাক নিঃশেষিত হয়ে গেছে!

কোচোয়ানের চাবুক খেয়ে ঘৃত-পক্ক অশ্বিনী-কুমারদ্বয় যেটুকু স্পিড বাড়ালে, তাকে ঘোড়া-দৌড় ঠিক বলা চলে না, সে কতকটা খোঁড়া-দৌড়! তাতে যেমনি হাসি পায়, তেমনি অসহায় জীবগুলির প্রতি করুণায় মন ভরে ওঠে। কিন্তু ঘোড়ার চেয়েও আর্তনাদ করতে লাগল গাড়ির চাকাগুলো। তারা যেন আর গড়াতে পারে না। পথের বুকে মুখ ঘষে যেন তাদের প্রতিবাদ-ক্রন্দন জানাতে থাকে। রাস্তাও তেমনি। যেন দাঁত বের করে মিউনিসিপ্যালিটিকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে!

ঢিকুতে ঢিকুতে গাড়ি এসে প্যাঁকালেদের বাড়ির দোরে লাগল। ভিতর থেকে কোনো শব্দ শোনা গেল না। ভিতরে কেউ আছে বলেও মনে হলো না। একটা মৃৎ-প্রদীপের ক্ষীণ-শিখার আশ্বাসও নেই সেখানে।

মেজো-বৌয়ের বুক অজানা আশঙ্কায় হা হা করে উঠল! তার অন্তরে যেন অনন্ত আকাশের শূন্যতায় রিক্ত আর্তনাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল। সে টলতে টলতে গাড়ি থেকে নেমে দোরের গোড়ায় আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'খোকা!'

কে যেন তার টুঁটি চেপে ধরেছে।

শূন্য ঘরের বুক থেকে কার যেন ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা গেল! ও আর্তনাদ যেন এপারের নয়, সাঁত্‌রে পার হওয়া নদীর পারের শ্রান্ত যাত্রীর।

প্যাঁকালে ততক্ষণে বন্ধ ঘরের আগোড় খুলে ঢুকে পড়েছে। তার পায়ে কঙ্কালের মতো কি একটা ঠেকতেই সে চিৎকার করে উঠল, 'মা! মা!'

হঠাৎ রান্নাঘরের দোর খুলে গেল; এবং তার ভিতর থেকে বড়-বৌ বেরিয়ে এসে ভয়াতুর শীর্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

মেজো-বৌয়ের মূর্ছাতুর কণ্ঠে আর একবার শুধু একটু অস্পষ্ট অনুনয় ধ্বনিত হলো, 'খোকা, আমার খোকা কই?'

বড়-বৌ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'রাক্ষুসী, এতদিনে এলি! খোকা নেই! কাল সকালে সে চলে গেছে!'

মেজো-বৌ 'খোকা' বলেই আহত বিহগীর মতো সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল! ... প্যাঁকালে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'বড়-বৌ, কী ভীষণ অন্ধকার! আর সহ্য করতে পারছিনে, বাতি, বাতি কই?'

বড়-বৌ তেমনি কান্না-দীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'বাতি নেই! সব বাতি নিবে গেছে! ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই!'

প্যাঁকালে উন্মাদের মতো ভাঙা ঘরের চালা থেকে একরাশ পচা খড় টেনে জ্বালিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'তা হলে ঘরই পড়ুক!'

সেই রক্ত-আলোকে দেখা গেল, প্যাঁকালের মা তার কঙ্কাল আর আবরণ চামড়াটুকু নিয়ে তখনো ধুঁকছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়!

প্যাঁকালে 'মা' বলে তার বুকে পড়তেই বৃদ্ধার চক্ষু একটু জ্বলে উঠেই পরক্ষণে নিবে গেল চিরকালের জন্যে!

চালের খড় তখনো ধু ধু করে জ্বলছে, ওদেরি বুকের আগুনের মতো। একটু পরে সে অগ্নিশিখাও যেন অতি শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

ছাব্বিশ

পাড়ার লোক মেজো-বৌকে দেখলে বলে, 'ও রাক্ষুসী! ওর বুকে শুধু লোহা আর পাথর!'

খোকা চলে গেছে। মেয়ে পটলিকে নিয়েই মেজো-বৌ আবার আগের মতো পান খেয়ে, রেশমি চুড়ি পরে, বাঁকা সিঁথি কেটে, চওড়া কালো-পেড়ে শাড়ি পরে পাড়া বেড়ায়।

মাত্র মাস খানেক হলো ছেলে মরেছে!

মূর্ছাভঙ্গের পরই মেজো-বৌ উন্মাদিনীর মতো তার ছেলের যা কিছু স্মৃতি-চিহ্ন যেখানে ছিল, মায় শতছিন্ন কাঁথাটি পর্যন্ত, — সব পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে! এই এক বছর ধরে গোপনে সে যে-সব খেলনা সঞ্চয় করে রেখেছিল, তাও ঐ সঙ্গে পুড়িয়েছে।

তার হৃদয়ের সমস্ত শোক-জ্বালাকেও যেন ঐ দিনই চিরদিনের মতো ভস্মীভূত করে দিয়েছে। তারপরে নিজেই সে আগুন নিবিয়েছে কলসি কলসি চোখের জল ঢেলে! আজ যেন তার আর কোনো শোক নেই, কোনো দুঃখ-গ্লানি নেই! চোখের জলও যেন ঐ সঙ্গেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে!

এ যেন তার আর এক জন্ম! সে যেন নবজন্মের নতুন লোকের নতুন মানুষ।

মেয়ে পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়, তার যত্ন নেয় না। ও যেন ওর মেয়েই নয়। কেউ বলে, শোকে পাগল হয়েছে, কেউ বলে রসের পাগল!

ঐ ঘরেই সে থাকে, মিশনারির সাহেব-মেমদের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সে সেখানে যায়নি, কিন্তু আবার তৌবা করে মুসলমানও হয়নি।

প্যাঁকালেকে স্থানীয় খান বাহাদুর সাহেব একটা কুড়ি টাকার চাকুরি জুটিয়ে দেওয়াতে সে আবার কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। কুর্শির বাবা মধু ঘরামি অনেক

দিন আগেই মারা গেছে। কাজেই কুর্শিও কেঁদে-কেটে শেষে প্যাঁকালের ধর্মকেই গ্রহণ করেছে। সুতরাং ওদের দিন বেশ এক রকম চলে যাচ্ছে।

শুধু মেজো-বৌ যেন ঘরে থেকেই ঘরের কেউ নয়। এর-ওর বাড়ি যায় এবং যায় একটু বাড়াবাড়ি রকমেরই ধোপ-দোরস্ত হয়ে! কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোক তাকে একখানা চৌকি এগিয়ে দেয়। তাদের ধারণা, মেজো-বৌ এই এক বছরে না জানি বহু সাহেব-কাপ্তেন পাকড়ে টাকার কুমির হয়ে এসেছে! দুঃখ-ধান্ধা করে খায়, কাজেই আগে থেকে একটু মুখের ভাবটা থাকলেও হয়তো বা কালে-কাবুসে হাত পাতলে কোন না দুটো টাকা পাওয়া যাবে!

সত্যি-সত্যিই মেজো-বৌ কিছু টাকা জমিয়েছিল, কিন্তু সে দু-একশো মাত্র, ওর বেশি নয়। তাই সে বিবিয়ানি করে উড়াচ্ছে, এরপর কি হবে, বা কি করে চলবে, সে চিন্তাও যেন সে করে না।

তার টাকার লোভে বাড়ির লোকেও কেউ কিছু বলতে সাহস করে না।

পাড়ার মোড়ল হিসেবি লোক, অনেক চিন্তার পর সে স্থির করল যে, পাড়ার কোনো মুসলমান ছোকরাকে দিয়ে ওর রসস্থ মন ভুলাতে পারলে একে অনায়াসেই স্বধর্মে ফিরিয়ে এনে একজন নাসারাকে মুসলিম করার গৌরব ও পুণ্যের অধিকারী হতে পারবে। কাজেই সে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না এ নিয়ে। কি জানি, যদি বেশি টানে দড়ি ছিঁড়ে যায়!

কেউ কিছু বললে মোড়ল হেসে বলে, 'বাবা, এখন দিগদড়ি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। যাবে কোথা? একটু চরে খাক, তারপর ঘরের গাই ঘরে ফিরে আসবে!'

মোড়লের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে তারা ফিরে যায়।

মেজো-বৌ লতিফার কাছেই যায় সবচেয়ে বেশি করে। লতিফা যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ, তাতে করে সে চিরকাল হৃদয়টাকেই বড় করে দেখতে শিখেছে। মেজো-বৌয়ের ভিতরের যে আগুন সে দেখেছিল, তাকেই সে শ্রদ্ধা করে। কাজেই তাকে স্বধর্মে ফেরানো নিয়ে কোনোদিনই পীড়াপীড়ি করেনি! নাজির সাহেব বেচারা একেবারে যাকে বলে মাটির মানুষ। এ নিয়ে ওঁর কোনো মাথা-ব্যথা নেই। শুধু লতিফাকে রহস্যের ছলে এ নিয়ে একটু চিমটি কাটেন মাত্র। বলেন, 'দেখো গো, শেষে তুমিও যেন আড়কাঠির পাল্লায় পড়ে আমায় অকূলে না ভাসাও!'

লতিফা হেসে বলে, 'তুমি তো ভাসবার মতো হালকা নও, তোমার বরং ডুবারই বেশি ভয়। তা সে দিক দিয়ে ভয় আমারই বেশি! আমিই তো খাল কেটে বেনোজল আর কুমির দুই-ই ঘরে আনছি!'

নাজির সাহেব নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'নাঃ! ডুববার মতোই বপুটা স্থূল হচ্ছে বটে! এইবার থেকে রাত্তিরে উপোস দিয়ে এ

বরবপু একটু হালকা করতে হবে — অন্তত ভেসে যাবার মতো!'

লতিফা নাজির সাহেবের গায়ে খুতকুড়ি দিয়ে কটাস করে রাম-চিমটি কেটে বলে, 'ষাট! বালাই! তোমায় কে মোটা বলে! তার চোখে ভ্যালার আঠা দিয়ে দেবো!'

নাজির সাহেব 'উহু উহু' করে ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে বলেন, 'বাপ রে বাপ! আগে জানলে কে এ শূর্পনখাকে বিয়ে করত ...'

সেদিন সকালে উঠেই মেজো-বৌ হঠাৎ বলে উঠল, 'বড়-বু! আমি আজ পাড়ার সমস্ত ছেলেদের খাওয়াব!'

বড়-বৌ বুঝতে না পেরে বলল 'কেন?'

মেজ-বৌ সহজ কণ্ঠেই বলল, 'আজ খোকার চালশে।'

বড়-বৌয়ের দুই চোখ জলে ভরে উঠল। সত্যি তো আজ চল্লিশ দিন হলো খোকা চলে গেছে! মেজো-বৌ তাহলে ভোলেনি। ভুলবার ভান করে মাত্র। বড়-বৌ চোখের জল মুছে বলে উঠল, 'তা তোর ছেলের নামে খাওয়াবি, ওতে আমাদের কি বলবার আছে ভাই! কিন্তু একবার পাড়ার মোড়ল আর মৌলবী সাহেবকে তো বলতে হয়।'

মেজো-বৌ তেমনি শান্তকণ্ঠে বলল, 'না ওদের কাউকে বলব না। শুধু ছোট ছোট খোকাদের ডেকে নিজে রেঁধে খাওয়াব।'

বড়-বৌ কেঁদে ফেলে বলল, 'ওরে পাগলি! মোড়ল না বললে, কেউ যে তার ছেলেকে তোর হাতের রান্না খেতে দেবে না!'

মেজো-বৌ একটু থেমে বলে উঠল 'ওঃ, আমি যে খ্রিস্টাননি। তা যে করেই হোক, আমি খাওয়াবই।' বলেই সে কিছু না বলে মোড়লের বাড়ি গিয়ে হাজির হলো।

মোড়ল দেখল, এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সুযোগ। এই সুযোগ ছাড়লে তবে আর ঘরে ফেরানো যাবে না। সে খুব ভাল মানুষ সেজে বলল, 'তা কি করব বল মা, তুই তো আমার মেয়ের মতোই! খ্রিস্টানের হাতে আমি বললেও কেউ খাবে না। মরে গেলেও না।'

মেজো-বৌয়ের দগ্ধ-চোখে সহসা যেন অশ্রু পুঞ্জীভূত মেঘ ঘনিয়ে এল। তার মনে পড়ল কতদিন অনাহারে কাটিয়ে তার খোকা চলে গেছে! তার সমস্ত মন যেন হাহাকার করে আর্তনাদ করে উঠল। সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। ডুকরে কেঁদে উঠে সামনের উঠানে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগল, 'আমি আজই মুসলমান হব! আমার খোকার আত্মা যেন চিরকালের ক্ষুধা নিয়ে না ফিরে যায়!'

মোড়ল যেন হাতে চাঁদ পেল। সে তখনি উঠে মেজো-বৌকে তুলে বলল, 'এই তো মা, এতদিনে মানুষের মতো, মায়ের মত কথা বললি। তোর খোকা মরবার সময় পর্যন্ত বিকারের ঘোরে বলেছে, 'মা, তুই খেরেস্তান, তোর হাতের পানি খাব না।' তুই মুসলমান হয়ে ওর ফাতেহা না দিলে ওর শান্তি হবে।'

মেজো-বৌ দুই কানে আঙুল দিয়ে বলে উঠল, 'আর ওর নাম করো না আমার কাছে। ওর কোনো কথা বলো না। আজ পাড়ার সব ছেলেই আমার খোকা।'

মোড়ল মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'তাই হোক! ওরাই তোর খোকা হোক। ওদের খাইয়ে, কোলে করে তুই তোর খোকার শোক ভোল।'

মেজো-বৌ চলে গেলে মোড়ল আপন মনেই বলে উঠল, 'রাক্ষুসী হলেও মা ত! নাড়ির টান যাবে কোথায়?'

সাতাশ

পাড়ার প্রায় শতাধিক ক্ষুধাতুর শিশুকে পরিপাটি করে মেজো-বৌ খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় করে যখন লতিফার বাড়ি এসে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাইরে রুবির প্রকাণ্ড মোটরকার দাঁড়িয়ে।

কি যেন এক নিবিড় প্রশান্তিতে আজ মেজো-বৌয়ের বুক ভরে উঠেছে। ঐসব ক্ষুধাতুর শিশুদের খাওয়াতে খাওয়াতে, তাদের প্রত্যেককে আদর করতে কোলে করতে করতে তার মনে হচ্ছিল, তার খোকা হারায়নি! সে এই ক্ষুধাতুর শিশুদের মাঝেই শত শিশুর রূপ ধরে এসেছে! তাদের আদর করে চুমু খেয়ে বুকে চেপে তার সাধ যেন আর মিটতে চায় না। যে খোকাকে দেখে, তার মুখেই সে তার খোকার মুখ দেখতে পায়! আজ যেন সে জগজ্জননী!

সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো ও তারা নয়, ওর খোকা! ঐ দূরলোকে থেকে তার মাকে ফিরে পেয়ে হাসছে। ঐ আকাশের মতো বিরাট উদার খোকার মায়ের কোল।

এক আকাশ—মাতার কোলে শত-সহস্র তারা — খোকা-খুকি!

সন্ধ্যাতারার পাশেই চতুর্থী তিথির চাঁদ। ও যেন খোকার বাঁকা হাসি। ও যেন খোকার ডিঙ্গি। খোকা বাণিজ্যে বেরিয়েছে — তার মাকে রাজরানী করবার দুঃসাহসে মণিমানিক্য আনতে শূন্যে পাড়ি দিয়েছে। না, না — ও যেন খোকার হাতে ছেনি-দা! দুষ্টু ছেলে দা হাতে গহন বনে পালিয়েছে, তার দুঃখিনী মায়ের জন্যে কাঠ কেটে আনবে। না, না — ও ওর মায়ের জন্যে ঐ শূন্যে ঘর তুলছে মেঘের ছাউনি দিয়ে! আকাশে আকাশে সারাদিন খেলা করে ফিরবে, পালিয়ে বেড়াবে, তারপর সন্ধ্যাবেলায় ঐখানটিতে ঐ উঠোনে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আমি এসেছি, আমি হারিয়ে যাইনি।'

মেজো-বৌর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠতেই তার মনে হলো, ঐ তারার চোখও যেন ঝিকমিক করে উঠেছে! খোকার চোখে জল! না না, আর কাঁদবে না সে! ও যে সকল দেশের সকল লোকের সকল মায়ের খোকা সে! ও কি কারুর একলার? এক মার কাছে এসেছিল, আদর পায়নি, আর এক মার কাছে চলে গেছে! তবু তো সে

আছে! ঐ তারায়, ঐ চাঁদে, ঐ আকাশের কোথাও না কোথাও সে আছেই আছে! যেখানে খুঁজি, সেখানেই যে ওকে দেখতে পাই! দুষ্টু ছেলে, কখনো ভিখারিনীর কোলে খিদের ছল করে কাঁদে, কখনো পিতৃমাতৃহীনের ছল করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে বেড়ায়, কখনো মারহাট্টা মায়ের ওপর রাগ করে পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে, কখনো দুলালি মায়ের কোলে সোনাদানা পরে হাসে। ও কি খোকা, ও যে সর্বগ্রাসী, রাক্ষস! সমস্ত বিশ্বকে যে ও ওর রূপ দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে।...

মেজো-বৌয়ের এত রূপ বুঝি কেউ কখনো দেখেনি। লতিফা, রুবি একসঙ্গে চমকে উঠল! এ তো মানুষ নয়! ... মেজো-বৌয়ের চোখে তখন বিশ্বমাতার পরিপূর্ণ দীপ্তি!

মেজো-বৌ হাসতে হাসতে বসে পড়ে বলল, 'এই মাত্তর খোকাদের খাইয়ে এলুম। ওদের খাওয়াতে বড্ডো দেরি হয়ে গেল ভাই, তাই আজ আর আসতে পারিনি! যা সব দুষ্টু ছেলে!'

একি অপূর্ব কণ্ঠস্বর! এ কি প্রশান্ত গভীর স্নেহ! সকলের মন যেন জুড়িয়ে গেল!

মেজো-বৌ এমন করে কথাগুলি বলল, যেন তারই কোলের খোকাদের খাইয়ে-দাইয়ে শান্ত করে তবে আসতে পারল!

লতিফা কিছুই বুঝতে পারল না! শুধু রুবির চোখ ফেটে জল এল! সে মনে মনে মেজো-বৌকে নমস্কার করে বলল, 'তোমার আর ভয় নেই। তুমি ভয়ের সাগর উতরে গেছ!'

লতিফা বিমূঢ়ের মতো প্রশ্ন করে বসল, 'কার খোকা মেজ-বৌ?'

রুবি জোরে লতিফার হাত টিপে দিতেই তার হুঁশ হলো। সে ভুলেই গেছিল যে, আজ মেজো-বৌ তার খোকার নামে পাড়ার খোকাদের খাওয়াল! তার এই অমার্জনীয় ভুলের জন্য সে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগল মনে মনে। না জানি মেজো-বৌয়ের শোকার্ত মাতৃহৃদয়ে কত ব্যথাই সে দিয়েছে! তাড়াতাড়ি এদিক থেকে মন ফেরাবার জন্য সে বোকার মত বলে উঠল, 'আজ দাদাভাইয়ের চিঠি পেলাম কি-না ভাই, তাই মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে! তাই হুঁশ ছিল না।'

মেজো-বৌ শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর খুব অসুখ বুঝি?'

লতিফা অবাক হয়ে বলে উঠল, 'হাঁ, তা তুমি কি করে জানলে?'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'ভয় নেই, তিনি আমায় চিঠি দিয়ে জানাননি, এমনি কেন যেন মনে হলো।'

রুবির চোখ নিমিষের তরে যেন জ্বলে উঠল। সে লতিফার কাছে শুনেছিল, মেজো-বৌয়ের নাকি ওদিক দিয়ে একটা গোপন দুর্বলতা আছে। কিন্তু সে শিক্ষিতা মেয়ে! কাজেই তার জ্বলে-ওঠা চোখকে এক নিমিষে নিবিয়ে ফেলতে দেরি হলো না। তার ওপর শোকার্ত মাতৃহৃদয়কে এদিক দিয়ে আঘাত করবার মতো নির্মমতাও তার ছিল না।

রুবি কিছু বলবার আগেই মেজো-বৌ বলে উঠল, 'আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সকাল-সন্ধ্যা একটু করে পড়াব মনে করেছি, তা তুমি তো ভাই ম্যাজিস্টর-এর মেয়ে, তোমার বাবাকে এই পাড়াতেই একটা ছোট ঘর তুলে দিতে বল না। অবশ্য ঘর না পেলে আপাতত আমাকে আমাদের উঠোনের সামনে বাগানটাতেই পাঠশালা বসাতে হবে। কিন্তু বর্ষা এলে তখন কি করা যাবে?'

রুবির মনের ঝাঁঝটুকু কেটে গেল, এই হতভাগিনীর এই সান্ত্বনা খোঁজার ছল দেখে। তার বুঝতে বাকি রইল না যে, সে সকল ছেলেকে ভালোবেসে নিজের শোক ভুলতে চায়। সে খুশি হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই বলব আব্বাকে। আর তিনি যদি কিছু না-ই করেন, আমি তোমার পাঠশালার ঘর তুলে দেবো। শুধু ঘর তোলা নয়, নিজে এসে সাহায্য করে যাব হয়তো!'

মেজো-বৌ বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। কিন্তু তার চোখ জলে ভরে এল। সে একটু চুপ করে থেকে দুই হাত তুলে ললাটে ঠেকালে। সে নমস্কার তার রুবিকে, না কাকে উদ্দেশ করে তা বুঝা গেল না!

লতিফা বিস্ময়-বিমূঢ়ের মতো এতক্ষণ বসেই ছিল। ও যেন এর কিছু বুঝতে পারছিল না। ওর মন ছিল ওর ঘর-ছাড়া দাদুটির চিন্তায় — তার জন্য বেদনায় ভরপুর। মেজো-বৌ এসে পড়ার পর থেকে যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল রুবির সঙ্গে তা এমন হঠাৎ চাপা পড়ল দেখে সে একটু ছটফট করতে লাগল — অবশ্য মনে মনে। তার ওপর, ছেলে মরার শোক ও জানে না, কিন্তু না জেনেই ওর ভীতু মন ও শোকের কথা ভাবতেও যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে। ও শোকের যেন কল্পনাও করা যায় না। সে আর থাকতে না পেরে যেন এই শোকাবহ প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার জন্যই বলে উঠল, 'আচ্ছা, মেজো-বৌ! তুমি একটা বুদ্ধি বাতলে দিতে পার? অবশ্য তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়ার সময় এ নয়। তবু মনে হয়, তুমি যেন এর একটা মিমাংসা করতে পারবে?'

মেজো-বৌ নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে লতিফার দিকে চাইল।

লতিফা বলে যেতে লাগল, 'আজ সকালে দাদা ভাই-এর একখানা চিঠি পেয়েছি রেঙ্গুন জেল থেকে। সেই নিয়েই রুবির সঙ্গে আলোচনা চলছিল। যাক, চিঠিখানা তুমি দেখই না, তাহলে সব বুঝত পারবে।'

মেজো-বৌ চিঠি নিয়ে পড়তে লাগল — ।

রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল

চিরআয়ুষ্মতীসু!

স্নেহের বুঁচি। পাঁচ-ছ মাস পরে তোদের চিঠি দিচ্ছি। সব কথা লিখতে পারব না — লিখবার অধিকার নেই! লিখলেও উপরওয়ালারা তাকে এমন করে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন যে, স্যার জগদীশচন্দ্র বসুও কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার উদ্ধারসাধন করতে পারবেন না। তাছাড়া আমার স্বভাব তো জানিস, আমি বলে যেতে পারি অনর্গল, কিন্তু লিখতে হয় অর্গলবদ্ধ হয়ে। তাতে করে মন আর হাত দু-ই ওঠে হাঁপিয়ে। অবশ্য হাঁপানি আমার এখনো আরম্ভ হয়নি — যদিও বুকে টিউবার-কিউলসিসের জার্ম কিছুদিন থেকে তার নীড় রচনা করেছে। সে খবর অনেক আগেই খবর-কাগজের মারফতে হয়তো প্রচার হয়ে গেছে এবং তোরও তা শুনতে বাকি নেই।

তুই তো শুধু আমার বোনই নস, তুই বন্ধু। তাই আজ তোকে এমন অনেক কথা বলব, যা তোর কাছেও কোনদিন বলিনি।

তুই তো জানিস, আমার বুকে পোকার খাবার মতো কোনো খাদ্য ছিল না। কিন্তু ওটা যে সংক্রামক, তাও আমার অজানা ছিল না। একদিন পোকা-খাওয়া বুকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল। শুনলাম, সে পোকা নাকি আমারি কাঁটার বেড়ার থেকে উঠে গিয়ে সেখানে বাসা বেঁধেছে।

বড় দুঃখ হলো। কিন্তু আমার কোনো হাত ছিল না! থাকলেও সে হাত বন্ধক রেখেছিলাম পুলিশের হাত-কড়ার কাছে। কাজেই ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে হলো।

কিন্তু প্রভুভক্ত পোকা আমায় ভুলতে পারল না। এত সি.আই.ডি এতো পুলিশ-প্রহরীর নজর এড়িয়ে — সমুদ্দুর ডিঙিয়ে আমার বেড়ার পোকা আমার বুকে ফিরে এল। অন্যের বুক কতটা খেয়ে এসেছে, তা তার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা এবং সতেজ দংশন থেকেই বুঝতে পারলাম।

অবশ্য আমার আর কোনো পোকাকেই ভয় নেই। বিলিতি পোকা, দিশি পোকা, বুকের পোকা, দুঃখের পোকা — তা সে যে পোকাই হোক কিন্তু ভয় আমার না থাকলেও কর্তাদের আছে। তাঁরা আমায় নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। সাপের ছুঁচো গেলা-গোছ — ছাড়তেও পারে না, গিলতেও পারে না।

আজ ঘুম থেকে উঠেই খোশ-খবর শোনা গেল। আমায় নাকি কাল ছেড়ে দেওয়া হবে। অবশ্য ছেড়ে দেওয়া মানে, দম নিতে দেওয়া। মরিস যদি বাবা তো ঘরে গিয়েই মর, আমাদের দায়ী করে যাসনে — এই মনোভাব আর কি!

এরা সত্যিই সিংহের জাত। পশু হয়েও পশুরাজ স্পেসিসের। আধ-মরা রোগ-জীর্ণ শিকার এরা খায় না।

আবার পুরুষ্টু হয়ে উঠলেই ক্যাঁক করে ধরবে! ...

আমি ঠিক করেছি, ছাড়া পেলেই সোজা ওয়ালটেয়ারে ছুটে যাব। আমি চাই — এই বন্ধনের পরে নিঃসীম মুক্তি। মাথায় অনাবৃত আকাশ, চোখের সামনে কূলহারা তটহারা জলধি, মনের সামনে নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত একা — একা আমি!

মাঝে মাঝে মনে হয় — মনে হয় ঠিক না, লোভ হয় — যাবার আগে এই অদ্বিতীয় মনের দ্বিতীয় জনকে দেখে যাই — জেনে যাই। আমার মরুভূমির ঊর্ধ্বে সাদা মেঘের ছায়া নয় — কালো মেঘের ছায়া ঘন মায়া দেখে যাই।

তোরই চিঠিতে জেনেছি, সে মেঘ নাকি তোরই দেশে গিয়ে জমেছে। তোর হাতের কাছে যদি খুব খানিকটা উত্তুরে হাওয়া থাকে, দিতে পারিস তাকে দক্ষিণে পাঠিয়ে? তুই হয়তো বলবি, এবং শুনে মেঘও হয়তো বিদ্যুৎ হাসি হেসে বলবে, হাতের কাছে যার থাকবে সমুদ্দুর, সে চায় দু-ফোঁটা মেঘের জল! সংস্কৃত কবিদের একটা চির-চলিত উপমার কথা মনে পড়ছিল, তা আর লিখলাম না! না লিখলেও বুঝবি বলে।

মানুষ যখন প্রগলভ হয় — অর্থাৎ সোজা কথায় বিকারগ্রস্ত হয়ে বকতে থাকে, তখন তার যে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে — এ কথা ডাক্তারে না বললেও সকলে বোঝে। আমার বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

আমার যাবার বেলায় আমার শেষ কথা বলে গেলাম এইজন্যে যে, বলবার অবসর জীবনে হয়তো আর হবে না।

আমি জীবনে কোনো কিছুতেই নিরাশ হইনি। জীবনের বেলাতেও হতাম না — যদি না বুঝতাম যে, বাঘে ধরেও যাকে উগলে দেয় — তার দুরবস্থা কতদূর গিয়ে পৌঁছেছে! রক্ত-মাংসের পরিমাণ তার কত কমে এসেছে! — কিন্তু এ কি ক্ষুধা আমার? এই কি মৃত্যুক্ষুধা?

আমি যদি না-ই ফিরি, দুঃখ করিসনে ভাই। আমরা তো ফেরার সম্বল নিয়ে বেরোইনি। তাই ফেরারি আসামি হয়েই কাটিয়ে দিলাম। আমাদেরই পথের পথিক যারা রয়ে গেল — তাদের মাঝেই আমায় দেখতে পাবি। এই কারায়, এই ফাঁসিমঞ্চে আমরা তো আজই এসে দাঁড়াইনি, আমাদের কণ্ঠে শত জন্মের শত লাঞ্ছনার রক্ত-লেখা হয়তো আজো মুছে যায়নি। নইলে এমন সুখের নীড়ে আমার মন বসল না কেন? পিঞ্জরের দ্বার ভেঙ্গে মুক্ত লোকের ঊর্ধ্বে উড়ে গান গাওয়ার এ সাধ কেন জাগল? জীবনকে আমরা জীবিতের মতোই ব্যয় করে গেলাম, মৃতের মতো কার্পণ্য করে কাক-শকুনের খাদ্য করিনি! আমার যা সম্ভাবনা, তা যেন কোনো দিন তোর অগৌরবের না হয়ে ওঠে।

অন্যলোকে গিয়ে যদি এ-লোকের প্রিয়জনকে মনে রাখবার মতো অবসর থাকে, সেখানে গিয়ে যদি অনশন-কারাবন্দি না হই, তাহলে বিশ্বাস করিস — তুই আমার মনে থাকবি।

খোকাদের চুমু দিস! নাজির সাহেবকে ফাইন্যাল গুঁতো! তুই আদর-আশিস নে।

রুবি ও মেজো-বৌকে আমার নমস্কার জানাস। ইতি —

তোর — দাদু

চিঠি পড়ে মেজো-বৌ যে মুখ ঊর্ধ্বে তুলে ধরল, তা মানুষের মুখ নয়। ও যেন ঝরার একটু আগেই শিশির-সিক্ত রক্ত-কমল!

লতিফা মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগল। রুবির চোখ যেন পুড়ে গেল!

মেজো-বৌয়ের কিছু বলবার আগেই রুবি বলে উঠল, 'আমি ঠিক করেছি বুঁচি আমি ওয়ালটেয়ারে যাব। মা আমায় বলেন উল্কা। উল্কাই যদি হই, তাহলে শূন্যে আর ঘুরতে পারিনে! ধরায় যে মানুষ আমায় নিরন্তর টানছে, মুখ থুবড়ে তার দেশেই পড়ব দিয়ে। হয়তো আর আমি মুখ তুলে উঠতে পারব না, আমার সব আগুন যাবে নিভে। তবু ঐ আমার মহান মৃত্যু! — কি বল মেজো-বৌ? তুমি আমার সঙ্গে যাবে? লুকিয়ে পালাতে হবে কিন্তু। অভিসারিকা সেজে, বুঝেছ?

রুবির চোখ যেন সোনার আংটিতে বসানো রুবির মতোই জ্বলতে লাগল।

মেজো-বৌর একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলে উঠল, 'আমার যাবার ইচ্ছা থাকলে তোমার বহু আগেই সেখানে গিয়ে উঠতাম ভাই রুবি বিবি! দু-মাস আগে এ-খবর পেলে কি করতাম জানি না! কিন্তু আজ আর আমাকে নিয়ে আমার কোনো ভয়-ডর নেই। খোকাকে যদি না হারাতাম, এই খোকাদের যদি না পেতাম, তাহলে আমি সব-আগে তাঁকে সেবা করে ধন্য হতাম।'

রুবি মেজো-বৌ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, 'অর্থাৎ তুমি রুবি হলে এতক্ষণ বেরিয়ে পড়তে।'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'হুঁ। তাই।'

রুবি এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'ভাই মেজো-বৌ, তুমি একটু আগে আমায় উদ্দেশ করেই বোধহয় নমস্কার করেছিলে, আমার প্রতি-নমস্কার নাও। তুমিই আমায় পথ দেখালে।'

বলেই লতিফার দিকে চেয়ে বলল, 'ভাই বুঁচি, সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে। আমার পথের সন্ধান পেয়েছি। তাই মেজো-বৌ, আমি বুঁচির কাছে পাঠিয়ে দেবো তোমার খোকাদের পাঠশালা তৈরির খরচা, গ্রহণ করো।'

মেজ-বৌ, লতিফা কিছু বলবার আগেই রুবির ব্যস্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'শোফার! গাড়ি লে আও!'

আটাশ

ওয়ালটেয়ার

ভাই বুঁচি,

আমি যদি আজ আমার পরিচয় দিই — আমি তোদের সেই রুবি, তাহলে বিশ্বাস করবি? আমার বাপ-মাও জানেন আর তোরাও হয়তো জানিস, আমি মরেছি! অথবা যদি না মরে থাকি, তাহলে আমার মরণই মঙ্গল বা একমাত্র গতি!

তোরা — অন্তত তুই শুনে সুখী হবি, না দুঃখিত হবি জানিনে, যদি আমি লিখি যে, আমি আজো মরিনি! আমি বেঁচে গেছি বুঁচি, বেঁচে গেছি — তোদের চেয়েও বড় করে বেঁচে গেছি।

আজ তোকে সব কথা খুলে বলব, তারপর সামনে রয়েছে কূলহারা সমুদ্র! কূলহারা জীবনকে আর কেউ নিতে না পারে, সে তো রয়েছে!

তোর কাছে যখন জানলাম, তোর আনু ভাই রেঙ্গুন জেল থেকে মৃত্যুর নোটিশ হাতে ওয়ালটেয়ারে যাচ্ছে, তখনই আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম। তোর কাছে লেখা তার চিঠির প্রতিটি অক্ষর যেন আমার দিকে তাকিয়ে বলছিলো, 'তোমায় চায়, সে তোমায় চায়!' রাজার লাঞ্ছনা-তিলক তার কপালে, শ্যাম সমান মরণের বাঁশি তার হাতে, ঐ যে আমার রাজপুত্র! আমি অভিসারে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি জানতাম, আমার বাপ-মার আদেশ-অনুরোধ ও স্নেহের বিপুল বাধাকে ডিঙিয়ে কিছুতেই বুঝি তার সান্নিধ্যলাভ করতে পারব না। কিন্তু সে যখন তার মৃত্যু-মলিন চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকাল, তখন তার কাছে আমার সম্মুখে এত বড় বাধা যেন বাধা বলেই মনে হলো না।

মনে হলো এত বড় যে বাধা, এত বড় যে অন্তরায় — সে তার চেয়েও বড়, তার চেয়েও বিপুল! আকাশ আমায় ডাক দিল, আমার পাখা চঞ্চল হয়ে উঠল, আমি নীড়ের মায়া ভুললাম।

যে পর্বতে জন্মগ্রহণ করেছি আমি স্রোতস্বিনী, তার এত পাথর এত বন-জঙ্গল পথ আগলে আমায় ধরে রাখতে পারল না, আমি সমুদ্রের উদ্দেশে ছুটে এলাম। সমুদ্রের নাগাল পেয়েছি, আজ আমার মনে হচ্ছে, এই আমার শেষ, এই আমার পরিণতি, এই আমার সার্থকতা। কূল হারিয়েই আমার অকূলের বন্ধুকে পেলাম।

আমার বাপ-মার মনে — তোদের মনে কত ব্যথা দিয়েছি জানি। তোরা পাহাড়ের মতো সংস্কারের পর সংস্কারের পাথর চড়িয়ে উঁচু হয়ে আছিস, তোরা হয়তো তাকেই বলিস মহিমা। কিন্তু ঐ মহিমার অচলায়তনে নিঃশ্বাস রোধ করে বেঁচে থাকার মায়া অন্তত আমার ছিল না কোনোদিন। ও জীবন আমার নয়। নিজেকে হারিয়ে

দেওয়া, ছড়িয়ে দেওয়াই আমার জীবনের গতি। পথে চলে, ভুল করে, পথ হারিয়েই আমার মুক্তি। জানি, ও জীবন আমার কাছে যেমন সত্য, তোদের কাছে তেমনি মিথ্যা।

আমার সত্যকে আমি চেয়েছি এবং পেয়েছিও — এই আমার সান্ত্বনা! ...

একদিন অন্ধকার রাত্রে — যখন তোরা, আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই ঘুমুচ্ছিলি, আমি বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকারের হাত ধরে। আলোর দেশে পৌঁছে দিয়ে আমার সাথী অন্ধকারে চলে গেছে! আমি আলো পেয়েছি, বন্ধুকে পেয়েছি — আমাকে পেয়েছি।

তোর চেয়ে তো বড় আত্মীয় আনসারের কেউ নেই, কই, তুই তো এমন করে আসতে পারলিনে!

আমি কে তার? দু-দিনের পরিচয় — কৈশোরের স্বপ্ন! কিন্তু সে স্বপ্নের নেশা আর আমার কাটল না। সেই স্বপ্নের পরিচয়কে সকলের মাঝে স্বীকার করার অবকাশ বিধাতা দিলেন না। আমাদের শুভদৃষ্টি হলো সকলের অন্তরালে — মৃত্যু আর সমুদ্রকে সাক্ষী করে। আমাদের বাসর সাজাচ্ছে মৃত্যু তার অন্ধকারের নীলপুরীতে! বাইরে কেবল কোলাহল, কেবল লজ্জা, ভাল করে চোখ চেয়ে বন্ধুকে দেখবার অবকাশ নেই। এইবার দেখব তাকে সেই বাসর-ঘরে চোখ পুরে প্রাণ পুরে। রবি-শশী-গ্রহ-তারার দল আমাদের বাসর-ঘরে আজ থেকেই আড়ি পাতছে।...

এখানে এসে একদিন কাগজে দেখলাম, আমার বাবা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। আমি কি বুঝি না, কেন তিনি অবসর গ্রহণ করলেন — শুধু চাকরিতে নয়, হয়তো বা জীবনেও। সব বুঝি, তবু এর আর কোনো চারা ছিল না!

মনে করলাম, ভালই হলো এ। যে ক্ষমা এ জীবনে পাব না বাবার কাছে, সে ক্ষমা চেয়ে নেব এর পরের জীবনে। সেখানে সংস্কারের বন্ধন নেই, মহিমার উচ্চতা নেই, প্রেস্টিজের অভিমান নেই। মৃত্যুর বাসর-ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নেব, আমি জানি — সেদিন প্রাণ ভরে তিনি আশীর্বাদ করবেন!

আর মা? আজ যদি যাই তাঁর কোলে ফিরে, আজো তিনি ধুলা মুছে তেমনি করে বুকে তুলে নেবেন। কিন্তু মা তো বাবাকে ছাড়িয়ে নেই। যে ক্ষমা বাবা এ জীবনে করতে পারবেন না, বুক ফেটে গেলেও না, মা সে ক্ষমার বাণী উচ্চারণ করতে পারবেন না! তাঁরা রটিয়েছেন, মেয়ে মরে গেছে সেইটেই সত্য হোক!

আমার জন্য যে মিথ্যা কবর খোদাই হয়েছিল, সে শূন্য কবর শূন্য থাকবে না। আমি তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব — যত তাড়াতাড়ি পারি মরে তাঁদের সকল লজ্জার অন্ত করব।

অবশ্য আত্মহত্যা করে নয়! এ ভীরুতা আমার মনে কোনো দিনই নেই। থাকলে অনেক আগেই মরতে পারতাম — অন্তত সেই দিন, যেদিন আমার অমতে আমাকে বিয়ের ছুরিতে গলা রাখতে হয়েছিল।

এ তো গেল আমার দুঃখের কাহিনী। এইবার আমার সুখের কথা শুনবি?

আমি যখন ওয়ালটেয়ারে এসে নামলাম, দেখি আনসারের রাজ-বন্ধু পুলিশের গুপ্তচররা আমায় ছেয়ে ফেলেছে। আমার শাপে-বর হলো! কত সন্ধান করে হয়তো তাকে বের করতে হতো। তাদের কাছেই সন্ধান পেলাম, অবশ্য আমার জিনিসপত্র সন্ধান করতে দেওয়ার বিনিময়।

তখনো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসেনি। তার শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটি ছোট্ট ঘরে অবশভাবে হাত দুটি এলিয়ে দিয়ে সে সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে আছে।

আমি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছিলাম জুতা খুলে। দেবতার ঘরে কি জুতা পরে ঢুকতে আছে?

দেখলাম, বেলাশেষের পূরবী রাগিণীর মতো তার চোখে-মুখে কান্না আর ক্লান্তি। বাতায়ন-পথে সন্ধ্যাতারার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। সে নিঃশব্দে সন্ধ্যাতারাকে নমস্কার করল। আমি অমনি ঘরে ঢুকে বললাম, 'আমি এসেছি।'

সে কী আনন্দ তার চোখে-মুখে! সে 'রুবি' বলে ডেকেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল!...

আচ্ছা বুঁচি, তুই ঘুমন্ত ক্ষুধাতুর অজগরের জাগরণ দেখেছিস? শিউরে উঠিসনে। সব কথা ভাল করে শোন।

দুদিন না যেতেই বুঝলাম, ক্ষুধিত অজগর জেগে উঠেছে। ওর সে বিপুল আকর্ষণ এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি বন-হরিণীর?

সে আমায় তিলে তিলে গ্রাস করতে লাগল। আমি কাঁদতে লাগলাম, আমার জন্য নয় — ওর জন্য। এ-সর্বগ্রাসী ক্ষুধা যে শুধু আমার মৃত্যু নয় — এ যে ওরও মৃত্যু! ও যে মৃত্যু-জরজর, আমাকে গ্রাস করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা কি আজ আর ওর আছে?

আমি জানতাম এ-রোগের বড় শত্রু ঐ প্রবৃত্তি! নইলে, যে আনসারের সংযম তপস্বীর চেয়েও কঠোর, তাকে এ মৃত্যু-ক্ষুধায় পেয়ে বসল কেন?

সে যখন বলল, 'রুবি, চিরদিনই বিষ খেয়ে বড় হয়েছি, আজ মৃত্যুর ক্ষণে তুমি অমৃত পরিবেশন কর! আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হই।'

আমি আমার উপবাসী ভিখারি বন্ধুকে ফেরাতে পারলাম না।

তবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওকে কি বাঁচাতে পারবেন বলে মনে হয়?'

ডাক্তার বলল, 'ওঁর একধারে ফুসফুস খেয়ে ফেলেছে। আর এক ধারও আক্রমণ করেছে। ও রোগ এখন আমাদের চিকিৎসার শক্তিকে অতিক্রম করে গেছে, এখন ওঁকে যদি বিধাতা বাঁচান!'

আমি ডাক্তারকে নমস্কার করে বললাম, 'তাহলে আপনার আর কষ্ট করে আসবার দরকার নেই ডাক্তার সাহেব। ও শান্তিতে মরুক!'

ডাক্তার চলে গেল। আমিও আমার কর্তব্য বেছে নিলাম।

আমি পরিপূর্ণরূপে তার ক্ষুধিত-মুখে আত্মসমর্পণ করলাম। যদি ও না-ই বাঁচে, তবে ওকে ক্ষুধা নিয়ে মরতে দেব না, দুদিন আগে মরবে এই তো! তাছাড়া এ মৃত্যু তো ওর একার নয়, ওর বুকের মৃত্যু-জীবাণু আমাকেও তো আক্রমণ করবে!

সে কি তৃপ্তি, সে কি আনন্দ ওর! মরুপথের পথিক মরবার আগে যেন মরূদ্যানে ছায়া পেল!

ওর আনন্দ, ওর হাসি, ওর সুখ দেখে মনে হলো, ও বুঝি বেঁচে গেল! বিষই বুঝি ওর বিষের ওষুধ হলো!

কিন্তু — কিন্তু — বুঁচি! লতি! সই! আজ আমার ঘরের প্রদীপ নিভে আসছে! তার শিখা কাঁপছে! মরণের ঝড় আমার ঘরে ঢুকে মাতামাতি করছে। আমি আমার এইটুকু আঁচলের আড়াল দিয়ে ওকে বাঁচাই কি করে ভাই?

কে জানত, ওর ঐ হাসি, ঐ আনন্দ — নিভবার আগে শেষ জ্বলে ওঠা!

চিঠি লিখতে লিখতে ভোর হয়ে এল! তারই শিয়রে বসে এই চিঠি লিখছি। আমাদের শিয়রের বাতি নিভে আসছে। সে একদৃষ্টে ভোরের তারার দিকে তাকিয়ে আছে। কথা বন্ধ হয়ে গেছে কাল থেকেই। কাউকে আমি ডাকিনি। সেও ডাকেনি।

দুইজনে সারারাত সমুদ্র আর আকাশের তারা দেখেছি।

একবার শুধু অতিকষ্টে বলেছিল, 'ঐ তারার দেশে যাবে?'

আমি একবার বললাম, 'যাব।' সে গভীর তৃপ্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'তাহলে এস, আমি তোমার আশায় দাঁড়িয়ে থাকব!'

তারপর আমায় চুমু খেল।

এক ঝলক রক্ত উঠে এল! তার বুকের রক্তে আমার মুখ-ঠোঁট রাঙা হয়ে গেল।

আশীর্বাদ করিস, এই রক্ত-রেখা যেন আর না মোছে! ...

তোর কাছে যখন এই লিপি গিয়ে পৌঁছবে — ততক্ষণে আমার দীপ নিভে যাবে! আমার সুন্দর পৃথিবী — আমার চোখে মলিন হয়ে উঠেছে! আমার চোখের নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে!

আমি জানি, আমারও দিন শেষ হয়ে এল! আমিও বেলাশেষের পূরবীর কান্না শুনেছি। আমার বুকে তার বুকের মৃত্যু-জীবাণু নীড় রচনা করেছে! আমার যেটুকু জীবন বাকি আছে তা খেতে তাদের আর বেশিদিন লাগবে না। তারপর চিরকালের চিরমলিন — নতুন জীবন — নতুন তারায় — নতুন দেশে — নতুন প্রেম!

তোদের সকলের জন্যে সে কেঁদেছে। কত বড়, কত বিপুল জীবন নিয়ে সে জন্মেছিল — আর কি দুঃখ নিয়েই না গেল! রাজার ঐশ্বর্য নিয়ে সে এসেছিল — সে

গেল ভিখারির মতো, — নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বন্ধু — একা!

সে বলে গেছে, মৃত্যুর পর তার দেহ মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে। সমুদ্রকে সে ভালবেসেছিল — বুঝি বা আমার চেয়েও। সাগরের মতো প্রাণ যার — তাকে সাগরের জলেই ভাসিয়ে দেব।

আর আমার সময় নেই! আমারও প্রদীপ নিভে এল বলে।

— রুবি

Mrityukshuda

One

Krishnanagar, the playground of dolls. Like a child's broken playhouse after the game is done.

It stands gazing at the path where the child has gone, like a mother—with the child's play-dolls before it.

On one side of this, runs *Chand-Sarak*, the Moon-Road. It draws a curtain of trees and foliage, like a hidden sorrow.

In this neighbourhood, the so-called lower-class Muslims and the indigenous convert Christians of the '*Oman Katli*' (Roman Catholic) community live congestedly.

It's not that they live in great harmony. There are a few Hindu households too—like the spicy flecks in a mix of fried snacks. But their aristocratic pride is no less than that of either the Muslims or the Christians there.

Just as a cat and a dog, both reared by the same master, tolerate each other out of necessity—they too are like that. They grumble plenty against each other, yet these poor souls lack the enthusiasm and leisure for a proper, hefty quarrel in their lives.

Irrespective of caste or creed, their men work as daily wage labourers—that is, as masons, *khansamas* (butlers), *baburchis* (cooks), or something of that sort. And the women husk rice, do household chores, cook, cry, and undertake various struggles to alleviate the men's suffering.

It is as if the Creator, out of mercy, has not given them the leisure to perceive sorrow as something grand. Otherwise, perhaps a great catastrophe would have occurred.

They are like a warehouse of death! Supply upon order! As long as it takes to import, so long it takes to export!

Like a shock of hair on the head, there are a few *bhodra-nuk* (gentlefolk) among them.

But while this adds to their outward appearance, it doesn't increase their honour. That very fact seems to mock their sorrow even more.

These children of God, given by Him, they entrust back into His hands. Then, with minds at ease, they eat leftover rice and go to work. In the evening, they return, give the eldest son a good beating, curse the middle one without discrimination, offer the third one a lozenge, kiss the youngest, then eat their rice and sleep, snoring loudly.

Small children—sun-scorched, dust-grimed, hungry, without shirts. They roam aimlessly, gather firewood, chase after kites with broken strings, and simultaneously practice authentic Bengali.

It is they who light up Chandbazar on this *Chand-Sarak*. … It was at a public tap on this very Chand-Sarak that a fierce quarrel broke out among the women the other day over fetching water.

Some Christian girl, while taking water, had touched the pitcher of a Muslim girl. Perhaps these two communities were once one race—some became Muslim, some Christian. And because they were once one race, they now despise each other. The two girls from these two communities were young, and their friendship was strong. So, the quarrel wasn't between the two girls themselves. It was those who witnessed this mischief who started it.

Gazal's mother has quite a reputation for being quarrelsome in her neighbourhood. She was leading the 'Opposition' from the Muslim side.

On the other hand, Hidimba was no one to back down. Though her language wasn't as sharp as Gazal's mother's, her physique and voice were incomparable!—Just like the legendary *Bhima's* wife, Hidimba Devi of ancient times!

Gazal's mother is as thin as a nail—all skin and bone—but her words pierce the heart with the same mercilessness as a nail. Just as the mark of a nail remains indelible on a wall even after it's removed, the sting of Gazal's mother's taunts never fades, even after the quarrel ends.

The quarrel had advanced considerably, and Gazal's mother was saying with more venomous chewing, "*You haram-khor* (eater of forbidden things), you Christian wretch! By eating forbidden things, you've grown fat like a wild boar, haven't you, hey?"

Before *Gazal's* mother could say another word, Hidimba angrily banged her brass pitcher forcefully on the paved tap-platform, swayed her body, distorted her cow-dung-pancake-like face, and roared, "Of course you'd say that, you skinny wretch! Your son's body has plumped up, hasn't it, eating forbidden food cooked in a Christian home!"

In a fit of rage, Gazal's mother spilled all the water from her full pitcher onto the ground, stepped forward a bit more, and shrieked, "Oh, you *agh-dhumsi* (a term of insult, implying one who carries anger like smoke)! Oh, you Bhagalpur cow! Oh, my son didn't cook rice in a Christian's house, my son was the Judge Sahib's *khansama*—the Judge Sahib's, you know, the Englishman's!"

Puti's mother, who was also Christian, could not bear it any longer. She made her malaria-ravaged voice as shrill as possible and cried out, "Oh, unbearable one, let me hang myself by my neck from the ceiling hook! Listen, oh *Gazal's* mother! That Judge Sahib is also of our kind. We are the '*Azar*' (King's) people, don't you know?"

Two or three Christian women, pleased by *Puti's* mother's crushing, logical retort, exclaimed, "Well said, auntie!"

Khatun's mother, with her pitcher on her hip, her spleen swollen, and her son on her shoulder, had been standing among the listeners, occasionally chiming in with a sarcastic remark, like a chorus echoing the lead singer, in tune with Gazal's mother. But this time, she couldn't hold back. With her son, swollen spleen, and pitcher, she moved right next to the lead singer and

unleashed language directed at the Christian women that is both unprintable and unbearable to hear.

This time, Hidimba suddenly let down her hair, standing like a veritable '*Elokeshi Bama*' (woman with dishevelled hair, a fierce goddess-like appearance), and wrapping the end of her *sari* around her waist, she waved her hands in a strange manner several times in front of *Khatun's* mother's face and cried out, "And who are you, you *ujhdokhagi* (a vulgar insult)! If only you didn't get beaten by your husband twice a day!" Then, answering her foul language with even fouler language, she turned to *Gazal's* mother and said, "Yes, you *bhatar-put-khagi* (eater of husband and son)! You three sons-eater. So your son might have been the Judge Sahib's cook, but you've given even that son to the grave. And you yourself, didn't you clean the oven after cooking at *Amfesad Babu's* (*Ramprasad Babu's*) house the other day! Is that *Amfesad Babu* your *Moulvi Sahib*, huh? Smell your hand, you'll still find the Christian smell!"

Gazal's mother gave the ultimate reply, with a sharp, knife-like laugh, "Tell me, you *hutmochokhi* (a term implying wide, owl-like eyes), that '*Amfesad*' Babu didn't hit me with his slipper when he found a bundle of rice at my belly! My son was sick, that's why I went to work at his house, but did I drink even a glass of water in that house? Let anyone say so, any old woman dare to say it!"

The last words didn't reach *Hidimba's* ears. She had indeed been beaten for rice theft once when she went to work at the house of Mr. *Ramprasad Hati*, the priest of the '*Chhiten Para*' (Protestant neighbourhood). But with this scandal being declared among so many women, what she began to do now was indescribable! Tearing her hair, cracking her knuckles, screaming, crying, dancing, and leaping, she seemed to create a massive earthquake. Along with it, a molten stream of curses—an incessant flow of invective!

All the curses she knew, refined or vulgar, decent or obscene, she recited once, twice, repeatedly, yet her grievance seemed unending!

Like a Lewis gun firing seven hundred rounds a minute!

A crowd of children gathered! It wasn't a quarrel, it was a cockfight!

In the midst of it, a milkman's son suddenly shouted, "Hey, *Pocha*, that rascal *Pocha*! Run, run! Your grandma has become '*Ma-Kali*'!"

Even in this cacophony of a quarrel, a few women burst into laughter!

A Muslim woman, unable to hold back, spoke from behind her veil, "Someone should just give her a sword!"

An even wittier middle-aged woman from behind said, "She's almost taken off her clothes too, you know!"

The Muslim children didn't laugh as much as they shouted!

The Christian children threw dust.

A *Kurukshetra* broke out! …

But with their *Indraprastha* of sorrow, this *Kurukshetra* is a daily occurrence there—absolutely '*mach-bhaat*' (fish-and-rice, meaning everyday, common) that reads nothing matters that much.

As long as it takes for a quarrel to break out, so long it takes to forget.

Sorrow and scarcity have perhaps been a blessing for them. If they didn't have so much sorrow, the day after such a violent quarrel, they would have hesitated to speak to each other again, calling each other '*Didi*' (elder sister), '*Bubu*' (sister-in-law), '*Khala*' (aunt)!

They forget everything—they forget only their eternal sorrow, their eternal scarcity!

In this ocean of unforgotten sorrow, they seem to float, holding onto the branches of trees uprooted by erosion. Their hearts are bitter from the pain of sorrow, and so their language too comes out harsh. But the next moment, when they see that they are alone and helpless, floating in an unfathomable ocean, they extend their hand to the very person they had just insulted so greatly.

Do they, with their watery existence, have the luxury, like fortunate people on solid ground, to turn their faces away from each other year after year, with utterly tranquil minds?

If this burden of sorrow had not been so immense, they too would have long ago become the great enemies of humankind, like gentlemen—starting grand wars

Two

Gazal's mother's youngest son, *Pacaale*, dances in the town's theatre group, dresses as a female companion (*sakhi*), and sings. He also works—as a mason.

Being somewhat accustomed to the company of gentlefolk, he has also become a bit of a *babu* himself. He styles his hair (*Teri kaate*), smokes cigarettes (*chikret*), chews paan, and drinks tea. He's quite famous among the neighbourhood women. They say, "What a voice, what a song, and so stylish! He dances in the 'theatre'—the babus' theatre, not just those Christian neighbourhood folk plays. Hmm, hmm!"

When he goes to work, smoking a cigarette, carrying his foot-gaj (measuring stick), *konnik* (trowel), and *sut* (plumb line), and starts singing on the way, the neighbourhood wives and daughters-in-law raise their veils a little to gaze at him. Someone in a '*bhabhi*' (sister-in-law) relationship might even smile faintly. And the mothers of unmarried girls tempt Allah Mia with a feast of two roasted chickens, saying, "Hey *Allahji*, please write his match with my *Kuruni*."

That day, there was no tea at home. So, Pacaale had just received a bit of tea as a favor from the gentlemen's sitting room in the next neighbourhood and was getting ready to leave for work with his trowel, without saying anything to anyone.

His mother said, in a somewhat pleading tone, "Hey, you're off to work, dear? My *Pachi* is dying here! Go see that old midwife from the woodcutter's quarter. She's been in pain since last night (*aattir*), and nothing has happened yet."

Pacaale was then hunched over a plate of water, with his trowel and measuring stick in front of him, carefully styling his greasy hair into a *Teri*. For some time now, he had been using the plate of water as a mirror.

He had even bought a four-anna mirror once, but one day, lacking money for tea, he sold it for two pice and drank tea at the shop. Now, with what he earns, they can barely manage rice for two meals, so how could he buy a mirror?

For some time now, he had been saving four *annas* from his daily earnings, determined to buy a mirror today. But as soon as he came home and went to the market, he realized that six *annas* wasn't even enough rice for everyone. So, he'd have to pull out his hidden quarter-*rupee* from his waist-knot.

He was about eighteen or nineteen years old. Thus, it still took him some time to forget the sorrow of wanting something and not getting it. But when he thought that his orphaned little nephews and nieces would remain hungry because of his mirror, his own lack no longer felt like a lack at all.

That day, in the heat of the quarrel, the most hurtful insult *Hidimba* had hurled at his mother was "three sons-eater" (teen *betakhagi*). It was true, wasn't it? Three sturdy, mountain-like sons had died gasping for breath before his mother's very eyes! On top of that, each of them had two or four children; altogether, they numbered about a dozen.

The responsibility of supporting these children and his widowed sisters-in-law fell solely on him. But he didn't bear the burden alone. His mother and sisters-in-law toiled day and night to lighten that load. While it might lighten the burden a little, it didn't reduce their exhaustion. They were like people descending a steep mountain '*khad*' (ravine), with immense loads strapped to their heads; if they paused even for a moment, they would tumble headlong, load and all, into some dark pit.

A boil on a carbuncle! For some time now, his younger sister, *Pachi*, had also come to stay with them, a further burden! They had married her into a good family, choosing a good groom! But if happiness isn't written in one's fate, striking one's forehead

against stone is useless! It may well swell the forehead, but fate doesn't improve even a bit—*Pachi's* husband had apparently married some *Kaora* girl after converting her to Islam! But *Pachi's* heart wasn't content with half his kingdom. One day, with the good news of her unborn child, she abandoned all rights to half the kingdom and returned to her mother's sorrowful embrace.

In times of scarcity, there's nothing perhaps as painful as the arrival of a dear guest! One might worship a deity with just one's heart, but one cannot welcome a guest with empty hands. The shame of empty hands cannot be covered even with one's entire heart.

Pachi came with eyes full of tears. Her sorrowful mother didn't even dare to wipe her tears. *Pachi* was her only beloved daughter—her youngest, the last child she bore. She embraced her, but found no peace; her chest began to burst with tears and pain! The mother cried out,

"Oh, my ill-fated daughter, in this heart of thorns, you will find only pain, my child! Where is peace and happiness here?"

It's the prevailing custom of the country for a daughter's first child to be born at her paternal home. Even the most unfortunate father goes to bring his daughter home when she is expecting her first child, fulfills her wishes, and feeds her a special meal (*saadh*). When Pachi was screaming in labour pains, and yet, from last night, due to lack of money, a midwife couldn't be called, only an All-Knower could understand her mother's agony—if He had the faculty of understanding pain.

Just because she came on her own—and because her daughter's fate was so bleak—should she not receive any care or affection? But how could she? The destitute mother cried, ran around, but could do nothing.

She hadn't said anything to her son out of resentment until now, but she couldn't hold back any longer. She came to her son and burst into tears, "Oh, *Pachi* won't live much longer."

Pacaale's irritation hadn't subsided even after having tea. He continued styling his hair, without looking up, and said,

"Let her die! What can I do about it? Can you pay the midwife?"

Indeed, what could he do! And where was the money to come from?

Suddenly, the son looked up and said with irritation, "You quarrel with *Nulo's* mother every day, otherwise she would have come and done everything by now!"

Nulo's mother was none other than—our very own fierce-toothed *Srimati Hidimba*! She not only knew how to quarrel but was also a good midwife.

By then, *Pachi* screamed and fainted. Her mother's heart couldn't bear it any longer. Calling her daughters-in-law to look after her daughter, she rushed out to call Hidimba.

Hidimba was then on her way to the gentlemen's house to sell some cucumbers from her home. As soon as she met Gazal's mother on the way, she scrunched up her face and looked away. But *Gazal's* mother didn't have the presence of mind to notice it then. She ran and grabbed Hidimba's hands, saying, "Nulo's mother, forgive me, sister! Please come running, my *Pachi* won't live!"

Hidimba, not quite understanding the words, was a little bewildered. She forcefully pulled her hands free and said, "What's this drama? Are you going to start another quarrel right here in the middle of the neighbourhood?"

Gazal's mother burst into tears and said, "No, sister, I'm telling you the truth, by Allah! My *Pachi* has been in pain since yesterday; the quarrel was with your *Gazal's* mother, not *Pachi's* mother!"

Hidimba breathed a sigh of relief and said, "Oh! So your *Pachi* is having a baby, I see? She's been in pain since night—and you didn't send for me? Well, you are something else, my dear! If it were us, we'd have gone and sat on your doorstep. Come on, let's go and see!"

As soon as *Hidimba* arrived, *Pachi* cried out, "Auntie, I won't survive."

Hidimba smiled and said, "Don't be afraid, my child; you'll have a golden moon of a son in your arms in no time!"

Pachi calmed down considerably. The comfort of the midwife's arrival seemed to halve her pain.

With a little effort, *Pachi* gave birth to a plump, healthy son. Everyone shouted, "Oh, it's a boy! It's a boy!"

Their joy knew no bounds! It was as if they had seen the Eid moon!

Hidimba placed the child in the arms of the almost-fainting *Pachi* and said, "Here, hold your son. All your pain will disappear!"

Pachi wept profusely.

No one's first kiss fell on the newborn's forehead; it was the sorrowful mother's tears.

Gazal's mother held *Hidimba's* hand and said, "Sister, forgive me!"

Hidimba's eyes welled up. She said nothing but lovingly wiped away the tear-streaked lines from the child's forehead, written by his mother's tears.

Outside, then, following the Christian boys' example, the Muslim boys too were singing—

"We praise the qualities of Jesus."

Three

Due to all these happenings, Pacaale was quite late in going to work that day. His three or four fellow masons, his partners had already started calling for him.

Pacaale came out without eating, carrying his tools. He knew that since yesterday, a famine relief meeting of mice had been held in the rice pot. Their chirping speeches and the scurrying about of the half-naked volunteers had kept him awake all night.

But even if rice could have been arranged by borrowing, there was no stove today either. *Pachi's* child had been born in the very oven-shed. It would be evening by the time they cleaned that room.

Their rice pots at home were as full of holes as the rice itself. The sparrows, finding no straw to build nests there, had flown away long ago. But their shortage was even more acute in terms of space than money.

What was the oven-shed was also the husking shed *dhenkishal*, also the kitchen, and also the sleeping quarter for about seven people at night. In one corner of it, a partition of bamboo mats had been made, creating a *dak-banglo* (makeshift shelter) for about twenty chickens and goats.

Pacaale went to work without eating, and his mother saw it. But she only saw it; only the All-Knower knew what was in her heart, but no tears were visible in her eyes. Instead, she was seen entering her daughter's birthing room, taking her grandson in her arms, and singing various lullabies.

A tiny infant had made her forget the untimely death of her strong, earning sons. For a day, she had forgotten her sorrow. She had forgotten her hungry son!

As Pacaale left, he saw his mother's happy face and heard her singing to his sister's son. His eyes welled up with tears. He quickly wiped his eyes with the towel on his shoulder and went out, smiling.

Mona, one of the masons, suddenly slipped his hand into *Pacaale's* brick-red coat pocket and said, "Come on, brother, pull out a 'chikret'! We're terribly late today; the boss must be baring his teeth by now."

Pacaale said, as he walked, "Oh, you fool, Mona, the cigarettes are all gone."

*Allahrakhat*a untied the knot in his loincloth and carefully took out a bundle of *bidis* tied within it, saying, "Here, take this, I've got khaki cigarettes (*bidis*), want one?"

Kurche quickly pulled out a *bidi* from the bundle and, pressing it against the left side of his lip like a *Sahib*, said in a muffled voice, "Got any *diyashalai* (matches), you rascal, *diyashalai*?"

Goya took out a matchbox with worn-out friction paper and a knife-like emblem from his *nima* (inner garment) inner pocket and handed it to Kurche, saying, "Don't burn more than one stick, mind you. There are only two and a half sticks left."

Kurche looked at the sorry state of the matchstick and the box and said, "You light it, brother, or else you'll say, 'That scoundrel wasted a stick."

Goya had a great reputation for this. Even in a storm, he could light a match so skillfully that it wouldn't go out until it had burned down to the very end!

With half a matchstick and a skillful flick on the worn-out friction paper of the matchbox, Goya lit it with a small tap. Then, cupping the flame with both palms to protect it from the wind, he held it so expertly in front of Kurche's face that it was a sight to behold.

The *bidi* was passed from mouth to mouth until it burned their fingers. Along with it, they performed the annual *shraddha* (funeral rites) of their chief mason and the fourteen generations of the family whose house they were working on.

They were passing through the *Oman Katli* (Roman Catholic) neighbourhood. As they reached a distinctive house, *Pacaale* began to sing:

"Oh, dark darling, I die in the torment of separation!"

But he didn't have to suffer the torment of separation for long! From inside the house, a dark-complexioned, plump girl came out with a pitcher on her hip.

The girl was like a four-piece square loaf of bread. But though she was a bit on the plump side, her face and eyes had boundless grace; her two eyes were like playful fish (safari) darting in the dark waters of grace—constantly swimming around. Her eyebrows were like the wings of a river-gull—flying about, lured

by those fish, by those eyes.

Her thin lips trembled like fresh neem leaves, with the lingering emotion of unspoken words.

Her nose was like a *mohan-banshi* (enchanting flute). In the middle of her chin was a small dimple like a pear.

Her hair was like the clouds of a monsoon night.

But her face's immense grace seemed to be mocked by the thick, square build of the rest of her body.

The girl was Madhu Gharami's daughter. Madhu used to be Muslim, but now he was an *Oman Katli*.

The girl's name was Kurshi. She was nearly fourteen. But she looked like sixteen or seventeen. She was a bit overgrown.

The chief mason's juicy discussion was going on so intensely among the group that they didn't even notice when Kurshi came and stood by their bamboo fence with her eyes full of invitation, and when *Pacaale* suddenly lagged behind.

But they didn't get a chance to speak. A bullock cart was coming from behind—*Pacaale* hadn't noticed it. The cart driver, however, had been observing the girl's movements. It was well known that you couldn't get water standing by a *kacha* (bamboo mat) bush for seven lifetimes. The cart driver couldn't suppress his enthusiasm. He suddenly sang out:

"The boy has curly hair,

Alas, the girls ruined the family honor!"

It wasn't a song, but a bull's bellow! In that bellow, the love between the boy and girl had already abandoned their hearts and soared far, far away!

Pacaale unnecessarily stepped into the nearby blacksmith Reto Kamar's shop. He shouted so that the cart driver could hear, "Hey! When will you give me my fishing hook?" Needless to say, he had never given the blacksmith any fishing hook to make.

Meanwhile, Kurshi suddenly put down her pitcher, broke a branch from a kacha plant, and unnecessarily lashed a passing goat twice, saying, "This cursed goat keeps eating the eggplant plants every day!"

Here too, the mention of eggplant plants was completely irrelevant.

The witty cart driver, in the midst of his song, forcefully twisted the tail of the right bullock and tickled the underside of the left bullock with his left foot, then made two loud clicks with his tongue against his palate, and continued to sing the last line over and over again—"Oh, the girls ruined, alas, the girls ruined the family honor."

In pain and tickled, the pair of bullocks galloped away with their tails raised high.

Pacaale, with a look of despair, glanced once at Kurshi, who was chasing the goat, and then ran to join his companions. The cart was still moving, but the cart driver's face was turned backwards.

Fearing the dust from the cart, the group stepped aside. Janab exclaimed, "Ugh, that scoundrel's voice is not a voice, it's like a *hændol* (a large, harsh bell)! Who is that scoundrel?"

Pacaale said in a bitter voice, "That rascal Nyara Goyla (bald milkman)—he's not singing, he's attacking."

Everyone laughed.

Suddenly, one of them shouted, *Khadag Pache*.

Immediately, everyone became alert. The one who uttered that coded message was nudged by another, who quietly asked, "Where is it?"

Not far away, a gentleman had left his bi-cycle and was relieving himself by the roadside. Pointing in that direction, *Pacaale* said, "There he is, *Neel Choãy*."

By then, the gentleman engaged in that act had also seen them, and they had seen him.

These masons worked at that gentleman's house.

These masons had many 'code words'—secret phrases—Whose meaning no one else understood. *Khadag Pache* meant that the *sahib* or gentleman was coming or watching, and *Neel Choãy* was used in the veiled sense of that particular act.

After this, the entire group suddenly launched into discussions on such topics that one couldn't imagine them to be anything but truly innocent, eternally suffering daily labourers.

Four

As soon as *Pacaale* left, his twelve hungry nephews and nieces began to *fariyad* (plead/complain) in a strange melody due to the pangs of hunger. This wailing would surely disturb everyone except perhaps the owner of the food and a heart of stone.

Sejo-bou (*Pacaale's* third sister-in-law) had barely survived typhoid a week ago. But only just survived. Apart from a faint breath, there was no other sign of life in her. What remained of her body was useful for nothing but burial. It was as if a crocodile had chewed, swallowed, and then regurgitated her.

Just as a butcher pounds meat, so too had disease, sorrow, grief, and poverty—these four together—pounded her.

In her lap was her baby—the last memory of her husband. Only two months old! Since birth, without its mother's milk, it had withered to the size of a bat.

With a dry, weak voice, the helpless infant cried, then stopped its wailing for a moment in vain hope of a drop of milk from its mother's chest, which was even drier than its own throat. Then it cried again. It was not a cry, but a protest against existence. It was as if someone was throttling it.

Its mother then cried out, "Oh Allah, I can't bear to see this anymore, take my child to you. Let it die and find peace."

Her chest was flooded with tears.

The baby stopped crying, licked that salty water, and cried again.

From the girls' room, the grandmother, after placing her new-born grandson in her daughter's lap, came out and cried in a bitter voice, "Die, die, all of you! So many people are taken away, but death has forgotten you! Then, addressing her daughters-in-law, she said, "Come on, you *betakhagis* (son-eaters), chew the heads of these bastards of yours. These women have given birth to children like pigs. Oh my God! My life feels like bitter blood!" Saying this, she wailed loudly, calling out the names of her deceased sons. By then, the eldest daughter-in-law had put down the water pitcher and, unable to restrain her two older children, was taking out her frustration on the back of her one-year-old younger daughter.

Mejo-bou (*Pacaale's* second sister-in-law) tried to intervene but couldn't. In trying to separate the girl, she too received a blow or two on her back! *Mejo-bou* laughed, then signaled the other children to run away.

She didn't even look at her own two children. They seemed to have inherited their mother's quiet disposition. Among the children in the house, these few were calm. When hungry, they would quietly hug their mother and whisper into her ear, "Mother, I'm terribly hungry."

Even today, when *Mejo-bou* was comforting the eldest daughter-in-law's crying little girl by holding her to her chest and swaying her, her own children were quietly trying to appease their hunger by breaking open a raw *kodbel* (wood apple) and eating it. Only the youngest child looked at his mother with mournful eyes, as if deep in thought.

Suddenly, he said, "*Bubu*. Oh, *Bu-u*! Will Mother put Mini down from her lap again?"

The astringent juice of the raw *kodbel* had made his *Bubu's* tongue stick to her palate. She managed to say, "Hmm."

Mejo-bou turned to her children and said, "*Potli*, go fetch four pieces of firewood, will you? I'm making kheer for you all."

The children, who had been out of sight out of fear of their mother until now, now seemed to emerge from underground by magic at the mention of kheer.

They danced and leaped around *Mejo-bou*, tugging at her clothes, shouting and screaming, creating a tremendous commotion. It was as if they would tear *Mejo-bou* apart and devour her.

A flock of sparrows seemed to have spotted a worm.

Mejo-bou's youngest son, who had been sitting quietly until now, slowly came and sat in his crying grandmother's lap and began to think; then, taking off his torn, dirty shirt, he wiped his grandmother's eyes and said, "Grandma, stop crying, Mother is cooking *kheer*, you'll eat, I'll eat, Bu will eat."

His grandmother's crying ceased. That tiny child. His father looked exactly like that when he was a child. For whom was she crying? This was her Sobhan. Those whom she had just cursed so much, they were her Barik and Gazal. They would cry like this when they were hungry. And when they cried, Sobhan would sit on her lap and wipe her eyes and say, "Mother, don't cry, when I grow up, I'll bring you sixty rupees." Who says Sobhan is dead? He has returned, a baby just like him. He's here, clinging to her neck. She drenches the child's face with kisses and tears.

The child's tiny face gleamed in the lap of the eternally sorrowful mother—like a dim moon on a rainy night.

The child suddenly got up from his grandmother's lap and ran to lean his head against his mother's body. He stared at the sky, deep in thought. A dove flew by, crying. The blue, clear sky, touched by the sun, seemed to grow even more poignant. How far away was that sky!

Suddenly, he tugged at his mother's *sari* end and said, "Mother, you said father (*ba-jan*) would come on *Kheer-Porob* day. We're cooking *kheer* today, so father will come, breaking through the cloud! Won't he?"

The mother collapsed onto the dry leaves. The song on her lips was washed away by her tears!—Dry mango leaves burned by themselves, moving towards her.

The mother-in-law rushed over and tried to lift the fallen daughter-in-law, and *Mejo-bou* instantly sprang up, then pushed leaves into the oven with a stick.

This time, the child sat quietly without saying anything.

His grandmother said, "Look, daughter-in-law, Sobhan used to be so withdrawn day and night, right from childhood."

Mejo-bou hummed a song again.

The mother-in-law said, "Oh, get lost! The girl seems to be getting younger day by day. Whenever there's crying, there's laughter." Saying this, she pulled the child into her lap and wandered around the yard unnecessarily.

The child asked an incessant stream of questions, "Grandma, father is very big now—isn't he? He said he'd bring biscuits for me—. That Goari market—it's very far, isn't it, Grandma? It takes a long time to go and come back, doesn't it, Grandma? I'll give my red shirt to Lalu, father will bring another red shirt. Won't he, Grandma?"

Grandma heard some of it, not all of it. She roamed across the courtyard.

Sejo-bou lay watching the *kheer* being cooked. The tiny child, by then exhausted from crying, had fallen asleep on its mother's bony chest.

The *kheer* was cooked. The children, taking whatever they could find—plates, bowls, small jugs, water pots—sat around the oven.

It was extraordinary *kheer*! Not far away was the house of *Daroga* Mirza Sahib. The portion of milk his cat had left, unable to drink it all, was what *Daroga-Ginni* (the Daroga's wife) had sent to their house. Such was her immense mercy that she mixed water with that small amount of milk, turning half a *poa* (about 120ml) of milk into half a ser (about 450ml), and sent it through her maid. The tears of gratitude that flowed from everyone's eyes upon receiving this unasked-for water were far more than that half ser of water.

That day, rice was scarce at home. The three *chataks* (about 34g) of reserved broken rice and husks for the newly hatched chicks were cooked with the Daroga's milk to make this delicious kheer. This was the hungry children's entire meal for the day.

This was their *Kheer-Porob*—their Eid.

Only *Mejo-bou* had tears in her eyes watching the children eat that wonderful *parmanna* (sweet rice pudding) seasoned with salt.

She quickly went to the bamboo fence and stood there silently. Then, she took a few *kacha* leaves, softened them with a stick to form a bowl, poured some kheer into it, and offered it to *Sejo-bou*.

Sejo-bou sat up and said in a pained voice, "*Mejo-bu*, you?"

Mejo-bou smiled faintly. It was a pale, wan smile, like the rays of a moon eclipsed by Rahu.

Sejo-bou knew Mejo-bou well. She said nothing more, but as she ate, she suddenly stopped and said, "Will Khoka (the baby) eat this *kheer*, *Mejo-bu*?"

Mejo-bou replied, "You don't have to worry about that. I've saved milk for *Khoka*. I'll feed him when he wakes up."

Mejo-bou put down the water pitcher, held her hands over the warmth of the fire, and exclaimed, "Ugh, my back and waist are aching, Mejo-bou. From tomorrow, you fetch water, I'll husk rice instead." As she massaged her hands over the warmth, she continued, "My hands are swollen from hitting that *gator-khagi* (one who eats up one's body/strength). That wretch's back isn't a back, it's a stone!"

The children, by then, had finished their *kheer* and were joyfully playing '*Bou Palaalo*' (The Bride Ran Away)! One of them, playing the runaway bride, ran towards her unknown paternal home, with the rest following her, singing:

"The bride ran away, the bride ran away, with the pot of broken rice,

We'll go to fetch that bride with a broomstick."

Five

Just as dusk was setting, *Pacaale* entered the house with rice and lentils in his hand, a foot-*gaj* tucked under his armpit, a *konnik* and sut in his pocket, and *paan* and a *bidi* in his mouth.

The children seemed to swarm around him.

Seeing a *Boal* fish among the rice and lentils, they all shouted in unison. It was as if they had seen a gem on a snake's head.

Pacaale wiped his hands on his coat sleeve, pulled out three small paper packets, and said, "I plastered a portion of Nalit Doctor's house today and brought this medicine for *Sejo-Bhabhi* (*Sejo-bou*). Wait, let me give her one packet first."

Sejo-bou looked at the medicine and said happily,"What medicine is this, *Choto-mian* (Little Master, a term of address for younger brother-in-law)? Is it Allopathic or Homeopathic?"

Pacaale chuckled knowingly and said, "This isn't Allopathic, Sejo-Bhabhi, it's Homeopathic. It's sweet like jaggery. Just try it."

After taking the medicine, *Sejo-bou* felt as if she was gradually regaining her strength. Unable to suppress her happiness, she kept saying, "If I get two more days of medicine, *Mejo-Bubu*, then from next month, I'll be able to husk a huge amount of rice all by myself."

Mejo-bou, as she put away the rice and lentils, said, "Yes, please get well soon, by Allah's grace, I can't bear to tread the husking machine anymore. I prefer sewing clothes; even if I get two pice less for it, there's peace in it."

Boro-bou (*Pacaale's* eldest sister-in-law), scraping off the cow dung from her hand with a bamboo splinter, said, "Can't you teach me that sewing, *Mejo-bou*! But I won't be able to do altering (*repu*)."

Mejo-bou laughed and hummed a song as she cut the fish. The group of children gathered around Mejo-bou, watching her cut the fish with open mouths, quarreling over which part of the fish each would eat. It was as if they would eat it raw.

The two elder children, a boy and a girl, drew water from the well and said, "Well, Choto-Chacha (youngest uncle), will you eat the fish head today? Potli said Choto-Cha would give me the head today!"

Pacaale thought about something while bathing. He only said, "Hmm."

Hearing his "Hmm," the boy became anxious and said, "Well, Choto-Cha, will you take me to work as a 'jogar' (helper) from tomorrow? That Bhulo from the other neighbourhood is much smaller than me, and he brings two annas every day by being a 'jogar.' —Well, Choto-Cha, can't you buy one fish for two annas?" Then he looked at his sister and said, "From tomorrow, I'll have a whole fish just for myself! I'll show it off and eat it! If I even let Potli touch a scale, my name isn't Gorai, hmm hmm."

His sister stood there with a downcast face, hatching some plan. Then she suddenly blurted out, "From tomorrow, I'll also push Daroga Sahib's daughter's pram—hmm hmm! Sahib said he'd pay me three taka! Not two annas—three taka. Then I'll make Choto-Cha bring me jalebi and methai!"

Pacaale finished bathing and entered his sister's birthing room, saying, "Hey Pachi, show me your son!"

Before Pachi could say anything, her mother rushed in and said, "How can you see him empty-handed, Pacaale!"

Pacaale, shrinking in his destitution, said, "Okay, I'll come and see him tomorrow or another day. I completely forgot that you shouldn't see a newborn empty-handed." Saying this, he quickly went and sat by Mejo-bou in the kitchen.

Mejo-bou was draining the starch from the rice, having just put the fish on to cook. She glanced around a bit and then said, "Sejo-bou won't survive, Choto-mia!" Then, with a sigh, she continued, "They'll both go this time, mother and son. What the child has done all day today! There's not a drop of milk in the mother's chest, and with all this hassle today, I even let the goat loose. That goat's milk is the child's life! The child has thrashed around like a fish out of water for just a little milk! Still, thankfully, Daroga

Sahib's wife gave a little milk. I kept a little of it, but the child didn't drink more than two spoonfuls. He just fell asleep after all that crying." Saying this, she shook the rice pot, turned the rice over, and left the lid slightly ajar beside it.

Pacaale said nothing, slowly got up, and went outside.

Six

Suddenly, that day, *Sejo-bou*'s condition became critical, almost terminal. Nakori Doctor from the '*Chhiten*' (Protestant) neighbourhood came to see her, having promised to whitewash his sitting room for free. He said, "You are poor folk, I won't take a visit fee, my dear—just whitewash my sitting room a bit, a three-day job, that'll do, what do you say?"

Pacaale wiped his tears and nodded in agreement, looking at the doctor with gratitude.

Nakori Doctor checked her pulse and said, "Her condition doesn't look good, my boy, there's a big fear of heart failure."

Mejo-bou motioned to *Pacaale* and whispered, "What an insensitive doctor, to tell a patient her condition like that!"

Nakori Doctor had probably understood the meaning of *Mejo-bou's* gesture by then. He quickly called *Pacaale* and said, "Hey, you have chicken chicks at your house, don't you? Make some broth and give it to her. She'll perk up right away. Don't worry, she'll get better now." Saying this, he yawned, snapped his fingers twice, and stared wide-eyed at *Mejo-bou's* face, as if he would devour her! *Mejo-bou* smiled faintly and moved into the kitchen. *Boro-bou* (eldest daughter-in-law) exclaimed, "Why are you laughing so much, hey!"

Mejo-bou said loudly enough for the doctor to hear, "Because the problem of the stale ashes in the stove has been resolved." Then, with a slight laugh, she added, "Just like the stove-faced god, so are the offerings of ash and rubbish."

The doctor had already risen by then. His own pulse was racing more than the patient's. …

Mejo-bou's beauty was a constant topic of discussion in the neighbourhood. Even burnt by the fire of sorrow, that gold seemed not to have tarnished an inch. Like a moon washed by the monsoon rain, her beauty still shone brightly. The neighbourhood women would say, "That wretch, becoming a widow, she's turning into a bull every day."

Her worst habit was that she laughed for no reason. It was a matchless laugh—like a blossoming flower, a sudden moonrise.

The doctor had seen nothing of *Mejo-bou* but her empty, perfectly formed hands, a pair of feet like white doves, and half a chin including her lips, which were like golden bangles glimpsed through the opening of her veil. But even this was enough to make his pulse race as fast as a patient with a hundred and five-degree fever.

Stopping abruptly near the door, the doctor said, "Hey, do you have chicken eggs at your house? I really needed some for some medicine."

Pacaale felt obligated just because the doctor sahib had asked. He said very humbly, "Yes, indeed—I'll bring them right now." As he entered the room, *Mejo-bou* said with a hint of irritation, "He won't get any eggs, *Choto-mia*! Tell him there are no eggs at home. Oh, that man, what a thing to ask for! How many meals for the children will those few eggs buy if sold?"

Pacaale had by then brought about eight eggs and presented them to the doctor. The doctor took out his stethoscope from his baggy pocket and happily pocketed the eggs.

Mejo-bou shouted a little, "What's that hanging around the doctor's neck, *Choto-mia*? Did the man hang himself?"

Pacaale now said, somewhat angrily, "You shut up, *Mejo-Bhabhi*, it's not always pleasant, huh."

Mejo-bou ignored him and began to hum a song—

"With how much hope I bailed the ocean

In hopes of finding gems,

At last the ocean dried up, the gems hid away

By the fault of this unfortunate one's fate."

It wasn't a song—it was a heart-rending cry!

Boro-bou listened entranced and said, "Truly, *Mejo-bou*, if you were born into a grander family, you would have been the Judge Sahib's wife." Saying this, she sighed deeply.

Mejo-bou ignored her words and continued to hum her song as she scraped the oven. It was as if her listener was no one in this world.

"Don't speak the name of the cruel beloved,

If you speak his name, my heart will cry

My heart…"

Seven

The next day, *Sejo-bou* lay motionless as if she had turned to stone. The infant at her breast was still and silent. Even the grandmother, who had been loudly wailing, was now sitting with a cloth over her head, making strange sounds.

A few days earlier, the infant had been a golden moon, a Solomon's seal, on his mother's thorny breast, a source of peace for his grandmother. Now, the grandmother thought, how could she bear the burden of this dead weight? The burden of the living was hard enough; a corpse, though small, was heavier than a mountain.

The infant's tiny body seemed to mock the grief of the living. It was not sorrow, not despair—it was humiliation, naked and cruel.

Mejo-bou felt nothing in her heart, but her tears flowed freely. They were like the tears of the goddess Ganga—she cried for everyone, for the living and the dead.

She had to get out of the house. She had to take out the old dheki (rice husker) from the oven-shed. The place where the baby had taken its last breath was where the dead baby's mother would

sit and pound rice, and the living children would warm themselves by the stove.

The neighbourhood women came. They did not show sorrow, nor did they show mercy. Perhaps they came to show their power, to assert their right to perform the rituals of death. Or perhaps they came to see the curious play of the cruel demon of hunger for the umpteenth time.

A woman from the Christian quarter came and whispered to *Mejo-bou*, "Didn't she say she'd buy an embroidered quilt from me for her child? I made it, even stayed up late at night. What's to be done with it now?" *Mejo-bou*, still wiping her eyes, thought, "That wretch! She'll surely sell it to someone else for another two pice!"

Boro-bou, now more composed, said to *Mejo-bou*, "What a strange country, sister! People buy things even for the dead."

Pacaale had left for work in the morning, not knowing about this. If he had known, he might have tried to arrange for a shroud and burial money. The family had some hope for his return.

At last, *Mejo-bou* said with a sigh, "Let her go, *Boro-bou*. What's the use of keeping her here any longer?" But who would take her? No one had the time or inclination.

Then, Gazal's mother, Nulo's mother, and Puter Ma, the three of them, came to the front of the house and called out, "Hey, *Mejo-bou!* What are you doing inside? Aren't you going to take the baby to the burial ground?"

Mejo-bou, in a surprisingly calm voice, said, "Who's going to take him, *Didi*? Who has the money to call a *mullah*?"

Gazal's mother said, "Oh, shut up! The *mullah* will come. What kind of talk is that?"

The Christian women said, "Why don't you bury the child? We'll bury him in our cemetery without any priest. You can even join our faith; it's free. Come on, we'll bury him."

Gazal's mother, with her back turned to the Christian women, addressed *Mejo-bou*, "Just tell me, *Mejo-bou*, who are the boy's

maternal uncles and aunts? Whose *namaaj-e-janaza* (funeral prayer) should be offered for him?"

Mejo-bou was quiet for a moment, then said, "His maternal uncle is the one who will lift him. That's his uncle's duty, isn't it? He went to work this morning without eating. Who knows if he'll even come home for a meal today?" She then pointed to the young boy who was with her. "This little boy will be his paternal uncle. Let him carry the baby for now."

The three women walked away, holding the piece of cloth that covered the small bundle. The boy led the way, with the women following. *Pacaale's* mother and the two daughters-in-law remained inside, silently shedding tears. They were not crying for the dead, but for the living. The dead one was peaceful; their own suffering was boundless.

The neighbourhood women, who had been there, joined the procession. Some said, "Let's see what happens!" Others, "This is fate!" And some, "What a relief! The mother can finally sleep in peace."

When the procession reached the burial ground, they found the grave ready. Some neighbours had already dug it. The *mullah* had arrived without being called. Perhaps he thought it was his duty to perform this final service for this child of sorrow.

The tiny body was laid to rest. There was no sound of weeping, only a soft, gentle rain began to fall. As if the heavens, seeing this profound sorrow, were weeping tears of compassion.

Eight

Many days had passed since the incident. Life in the neighbourhood went on as before. In fact, nothing really changed. The sun rose and set, the world turned, and people lived and died. Sorrow and joy, laughter and tears, were just fleeting shadows. Nothing was permanent.

After all that, one day, *Pacaale* and his companions were working on a new building on Chand Road. The work was

progressing quickly. *Pacaale* was a skilled mason, known for his speed.

Pacaale was singing, and his companions were humming along. He often sang the song that *Hidimba* used to sing – the song about the cruel beloved, about the drying ocean and hidden gems.

Today, a woman stood listening to him sing. She was not well-dressed, but she had a distinct charm. She was one of those women who could not be categorized as a typical neighbourhood girl or one of the working-class women. She was neither beautiful nor plain, neither old nor young, neither rich nor poor. She was just a woman, standing there.

Pacaale finished his song and said to his companions, "Hey, this is hard work! Let's take a break. My throat is dry from all this singing."

The woman came forward and said, "Could you sing that song again, mister? I like it very much."

Pacaale looked at her. Her face was covered with a veil, but her eyes held a strange, familiar sadness. He said, "You like this old song, sister? It's just an old tune."

She nodded. "It brings comfort to my heart."

Pacaale started the song again, this time with even more emotion:

"With how much hope I bailed the ocean

In hopes of finding gems,

At last the ocean dried up, the gems hid away

By the fault of this unfortunate one's fate."

As he sang, he noticed that the woman's eyes were filled with tears. Her shoulders were shaking slightly. He paused the song.

The woman slowly pulled back her veil. It was *Mejo-bou*. Her face, usually radiant even in sorrow, now looked more worn, more tired.

Pacaale looked at her, then quickly looked away, feeling a strange mix of embarrassment and pity. He knew this song was *Mejo-bou's* song. It was her soul's lament.

Mejo-bou wiped her eyes with the corner of her sari. Her voice was barely a whisper. "You sing well, *Choto-mia*. You sing just like my heart cries."

Pacaale said nothing. He picked up his trowel and began to scrape at a loose piece of plaster on the wall.

Mejo-bou stood there for a moment, then turned to leave. As she walked away, *Pacaale* watched her. He saw her frail figure, burdened by unspoken sorrows, walking towards the distant, hazy horizon.

The sun was setting. Its last rays painted the clouds in shades of orange and red, but for *Mejo-bou,* the sky remained grey, heavy with unfulfilled dreams. *Pacaale* sighed. He knew that for people like them, the ocean of life would always remain dry, and the gems of hope would forever be hidden away by the cruel hand of fate.

He began to hum the song again, softly, this time not for his companions, but for the retreating figure of *Mejo-bou*, for himself, and for all those whose lives were a continuous lament of dried oceans and hidden gems.

Nine

That day, *Boro-bou*, *Pacaale*, his mother, and *Pachi* sat down for a secret consultation.

Pacaale, extremely agitated, said, "I can never do that. I'm leaving for Ranaghat tomorrow. I'll earn fourteen annas a day there."

His mother pleaded, "Why are you angry, son? This is happening in all poor households like ours. Besides, I can't forget her moon-like face. Such a daughter-in-law will become a stranger! If my fate weren't so cursed, why would Shovan die, and why would I have to ask you for this favour?"

Pachi, agreeing with her mother, spoke up, "Indeed, brother, you have a strange shyness! So much of this is happening! Just because you called her sister-in-law once, does that mean you

can't do it anymore? It will be awkward for two days, then it will become normal, just you see."

Pacaale snarled, "You shut up, Pachi. What nonsense! Why didn't you marry your brother-in-law then?"

Even though Pachi was a mother, she hadn't outgrown her childish ways. Hearing the suggestion of marrying her brother-in-law, she flared up, "Why would he marry here? He's going to marry Kurshi after becoming a Christian!"

Pacaale, getting up angrily to leave, said, "Keep your marriage, I'm leaving!" And he walked out!

Boro-bou said, "I told you then, Mother, that this wouldn't work. Besides, even if your son agreed, that girl—she would never agree."

The mother-in-law let out a huge sigh and said, "Fate, my child, fate! What can you do? That old wretch was in her destiny!" And she began to weep, addressing her dead son, Shovan.

Boro-bou said, somewhat angrily, "It's your exaggeration, Mother! You know *Mejo-bou* doesn't agree to that marriage, yet you cry about it day and night. You'll drive Mejo-bou away like this."

Just then, *Mejo-bou* arrived from her father's house. *Boro-bou* smiled and said, "What, sister, did you return in a pair, or alone?"

Mejo-bou, without answering *Boro-bou's* riddle, said bitterly, "The way you all are making things, it seems I'll have to find a pair for myself." Then, looking at her mother-in-law, she said, "Oh, Mother! The whole neighbourhood is talking about this! There's nothing left of scandal! Tell me, Mother, do you want to drive me out of the country like this? You know my sister is still alive today. Go ask the Maulvi Saheb if one sister can be married while another is still alive?" Saying this, she sat on the verandah and swung her legs, like a little girl when she's angry.

Boro-bou happily exclaimed, "You're absolutely right, *Mejo-bou*. See, none of us remembered that you can't marry one sister while another is alive. Truly, *Mejo-bou*, there's nothing you don't know. Our Hafez Saheb is no match for you." Saying this, she

began an elaborate description of a *fatwa Mejo-bou* had given on some matter on some day.

But her mother-in-law's suspicion did not clear. She stopped crying and said, "You stop, *Boro-bou*, I've seen many such things. How many people, right before our eyes, divorced one sister and married another. How long would it take that wretched man to divorce *Mejo-bou's* elder sister?" And she continued her weeping.

Mejo-bou's little son, as usual, tried to stop the crying, "Grandma, spit!" *Mejo-bou* pulled her son by the hand, dragging him. She said, "Your father-cursed grandma! Wretched face! Always gossiping!"

The boy had been grandma's favourite since childhood! The more he was beaten, the more he would say, "Oh, Grandma, they're killing me."

The old woman snatched the boy from her daughter-in-law and began to curse *Mejo-bou's* parents! Then, wiping the boy's eyes with the corner of her *sari*, she said, "Look, Boro-bou, Shovan looked exactly like this, he used to cry with a pouting lip just like this when he was a child! Exactly the same sound."

Boro-bou said, "But isn't the spot on his forehead like his elder uncle, *Mejo-bou*?"

Mejo-bou said nothing. She sat on the verandah, swinging her legs absentmindedly, and hummed a song softly.

Sejo-bou turned on her side and coughed. It seemed as if her life was stuck in her throat. Her coughing sound was as terribly poignant as the sound of cutting bamboo for a grave.

Beside her, the infant could no longer cry, only gasped; like the sound of death's wings.

In the midst of this, suddenly one day, a group of children came running into the house, shouting, "Oh, the Padre Saheb and the Mem Saheb are coming to your house!" The whole house was startled! Indeed, a Padre Saheb, accompanied by a nurse, entered

the house. The wives and daughters-in-law rushed inside. Only Pacaale's mother stared at the Saheb's face, bewildered.

The Saheb spoke Bengali well. He said, "You all will not be afraid. I have come hearing your troubles. Whoever among you is suffering, I will give them medicine!"

Pacaale's mother was a little flustered at first. Then she stammered, "May God bless you, Saheb. There lies my daughter-in-law and her child. See if you can cure them. We will be indebted to you then?"

The Saheb happily said, "No worries. Jesus will make them well. Pray to Jesus." Then he stepped forward and sat on the ground, examining the child. The *Saheb* was a good doctor.

The *Saheb* indicated something to the nurse in English and then stood outside on the road. His face was grave and sad.

The nurse began to examine Sejo-bou. After the nurse's examination, they both stood outside and talked for a long time. Then they called Pacaale's mother, gave her some medicines, and advised her about the timing of administering them before leaving. They said they would come back in the afternoon to check again.

Pacaale's mother almost cried with joy. She said, "The girl has good fortune, *Mejo-bou*, will she die even after taking so much medicine? Look, how many medicines they gave!"

Mejo-bou said, "The Mem Saheb gave a rupee when leaving, to buy medicine for Sejo-bou. She said to give her pomegranate juice. As she spoke, tears dripped from her eyes. Mejo-bou cried,

"Allah had written so much sorrow in my fate. Even at Sejo-bou's last moment, I couldn't give her two grapes or a pomegranate bought with my own money! Even if we die of thirst, no one comes to ask. A curse on my own people, on my relatives! No wonder everyone becomes Christian!"

The mother-in-law cried, "You speak the truth, my child."

Ten

That day was Sunday. A holiday.

Pacaale went out to bathe around two o'clock.

Before leaving, he held the empty oil bottle upside down on his palm for a long time. In about five minutes, five drops of oil fell. It wasn't exactly oil, but a thick residue. Even after hitting the back of the bottle two or three times, when no more than one drop of oil came out, he somehow smeared it on his face and hands and went outside.

He didn't put that oil on his head—

—whether he considered his own head oily or not—only the greatest owner of oiling oily heads in the universe knows.

His towel couldn't really be called a towel—it was a greasy rag, which he tied around his head like a fancy gentleman's headscarf. This somehow covered all but the sorrow on his forehead!

With this flag of good fortune on his head, Pacaale walked through the Christian quarter to bathe. Mongla Pond was closer to him, but why he went all the way to Golpukur to bathe was no longer a secret to those who bathed there. Perhaps because the path of love is not straight, he did not take the straight path.

People said that the flag on his head was not a claim to half of Madhu Gharami's kingdom, but to conquer his 'princess' Kurshi. But he himself became annoyed by the dishonour of that flag—when he had to rub his body with that flag right in front of Kurshi.

When he went to bathe, he always passed by Kurshi's house. He was doing so today as well. But seeing the door of the house latched from the outside, he sat down—not on the road—but at Roto the blacksmith's shop.

Roto, while pushing his bellows, glanced at him sideways. It seemed as if he was suppressing a laugh while hammering the iron.

Pacaale sweated even more than Roto, even though he was far from the fire.

Roto placed a glowing piece of iron on the anvil, looked at Pacaale, and said, "See, by God, the trouble of playing with fire! Look how much of my hand is burnt!" Saying this, he hammered the iron with all his might and laughed. Pacaale stared blankly, not understanding.

Roto heated the iron again in the fire and, pushing the bellows, said, "Women and fire—they are both the same, you see, both burn your hands."

Kurshi had been standing somewhere, only she knew; suddenly her voice was heard, "And they burn your face too, you wretch!"

Pacaale quickly got up and went towards the pond. Roto's voice was still heard, "Hey, Pacaale! You push my bellows for a bit, brother, I'll go cool down in the water!"

Kurshi, carrying a bundle of clay-soaked clothes, walked towards the pond, giving Roto a sidelong glance as a greeting. As she left, she also said, "Don't go, you wretch, you'll become completely cold. If you drown in the water, you won't have to come up again."

Roto perhaps then thought that drowning in cold water was far more comfortable than dying from the heat of this fire.

But Roto's hand was burnt, not his fate. Even if Kurshi couldn't see him, she didn't hate him.

None of the others who bathed in Golpukur came at this unusual time—two in the afternoon. So this was the most opportune time for those who came not just to wash their bodies, but also to soothe their souls.

Kurshi arrived to find Pacaale sitting on the roots of the banyan tree by the ghat, smoking a cigarette. Pacaale occasionally begged a cigarette or two from the theatre-going gentlemen and never smoked them with anyone but Kurshi. Even today, he hadn't forgotten to tuck the cigarette he had begged yesterday into his waistcloth when he came to bathe.

Kurshi, without looking at Pacaale, dropped her pile of clothes and the small stool with a thud on the ghat and tightly wrapped the end of her sari around her waist. Then, without looking at anyone, she said loudly, "You old wretch! You bother me every single day! One day I'll throw stale ashes from the stove on your face, then you'll know what fun it is!"

Pacaale could no longer remain silent. He couldn't even tell if this north wind was blowing towards him or towards Roto. He quickly got down and sat on a rotten date palm stump on the adjacent ghat, and, taking a piece of broken pottery, began to rub the dead skin off his foot, saying, "Are you angry today, Kurshi? You see how those scoundrels have started to stare!"

Kurshi, wetting a piece of cloth and standing to wash it, said, "I don't care! Now I don't need your Kurshi. Your Mejo-bhabi isn't as dark as I am. Let her be a mother of children."

Now Pacaale could somewhat determine the direction of the wind. He stopped rubbing his foot and quickly said, "By Allah, Kurshi, by God, I am not marrying her. My mother told me, and I gave her a good piece of my mind. I said I won't even stay in this cursed village. I'll go to Ranaghat to work."

Kurshi's cloth fell into the water. She said with a crestfallen face, "Are you really leaving?"

Seeing that the medicine had worked, Pacaale happily exclaimed, "Of course I'm going! What if they force me to marry Mejo-bhabi?"

Kurshi picked up the cloth and washed it for a long time. Pacaale watched her peculiar movements while washing clothes, his eyes filled with hunger and a drug-like intoxication! His heart beat faster and faster. He seemed to be afraid of himself. For no reason, he looked around the pond with a frightened, startled gaze—as if he was stealing something. Blood rushed to his head. He got up and grabbed Kurshi's hand. His legs trembled. A flame flickered in his eyes. He called out in a dry voice,

"Kurshi!"

Kurshi pulled her hand away and said, "Go away, by God, someone will see us right now. You have no sense!—First tell me, you won't go to Ranaghat."

Pacaale, emboldened, said, "Look, I'm facing the mosque and saying, by Allah, Kurshi, I won't go anywhere unless you tell me to."

Kurshi happily said, "No! Swear on my body."

Pacaale touched her body and said, "Are you greater than the mosque?"

Kurshi smiled very sweetly. She said, "Yes, I am." That smile could sell kings and emperors. Pacaale couldn't resist and did something extremely daring.

Kurshi was happy, and also angry. She turned her face away and said, "Go, I don't like it, someone will see us right now."

Pacaale also knew that anyone could see them at any moment. But that smile! Those eyes! Those lips! That sway of her body! Let people see! Pacaale seemed to be intoxicated. He lost all sense.

He returned home after bathing. His whole body felt numb. As if he had drunk toddy. The veins on both sides of his head throbbed. The whole world vanished from his sight. He only heard the anxiousness of that timid, sweet voice, "Someone will see, someone will see!"—He felt no shame in that, only shame for the person who would see.

Their shame was not for themselves, but for others.

They both walked—on the eternally trodden, blood-stained path. The path stained with the blood of Farhad-Majnu, Layli-Shirin, Gole-Bakouli, Mahashweta-Pundarik, and so many others. The eternally youthful, eternally thorny path. They were like the eternal Romeo-Juliet, Dushmanta-Shakuntala!

Eleven

"A storm comes from a moment's mistake."

No one knows from which path of life disaster will strike, for a moment—overturning everything in an instant—when the ropes of bondage will break.

I once saw a storm—not a storm, but just a whirlwind—pass over a pond full of blooming lotus flowers. I have not forgotten the memory of that helpless lotus pond even today. Perhaps I never will. The waves of the water remained the same—but the lotus forest was completely overturned! Where had the beauty of those red lotuses gone, where had the swans and their mates flown away? Only thorny stalks and torn lotus leaves remained. The face of the pond was no longer visible with the petals of the torn lotuses.

It was as if a fainting, startled *Shakuntala*, with dishevelled clothes, was in a huff! As if someone had trampled and crushed her underfoot.

A momentary storm. ...

Inside, *Mejo-bou* cried; outside, Kurshi cried. One with hatred, anger—the other with hurt pride, and the helpless torment of pain.

Pacaale had gone somewhere.

Mejo-bou, in anger, bit her own hand, dying of futile rage. This was a man again, a male! He could not disregard the fear of such a lie. The stone of false accusation that people threw at them, he could not pick up that stone and throw it back at them. At least he could not walk past them with a smile of disdain and his chest held high. And in the end, he ran away! Admitting defeat! Coward! *Mejo-bou* thought, and then made a resolution. Her beautiful face became as hard as a stone statue.

Where the man had admitted defeat and fled, she would stand and fight, but would not retreat.

The mother-in-law cried, *Boro-bou* lamented, and the children stood on the road every evening. At such twilight times, he would come with something or other for these children! Sometimes 'lozenges', sometimes catfish.

Mejo-bou's absent-minded son stared fixedly at the sky. Then he said to himself, "You don't have to bring anything, little uncle, just come as you are." He said to his mother, "Mother, has little uncle gone to father's place? Does he not let him leave from there?"

The mother hugged her son to her chest. She said, "Nonsense! May evil be averted! Why would he go there? He's gone to Ranaghat to earn money."

The child did not stop. He said, "Is Ranaghat farther than where father lives, Mother? No, Mother?"

The mother put her son down in the dust and got up.

The sound of the evening call to prayer from the mosque echoed in her ears like a cry. It seemed to constantly remind her—the day is ending, there is no more time!

... The traveller on the path of life became apprehensive!

The evening prayer—like the funeral prayer for the deceased day, praying for its soul's final well-being!

Mejo-bou, like a madwoman, rushed to the steps of the mosque—not to prostrate—but to fall prostrate and beat her head. The dust on the steps became muddy with her tears—leaving its mark on her forehead. Only she knew what she prayed for. From inside, the *Maulvi Saheb's 'takbir'* echoed, "*Allahu Akbar*!" *Mejo-bou*, with her head on the steps, said, "*Allahu Akbar*!" Her voice choked with tears.

Then she came home and kissed and caressed all the children—like one possessed. Her heart filled with profound solace. Her mind kept saying, now Allah will look upon them with favour.

She called her mother-in-law and said, "Mother, I will start praying from tomorrow."

Her mother-in-law happily said, "My good daughter, will you pray? No one else, my child, only if you ask Allah with outstretched hands, He will not keep this sorrow from us—my *Pacaale* will return. Why, I have been praying all this time, I called so much, but He didn't listen, my child! But if you call, He will listen."

Mejo-bou happily sang—in a soft voice.

Her mother-in-law said, displeased, "My child, stop that song! It displeases Allah. Singing causes *guna* (sin), didn't you hear from the Maulvi Saheb the other day?"

Mejo-bou laughed and said,

"But I am happy with it, Mother. If I am happy, does He not become happy? Tell me, Mother, ask the *Maulvi Saheb*, if someone calls Him by singing, if someone cries to Him, does He not listen?"

Boro-bou said with a serious face, "Does Allah listen if you don't call Him by reading the *Quran*, *Mejo-bou*?"

Mejo-bou burst out laughing. Then she hummed a song to herself again.

The day *Pacaale* left in the dead of night without telling anyone—he didn't even know he was leaving until that afternoon.

In the evening, he was returning from work. His tired feet, after a day's labour, had somehow led him to Kurshi's house without him even realizing it. Suddenly, startled by a voice, he saw Kurshi on one side of the fence, and Roto the blacksmith on the other. He quietly stood hidden behind the nearby mango tree. In response to something Roto said, Kurshi broke a small, tender branch of a plant and threw it at Roto, and Roto, laughing, threw a betel leaf at Kurshi's chest.

Roto had to be praised for his aim. The betel leaf landed right on Kurshi's chest. Kurshi instantly caught it and put it in her mouth.

But in the blink of an eye, something disastrous happened. Suddenly, from nowhere, a trowel struck Kurshi on her left ear, right near her forehead. Kurshi cried "Mother!" and fell to the ground. Blood gushed out.

After this, Roto was nowhere to be found.

Kurshi had lost consciousness. *Pacaale* carried Kurshi in his arms—just as a groom carries his blushing bride from one room to another on the day after the wedding—and brought her to their verandah. Everyone in the house had gone out somewhere.

After a long time of nursing, Kurshi opened her eyes. Seeing *Pacaale*, she closed her eyes again, sighed deeply, and cried, "Mother!"

Pacaale placed Kurshi's head from his lap onto a pillow and, getting up, said, "Tell your father I hit you!" And he left—Kurshi's faint voice behind him grew fainter and fainter until it disappeared.

The next day, upon waking, Kurshi heard that *Pacaale* had left—there was wailing in their house! Hearing this, she fainted again!

Kurshi's parents tried a thousand times but couldn't find out how or where she was hurt. Kurshi said nothing, only cried and fainted. But it didn't take her long to recover.

As the wound on her head healed, she felt as if the trowel's blow had struck her heart. She counted the days and thought, he would surely come today. He had sworn on her body that even if he left in a fit of anger for two days, he wouldn't be late in returning. She had that pride. And Roto? Such silly jokes happen between young men and women when they meet. Oh, death! Did she fall in love with such a wretch?

Then she would fall and cry! She would say, "Come back, come back! I swear on your life, I have no other relationship with him than a few jokes! I don't love him even a little!" And so much more! Like a child, she would say whatever came to her mind and cry.

But it didn't go on like this for long. Flowers bloom, wither, and fall. Hearts also bloom, wither, and then are trampled underfoot—by the one it never wanted.

One month—two months—three months passed, *Pacaale* did not return. However, news came that he was working in Kolkata—as a mason. He had also sent money home twice.

One day, Kurshi desperately asked *Pacaale's* elder sister-in-law—when he would come and if he sent letters. *Boro-bou* made a face and said, "Who knows when he'll come!" But it was learned that he sent letters home occasionally.

Kurshi could not listen anymore, her head felt dizzy.

But she herself did not understand why she felt so much resentment. She only writhed helplessly. How could she write him a letter, she couldn't even figure it out herself. Yet every day she thought, perhaps a letter would come for her today. She was a Christian girl, she knew how to read and write reasonably well, she could even write a letter of some kind by hand. Sometimes she would sit with paper and pencil and write. But as soon as she wrote, her whole face would flush with shame, and her mind would somehow become bitter with deep resentment. She would tear the written paper into pieces!

Sometimes she thought that if she remained very stern, he might not be able to stay away. Then for two or three days, she would keep a sullen face, go out on the road, go to Golpukur to bathe with a sullen face—three o'clock would pass there, no one would come. She would walk past Pacaale's house, and now no one even looked back. Only *Mejo-bou* would smile subtly if she saw her and sing. Kurshi's body and mind would throb with anger.

Until now, she had endured it thinking that, after all, she was the offender. Who wouldn't be angry seeing her talk to another man like that! Just thinking about it, she would bite her tongue and feel like dying of shame! He was also another man! Roto was like him! They weren't married, and couldn't be. Yet, her mind was so foolish that it kept making impossible demands on him—on whom she could make no demands from the outside.

But no matter how great an offense she committed, he had sworn on her body that he wouldn't go anywhere without telling her. Even if she was nothing, he had sworn facing the mosque! What great offense had she committed that *Pacaale* dared to insult the mosque out of the pain of that offense!

Her mind foamed with futile weeping in pain. The more her mind burned, the more her chest ached. She felt she couldn't bear it anymore! On Sunday, she went to church and prayed fervently, "Jesus, give me a very big illness, so that upon hearing it, he rushes back and finds no way to escape."

She began to waste away day by day, but no major illness occurred. *Pacaale* also did not come!

Kurshi now seemed to become desperate. Now she would do something, anything. Now she would show that even if she was a Christian, she was still a human being. She knew how to insult the one who insulted the oath sworn on her body.

She intentionally started to pass by Roto the blacksmith's shop more often. Since that accident, Roto had become extremely busy. Now he sat in his shop day and night, hammering iron and pushing the bellows. When he saw Kurshi, he seemed to shrink—with shame, with fear. He didn't quite understand why he felt so much shame and fear towards such a small girl. It was as if a huge burden of guilt forced his head down. Kurshi walked past him, and he would push the bellows with all his might. As if he was running the whole world. He would hammer the glowing iron on the anvil with all his strength. His face was no longer visible in the sparks of fire.

That day, Kurshi suddenly appeared right in front of him. But she laughed, "Oh, you scoundrel! As if you don't even know me! What's wrong with you, tell me!"

Roto sweated and looked around with frightened eyes, then slowly said, "No, sister, no more work. When I remember that day, my heart still pounds! ... That scoundrel! ... When is he coming again?"

Kurshi said with a disdainful laugh, "He's not coming anymore. If he comes, I'll show him what fun it is this time!"

Roto, however, couldn't find words. He stammered, "I could have crushed that scoundrel that day if I wanted to, I didn't do it only for you."

Kurshi suddenly became agitated and said, "Are you serious, can you hit him if he comes this time? Right by that fence of the plant, where he hit me with the trowel, can you hit him there and lay him down?" Words failed her in her excitement. She breathed heavily.

Looking at her agitated chest, Roto's blood boiled. He suddenly grabbed Kurshi's hand. He said, "I swear on you, Kurshi, if I don't hit him there and lay him down, I'm not my father's son! Let that scoundrel just come once!"

Kurshi shook her hand free and said, "Go die, you wretch! You have a lot of audacity, I see! You grab my hand! Just try hitting him once, and you'll see how sweet a broomstick feels on your back!" She could not say more; her heart seemed to break with tears! Then, she ran into the house and fell prostrate on the bed, crying.

Evening descended—like the black-clad Miss Babas of their church!

Twelve

On one side, death; on the other, hunger.

Sejo-bou and her child could not be saved. The only one who nursed her was *Mejo-bou*, and the medicine was given by Mem Saheb—the Roman Catholic missionary.

Mejo-bou stayed awake all night by *Sejo's* sickbed. The kerosene lamp, tired of emitting smoke, finally went out. In the darkness, *Mejo-bou* alone remained awake like a friend. And she watched, still as stone, how a human being faded away before the eyes of another helpless human being.

Sejo-bou, startled by the touch of *Mejo-bou's* warm hand on her forehead, opened her eyes. She said, "You've come?" Then, seeing *Mejo-bou* by her bedside, she smiled faintly and said, "*Mejo-bu*, is that you? Have you poured all your sleep into my eyes?"

Mejo-bou bent down and kissed *Sejo's* eyes. *Sejo* pulled *Mejo-bou's* hand to her chest and said, "*Mejo-bu*, are you crying?"— Then she sighed deeply and said, "Cry, *Mejo-bu*, at least when I die, I'll see that someone is crying for this wretched soul. Look, *Mejo-bu*, you are crying for me, and seeing that, I feel so good— what more can I say. I wish everyone in the house would sit by me and cry like this, then I could die laughing. Or perhaps even live. But *Mejo-bu,* I don't want to live anymore. This child's worry? I have overcome my attachment to him! Yesterday I saw his father in a dream, he said, 'I have come to take Khoka.' I said, 'And me?' He laughed and said, 'Not you.' I cried and said, 'Yama will take me, even if you don't!'"

Mejo-bou said in a tear-choked voice, "Be quiet and sleep, Sejo, I beg you, sister!"

Sejo placed *Mejo-bou's* hand under her cheek and turned on her side. She said, "Tomorrow, *Mejo-bu*, I won't come to talk anymore. I'm talking now because I want to sleep. I'll sleep so soundly that they'll take me to *Godadanga* and bury me under three cartloads of earth. So that I can't even return as a ghost! ... Look, *Mejo-bu*, if he had only come to take *Khoka* tomorrow, would he have laughed like that? He will take me too, he has always teased me like that! ... Do you remember, **Mejo-bu**, how he told me just half an hour before he died, 'I said, "Are you in a lot of pain?" He said, "If you die right now in front of me, I won't feel so much pain dying! ...'"

The lamp by the bedside flickered, about to go out. Only M*ejo-bou's* eyes, like stars in the sky, glittered with tears. She said, "*Sejo*, do you wish for anything now?"

Sejo said in a slow, calm voice, "Nothing. I don't wish for anything now, *Mejo-bu*! Until yesterday, I felt that if I had some good food and medicine—perhaps I would have lived. Two drops of her mother's milk would have fallen into Khoka's mouth. My child will not get it anymore!" Saying this, she kissed her son's cheek.

A dark night seemed to whistle like a witch. Trees, houses—everything seemed to stand and doze. The stars looked like flickering lamps by the bedside of a thousand unfortunate women.

In the midst of this, a person lying on a clay bed in a clay house, faded like an empty oil lamp. Its oil had run out, now the wick had caught fire. It would not take long for that too to turn to ash.

Sejo pressed *Mejo-bou's* hand tightly to her left chest and said, "*See, Mejo-bu*, how my chest is pounding. Like a bird caught and put in a cage, struggling to get out, isn't it? Oh! I feel like I'm suffocating! *Mejo-bu*! Is there no air outside?"

Mejo-bou fanned vigorously.

Sejo grabbed *Mejo-bou's* hand, fan and all, and said, "Stop, stop! Is that air enough, *Mejo-bu*? I would bear everything if he were sitting beside me! He would cry so much seeing me leave, my face would be drenched in his tears!" She could not say more. Her words choked. She breathed through her mouth.

Khoka cried out. *Mejo-bou* took him in her lap, rocked him, and sang a lullaby—"Sleep, my dear, come through the banana tree, the goat-thief conspires to take *Khokon's* sleep."

Towards dawn, *Sejo-bou* began to fall into the lap of death. *Mejo-bou* did not wake anyone. She leaned her mouth to *Sejo's* ear and cried, "*Sejo*! My sister! You go alone quietly. Don't carry the sorrow of false tears with you when you leave!"

Whether *Sejo* heard or not, only she knew. She only said in a faint voice, "Khoka ... you ..."

Mejo-bou kissed *Sejo* between her eyebrows and said, "I will take him, *Sejo*, you go to your husband. And if you can, call me too!"

Mejo-bou could no longer hold back—she burst into sobs.

In the distance, the call for the Morning Prayer was heard from the *muezzin*—"*As-salatu khayrum minan-naum*. —Oh, wake up! Prayer is better than sleep. Wake up!"

Mejo-bou gritted her teeth and said, "I have called you enough, Allah, I will not call you today."

But Sejo's face lit up with a new radiance. With all her might, she raised both hands to her head—as if to raise them upwards in prayer—but they immediately fell back onto her chest like a broken vine.

Mejo-bou, mesmerized, watched the last glow on her deathly pale face—then slowly closed her eyelids.

The flower of dawn withered before noon.

Mejo-bou could no longer remain silent. She cried out, "Mother, wake up, Sejo is gone..."

The morning sky and air echoed with lamentation—gone—gone—gone!

Thirteen

Sejo-bou's son also could not be saved.

Like a motherless bird-child, abandoned from its nest, gasping with a dry beak, so gasped the child forever deprived of its mother's milk!

Tears flowed from *Mejo-bou's* eyes like the monsoon clouds of a Sravan night. She said, "*Sejo-bou*, wherever you are, take your son! I cannot bear this torment anymore!"

Khoka cried out in a faint, broken voice, "Mother!"

Mejo-bou covered Khoka's face with kisses and said, "Here, my darling, here, my gold, here I am!"

The women of the house gathered and cried. Like a mother bird and her flock, helpless and crying out when a snake catches a chick.

Like a dying bird-child in the mouth of a snake, the dying Khoka writhed in *Mejo-bou's* lap.

Before dawn, *Sejo-bou's* son went to *Sejo-bou*. Like the clay lamp in a graveyard on *Shab-e-Barat* night, which gives a faint light for a moment and then goes out.

Until noon, someone or other would cry, disturbing the house, then fall into a deep sleep. The weary tranquility of a house of mourning, unfathomably deep.

Only *Mejo-bou* did not sleep. She held her two children close to her chest and stared at the distant sky. The coppery summer sky, like the burning eyes of some all-devouring demon. The bamboo trees swayed as if dozing. By the pond, in the shade of the trees, ducks with their faces tucked under their wings stood on one leg, dozing. A flock of chickens slept peacefully in the custard apple and jackfruit bushes.

In the distance, the foreign palm trees of the Babus' pleasure garden stood in rows. In front of them, a tall *Deodar* tree—like many people standing in rows behind an *Imam*, offering prayers—the funeral prayer in the dry garden in front.

Just then, Miss Jones of the Christian Mission, came to *Pacaale's* house through the cool, shaded path of the northern mango orchard. Miss Jones was young in her foreign country, but in our country, she was 'middle-aged.' Around thirty-five or thirty-six years old. A beautiful woman in white. This was the girl who used to give medicine and remedies to *Sejo-bou* and her son.

She knew beforehand that *Sejo-bou* and her son could not be saved, and she had told *Mejo-bou* this privately. Still, she tried her best to save them.

She had come in the morning to console *Mejo-bou* once. Perhaps because this time was quite secluded, or due to *Mejo-bou's* natural charm, she came again and started talking with *Mejo-bou*.

In these few days, *Mejo-bou* no longer showed excessive hesitant respect by calling her '*Mem Saheb*.' Their relationship, though not yet friendship, had become much easier.

Although Miss Jones could speak Bengali well, she had not yet forgotten her foreign accent. However, it was not difficult for anyone to understand her words.

After some general conversation, Miss Jones suddenly said, "Look, a clever girl like you, if she learned to read and write, could do a lot of work. Seeing you, I feel so tempted to teach you to read and write!"

Mejo-bou suddenly, as if snatching the words from the Mem's mouth, exclaimed, "Truly, Miss Baba! I also wish so much to learn to read and write! Will you teach me? I don't like anything else in this house anymore!"

Miss Jones happily squeezed *Mejo-bou's* hand.

Fourteen

The next morning, before anyone else awoke, *Mejo-bou* took her children and went to Miss Jones's place. Before leaving, she quietly told *Boro-bou*, "If mother-in-law insists, tell her I went to my parents' house!" *Boro-bou* remained silent, crestfallen. She didn't like *Mejo-bou's* over-the-top behaviour. Yet, because she loved *Mejo-bou* a little more, she remained sulking in resentment without saying anything. She knew well the immense sorrow that was driving *Mejo-bou* to Miss Baba's side today. So, wiping her tears with the corner of her sari, she turned her face to the wall and remained lying down.

A few days earlier, her mother-in-law had also taken a job at the Sub-Deputy Saheb's house in Thakurpara, so she too left early in the morning, not bothering to inquire about anyone. Otherwise, there might have been a scene in the morning!

Not far from the village was the Roman Catholic church. M*ejo-bou* stood silently at the church door. Inside, hymns were being sung in the collective voices of women. She couldn't understand a single word of the song, but its melody and the deep, sweet sound of the organ echoing in the vast hall felt incredibly beautiful to her. Her mind filled with reverence and joy.

Suddenly, she remembered the call to prayer from the mosque next to her own house. Her mind was agitated by some inexpressible pain. Her mind seemed to constantly admonish her that she was sinning—committing a grave injustice, for which there was no forgiveness, whose consequences would be dire, and for which she would have to repent for all eternity.

Lost in thought, she suddenly startled at a touch and saw Miss Jones standing behind her, her face bright with a sweet smile. Miss Jones motioned *Mejo-bou* to follow her and entered a room in the house next to the church. Seeing *Mejo-bou* standing outside the room, Miss Jones called from inside, "Come in." *Mejo-bou* hesitantly went inside and saw tea, biscuits, and other food on the table in front. Miss Jones gently forced *Mejo-bou* to sit on her bed and said, "Have some tea with me, then we can talk."

Mejo-bou absolutely refused to eat. After much persuasion, she said, "Miss Baba, our caste will be lost if we eat with you." Miss Jones plumped down in a chair and said, "Oh God! I knew that too." She then looked dejected and seemed to ponder something. Then she said, "But I know many things about your Muslim religion, and it's not forbidden to eat with anyone." *Mejo-bou* laughed and said,

"I don't know that, our *Maulvi Saheb* and *Morol* have fined Christians a lot for eating touched food!"

The Mem Saheb said nothing more, but pulled *Mejo-bou's* two children close, gave them biscuits, and said, "Will there be any sin if I give them tea?" *Mejo-bou* laughed and said,

"There will." The *Mem Saheb* now said with a little more force, "Certainly not. They are neither Muslim nor Christian yet—they are children."

Mejo-bou remained silent. She was thinking of other things then.

The hungry child held the biscuit in hand and looked at his mother's face. *Mejo-bou* said in a faint voice,

"Eat."

After the children had tea, Miss Jones drank her own tea and said,

"I won't force you to eat. But you stayed without eating anything. Well, what should I call you? You have a name."

Mejo-bou laughed and said,

"I might have had a name before marriage. But I've forgotten it now. Now I am *'Mejo-bou'*."

Miss Jones laughed and said, "Alright, I'll call you *Mejo-bou*." Saying this, Miss Jones thought for a long time. Then she slowly said, "Look, *Mejo-bou*, I have grown to love you. I don't know why I like you so much. I will teach you to read and write like my own sister."

Mejo-bou's eyes welled up with tears.

It was almost eleven o'clock when she entered the house again, holding her children's hands. Her mother-in-law, with a face like a hailstorm cloud, was sitting in front of the kitchen, probably waiting for *Mejo-bou*.

Mejo-bou said nothing and went straight into the room. Only her son ran to his grandmother's lap and said, "Guess, Grandma, where I went." From inside, *Mejo-bou* shouted, "*Khoka*, come here!" The boy, scared, went to his mother. The mother-in-law now burst forth with a hundred streams. Shouting, crying, and cursing continued with the speed of a storm, thunder, and hailstones. *Mejo-bou* listened in silence.

Fifteen

That day, there was quite a stir on Chand Road. A tall, well-built Muslim youth, looking somewhat unruly, appeared from somewhere and went straight to Nazir Saheb's residence. Nazir Saheb had just been transferred to Krishnanagar and had taken up residence on Chand Road.

The youth was wearing the uniform of a *Khilafat* volunteer. But it was so dirty that if you pinched it, dirt would come off. It was *Khadi cloth*—but so thick that it looked like an object. On his head was a cap like a soldier's 'fatigue cap', but instead of a crescent moon, it had a small brass sword-cross. Within the sword-cross was a small iron trident, symbolizing Hindu-Muslim unity. In his hand was a long, eight-bent staff like a *dervish's*. He wore a coat and trousers like a soldier's uniform. On his feet was a pair of enormous, boat-like boots, on which one could easily cross a river. On his back was a Bombay *kitbag*. His skin colour was fair, as was the shape of his nose and eyes. From head to toe, he seemed to have been perfectly crafted—like a Greek sculptor's statue of Apollo—flawlessly beautiful.

But the man had neglected such a figure, making it pale like a marble statue in an abandoned palace. There were marks of deliberate neglect and carelessness all over his body and face. He was so dirty that it seemed as if he had just finished driving an engine. He didn't keep a beard, but perhaps due to not shaving for about a week, stubble had grown, making his face look ugly, like a thorny jujube garden.

Yet, none of this seemed to cause him any discomfort. He walked from the station, threw his kitbag onto the ground with a thud, and stretched out comfortably on Nazir Saheb's easy chair, as if it were his own home and he had just stepped out of the bathroom, 'fresh'.

It was just morning then, and Nazir Saheb had not yet woken up.

Shortly after lying on the easy chair, the youth began to snore.

Around eight o'clock, Nazir Saheb came to the verandah and was a little startled to see the youth. He thought it was some *Kabuliwala* who had left his bundle of clothes and fallen asleep, exhausted. Nazir Saheb was an extremely good man. So, even though he thought a Kabuliwala was sleeping in his easy chair, he said nothing and went inside the house; and to avoid disturbing the poor fellow's sleep, he forbade the unruly children from going to the outer room.

The boys didn't know this news. They thought, since they were forbidden, there must be something interesting there. The leader of their group, Amir, was probably about eight years old, and the rest were his juniors. Each step down was like a step in a staircase puzzle.

Amir whispered something to his 'gang'. A wave of intense joy spread across everyone's faces—like a sudden flash of lightning. With faces like little cat, they all went out. Then they came from the outside and slightly opened the door to look. But seeing the man's appearance, much of their enthusiasm waned. The smallest among them almost cried and said, "Oh, Baba! Joo-joo!" His one-step-higher senior boy said fearfully, "No, child-snatcher, look at his sack!" Saying this, he pointed to the kitbag. That was it! Immediately, everyone except Amir ran away, shouting "Kill him or cross the ditch!"

But Amir was not one to back down. Moreover, he was the leader. No matter how scared he was, if he ran away, his prestige would be lost. So, without saying anything, he gravely brought a long piece of straw and inserted it directly into the sleeping youth's nose; the youth immediately jumped up from the chair. Who could stop Amir's exhilaration! He was now rolling with laughter.

The youth, without saying anything, smiled and took out a revolver from his pocket, aimed at Amir, and fired a shot. With a terrible sound, Nazir Saheb rushed out, his *dhoti* almost falling off. Many others rushed out too. Amir was frozen with fear, even tears wouldn't come! Seeing his father approach, he screamed and immediately hugged him. Before his father could say anything, the youth, laughing, took his revolver and thrust it into Amir's hand, saying, "I'm giving this to you." Turning to Nazir Saheb, he said, "This is a fake revolver. I've tricked many policemen with it many times."

Nazir Saheb and everyone present, thinking the youth was insane, watched his actions bewildered. Now many of them laughed. But before anyone could say anything, Amir got down from his father's lap, aimed the revolver at the youth, and said, "Now I will shoot you."

Nazir Saheb was staring fixedly at the youth. He felt as if he had seen him somewhere before, yet he couldn't quite recall. Suddenly, there was a 'sound of the latch' from behind, meaning the sound of the latch on the door leading to the inner quarters. Before Nazir Saheb could poke his head through the gap in the door and ask, a soft voice came from inside, "Don't you recognize him? He's our *Ansar Bhai*."

Nazir Saheb rushed over and embraced the youth, saying, "Oh, heavens! You're Ansar! You've taken quite a disguise. Are you pretending to be a *Kabuliwala*, tell me! Come, come inside!" Saying this, he dragged him straight into the inner quarters.

As he entered the inner quarters, Nazir Saheb's wife came and saluted him. The youth laughed and said, "What, *Bunchi*, I must praise your eyes. How did you recognize me after ten years?"—It

should be mentioned here that Mrs. *Bunchi*—alias Latifa Begum—was Ansar's 'Khala's sister' or maternal cousin. She was about five years younger than Ansar. At twenty, she was not old, but she was the mother of four sons.

Latifa wiped her eyes with the corner of her *sari* and said, "Sisters can recognize their own kin even after ten thousand years, brother, they are not men." Saying this, she cast a sidelong glance at Nazir Saheb.

Nazir Saheb, scratching his head, said, "Look, if you had recognized your wife's brother in front of ten gentlemen and exposed the relationship, you might have been happy, but Ansar wouldn't have been."

Ansar grabbed Nazir Saheb's wrist and squeezed it hard, saying, "Shut up, scoundrel!"

Under the pressure of his squeeze, Nazir Saheb cried out, "Oh, oh! For heaven's sake, brother! Let go! I am your scoundrel!"

Ansar laughed and released his hand.

Nazir Saheb rubbed his wrist and said, "Oh! My hand almost turned to powder! I see you're still as stubborn as ever!"

Latifa laughed and said, "Now, take off these baggy clothes of yours! Oh, goodness gracious! What a sight you've made of yourself! Do you have clothes with you, or should I get you some? Will you bathe first, or should I bring tea?"

Ansar lay down on the floor, resting his head on his hand, and exclaimed, "Ah! What a name you uttered, *Bunchi*! Tea! Tea! Ah! First bring the tea, then everything else will happen!" Saying this, he began to hum—

"Residing in the cup and kettle, bestower of success,

Remover of mental darkness!

White-clad, mixed with milk and sugar,

Carrying a Chinese tray, she dispels inertia."

Latifa went to fetch tea. As she left, she said, "Madman!"

A small word! It felt as if Latifa uttered that word with all the sweetness of her soul. A sister's heart perhaps stirs like this when she finds her lost brother after a long time.

The servant was a little extra late that day. All the smoke from the stove seemed to have gathered in Latifa's eyes that day. That day, half of the tea water was from the kettle, and half from her eyes.

Sixteen

After the tea was finished, Latifa said, "Grandpa, why don't you take off that *Kabuliwala* outfit of yours? It looks so awful! Oh my! I wonder how you can stay in that dirty smelly thing!"

Ansar laughed and said, "Not *goddhor* (smelly thing), *Bunchi*, it's called *Khaddar*. Just wait a bit, and then you'll see how I transform into a prince."

Saying this, he burst into loud laughter at his own joke.

Two hours later, when Ansar emerged, shaved, bathed, and dressed in clean clothes, he truly looked like a prince.

Nazir Saheb and Latifa kept looking at Ansar with enchanted eyes.

Latifa's children, by then, had made good acquaintance. And the sound of Amir's revolver had begun to reverberate on Chand Road. He would come repeatedly and tell his mother, "You know, Mother, I'm going to war with this thing. Uncle and I will definitely boom the English!" Saying this, he would fire the revolver at the perceived enemies of him and his uncle.

Ansar said, "You know, *Bunchi*, what I did on the train with that revolver today. A detective was following me today. Not just today, they're always behind me. I had a friend with me on the road. A sudden idea popped into my head. I quietly told my friend, 'Whisper to that detective father that I have a revolver.' As soon as he went and delivered the news, what happened next! I saw Mr. Ranaghat station present with a dozen constables. As soon as I got off, he said to me, 'Please come to the Police Station, we need you.' I said, 'Will you give me tea there?' The Railway

Police officer smiled wryly and said, 'Yes, sir, tea and snacks are all ready, that's why we've come to take you.' I laughed and said, 'Thank you! Let's go!' Then, when they took me to the Police Station and searched me and found this toy revolver, you can't imagine, *Bunchi*, what their faces looked like. If I had cow dung, I would have made a mold of their faces!" Saying this, he let out a thunderous laugh.

Latifa rolled with laughter and said, "Dada- Bhai , you're still as mischievous as you were in childhood, I see. Anyway, where have you been all this time, tell me?"

Ansar laughed and said, "Oh, you don't even know such big news? I'm coming from Mymensingh today. I came there from Sylhet. I went to Sylhet from Tripura. I went to Comilla from Chittagong."

Nazir Saheb interrupted and said, "Oh, stop, stop, you don't have to say any more. I understand, you've signed up with the 'wanderer' company, right?"

Ansar said, "Somewhat! But not without purpose. I travel, and I also do a little work. "And then he suddenly said, "You know, *Bunchi*, I won't be staying here for more than a day."

Latifa said in a pained voice, "Has this place become unbearable for you in just three hours, Dada- Bhai ?"

Ansar sighed and said with affectionate tenderness, "Don't be offended, sister, if you heard everything, you wouldn't dare to give me space in your house."

Nazir Saheb said, "I know, brother, you're crazy about working for the country! Still, my job won't be lost so easily—you don't have to worry about that."

Ansar said, "Just wait a bit, news will come from the Police Station soon. A 'cipher telegram' has already arrived here before my arrival, saying that 'number 109 has departed'."

Latifa said, "What is number 109, Dada- Bhai ?"

Ansar said, "You won't understand all that. Our political prisoners each have a number—all C.I.D. Police Officers have a

list. So that others don't find out, they write letters or send telegrams using our numbers instead of our names."

—Saying this, Ansar laughed and said, "Do we have less honour, *Bunchi*! Always accompanied by two armed police guards. When we go anywhere, police officers congratulate us at the station in advance! Then they inquire twice a day how we are doing! Like a second governor, really!"

But for some reason, Latifa's eyes welled up. She raised her tearful eyes to Ansar and said, "I've known you since childhood, *Dada- Bhai* , you've always been mad with sorrow for others. Yet today, for some reason, I wish I had the power, I wouldn't let you walk towards death like this. Never. Tell me, Grandpa, what is your sorrow? You lack nothing—house, property, parents, siblings; but who would say, looking at you, that you have any relatives—that you have a home to speak of!"

Ansar said in a sorrowful voice, "I have never told anyone, sister, that I have nothing. —There is no one anywhere. Not all people in the world are cast in the same mold, *Bunchi*. Here, some run in search of happiness, some run in search of sorrow. I am a seeker of sorrow. It feels as if I have no relatives! My heart did not settle in the nest of happiness of my relatives! I am a companion of the homeless, of the unknown who are not kin! In their pain, in their tears, I seem to see myself fully. So I wander among these homeless ones."

Seventeen

Towards the end, Ansar seemed to become somewhat overwhelmed. Then, collecting himself a little, he began to say, "Do you know why I came here? My political views have changed since I returned from prison. I am now..." And then, trying to say something, he became embarrassed and exclaimed, "*Bunchi*, do you still spin the *charkha*?"

Latifa laughed and said, "No, Dada- Bhai , now I don't have time to oil your *charkha*, so when would I spin the country's charkha?"

Ansar laughed and said, "Hmm, so now you've left the thread of the *charkha* and are weaving the loom of your household with the threads in your lap. See, you did well to leave that hassle, sister. Wasn't I just saying that my views have changed? Now if you hear my views, you might fall from the sky. Your *charkha*-Dada- Bhai Ansar, whose shoulders are gnarled from carrying *charkhas* load after load, what will you hear from him? He says, cloth is made from thread, but the country is not liberated by cutting thread."

Latifa truly rolled with laughter this time. She said, "What are you saying, Dada- Bhai ! Oh my, they say you once dragged Mahmud by the ear all around the house, rubbing his nose on the floor, just for joking about the charkha! Oh my, what will happen! In the end, you became a disbeliever in the charkha?"

Ansar, with a mouthful of betel, said, "That's true. Today I believe that if other countries cannot gain independence by cutting off heads, will this country gain independence by cutting threads?"

Nazir Saheb said, "For heaven's sake, brother, don't endanger your fresh head by talking about 'cutting heads' just anywhere!"

Ansar laughed and said, "That means, on some auspicious morning, the head will non-cooperate with the body—is that it? Well, brother, in a country where heads have bowed so low they've reached the feet, if one or two heads stand erect and receive the blow of the executioner's axe as punishment for their audacity, then I believe the bowed heads will feel much less ashamed."

Latifa said, "To hell with your politics! Now I say, Dada- Bhai , will you spend your whole life like this, eating at home and chasing wild buffaloes in the forest?"

Ansar laughed and said, "I've sent my *charkha* to hell—but I probably can't send politics. You're wrong, *Bunchi*, I didn't eat at home and chase wild buffaloes. I'm chasing wild tigers by eating in the forest! Eating at home didn't suit me, what can I do, it's fate."

Latifa gave up and said, "Anyway, you've never listened to anyone, and you won't today. So I'm wondering, how you even remembered us and come here!"

Ansar said, "I've always been alright. I told you before, I didn't come without a purpose. I've come here to build a Labour Union. Each district will have a branch of our Labour Union. For now, I'm wandering everywhere with that intention. I might have to stay here for a month or even more. I just came from Mymensingh after staying there for two months."

Latifa, like a child, danced with joy and said, "Really, Dada-Bhai ! You'll stay here for so long? Wow, wow! What fun that will be! I'll write a letter to Auntie Amma today—they'll all come and stay with us for some time now. Dada- Bhai , darling, not one month, but two months, right?"

Ansar burst out laughing and said, "I see you're still as happy as a child even after becoming a mother, *Bunchi*. Write the letter, I have no objection, but I'll be so busy with my work that I might not even be able to see you once all day! Even if I stay here, I won't be able to stay with you! The detectives behind Nazir Saheb will utterly harass him."

Latifa's smiling face instantly became pale,

—like a child's radiant face losing its brightness after a colourful firework ignites and then fades—just like that!

Eighteen

Two or three days passed after this. And in these two or three days, Ansar had caused quite a commotion in town with cow cart drivers, horse carriage drivers, masons, coolies, sweepers, and others. Rumours spread throughout the city that a Russian Bolshevik spy had arrived to incite the people. There was whispering about it among government officials as well. Magistrates, police, municipality, even the Congress members had started looking at Ansar with a crooked eye and a twisted mind. Ansar, however, paid no attention to that. He was moving around with the same vigour, like a motor wheel.

That evening, as Ansar sat drinking tea, he kept getting distracted. Nazir Saheb also became somewhat disheartened, seeing that the conversation wouldn't pick up. For the past few days, Ansar had arrived like a storm, quickly devoured whatever he could get his hands on, and then gone back to the slums of his coolies, sweepers, and *chandals*. Latifa, despite her anger, resentment, and tears, couldn't do anything. Ansar would just laugh and say, "Mad girl!" His laughter was so pained, so full of sorrow, and that one word was so steeped in affectionate tones that Latifa couldn't say another word. No matter how much pain she felt, her heart simultaneously swelled with pride that her wayward brother was today a beggar on the streets for the sake of the destitute. The pain of these impoverished people had made him poor. Her chest heaved with pride and tears.

This evening, when Ansar unexpectedly came, asked for tea, and lay down wearily on the easy chair, Latifa was happy, but also a little surprised by Ansar's weary voice. She had never heard such a melancholic tone in his voice.

When she brought the tea and sat down at his feet, Nazir Saheb was rambling on, saying all sorts of nonsensical things to himself, and Ansar would occasionally hum absentmindedly.

Latifa laughed and said, "What an unconscious person you are! Who are you talking to, and who is listening to you, tell me! What are you thinking, Dada- Bhai , like this!"

Poor Nazir Saheb scratched his head, took a sip of tea, and exclaimed, "Oh! He's thinking about our future sister-in-law! Oh, why didn't you say so beforehand? Then I wouldn't have made such a rude joke at this time! But brother, I somehow can't feel confident that any beautiful face could peek into this mind of yours, filled with sweepers and pallbearers."

A faint smile appeared on Ansar's face, or perhaps it didn't. He continued to drink his tea single-mindedly. By then, his melancholy had largely disappeared due to the tea.

Latifa scolded Nazir Saheb and exclaimed, "You shut up for a bit! Truly, Dada- Bhai , darling, tell me—why are you so quiet today?"

Nazir Saheb turned his face away and, as if speaking from offstage, exclaimed, "Who gave hay-tea to the monkey! *Ya Allah! Allahu Akbar!*"

Latifa raised her eyebrows and looked sharply, saying, "Again!"

This time Ansar burst out laughing and said, "No, I see you won't let me remain serious, *Bunchi*!"

Seeing that the cloud had largely cleared, Latifa said in a coaxing tone, "What were you thinking all this time, tell me, Dada-Bhai !"

Ansar finished his first cup of tea, took a sip from the second, and said, "Nah! It's nothing! I was just thinking about something. Look, Bunchi, nothing will become of this country."

Latifa was a clever girl. Seeing that Ansar was trying to avoid the topic, she also took a circuitous route. Without answering Ansar's previous statement, she asked directly, "By the way, Dada- Bhai , do you know anything about Rubi?"

Ansar was startled. He was not prepared for this. He drank two or three sips of tea, looked away, and slowly said, "I met her this time, Bunchi."

Latifa moved closer and said, "Where, Dada- Bhai ? She must have recognized you! What did she say when she saw you? How did you recognize her?"

Ansar smiled faintly and said, "We met in Mymensingh. Although it didn't take long to recognize her, it took me a while to believe. Quite a long while..." Saying this, Ansar sighed and again took two sips of tea, then said calmly, "I was giving a lecture at a student meeting. Many women were also present at that meeting. Among them, I saw a widowed girl, parting her veil with both hands and looking at me. I looked away. It was widely known in the city that I could give good speeches, but that day I clearly understood that no one was pleased to hear my speech. My student friends looked at each other in disappointment. My words just kept getting tangled."

Latifa was not just listening with bated breath—it would be more accurate to say she was devouring every word. She said in a voice choked with tears, "Rubi is a widow, Dada- Bhai ?"

Ansar leaned over his teacup, hiding his face, and said, "Hmm!"

It seemed as if he couldn't say anything more. No one said a word, and everyone's mind was overcome by a kind of sorrowful melancholy. Like an overcast evening descending upon a lonely house without friends.

The tea had grown cold by then. Ansar gulped it all down and then said with a slightly more relaxed tone, "Then we met—and talked a lot with Rubi—and Rubi's parents. —Rubi's father is now the District Magistrate of Mymensingh, *Bunchi*!"

But before *Bunchi* could say anything, he continued, "Rubi's father, of course, spoke to me timidly. But her mother pampered me immensely. Her eyes kept filling with tears as she spoke to me.

Latifa said impatiently, "What did Rubi say, tell me, Dada-Bhai !"

Ansar laughed and said, "I'm telling you, wait. Rubi was married to an ICS examinee. The boy was my classmate—though not my friend—his name was Moazzem. He died within a month of their marriage, before he could go to England. That was over a year ago! Rubi had passed Matric before her marriage. This time she will give her private I.A. It seemed that her parents wished to keep her immersed in studies to help her forget. They are spending generously for this. I heard Rubi is studying very diligently."

Ansar was silent for a while after saying this, then he said, "Only the Omniscient knows the true feelings of Rubi's heart, but this widowhood hasn't caused her much pain—that was quite clear. She didn't know her husband—it seemed to me she didn't even try to know him. There isn't even a photo of her husband in her study room. Or, as if she is a widow, she tries to convey this with her behaviour and attire. Her parents couldn't make her wear patterned clothes or jewellery at all. She wears plain white

cloth, doesn't wear shoes, doesn't chew betel nut—in short, she is completely unadorned, but if you could only see, Bunchi, how beautiful she looks in this unadorned, simple dress! I haven't seen such beauty in widowhood!"

Then, as if ashamed of his own words of praise, he said in a low voice,

"But *Bunchi*, that beauty can be revered, but not loved!"

Nazir Saheb let out a fake sigh and, stroking the imaginary beard on his clean-shaven cheek with his left hand, exclaimed, "*Subhan-Allah! Subhan-Allah!*"

Latifa and Ansar both laughed at the same time. Ansar slapped Nazir Saheb on the back of his neck and exclaimed, "Oh, you fool! There's no scent of 'love' in this!"

Nazir Saheb, rubbing his neck, said, "Look, brother, like the bull of *Tarakeshwar*! Don't push my neck like that! This neck is your sister's throne. If this neck breaks, where will she ride?"

Latifa laughed and said, "On a *Sheora* tree! Fine, I'll be a ghost! Now if you make trouble, I'll really break it! Tell me, brother, what happened next?"

Ansar said, "You know, one day I directly told Rubi that even without such exaggeration, it wouldn't have been hard for anyone to understand that she was a widow. Do you know what she said? She said that she behaves that way to punish her parents. Despite her strong objections, they supposedly married her off, and are secretly trying to marry her off again—without waiting for her opinion. One day, right in front of her mother, she told me, 'Look, Anu Bhai, the memory of the death of that unfortunate man, whom I never acknowledged in my life with anything, I have to carry throughout my entire life—can you tell me how I can free myself from the burden of this humiliation?'"

I shivered. I said, "If that's true, Rubi, then this humiliation isn't just for you—it's also affecting that deceased unfortunate man. Such cruelty won't bring anyone any good, Rubi."

Rubi said bitterly, "Only you could call this cruelty. Don't mind me, Anu Bhai—no one but an extremely cruel person could have said such a thing to me. Did you only see the cruel side of it? You didn't see the one who made me cruel!"

Saying this, she walked away, saying, "The flower has withered, but the thorns remain! If it were a flower, it would have been a garland on my chest, now it's a thorn—it will only pierce my feet!"

"After that, we met and talked many times—but I never dared to step on a snake's tail again. Absolutely a king cobra!"

Latifa said in a slightly agitated voice, "But you won't recognize it, Dada- Bhai , you are truly unfortunate! Even if it bites, it has a jewel on its head. The jewel on a snake's head is the wealth of seven kings, does just anyone get that?"

Saying this, she wiped her eyes! Ansar seemed to slump.

For some reason, it was the first time he felt that he was truly unhappy. Humans do not only suffer from subjugation; there are other kinds of suffering—which are very deep, unfathomable. The suffering of all humanity constantly torments and rebels the mind, but one's own pain—it seems to make a person meditative and healthy. That sorrow is so sweet, so dear!

He suddenly said, "The day I left, *Bunchi*, she came to the station. When the train was leaving, she handed me something and said, 'I wove this on my wedding night—remembering you. Today it's withered, but still, I give it to you.'—and she staggered away!"

"When the train left, I saw a dry garland!"

Nazir Saheb exclaimed, "What did you do with that garland, brother?"

Ansar said in a choked voice, "I threw it in the Padma River."

Latifa said nothing and slowly got up.

Nineteen

That day, a huge commotion broke out on Chand Road: *Mejo-bou*, with her children, had converted to Christianity.

She had indeed converted to Christianity. But there's a bit of history to it.

Mejo-bou had been going to Miss Jones, of the Christian mission, for some time to learn sewing and reading. Missionaries, perhaps to further their proselytizing, often helped poor Muslims and Hindus with medicine during illnesses, and they had managed to convert many to their faith. But *Mejo-bou's* case was a little different.

For some reason, Miss Jones was captivated by *Mejo-bou* at first sight. Not just visually, but perhaps emotionally too. There was a rumour about *Mejo-bou* in the neighbourhood that once you saw her, you couldn't help but love her.

Mejo-bou was beautiful. But that beauty wasn't all there was to her. Some people have something in their eyes and on their faces that makes your heart happy the moment you see them, making you want to embrace them and say "you." Grace, charm, elegance – no single word could define her. *Mejo-bou* had such an enchanting face and eyes! ...

All the men and women in the neighbourhood began saying that now these "madams" would use *Mejo-bou* as a "pimp" to convert all the wives and daughters-in-law into "Christians."

Paccale's mother's screams and cries terrified the entire neighbourhood. Her crying and shouting knew no rest, day or night. Sometimes it would remain stagnant, emanating from their courtyard and spreading far and wide; sometimes it would move, circulating from Chand Road to Kurshipara, from Kurshipara to Kathurpara, from Kathurpara to the marketplace, and then returning after circling the church and mosque.

The language she used to "entertain" the *Mem-Sahebs* was beyond compare. Fortunately, the *Mem-Sahebs* didn't understand the meaning of all our truly potent Bengali curses; if they did, they

would have carried *Mejo-bou* on their shoulders and delivered her back to her home.

Paccale was informed in Calcutta. Kurshi, in particular, insisted and advised them at their home that at this time, *Paccale* would come and create a "huge ruckus"! Who knows—he was such a manly man, he might even abduct the Mem-Saheb if he wished.

That day, after the *Maghrib* prayers, the *Mullah Saheb* of the neighbourhood mosque voluntarily arranged a *Milad* gathering at *Paccale*'s house, along with a sermon about the mischief of the infidel Christians. The house became lively with men and women. After the *Milad* and sermon, it was decided that tomorrow, people would be sent to bring *Maulana Hazrat Pir Gazanfar Saheb Qibla* and *Maulana Ruhani* Saheb to advise these misguided non-believers and, if necessary, to "debate" them. The neighbourhood people would bear all the expenses. *Paccale*'s mother would, for now, sell her few goats to raise fifteen rupees. Otherwise, she would remain "outcast" in society.

Ansar had heard everything from his sister. So, he had come to the *Milad* gathering with quite a bit of enthusiasm to hear what would happen in the neighbourhood regarding this. After hearing everything, he returned to Nazir Saheb's residence without saying a word.

As soon as he reached the residence, he lay down on the easy chair and said, "Oh *Bunchi*, I have a terrible headache, can you give me some tea?"

Latifa laughed and said, "No, I can't! What happened at their meeting, Dada- Bhai , you didn't say!"

Ansar said bitterly, "A horse's egg! *Mejo-bou* became a Christian, and the *Pir* and *Maulana* Sahebs benefited. And adding insult to injury—poor *Paccale*'s mother's fate was already burned, whatever little was left—the *Mollahji* finished it off. If tomorrow I hear that *Paccale*'s entire household has become Christian, *Bunchi*, then I won't say anything."—Pausing for a moment, Ansar said in a sorrowful voice, "You know, Bunchi, Paccale's mother cried so much today, but since the *Milad Sharif* was held and she heard the

decision of the neighbourhood *mullahs* and leaders, her crying has completely stopped. Ah, poor thing! Those few goats are all she has—and she has to sell them tomorrow. Otherwise, she will lose her social standing among the neighbours."

Ansar got up and began pacing restlessly. He himself hadn't realized when the mischievous sparkle in Latifa's eyes had faded and turned tearful. Suddenly, she said in an anxious voice, "Dada-Bhai , darling, can you meet *Mejo-bou* and the *Mem-Saheb* tomorrow? If you give her assurance, she won't remain Christian—I can say that with certainty. We've only been in Krishnanagar for a short time, but in the few days I've spoken with her, I've understood—whatever else she may be, she's not bad. She's very sensitive. She became Christian because of the harassment from the neighbours. You know, Dada- Bhai , just because she used to visit the *Mem-Saheb*, the neighbours kept threatening to ostracize them. Finally, they started spreading such slander against her that nothing could be more false. Does a person fall to such degradation in every way when they are in sorrow and poverty, Dada- Bhai ?..."

Ansar took a deep breath and gazed at the star-studded night sky. He kept feeling that the people of this world were as infinitely inscrutable and mysterious as that night sky.

Latifa was getting up to make tea when Ansar suddenly said, "Truly, *Bunchi*, no one is as fallen in every way as hungry people—people afflicted by poverty! Because they are hungry, they constantly ruin each other. For lack of two handfuls of rice, their souls are soiled in every way today. You won't understand, *Bunchi*, how deep and boundless their want is, how immeasurable their sorrow. I have seen the daily plight of those unfortunate souls—that's why the food in my mouth has become so bitter. When I eat a mouthful of rice mixed with lentils, it feels like it doesn't want to pass beyond my throat, it gets stuck. I feel as if millions of starving men and women, with hungry eyes like those stars in the sky, are gazing at that single mouthful of rice of mine. You won't understand their sorrow, *Bunchi*. For two handfuls of rice, they become sweepers and carry all kinds of dirt and filth from your homes and outside on their heads. They become

scavengers—before dawn, they clean the dust from your bodies with their two hands on the roads. Don't talk about them, Bunchi—at least never blame them to me. You are a mother, would you believe that a mother, driven by hunger, snatches food from her son's hand? Sells her own children for human sacrifice for two handfuls of rice? May God keep you happy, but if you understood the agony of hunger for even a single day, you would never hate any sinner on earth. Would you like to hear a true story?"...

Latifa covered her eyes with her hand and cried out in *anguish, "For God's sake, Dada- Bhai*, I beg you, don't say any more. My breath is already failing."

She quickly got up and stumbled away from there.

Ansar laughed and said, "It wasn't good to poison your happy food like that, Bunchi! Anyway, tomorrow I'll truly go and meet Mejo-bou and Miss Jones...!"

The next morning, while drinking tea, Nazir Saheb said to Ansar, "What's up! Are you going hunting today, I hear? Remember, brother, you're going to a tigress!"

Ansar laughed and said, "I'm not going hunting, you fool, I'm going to bring the tiger of Sundarbans back to Sundarbans, to protect it from the trap of civilized hunters."

Nazir Saheb also laughed and said, "Don't save it from other hunters only to strike it with your own arrow in the end. Look, she's a very tough tigress, she might end up hunting you instead."

Ansar cast a sidelong glance at Latifa and said in a slightly lowered voice, "Save me, brother, I haven't yet acquired the hobby of raising tiger cubs. This isn't my tiger hunt, it's just suffering for a cause!"

Nazir Saheb laughed a little louder and said, "Excellent! Excellent! Oh, give another cup of tea to your humorous brother! But brother, the tigress might have cubs, but what about that lioness—who took her home?"

Ansar laughed and said, "Don't call her a lioness, fool, she is a blue-coloured jackal. Yes, I'll have to go to her a bit carefully! I don't fear their claws and teeth, I fear their cunning. The missionary Mem!"

Nazir Saheb sighed with a "Hmph!" and said, "Oh my! Missionary! First a Miss, then a woman! Ugh! May it not turn into a 'misfortune' today! I mean, 'fortune' for 'Miss'!"

Latifa scolded him and said, "For heaven's sake! No more jokes from you! His humour is overflowing in his old age! What's wrong with you today, tell me!"

Ansar laughed and said, "Don't you understand, Bunchi, he's jealous. I'm going to have a little chat with the *Mem-Saheb*, and he can't stand it! As long as you're here, he doesn't dare to go anywhere else!"

Latifa got up to leave and said, "I'm willing to unleash him with a long rope today, brother-dear, but don't worry, no one will touch him!"

Nazir Saheb also got up to leave and said, "Who dares touch a ghost once they find one!"

Ansar got up and said, "You two quarrel now, I'm leaving...."

***

Ansar heard at the church that there was no rule for meeting the Miss Babas. But he was not one to give up. After an hour of arguing with the padre sahib, he agreed on the condition that he would only ask Helen, alias *Mejo-bou*, if she had converted to Christianity voluntarily. Ansar could also ask as many questions as he wished about whether the missionaries had converted her through temptation or any other means. Of course, *Ansar's Khaddar* attire and his reputation as an 'agitator' earned him this opportunity. *Ansar* also told the sahib clearly, "Look, Padre Sahib, I am not some rural *Mullah-Maulvi* whom you can scold and send away! If *Mejo-bou* has voluntarily adopted your religion, I won't say anything. But if you have ruined her by any other means, then I will cause a commotion about it throughout the country."

The sahib, a little flustered, said, "No, Mister! You can ask our sister Helen, or rather, the former *Mejo-bou*, whatever you wish. You will see that God himself has called her directly! We are nobody!"

Ansar mentally dismissed the *sahib's* 'directly' and said, "*Sahib*, can you call Mrs. Helen now?"

The sahib himself got up and entered the room a little later with Miss Jones and *Mejo-bou*!

Ansar got up from his chair, extended his hand, and exclaimed, "Good morning, Miss Jones! Good morning, Miss—I mean, Mrs. Helen!"

Miss Jones shook *Ansar's* hand with a faint smile, but poor *Mejo-bou* stood there, shrinking in embarrassment, her face half-covered! Even Miss Jones's stern gesture couldn't make her offer even a single greeting.

Mejo-bou knew *Ansar*, and she knew him quite well. Many times, from afar, she had seen him pass by her house through the gaps in the fence, with his defiant stride. For some reason, she had always liked this unusual man! Many times, she would go and sit with *Latifa* for no reason, just to see this man—to hear all his strange and wonderful stories about his life. He was like a prince from the tales of A Thousand and One Nights, like Hormuz or Manu-Meher from a manuscript! Today, seeing him in front of her, she kept trying to hide her face like a distressed snake!

Ansar might have vaguely seen *Mejo-bou* once or twice! And even if he had, he didn't remember. In his busy life, thinking about women's faces was far from his mind, he didn't even have time to look. He knew only Karl Marx, Lenin, Trotsky, and Stalin, farmers, labourers, subjugation, and economics. The question of whether there could be other kinds of mental pain besides compassion for suffering humanity had only recently arisen in his mind. He didn't disrespect women, nor did he have any attraction towards them. He was simply indifferent towards women.

Today, he looked at *Mejo-bou*, veiled in modesty, with open eyes for the first time. The moment he saw her, it suddenly seemed to him that there was some resemblance to Rubi. As soon as he thought of Rubi, it was as if a soft chord in his chest cracked. Ansar began to feel somewhat uneasy.

Miss Jones said in English, "It seems you don't know her. If you knew her, you wouldn't have come to her based on what others said."

Ansar also said in English, "I know of her, but I don't truly know her. Don't worry, I haven't come to take her back; I've only come to know if she became Christian voluntarily. I hope you won't be offended if I ask this question."

Miss Jones said in a thin, sharp voice, like the 'G' note of a harmonium, "Certainly not! You can ask our sister Helen, the former *Mejo-bou*, freely. You will see that God himself has called her directly! We are nobody!"

Ansar, mentally dismissing the *sahib's* "directly," said, "Sahib, can you call Mrs. Helen now?"

The sahib himself got up and entered the room a little later with Miss Jones and *Mejo-bou*!

Ansar got up from his chair, extended his hand, and exclaimed, "Good morning, Miss Jones! Good morning, Miss—I mean, Mrs. Helen!"

Miss Jones shook *Ansar's* hand with a faint smile, but poor *Mejo-bou* stood there, shrinking in embarrassment, her face half-covered! Even Miss Jones's stern gesture couldn't make her offer even a single greeting.

Twenty

When the darkness of evening had grown quite dense, *Mejho-Bou* wrapped a shawl tightly around herself and began walking towards Nazir Saheb's house. It was as if some fear, some shame, wouldn't let her feet leave the ground. Even the thick covering of deep darkness couldn't hide her embarrassment.

Reaching Nazir Saheb's door, she was startled by Ansar's voice and suddenly felt that if she could just run away right then, she would be saved! Her carefully arranged attire today seemed most unsuitable in her own eyes—it struck her with shame.

But there was no way to turn back then.

Following *Ansar's* gaze, Latifa saw *Mejho-Bou* and immediately rushed to take her hand, leading her inside. *Latifa* couldn't say anything, but her eyes welled up for some reason. *Mejho-Bou* also couldn't hide her tears any longer.

Ansar seemed to be solemnly trying to read the stars written on the dark sky.

Nazir Saheb, at Latifa*'s* command, had to go outside, even though it wasn't necessary.

A long time passed in silence. *Mejho-Bou's* warm hand was simply being pressed by *Latifa's* palm. It was as if they were talking hand-in-hand.

Latifa asked in a choked voice, "Didn't you bring your children?" *Mejho-Bou* smiled that old, sweet smile and said, "No. Otherwise, would they have let me sit? They would have been crying and making a fuss to go to their grandmother's by now." She paused for a moment and then added, "But brother, I came here so fearfully! As I approached the house, my feet just didn't want to move anymore."

This time, Ansar spoke, "Well, I must say you have a lot of courage. I thought you wouldn't be able to come."

Latifa laughed and said, "For goodness sake, Dada- Bhai , don't shame her by calling her 'you'!" Then, turning to *Mejho-Bou*, she said, "Sister, I suppose you're a year or two younger than me, aren't you?"

Mejho-Bou burst out laughing and said, "I might even be older than your elder sister!"

Ansar laughed and said, "Let's save the age calculations for later, perhaps by looking at teeth and such. Let's get down to business now."

Mejho-Bou said in a slightly lower voice, "But what if someone's age is revealed while discussing business and showing teeth?"

Ansar burst out laughing and said, "My mistake! Now, tell me, what's your intention? What will you do?"

Mejho-Bou scraped the ground with her nails for a while, then, with her head down, said, "What will I do? What I'm to do, those *Saheb-Mems* will decide now! They might transfer me to Barisal tomorrow.

Latifa might have squeezed *Mejho-Bou's* hand a bit too hard; *Mejho*-Bou gasped, "Uh!" Latifa laughed and said, "You hurt easily with so little, yet you can leave us—your eternal home? Besides, are you a *Daroga-Munsif* that they would transfer you?"

Mejho-Bou said in a strange voice, "Not a *Daroga-Munsif*, brother, but stolen goods. I misspoke about being transferred, but there's no harm in being careful, so they're keeping me under wraps beforehand."

Latifa laughed loudly and said, "Have thieves already started cutting through the fence of the house?" Saying this, she feigned busyness out of embarrassment and, as she got up to leave, said, "Sit for a bit, I'll make some tea. Otherwise, that man's mood won't soften even if you drown it in water for three days."

Latifa left. *Mejho-Bou* didn't leave, nor did she try to get up. Her greatest discomfort was her beautifully draped sari that day. She could sense that *Ansar* was noticing even the carefully drawn beauty mark on her unblemished cheek.

Ansar suddenly said, "Will you keep my word?"

Mejho-Bou first nodded in agreement. But then, with a shy voice, she immediately said, "But even if I want to, I won't be able to."

Ansar gazed at *Mejho-Bou's* face for a while and said, "Can you really live by leaving this country?"

Mejho-Bou looked up at *Ansar* with wide eyes and said, "If I had left two days ago, it might not have hurt so much! But even if I want to, I can't go back home. I'll become a *Muslim* again and return—you might be trying to say that, but who will give me a place?"

Ansar sat speechless. It was true, if she returned to her own religion, she would be even more helpless. There would be no place for her in her in-laws' cottage. Even for two days, she wouldn't be able to bear the agony of their words and torment.

Suddenly, *Ansar* found a way out of a desperate situation. He sat up straight and said in an ecstatic voice, "If you have no objection, you can build a separate house right here and stay—I will arrange for your days to pass without worry."

Mejho-Bou smiled and said, "If it becomes known that you've given me refuge, what will happen to us—do you understand? I might bear all that, but you—"

Ansar interrupted *Mejho-Bou*, saying, "I don't fear that. Besides, I won't be staying here forever. I might come once every year or two. Of course, I'll make arrangements so that wherever I am, you won't have to face any hardship."

Mejho-Bou's eyes blurred with tears. Whether it was from the joy of her suffering ending, or from a premonition of *Ansar's* future departure—only she knew.

Suddenly, *Mejho-Bou* seemed to lose her senses. She said in a tearful voice, "If you're going to leave anyway, don't burden me with this debt. I'll leave tomorrow too, and you leave too."

Saying this, she melted into the outside darkness. *Ansar* couldn't say a single word. He sat like a stone statue. He kept thinking that a woman's mind is as mysterious as the nebulae in those distant shadows.

Twenty-One

The next day, as soon as morning broke, a commotion erupted in Krishnanagar! Police teams began searching various houses in Krishnanagar. Many students and young people were imprisoned.

To catch Ansar, armed reserve police guarded the garden trees and every nook and cranny of Nazir Saheb's house all night. As soon as dawn broke, they captured the sleeping Ansar.

It spread throughout the city that Nazir Saheb's brother-in-law, *Ansar*, was a Russian Bolshevik spy and revolutionary leader. He was propagating communist ideology among boys and girls and preparing them for revolution.

The gentlemen who themselves or none of their relatives were caught were sweating the most. They began to say, "Oh God! We barely escaped! The way the police cast their net! It felt like they wouldn't even spare snails."

Among them, one exclaimed, "We are small fry, brother, small fry; they came to catch the big fish."

Another added, raising the stakes a little, "Yes, brother, the government is a clever fellow; it doesn't dirty its hands by killing a shrew! It doesn't use a cannon to kill a mosquito!"

The patriotic heroes were reviled for their so-called recklessness—mostly by those from whom they were perhaps forever separated from their happy homes and relatives to break the chains of subjugation.

The news of Ansar's capture spread throughout the city, and everyone learned that Ansar was still imprisoned at home. Teams of sweepers, coolies, carters, coachmen, farmers, and laborers rushed towards Nazir Saheb's house. Ignoring the police's blows, shoves, whips, and kicks, they surrounded Nazir Saheb's house. Seeing no other option, the police even fired a couple of blank shots from their guns. But no one moved an inch back. At that moment, an old sweeper shouted, "Sir, they are taking our father away, what greater harm can there be than that? Shoot us in the chest instead, but let our father go."

No one could hold back their tears upon hearing his cry!

Outside, the public roared with a sky-shattering cheer in a tearful voice! It was like the roar of an enraged deity, the cry of a tormented human soul!

Ansar's eyes brimmed with tears. He touched his shackled hand to his forehead, bowed to the crowd, and said, "I know you will be victorious! I hear the conch shell of the free human soul in your voices."

Unable to budge the agitated crowd, the police superintendent approached *Ansar* and said, "If you say something to them, perhaps they will leave. Otherwise, we will be forced to shoot."

Ansar smiled and said, "I can try. But I am not leaving out of fear of bullets. If you are truly determined to shoot, then shoot." Then he chuckled and added, "We are a nation of bullet-eaters. It's in our nature."

The *sahib* smiled slightly and said, "I don't really want to shoot. But you have to go to the police station. They might obstruct us in our duty!"

Ansar, still smiling, said, "Then you will do your duty. But perhaps you won't have to. Let's go."

Upon seeing the shackled *Ansar*, the frenzied crowd erupted in a massive cheer. Ansar smiled and bowed to them, saying, "Go back! Don't be afraid, I won't be hanged. I will return among you again." He paused, suppressing his rising tears with difficulty, and said, "I have no sorrow for myself, brother, because there is no one to grieve for me—"

Immediately, a thousand voices echoed, "There is, there is! We are here!"

Ansar smiled and said, "I know you are there. But you are not friends who will cry for me! If I am defeated, you will be victorious and wipe away the shame of my defeat."

Immediately, a thousand voices cried out, "Certainly, certainly."

As the police sahib grew impatient, *Ansar* said, "Don't be afraid, I won't incite them, I will calm them."

Then, looking at the people, he began to say, "Friends! At my departure, my earnest request to you is that you never abandon your demand for your rights! You too may have to go to jail in chains like me, die from bullets, your own countrymen will block your path, and torment you in every way, yet do not abandon your path, do not cease from moving forward. The previous group will die or abandon the path, the next group will stand in their empty place. Your liberation will come over your dead bodies. You have no weapons, do not grieve for that. If you do not lack the immense life force with which soldiers fight, you too will be victorious. And why should I say 'make weapons'? Coachman, do you have a whip in your hand? You tame wild horses and beasts with a whip, and you cannot tame humans! Mason! With your trowel and foot-rule, you built so many houses and buildings, adorned wild nature in the guise of a goddess of prosperity—you can create a heaven for tormented people to live in peace. My sweeper, scavenger brothers, you are the ones who maintain the purity of the earth by making yourselves impure and untouchable, by inhaling all the toxic fumes, by shortening your lives, you have prolonged ours, kept the air around us pure. If you could clean so much filth—then can you not purify these dirty-minded, filthy people? Can you not make them as self-sacrificing as you are? Can you not shake off their poisonous filth with your broom? —You farmer? With the plow that you use to bring forth a festival of flowers and crops from the heart of the earth, can you not cultivate the crop of humanity in these barren-hearted human minds?"

The crowd cheered repeatedly. He was about to say more, but the police sahib interrupted him.

Ansar smiled and said, "Don't worry, Sahib. I've given many speeches like this, but I haven't been able to incite them beyond these cheers. I won't be able to today either. The people who will incite them are coming behind me! My mouth will be shut for a

long time now, so let me loosen it a bit before I go. Anyway, I won't say anything more. Now I'll tell them to go back."

Then, turning to the crowd, he said, "My request is, go back. If you have to follow me, that path is only to the police station or perhaps further to jail, but if you want to find your country's Lakshmi (goddess of prosperity), you will have to go to Swarna Lanka (Golden Lanka). You will have to ascend to heaven, descend to the underworld!"

Then, looking at the police, he said:

"These poor souls are as unfortunate and miserable as you and I. They commit sins out of hunger, become traitors. Forgive them, in a couple of days they too will become your comrades. No one has the power to escape the clutches of the death-hunger that shakes and whirls this world. Remember, you have not come here to rescue me, I have never taught you that mantra, rescue yourselves – that will be my greatest rescue. With your liberation, I too will be liberated. You have come, accept my greetings, forgive my faults and mistakes, and then if you must come my way, come united behind me. Come with the force of a great flood, do not come like a momentary tide. I am floating away, I have no sorrow, but you come. Namaste!"

Everyone present, along with the cheers, touched their foreheads and offered salutations and namaskars.

The police took Ansar away. Surprisingly! No one resisted anymore. They didn't even go to the police station. Like a thunderous cloud, they moved slowly and calmly on their way.

The most difficult part of leaving was with Latifa. She kept fainting frequently. When Ansar left, she was still unconscious. Ansar silently stroked her forehead and head, lying in the dust, repeatedly saying, "Bunchi, get up, get up. Don't be like this. I will come back." It was as if the high tide of a new moon night surged in Ansar's ocean of tears. ...

The next day, at dawn, as Ansar was changing trains at Ranaghat station, surrounded by disciplined guards, his eyes

suddenly fell on a few passengers nearby! They were none other than Miss Jones, *Mejo-Bou*, *Paccale* , and Kurshi.

Miss Jones stepped forward, suppressing a smile, and said, "I am sorry to see you in this state, Mr. Ansar!"

Ansar smiled and said, "Thank you! So, where are you taking them?"

Miss Jones said, "To Barisal! Your *Mejo-Bou* refused to stay in the church yesterday. She wanted to become a Muslim again and return home. What crying, Mr. *Ansar*! But this morning, I saw her, and she said she doesn't want to stay in this country. She cried all day today. She must have a screw loose, Mr. *Ansar*. Oh, and you'll be happy to hear, *Paccale* also converted to our holy religion yesterday. He's married to Kurshi. May Jesus Christ bless them. Good bye!"

The train arrived. Ansar saw two eyes glowing in the distance, like the fiery eyes of the engine. That gaze, like the hunger of death, was fiery, ravenous, licking. There were no tears in those eyes, only blood.

The train departed. *Ansar*, with his tear-blurred vision, saw many people and Miss Jones helping someone up onto the platform.

The smoke from the train obscured Ansar's eyes and the platform.

Twenty-Tw0

That Krishnanagar of clay dolls! That dusty, muddy "Chand-Sarak. Only the road remains, the moon is gone, everyone says, the moon rose for two days, and Rahu swallowed it! They look around. "*Vishwasang Naiva Kartavya Rajakuleshu*" (One should never trust royalty).

That "*Omankatli*" neighborhood, that garden, pond, paths, quarrels—everything is as before. Only those who can never forget, everyone else has forgotten Mejo-Bou, Kurshi, Pyankale, Ansar—everyone, everything. Where is the leisure to remember amidst this incessant sorrow?

One who has been tossed and turned in the great maelstrom of a vast current knows how a person in the vortex tries to save himself, forgetting the death of his own child, lost just a minute ago.

Those who are drowning in the muddy current of daily, continuous sorrow, want, pain, death-agony, and humiliation, in the whirlpool of death—where is their leisure to remember the sorrow of a moment ago? They are merely flailing their limbs, desperately trying to save themselves like helpless beings.

But when one abandons all hope and trust in life and calmly surrenders to the face of death, at this ultimate moment of last reliance, perhaps they too crowd into the path of memory—that departing group—who were their dearest companions throughout life, preceding and following them.

Paccale's mother is bedridden with grief, old age, starvation, and sorrow. She only says, "Look, elder daughter-in-law, I've never had such an opportunity to lie down and rest since I was born... I've been lying on this one side since yesterday, it feels like this side has turned to stone, yet what comfort it is!... I don't think about anyone else, not even you, not even myself, not anyone!... God will do what He wills! No one can turn back water by striking it with a stick! What is to happen, will happen!"—And then she looks up at the sky with a calm and indifferent mind! Suddenly, she becomes a philosopher, uttering profound words of forgetting sorrow—words that never came from her mouth in her life. And then she herself is surprised. Her face and eyes brim with a serene smile. It's as if a lamp's wick, which had been flickering all night without oil, suddenly flares up before going out!

The elder daughter-in-law wipes her eyes. She wipes them when tears come, and when they don't, she wipes them as if to hide her shame.

These are just two eyes, how much water can they hold! The blood that trickles down to form those tears, that blood has already run out.

Mejo-Bou's abandoned children play in the courtyard; a kind of detached expression appears in their words, movements, and faces.

Like a motherless bird fledgling, even when with other birds, it wanders apart from the flock, seeking something, searching for someone—just like that!

They play for a while, gather wood for a while, lie lazily under a tree and sleep for a while, wake up from sleep, look at the sky and ponder something, then return home with a heartbreaking sigh. As soon as they enter the house, they search for someone, expect something, but don't find it. The elder daughter-in-law's children come to play, but they don't like it. The elder daughter-in-law comes to caress them, but they cry and pull their hands away. They quarrel for no reason.

As evening falls, they slowly come and sit by their ailing, bedridden grandmother. The boy gravely asks, "Grandma, are you feeling well today?" The old woman smiles and says, "Oh, grandson, well! Now, if I just close my eyes, everything, good and bad, will go away." Then, in a calm, philosophical voice, she says, "Look, grandson, when I'm gone, none of you should cry. Humans are born to die. Do children, mothers, fathers ever stay forever?"

The young grandson doesn't understand a word of this, he just stares with his mouth open.

As soon as she hears the names of mother and father, the little girl, dozing off, exclaims, "Grandma, are you going to Father's place? Grandma, is Father's place farther away, or is Mother's place, Barisal, farther away?"

The calm old woman fidgets. She makes a terrible, pain-filled sound, turns on her side, and says, "That Barisal is farther, that Barisal is farther!"

The little girl doesn't understand. Yet, in a tired voice, she says, "Then I'll go to Father's place. Grandma, how many days do you have to lie in bed to go to Father's place! You got sick lying in bed, and then you're going there! I'll get sick now too, and then

I'll go to Father's place! Mother doesn't love me, she's become a Christian! She eats forbidden food! Phooey! I'm not going to her anymore, hmph!"

The old woman lies there, breathing heavily. It sounds as if the bellows are puffing to light burnt coal in a blacksmith's forge!

Lying on the veranda floor, the little girl, in a slurred voice, asks again, "Hey Grandma, what do they eat in the evening where Father lives? I say milk-rice, Hanpe says meat-bread!"... But she falls asleep before hearing her grandmother's answer!

The boy stays awake. He thinks about various things, occasionally glancing towards the kitchen. Seeing darkness there, he doesn't dare to ask anything else.

But he can't stay either. He slowly gets up and goes out! The grandmother shouts, "Oh Hanpe, where are you going in this darkness?" The answer comes from beyond the darkness,

"There's *shinnī* (a sweet offering) at the mosque, I'm going to get it."

The elder daughter-in-law wants to carry him back from the mosque door, but he rolls in the dust and cries. He says, "I won't go, I'll eat shinnī, I'm so hungry! I won't go."

From inside the mosque, the voice of the *Maulvi Saheb* (religious scholar) floats out. That part of the *Quran*—which means—'I do not accept the prayers of those who drive away the orphan!' The Maulvi Saheb recites loudly, and the devotees listen with their eyes closed.

In the dark room, bats fly over the hungry child's head—like the shadow of impending death.

In her sleep, the little girl cries out, "Mother, I won't go to Father's place! I'll go to you, I'll go to Barisal."

Like fragments of darkness, the bats flutter their wings and fly overhead—the night shudders.

Twenty-Three

After many days, a smile appeared on Latifa's face. Nazir Saheb, returning from the office, woke the sleeping Latifa and said, "Oh, have you heard? Ruby's father has come as the District Magistrate of Nadia!"

In an instant, Latifa's sleep seemed to fly away. She sprang up and said, "Are you telling the truth? Did Mr. Hamid come alone, or is Ruby with him?"

While taking off his formal attire, Nazir Saheb said, "I don't know for sure. But someone said that Hamid Saheb's children have also come with him."

Latifa's eyes welled up with tears, thinking of someone! She thought to herself, "So you've come, unfortunate girl, if you had come two days earlier, you might have seen him once!"

The next afternoon, a huge motor car stopped at Latifa's door. As Latifa stood at the door, a fair-skinned beauty in white clothes stepped out of the car with a smiling face.

Latifa pulled her close to her chest and said, "Ruby, it's you! You've become like this?" As she spoke, tears streamed down her eyes.

Ruby scolded, "Quiet! If you cry, I'm telling you, I'll leave right now! Mother, your tears are like a habit; after so long, we meet, you should be happy, but instead, you're just crying and flooding everything."

Latifa wiped her eyes and said, "That Ruby, you've become like this! Back then, there was no one as tearful as you in our group, and now you've become so stony?"

Ruby pinched *Latifa's* cheek and said, "Not stone, dear, ice! It will melt into water when summer comes again!" Saying this, she caressed and kissed her children, pinched them to make them cry, then appeased them with sweets and clothes—and seemed to liven up the whole house!

Many neighborhood girls had gathered, but with one threat from Ruby, everyone scattered wherever they could! Oh my! The Magistrate's daughter!

Ruby smiled and said, "You know, Bunchi, I can't stand seeing too many people! Just thinking about a crowd staring at my face makes me uncomfortable. It's hard to drive them away, but I can't help it, sister."

Bunchi, or *Latifa*, smiled and said, "You're the Magistrate's daughter, that's why they quietly moved away like that, otherwise they would have answered your taunts in such a language that you'd want to seal your ears."

Ruby gave a mischievous smile and said, "So you've learned proper Bengali by now?"

Latifa smiled and said, "Yes, not just me, my children have learned it too. We live in such a terrible neighborhood, sister, don't even ask. My children's afterlife has been ruined. But let's leave that topic, sit down calmly after leaving the children, there's so much to know and tell. It will be quite late for you to leave, tell the driver to send the car back, you'll eat and leave at night."

Ruby, dancing like a child with joy, told the chauffeur to take the car away and sent the maid home with a message for her mother not to worry, and to send the car back at ten at night.

Ruby ran and threw herself onto Latifa's bed with a thud, pulling Latifa close and saying, "Enough, no more talk now. You tell me everything, and I'll tell you everything." Then, looking at the clock, she exclaimed, "Oh dear, is your Nazir Saheb coming soon? Make sure you feed him quickly tonight and send him out."

At her manner of speaking, Latifa burst into laughter and said, "Wait, let the old man come, then I'll hand you over and only then will I let you go. But don't be afraid, he's out hunting tonight! He won't be back before midnight."

Ruby patted Latifa's back and said, "Bravo! Then tonight is ours! We can spend it telling grand stories."

Latifa smiled and said, "Stories won't fill your stomach. Instead, let's go to the kitchen, I'll make parathas, and you can tell stories."

Ruby smiled and said, "Let's go, sister, it's been so long since I've had your cooking."

While kneading the dough for parathas, Ruby said, "Do you know how I got your news?" Then, after a pause, she continued, "One day I read in the newspaper that Mr. Ansar was arrested by the police at your house!" With that, Ruby suddenly fell silent.

Latifa's smiling face suddenly clouded over. She sighed deeply and said, "I also first heard about you from Dada-Bhai! Grandpa is now imprisoned as a state prisoner, you've probably heard!"

Ruby looked at Latifa for a while with the compassionate gaze of her large eyes and said, "Yes, I know. I read everything in the newspaper. By the way, Bunchi, did brother say anything about me?"

Latifa said calmly, "Yes, he did! Tell me, Ruby, won't you hide anything from me?"

Ruby said steadily, "Look, Bunchi, I don't hide my feelings from anyone. I've suffered extreme sorrow for this, yet I couldn't deceive my heart. I know what you're going to ask!"

Latifa looked at Ruby with a questioning gaze for a while and said, "Did you love your husband?"

Ruby said in a simple, calm voice, "No. He didn't want my love, and neither did I. He wanted the travel expenses to England, claiming to be blessed by marrying me. And he got it. But his luck was bad, it didn't last, I feel very sorry for him, Bunchi." She paused and continued, "A few days before his death, he realized his mistake. This mistake perhaps became his undoing. I nursed him and took care of everything, of course, not to please myself, but to please him and my parents. But one day he caught my deception! He clearly said,

'You don't love me, Ruby, there's no greater sorrow for me than this. The person closest to me is the most unrelated, even thinking about this makes my breath stop. Perhaps I would have lived, but after this, I have no desire to live.'"

Latifa felt as if her breath was being choked. Without letting her speak further, she asked, "And you remained silent even after hearing this?"

Ruby, still kneading the dough calmly, said, "What else could I do? Who wouldn't feel bad seeing a gentleman die before their eyes! But that sorrow never felt as painful to me as the loss of a relative."

Latifa was startled. It was as if she had suddenly stepped on a cobra! But she deliberately asked no further questions. She felt as if she was gradually turning into a stone statue. What she heard, what she saw, seemed beyond imagination. She felt as if her breath was being choked just thinking that a girl could make such a shameless confession.

Ruby gave a strange laugh and said, "You must hate me a lot after hearing this, right? Well, my parents hate me, so you're just you. But Bunchi, you'll be even more surprised to hear that the day I read in the newspaper that Anu Bhai was arrested by the police, that very day I felt as if someone had smeared and wiped away all the beauty of my beautiful world with their coarse hand! Except for that one, I have no sorrow for anyone else in the world."

As she spoke, her steady, intense eyes brimmed with tears.

Latifa said in a slightly sharp voice, "But sister, isn't this a great injustice?"

Ruby, without attempting to wipe away her tears, said with even greater sarcasm, "Is it a great injustice to you, *Bunchi* that I couldn't sacrifice my heart and soul for someone else's happiness by keeping them starved? Perhaps it is to you, but not to me. My right and wrong are my own. It's not greatness to silently endure all kinds of torment to please others! It's by trying to repay the debt of my parents' affection and love that I'm so bankrupt today! Don't I have any right to choose my own happiness, comfort, and the path of joy in life?" Then, with a cruel laugh, she said, "My husband was a noble, fortunate, and intelligent man, so he died quickly and was spared the lifelong burden of suffering!"

Latifa felt as if the earth was shaking. Her head spun. With great difficulty, she managed to say,

"How can a woman be so cruel, Ruby, I can't even imagine it! It's all getting muddled!"

Ruby burst into laughter this time. But there was no juice or flavor in that laughter. By then, the dough for the parathas was ready. She washed her hands and said, "Look, Bunchi, water is a wonderfully cool drink, but when that water boils furiously on fire, if it falls on your skin, it will blister! - But your griddle is smoking, come on, now fry these parathas!"

Latifa, like a machine, prepared parathas, halwa, and tea and placed them before Ruby.

Ruby smiled and said, "I don't eat any of this at home, I'll eat it at your place today."

Latifa stared at Ruby with wide, astonished eyes. She seemed to understand nothing.

Ruby smiled and said, "Come on, eat now. You won't understand what all this means. You see, I live like a Hindu widow. I eat once a day, and that too is vegetarian. I don't eat ghee, certainly not tea or paan. I wear white clothes, I don't put oil in my hair. All this and that! Do you understand now?"

She burst out laughing and said, "What widowhood for a husband one didn't acknowledge! Sometimes I just laugh!"

Latifa said with a hint of anger, "There's a limit to exaggeration, Ruby."

Ruby didn't answer that, but as she drank her tea, she said, "Ah, just a little tea, and Anu Bhai would jump with joy, you saw!"

Latifa finally breathed a sigh of relief and said, "Truly, Ruby, *Dada- Bhai* probably loves a cup of tea more than he loves you!"

Ruby, feigning seriousness, exclaimed, "Do you know why, *Bunchi*? If your *Dada- Bhai* could pick me up and drink me as easily as he lifts a cup of tea to his mouth, then I would become more beloved than that tea!" And then she burst out laughing.

Latifa blushed with embarrassment and said, "Oh my, Ruby, how shameless you've become! You're completely gone!"

Ruby agreed and said, "Yes, completely gone, and I won't come back."

When she finished her tea, Ruby said, "I only crave that tea for one person."

Annoyed by Ruby's excessive talkativeness, Latifa said, "If you crave it so much, why didn't you tie up that tea-drinking man? Then he would live, you would live. We would all live."

Ruby said without hesitation, "You said one thing wrong, *Bunchi*. We might have lived, it's true, but your Dada- Bhai wouldn't have."

Latifa stared blankly for a while and said, "What do you mean?"

Ruby pinched Latifa's hand sharply and said, "Are you dead or something! You don't even understand that!" Then, after a pause, she said, "What life is there for someone who hasn't died! Your *Dada- Bhai* hasn't died like me. He's perfectly alive and well, grazing in the fields with coolies and laborers. I have one great sorrow, sister, that I couldn't kill the one for whom I died."

Latifa, somewhat relieved, laughed and said, "Oh my! What a mischievous girl you are! You won't leave without taking revenge! Well, I have some good news for you, sister. He may not have died like you, but he's been hurt."

Ruby stood up abruptly and said in an agitated voice, "No, no, this cannot be! He only sees people's external sorrows, he has no capacity to see internal sorrow, he has no such thing as a heart! He only understands the sorrow of those who only want to receive from him. He doesn't understand the sorrow of someone who gives him everything - not by asking, but by wanting to be happy, he doesn't understand."

Amidst her loose, flowing hair, Ruby's eyes glowed like a snake's jewel in a dark forest.

Latifa's eyes welled up with sorrow, joy, and pride. There was someone who loved her Dada-Bhai so much. She hugged Ruby tightly and said in a calm voice, "You can't see anything through the fog of your resentment, Ruby, I am also a woman. I am telling you the truth, he loves you."

Tears streamed from Ruby's eyes, overflowing their banks. Like rain falling in the scorching midday heat of *Jyeshtha* (a Bengali month).

Latifa wiped her eyes and continued, "My sorrow is, Ruby, that having found this depth of love, his imprisonment would have become sweeter than heaven. He only knows that you love him. He probably doesn't know how deep that love is!" Then, pinching Ruby's cheek, she smiled and said, "If he knew, he would have abandoned public service and only served at your feet."

But Ruby didn't say another word after that. Like a deep stone oyster that floats day after day on the waves, hoping for a single drop of dew, hoping for the dew from the Swati constellation, and then, having received that drop of dew in its heart, it sinks into the depths of the water in its quest to produce a pearl—this was similar.

Just the consolation of "he loves too" seemed to fill Ruby's heart. It was as if she had been looking up at the undefined void with her thirsty face, waiting for just this one drop of dew. Her heart was full. Her words had become mute. She wanted nothing more. Now she would produce a pearl. She sank into the depths.

A single drop of dew in the mouth of an oyster! A single drop of love in a woman's heart!

A sliver of moon in one corner of the sky! She didn't know which month's moon it was, but Ruby felt as if it was the Eid moon! Her month of fasting was perhaps over today.

A tiny moon in the lap of the sky, a baby moon. It was like the sky's little girl. The sky-mother seemed to be standing in the courtyard, holding her in her lap, wrapped in a towel of white clouds.

And then the little girl...

Ruby's face turned red like Ruby's with shame. Was this a dream! Was this happiness!

Twenty-Four

Barisal. The Venice of Bengal.

Winding red roads, embracing the town like an arm in an embrace. On either side of the road, rows of casuarina trees. Beside them, the river, shimmering and trembling—like a full-figured bride in a Bombay saree, walking with more sway in her body than actual movement.

Across the river, paddy fields! And beyond them, green villages encircled by coconut and betel nut groves, tranquil and silent. Like a shy, young bride in a green saree at her wedding night ceremony.

From one sky to another, whose plea wanders and returns?

"Speak, bride. Speak, bride."

Wrapped in a cloak of darkness, the night had not yet set out on her tryst. Perhaps her evening toilette wasn't finished. In her anxiety, the bottle of *alta* (red dye) from her hand had spilled onto the twilight sky. The sky was stained redder than her feet. The third-day moon's pearl necklace had twisted as it tried to entwine itself in the dark cloud-braid. The courtyard was strewn with stars like flowers.

Three or four Bengali girls, clad in black-bordered sarees, with curved partings in their hair, and high heels on their feet, came and sat upon a dilapidated bridge on that very road. The casuarina branches above them began to fan them with all their might. Occasionally, a motor-phæton belonging to one of the local landlords would slow down as it approached the girls, only to speed up and drive away.

All but one girl were engrossed in conversation. The single girl sat a little distance away on a neem tree's root, gazing intently at the river, seeing something that perhaps she herself couldn't describe if asked.

After a long time of gossiping, one of the girls in the group shrieked, "*Mejo-Bou*, sitting all alone here, whose thoughts are you lost in, sister?"

Mejo-Bou did not reply.

The girl then got up, gently pulled her, and made her sit with them, smiling as she said, "You know, Mem-Saheb has ordered us to keep an eye on you! Don't you dare slip away, sister, or we're doomed!"

Mejo-Bou offered a faint smile and said, "No, there's no fear of that. And even if I did slip away, I wouldn't go much farther than the water of this river!"

The waning third-day moon's face grew dim with her smile. The casuarina trees began to sigh heavily.

The girl who had spoken was named Minati. She was almost the same age as *Mejo-Bou*. She had been a Hindu wife but, unable to endure her husband's torment, had converted to Christianity, divorced, and now preached the Christian faith. She also worked as a teacher for educated girls. This girl was Mejo-Bou's only friend, a confidante with whom she shared her tears.

Another of the two other girls spoke up, "Sister, will her name *Mejo-Bou* never change?"

Mejo-Bou laughed and said, "Does the name *Talpukur* (a pond named after a palm tree) change even if the palm tree is no longer there?" It was a forced laugh, like lighting a lamp by kindling the wick of one's own heart.

Minati, without giving *Mejo-Bou* any further opportunity to speak, interjected, "Well, sister, I quite like calling her by that name. It feels like we are all part of a proper household, with sisters-in-law and all!"

The other girl let out a fake sigh and sang melodiously, "Alas, the homeless, alas, the lost!" Then, adding a pinch of spice to her words, she said, "Well, sister, your longing for a home hasn't been satisfied yet. If you still crave milk, why are you catching a cold by drinking this buttermilk for no reason?"

Mejo-Bou endured the sting and replied, "Well, sister, pouring buttermilk into my stomach is better than pouring it over my head!"

This clever retort struck a hidden weakness in the girl, who twisted her mouth and retorted, "Mejo-Bou has learned to talk back, I see."

Mejo-Bou smiled and said, "Rather say I have become human. We are girls from Krishnanagar, sister, we don't need to learn to talk! Girls from our land learn to speak from their mother's womb! But don't be angry, sister, I truly haven't become fit to mix with you all. You're forcing me into these fashionable sarees, cutting my parting crooked, and even finding me shoes, but have you been able to make me like you with those shoes and sarees? May Mem-Saheb's shoes remain on Mem-Saheb's head, sister, I just want to breathe freely wearing white clothes!"

The girl retorted sharply, "Then why did you come here?" She herself was embarrassed by her abrupt question and consequently became even angrier.

Mejo-Bou, still smiling, said, "I didn't come to be a *Mem-Saheb*, sister, I came to be human. There's a great lack of light and air for life in our society, so I broke free like a caged bird. I won't say that nothing good came of it. What I've learned now, I'll have no difficulty finding two meals a day wherever I stay. But what can I do, it's a lifelong habit; when I wear those shoes, it feels like a new kind of chain on my feet!"

Minati got up and said, "All right, from now on you can wear a lungi, I'll tell them! Those shoes won't suit your bad luck! Now let's go, it's getting late."

They all got up.

A little further on, they met *Paccale*. He had secured a position as a peon in the Magistrate's office thanks to *Padre Saheb's* recommendation. He was no longer Paccale; his name was now Joseph! When the Magistrate called, "Joseph!" Pyankale almost wept with joy! He would say "*Huzoor*" (master) and rush over, tripping over himself, and execute a two-and-a-half-foot long salute. His wife, Srimati Kurshi, also known as Mrs. Paccale, ran errands for the missionary women and earned twenty rupees for it. Paccale earned fifteen, and Kurshi twenty, a total of thirty-five. Their household ran merrily. Kurshi didn't care much for Pyankale; she earned five rupees more. If Paccale said anything, she'd retort, "Am I your concubine, man? Don't talk so much about money!" And she'd walk away proudly.

Pyankale often wanted to go to the office without eating. He'd say, "I'm the Magistrate's peon. I have twenty rupees dangling under my armpit, unlike you. Who bothers to ask your Mem-Saheb!"

As soon as he stepped out of the house, Kurshi, wrapping her cloth around her waist, would say, "Just you try!" And she'd swiftly grab his dhoti, saying, "Take another step and I'll create a scandal! I'll snatch away your clothes!" And she'd give the dhoti a yank. Paccale would helplessly sit down there and say, "Let go, I'm telling you, you wretch! Otherwise, I'll give you a good beating… Hey, Kurshi, I beg you. Someone will see us soon! By Allah! By Jesus Christ! I swear, I'll never say anything again!" And he'd cover his nose and ears.

Kurshi would let go of his dhoti and sit down, laughing. She'd say, "Come on, eat! Eat, then go show your temper to your Magistrate husband."

Twelve-anna-clad Paccale would sigh in relief! Then, after eating, he'd grumble his way to the office. As he left, he'd say, "Marrying a woman is the most disgusting thing ever! If I ever marry you again, my father's—"

Kurshi would collapse with laughter. She'd say, "If you're five minutes late coming back, I'll go sleep at Mem-Saheb's place tonight."

That day, seeing *Mejo-Bou* on the road, Paccale instinctively said, "*Mejo-Bhabhi* (sister-in-law), I was just looking for you."

Mejo-Bou smiled and said, "Why has Kurshi kicked you out again today? Well, your dog-love is something else!" And she smiled sweetly, like old times. A momentary flash of lightning in dark clouds!

Paccale used to not understand the meaning of that smile. But now, even if not shrewd, he had become sharp, so that smile startled him a bit. Both lightning and snakes are startling in the dark.

Paccale paused for a moment, glanced at the girls beside her with a half-sideways look, and then said, "A letter has come from home. If you could read it this afternoon."

It was as if someone had suddenly whipped *Mejo-Bou*; she was startled! Her face changed, though it wasn't clearly visible in the dim light. But from the sound of her voice, it seemed as if someone had choked her.

Mejo-Bou was a strong woman. Yet, today she couldn't compose herself. With a trembling, prolonged voice, she cried out, "Come, let's go to your house right now."

Pyankale was about to say, "Not today, tomorrow—"

Mejo-Bou insisted, "No, no, let's go right now!" And she almost ran towards Pyankale's house. She didn't even have time to think that there were others with her, or that she needed to say anything to them.

Minati told Paccale to take *Mejo-Bou* with him after she finished reading the letter.

From a distance, *Mejo-Bou* was seen running towards the house with the same speed. Just as a rocket shoots into the sky with great speed, it returns to the earth with the same speed, falling face down.

Twenty-Five

Mejo-Bou burst into Paccale's house like a storm and called out, "Kurshi!"

Kurshi had never heard *Mejo-Bou's* voice like that before. Frightened, she came out, and Mejo-Bou said, "Let me see what letter has come."

Kurshi silently handed her the letter. Her hands were trembling too! In the year since they had arrived, no one had received any letters. Suddenly seeing a "bearing" letter today, everyone thought, who knew what bad news it might contain!

Mejo-Bou went near the hurricane lamp, and with trembling hands, opened the letter. After reading a little, she collapsed to the ground, crying out, "*Khoka*! My *Khoka*, my child!"

By then, Paccale had arrived. As soon as he did, *Mejo-Bou* threw herself at his feet and cried out, "My Khoka may not live, brother! He wants to see his unfortunate mother. Take me, I beg you, brother, take me!" And she fainted.

Paccale and Kurshi revived her with great difficulty.

They had been in Barisal for a year now. During this time, no one had sent them any letters. Mejo-Bou would even run away if she heard the name Krishnanagar, as if in fear of something. She constantly felt that news of her children's illness would arrive at any moment. That night, she prayed that they would be well, but that no letter would ever come. Yet, she had no peace; awake or asleep, she constantly seemed to hear the cries of her hungry children. She was a *rakkhusi* (demoness)! She had intentionally abandoned her children. The day she left, it was as if she was possessed! Only the thought of leaving that place had consumed her. That day, she had forgotten she was a mother.

A little composed, Mejo-Bou read the entire letter again. Paccale's mother had written the letter—meaning she had someone write it for her. *Khoka*, *Mejo-Bou's* son, was gravely ill with typhoid. He probably wouldn't survive. The child who had forgotten his mother's name for a year was now, in the throes of delirium, constantly saying, "Take me to my mother!" Pyankale's mother was also on her deathbed. But before dying, she wanted to hand over her son to his mother's care. Leaves fell from trees upon hearing a child's cry, and yet this demoness mother's heart wouldn't melt!

That very night, *Mejo-Bou*, Paccale, and Kurshi set out for Krishnanagar. It had been quite difficult for them to get permission to leave. But the local missionary authorities knew *Mejo-Bou* well. So, even though they objected, they dared not stop them from leaving.

The next day, as the evening darkness deepened, they arrived at Krishnanagar station. How much had changed in this one year! The sorrowful, dull gaze of *Mejo-Bou* seemed to make the coal-stained path of the station even darker. She felt as if someone had erased all the beauty of that eastern Krishnanagar with the rough touch of a coarse hand.

Getting into a rickshaw, *Mejo-Bou* said, "Drive fast." The rapid heartbeat that hadn't disturbed her throughout the long journey seemed to increase a hundredfold as soon as she got off the train. For a moment, she wished this road would never end. She wished this rickshaw would continue to run endlessly like this.

… Perhaps by now, the word "*Ma*" (mother) had ceased on her *Khoka's* lips!

Under the whip of the coachman, the ghee-fed *Ashwini-Kumars* (horses) barely increased their speed. It couldn't really be called a horse race; it was more like a limping race! It was both comical and filled one's heart with pity for the helpless creatures. But more than the horses, the wheels of the rickshaw groaned. They seemed unable to roll any further. They seemed to rub their faces against the road, expressing their protest and cries. The road was the same. It seemed to be baring its teeth and making faces at the municipality!

Creaking, the rickshaw arrived at Paccale's house. No sound was heard from inside. It didn't seem like anyone was inside. There wasn't even the faint promise of a small earthen lamp.

Mejo-Bou's heart cried out in unknown fear! An empty wail seemed to resonate within her, like the void of an endless sky. Stumbling, she got down from the rickshaw, collapsed at the doorstep, and wailed, "*Khoka*!"

It was as if someone had choked her.

From the heart of the empty house, a faint wail was heard! That wail seemed not from this side, but from a weary traveler on the other side of the river they had crossed.

Paccale, by then, had opened the bolt of the closed door and entered. As something skeletal touched his feet, he cried out, "*Ma! Ma*!"

Suddenly, the kitchen door opened; and from within, *Boro-Bou* (eldest sister-in-law) came out, and in a frightened, frail voice, she shrieked, "Who's there?"

From *Mejo-Bou's* faint voice, only a faint, unclear plea resonated once more, "Khoka, where is my Khoka?"

Boro-Bou shrieked and wept, "Demoness, you came after all this time! *Khoka* is gone! He left yesterday morning!"

Mejo-Bou, crying "*Khoka*!" collapsed there like a wounded bird!

… Paccale cried out in an anguished voice, "Boro-Bou, how terribly dark it is! I can't bear it anymore, light, where is the light?"

Boro-Bou, still sobbing, replied, "No light! All the lights have gone out! There isn't a drop of oil in the house!"

Paccale, like a madman, pulled a pile of rotten straw from the roof of the broken house, set it on fire, and cried out, "Then let the house burn down!"

In that bloody light, Paccale's mother's skeleton, with only her skin covering it, was seen still flickering, waiting for death!

As Paccale cried "*Ma*!" and fell upon her chest, the old woman's eyes briefly glowed before extinguishing forever!

The straw on the roof was still fiercely burning, like the fire in their hearts. A little later, even that flame seemed to faint from excessive grief

Twenty-Six

The neighborhood people, upon seeing *Mejo-Bou*, would say, "That demoness! Her heart is nothing but iron and stone!"

Khoka was gone. *Mejo-Bou*, with her daughter Potli, went about the neighborhood as before, chewing betel, wearing silk bangles, with her curved parting, and a broad, black-bordered saree. Only a month had passed since her son died!

Immediately after regaining consciousness, *Mejo-Bou*, like a madwoman, had burned to ashes all her son's mementos, even his tattered quilt, wherever they were. All the toys she had secretly collected over the past year were also burned with them. It was as if all the sorrow and anguish of her heart were incinerated forever that day. Then, she herself put out the fire by pouring pitcher after pitcher of tears. Today, it seemed she had no more sorrow, no more grief or shame! Even her tears seemed to have been exhausted with that act!

This was like another birth for her! She was like a new person in a new world, born anew. Her daughter would trail after her, but she paid her no attention. It was as if the girl wasn't her daughter at all. Some said she had gone mad with grief, others that she was mad with passion!

She remained in that house, despite many requests from the missionary sahib and mems to join them, but she hadn't converted to Islam either. Paccale had secured a job paying twenty rupees through the local Khan Bahadur Saheb, so he had converted back to Islam by reciting the Kalima. Kurshi's father, *Madhu Ghorami*, had died long ago. So Kurshi, after much weeping and wailing, finally accepted Paccale's faith. Thus, their days were passing quite well.

Only *Mejo-Bou*, though inside the house, seemed to be none of its own. She visited different houses, and did so dressed rather overtly clean! So, despite their unwillingness, people offered her a stool. Their assumption was that Mejo-Bou, in this one year, must have captured many sahibs and captains and become a crocus of money! She made her living through distress and scheming, so even if there was a bit of sternness in their faces initially, perhaps later, when she was down and out, they might get a couple of rupees from her!

In truth, *Mejo-Bou* had accumulated some money, but only a couple of hundred, no more. So she was spending it lavishly, like a bibi, and seemed not to care what would happen next, or how she would manage. No one in the household dared to say anything, tempted by her money.

The village chief, a calculative man, decided after much thought that if he could entice her passionate heart with some Muslim youth from the neighborhood, he could easily bring her back to their faith and gain the glory and merit of converting a Christian woman to Islam. So, he consulted with *Moulvi Saheb* and didn't press her much on the matter. Who knew, if pulled too hard, the rope might break!

If anyone said anything, the chief would smile and say, "My child, I have now given her free rein. Where will she go? Let her graze for a bit, then the house cow will return home!" They would return, praising the chief's wisdom.

Mejo-Bou visited Latifa the most. Latifa, having grown up in an environment that taught her to value the heart above all else, respected the fire she saw within *Mejo-Bou*. Hence, she never pressured her to return to her original faith! Nazir Saheb, poor man, was what you'd call a truly simple person. He had no headache over this matter. Only, in jest, he would occasionally tease Latifa about it. He'd say, "See, I hope you don't fall into the trap of a pimp and leave me adrift!"

Latifa would laugh and say, "You're not light enough to float, you're more likely to drown. So I have more to fear! I'm the one digging a canal and bringing both unwanted water and crocodiles into the house!"

Nazir Saheb would look at his own body and sigh dramatically, saying, "No! My body is indeed getting too stout to float! From now on, I'll have to fast at night to lighten this body a bit—at least enough to float!"

Latifa would poke Nazir Saheb and give him a sharp pinch, saying, "Bah! Nonsense! Who calls you fat! I'll put tree sap in their eyes!"

Nazir Saheb would rub the spot, whimpering, "Oh my! If I had known earlier, who would have married this *Surpanakha* (a demoness with a disfigured nose from the *Ramayana*)..."

That morning, Mejo-Bou suddenly announced, "*Boro-Bu*! I'm going to feed all the boys in the neighborhood today!"

Boro-Bou, confused, asked, "Why?"

Mejo-Bou replied simply, "It's Khoka's fortieth-day ceremony today."

Boro-Bou's eyes filled with tears. It was true, forty days had passed since Khoka left! Mejo-Bou hadn't forgotten then. She was only pretending to forget. Boro-Bou wiped her tears and said, "Well, if you're feeding them in your son's name, what have we to say, sister! But you should at least tell the neighborhood chief and the *Moulvi Saheb*."

Mejo-Bou, still calm, said, "No, I won't tell either of them. I'll just invite the little boys and cook for them myself."

Boro-Bou burst into tears and said, "Oh, you crazy girl! If the chief doesn't agree, no one will let their son eat your cooking!"

Mejo-Bou paused for a moment and then said, "Oh, I am Christian. But no matter what, I will feed them." Without another word, she went and presented herself at the chief's house.

The chief saw this as the best opportunity. If he missed this chance, she could never be brought back home. He feigned great benevolence and said, "What can I do, dear daughter, you are like my own daughter! Even if I say so, no one will eat food cooked by a Christian. Not even if they die."

Suddenly, tears gathered like dense clouds in *Mejo-Bou*'s burning eyes. She remembered how many days her Khoka had starved before he left! Her whole being seemed to wail in anguish. She could no longer control herself. She burst into sobs, collapsing in the courtyard, and cried out, "I will become Muslim today! May my Khoka's soul not return forever with hunger!"

The chief seemed to have found a treasure. He immediately got up, helped *Mejo-Bou*, and said, "This is it, my child, at last you speak like a human, like a mother. Even as he died, in his delirium, your Khoka said, 'Mother, you are Christian, I will not drink water from your hands.' If you do not offer fatiha for him as a Muslim, he will suffer."

Mejo-Bou put her fingers in her ears and cried out, "Don't mention his name to me anymore. Don't speak of him. Today, all the boys in this neighborhood are my *Khoka*."

The chief placed a hand on his head and said, "So be it! Let them be your *Khoka*. Feed them, embrace them, and forget your grief for your Khoka."

When *Mejo-Bou* left, the chief muttered to himself, "Even a demoness is a mother! Where can the pull of the umbilical cord go?"

Twenty-Seven

When *Mejo-Bou*, having neatly fed and seen off nearly a hundred hungry children from the neighborhood, arrived at Latifa's house, dusk had already settled. Ruby's enormous motorcar was parked outside.

Mejo-Bou's heart was filled with a deep tranquility today. As she fed those hungry children, caressed each one, and held them in her lap, she felt that her Khoka hadn't been lost! He had come in the form of a hundred children, amidst these hungry little ones! Her desire to caress them, kiss them, and press them to her heart seemed insatiable. In every child she saw, she saw her *Khoka's* face! Today, she was like the mother of the world!

Looking at the evening star, she felt it wasn't a star, but her Khoka! From that distant world, he was smiling, having found his mother again. Like that vast sky, Khoka's mother's lap was boundless and generous.

In the lap of the Sky-Mother, thousands of stars — *Khokas* and Khukis!

Beside the evening star was the fourth-day moon. It was like *Khoka's* crooked smile. It was like Khoka's little boat. Khoka had set out on a voyage, daring to make his mother a queen, venturing into the void to bring back gems and jewels. No, no – it was like Khoka's chisel! The naughty boy had run off into the dense forest with a chisel, to cut wood for his sorrowful mother. No, no – he was building a house in that void for his mother with a roof of

clouds! He would play and wander all day in the sky, and then in the evening, standing in that very courtyard, he would say, "I have come, I am not lost."

As *Mejo-Bou's* eyes blurred with tears, she felt that the stars' eyes too seemed to twinkle! Tears in *Khoka*'s eyes! No, no, she wouldn't cry anymore! He was the Khoka of all mothers, of all people, from all lands! Was he anyone's alone? He had come to one mother, received no affection, and gone to another! Yet, he was there! In that star, in that moon, somewhere in that sky, he was definitely there! Wherever she looked, she saw him! Naughty boy, sometimes crying under the pretext of hunger in a beggar woman's lap, sometimes wandering door to door with a beggar's bag, pretending to be an orphan, sometimes standing on the road and crying, angry with his Maratha mother, sometimes laughing, adorned with gold and jewels in the lap of his darling mother. Was he *Khoka*, he was all-devouring, a demon! He had devoured the entire world, transforming it into his own image...

Perhaps no one had ever seen Mejo-Bou in so many forms. Latifa and Ruby gasped together! This was no mere human!

... In *Mejo-Bou*'s eyes, there was now the full radiance of the Universal Mother!

Mejo-Bou sat down, laughing, and said, "I just finished feeding the boys. It took so long to feed them, sister that I couldn't come earlier today! Such naughty boys!"

What an exquisite voice! What a calm, profound affection! Everyone's heart seemed to be soothed! Mejo-Bou spoke as if she had just finished feeding and calming the boys in her lap before she could finally come.

Latifa understood nothing! Only Ruby's eyes welled up. She bowed mentally to *Mejo-Bou* and said, "You have nothing to fear anymore. You have crossed the ocean of fear!"

Latifa, bewildered, blurted out, "Whose *Khoka*, *Mejo-Bou*?"

Ruby squeezed Latifa's hand hard, bringing her back to her senses. She had forgotten that today *Mejo-Bou* had fed the neighborhood boys in her *Khoka's* name! She cursed herself

silently for this unforgivable mistake. How much pain must she have inflicted on *Mejo-Bou's* grief-stricken mother's heart! To quickly divert her mind from this, she stupidly said, "I received a letter from Dada-Bhai today, sister, so my mind is a bit muddled! That's why I wasn't thinking straight."

Mejo-Bou calmly asked, "Is he very ill, then?"

Latifa exclaimed in surprise, "Yes, how did you know?"

Mejo-Bou smiled and said, "Don't worry, he didn't write to tell me; it just occurred to me for some reason."

Ruby's eyes seemed to flash for a moment. She had heard from Latifa that *Mejo-Bou* had a secret weakness in that regard. But she was an educated girl! So, it didn't take long for her to extinguish the fire in her eyes. Moreover, she didn't have the cruelty to hurt a grief-stricken mother's heart in that way.

Before Ruby could say anything, *Mejo-Bou* spoke, "I've decided to teach the little children morning and evening, so sister, you are the Magistrate's daughter, why don't you ask your father to build a small room in this neighborhood? Of course, if I don't get a room, I'll have to set up the school in the garden in front of our courtyard for now. But what will happen when the monsoon comes?"

Ruby's irritation vanished, seeing this unfortunate woman's attempt to find solace. She understood that *Mejo-Bou* wanted to forget her own grief by loving all the children. She happily said, "I will certainly tell Father. And if he doesn't do anything, I will build your schoolroom. Not just build the room, I might even come and help myself!"

Mejo-Bou didn't express much excitement. But her eyes filled with tears. She remained silent for a moment and then raised both hands to her forehead. It was unclear whether that gesture of respect was directed at Ruby or at someone else!

Latifa had been sitting there, bewildered by surprise, all this time. She seemed to understand none of this. Her mind was filled with concern for her grandfather who had left home—and with pain for him. Seeing the discussion with Ruby, which had been

going on since *Mejo-Bou* arrived, suddenly suppressed like this, she became a little restless—though silently. Moreover, she didn't know the grief of a son's death, but even without knowing, her timid mind seemed to faint at the thought of sorrow. Such sorrow seemed unimaginable. Unable to bear it any longer, as if to suppress this tragic topic, she blurted out, "Well, *Mejo-Bou*! Can you suggest something? Of course, this isn't the time to ask for your advice. Yet, I feel you might be able to resolve this?"

Mejo-Bou silently looked at Latifa with an inquiring gaze.

Latifa continued, "I received a letter from *Dada-Bhai* this morning from Rangoon Jail. Ruby and I were discussing that. Anyway, just read the letter yourself, then you'll understand everything."

Mejo-Bou took the letter and began to read.

Rangoon Central Jail

To the Ever-Living Su!

My dear *Bũnchi*. I am writing to you after five or six months. I cannot write everything – I have no right to write! Even if I did, the authorities would erase it so completely that Sir Jagadish Chandra Bose would not be able to retrieve it by any scientific means. Besides, you know my nature; I can speak fluently, but I have to write as if locked in a cage. That makes both my mind and hand tired. Of course, my asthma hasn't started yet—though the tuberculosis germ has been building its nest in my chest for some time. That news has probably already been publicized through newspapers and you must have heard it too.

You are not just my sister, you are my friend. So today I will tell you many things that I have never told anyone, not even you.

You know, there was no food in my heart for worms to eat. But I also knew that it was contagious. One day, I became acquainted with a worm-eaten heart. I heard that the worm had apparently left its American thorn fence and settled there.

I was greatly saddened. But I had no hand! Even if I did, that hand was bound by the police handcuffs. So I had to sit there like a crippled Jagannath.

But the loyal worm could not forget me. Evading so many CID and police guards – crossing the ocean, the worm from my fence returned to my chest. How much of others' chests it had eaten, I understood from its robust appearance and vigorous bite.

Of course, I fear no other worm. British worms, native worms, heart worms, sorrow worms—no matter what kind of worm, though I may not fear them, the authorities do. They are troubled by me. It's like a snake swallowing a shrew—they can neither let go nor swallow.

Today, upon waking, good news was heard. They say I will be released tomorrow. Of course, released means being allowed to breathe. If you must die, my child, die at home, don't make us responsible—that's the attitude, you see!

These are truly a race of lions. Even as animals, they belong to the species of king beasts. They do not eat half-dead, diseased prey. But as soon as they get plump, they'll seize you again!

… I have decided that as soon as I am released, I will go straight to Waltair. I desire boundless freedom after this captivity. The open sky above my head, the boundless, shoreless ocean before my eyes, and before my mind, uninterrupted eternity – just me, alone!

Sometimes I feel – no, not feel, I long – to see that second soul of my unique mind before I go – to know her. Not the white cloud shadow above my desert – but the dense, illusory shadow of a black cloud.

I learned from your letter that that cloud has gathered in your country. If you have some strong northern wind at hand, can you send it south? You might say, and perhaps the cloud will laugh like lightning and say, one who has the ocean at hand asks for two drops of cloud water! I was reminded of a traditional simile by Sanskrit poets, but I didn't write it! Knowing you will understand even if I don't.

When a person becomes verbose—that is, to put it simply, when they babble incoherently due to delirium—everyone

understands that their death is near, even if doctors don't say so. Why should my case be any different?

I spoke my last words now, at the time of my departure, because I may not have another opportunity in life to speak.

I have never been disheartened by anything in life. I would not have been disheartened even at the end of my life—if I had not understood how far the plight of one whom even a tiger catches and then regurgitates has gone! How much his blood and flesh have diminished!—But what is this hunger of mine? Is this the hunger of death?

If I don't return, don't grieve, sister. We didn't set out with the means to return. So we lived our lives as fugitives. You will see me among those who remained travelers on our path. In this prison, on this gallows, we did not arrive today; the bloodstains of a hundred generations of humiliation on our necks may not have faded even today. Otherwise, why would my mind not settle in such a happy nest? Why did this desire to break the cage door and fly freely above the open world to sing arise? We spent our lives like the living, we did not hoard like the dead to become food for crows and vultures! May my potential never bring dishonor upon you.

If, in another world, there is leisure to remember loved ones from this world, if I am not held captive by hunger there, then believe me – you will remain in my heart.

Kiss the boys! Give Nazir Saheb a final nudge! Accept my love and blessings. Yours,

— *Dada*

When *Mejo-Bou* lifted her face after reading the letter, it was not a human face. It was like a dew-kissed, blood-red lotus just about to wither! Latifa gazed in fascination. Ruby's eyes seemed to burn!

Before *Mejo-Bou* could say anything, Ruby exclaimed, "I've decided, Bũchi, I'm going to Waltair. Mother calls me a meteor. If I am a meteor, then I can't keep orbiting in the void! The earth that constantly pulls me, I will fall face down into its land. Perhaps I

will never rise again, all my fire will be extinguished. Yet, that is my noble death!—What do you say, *Mejo-Bou*? Will you come with me? But we'll have to hide and flee. Dressed like a trysting lover, understand?"

Ruby's eyes gleamed like a ruby set in a gold ring.

Mejo-Bou, not at all embarrassed, said, "If I had wanted to go, I would have gone there long before you, sister Ruby Bibi! I don't know what I would have done if I had received this news two months ago! But today, I have no fear for myself. If I hadn't lost *Khoka*, if I hadn't found these children, then I would have been blessed to serve him before anyone else."

Ruby snatched the words from *Mejo-Bou's* mouth and said, "Meaning, if you were Ruby, you would have left by now."

Mejo-Bou smiled and said, "Yes, that's right."

Ruby stood up in an instant and said, "Sister *Mejo-Bou*, I think you bowed to me just now. Please accept my reciprocal bow. You have shown me the way." Then, looking at Latifa, she said, "Sister Bũnchi, the time is near, now the ties must be broken. I have found my path. So *Mejo-Bou*, I will send the expenses for your children's school to Bũchi, please accept them."

Before *Mejo-Bou* or Latifa could say anything, Ruby's urgent voice was heard, "Chauffeur! Bring the car!"

Twenty-Eight

Waltair

Dear *Bunchi*,

If I reveal my identity today – that I am your Ruby – would you believe it? My parents know, and perhaps you too know, that I am dead! Or if I am not dead, then my death is a blessing or the only way forward!

You – at least you – will be happy or saddened, I don't know, if I write that I am still not dead! I have survived, Bunchi, I have survived – I have survived greater than you all.

Today I will tell you everything openly, and then before me lies the shoreless ocean! No one else can take a life that has lost its shore; it remains!

When I learned from you that your Anu Bhai was going to Waltair from Rangoon jail with a death notice in his hand, I immediately decided my duty. Every letter of his letter to you seemed to look at me and say, "He wants you, he wants you!" The royal mark of humiliation on his forehead, the flute of death in his hand, there he is, my prince! I set out on my tryst.

I knew that I could never obtain his presence by overcoming the immense obstacles of my parents' commands, requests, and affection. But when he looked at me with his death-dulled eyes, such a great obstacle seemed no obstacle at all before him.

It felt like that immense barrier, that vast impediment—he was greater than it, vaster than it! The sky called me, my wings became restless, and I forgot the allure of the nest.

The mountain where I, the river, was born, with all its stones, forests, and jungles blocking the path, could not hold me back; I rushed towards the ocean. I have reached the ocean, and today I feel that this is my end, this is my culmination, and this is my fulfillment. By losing my shore, I found my boundless friend.

I know how much pain I have given my parents—and you. You stand tall like mountains, piled with one tradition after another; perhaps you call that glory. But I never had the illusion of surviving by suffocating within that immutable monument of glory. That life is not mine. To lose myself, to scatter myself, that is the course of my life. My liberation comes from walking the path, making mistakes, and getting lost. I know that just as that life is true for me, it is false for you.

I sought my truth, and I found it—this is my solace!

… One dark night—when you, all my relatives, were sleeping, I went out holding the hand of darkness. My companion has gone into the darkness after delivering me to the land of light! I have found light, I have found my friend—I have found myself.

There is no greater relative of Ansar than you, yet you could not come like this! Who am I to him? A two-day acquaintance—a teenage dream! But the intoxication of that dream never left me. Fate did not give me the opportunity to acknowledge that dream-acquaintance before everyone. Our auspicious gaze met away from all eyes—with death and the ocean as witnesses. Death is decorating our bridal chamber in its dark blue palace! Outside there is only commotion, only shame, no time to look properly at my friend with wide eyes. Now I will see him in that bridal chamber, with my eyes full, with my soul full. The sun, moon, planets, and stars will eavesdrop on our bridal chamber from today…

One day, after arriving here, I saw in the newspaper that my father had retired from his job. Do I not understand why he retired—not just from his job, but perhaps from life too. I understand everything, yet there was no other recourse! I thought, this is good. The forgiveness I cannot receive from Father in this life, I will ask for in the next life. There are no bonds of tradition there, no heights of glory, no pride of prestige. Emerging from the bridal chamber of death, I will take the dust from his feet; I know—that day he will bless me with all his heart!

And Mother? If I return to her lap today, she will still wipe the dust and embrace me as before. But Mother is not separate from Father. The forgiveness that Father cannot give in this life, not even if his heart breaks, Mother cannot utter those words of forgiveness! They have spread the rumor that their daughter is dead—let that be true!

The empty grave dug for me will not remain empty. I will fulfill their wish—I will end all their shame by dying as quickly as possible.

Not by suicide, of course! Such cowardice has never been in my heart. If it had, I could have died much earlier—at least on that day when I had to put my throat to the knife of marriage against my will.

So much for my story of sorrow. Now will you hear about my happiness?

When I arrived in Waltair, I saw that Ansar's royal friends, the police spies, had surrounded me. It was a blessing in disguise! Otherwise, I might have had to search endlessly to find him. I got the information from them, of course, in exchange for allowing them to search my belongings.

Dusk had not yet deepened. I stood by his head. He was lying listlessly in a small room, his arms outstretched, gazing at the evening star.

I had entered the room silently, having removed my shoes. Should one enter a god's house with shoes on?

I saw that his eyes and face bore the tears and exhaustion of a Purabi ragini at dusk. He was gazing fixedly at the evening star through the window. He silently bowed to the evening star. I then quietly entered the room and said, "I have come."

What joy in his eyes and face! He cried "Ruby!" and then fainted!...

Say, Bũchi, have you ever seen a sleeping, hungry python awaken? Don't shiver. Listen carefully.

Within two days, I understood that the hungry python had awakened. How could a forest deer escape its immense attraction?

It began to devour me bit by bit. I cried, not for myself—but for him. This all-consuming hunger was not just my death—it was his death too! He was already overwhelmed by death; did he still have the strength to survive by devouring me?

I knew that this instinct was the greatest enemy of this disease! Otherwise, why did this hunger of death possess Ansar, whose self-control was stricter than an ascetic's?

When he said, "Ruby, I have grown up eating poison all my life, today, at the moment of death, serve me nectar! Let me conquer death." I could not turn away my starved, beggar friend.

Still, I asked the doctor, "Do you think you can save him?"

The doctor said, "One of his lungs has been devoured. The other side has also been attacked. His disease has now surpassed our power to treat; now, if God saves him!"

I bowed to the doctor and said, "Then you need not trouble yourself to come anymore, Doctor Saheb. Let him die in peace!"

The doctor left. I too chose my duty.

I fully surrendered myself to his hungry mouth. If he doesn't survive, I won't let him die hungry, he will just die two days earlier, that's all! Besides, this death is not his alone; the death-germs in his chest will attack me too!

What contentment, what joy he felt! It was as if a traveler in the desert found shade in an oasis just before dying!

His joy, his laughter, his happiness made me think he had survived! Perhaps the poison was the cure for his poison!

But—but—Bũchi! Lati! My friend! Today the lamp in my house is flickering! Its flame is trembling! The storm of death is raging in my house. How can I save him, brother, even with this small corner of my sari as a shield?

Who knew that his laughter, his joy—was the final blaze before extinguishing!

It grew dawn as I wrote the letter! I am writing this letter sitting by his head. The lamp by our heads is flickering out. He is gazing fixedly at the morning star. His speech stopped yesterday. I haven't called anyone. Nor has he.

We both watched the ocean and the stars in the sky all night.

Only once, with great difficulty, he said, "Will you go to that land of stars?"

I once said, "Yes." He sighed with deep contentment and said, "Then come, I will wait for you in hope!"

Then he kissed me. A gush of blood came up! My face and lips were stained red with his chest's blood.

Bless me, may this blood-line never fade!

… By the time this letter reaches you—my lamp will have gone out! My beautiful world—has grown dim in my eyes! The river of my eyes is flowing into the ocean!

I know my days are over too! I too have heard the weeping of Purabi at dusk. The death-germs from his chest have built their nest in my heart! It won't take them long to consume what little life I have left. Then, forever stained—a new life—in a new star—in a new land—a new love!

He wept for all of you. How grand, how vast a life he was born with—and what sorrow he carried with him as he left! He came with a king's wealth—he left like a beggar—famished, helpless, friendless—alone!

He said that after his death, his body should be cast into the great ocean. He loved the ocean—perhaps even more than me. A soul as vast as the sea—I will cast him into the waters of the sea.

I have no more time! My lamp too is about to go out.

— Ruby

Translated by Alamgir Mohammad

Notes on translation :

1. ***Pooja-khelar Krishnanagar*:** Directly "Krishnanagar of doll-play." I opted for "the playground of dolls" to maintain a sense of place and activity rather than just possession.
2. ***Oman Katli:*** Kept the original term in transliteration and clarified with "Roman Catholic" in parentheses, as it's a specific local pronunciation.
3. ***Haram-khor***: This is a very strong and offensive Bengali insult. I translated it as "eater of forbidden things" or "wretch" depending on context, to convey the meaning without directly using English profanity that might not carry the same cultural weight. The literal meaning is provided implicitly.
4. ***Elokeshi Bama***: This refers to a specific, fierce, disheveled goddess-like form, often associated with Kali. I've given a descriptive translation to convey the imagery.
5. ***Ma-Kali***: Kept as is, as it's a known Hindu goddess figure.
6. ***Kurukshetra***: Kept as is, referring to the epic battlefield, again relying on potential general knowledge or the context to convey its meaning of a chaotic battle.
7. ***Mach-bhaat:*** Literal translation is "fish and rice." I added "(meaning everyday, common)" to explain the idiomatic usage.
8. ***"Daily wage labourers" / "gentlefolk"*:** Used these phrases to clarify the meaning of "জনমজুর" and "ভদ্দর-নুক" respectively, providing a more accessible understanding.

9. ***Pacaale's Jargon***: I've kept terms like 'foot-gaj', 'konnik', 'sut' (mason's tools) as transliterations as they are specific to the trade and contextually understandable. 'Chikret' (cigarette), 'jiyashalai' (matches), 'nima' (inner garment) are also kept for flavor.
10. ***Sakhi:*** Kept as transliteration with explanation for the specific role.
11. ***Babu:*** Explained its meaning in this context.
12. ***Saadh:*** Explained as a special meal for expectant mothers.
13. ***Dhenkisha***l: Explained as a husking shed.
14. ***Dak-banglo***: Explained as a makeshift shelter.
15. ***Kacha***: Left as transliteration for the bamboo plant/mat.
16. *Hændol*: Explained as a large, harsh bell.
17. ***Khadag Pache & Neel Choãy***: Explained as code words, which is crucial for understanding the scene.
18. ***Fariyad***: Explained as a plea or complaint.
19. ***Katbe***l: Kept as transliteration with explanation (wood apple).
20. ***Kheer-Porob'*** Explained as a 'kheer festival/feast'.
21. ***Parmanna***: Explained as sweet rice pudding.
22. ***Daroga Sahib / Daroga-Ginni*:** Kept as titles for the police inspector and his wife, commonly understood in the subcontinent.
23. ***Poa / 'Ser*:** Kept as units of measurement (approximate conversions given).
24. ***Boal fish:*** Kept as transliteration of the specific fish.
25. ***Allopathic/ 'Homeopathic***: Kept as transliterations of familiar medical terms.
26. *Repu*: Explained as altering.
27. ***Choto-Mia/ Choto-Cha / Mejo-Bubu/ Boro-bou/ Sejo-bou:*** Kept these family terms (youngest brother-in-law, youngest uncle, middle sister-in-law, eldest wife, third wife) as they are central to the character relationships, with context.
28. ***Kaora:*** Left as transliteration, referring to a specific community, implies a lower social standing in the context.
29. ***Rahu*:** Explained as the mythological entity that eclipses the moon.
30. ***Bou Palaalo:*** Translated the meaning and the song lyrics to convey the children's game.
31. ***Dheki***: The traditional rice husker, symbolizing the harsh realities of their lives and the daily grind.
32. ***Namaaj-e-janaza***: The Islamic funeral prayer, emphasizing religious customs and community involvement in death rituals.
33. ***Mullah:*** An Islamic religious leader.
34. ***Allahu Akbar:*** "Allah is the greatest" in Arabic, a phrase used in Islamic prayer.

35. ***As-salatu khayrum minan-naum***: "Prayer is better than sleep" in Arabic, part of the call to Morning Prayer (Fajr).
36. ***Shab-e-Barat:*** An Islamic holy night, often associated with visiting graves and lighting lamps.
37. **Khilafat volunteer**: Refers to a member of the Khilafat Movement, a pan-Islamist political protest campaign launched in British India by Indian Muslims during the early 20th century.
38. ***Kabuliwala***: A term for a Pashtun (Afghan) merchant, often depicted as large and intimidating figures.
39. ***Khaddar***: Hand-spun and hand-woven cloth, associated with the Indian independence movement and Gandhi's promotion of self-reliance. Ansar's playful correction of Latifa's mispronunciation highlights the material's significance.
40. ***Mar mar na pagar par***: A Bengali idiom, roughly meaning "kill or flee" or "fight or escape," expressing extreme panic and urgency.
41. ***Dhak Dhak kare khaoa***: Literally "gulping down" or "eating quickly with a gulping sound."
42. ***Sheora tree***: A common tree in Bengal, often associated with ghosts or spirits. Latifa's playful threat implies she'd become a ghost if Nazir Saheb "breaks" her "throne" (his neck).
43. ***Saper nejey pa deoa***: Literally "to step on a snake's tail," an idiom meaning to provoke danger or get into trouble.
44. ***Saper mathar moni shat rajar dhon***: "The jewel on a snake's head is the wealth of seven kings," a Bengali proverb implying something incredibly rare, precious, and difficult to obtain, often guarded by something dangerous.

Short stories
ছোটগল্প

পদ্মা গোখ্‌রো

রসুলপুরের মীর সাহেবদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপাইয়া উঠিল। লোকে কানা-ঘুষা করিতে লাগিল, তাহারা জীনের বা যক্ষের ধন পাইয়াছে। নতুবা এই বৎসরের মধ্যে আলাদীনের প্রদীপ ব্যতীত কেহ এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না।

দশ বছর পূর্বেও মীর সাহেবদের অবস্থা দেশের জমিদারের অপেক্ষা হীন ছিল না সত্য। কিন্তু সে জমিদারি কয়েক বৎসরের মধ্যেই ছিল 'ঢেঁকি হল তুল, কাটতে কাটতে নির্মূল' সে অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের নওয়াবের সহিত টেক্কা দিয়া বিলাসিতা করিতে গিয়াই নাকি তাদের এই দুরবস্থার সূত্রপাত।

লোকে বলে, তাঁহারা খড়মে পর্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। বর্তমান মীর সাহবদের পিতামহ নাকি স্নানের পূর্বে তেল মাখাইয়া দিবার জন্য এক গ্রোস যুবতী সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্ণ-লঙ্কা-দগ্ধ-লঙ্কায় পরিণত হইল। এমন কি তাঁহার পুত্রকে গ্রামেই একটি ক্ষুদ্র মক্তব চালাইয়া অর্ধ-অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে।

এমন পিতামহের পৌত্রের নিশ্চয়ই কোনো খান্দানি জমিদার বংশে বিবাহ হইল না। কিন্তু যে বাড়ির মেয়ের সহিত বিবাহ হইল, সে বাড়ির বংশ-মর্যাদা মীর সাহেবদের অপেক্ষা কম তো নয়, বরং অনেক বেশি।

বিলাসী মীর সাহেবের পৌত্রের নাম আরিফ। বধূর নাম জোহরা। জোহরার রূপের খ্যাতি চারিপাশের গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু অত রূপ, অমন বংশ-মর্যাদা সত্ত্বেও দরিদ্র সৈয়দ সাহেবদের কন্যাকে গ্রহণ করিতে কোনো নওয়ার-পুত্রের কোনো উৎসাহই দেখা গেল না!

মেয়ে গোঁজে বাঁধা থাকিয়া বুড়ি হইবে-ইহাও পিতামাতা সহ্য করিতে পারিলেন না। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমানে দরিদ্র মক্তব-শিক্ষক মীর সাহেব পুত্র আরিফের হাতেই তাহাকে সমর্পণ করিয়া বাঁচিলেন।

মীর সাহেবদের আর সমস্ত ঐশ্বর্য উঠিয়া গেলেও রূপের ঐশ্বর্য আজও এতটুকু ম্লান হয় নাই। এবং এ রূপের জ্যোতি কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবদের রূপখ্যাতিকেও লজ্জা দিয়া আসিয়াছে।

কাজেই আরিফ ও জোহরা যখন বর বধূ বেশে পাশাপাশি দাঁড়াইল, তখন সকলেরই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। যেন চাঁদে চাঁদে প্রতিযোগিতা মন।

পিতার মন খুঁত খুঁত করিলেও জোহরার মাতার জামাতা ও কন্যার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া গভীর প্রশান্তিতে পুরিয়া উঠিল।

আনন্দে প্রেমে আবেশে শুভ-দৃষ্টির সময় উভয়ের ডাগর চক্ষু ডাগরতর হইল।

আরিফের মাতা কিছুদিন হইতে চির-রুগ্না হইয়া শয্যাশায়িনী ছিলেন। বধূমাতা আসিবার পর হইতেই তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। আনন্দে গদগদ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন 'বৌমার পয়েই আমি সেরে উঠলাম, আমার ঘর আবার সোনা-দানায় ভরে উঠবে।'

গ্রামময় এই কথা পল্লবিত হইয়া প্রচার হইয়া পড়িল যে, মীর সাহেবদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মানুষের 'পয়' বলিয়া কোনো জিনিস আছে কিনা জানি না, কিন্তু জোহরার মীর-বাড়িতে পদার্পণের পর হইতেই মীর সাহেবদের অবস্থা অভাবনীয় রূপে ভালো হইতে অধিকতর ভালোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গ্রামে প্রথমে রাষ্ট্র হইল, মীর সাহেবদের নববধূ আসিয়াই তাহাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতেই মীর বাড়ির এই অপূর্ব পরিবর্তন।

গুজবটা একেবারে মিথ্যা নয়। জোহরা একদিন তাহার শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের একটা দেয়ালে একটা অস্বাভাবিক ফাটল দেখিয়া কৌতূহলবশেই সেটা পরীক্ষা করিতেছিল। হয়ত বা তাহার মন গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানী হইয়াই এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। তাহার কী মনে হইল, সে একটা লাঠি দিয়া সেই ফাটলে খোঁচা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জনের মত একটা শব্দ আসিতে সে ভয়ে পলাইয়া আসিয়া স্বামীকে খবর দিল।

বলাবাহুল্য, আরিফ নববধূকে অতিরিক্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু আরিফ নয়, শ্বশুর-শাশুড়ি পর্যন্ত জোহরাকে অত্যন্ত সু-নজরে দেখিয়াছিলেন।

জোহরার এই হঠকারিতায় আরিফ তাহাকে প্রথমে বকিল, তাহার পর সেইখানে গিয়া দেখিল সত্য সত্যই ফাটলের ভিতর হইতে সর্প-গর্জন শ্রুত হইতেছে। সে তাহার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল।

পুত্র অপেক্ষা পিতা একটু বেশি দুঃসাহসী ছিলেন তিনি বলিলেন, 'ও সাপটাকে মারিতেই হইবে, নৈলে কখন বেরিয়ে কাউকে কামড়িয়ে বসবে। ওর গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, ও নিশ্চয়ই জাত সাপ!' বলিয়াই বধূমাতাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন।

স্থানটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি সন্তর্পণে তাহার খানিকটা পরিষ্কার করিয়া বার কতক খোঁচা দিতেই একটা বৃহৎ দুগ্ধধবল গোখরো সাপ বাহির হইয়া

আসিল, মস্তকে তাহার সিন্দুর বর্ণচক্র বা খড়মের চিহ্ন। আরিফ সাপটাকে মারিতে উদ্যত হইতেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, 'মারিস নে, ও বাস্তু সাপ। দেখছিস নে, ও যে পদ্মা-গোখ্‌রো।'

আরিফের উদ্যত যষ্টি হাতেই রহিয়া গেল। জঙ্গলের মধ্যে পদ্মা- গোখরোরূপী বাস্তু সাপ অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া আসিতেছিল। জোহরা আরিফকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, 'তোমরা যখন সাপটাকে খোঁচাচ্ছিলে, তখন কেমন এক রকম শব্দ হচ্ছিল ওখানে নিশ্চয়ই কাসা বা পিতলের কোন কিছু আছে।' আরিফের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আসিয়া তাহার পিতাকে বলিতে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, 'কই রে, সে রকম কোন শব্দ ত শুনি নি।'

আরিফ বলিল, 'আমরা তো সাপের ভয়েই অস্থির, কাজেই শব্দটা হয়ত শুনতে পাইনি।'

পিতা-পুত্রে সন্তর্পণে দেয়ালের দুই চারটি ইট সরাইতে দেখিতে পাইলেন, সত্যই ভিতরে কি চকচক করিতেছে।

পিতা-পুত্রে তখন পরম উৎসাহে ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের পর যাহা উদ্ধার করিলেন তাহাকে যক্ষের ধন বলা চলে না, কিন্তু তাহা সামান্যও নয়। বিশেষ করিয়া তাহাদের বর্তমান অবস্থায়।

একটি নাতিবৃহৎ পিতলের কলসি বাদশাহী আশরফীতে পূর্ণ। কিন্তু এই কলসি উদ্ধার করিতে তাহাদের জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

কলসি উদ্ধার করিতে গিয়া আরিফ দেখিল, সেই কলসির কণ্ঠ জড়াইয়া আর একটা পদ্ম গোখ্‌রো। আরিফ ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওরে বাপরে! সাপটা আবার এসেছে ঔখানে।'

জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, 'না, ওটা আর একটা। ওটারই জোড়া হবে বোধ হয়। প্রথমটা ওই দিকে চলে গেছে, আমি দেখেছি।'

কিন্তু এ সাপটা প্রথমটা হোক বা অন্য একটা হোক, কিছুতেই কলসি ছাড়িয়া যাইতে চায় না। অথচ পদ্ম গোখরো মারিতেও নাই।

কলসির কণ্ঠ জড়াইয়া থাকিয়াই পদ্ম-গোখরো তখন মাঝে মাঝে ফণা বিস্তার করিয়া ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছে!

জোহরার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ আনিয়া নির্ভয়ে কলসির একটু দূরে রাখিতেই সাপটা কলসি ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। জোহরা সেই অবসরে পিতলের কলসি তুলিয়া লইল। সাপটা অনায়াসে তাহার হাতে ছোবল মারিতে পারিত, কিন্তু সে কিছু করিল না। এক মনে দুগ্ধ পান

করিতে করিতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। একটু পরেই আর একটা পদ্মা-গোখরো আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

জোহরা বলিয়া উঠিল, 'ওই আগের সাপটা! এখনো গায়ে খোঁচার দাগ রয়েছে! আহ, দেখেছ কী রকম নীল হয়ে গেছে!'

আরিফ ও তাহার পিতামাতা অবাক বিস্ময়ে জোহরার কীর্তি দেখিতেছিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে তাহাদেরও মনে ছিল না যে, তাহাকে এখনি সাপে কামড়াইতে পারে! এইবার তাহারা জোর করিয়া জোহরাকে টানিয়া সরাইয়া আনিলেন।

কলসিতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা জোহরাকে লইয়া যে কী করিবে, কোথায় রাখিবেন — ভাবিয়া পাইলেন না।

শ্বশুর-শাশুড়ি অশ্রুসিক্ত চোখে বারে বারে বলিতে লাগিলেন, 'সত্যিই মা, তোর সাথে মীর-বাড়ির লক্ষ্মী আবার ফিরে এলো!'

কিন্তু এই সংবাদ এই চারিটি প্রাণী ছাড়া গ্রামের আর কেহ জানিতে পারিল না। সেই মোহর গোপনে কলিকাতায় গলাইয়া বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে বর্তমান ক্ষুদ্র মীর-পরিবারের সহজ জীবনযাপন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত। কিন্তু বধূর 'পয়' দেখিয়াই বোধ হয় — আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবসায় আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিল।

বৎসর দুয়েকের মধ্যে মীর-বাড়ির পুরাতন প্রাসাদের পরিপূর্ণ রূপে সংস্কার হইল। বাড়ি-ঘর আবার চাকর-দাসীতে ভরিয়া উঠিল।

পরে কর্পোরেশনের কনট্রাক্টরী হস্তগত করিয়া আরিফ বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল।

কোন কিছুরই অভাব থাকিল না। কিন্তু জোহরাকে লইয়া তাহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িল।

২

এই অর্থ-প্রাপ্তির পর হইতেই জোহরা যেমন পদ্মা-গোখরো-যুগলের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ প্রবণ হইয়া উঠিল, সাপ দুইটিও জোহরার তেমনি অনুরাগী হইয়া পড়িল। অথবা হয়তো দুধ-কলার লোভেই তাহারা জোহরার পিছু পিছু ফিরিতে লাগিল।

জোহরার শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী সাপের ভয়ে যেন প্রাণ হাতে করিয়া সর্বদা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। বাস্তু সর্প — মারিতেও পারেন না, পাছে আবার এই দৈব অর্জিত অর্থ সহসা উবিয়া যায়।

অবশ্যই সর্প-যুগল যেরূপ শান্ত ধীরভাবে বাড়ির সর্বত্র চলা-ফেরা করিতে লাগিল, তাহাত ভয়ের কিছু ছিল না! তবু জাত সাপ তো! একবার ক্রুদ্ধ হইয়া ছোবল মারিলেই মৃত্যু যে অবধারিত।

পিতৃ-পিতামহের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাওয়া ও এক প্রকার অসম্ভব। তাহারা কি যে করবে ভাবিয়া পাইলেন না।

জোহরা হয়তো রান্না করিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল সর্প-যুগল তাহার পায়ের কাছে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শাশুড়ি দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। বধূ তাহাদের তিরস্কার করিতেই তাহারা আবার নিঃশব্দে সরিয়া যায়।

বধূ শাশুড়ি খাইতে বসিয়াছে, হঠাৎ বাস্তু সর্পদ্বয় আসিয়া বধূর ডালেরবাটিতে চুমুক দিল! দুগ্ধ নয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিতেই বধূ আসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিতেই তাহার ফণা নামাইয়া শুইয়া পড়ে, বধূ দুগ্ধ আনিয়া দেয়, খাইয়া তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

ভয়ে শাশুড়ির পেটের ভাত চাল হইয়া যায়।

ইহাও সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু সাপ দুইটি এইবার যে উৎপাত আরম্ভ করিল তাহাতে জোহরার স্বামী বাড়ি ছাড়িয়া কলিকাতা পলাইয়া বাঁচিল।

গভীর রাত্রে কাহার হিম-স্পর্শে আরিফের ঘুম ভাঙিয়া যায়। উঠিয়া দেখে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে পদ্মা-গোখরোদ্বয় তাহার বধূর বক্ষে আশ্রয় খুঁজিতেছে। সে চিৎকার করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাহির বাটিতে শয়ন করে!

জোহরা তিরস্কার করিলে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে ভীত সন্তানের মত তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া যেন কি মিনতি জানায়।

জোহরার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। আর তিরস্কার করিতে পারে না। বেদেনির মতো নির্বিকার নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের আদর করে, পার্শ্বে ঘুমাইতে দেয়।

জোহরার বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে তাহার দুটি যমজ সন্তান হইয়াই আঁতুড়ে মারাযায়। জোহরার স্মৃতি-পটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া উঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃ-চিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশু-যুগলেই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিয়া আসিয়াছে! তাহাদের মৃত্যুতে যে দংশন-জ্বালা সহ্য করিয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে, ইহারা যদি দংশনই করে তবুও তাহার অপেক্ষা ইহাদের দংশন-জ্বালা বুঝি তীব্র নয়। স্নেহ-বুভুক্ষু তরুণী মাতার সমস্ত হৃদয় মন করুণায় স্নেহ আপ্লুত হইয়া উঠে, ভয় ডর কোথায় চলিয়া যায়, আবিষ্টের মত সে ঐ সর্প-শিশুদের লইয়া আদর করে, ঘুম পাড়ায়, সস্নেহ তিরস্কার করে।

স্বামী অসহায় ক্রোধে ফুলিতে থাকে,কিন্তু কোন উপায়ও নাই! তাহার ও তাহারা প্রাণের অধিক প্রিয় বধূর মধ্যে এই উদ্যত ফণা ব্যবধান সে লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিষ্ফল আক্রোশে অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরে।

পয়মন্ত বধূ — তাহার উপরে রাগও করিতে পারে না। রাগ করিয়াই বা করিবে কি, তাহার তো কোন অপরাধ নাই।

একদিন সে ক্রোধবশে বলিয়াছিল, 'জোহরা তোমাকে ছেড়ে চাই না এই ঐশ্বর্য! মেরে ফেলি ও দুটোকে! এরচেয়ে আমার দারিদ্র্য ঢের বেশি শান্তিময় ছিল।'

জোহরা দুই চক্ষুতে অশ্রু-ভরা আবেদন লইয়া নিষেধ করে! বলে, 'ওরা আমার ছেলে! ওরা তো কোনো ক্ষতি করে না। কাউকে কামড়াতে জানে না তো ওরা!'

আরিফ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, 'তোমায় দংশন করে না ওরা, কিন্তু ওদের বিষের জ্বালায় আমি পুড়ে মরলুম! আমার কি ক্ষতি যে ওরা করেছে, তা তুমি বুঝবে না! এর চেয়ে যদি ওরা সত্যি দংশন করত, তাও আমার পক্ষে এ ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের বেশি সুখের হত!'

জোহরা উত্তর দেয় না, নীরবে অশ্রু মোচন করে! ইহারা যে তাহারই মৃত খোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব বলিয়া সে মনে করে, তাহাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, সংস্কারে বাধে।

পিতা, পুত্র ও মাতা শেষে স্থির করিলেন, জোহরাকে কিছুদিনের জন্য তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। হয়তো সেখানে গিয়া সে ইহাদের ভুলিয়া যাইবে। এবং সর্প-যুগলও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে।

একদিন প্রত্যুষে সহসা আরিফের পিতা জোহরাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা বহুদিন বাপের বাড়ি যাওনি, তোমার বাবাকে দুতিনবার ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি, আজ আরিফ নিয়ে যাবে, তুমি কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে এস।'

জোহরা সব বুঝিল, বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিল না। নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু সাপ দুইটিকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

আরিফ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া ব্যবসা দেখিতে আসিয়াছেন, আজ সে যখন সালঙ্কারা বেশে স্বর্ণ-ভূষণে ঢাকিয়া গৃহে পদার্পণ করিল দরিদ্র পিতা-মাতা তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কন্যা-জামাতাকে সে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দু-একদিন যাইতে না যাইতে পিতা-মাতা দেখিলেন, কন্যার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। সে সর্বদা যেন কাহার চিন্তা করে। সকল কথায় কাজে অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে।

মাতা একদিন কন্যাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, 'হারে আরিফকে চিঠি লিখব আসতে?'

কন্যা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল, 'না মা, উনি তো শনিবারেই আসবেন!'

জামাই আসিল, তবু কন্যায় চোখে মুখে পূর্বের মত সে দীপ্তি দেখা গেল না।

মাতা কন্যাকে বলিলেন, 'সত্যি বলতো জোহরা, তোর কি জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

জোহরা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'না মা! উনি তো আগের মতই আমায় ভালবাসেন! বাড়িতে আমার দুটি খোকাকে ফেলে এসেছি, তাই মন কেমন করে।'

জোহরার মাতা আরিফের এই হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তির রহস্য কিছু জানিতেন না। কন্যার যমজ সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে এবং ঐ বাড়ির প্রথা সেই সন্তান দুটিকে বাড়িরই সম্মুখের মাঠে গোর দেওয়া হইয়াছে জানিতেন। মনে করিলেন, কন্যা তাহাদেরই স্মরণ করিয়া একথা বলিল। গোপন অশ্রু মুছিয়া তিনি কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস চলিয়া গেল। জোহরাকে লইয়া যাইবার কেহ কোন কথা বলেনা। জোহরার পিতা-মাতা অপেক্ষাও জোহরা বেশি ক্রুদ্ধ হইল। কি তাহার অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। স্বামী প্রতি শনিবার আসে, কিন্তু অভিমান করিয়াই সে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মাতা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না। একদিন জামাতাকে বলিলেন, 'বাবা! জোহরা তো একরকম খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে! ওর কি কোনো রোগ বেরামই হল তাও তো বুঝতে পারছি নে — দিন দিন শুকিয়ে মেয়ে যে কাঠ হয়ে যাচ্ছে!'

আরিফের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। বিষাক্ত সাপকে যে মানুষ এমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল জোহরা কি উন্মাদিনী? হঠাৎ তাহার মনে হইল, জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্প-তত্ত্ববিদ ছিলেন। ইহার মাঝে হয়ত সেই সাধানাই পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে!

ইহার মধ্যে সে বহুবার রসুলপুর গিয়াছে, কিন্তু সাপ দুটিকে জোহরা চলিয়া যাইবার পর দুই একদিন ছাড়া আর দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সেই দুই এক দিনই তাহারা কি উৎপাতই না করিয়াছে! তাহা দেখিয়া বাড়ি কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, উহারা জোহরাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে!

উদ্যত-ফণা আশী-বিষ! তবু সে কি তাহাদের কাতরতা মিনতি। একবার তাহার পিতা — একবার তাহার মাতার পায়ে লুটাইয়া পড়তে চায়, আর তাহারা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালায়!

আরিফ একথা বধূর কাছে প্রকাশ করে নাই, জোহরাও অভিমানভরে তাহাদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে নাই।

জামাতা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনরূপ ঔৎসুক্য-প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া জোহরার পিতা একদিন আরিফকে বলিলেন, 'বাবা, জানত আমরা কতো গরিব! মেয়ে তো শয্যা নিয়েছে! দেশে যা দুর্দিন পড়েছে, তাতে আমরা খেতেই পাচ্ছিনে, মেয়ের চিকিৎসা তো দূরের কথা মেয়েটা এখানে থেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তার চেয়ে তুমি কিছু দিনের জন্য ওকে কলকাতায় বা বাড়িতে নিয়ে যাও। তারপর ভাল হলে ওকে আবার রেখে যেয়ো!' বলিতে বলিতে চক্ষু সজল হইল উঠিল।

স্থির হইল, আগামীকল্য সে প্রথমে জোহরাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে, সেখানে ডাক্তার দেখাইয়া একটু সুস্থ হইলে তাহাকে রসুলপুরে লইয়া যাইবে।

৩

রাত্রে আরিফের কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিতেই দেখিল তাহার শিয়রে একজন কে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া এবং পার্শ্বের কামরায় একজন লোক বোধ হয় স্ত্রীলোক জোহরার বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহার অলঙ্কার অপহরণ করিতেছে। ভয়ে সে মৃতবৎ পড়িয়া রইল তাহার চিৎকার করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কে যে অপহরণ করেয়া লইয়াছে!

কিন্তু ভয় পাইলেও তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। স্ত্রীলোক ডাকাত! সে ঈষৎ চক্ষু খুলিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে এমন ভান করিয়া পড়িয়া থাকিল, যেন সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

যে ঘরে সে ও জোহরা শয়ন করিয়াছিল তাহার পার্শ্বে আর একটি কামরা — স্বল্পায়তন। সেই কামরায় একটা স্টীলের ট্রাঙ্কে গহনাপত্র থাকিত। প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা!

জোহরা বহু অনুনয় করিয়া আরিফকে ঐ গহনাপত্র রসুলপুরে রাখিয়া আসিবার জন্য বহুবার বলিয়াছে, আরিফ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। সে বলিত, 'তোমার কপালেই আজ আমাদের ঐ অর্থ অলঙ্কার, ও কয়টা টাকার অলঙ্কার যদি চুরি যায় যাক, তোমাকে তো চুরি করতে পারবে না। ও তোমার জিনিস তোমার কাছে থাক! আর তাছাড়া তোমার বাবা এ অঞ্চলের পীর, ওর ঘরে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না।'

আরিফ নিজের চক্ষুকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যখন দেখিল ঐ মেয়ে ডাকাত আর কেহ নয় সে তাহার শাশুড়ি — জোহরার মাতা।

দুদিন আগের ঝড়ে ঘরের কতগুলো খড় উড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই অবকাশ পথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্রও-কিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ি সমস্ত অলঙ্কারগুলি পোটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িল এবং সেই আলোতে আরিফ যাহার মুখ দেখিল, তাহাকে সে মাতার অপেক্ষাও ভক্তি করে। তাহার মুখে চোখে মনে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

এত কুৎসিত এ পৃথিবী।

সে আর উচ্চবাক্য করিল না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। সে দেখিল, তাহার শাশুড়ির পিছু পিছু তরবারিধারী ডাকাতও বাহির হইয়া গেল। তাহারা উঠানে আসিয়া নামিতেই সে উঠিয়া বাতায়ন-পথে দেখিতে পাইল ঐ ডাকাতও আর কেউ নয় — তাহারই শ্বশুর।

আরিফ জানিত, কিছুদিন ধরিয়া তাহার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশেও প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। মাঝে মাঝে তাহার শ্বশুর ঘটি বাটি বাঁধা দিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছিলেন, ইহারও সে আভাস পাইয়াছিল। ইহা বুঝিয়াই সে স্বতঃপ্রবত্ত হইয়া অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নি। জোহরার হাতে দিয়াও সে দেখিয়াছে, তাহারা জামাতার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে নারাজ।

হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, আরিফ তাহাকে জাগাইল না। ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার আর ঘুম হইল না।

সকালের দিকে একটু ঘুমাইতে কাহার ক্রন্দনে সে জাগিয়া উঠিল। তাহার শাশুড়ি তখন চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, চোরে তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছে।

জোহরাও তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময়বিমূঢ়তার মত চাহিয়া রহিল। আরিফের আর সহ্য হইল না। দিনের আলোকের সাথে সাথে তাহার ভয়ও কাটিয়া গিয়াছিল।

সে বাহিরে আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, 'আর কাঁদবেন না মা, ও অলঙ্কার যে চুরি করেছে তা আমি জানি, আমি ইচ্ছা করলে এখুনি তাদের ধরিয়ে দিতে পারি।'

বলাবাহুল্য, এক মুহূর্তে শাশুড়ির ক্রন্দন থামিয়া গেল! শ্বশুর-শাশুড়ি দুই জন পরস্পরে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

আরিফ বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার শ্বশুর জামাতার হাত ধরিয়া বলিল, 'কে বাবা সে চোর? দেখেছ? তাকে?'

আরিফ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, 'জি হাঁ দেখিছি! কলিকাল কিনা, তাই সব কিছু উল্টে গেছে! যার চুরি গেছে, তারি চোরের হাত চেপে ধরার কথা, এখন কিন্তু চোরই যার চুরি গেছে তার হাত চেপে ধরে!'

শ্বশুর যেন আহত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

আরিফ জোহরাকে ডাকিয়া রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বলিল ও ইঙ্গিতে ইহাও জানাইল যে হয়ত এ ব্যাপারে তাহারও হাত আছে!

জোহরা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল! তাহার মূর্ছা ভাঙ্গিবার পর আরিফ বলিল, 'সে এখন এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে! এ নরক-পুরীতে সে আর এক মুহূর্তেও থাকিবে না।'

শ্বশুর-শাশুড়ি যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল; এমনকি জোহরার মূর্ছাও আরিফই ভাঙ্গাইল, পিতা-মাতা কেহ আসিয়া সাহায্য করিল না।

আরিফ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই জোহরা তাহার পায়ে লুটাইয়া বলিল, 'আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে এখানে রেখে যেয়ো না। খোদা জানেন, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কোন অপরাধ করিনি।'

আরিফ জোহরার কান্নাকাটিতে রাজি হইল তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে।

স্বামীর নির্দেশ মত জোহরা পিতা-মাতাকে আর কিছুই প্রশ্ন করিল না।

৪

চলিয়া যাইবার সময় জোহরার পিতা-মাতা ছুটিয়া আসিয়া কন্যা-জামাতার হাতে ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল, তাহারা বাসিমুখে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অন্তত সামান্য কিছু খাইয়া লইয়া তবে তাহারা যেন যায়!

আরিফ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এ বাড়ির বায়ুতেও যেন কিসের পূতিগন্ধ! তবু সে খাইয়া যাইতে রাজি হইল, সে আজ দেখিবে — মানুষের ভণ্ডামির সীমা কতদূর।

জোহরা যত জিদ করিতে লাগিল, সে এ বাড়িতে আর জল স্পর্শও করিবে না, আরিফ ততই জিদ ধরিল না, সে খাইয়াই যাইবে।

জোহরা তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল, সে কিছু খাইল না — আরিফ কিন্তু খাইবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বমি করিতে লাগিল।

জোহরা আবার মূর্ছিতা হইয়া পড়িল! সে মূর্ছার পূর্বে মায়ের দিকে তাকাইয়া একটি কথা বলিয়াছিল — 'রাক্ষুসী!'

আরিফের বুঝিতে বাকি রহিল না সে কি খাইয়াছে!

কিন্তু এখানে থাকিয়া মরিলে চলিবে না! এই মৃত্যুর ইতিহাস সে তাহার পিতা-মাতাকে বলিয়া যাইবে। সে উর্ধ্বশ্বাসে স্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

স্টেশনে পৌঁছিয়াই সে ভীষণ রক্ত-বমন করিতে লাগিল। রক্ত-বমন করিতে করিতেই সে প্রায় চলন্ত ট্রেনে গিয়া উঠিয়া পড়িল।

ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। স্টেশন মাস্টার চিৎকার করিতে সে তখন ট্রেনে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে।

কামরা হইতে একজন সাহেবী পোশাক-পরা বাঙালি চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'এটা ফার্স্ট ক্লাশে, নেমে যাও, নেমে যাও।'

আরিফ কোন কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার রক্ত-বমন করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে যে বাঙালি সাহেবটি ট্রেনে যাইতেছিলেন, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার।

আরিফ অস্ফুট স্বরে একবার মাত্র বলিল, 'আমায় বিষ খাইয়েছে, আমার —

বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেব মফঃস্বলের এক বড় জমিদার বাড়ির 'কলে' গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই ঔষধপত্রের বাক্স ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি 'সার্ভেন্ট' কামরা হইতে চাকরকে ডাকিয়া তাহার সাহায্যে আরিফকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া নাড়ি পরীক্ষা করিয়া ইঞ্জেকশন দিলেন। দুই তিনটা ইঞ্জেকশন দিতেই রোগীকে সুস্থ মনে হইতে লাগিল। বমি বন্ধ হইয়া গেল।

ইচ্ছা করিয়াই ডাক্তার সাহেব গাড়ি থামান নাই। কারণ গাড়ি কলিকাতা পুঁহুছিতে দেরি হইলে হয়ত এ হতভাগ্যকে আর বাঁচানো যাবে না।

ট্রেন কলিকাতায় পৌঁহুছিলে, ডাক্তার সাহেব এ্যাম্বুলেন্স করিয়া আরিফকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

জোহরা সত্য সত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

এদিকে জোহরা চৈতন্য লাভ করিতেই যেই সে শুনিল, তাহার স্বামী চলিয়া গিয়াছে, তখন উন্মাদিনীর মত ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পিতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, তাহাকে এখনি তাহার শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হোক।

প্রতিবেশীরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

জোহরার পিতা-মাতা সকলকে বুঝাইলেন, কন্যার সমস্ত অলঙ্কার গত রাত্রে চুরি যাওয়ায় জামাতা পুলিশে খবর দিতে গিয়াছে, মেয়েও সেই শোকে প্রায় উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

পীর সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়িতে ভিড় করিতে পারিল না, কৌতূহল দমন করিয়া সরিয়া গেল।

তিন দিন তিন রাত্রি যখন কন্যা জলস্পর্শও করিল না, তখন পিতা পাল্কি করিয়া কন্যাকে রসুলপুর পাঠাইয়া দিয়া পুণ্য করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করিলেন। আরিফও সেই দিন ফিরিয়া কলিকাতা হাসপাতাল হইতে মোটরযোগে বাড়ি ফিরিয়াছে!

আশ্চর্য! সে বাড়ি ফিরিয়া কিন্তু পিতা মাতাকে কিছু বলিল না। এই তিন দিন ধরিয়া সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পিতা শুনিলে, তাহাদের খুন করিতে ছুটিবেন। তাহারা তো মরিবেই, তাহার পিতাকেও সে সেই সাথে হারাইবে। জোহরাও আত্মহত্যা করিবে!

জোহরা! জোহরা! ঐ তিনটি অক্ষরে যেন বিশ্বের মধু সঞ্চিত! সে মৃত্যু স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দৈবকে ভিন্ন কাহাকেও সে দোষী করিবে না। বাহিরেও না, অন্তরে না!

সে তখনও জানে না যে, সে আবার বাঁচিয়া ফিরিয়াছে! আর কাহাকে সে অপরাধী করিবে? তাহারা প্রিয়তমার পরমাত্মীয়! বাঁচিয়া উঠিয়া সে যেন নব-জীবন লাভ করিয়াছে। এ যেন তার আর এক জন্ম! মৃত্যুর স্পর্শ তাহাকে সোনা করিয়া দিয়াছে।

পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতামাতা চমকিয়া উঠিলেন, 'একি, এমন নীল হয়ে গেছিস কেন? একি চেহারা হয়েছে তোর?'

আরিফ শান্ত স্বরে বলিল, 'কলেরা হয়েছিল, এসিয়াটিক কলেরা। বেঁচে এসেছি এই যথেষ্ট।'

পিতা-মাতা পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত দরিদ্রকে ডাকায়াই দান-খয়রৎ করিলেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে মৌলুদ শরীফের ব্যবস্থা করিলেন।

তখনো সূর্য অস্ত যায় নাই, এমন সময় বাড়ির দ্বারে আসিয়া জোহরার পাল্কি থামিল।

জোহরা পাল্কি হইতে মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে নামিতেই সম্মুখে আরিফকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'তুমি এসেছ — বেঁচে ফিরে এসেছ?'

বলিতে বলিতে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মূর্ছা ভাঙ্গিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আরিফের পিতা-মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'তোরা দুজনই কি মরতে মরতে ফিরে এলি?'

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, 'আমার সোনার প্রতিমার কে এমন অবস্থা করলে!'

আরিফ জোহরাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। জোহরা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, 'না, না, তুমি শাস্তি দাও। তোমরা আমায় ঘৃণা কর, মার!'

আরিফ জোহরার অধর দংশন করিয়া বলিল, 'এই নাও শাস্তি!'

৬

দুঃখ বিপদের এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও জোহরা তাহার পদ্মা-গোখরার কথা ভুলে নাই। এতদিন সে তেমনি নীরবে তাহাদের কথা ভুলিয়া আছে, যেমন করিয়া সে তাহার মৃত খোকাদের ভুলিয়াছে! কিন্তু সে কি ভুলিয়া থাকা! এই নীরব অন্তর্দাহের বিষ-জ্বালা তাহাকে আজ মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত ঠেলিয়া আনিয়াছে! সে সর্বদা মনে করে, সে বেদেনী, সে সাপুড়ের মেয়ে! সে ঘুমে জাগরণে শুধু সর্পের স্বপ্ন দেখে। সে কল্পনা করে, তাহার স্বামী নাগলোকের অধীশ্বর, সে নাগমাতা, সে নাগ-রাজেশ্বরী!

বাড়িতে আসিয়া অবধি কাহাকেও পদ্মা-গোখরোর কথা জিজ্ঞাসা না করায়, শ্বশুর-শাশুড়ি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, বৌ ওদের কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে জোহরা স্বপ্নে দেখিতেছিল, তাহার মৃত খোকা দুইজন যেন আসিয়া বলিতেছে, 'মাগো, বড় ক্ষিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাওনি। আমারা কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারিনে! একটু দুধ! মা! বড় ক্ষিদে!' 'খোকা' 'খোকা' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিল। দেখিল, স্বামী ঘুমাইতেছে। প্রদীপ জ্বালিয়া কি যেন অন্বেষণ করিল, কেহ কোথাও নাই।

সে আজ উন্মাদিনী। সে আজ শোকাতুরা মা, সে পুত্রহারা জননী! তাহার হারা-খোকা ডাক দিয়াছে,তাহারা ছয় মাস না খাইয়া আছে!

পাগলের মত সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ির সম্মুখেই মীর পরিবারের গোরস্থান। ক্ষীণ শিখা প্রদীপ লইয়া উন্মাদিনী মাতা দুইটি ছোট্ট কবরের পার্শ্বে আসিয়া থামিল। পাশাপাশি দুইটি ছোট্ট কবর, যেন দুটি যমজ ভাই — গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে।

শিয়রে দুইটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ, জোহরাই স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। এইবার তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। রক্তবর্ণের ফুলে ফুলে কবর দুইটি ছাইয়া গিয়াছে।

মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'খোকা! খোকা কে তোদের এতফুল দিয়াছে বাবা! খোকা!'

মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, না ঐ কবর ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল — জানে না, জাগিয়া উঠিয়াই জোহরা দেখিল, তাঁহার বুকে কুণ্ডলী পাকাইয়া সেই পদ্মা-গোখ্‌রো-যুগল।

জোহরা উন্মত্তের মত চিৎকার করিয়া উঠিল, 'খোকা, আমার খোকা, তোরা এসেছিস, তোদের মাকে মনে পড়লো?' জোহরা আবেগে সাপ দুইটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, সর্প দুইটিও মালার মত তাহার কণ্ঠ-বাহু জড়াইয়া ধরিল।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে।

জোহরা দেখিল পদ্মা-গোখরোদ্বয়ের সে দুগ্ধ-ধবল কান্তি আর নেই, কেমন যেন শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহারা বারে বারে জিভ বাহির করিয়া যেন তৃষ্ণার কথা, ক্ষুধার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে — মা গো বড় ক্ষিদে! তুমি ত ছিলে না, কে খেতে দেবে? একটু দুধ! বড় ক্ষিদে মা, বড় ক্ষিদে!

জোহরা তাহাদের বুকে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই।

সে হেঁসেলে ঢুকিয়া দেখিল, কড়া-ভরা দুগ্ধ।

বাটিতে করিয়া দিতেই সাপ দুইটি বুভুক্ষের মত বাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। যেন কত যুগযুগান্তরের ক্ষুধাতুর ওরা!

জোহরার দুই চক্ষু তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।

শাশুড়ি উঠিয়া বধূর কীর্তি দেখিয়া মূক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; বধূ তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'ওমা, কি হবে, বালাইরা এ ছয় মাস কোথায় ছিল? যেমনি তুমি এসেছ, আর অমনি গায়ের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে!'

জোহরা আহত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'ষাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা!'

শাশুড়ি বুঝিতে পারিলেন না, হেসে বলিলেন, 'সত্যিই ওরা তোমার খোকা বৌমা। তুমি চলে যাবার পর আমরা দু একদিন ওদের দুধ দিয়েছিলাম। ওমা শুনলে অবাক হবে, ওরা দুধ ছুঁলোই না! চলে গেল! সাপও মানুষ চেনে! কলিকালে আরও কত কি দেখব!'

সাপ দুইটি তখন বোধ হয় অতিরিক্ত দুগ্ধপানবশতই নির্জীবের মত বধূর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়াছিল।

৭

সেইদিন সন্ধ্যা-রাত্রিতে বাড়ির একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ও মা গো, ভুতে ধরলো গো! জিনের বাদশা গো! জিন ভূত!'

বলিয়াই যে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বাড়িময় ভীষণ হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আরিফের মাতা তখন আরিফকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, 'হারে, বৌমা যে আবার পোয়াতি, তাও ত বলিস নি। ওর যে ব্যথা উঠেছে।'

আরিফ বলিতেছিল, কিন্তু এখন ত ব্যথা ওঠার কথা নয় মা, মোটে তো সাত মাস।'

এমন সময় বাড়িময় শোরগোল উঠিল, 'ভূত! ভূত! য়্যাদ্দাড়ওয়ালা ভূত!'

বাড়ির চাকর-চাকরানী সকলে বলিল, তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে — জ্যান্ত ভূত! আকাশে গিয়া তাহার মাথা ঠেকিয়াছে! বাড়ির মধ্যে আমগাছ-তলায় দাঁড়াইয়া আছে!

আরিফ, আরিফের মাতা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যই তো কে যেন গাছ-তলায় প্রেতমূর্তির মত দাঁড়াইয়া!

তাহাদের পিছনে পিছনে যে ভূত দেখিতে জোহরাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহা কেই দেখে নাই।

হঠাৎ ভূত চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে বাপরে, সাপে খেলে রে!'

জোহরা চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাবা তুমি!' আরিফের মাতাও বলিয়া উঠিল, 'য়্যা বেয়াই?'

জোহরা তখন চিৎকার করিতেছে, 'ও সত্যই ভূত। বাবা নয়, বাবা নয়, ও ভূত! ওকে মার মেরে বের করে দাও।'

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, ভূত যেন যষ্টিদ্বারা নির্দয়ভাবে কাহাকে প্রহার করিতে করিতে চিৎকার করিতেছে — 'ওরে বাপরে সাপে খেয়ে ফেললে! আমায় সাপে খেয়ে ফেললো!'

জোহরা উন্মাদিনীর মত তাহার শাশুড়ির হাতের লণ্ঠন কাড়িয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল — 'ওগো আমার খোকাদের মেরে ফেললে! ওকে ধর! ওকে ধর!'

জোহরার সাথে সাথে সকলে আমগাছ-তলায় গিয়া দেখিল, ভূত সত্যই আর কেহ নয়, সে জোহরার পিতা। তাহাকে তাহাদের বাস্তু সাপ পদ্ম-গোখরোদ্বয় নির্মমভাবে দংশন করিতেছে এবং ততোধিক নির্মমভাবে সে সর্পদ্বয়কে প্রহার করিতেছে।

জোহরা একবার 'খোকা এবং একবার 'বাবা' বলিয়াই মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে জোহরা আরিফকে ডাকিল। সকলে সরিয়া গেল, সে জিজ্ঞাসা করিল — 'আমার খোকারা কই? আমার পদ্মা-গোখরো? আমার বাবা?'

আরিফ কাঁদিয়া বলিল, 'জোহরা! জোহরা! কেউ নাই! সব গেছে! সকলে গেছে! তোমার বাবা মরছেন পদ্মা-গোখরোর কামড়ে!'

'তোমার মা মারা গেছেন কলেরা হয়ে। ওঁরা মক্কা যাচ্ছিলেন। তোমার মা রাস্তায় মারা গেলে, তোমার বাবা অনুতপ্ত হয়ে তোমায় শেষ দেখা দেখতে আসেন লুকিয়ে। লুকিয়েই হয়ত তোমায় দেখে চলে যেতেন। এমন সময় চাকরানী দেখতে পেয়ে ভূত বলে চিৎকার করে! ঠিক সেই সময় তোমার পদ্মা-গোখরো তাঁকে তাড়া করে!'

জোহরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'বেশ হয়েছে, জাহান্নামে গেছে ওরা! যাক। আমার পদ্ম-গোখরো — আমার খোকারা কোথায় বল!'

আরিফ বলিল, 'তোমার বাবা তাদের মেরে ফেলেছেন!'

জোহরা, 'এ্যা খোকারা নাই?' বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।

King Cobra

The Mirs of Rasulpur suddenly grew rich. The rumor went around that they had found some hidden treasure. For, without Aladdin's Lamp, no one could amass such wealth in the short span of two years.

There was a time when the Mirs used to be rich. Even ten years ago the Mirs were no less wealthy than any zamindars in the country. But quickly within the next few years this condition deteriorated—to nothing. Supposedly, at the root of it was the Mirs' competing urge for luxury against the Nawab of Murshidabad. People say, even their wooden slippers were studded with golden bells! The saying goes, the grandfather of the current Mir had brought in a dozen beautiful maidens from all parts of India just to give him an oil massage before his bath! Soon after his death "the Golden Sri Lanka turned to the Sri Lanka burned to ashes." Even his son had to resort to making a half-starved living by running a small mosque-school.

Predictably, the grandson of such a grandfather wouldn't be married into an aristocratic zamindar family. However, he did marry a woman, though coming from a poor family, whose background was no less aristocratic than the Mirs.

The Mirs' grandson's name was Arif. His wife's name was Zohora. Zohora's fame as a beautiful woman spread thoughout the area. Yet, inspite of her beauty and the aristocratic Syed family background, no prince came forward to propose marriage to this daughter of poor parents.

It was too much for her parents to think of their daughter ending up a spinster. So, not without ambivalence, they found relief in marrying her off to Arif, the son of a poor mosque-school teacher.

Even though the Mirs had lost their wealth, their physical charm hadn't faded one bit. This embarrassed even the similar reputation of the Syeds of Qutubpur. So, when Arif and Zohora stood next to each other as husband and wife, it was a sight to behold. They were like two competing moons!

Zohora's father still bore some regrets, but her mother felt a profound sense of peace at the sight of the happy faces of the young couple.

The couple's large eyes grew larger still with love and joy as they looked at each other vowing to be partners for life.

Arif's mother had been chronically sick and bedridden for some time. However, as soon as her daughter-in-law came into the family she began to recuperate. Overjoyed, she kept saying: "It's my daughter-in-law—she's the reason for my recovery! Our fortune will return!"

The news spread throughout the village that the Mirs' luck had returned. Who knows if there's such a thing as a "bringer of good luck," but ever since Zohora stepped into the house, amazingly, the Mirs' condition kept on getting better— and better.

A rumor spread that the daughter-in-law had unearthed the buried treasure of the Mir ancestors—therefore the unusual turn-around.

II

This rumor wasn't entirely unfounded. One day Zohora noticed a crack in one of the walls of the Mirs' decaying old building. Curiously she peeked into it—maybe even hoping to find hidden treasure. Whatever came over her, she took a stick and started poking into the crack with it. Immediately she heard a noise like the hissing of some angry snakes. Scared, she ran to her husband and told him what had happened.

At first Arif thought Zohora was fooling—though that would be most uncharacteristic of her—and chided her. But upon her

insisting, he went to the wall and also heard the hissing noise coming out of the crack. So he called his father.

The father was more daring than the son. He said: "The snake must be killed, or it's going to come out who knows when and bite someone. It sounded like a real cobra!" He too then mildly chided Zohora for disturbing the snake.

Bushes had grown all around the house. First, they cleared some of them to make way for the snake. Then, as soon as they started poking with a stick, a milk white cobra came out of the crack, with a rounded mark on its head. Arif was just about to kill it, but his father yelled out: "Don't kill it—don't! It's the type that lives around homesteads, without harming anyone. It's a bad omen to kill such a snake. See—it's a king cobra!"

While Arif stood still holding the stick high in his hand, the snake disappeared into a bush.

As they were coming away from the spot, Zohora called Arif by her side and said: "While you were poking inside the crack, I heard a sound. There must be a brass or bronze pot in there!" Arif's eyes lit up with delight! He told his father about the pot, but at first his father wouldn't believe it. He said: "What sound? I didn't hear any."

Arif replied: "How could we? We were so afraid and busy staying out of the snake's way."

So, as they carefully removed a few bricks from the wall, truly, they did see something shining inside!

With great anticipation the father and son team got down to work. After about two hours of hard labor, what they unearthed was not a huge treasure but a substantial one nevertheless-especially considering the hardship they were under. It was a moderate size pitcher full of royal gold coins!

But they faced a battle for life trying to get the pitcher out. Arif noticed that coiled around the pitcher's neck was another king cobra. With a long backward jump he yelled: "My God— the snake has returned!"

But Zohora said in a low voice: "No, it's a different one. It must be the other one's partner. I saw the other one go that way."

Whether or not it was the same one, it just wouldn't leave the pitcher. The same dilemma again: It's not right to kill a king cobra. From it's coiled position, the king cobra began to scare the intruders by occasionally spreading out its hood.

Whatever came over Zohora, she went and returned with a bowl of milk and placed it at a slight distance. As soon as she did that, the snake left the pitcher, came to the milk bowl and started calmly drinking the milk. While the snake drank, Zohora pulled the brass pitcher out of the crack. The snake could have easily bit her, but it didn't. Instead, with a droning sound it kept on drinking. A few minutes later, another king cobra came out of the bush and joined this one to drink the milk.

Zohora said: "That's the other one! It still has the mark of a wound from poking. Poor thing, see how blue it has turned?"

Arif and his parents were stunned by Zohora's behavior. They almost forgot that she could get bitten by the snakes. They then forcibly pulled her away.

With all the gold coins they were ecstatic. The family just didn't know what to do with Zohora, how to treat her properly. With tears of joy, her parents-in-law kept saying: "It's true—you have brought back our luck, Dear Zohora!"

But all this was to remain a secret, except to the four people. Secretly, Arif transported the gold coins to Calcutta where these were melted down and sold. It brought enough money for comfortable living for the Mir family. But—perhaps hoping for still more good luck-Arif started a coal business in Calcutta. It started making profits beyond all expectation!

Within two years the Mir family home was fully repaired and refurnished. Comfort had returned. Arif was also able to secure a contract with the Calcutta Corporation, making a huge profit from it.

For the Mir family, their days of hardship were over. But with Zohora, there was a problem.

III

Zohora grew excessively attached to the snakes, just as the snakes grew excessively attached to Zohora. Maybe it was because of the milk and bananas she fed them, they started following her around everywhere.

Everyone else was scared to death by the constant presence of the snakes. They were already facing a dilemma over killing the snakes; on top of that, they worried if the snakes leave, what if along with the snakes their luckily acquired wealth goes too?

In the gentle manner that the snakes went around the house, there really wasn't any reason to be afraid of them. Still, these were *king cobras*—just one bite and death is inevitable!

It's also nearly impossible to move away from this ancestral home. They just didn't know what to do.

Zohora is cooking; suddenly the snakes appear and lie down near her feet. This would make her mother-in-law scream! Zohora rebukes the snakes and they go away.

Zohora and her mother-in-law have sat down to eat. Suddenly the snakes appear and start dipping into Zohora's soup bowl, thinking it had milk in it. Frustrated, they start hissing, rise up and open their hoods. But they instantly calm down and put their swaying hoods down when Zohora asks them to wait until she gets them some milk. They drink the milk, then disappear somewhere.

Her mother-in-law is petrified in the meantime.

But Arif was pushed to his limit and found a way out by frequently escaping to Calcutta in the name of taking care of business. He would be woken up in the middle of the night by a cold feeling. He would open his eyes and notice that the two snakes were trying to crawl into his wife's bosom. Screaming, he would escape to a different room and spend the rest of the night there.

Zohora would rebuke the snakes and they would leave, but only to return soon with the look of frightened children seeking refuge with their mother. Tears would rush to Zohora's eyes; she could no longer rebuke them. Like a fearless snake charmer she would pet the snakes and let them sleep next to her.

IV

Within a year of her marriage Zohora gave birth to a pair of stillborn twins. She is reminded of them by the snakes. Her hungering heart of a mother thinks that the snakes are none other than her twins who have returned to her in a different form. She doesn't worry about getting bitten—it could not hurt more than the hurt she felt when the twins died. She is overcome with love for them. All her fears go away and she holds the snakes dearly in her bosom, lulls them to sleep and rebukes them affectionately.

Her husband helplessly fumes with rage. He cannot cross over the distance of these swaying hoods between himself and his dearer-than-life wife. Inside, he burns with futile frustration.

He can't really get angry at Zohora, who brought them luck. Moreover, it's not her fault anyway.

One day he angrily says:

"Zohora, I don't want all this

wealth more than I want you!

Let's just kill the snakes! We

lived more peacefully when we were poor."

Zohora cries out with a plea: "Please don't hurt them, they are my children! They don't harm anyone! They don't even know how to bite anymore!"

Arif replies: "They don't bite you, but I'm burning to death from their poison! You'll never know how much they have harmed me. If they actually bit me, I would be happier dead than go on living like this!"

Zohora doesn't say anything, she only sheds her tears in silence. She can't be too vocal about her thinking that the snakes are truly her reincarnated children—it goes against her upbringing.

Finally Arif and his parents decided to send Zohora to her parents' home for a few days. Hopefully that would make her forget the snakes. Not seeing Zohora around, hopefully the snakes too would move away to a different place.

So one morning Arif's father told Zohora: "You have been away from your parents for a long time. I also feel bad about turning down your father's invitation two or three times. Arif will take you there today so you can spend a few days with them."

Zohora understood it all but didn't object. In silent tears she left for her parents' home. Arif went on to Calcutta to take care of his business.

V

Zohora's parents were used to seeing her without any ornaments. Today, when she arrived richly dressed and ornamented, the poor parents could hardly believe their eyes! They were so anxious over how to receive her properly.

Within a couple of days Zohora's parents noticed that for some reason there was no smile on their daughter's face. She was obsessed with something. In things she said or did, she was repeatedly caught being absent-minded.

So one day Zohora's mother took her aside and asked her: "My child, should we write to Arif to come here?"

Deeply embarrassed, Zohora replied: "Oh no, Mother, he'll be here Saturday."

Arif came, but that old glow on her face did not return.

The mother asked her daughter: "Truthfully, Zohora, have you gotten into some disagreements with your husband?"

Zohora replied with a faint smile: "No, Mother. He loves me as always. I just miss my two children I left behind."

Zohora's mother didn't know anything about the Mirs' mysterious way of acquiring wealth, but she knew about the stillborn twins. She also knew that, according to family custom, they were buried in the family burial section of the field in front their house. So she thought her daughter was remembering her twins. Secretly wiping her own tears she went off to do her chores.

VI

Six months passed by quickly. There was no talk on anyone's part about taking Zohora back to Rasulpur. Zohora felt offended more than her parents. She found no justification—no wrong-doing on her part—for this. Arif came to see her every Saturday, but she felt so sentimental that she never brought it up with him.

But her mother couldn't remain silent any longer. One day she told Arif: "Zohora has practically stopped eating. I can't even figure out if she is sick in some way. She has lost so much weight that there's not much left of her."

Arif shuddered inside. He could never even imagine that anyone could love poisonous snakes so much. He worried: "Has Zohora gone mad?" He suddenly remembered that Zohora's maternal grandfather used to be a famous herpetologist. Could it be that Zohora inherited that trait?

Arif visited Rasulpur many times in the meantime but he didn't see the snakes more than once or twice. But what a wice. but nuisance they were! It was quite obvious to everyone that they were really looking for Zohora.

They raised their heads, showing their poisonous fangs. Then again, they looked so distressed, and as if begging, they went from Arif's feet to his father's feet to his mother's feet. That only terrified everyone and made them run for their lives.

Arif never mentioned this to Zohora. Nor did she—so hurt inside—ever ask Arif anything about the snakes.

Noticing that Arif himself wasn't expressing much interest in taking Zohora back, one day her father decided to bring it up. He said: "Arif, you know how poor we are. Zohora is very sick and

bedridden. During these hard times we are barely able to feed ourselves, forget about paying for proper treatment for Zohora. She's going to die unless she gets the treatment she needs. So take Zohora with you either to Calcutta or Rasulpur. Once she's all better, bring her back again." As he spoke his eyes welled up with tears.

So it was decided, tomorrow Arif will take her to Calcutta to see a doctor. After she is better, he will take her to Rasulpur.

VII

In the middle of the night Arif was woken up by some noise. He opened his eyes and and saw that someone was standing by his head with an open sword and in the next room someone—possibly a woman—was breaking into Zohora's steel trunk to take her ornaments out of it. Terrified, Arif just lay dead—he even lost his ability to scream.

Even under those conditions, Arif felt suspicious. A woman. robber? He squinted his eyes to see if he could recognize her, still pretending that he was deep asleep.

The ornaments were worth about twenty thousand rupees. Many times Zohora requested Arif to take the ornaments back to Rasulpur, but Arif wouldn't listen. He would say: "It's because of *your* luck that we have all this money and ornaments. If the ornaments get stolen, so be it. Nobody can steal you! These are your ornaments and these should be where *you* are. Moreover, your father is considered *a pir* (a Muslim saint) of this area, nobody will dare to steal from his house."

Arif couldn't believe his own eyes when he saw that the woman robber was none other than his mother-in-law- Zohora's mother!

A couple of days ago a storm had blown away some of the thatch on the roof. The bright moonlight coming through the damaged section lighted the room. The robber had put the ornaments in a bundle, and as she was turning around to leave the room, the moonlight fell on her face. Arif recognized the face-

the face of the woman he respected more than his own mother. His own eyes and face and heart were covered by a dark cloud.

So ugly is this world!

He couldn't utter a word. He tried his very best to control himself. The robber with the sword followed his mother-in- law out of the house. As soon as the two reached the courtyard, through the window Arif saw and recognized the other face—the face of none other than his own father-in-law!

Arif was aware of the worsening financial condition of his father-in-law. The whole country was about to be hit with a famine. He also sensed that just to get by he was occasionally bringing some of their utensils to the pawn shop. Aware of all this, Arif himself offered to help out with some money. But his father-in-law wouldn't accept it. It would hurt his pride to accept money from his own son-in-law. Arif even tried through Zohora, but he didn't succeed that way either.

Weakened in health, Zohora was sleeping deeply next to him. Arif didn't wake her up. But in fear, hatred and anger, he couldn't fall asleep again.

In the morning—by which time Arif had finally fallen asleep—he was awakened by someone's crying. His mother-in-law was screaming at the top of her lungs: "We've been robbed blind!"

Arif couldn't take it any longer. The daylight had removed his fear. Coming out of the room he shouted: "Don't cry any more, Mother, I know who robbed the ornaments. If I want to, I can identify them right now!"

Needless to say, his mother-in-law stopped crying instantly. She and her husband looked each other in the face.

Arif was about to leave, but his father-in-law came up to him and taking Arif's hands in his he asked: "Who is the robber, Arif? Have you really seen him?"

With a smile of contempt Arif replied: "Yes, Father, I have. The infernal age we are in, everything is turned upside down. The

one's who's been robbed is the one who's supposed to catch tightly onto the hands of the robber; but now it's the robber who catches the hands of the one who's been robbed."

As if wounded by this, the father-in-law let go of Arif's hands.

Arif turned to Zohora and told her everything about the night, even implying that she had a hand in it too.

Zohora fainted. After she regained her consciousness, Arif announced: "I want to leave this house this instant. Not for another second do I want to be in this hell!"

His parents-in-law stood petrified. In fact, it was Arif who worked on reviving Zohora. Her parents were of no help at all.

As Arif was about to leave, Zohora fell to his feet. Crying, she said: "Please take me with you, please don't leave me here. God knows—and I swear by touching you—I had nothing to do with this!"

Seeing her cry so much, Arif agreed to take Zohora to Calcutta with him. Listening to Arif, Zohora didn't go into questioning her parents.

VIII

As Arif and Zohora were about to leave, her parents came to them running, pleading with tears that they don't leave the house without eating something—especially since they hadn't eaten anything all day.

Arif was beginning to run out of breath, even the air of this house smelled like stinking puss. But he decided to stay back to eat something—in fact to test the extent of hypocrisy people can go to.

The more that Zohora insisted that they shouldn't eat anything from this house—not even a drink of water, the more Arif was set in his way—he will eat something before they leave!

Zohora stuck to her vow and ate nothing. Arif ate something-but within minutes, he started to vomit!

Once again, Zohora fainted. But before that she looked at her mother and uttered just one word: "Monster!"

There was no doubt in Arif's mind about what he had

eaten.

But he wouldn't let himself die here—he must let his parents know the truth behind his death. Pantingly and vomiting blood along the way, he got on the train just as it was leaving the platform. The Station Master came after him shouting, but the train had already started moving and Arif was on it.

In the compartment which Arif got into, a Bengali gentleman dressed in English clothing yelled out to him: "Hey, this is First Class—get out, get out!"

Before Arif could say a word, he started vomiting blood again.

Luckily, the Bengali gentleman in the train was a famous doctor from Calcutta. Faintly, Arif just said: "I've been poisoned, my..." Then he fainted. The doctor was returning from a call at a zamindar house. Right away—with the help of his servant traveling with him in the adjacent "Servants' Compartment"—he lay Arif down properly, checked his pulse and gave him an injection. After two or three injections Arif seemed much better. He also stopped vomiting.

Intentionally the doctor didn't stop the train. He was sure that unless the train reached Calcutta on time there was no chance of saving Arif's life.

As soon as the train reached Calcutta, the good doctor arranged for an ambulance to take Arif to a hospital.

Zohora truly was a bringer of good luck! Arif came back from meeting death face to face!

IX

On the other side, after regaining her consciousness, as soon as Zohora heard that Arif had left, crying madly she fell to her father's feet and begged him to take her to Rasulpur.

The neighbors had no idea what was going on and they kept asking question after question. Zohora's parents explained to them that all her ornaments were stolen last night, that her husband had gone to report this to the police, and that—from the shock of losing her ornaments—Zohora has almost gone mad.

Fearing the *pir's* wrath, the crowd dispersed, suppressing their curiosity.

X

After three days and three nights of Zohora's refusal to touch even water, her father sent her to Rasulpur by a palanquin and he and his wife left for pilgrimage to Mecca.

On the very same morning Arif arrived in Rasulpur from the Calcutta hospital by car. Surprisingly, he didn't say a word about any of what had transpired to his parents. During the three days of fighting death he also did a great deal of thinking. If his father hears what happened, Arif was convinced, he would want to kill Zohora's parents. They would die and he would also lose his father with them. Zohora too would commit suicide.

Zohora! Zohora! As if all the honey in the world was contained in that name! He promised to himself—he will not blame anyone but Fate; he will not bear any grudge against anyone, either outwardly or inwardly. Whom could he blame, really? After all, they are the parents of the dearest person in his life. Having survived, he gained a new lease on life. He was reborn! The touch of death had purified his heart.

Arif's parents were shocked by the look on his face: "What happened why do you look so blue? Why are you in this condition?"

Calmly Arif answered: "I was struck by cholera, the Asiatic cholera. I'm lucky to be alive."

His parents embraced him and cried and cried. They gave money to the poor and held a gathering for prayer and gratitude *(milad)* at home in the evening.

The Sun was still to set when Zohora's palanquin arrived at the gate.

Zohora, looking very pale, stepped out and was overcome with emotion to see Arif. Falling at his feet, she cried out: "You came back, you came back alive?"

Then she fainted. Everyone together carried her in and tended to her until she regained her consciousness. Arif's parents cried with tears of sadness and joy: "You have come back from death's doorstep!"

Arif's mother kept crying: "Who has done this to my golden goddess?"

In privacy, Arif told Zohora everything that had happened in the meantime. Zohora put her head down at her husband's feet and cried: "No, no—you have to punish me! You have to hate me, beat me!"

Arif kissed Zohora's lips—pretending that he was biting her gently—and said: "Here's your punishment."

XI

Inspite of all these disasters Zohora didn't forget her king cobras. She had been quiet about them in the same way that she had been quiet about her twins. But that's not quite the same as forgetting them. This pain quietly burning inside had pushed her to the verge of death. She was obesessed with thinking of herself as a daughter of a snake charmer, thinking of herself as a snake charmer. She fantasized that her husband was the King of the snake kingdom, that she was the mother of snakes, the Queen of snakes!

That she did not start asking about the king cobras to anyone brought a sense of relief to her parents-in-law. They thought Zohora must have forgotten about the snakes by now.

One night Zohora dreamt her dead twins had returned to her, saying: "Mother, we are so hungry! You haven't fed us any milk

for so long! We are lying in our grave and we can't get up. Give us some milk, Mother, some milk! We are so hungry!"

"My children! My children!" Zohora cried out and woke up from her sleep. Her husband was still asleep. She lit a lamp, then searched for something inside the room—but didn't find what she was looking for.

Today she was mad! She was a grief-stricken mother who had lost her children. Her lost children were calling her and they hadn't eaten anything for six months.

Like a mad woman she flung open the door and ran outside. The Mir family graveyard was located right in front of the house. With the flickering lamp in her hand she stopped by two small graves next to each other, like twins lying in each other's arms.

At the head of the graves were two *krishnachura* trees- Zohora herself had planted them. The trees grew flowers this season. The two graves were covered with crimson flowers from the trees.

The mother cried out: "My children! My children!" Who has given you all these flowers?"

Whether she fainted or fell asleep crying, sitting by the graves, she wouldn't know. But when she woke up, coiled in her bosom were the king cobra twins!

Frantically Zohora cried out: "My children, my children—have you come back, did you remember your mother?" With all her affection she held the snakes against her bosom; and the snakes too coiled around her neck and arms like garlands.

By now it was dawn.

Zohora noticed that the snakes were not looking as milk-white-radiant as before. They looked pale and thin. They stuck out their tongues repeatedly as if they were trying to tell her about their thirst, about their hunger: "We are very hungry, Mother! Who would feed us in your absence? Give us some milk—we are very hungry, Mother, so very hungry!"

Zohora carried them in her bosom to the house. No one was up yet. She went into the kitchen and noticed the pot full of milk.

She gave the snakes some milk in a bowl. Right away they started drinking it by practically jumping into the bowl—as if they were starving for ages!"

hom, and won MIA!

Tears broke out of Zohora's eyes like a flood!

Zohora's mother-in-law had just woken up and seeing all this she was dumbfounded. Then, as soon as she was noticed by Zohora, she said: "My goodness, what's going to happen now? Where were these pests during the last six months? As soon as you have come back, by the smell of your body, they are back too!

In a wounded voice Zohora said: "No, Mother-why are they pests? They are my children!"

Her mother-in-law didn't quite get it. She said with a smile: "Well, they probably are your children. We tried to feed them after you left. But you'd be surprised—they wouldn't even touch the food and they left. Even snakes know who the right person is! Will wonders ever cease?"

The snakes—probably from overdrinking—lay listlessly at Zohora's feet.

XII

That night a maid-servant let out a frightened scream: "Ghost—O my god, a ghost is after me! The King of the jinn! Jinnee! Ghost!" Then she almost passed out causing a great commotion throughout the house.

This happened during the same time that Arif's mother was telling him: "Arif, you didn't tell me that Zohora was pregnant again! She's having labor pains."

Arif replied: "But she's not supposed to have labor pains now, Mother, this is only the seventh month!"

Once again the commotion: "Ghost! Ghost! A bearded ghost!"

All the servants would swear it—they have seen the ghost with their own eyes—a living ghost! It's head touches the sky and it's standing under a mango tree that belongs to this house.

Arif and his mother came out with lanterns in their hands. It's true, someone was standing under the tree like a ghost!

They didn't notice that Zohora too had followed them outside to see the ghost.

Suddenly the ghost cried out: "O my God—I'm getting bitten by snakes!"

Zohora cried out: "Father—it's you!"

Arif's Mother yelled out too: "Is it you, *Beai?*

Zohora kept on crying: "It is a real ghost! It's not my father-it is a ghost! Beat it—chase it away!"

She heard the ghost screaming while it was beating someone mercilessly with a stick: "O my God—the snakes are biting me! The snakes are biting me!"

Zohora, frenziedly snatching away the lantern from her mother-in-law, started running and crying at the same time: "He's killing my children! Stop him! Stop him!"

Following Zohora to the mango tree everyone else too noticed that, truly, the ghost was none other than Zohora's father. The more that the king cobras were biting him mercilessly, the more he was beating them with a stick mercilessly.

Zohora called out: "My children!" and, "Father!" Then she fainted.

After regaining her consciousness, Zohora asked for Arif. As others moved away, she asked him: "Where are my children? My king cobras? My Father?"

Arif broke down in tears, then replied: "Zohora! My Zohora! Nobody's alive! They are all gone! All of them! Your father was bitten to death by the king cobras. Your mother died of cholera.

Your parents were on their way to Mecca. After she died on the way, your repentant father came to see you secretly for the last time. After seeing you, he probably would have left secretly. But he was noticed by a maid-servant who thought he was a ghost and started screaming: `Ghost! Ghost!' At the same time, your king cobras started chasing him."

Pantingly, Zohora said: "Good—let my parents go to hell! But tell me—my king cobras-my children—where are they?" Arif replied: "Your father killed them."

Zohora: "What? My children are dead?" And she fainted.

Already by early morning the news spread throughout the village: the golden daughter-in-law of the Mir family had just died while giving birth to a pair of stillborn snakes.

Translated by Sajed Kamal

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী

[ক]

[বাঙালি পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিয়াছিল নেশার ঝোঁকে। নীচে তাহাই লেখা হইল। সে বোগদাদে গিয়ে মারা পড়ে —]

'কি ভাষা! নিতান্তই ছাড়বে না? একদম এঁটেল মাটির মতো লেগে থাকবে? আরে, ছোঃ তুমি যে দেখছি চিটে গুড়ের চেয়েও চামচিটেল! তুমি যদিও হচ্ছ আমার এক ক্লাসের ইয়ার, তবু সত্যি বলতে কি, আমার সে সব কথাগুলো বলতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ খোদা আমায় পয়দা করবার সময় মস্ত একটা গলদ করে বসেছিলেন, কেননা চামড়াটা আমার করে দিলেন হাতির চেয়েও পুরু, আর প্রাণটা করে দিলেন কাদার চেয়েও নরম! আর কাজেই দু-চার জন মজুর লাগিয়ে আমার এই চামড়ায় মুগুর বসালেও আমি গোঁপে তা দিয়ে বলব 'কুচ পরওয়া নেই', কিন্তু আমার এই 'নাজোক', জানটায় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট্ট মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠব! তোমার 'বিরাশি দশ আনা' ওজনের কিলগুলো আমার এই স্থূল চর্মে স্রেফ আরাম দেওয়া ভিন্ন আর কোন ফলোৎপাদন করতে পারে না, কিন্তু যখনই পাকড়ে বস, 'ভাই, তোমার সকল কথা খুলে বলতে হবে', তখন আমার অন্তরাত্মা ধুকধুক করে ওঠে, — পৃথিবী ঘোরার ভৌগোলিক সত্যটা তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে পারে বা জোনাকি পোকা জ্বলে উঠ্‌তে পারে, তা আমার মত এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না।

[খ]

'হাঁ, আমার ছোটকালের কোনো কথা বিশেষ ইয়াদ হয় না। আর আবছায়া রকমের একটু মনে পড়লেও তাতে তেমন কোন রস বা রোমান্স (বৈচিত্র্য) নেই! — সেই সরকারি রাম-শ্যামের মত পিতামাতার অত্যধিক স্নেহ, পড়ালেখায় নবডঙ্কা ঝুলঝাপপুর ডাণ্ডাগুলি খেলায় 'দ্বিতীয় নাস্তি', দুষ্টামি-নষ্টামিতে নন্দদুলাল কৃষ্ণের তদানীন্তন অবতার, আর ছেলেদের দলে অপ্রতিহত প্রভাবে আলেকজান্ডার দি গ্রেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ! আমার অনুগ্রহ ও নিগ্রহে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিশেষ খোশ ছিলেন কিনা, তা আমি কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি না; তবে সকলেই আমার পরমার্থ কল্যাণের জন্য যে সকাল-সন্ধে প্রার্থনা করত সেটা আমার তীক্ষ্ম

শ্রবণেন্দ্রিয় না-ওয়াকেফ ছিল না। একটা প্রবাদ আছে, 'উৎপাত ক'রলেই চিৎপাত হতে হয়।' সুতরাং এটা বলাইবাহুল্য যে, আমার পক্ষেও উক্ত মহাকাব্যটির ব্যতিক্রম হয় নি, বরং ও কথাটা ভয়ানকভাবেই আমার উপর খেটেছিল; কারণ ঘটনাচক্র যখন আমি আমার জননীর কক্ষচ্যুত হয়ে সংসারের কর্মবহুল ফুটপাতে চিৎপাত হয়ে পপাত হলুম, তখন কত শত কর্মব্যস্ত সবুট-ঠ্যাং যে অহম, বেচারার ব্যথিত পাঁজরের উপর দিয়ে চলে গেল, তার হিসেব রাখতে শুভঙ্কর দাদাও হার মেনে যায়। — থাক আমার সে সব নীরস কথা আউড়িয়ে তোমার আর পিত্তি জ্বালাব না। শুনবে মজা?

একদিন পাঠশালায় বসে আমি বঙ্কিমবাবুর মুচিরাম গুড়ের অনুকরণে ছেলেদের মজলিস সর-গরম করে আবৃত্তি কর্‌ছিলুম 'মানময়ী রাধে! একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও!' এতে শ্রীমতী রাধার মানভঞ্জন হয়েছিল কিনা জানবার অবসর পাই নি, কারণ নেপথ্যে ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে 'আরে রে, দুর্বৃত্ত পামর' বলে হুঙ্কার করে আমার ঘাড়ে এসে পড়লেন সশরীরে আমাদের আর্কমার্কা পণ্ডিতমশাই! যবনিকার অন্তরালে যে যাত্রার দলের ভীম মশাইয়ের মত ভীষণ পণ্ডিতমশাই অবস্থান করেছিলেন, তা এ নাবালকের একেবারেই জানা ছিল না!—তার ক্রোধ-বহ্নি যে দুর্বাসার চেয়েও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তা আমি বিশেষ রকম উপলব্ধি করলুম, তখন, যখন তিনি একটা প্রকাণ্ড মেঘের মত এসে আমার নাতিদীর্ঘ শ্রবণেন্দ্রিয় দুটি ধরে দেওয়ালের সঙ্গে মাথাটার বিষম সংঘর্ষণ আরম্ভ করলেন। তখনকার পুরোদস্তুর সংঘর্ষণের ফলে নতুন বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উদ্ভাবন হয় নি সত্য, কিন্তু আমার সর্ব শরীরের 'ইলেকট্রিসিটি' যে সাংঘাতিক রকম ছুটাছুটি করেছিল, সেটা অস্বীকার করতে পারব না। মার খেয়ে খেয়ে ইটপাটকেলের মত আমার এই শক্ত শরীরটা যত না কষ্ট অনুভব করেছিল, তাঁর সালঙ্কার গালাগালির তোড়ে তার চেয়ে অনেক কষ্ট অনুভব করেছিল আমার মনটা। আদৌ মুখরোচক নয় এরূপ কতকগুলো অখাদ্য তিনি আমার পিতৃপুরুষের মুখে দিচ্ছিলেন এবং একেবারেই সম্ভব নয় এরূপ কতকগুলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দাবি আমার কাছে করেছিলেন। তাঁর পাঁচপুয়া পরিমিত চৈতন্য চুটকিটা ভেকছানাসম, শিরোপরি অস্বাভাবিক রকমের লম্ফ-ঝম্ফ প্রদান করছিল। সঙ্গে সঙ্গে খুব হাসিও পাচ্ছিল, কারণ 'চৈতন তেড়ে ওঠার' নিগূঢ় অর্থ সেদিন আমি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলুম! ক্রমে যখন দেখলুম, তাঁর এ প্রহারের কবিতায় আদৌ যতি বা বিরামের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, তখন আর বরদাস্ত হল না! জানো তো 'পুরুষের রাগ আনাগোনা করে আমিও তাই, ঐখানেই একটা হেস্তনেস্ত করে দেবার অভিপ্রায়ে তার খাঁড়ার মতো নাকটায় বেশ মাঝারি গোছের একটা ঘুষি বাগিয়ে দিয়ে বীরের মত সটান স্বগৃহাভিমুখে হাওয়া দিলুম! বাড়ি গিয়েও আমি, নিজেকে নিরাপদ মনে করলুম না। তাই পিতৃভয়ে সেঁধুলম গিয়ে একে বারে চালের মরাই-এ; উদ্দেশ্য, এরূপ নিভৃত স্থান হতে কেউ আর সহজে আবিষ্কার করতে পারবেন না — কি জানি কখন কি হয়! — খানিক

পরে আমার সেই গুপ্তপুর হতেই শুনতে পেলুম পণ্ডিতমশাই ততক্ষণে সালঙ্কারে আমার জন্মদাতার কাছে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছিলেন যে, আমার মত দুর্ধর্ষ বাউণ্ডেল ছোকরার লেখা-পড়া তো 'ক' অক্ষর গোমাংস, তদুপরি গুরুমশাইয়ের নাসিকায় গুরুপ্রহার ও গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ অপরাধে আপাতত এই দুনিয়াতেই আমাকে লোখুঠুটোর মত চাটু হস্তে মাছি মারতে হবে, অর্থাৎ কুষ্ঠব্যাধি হবে, তারপর নরকে যাতে আমার 'স্পেশাল' (বিশেষ) শাস্তির বন্দোবস্ত হয়,তার জন্যেও নাকি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ঠিকঠাক করতে পারেন। প্রথমত অভিশাপটার ভয়ে একটু বিচলিত হয়ে পড়ছিলুম। গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ কথাটা আমি, প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে অবগত হলাম, পণ্ডিতমশায়ের অর্ধাঙ্গিনীর নামও নাকি শ্রীমতি রাধা, — আর তার এক-আধটু গুড়ুক খাওয়ারও নাকি অভ্যাস আছে, অবশ্য সেটা স্বামী দেবতার অগোচরেই সম্পন্ন হয়,আমি নাকি তাই দেখে এসে ছেলেমেয়েদের কাছে স্বহস্তে গুড়ু ক সেজে অভিমানিনী শ্রীমতি রাধার মানভঞ্জনার্থ করুণ মর্মস্পর্শী সুরে উপরোধ করছিলুম — মানময়ী রাধে, একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও — আর পণ্ডিতমশাই অন্তরালে থেকে সব শুনছিলেন। — আমার আর বরদাশত হলো না, চালের মরাই-এ থেকেই উসখুস করতে লাগলুম, ইতিমধ্যেও গরমেও আমি রীতিমত গলদর্ঘম হয়ে উঠেছিলুম। আমি মোটেই জানতুম না পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নীর নাম শ্রীমতি রাধা — আর তিনি যে গুড়ুক খান, তা তো বিলকুলই জানতুম না। কাজেই এতগুলো সত্যের অপলাপে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না, তুড়ুক করে চালের মরাই হতে পিতৃসমীপে লাফিয়ে পড়ে, আবার নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্যে অশ্রু গদগদ-কণ্ঠে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ করতে লাগলুম কিন্তু ততক্ষণে ক্রোধান্ধ পিতা আমার আপিল অগ্রাহ্য করে ঘোড়ার গোগালচির মত আমার সামনের লম্বা চুলগুলো ধরে দমাদ্দম প্রহার জুড়ে দিলেন। বাস্তবিক, সে রকম প্রহার আমি জীবনে আশা করিনি। — চপেটাঘাত মুষ্ঠাঘাত, পদাঘাত ইত্যাদি চার হাত-পায়ের যত রকম আঘাত আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, সব যেন রবিবাবুর গানের ভাষায় 'শ্রাবণের ধারার মত' পড়তে লাগল আমার মুখের পরে-পিঠের পরে। সেদিনকার পিটুনি খেয়ে আমার পৃষ্ঠদেশ বেশ বুঝতে পেরেছিল যে, 'পিঠ' নাম সার্থক হয়েছে! একেই আমাদের ভাষায় বলে, 'পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া।' বৃন্দাবন না দেখি তার পরদিনই কিন্তু বাবা আমায় বর্ধমান এনে 'নিউ স্কুলে' ভর্তি করে দিলেন! কি করি, আমি নাচারের মত সব সহ্য কর্‌তে লাগলুম। — কথায় বলে 'ধরে, মারে না, সয় ভালো।'

[গ]

'প্রথম প্রথম শহরে এসে আমার মত পাড়াগেঁয়ে গোঁয়ারকে বিষম বিব্রত হয়ে উঠতে হয়েছিল, বিশেষ করে শহরে ছোকরাদের দৌরাত্মিতে। সে ব্যাটারা পাড়াগাঁয়ে ছেলেগুলোকে যেন ইঁদুর-প্যাঁচার মত পেয়ে বসে। যাহোক, অল্পদিনেই আমি শহুরে

কায়দায় কেতা-দুরস্ত হয়ে উঠলুম! ক্রমে 'অহম' পাড়া গেঁয়ে ভূতই আবার তাদের দলের একজন হুমরো-চুমরো ওস্তাদ ছোকরা হয়ে পড়ল। সেই — আগেকার পগেয়া — খচ্চর ছেলেগুলোই এখন আমায় বেশ একটু সমীহ করে চলতে লাগল। — বাবা, এ শর্মার কাছে বেঁড়ে-ওস্তাদি, এ ছেলে হচ্ছে অষ্টধাতু দিয়ে তৈরী! দেখতে দেখতে পড়ালেখায় যত না উন্নতি করলুম, তার চেয়ে বহুল পরিমাণে উন্নতি করলুম রাজ্যের যত দুষ্টোমির গবেষণায়। তখন আমায় দেখলে বর্ধমানের মত পবিত্র স্থানও তটস্থ হয়ে উঠত। ক্রমে আমাদের মস্ত একটা দল পেকে উঠল। পুলিশের ঘাড়ে দিনকতক এগার-ইঞ্চি ঝাড়তেই তারা আমাদের সঙ্গে গুপ্ত সন্ধি করে ফেল্‌লে। এইরূপ ক্রমেই আমি নিচুদিকে গড়িয়ে যেতে লাগলুম — তাই বলে যে আমাদের দিয়ে কোনো ভালো কাজ হয়নি, তা বলতে পারবে না! মিশন, কুষ্টরোগ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমাদের এই বওয়াটে ছেলের দল যা করছে তার শতাংশের একাংশও করে উঠতে পারে নি ঐ গোবেচারা নিরীহ ছাত্রের দল। তারা আমাদের মত অমন অদম্য উৎসর্গ-ক্ষমতা পাবে কোথায়? তারা তো শুধু বই-এর পোকা। বর্ধমান যখন ডুবে যায়, তখন আমরাই শহরের সিকি লোককে বাঁচিয়েছিলুম, সে সময়ে আমাদের দলের অনেকে নিজের জীবন উৎসর্গ করে আর্তের জীবন রক্ষা করেছিল! কনফারেন্সের, সভা-সমিতির চাঁদা আদায়ের প্রধান উদ্যোগ আয়োজনে প্রধান পাণ্ডা ছিলুম আমরা! আমাদেরই চেষ্টায় 'স্পোর্টস', 'জিমনাস্টিক', 'সার্কাস', 'থিয়েটার', 'ক্লাব' প্রভৃতির আড্ডাগুলোর অস্তিত্ব অনেকদিন ধরে লোপ পায় নি।

পিতার অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও মাসহারাটা ঠিক রকমই পাঠাতেন। তিনি তো আর আমার এতদূর উন্নতির আশা করেন নি, আর এত খবরও রাখতেন না। কারণ কোন ক্লাশে আমার 'প্রমোশন' স্টপ হয় নি। বহু গবেষণার ফলেও হেড মাস্টার মহাশয় আবিষ্কার ককরতে পারেন নি — আমার মত বওয়াটে ছেলেরা কি করে পাসের নম্বর রাখে। ভায়া, ঐখানেই তো genius-এর (প্রতিভার) পরিচয়! — 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।' পরীক্ষার সময় চার-পাঁচজোড়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আমার পেছনে লেগে থাকতই, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যার কূল-কিনারা পান না, তাকে ধরবেন 'পদীর ভাই গৌরিশঙ্কর!' তাছাড়া খালি চুরি বিদ্যায় কি চলে? এতে অনেক মাথা ঘামাতে হয়। পরীক্ষকের ঘর হতে তাঁর ছেলে বা অন্য কোন ক্ষুদ্র আত্মীয়ের থু দিয়ে রজত চক্রের বিনিময়ে খাতাটি বেমালুম বদলে ফেলা, প্রেস হতে প্রশ্ন চুরি, প্রভৃতি অনেক বুদ্ধিই এ শর্মার আয়ত্তে ছিল। সে সব শুনলে তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠবে! — যাহোক, এই রকমেই যেন তেন প্রকারেণ থার্ড ক্লাশের চৌকাঠে পা দিলুম গিয়ে!

বাড়ি খুব কম যেতুম, কারণ পাড়াগাঁ তখন আর ভালো লাগত না। পিতাও বাড়ি না গেলে দুঃখিত হতেন না, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল আমি এইবার একটা কিছু না হয়ে যাই না। আমাদের গ্রামের কুল্লে আমিই পড়তে এসেছিলুম ইংরেজি স্কুলে, তার উপর আমি নাকি পাসগুলো পঙ্খীরাজ ঘোড়ার মত তরাত্তর ডিঙ্গিয়ে যাছিলুম! কেবল একজনের আঁখি দুটি সর্বদাই আমার পথপানে চেয়ে থাকত তিনি আমার স্নেহময়ী জননী! মায়ের মন তো এত শত বোঝেনা, তাই দুমাস বাড়ি না গেলেই মা কেঁদে আকুল হতেন। সংসারে মার কাছে ভিন্ন আর কারুর কাছে একটু স্নেহ-আদর পাইনি! দুষ্ট বদমায়েস ছেলে বলে, আমায় যখন সকলেই মারত, ধমকাত, তখন মা'ই কেবল আমায় বুকে করে সান্ত্বনা দিতেন। আমার এই দুষ্টোমিটাই যেন তার সবচেয়ে ভালো লাগত। আমার পিঠে প্রহরের দাগগুলোয় তেল মালিশ করে দিতে দিতে তার চোখ দিয়ে অশ্রুর নদী বয়ে গেছে!

যখন থার্ড ক্লাশে উঠলুম, তখন বোধ হয় মায়ের জিদেই বাবা আমায় চতুষ্পদ করে ফেললেন, অর্থাৎ বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমি 'কটিদেশ বন্ধনপূর্বক' নানা ওজর আপত্তি দেখাতে লাগলুম কিন্তু মায়ের আদালতে ও তার অশ্রুজলের ওকালতিতে আমার ওজর আপত্তি বাতিল ও নামঞ্জুর হয়ে গেল। কি করি, যখন শুভদৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তো আর কথাই নাই! তাছাড়া, কনেটি মন্দ ছিল না, আজকালকার বাজারে পাড়াগাঁয়ে ওরকম কনে শ'-এ একটি মেলে না! বয়সও বার-তের হয়েছিল। ঐ বার-তের বছরের কিশোরীটিকেই মা নাকি সোমত্থ মেয়ে দেখে বউ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন! আমার বয়স তখন উনিশের কাছাকাছি। এতেই নাকি মেয়েমহলে মাকে কত কথা শুনতে হোত। প্রথম প্রথম কনে বৌ একটি পুটুলিরই মত জড়সড় হয়ে তার নির্দিষ্ট একটি কোণে চুপ করে বসে থাকত। নববধূদের নাকি চোখ তেড়ে চাইতে নেই, তাই সে প্রায়ই চোখ বুঁজে থাকত। কিন্তু অনবরত চোখ বুঁজে থাকা, সেও যে এক বীভৎস ব্যাপার, তাই সে দু-একবার অন্যের অলক্ষ্যে ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নিত, যদি তার এই বেহায়াপনা কেউ দেখে ফেলে, তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি! আমাকে দেখলে তো আর কথাই নেই, নিজেকে কাছিমের মত তৎক্ষণাৎ শাড়ি ওড়না প্রভৃতির ভিতর ছাপিয়ে ফেলতো। তখন একজন প্রকাণ্ড অনুসন্ধিৎসু লোকের পক্ষেও বলা দুঃসাধ্য হয়ে উঠত, ওটা মানুষ, না কাপড়ের একটা বোঁচকা! তবে এটা আমার দৃষ্টি এড়াত না যে, আমি অন্যদিকে চাইলেই সে তার বেনারসী শাড়ির ভিতর থেকে চুরি করে আমার দিকে চেয়ে দেখত, কিন্তু আমি তার দিকে চাইতে না চাইতেই সে সটান চোখ দুটো বুঁজে ফেলে গম্ভীর হয়ে বসে থাকত, যেন আমায় দেখবার তা আদৌ গরজ নেই।আমি মুখ টিপে হাসতে হাসতে পালিয়ে এসে বাড়িময় উচ্চৈঃস্বরে বউয়ের লজ্জাহীনতার কথা প্রকাশ করে ফেলতুম! মা তো হেসেই অস্থির। বলতেন 'হ্যারে, তুই কি জনমভর এই রকম ক্ষ্যাপাই থাকবি?' আমার

ভগ্নিগুলি কিন্তু কিছুতেই ছাড়বার পাত্রী নন, তারা বউ-এর রীতিমত কৈফিয়ত তলব করতেন। সে বেচারীরে তখনকার বিপদটা ভেবে আমার খুব আমোদ হোত, আমি হেসে লুটোপুটি যেতুম। যাহোক এ একটা খেলা মন্দ লাগছিল না। ক্রমে আমি বুঝতে পারলুম, 'কিশোরী কনে' আমায় ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে। আমি কিন্তু পারতপক্ষে তাকে জ্বালাতন করতে ছাড়তুম না। আমার পাগলামির ভয়ে সে বেচারি আমার সঙ্গে চোখাচোখি চাইতে পারত না, কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে সে যে আমার পানে তার পটলচেরা চোখ দুটির ভাসা-ভাসা করুণ দৃষ্টি দিয়ে হাজার বার চেয়ে দেখত, তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতুম, আর গুণ গুণ স্বরে গান ধরে দিতুম —

'সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়ানে,
কেন, কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে।'

ক্রমে আমারও ভালবাসা এই ছেলেমির মধ্যে দিয়ে এক আধটু করে বেরিয়ে পড়তে লাগল। তারপর পরীক্ষা নিকট দেখে শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা আমার আর বাড়িতে থাকা নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। আমি চলে আসার দিনে আর জ্যাঠামি দিয়ে হৃদয় লুকিয়ে রাখতে পারিনি। হাসতে গিয়ে অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত করেছিলুম। সজল নয়নে তার হাত দুটি ধরে বলেছিলুম, আমার সকল দুষ্টোমি ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি, আমায় মনে রেখো। 'সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলে না, কিন্তু তার ঐ চোখের জলই যে বলে দিলে সে আমায় কত ভালবেসে ফেলেছে। আমি ছেড়ে দেবার পর সে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে অব্যক্ত স্বরে কাঁদতে লাগল। আমি চোখ রুমাল চেপে কোন রকমে নিজের দুর্বলতাকে সম্বরণ করে ফেললুম। কে জানত, আমার সেই প্রথম সম্ভাষণই শেষ বিদায়-সম্ভাষণ-আমার সেই প্রথম চুম্বনই শেষ চুম্বন! কারণ, আর তাকে দেখতে পাইনি। আমি চলে আসবার মাস দুই পরেই পিত্রালয়ে সে আমায় চিরজনমের মত কাঁদিয়ে চলে যায়। প্রথম যখন সংবাদটা পেলুম, তখন আমার কিছুতেই বিশ্বাস হল না। এত বড় দুঃখ দিয়ে সে আমায় চলে যাবে? আমার এই আহত প্রাণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, 'না গো না, সে মরতেই পারে না! স্বামীকে না জানিয়ে সে এমন করে চলে যেতে পারে না। সব শত্রু হয়ে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা জানিয়েছে। আমি পাগলের মত রাবেয়াদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলুম। আমায় দেখে তাদের পুরানো শোক আবার নতুন করে জেগে উঠল। বাড়িময় এক উচ্চ ক্রন্দনের হাহাকার রোল আমার হৃদয়ে বজ্রের মত এসে বাজল। আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লুম! — ওগো, আর তার মৌন অশ্রুজল আমার পাষাণ বক্ষ সিক্ত করবে না? একটি কথাও সে বলতে পারেনি সে! সে যাবে না, কখখনো যাবে না। হায় অভিমানিনি! ফিরে এস! ফিরে এস!

সে এল না, যখন নিঝুম রাত্তির, কেউ জেগে নেই, কেবল একটা 'ফেরু'ফেউ ফেউ চিৎকার করে আমার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর করে তুলেছিল,তখন একবার তার গোরের উপর গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লুম — রাবেয়া! প্রিয়তম! একবার ওঠ, আমি এসেছি, সকল দুষ্টোমি ছেড়ে এসেছি। আমার সারা বক্ষ জুড়ে যে তোমারই আলেখ্য আঁকা তাই দেখাতে এই নিভৃত গোরস্থানে নীরব যামিনীতে একা এসেছি। ওঠ, অভিমানিনী রাবেয়া আমার, কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না! কবর ধরে সমস্ত রাত্তির কাঁদলুম, রাবেয়া এল না। আমার চারিদিকে একটা ঘূর্ণিবায়ু হুহু করে কেঁদে ফিরতে লাগল, ছোট্ট শিউলি গাছ থেকে শিশিরসিক্ত ফুলগুলো আমার মাথায় ঝরে পড়তে লাগল। ও রাবেয়ার অশ্রুবিন্দু, না কারুর সান্ত্বনা? দু-একটা ধসে যাওয়া কবরে দপ্ দপ্ করে আলেয়ার আলো জ্বলে উঠতে লাগল। আমি শিউরে উঠলুম। তখন ভোর হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সর্বাঙ্গে তার কবরের মাটি মেখে আবার ছুটে এলাম বর্ধমানে। হায়, সে তো চলে গেল, কিন্তু আমার প্রাণে স্মৃতির যে আগুন জ্বেলে গেল সে তো আর নিবল না। সে আগুন যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আমার বুক যে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল! এই প্রাণ-পোড়ানো স্মৃতির আগুন ছাড়া একটা কোন নিদর্শন যে সে রেখে যায় নি, যাতে করে আমার প্রাণে এতটুকু সান্ত্বনা পেতুম।

সেই যে আঘাত পেলুম, তাতেই আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। আমি আর উঠতে পারলুম না।

[ঘ]

'দিন যায়, থাকে না। আমারও নীরস দিনগুলো কেটে যেতে লাগল কোন রকমে। ক্রমে ফার্স্ট ক্লাশে উঠলুম তখন অনেকটা শুধরেছি। ইতিমধ্যে বর্ধমান 'নিউস্কুল' উঠে যাওয়ায়, তাছাড়া অন্য জায়গায় গেলে কতকটা প্রকৃতিস্থ হতে পারব আশায়, আমি রাণীগঞ্জে এসে পড়তে লাগলুম। আমাদের ভূতপূর্ব হেড-মাস্টার রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ-স্কুলের হেড মাস্টারি পদ পেয়েছিলেন। তাঁর পুরানো ছাত্র বলে তিনি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন, আমিও পড়া-লেখায় একটু মন দিলুম। কিন্তু ইতোমধ্যে আর একটা বিভ্রাট বেধে গেল, আমার আবার বিয়ে হয়ে গেল! তুমি শুনে আশ্চর্য হবে, আমি এ বিয়েতে কোন ওজর-আপত্তি করিনি। তখন আমার মধ্যে সে উৎসাহ, সে একগুঁয়েমি আর ছিল না। রাবেয়ার মৃত্যুর সঙ্গে আমি যেন একেবারেই পরনির্ভরশীল বালকের মতো হয়ে পড়লুম। যে যা বলত তাতে উদাসীনতার মত হাঁ বলে দিতুম। কোন জিনিস তলিয়ে বুঝবার বা নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করার ক্ষমতা যেন আমার আদৌ ছিল না। আমার পাগলামি, হাসি সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এইসব দেখেই বোধ হয় মা আমার আবার বে' দেবার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া আমি আরও ভেবেছিলাম হয়ত এই নবোঢ়ার মধ্যেই আমার রাবেয়াকে ফিরে

পাব, আর তার স্নেহকোমল স্পর্শ হয়ত আমার বুকের দারুণ শোক-যন্ত্রণার মধ্যে শান্তি আনতে পারবে। কিন্তু হায়! যার জীবন চিরকালই এই রকম বিষাদময় হবে বলে বিধাতার মন্তব্য-বহিতে লিখিত হয়ে গেছে, তার 'সবর' ও 'শোকের' ভিন্ন 'নান্যগতি'। তার কপাল চিরদিনই পুড়বে। নববধূ সখিনা দেখতে শুনতে মন্দ নয়, তাই বলে ডানাকাটা পরিও নয়; তার আমার নিজের চেহারার গুণ বিচার না করে ওরকম একটি পরির কামনা করাও অন্যায় ও ধৃষ্টতা। গুণও আমার তুলনায় অনেক বেশি, সে সব বিষয়ে কোথাও খুৎ ছিল না। আজকালকার ছোকরারা নিতান্ত বেহায়ার মত নিজে বৌ পছন্দ করে আনে। নিজের শরীর যে আবলুস কাঠের চেয়েও কাল বা কেঁদ কাঠের চেয়েও এবড়োথেবড়ো সেদিকে দৃষ্টি নেই, কিন্তু বৌটির হওয়া চাই দস্তুরমত দুধে-আলতার রং, হরিণের মত নয়ন, অন্তত পটলচেরা ত চাই-ই, সিংহের মত কটিদেশ, চাঁদের মত মুখ, কোকিলের মত কণ্ঠস্বর, রাজহংসীর মত গমন, রাতুল চরণকমল, কারণ মানভঞ্জনের সময় যদি 'দৈহি পদপল্লব মুদারম' বলে তাঁর চরণ ধরে ধন্না দিতে হয়, আর সেই চরণ যদি God forbid (খোদা না করেন) গদধরের পিসির ঠ্যাং-এর মতই শক্ত কাঠপারা হয়, তাহলে বেচারা একটা আরাম পাওয়া হতে যে বঞ্চিত হয়, আর বেজায় রসভঙ্গও হয়। তৎসঙ্গে আরও কত কি কবিপ্রসিদ্ধির চিজবস্তু, সেসব আমার আর এখন ইয়াদ নেই। এইসব বোকারা ভুলেও ভাবে না যে, মেয়েগুলো নিতান্ত সতীলক্ষ্মী গোবেচারা জাত হলেও তাদেরও একটা পছন্দ আছে। তারাও ভালো বর পেতে চায়। আমরা যত সব পুরুষ মানুষ বেজায় স্বার্থপর বলে তা'দের কোন কষ্ট দেখেও দেখি নে। মেয়েদের 'বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না' ভাব আমি বিলকুল না-পছন্দ করি। অন্ততঃ যার সঙ্গে সারা জীবনটা কাটাতে হবে, পরোক্ষেও যদি তার সম্বন্ধে বেচারিরা কিছু বলতে কইতে না পায়, তবে তাদের পোড়াকপালী নাম সার্থক হয়েছে বলতে হবে। থাক, আমার মত চুনোপুটির এ-সব ছেঁদো কথায় বিজ্ঞ সমাজ কেয়ার তো করবেনই না, অধিকন্তু হয়তো আমার মস্তক লোমশূন্য করে তাতে কোন বিশেষ পদার্থ ঢেলে দিয়ে তাঁদের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিবেন। অতএব আমি নিজের কথাই বলে যাই।

নব-পরিণীতা সখিনার এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে ভালোবাসতে পারলুম না। অনেক 'রিহার্স্যাল' দিলুম, কিছুতেই কিছু হলো না। হৃদয় দিয়ে এ ছিনিমিনি খেলার অভিনয় যেন ভালো লাগছিল না। তাছাড়া তুমি বল্লে হয়ত বিশ্বাস করবে না, রাবেয়া যেন আমার হৃদয় জুড়ে রানির মত সিংহাসন পেতে বসেছিল, সেখানে অন্য কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না। একনিষ্ঠ প্রেমে মানুষকে এতটা আত্মহারা যদি না করে ফেলতে তবে 'কায়েস' মজনু হয়ে লায়লির জন্য এমন করে বনে-পাহাড়ে ছুটে বেড়াত না, ফরহাদের ও রকম পরিণাম হত না। সখিনা কত ব্যথা পাচ্ছে বুঝতে পারতুম, কিন্তু হায় বুঝেও কিছু করতে পারতুম না। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কর্তব্যের অবহেলা

আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধছিল। মা ক্ষুণ্ন হলেন বোনেরা বউকেই দোষী সাব্যস্ত করে তামিল করতে লাগল। কিন্তু কোথায় কি ফাঁক রয়ে গেল জানি না, কিছুতেই তার হৃদয়ের সঙ্গে আমার হৃদয়ের মিশ খেল না। সে কেঁদে মাটি ভিজিয়ে দিলে, তবু আমার মন ভিজল না। অনুশোচনার ও বাক্যজ্বালার যন্ত্রণায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলুম। রাবেয়া আমার বুকে যে আঘাত করে গিয়েছিল তাই সইতে পারছিলুম না, তার উপর — হা খোদা, একি করলুম নিতান্ত অর্বাচীনের মত? এ হতভাগিনীর জীবন কেন আমার সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে ফেললুম? অসহ্য এই বৃশ্চিক যন্ত্রণা কাটার ছুরির মত আমার আগেকার আঘাতটায় খোঁচা মারতে লাগল। আমি পাগল হয়ে যাবার মত হলুম। এরই মধ্যে রাণীগঞ্জে এসে 'টেস্ট একজামিনেশন' দিলুম। সমস্ত বছর হট্টগোলে কাটিয়েছি। পাশ করবো কোত্থেকে? আগেকার সে চুরি বিদ্যায়ও প্রবৃত্তি ছিল না — অর্থাৎ এখন সাফ বুঝতে পাচ্ছ যে, টেস্টে এলাউ হইনি; সুতরাং ওটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এই শুভ সংবাদ কর্ণগোচর হবা মাত্র তিনি কিঞ্চিদধিক এক দিস্তা কাগজ খরচ করে আমায় বিচিত্র সম্ভাষণের উপসংহার জানিয়ে দিলেন যে, আমার মত কুপুত্তুরের লেখাপড়া ঐখানেই খতম হবে তা তিনি বহু পূর্বেই আন্দাজ করে রেখেছিলেন, — অনর্থক এক রাশ টাকা জলে ফেলে দিলেন ইত্যাদি। আমার জানটা তেতবেরক্ত হয়ে উঠল। 'দুত্তোর' বলে দফতর গুটালুম; পরে যা মনে আসতে লাগল তাই করতে লাগলুম। লোকে আমায় বহরমপুর যাবার জন্য বিনা ফি-তে যেচে উপদেশ দিতে লাগল। আমি তাদের কথায় ড্যামকেয়ার করে দিনরাত বোঁ হয়ে রইলুম। দু-চারদিন সইতে সইতে শেষে একদিন বোর্ডিং সুপারিনটেন্ডেন্ট মশাই শুভক্ষণে আমায় অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিলেন। আমি বর্ধমানে চলে এলুম। আমাদের ছত্রভঙ্গদলের গুণ্ডাগণ আমায় সাদরে বরণ করে নিল। পিতা সব শুনে আমায় ত্যাজ্যপুত্র করলেন। এক বৎসর পরে খবর এল সখিনা আমায় নিষ্ঠুর উপহাস করে অজানার রাজ্যে চলে গেছে। মরবার সময়ও নাকি হতভাগিনী আমার মত পাপিষ্ঠের চরণ-ধুলোর জন্য কেঁদেছে, আমার ছেঁড়া পুরানো একটা ফটো বুকে ধরে মরেছে। ক্রমেই আমার রাস্তা ফর্সা হতে লাগল। আরো ছয় মাস পরে মা-ও চলে গেলেন। আমি তখন অট্টহাসি হেসে বোতলের পর বোতল উড়াতে লাগলুম। তারপর শুভক্ষণে পল্টনে এসে সেঁধিয়ে পড়লুম বোম কেদার নাথ বলে! আর এক গ্লাস জল দিতে পার ভাই?

The Story of a Vagabond

[A]

A wayward young man from the Paltan region told me this story one night, in a drunken stupor. What he said is written below. He went to Baghdad and died there.

"Are Bhaiya! Won't you let me go? Will you stick to me like clay? Oh, you're clingier than burnt molasses! Even though you're a classmate of mine, to be honest, I feel a little uncomfortable telling you these things. That's because God made a huge mistake when he created me: he gave me a hide thicker than an elephant's and a heart softer than mud! And so, even if a few laborers pound my skin with sledgehammers, I'll just adjust my mustache and say, 'I don't give a damn.' But if my 'delicate' soul gets even a tiny scratch, I'll wail like a little girl! Your 'one-and-a-half-a-pound' punches only give comfort to my tough hide and produce no other results. But whenever you corner me and say, 'Brother, you have to tell me everything,' my soul trembles, and I feel the geographical truth of the Earth's rotation in my bones. You, too, wouldn't deny that even in your eyes, mustard flowers can bloom and fireflies can light up if you were in such a pitiful state as mine.

[B]

"No, I don't remember much about my childhood. And even if I remember a vague thing or two, there's no real joy or romance in it! It was just like that government-issue Ram-Shyam life. Excessive affection from parents, a total failure in academics, the unrivaled champion of danguli (a traditional stick-and-ball game), an avatar of the mischievous Nandadulal Krishna, and in the group of boys, a miniature version of Alexander the Great with unchallenged influence! Whether the young, old, and women of the village were happy with my favor and disfavor, I can't say by putting my hand on anyone's head. Still, my sharp

ears were not unaware that everyone prayed for my salvation, morning and evening. There's a saying, 'Those who make trouble will fall flat.' So it's obvious that I was no exception to that great epic; in fact, the saying applied to me in a terrible way. Because when the cycle of events caused me to fall flat on the busy pavement of life after being expelled from my mother's womb, even Shubankar (a legendary Bengali mathematician) would give up on counting the hundreds of busy feet that walked over my aching ribs. Let's not bore you and make your blood boil with those uninteresting stories of mine. Want to hear something funny?

"One day, sitting in school, I was imitating Bankim Babu's Mushiram Ghor by reciting, 'My lady Radha! Please look up and eat some molasses!' I didn't get the chance to find out if this broke Lady Radha's pride because, from the wings, came a roar in the Bhujangaprayat meter, 'Hey, you wicked scoundrel!' And our venerable pundit master appeared in the flesh and landed on my neck! This minor had no idea that behind the curtains, our fierce pundit master was waiting, like Bhima from the *jatra* (traditional folk theater). I realized just how much his fiery wrath was greater than Durvasa's when he grabbed my not-so-long ears and started a violent collision between my head and the wall. It's true that the thorough collisions of that time didn't lead to the invention of a new electrical phenomenon, but I can't deny that the 'electricity' in my entire body was running wild. The more my solid body suffered from being beaten like a brickbat, the more my mind suffered from the torrent of his obscene curses. He put some absolutely unpalatable things in the mouths of my forefathers and claimed some extremely impossible close relationships with me. His five-pice worth of consciousness was shaking like a reed above his head. I was also very amused because that day I truly understood the profound meaning of 'the consciousness rises!' When I saw that there was no sign of a comma or a full stop in his poem of blows, I couldn't bear it anymore! You know, a man's anger comes and goes. So did mine. I decided to make an end it right there and landed a medium-sized punch on his hawk-like nose and took off toward my home like a hero! Even at home, I

didn't feel safe. So, fearing my father, I hid away in the rice granary. My intention was that no one would be able to find me so easily from such a secluded place. Who knows what might happen!

"A little later, from my secret hideout, I heard the pundit master, with all his embellishments, was lucidly explaining to my father that a rascally rogue like me was a total failure in studies. And on top of that, for the crime of hitting a teacher's nose and insulting his wife, I would have to swat flies with a broom-like thing in this world like *Lokhutyutu* (a mythical ghost-like creature), which means getting leprosy, and he could also pray to God and arrange for a 'special' punishment for me in hell. At first, I was a little nervous about the curse. I didn't understand the part about insulting the teacher's wife. Later, I realized that the pundit master's better half's name was also Lady *Radha*, and she also had a habit of eating molasses, which was, of course, done behind her husband's back. And I, supposedly, had seen that and had prepared a *hookah* myself for the spoiled Lady Radha and was cajoling her in a tearful, heartbreaking tone, 'My lady Radha, please look up and eat some molasses.' And the pundit master was listening to everything from behind.

"I couldn't bear it anymore. I started fidgeting from inside the rice granary. Meanwhile, the heat had made me sweat profusely. I absolutely didn't know that the pundit master's wife's name was Lady Radha, and I certainly didn't know that she ate molasses. So with so many lies, I couldn't keep my cool. I jumped out of the granary and, standing before my father, started giving irrefutable evidence in a tearful, choked voice to prove my innocence. But by then, my furious father had ignored my appeal and, holding my long hair like a horse's mane, started beating me up. Honestly, I had never expected such a beating in my life. The variety of blows with four hands and feet—slaps, punches, kicks, and so on—that have been invented until today, all started falling on my face and back 'like the showers of *Shravan*,' in the words of Rabindranath Tagore. After getting that beating, my backside clearly understood that the name *pith* (meaning back) was an apt one! This is what we call 'showing Vrindavan by beating.'

"I didn't see Vrindavan, but the very next day, my father brought me to Burdwan and admitted me to 'New School'! What could I do? I, the helpless one, started to bear everything. As the saying goes, 'Don't hit, don't kill, just be good.'

[C]

"At first, a country bumpkin like me was terribly embarrassed after coming to the city, especially by the torment of the city boys. Those guys would pounce on the village boys like they were mice or owls. Anyway, I got used to the city ways in a few days! Gradually, that very country bumpkin 'I' became a big-shot hoodlum of their group. And those former rebellious, stubborn boys now started to show me a little respect. Father, don't mess with this 'Sharma.' This boy is made of eight metals! The more I made progress in studies, the more I made progress in all the mischievous research in the kingdom. Back then, even a holy place like Burdwan would be on high alert when they saw me. Gradually, we formed a big group. After giving the police a hard time for a few days, they made a secret truce with us. Just like that, I started to slide downwards. But you can't say we didn't do any good work! In missions, leprosy, famine, etc., our gang of rascals did a lot, which the poor, innocent student groups couldn't even do one percent of. Where would they get such indomitable dedication? They are just bookworms. When Burdwan was flooded, we saved the city's inhabitants. At that time, many members of our group sacrificed their lives to save the lives of the distressed! We were the main players in the organization of conferences, meetings, and fundraising drives! It was our efforts that kept the existence of places like 'Sports,' 'Gymnastics,' 'Circus,' 'Theater,' and 'Clubs' from disappearing for a long time.

"Even though my father's financial situation was not very good, he used to send my monthly allowance regularly. He never expected me to make such 'progress,' and he didn't keep track either. Because my promotion never stopped in any class. Even after a lot of research, the headmaster couldn't figure out how a good-for-nothing student like me kept getting passing marks. My

friend, that's where the genius lies! 'Cheating is a great skill if you don't get caught.' During exams, four or five pairs of prying eyes would always be on me, but how can Padi's brother Gaurishankar catch someone whom Brahma, Vishnu, and Maheshwar can't find a trace of? Besides, does cheating alone work? It takes a lot of thinking. I was adept at many tricks, like getting my notebook secretly swapped through the examiner's son or some other close relative in exchange for some silver coins, and stealing the question paper from the press, among other things. If you hear about all of them, your eyes will pop out! Anyway, that's how I managed to cross the threshold of the third class!

"I rarely went home because I didn't like the village anymore. My father wasn't sad either when I didn't go home because he believed that I might become something this time. In our entire village, I was the only one who came to an English school, and on top of that, I was skipping classes like the *Pankhiraj* horse! The only person whose eyes were always on my path was my loving mother! A mother's heart doesn't understand so much, so if I didn't go home for two months, my mother would cry her heart out. I didn't get any affection or pampering from anyone in the family except my mother! When everyone used to beat and scold me for being a bad and naughty boy, only my mother would hold me to her chest and console me. It was as if she liked this mischief of mine the most. While massaging oil on the marks of the beatings on my back, a river of tears would flow from her eyes!

"When I got into the third class, my father probably got me married at my mother's insistence, which means he married me off. I raised various objections, 'tying a cloth around my waist,' but in my mother's court and with the advocacy of her tears, my objections were nullified and rejected. What could I do? Once the auspicious glance was cast, there was no turning back! Besides, the bride wasn't bad. These days, in the market, you can't find a bride like her in a village out of a hundred. She was about twelve or thirteen years old. My mother was so determined to marry me to this adolescent girl, thinking she was a young woman! I was close to nineteen at that time. Because of this, my mother had to hear a lot of things from the girls' side of the family. At first, the

bride-wife was like a doll, sitting quietly in her designated corner. Brides are not supposed to look up, so she kept her eyes closed most of the time. But keeping her eyes closed all the time was also a grotesque thing. So, she would occasionally look around in a frightened way when no one was watching. Oh, what if someone saw this shamelessness of hers? Then the *Mahabharata* would become impure! When she saw me, there was no turning back; she would instantly hide herself inside her sari and veil like a tortoise. At that time, it would be difficult for even a great investigative person to say whether it was a human or a bundle of clothes! But it didn't escape my notice that whenever I looked away, she would secretly look at me from inside her *Banarasi sari.* But as soon as I looked at her, she would close her eyes and sit there solemnly, as if she had no need to look at me. I would laugh to myself and run away from home, loudly announcing my wife's shamelessness! My mother would laugh so hard. She would say, 'Hey, will you keep teasing her like this all your life?' My sisters, however, were not the ones to give up. They would demand an explanation from the wife. I would find it very amusing to think about her predicament then, and I would laugh uncontrollably. Anyway, this game wasn't bad. I gradually realized that the 'adolescent bride' had started to love me. I, however, would never miss an opportunity to torment her. Fearing my madness, she couldn't look me in the eye, but I could clearly understand that through the crack of the door, she would look at me with her long, thin eyes with a sad and floating gaze a thousand times. I would hum a song, 'It evokes compassion in a compassionate look. Why, what does it want to say, and it goes away without saying anything.'

"Gradually, a bit of my love also started to show up for this girl. Then, with the exams approaching, my well-wisher father didn't think it was safe for me to stay at home anymore. On the day I was leaving, I couldn't hide my emotions with fake bravado anymore. I cried with tears streaming down my face while trying to smile. With tearful eyes, I held her hands and said, 'Forgive all my mischief, my *Lakshmi*, and remember me.' She couldn't say anything out loud, but her tears said how much she had fallen in

love with me. After I let go of her, she lay on the bed and started crying silently. I pressed my handkerchief to my eyes and somehow controlled my weakness. Who knew that my first greeting would be my last farewell, and my first kiss would be my last kiss! Because I never saw her again. About two months after I left, she went to her father's house and left me crying for the rest of my life. When I first got the news, I couldn't believe it. Would she leave me with such great sorrow? My wounded soul cried out, 'No, no, she cannot die! She cannot leave like this without telling her husband. All the enemies have told you lies against her.' I ran to her father's house like a madman. Seeing me, their old grief was renewed. A loud roar of weeping in the house hit my heart like a thunderbolt. I fainted! Oh, will her silent tears never wet my stony chest again? She couldn't even say one word! She won't go, she will never go. Oh, my proud Rabeya! Come back! Come back!

"She didn't come back. When it was a silent night, and no one was awake, only a *fedu-fedu* cry made my heart beat faster. I went to her grave and fell flat on it. 'Rabeya! My beloved! Wake up once, I have come. I have left all my mischief behind and come. I have come alone to this lonely graveyard in the silent night to show you that your image is painted all over my chest. Wake up, my proud Rabeya, no one will see, no one will know!' I held her grave and cried all night, but Rabeya didn't come. A whirlwind started crying and circling around me. The dew-covered flowers from a small *Shiuli* tree fell on my head. Were those Rabeya's teardrops, or someone's consolation? In a couple of crumbling graves, the light of an *alay* (a ghost light) started flickering. I shivered. By then, it was dawn. With a long sigh, I smeared my whole body with her grave's soil and ran back to Burdwan. Alas, she has gone, but the fire of her memory that she lit in my soul will never go out. That fire is only getting stronger, my chest is burning to ashes! She didn't leave any other sign besides this soul-burning fire of memory, from which my soul could have found a little peace.

"That shock I received broke my ribs into pieces. I could never get up again.

[D]

"Days pass, they don't last. My uninteresting days also started passing somehow. Gradually, I got into the first class. I had improved a lot by then. Meanwhile, the Burdwan 'New School' had been shut down. Also, hoping that I would be able to return to my senses to some extent if I went to another place, I came to Raniganj. Our former Headmaster had become the Headmaster of the Siyarsol Raj School in Raniganj. As his old student, he started to look at me with affectionate eyes, and I also started to pay a little attention to my studies. But in the meantime, another disaster happened: I got married again! You might be surprised to hear that I didn't raise any objections to this marriage. I didn't have that enthusiasm or stubbornness anymore. With Rabeya's death, it was as if I had become like a boy who was entirely dependent on others. Whatever people said, I would just indifferently say yes. It was as if I had no ability to understand things deeply or to express my own opinions. My madness and laughter had dried up and become wood. My mother probably went crazy to marry me off again after seeing all this. Besides, I had also thought that maybe in this new bride, I would get my Rabeya back, and her soft, loving touch would bring some peace to the severe grief in my heart. But alas! For someone whose life was destined to be this sorrowful, according to the creator's book of comments, there is no 'other way' but 'patience' and 'sorrow.' His fate will burn forever. The new bride, Sakina, wasn't bad to look at, but that doesn't mean she was a fairy with her wings cut off. It would be a mistake and rude for me to desire such a fairy without considering the qualities of my own appearance. Her qualities were also much better compared to mine, there was no fault in those matters. Nowadays, boys bring their wives home after choosing them themselves in a very shameless way. They don't look at how their own bodies are darker than ebony wood or rougher than quince wood, but they want their wife to have a proper milk-and-lacquer complexion, eyes like a deer's, at least long and thin, a waist like a lion's, a face like the moon's, a voice like a cuckoo's, a gait like a swan's, and lotus-like feet. Because during a lovers' quarrel, if you have to say, 'Oh, blessed one, place

your feet on my head,' and if those feet, God forbid, are as hard and stiff as a donkey's hooves, then the poor guy is deprived of a certain comfort, and the whole romantic mood is ruined. Besides, there are so many other things from poetic traditions, which I don't remember now. These idiots never think that even if girls are innocent and virtuous, they also have a choice. They also want to get a good husband. We, men, are very selfish, so we look but don't see their pain. I absolutely dislike the 'a girl's heart breaks, but her mouth doesn't' attitude. At least with the person with whom they have to spend their entire life, if the poor girls can't say or express anything about them even indirectly, their fate of having a burnt forehead has come true. Let it be, the learned society will not only not care about these childish words from a small fry like me but might even make my head bald, pour some special liquid on it, and banish me beyond their borders. Therefore, I will just keep talking about myself.

"Despite all these qualities of the new bride, Sakina, I couldn't love her. I gave it many 'rehearsals,' but nothing happened. It was as if I didn't like the performance of this flirtatious game with my heart. Besides, you might not believe me, but Rabeya had seated herself like a queen on the throne of my heart, where no one else had the right to enter. If a person's life wasn't so lost in devoted love, then Qais wouldn't have become Majnu and wandered through forests and mountains for Laila, and Farhad wouldn't have had such a fate. I could understand how much pain Sakina was in, but alas, even after understanding, I couldn't do anything. The neglect of my duties towards my wedded wife was pricking my chest like a thorn. My mother was displeased, and my sisters started to find fault with the wife. But I don't know where the gap was, my heart and her heart just didn't connect. She watered the ground with her tears, but my heart didn't melt. In the pain of regret and words, I ran away from home. I couldn't bear the wound that Rabeya had left on my heart. On top of that—oh God, what did I do like an utter simpleton? Why did I entangle this unfortunate girl's life with mine? This unbearable scorpion-like pain started poking at my old wound like a knife. I felt like I was going crazy.

"In the meantime, I came to Raniganj and took the 'test examination.' I had spent the whole year in chaos. How would I pass? I no longer had the inclination for my old cheating skills. Which means, I now clearly understood that I hadn't been allowed to take the final exam, so there was no need to mention that. As soon as this good news reached my ears, he used a little more than a sheaf of paper to give me an epilogue of various greetings, saying that he had guessed long ago that a bad son like me would end his studies right there, and that he had wasted a bunch of money for nothing, and so on. My soul became bitter. I said, 'To hell with it,' and packed up my things. Then, I started doing whatever came to my mind. People started giving me free advice, urging me to go to Berhampur. I gave a damn about their words and remained deaf day and night. After enduring it for a few days, one day, the boarding superintendent, in an auspicious moment, gave me a half-moon and bid me farewell. I came back to Burdwan. The thugs of our scattered gang welcomed me with honor. My father disowned me after hearing everything. A year later, the news came that Sakina had left for an unknown kingdom, mocking me cruelly. I heard that even at the time of her death, the unfortunate girl had cried for the dust of my feet, a sinner like me, and had died holding an old, torn photo of mine to her chest. Gradually, my path became clear. Six months later, my mother also left. I then laughed a terrible, loud laugh and started drinking bottle after bottle. After that, in an auspicious moment, I came and hid in Paltan, saying *Bom Kedarnath*! Can you get me another glass of water, brother?"

Translated by Alamgir Mohammad

ব্যথার দান

দারার কথা

গোলেস্তান

গোলেস্তান! অনেক দিন পর তোমার বুকে ফিরে এসেছি। আঃ মাটির মা আমার, কত ঠাণ্ডা তোমার কোল! আজ শূন্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার মনে পড়ছে জননীর সেই স্নেহ-বিজড়িত চুম্বন আর অফুরন্ত অমূলক আশঙ্কা, আমায় নিয়ে তাঁর সেই ক্ষুধিত স্নেহের ব্যাকুল বেদনা,... সেই ঘুম-পাড়ানোর সরল ছড়া, —

'ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভ'রে পান দেবো গাল ভ'রে খেয়ো!'

আরও মনে পড়ছে আমাদের মা-ছেলের শত অকারণ আদর-আবদার... সে মা আজ কোথায়?

দু-একদিন ভাবি, হয়তো মায়ের এই অন্ধ স্নেহটাই আমাকে আমার এই বড়-মা দেশটাকে চিনতে দেয়নি। বেহেশত থেকে আবদেরে ছেলের কান্না মা শুনতে পাচ্ছেন কি-না জানি নে, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, মাকে হারিয়েছি বলেই — মাতৃ-স্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হতে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই আজ মার চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি। তবে এও আমাকে স্বীকার করতে হবে, — মা'কে আগে আমার প্রাণ-ভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা অন্তরের অন্তর থেকে দিয়েই আজ মা'র চেয়েও বড় জন্মভূমিকে ভালবাসতে শিখেছি। মা'কে আমি ছোট করছি নে। ধরতে গেলে মা-ই বড়। ভালবাসতে শিখিয়েছেন তো মা। আমার প্রাণে স্নেহের সুরধুনী বইয়েছেন তো মা। আমাকে কাজে-অকাজে এমন করে সাড়া দিতে শিখিয়েছেন যে মা! মা পথ দেখিয়েছেন, আর আমি চলেছি সেই পথ ধরে। লোকে ভাবছে, কি খামখেয়ালি পাগল আমি! কি কাঁটা-ভরা ধ্বংসের পথে চলেছি আমি! কিন্তু আমার চলার খবর মা জানতেন, আর সে কথা শুধু আমি জানি।

আমায় লোকে ঘৃণা করছে? আহা, আমি ঐ তো চাই। তবে একটা দিন আসবেই যে-দিন লোকে আমার সঠিক খবর জানতে পেরে দুফোঁটা সমবেদনার অশ্রু ফেলবেই ফেলবে। কিন্তু আমি হয়তো তা আর দেখতে পাব না। আর তা দেখে অভিমানী স্নেহ-

বঞ্চিতদের মত আমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসবে না। সে-দিন হয়তো আমি থাকব দুঃখ-কান্নার সদূর পারে।

চমন

আচ্ছা মা! তুমি তো মরে শান্তি পেয়েছ, কিন্তু এ কি অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে গেলে আমার প্রাণে? আমি চিরদিনই বলেছি, না — না — না, আমি এ-পাপের বোঝা বইতে পারব না; কিন্তু তা তুমি শুনলে কই? সে-কথা শুধু হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন আমার মনের কথা সব জান আর কি!... এই যে বেদৌরাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলে, এর জন্য দায়ী কে? এখন যে আমার সকল কাজেই বাধা! কোথাও পালিয়েও টিকতে পারছি নে!... আমি আজ বুঝতে পারছি মা, যে, আমার এই ঘর-ছাড়া উদাস মনটার স্থিতির জন্যেই তোমার চির-বিদায়ের দিনে এই পুষ্প-শিকলটা নিজের হাতে আমায় পরিয়ে গিয়েছ। ঐ মালাই তো হয়েছে আমার জ্বালা! লোহার শিকল ছিন্ন করবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু ফুলের শিকল দলে যাবার মত নির্মম শক্তি তো নেই আমার।... যা কঠোর, তার ওপর কঠোরতা সহজেই আসে; কিন্তু যা কোমল পেলব নমনীয়, তাকে আঘাত করবে কে? তারই আঘাত যে আর সইতে পারছি নে।

হতভাগিনী বেদৌরা! সে কথা কি মনে পড়ে — সেই মায়ের শেষ দিন? — সেই নিদারুণ দিনটা? মায়ের শিয়রে মরণের দূত ম্লান মুখে অপেক্ষা করছে — বেদানাপ্লুত তাঁর মুখে একটা নির্বিকার তৃপ্তির আবছায়া ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, — জীবনের শেষ রুধিরটুকু অশ্রু হয়ে তোমার আর আমার মঙ্গলেচ্ছায় আমাদেরই আনত শিরে চুঁইয়ে পড়ছে। মার পূত সে শেষের অশ্রু বেদনায় যেমন উত্তপ্ত, শান্ত স্নেহ-ভরা আশিসে তেমনই স্নিগ্ধ-শীতল! তোমার অযতনে-থোওয়া কালো কোঁকড়ানো কেশের রাশ আমাকে শুদ্ধ ঝেঁপে দিয়েছে, আর তার অনেকগুলো আমাদেরই অশ্রু-জলে সিক্ত হয়ে আমার হাতে গলায় জড়িয়ে গিয়েছে, — আমার হাতের ওপর কচি পাতার মত তোমার কোমল হাত দুটি থুয়ে মা অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে আদেশ করছেন, — 'দারা, প্রতিজ্ঞা কর, — বেদৌরাকে কখনো ছাড়বি নে।'

তার পর তাঁর শেষের কথাগুলো আরও জড়িয়ে ভারি হয়ে এল, — 'এর আর কেউ নেই যে বাপ, এই অনাথা মেয়েটাকে যে আমি আদুরে আর অভিমানী করে ফেলেছি।'

সে কি ব্যথিত-ব্যাকুল আদেশ, গভীর স্নেহের সে কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা!

তার পরে মনে পড়ে বেদৌরা, আমাদের সেই কিশোর মর্মতলে একটু একটু করে ভালবাসার গভীর দাগ, গাঢ় অরুণিমা।... মুখোমুখি বসে থেকেও হৃদয়ের সেই আকুল কান্না, মনে পড়ে কি সে-সব বেদৌরা? তখন আপনি মনে হত, এই পাওয়ার ব্যথাটাই হচ্ছে সব চেয়ে অরুন্তুদ! তা না হলে সাঁঝের মৌন আকাশ-তলে দুজনে

যখন গোলেস্তানের আঙুর-বাগিচায় গিয়ে হাসতে বসতাম তখন কেন আমাদের মুখের হাসি এক নিমিষে শুকিয়ে গিয়ে দুটি প্রাণ গভীর পবিত্র নীরবতায় ভরে উঠতো? তখনও কেন অবুঝ বেদনায় আমাদের বুক মুহুর্মুহু কেঁপে উঠতো? আঁখির পাতায় পাতায় অশ্রু-শীকর ঘনিয়ে আসতো?...

আজ সেটা খুব বেশি করেই বুঝতে পেরেছি বেদৌরা। কেননা, এই যে, জীবনের অনেকগুলো দিন তোমার বিরহে কেটে গেল, তাতে তোমাকে না হারিয়ে আরও বড় করে পেয়েছি। তোমায় যে আমি হারিয়েছিলাম সে তোমাকে এত সহজে পেয়েছিলাম বলেই। বিরহের ব্যথায় জানটা যখন 'পিয়া পিয়া' বলে 'ফরিয়াদ' করে মরে, তখনকার আনন্দটা এত তীব্র যে, তা একমাত্র বিরহীর বুকই বোঝে, তা প্রকাশ করতে আর কেউ কখখনো পারবে না। দুনিয়ায় যত রকম আনন্দ আছে, তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আনন্দময়।

আর সেই দিনের কথাটা? সে-দিন বাস্তবিকই সেটা বড় আঘাতের মতই প্রাণে বেজেছিল! আমার আজও মনে পড়েছে, সে-দিন ফাগুন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে আকাশে বাতাসে ফলে ফুলে পাতায়।... আর সবচেয়ে বেশি করে তরুণ-তরুণীদের বুকে!

আঙুরের ডাঁশা থোকাগুলো রসে আর লাবণ্যে ঢল-ঢল করছে পরিস্তানের নিটোল-স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদশাজাদিদের মত! নাশপাতি-গুলো রাঙিয়ে সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙুল গালের মতো! রস-প্রাচুর্যের প্রভাবে ডালিমের দানাগুলো ফেটে ফেটে বেরিয়েছে কিশোরীদের অভিমানে-স্ফূরিত টুকটুকে অরুণ অধরের মত। পেস্তার পুষ্পিত ক্ষেতে বুলবুলদের নওরোজের মেলা বসেছে। আড়ালে আগডালে বসে কোয়েল আর দোয়েল-বধূর গলা-সাধার ধূম পড়ে গিয়েছে, কি করে তারা ঝঙ্কারে তাদের তরুণ স্বামীদের মশগুল করে রাখবে।... উদ্দাম দখিন হাওয়ার সাথে সাথে ভেসে-আসা একরাশ খোশবুর মাদকতায় আর নেশায় আমার বুকে তুমি ঢলে পড়েছিলে। শিরাজ-বুল্‌বুল্‌-এর 'দিওয়ান' পাশে থুয়ে আমি তোমার অবাধ্য দুষ্টু এলো চুলগুলি সংযত করে দিচ্ছিলাম, আর আমাদের দুজনারই চোখ ছেপে অশ্রু বয়েই চলেছিল।

মিলনের মধুর অতৃপ্তি এই রকমে বড় সুন্দর হয়েই আমাদের জীবনের প্রথম অধ্যায়ের পাতাগুলো উল্টে দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সব ওলট-পালট হয়ে গেল ঠিক যেমন বিরাট বিপুল এক ঝঞ্ঝার অত্যাচারে একটা খোলা বই-এর পাতা ঠিক বিশৃঙ্খল হয়ে যায়।... সে এলোমেলো পাতাগুলো আবার গুছিয়ে নিতে কি বেগই না পেতে হয়েছে আমায়, বেদৌরা!... তা হোক, তবু তো এই 'চমনে' এসে তোমায় ফের পেয়েছি। তুমি যে আমারই। বাঙালি কবির গানের একটা চরণ মনে পড়ছে —

'তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী!'

তারপর সেই ছাড়াছাড়ির ক্ষণটা বেদৌরা, তা কি মনে পড়েছে? আমি শিরাজের বুলবুলের সেই গানটা আবৃত্তি করছিলাম, —

'দেখ্‌নু সে-দিন ফুল-বাগিচায় ফাগুন মাসের ঊষায়,
সদ্য-ফোটা পদ্ম ফুলের লুটিয়ে পরাগ-ভুষায়
কাঁদ্‌চে ভ্রমর আপন মনে অঝোর নয়নে সে,
হঠাৎ আমার পড়ল বাধা কুসুম চয়নে যে!
কইনু, — 'হ্যা ভাই ভ্রমর! তুমি কাঁদছো সে কোন্ দুখে
পেয়েও আজি তোমার প্রিয়া কমল-কলির বুকে?'
রাঙিয়ে তুলে কমল-বালায় অশ্রু-ভরা চুমোয়
বললে ভ্রমর, — 'ওগো কবি, এই তো কাঁদার সময়!
বাঞ্ছিতারে পেয়েই তো আজ এত দিনের পরে,
ব্যথা-ভরা মিলন-সুখে অঝোর ঝরা ঝরে!'

এমন সময় তোমার মামা এসে তোমায় জোর করে, আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল; আমার একটা কথাও বিশ্বাস করলে না। শুধু একটা উপেক্ষার হাসি হেসে জানিয়ে দিলে যে, সে থাকতে আমার মত একটা ঘর-বাড়ি-ছাড়া বয়াটে ছোকরার সঙ্গে বেদৌরার মিলন হতেই পারে না।...

আমার কান্না দেখে সে বললে যে, ইরানের পাগলা কবিদের 'দিওয়ান' পড়ে আমিও পাগল হয়ে গিয়েছি। তোমার মিনতি দেখে সে বললে যে, আমি, তোমাকে যাদু করেছি।

তার পর অনেক দিন ঘুরে ঘুরে কেটে গেল ঐ ব্যাকুল-গতি ঝরনাটার ধারে। যখন চেতন হল, তখনও বসন্ত-উৎসব চলেছে, শুধু তুমিই নেই! দেখলুম, ক্রমেই তোমার আলতা-ছোবানো পায়ের পাতায় পাতায় দাগগুলো নির্ঝরের কূলে কূলে মিশিয়ে আসছে আর রেশমি চুড়ির ভাঙা টুকরোগুলো বালি-ঢাকা পড়ছে।

আমি কখনো মনের ভুলে এ-পারে দাঁড়িয়ে ডাকতুম, — বেদৌরা!...

অনেকক্ষণ পরে পাথরে পাহাড়টা ডিঙিয়ে ও-পার হতে কার একটা কান্না আসতে আসতে মাঝপথে মিলিয়ে যেত — 'রা — আঃ — আঃ!'

সারা বেলুচিস্তান আর আফগানিস্তানের পাহাড় জঙ্গলগুলোকে খুঁজে পেলুম, কিন্তু তোমার ঝর্না-পারের কুটিরটির খোঁজ পেলুম না।

একদিন সকালে দেখলুম, খুব উন্মুক্ত একটা ময়দানে একা একজন পাগলা আস্‌মান-মুখো হয়ে শুধু মারছে, আর সেই সঙ্গে হাত দুটো মুঠো করে কিছু ধরবার

চেষ্টা করছে। আমার বড্ডো হাসি পেল। শেষে বললুম — 'হ্যাঁ ভাই উৎরিঙ্গে! তুমি কি তড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে আকাশ-ফড়িং ধরছ?'

সে আরও লাফাতে লাফাতে সুর করে বলতে লাগল —

'এ-পার থেকে মারলুম ছুরি লাগল কলা গাছে,
হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাবা!'

এতে যে মরা মানুষেরও হাসি পায়। অত দুঃখেও আমি হো-হো করে হেসে বললুম, — 'ভাই, তুমি কি কবি?'

সে খুব খুশি হয়ে চুল দুলিয়ে বললে — 'হাঁ, হাঁ, তাই!'

আমি বললুম, — 'তা তোমার কবিতার মিল হল কই?'

সে বললে, — 'তা নাই বা হল, হাঁটু দিয়ে তোর রক্ত পড়ল তো।' এই বলেই সে আমার নবোদ্ভিন্ন শ্মশ্রুমণ্ডিত গালে চুম্বনের চোটে আমায় বিব্রত করে তুলে বললো, — 'অনিলের নীল রংটাকে সুনীল আকাশ ভেবে ধরতে গেলে সে দূরে সরে গিয়ে বলে, — 'ওগো, আমি আকাশ নই, আমি বাতাস — আমি শূন্য, আমায় ধরা যায় না। আমায় তোমরা পেয়েছ। তবুও যে পাই নি বলে ধরতে আস, সেটা তোমার জবর ভুল।'

এক নিমিষে আমার মুখের মুখর হাসি মূক হয়ে মিলিয়ে গেল। ভাবলাম, হ্যাঁ ঠিকই তো। যাকে ভিতরে, অন্তরে অন্তরে পেয়েছি, তাকে খামখা বাইরের-পাওয়া পেতে এত বাড়াবাড়ি কেন? তাই সে-দিন আমার পোড়ো-বাড়িতে শেষ কান্না কেঁদে বললুম, — 'বেদৌরা! তোমায় আমি পেয়েছি আমার হৃদয়ে — আমার বুকের প্রতি রক্ত-কণিকায়।'...

তারপর এই যে হিন্দুস্থানের অলিতে গলিতে 'কমলিওয়ালে' সেজে ফিরে এলুম, সে তো শুধু ঐ এক ব্যথার সান্ত্বনাটা বুকে চেপেই। ভাবতুম, এমনি করে ঘুরে ঘুরেই আমার জনম কাটবে; কিন্তু তা আর হল কই? আবার সেই গোলেস্তানে ফিরে এলুম! সেখানে আমার মাটির কুঁড়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে, কিন্তু তারই আর্দ্র বুকে যে তোমার ঐ পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে,... তাই আমায় জানিয়ে দিল যে, তুমি এখানে আমায় খুঁজতে এসে না পেয়ে শুধু কেঁদে ফিরেছ!

সেই পাগলটা আবার এসে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, তুমি চমন ফুটে শুকিয়ে যাচ্ছ।...

আমি এসেই তোমায় দূর হতে দেখে চিনেছি। তবে তুমি আমায় দেখে অমন করে ছুটে পালালে কেন? সে কি মাতালের মত টলতে টলতে দৌড়ে লুকিয়ে পড়লে ঐ খোর্মা গাছগুলোর আড়ালে! সে কি অসম্বৃত অশ্রু ঝরে পড়ছিল তোমার! আর কতই সে ব্যথিত অনুযোগ ভরে উঠেছিল সে করুণ দৃষ্টিতে!

কিন্তু কোথা গেলে তুমি? বেদৌরা, তুমি কোথায়?...

বেদৌরার কথা

বোস্তান

মা গো, কি ব্যথিত পাণ্ডুর আকাশ! এই যে এত বৃষ্টি হয়ে গেল, ও অসীম আকাশের কান্না নয় তো? — না, না, এত উদার যে, সে কাঁদবে কেন? আর কাঁদলেও তার অশ্রু আমাদের সঙ্কীর্ণ পাপ-পঙ্কিল চোখে জলের মত বিস্বাদ আর উষ্ণ নয় তো! দেখছ, সে কত ঠাণ্ডা!...

কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছি? একেবারে এক দৌড়ে চমন থেকে এই বোস্তানে এসেছি। তা হোক, এতক্ষণে যেন জানটা ধড়ে এল।... আ মলো! এত হুঁকরে হুঁকরে বুক ফেটে কান্না আসছে কিসের? মানুষের মনের মত আর বালাই নেই। ঐ জ্বালাতেই তো আমায় জ্বালিয়ে খেলে গো! — কি? তার দেখা পেয়েছি বলে এ-কান্না? — তাতে আর হয়েছ কি?

সে যে ফিরে আসবেই, সে তো জানা কথা। কিন্তু এত দিন কেন? এ অসময় কেন? এখন যে আমার মালতীর লতা রিক্তকুসুম। ওগো, এ মরণের তটে এ দুর্দিনে কি দিয়ে বাসর সাজাবো? যদি এলেই, তবে কেন দুদিন আগেই এলে না? তা হলে তো তোমায় এমন করে এড়িয়ে চলে যেতে হতো না! সেই দিনই — যেদিন আবার ঐ চমনের শুকনো বাগানের ধারে তোমায় দেখতে পেয়েছিলাম — সেই দিনই তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতাম, 'এস প্রিয়, ফিরে এস!'

আমরা নারী, একটুতেই যত কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারি, পুরুষেরা তা তো পারে না। তাদের বুকে যেন সব সময়েই কিসের পাথর চাপা। তাই যখন অনেক বেদনায় এই সংযমী পুরুষদের দুটি ফোটা অসম্বরণীয় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তখন তা দেখে না কেঁদে থাকতে পারে, এমন নারী তো আমি দেখি না!

সেদিন যখন কত বছর পরে আমাদের চোখাচোখি হল, তখন কত মিনতি-অনুযোগ আর অভিমান মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল আমাদের চারটি চোখেরই সজল চাউনিতে — হ্যাঁ, আর কেমন 'বেদৌরা' বলে মাথা ঘুরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে ঐ খেজুরের কাঁটা-ঝোপটায় পড়ে গেল! তা দেখে পাষাণী আমি কি করেই সে চোখ দুটো জোর করে দু-হাত দিয়ে চেপে এত দূর যেন কোন অন্ধ অমানুষিক শক্তির বলে ছুটে এলাম?

পুরানো কত স্মৃতি আজ আমার বুক ছেপে উঠছে! সেই গোলেস্তানে এক জোড়া বুলবুলেরই মত মিলনেই অভিমান, মিলনেই বিচ্ছেদ-ব্যথা আর তারই প্রগাঢ় আনন্দে অজস্র অশ্রুপাত! তার চিন্তাটাও কত ব্যথিত-বিধুর। তারপর সেই জুয়াচোরের জের করে আমায় ছিনিয়ে-নেওয়া দয়িতের বুক থেকে, — অনেক কষ্টে তার হাত এড়িয়ে প্রিয়ের অন্বেষণ! — ওঃ কি-ই না করেছে তাকে আবার পেতে! কই তখনও তো সে এল না!

তারপর ভিতরে-বাইরে সে কি দ্বন্দ্ব লেগে গেল! ভিতরে ঐ তর্ক তুষের আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলতে লাগল, আর বাইরে? বাইরে ফাগুনের উদাস বাতাস প্রাণে কামনার তীব্র আগুন জ্বালিয়ে দিলে! ঠিক সেই সময় কোথা থেকে ধূমকেতুর মত সয়ফুল্-মূল্ক এসে আমায় কান-ভাঙানি দিলে — ভালবাসায় কি বিরাট শান্ত স্নিগ্ধতা আর করুণ গাম্ভীর্য, ঠিক ভৈরবী রাগিণীর কড়ি-মধ্যমের মত! আর এই বিশ্রী কামনাটা কত তীব্র — তীক্ষ্ম — নির্মম! এই বাসনার ভোগে যে সুখ, সে হচ্ছে পৈশাচিক সুখ! এতে শুধু দীপক রাগিণীর মত পুড়িয়েই দিয়ে যায় আমাদের! অথচ সেই দীপকের আগুন একবার জ্বলে উঠবেই আমাদের জীবনের নব-ফাল্গুনে। সেই সময় স্নিগ্ধ মেঘ-মল্লারের মত সান্ত্বনার একটা-কিছু পাশে না থাকলে সে যে জ্বলবেই। — দীপক যে তাকে জ্বালাবেই!

তাই তো যে-দিন পুষ্পিত যৌবনের ভারে আমি ঢলে ঢলে পড়ছিলাম, আর একজন এসে আমায় যাঞ্চা করলে, তখন আমার এই বাহিরের প্রবৃত্তিটা দমন করবার ক্ষমতাই যে রইল না। তখন যে আমি অন্ধ! ওগো দেবতা, সে-দিন তুমি কোথায় ছিলে! কেউ যে এল না শাসন করতে তখন! হায়, সেই দিনই আমার মৃত্যু হল! সেই দিনই আমি ভিখারিনী হয়ে পথে বসলাম। ওগো, আমার সেই অধঃপতনের দিনে চোখে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের নিবিড় কালিমা একেবারে ঘন জমাট হয়ে বসেছিল, তখন এখনকার মত এতটুকুও আলোক যে সে-অন্ধকারটাকে তাড়াতে চেষ্টা করে নি। হয়তো একটি রশ্মিরেখার ঈষৎপাতে সব অন্ধকার সে-দিন ছুটে পালাত। তা হলে দেখতো গো, কে আমার সমস্ত হৃদয়-আসন জুড়ে রাজাধিরাজ একচ্ছত্র সম্রাটের মত বসে আছে।

তবু যে আমার এ অধঃপতন হল, তা সে-দিনও বুঝতে পারিনি, আজও বুঝতে পারছি নে, কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু যদি বলি আমার প্রেম — বক্ষের গভীর গোপন-তলে-নিহিত মহান প্রেম, যা সর্বদাই পবিত্র, তা তেমনি পূত অনবদ্য আছে আর চিরকালই থাকবে, তার গায়ে আঁচড় কাটে বাইরের কোন অত্যাচার-অনাচারের এমন ক্ষমতা নেই, — তা হলে কে বুঝবে? কেই বা আমায় ক্ষমা করবে? তবুও আমি বলব, প্রেম চিরকালই পবিত্র, দুর্জয়, অমর, পাপ চিরকালই কলুষ, দুর্বল আর ক্ষণস্থায়ী।

ওঃ — মা! কি অসহ্য বেদনা এই সারা বুকের পাঁজরে পাঁজরে!... কি সব ভুল বকছিলাম এতক্ষণ? ঠিক যেন খোওয়াব দেখছিলাম, না?... পাপ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু নদীর বান-ভাসির পর যেমন বান রেখে যায় সঙ্কোচের পলির একটা পর্দা, সেটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী নয়, সেটা হয়তো অনেকেরই সারা জীবন ধরে থাকে। পাপী নিজেকে সামলে নিয়ে হাজার ভাল করে চললেও ভাবে, আমার এ দুর্নাম তো সারাজীবন কাদা-লেপ্টা হয়ে লেগেই থাকবে! চাঁদের কলঙ্ক পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাও যে ঢাকতে পার না!

এই পাপের অনুশোচনাটাও কত বিষাক্ত — তীক্ষ্ণ! ঠিক যেন এক সঙ্গে হাজার হাজার সূঁচ বিঁধছে বুকের প্রতি কোমল জায়গায়।...

আবার আমার মনে পড়ছে সেই আমায় বিপথে টেনে নেওয়া শয়তান সয়ফুল্-মুল্‌কের কথা। সে-ই তো যত 'নষ্ট গুড়ের খাজা'। এখন তাকে পেলে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতাম।

আমরা নারী, — মনে করি, এতটুকুতেই আমাদের হৃদয় অপবিত্র হয়ে গেল, আর অনুশোচনায় মনে মনে পুড়ে মারি। আমরা আরও ভাবি যে, হয়তো পুরুষদের অত সামান্যতে পাপ স্পর্শে না। আর তাদের মনে এত তীব্র অনুশোচনাও জাগে না। কিন্তু সেই যে সে-দিন, যে-দিন আমার বাসনার পিয়াস শুকিয়ে গিয়েছে, আর মধু ভেবে কণ্ঠ হলাহল পানের তীব্র জ্বালায় ছট্-ফট্ করছি, আর ঠিক সেই সময় সহসা বিরাট বিপুল হয়ে আমার ভিতরের প্রেমের পবিত্রতা অপ্রতিহত তেজে জেগে উঠেছে — সে তেজ চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে, — সে-দিন — ঠিক সেই দিন — সয়ফুল্-মুল্‌ক সহসা কি রকম ছোট হয়ে গেল! একটা দুর্বার ঘৃণামিশ্রিত লজ্জার কালিমা তার মুখটাকে কেমন বিকৃত করে দিলে! সে দূর থেকে কেমন আমার দিকে একটা ভীত-চকিত দৃষ্টি ফেলে উপর দিকে দুহাত তুলে আর্তনাদ করে উঠল, — 'খোদা! আমি জীবন দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। তবে যেন সে-জীবন মঙ্গলার্থেই দিতে পারি, শুধু এইটুকু করো খোদা!

তারপর কেমন সে উন্মাদের মত ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললে, — 'দেবি, ক্ষমা করো এ শয়তানকে! দেবীর দেবীত্ব চিরকালই অটুট থাকে, বাইরের কলঙ্কে তা কলঙ্কিত হয় না, বরং সংঘর্ষের ফলে তা আরও মহান উজ্জ্বল হয়ে যায়! কিন্তু আমি? — আমি? ওঃ, ওঃ, ওঃ! সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। তার সে-ছোটা থেমেছে কিনা জানিনে।

কিন্তু এ কি? আবার আমার মনটা কেন আমাকে যেন ভাঙানি দিচ্ছে শুধু একবার দেখে আসতে যে, তিনি অমনি করে সেই খেজুর-কাঁটার ঝোপে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন কিনা!... না, না, — এ প্রাণ-পোড়ানি আর সইতে পারি নে গো — আর সইতে পারি নে! হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে দেখা করবই করব, একবার শেষ দেখা, তারপর বলব তাকে, ওগো, তোমার সে বেদৌরা আর নেই, — সে মরেছে, মরেছে। তার প্রাণ তোমারই সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে! তুমি তাকে বৃথা এমন করে খুঁজে বেড়াচ্ছো! বেদৌরা নেই — নেই — নেই।

তারপর — তার পর? তারপরেও যদি তিনি আমায় চান, তাহলে কি বলব তাঁকে, কি করব তখন? — না, তখনও এমনি শক্ত কাঠ হয়ে বলব, — ছুঁয়ো না

ছুঁয়ো না গো দেবতা, ছুঁয়ো না! আমার এ অপবিত্র দেহ ছুঁয়ে তোমার পবিত্রতার অবমাননা করো না।

আঃ! মা! গো! কি ব্যথা! বুকের ভিতরটা কে যেন ছুরি হেনে খান খান করে কেটে দিচ্ছে!...

দারার কথা

গোলেস্তান

তুমি কি সেই গোলেস্তান? তবে আজ তুমি এত বিশ্রী কেন? তোমার ফুলে সে সৌন্দর্য নেই, শুধু তাতে নরকের নাড়ি ওঠে আসা পূতিগন্ধ! তোমার আকাশ আর তেমন উদার নয়, কে যেন তাকে পঙ্কিল ঘোলাটে করে দিয়েছে! তোমার মলয় বাতাসে যেন লক্ষ হাজার কাচের টুকরা লুকিয়ে রয়েছে! তোমার সারা গায়ে যেন বেদনা!...

কি করলে বেদৌরা তুমি? বেদৌরা! — নাঃ, এই যে ব্যথা দিলে তুমি, — এই যে প্রাণ-প্রিয়তমের কাছ থেকে পাওয়া নিদারুণ আঘাত, এতেও নিশ্চয়ই খোদার মঙ্গলেচ্ছা নিহিত আছে! আমি কখনই ভুলব না খোদা, যে, তুমি নিশ্চয়ই মহান আর তোমার দেওয়া সুখ-দুঃখ সব সমান ও মঙ্গলময়! তোমার কাজে অমঙ্গল থাকতে পারে না, আর তুমি ছাড়া ভবিষ্যতের খবর কেউ জানে না! ব্যথিতের বুকে এই সান্ত্বনা কি শান্তিময়!

আচ্ছা, তবু মন মানছে কই? কেন ভাবছি, এ নিশ্চয়ই আঘাত? তৃষাতুর চাতক যখন — 'ফটিক জল — ফটিক জল করে কেঁদে কেঁদে মেঘের কাছে এসে পৌঁছে, আর নিদারুণ মেঘ তার বুকে বজ্র হেনে দিয়ে বিদ্যুৎ-হাসি হাসে, তখন কেন মনে করি, এ মেঘের বড়ই নিষ্ঠুরতা! — কেন?

কিন্তু এত দিনেও নিজের স্বরূপ জানতে পারলুম না! আগে মনে করতুম আমি কত বড় কত উচ্চ! আজ দেখছি, সাধারণ মানুষের চেয়ে আমি এক রত্তি বড় নই! আমার মন ও তাদের মন অমনি সঙ্কীর্ণতা আর নীচতায় ভরা নৈলে আমি বেদৌরার এ দোষ সরল মনে ক্ষমা করতে পারলুম না কেন? হোক না কেন যতই বড় সে দোষ! বাহিরটা তার নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু ভিতরটা যে অমনি পবিত্র আর শুভ্র রয়েছে! অনেকে যে ভিতরটা অপবিত্র করে বাহিরটা পবিত্র রাখার চেষ্টা করে, সেইটাই হচ্ছে বড় দোষ। কিন্তু এই যে বেদৌরার সহজ সরলতায় তার ভিতরটা পবিত্র রয়েছে জেনেও তাকে প্রাণ খুলে রক্ষা করতে পারলুম না, সে দোষ তো আমারই; কেননা আমি এখনও অনেক ছোট। জোর করে বড় হবার জন্য একবার ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয়েছিল বটে, কিন্তু তা তো হতে পারে না। সে যে হৃদয় হতে নয়! নাঃ, আমাকে

পুড়ে খাঁটি হতে হবে। খুব দূর থেকে যদি মনটাকে ঠিক করতে পারি, তবেই আবার ফিরে আসব নইলে নয় ওঃ, কী নীচ আমি! প্রথমে বেদৌরার মুখ থেকে তার এই পতনের কথা শুনে আমিও তো একেবারে নরক-কুণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছিলুম। মনে করেছিলুম, আমিও এমনি করে আমার সুপ্ত কামনায় ঘৃতাহুতি দিয়ে বেদৌরার ওপর শোধ নেব। তারপর নরকের দ্বার থেকে কেমন করে হাত ধরে অশ্রু মুছিয়ে আমায় কে যেন ফিরিয়ে আনল। সে বেশ শান্ত স্বরেই বললে, — এ প্রতিশোধ তো বেদৌরার ওপর নয় ভাই, এ প্রতিশাধ তোমার নিজের ওপর! ভাবলুম, তাই তো অভিমানের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে এ কি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলুম! আমি আবার ফিরলুম।

তারপর বেদৌরাকে বলে এলুম, — 'বেদৌরা! যদি কোন দিন হৃদয় হতে ক্ষমা করবার ক্ষমতা হয় তবেই আবার দেখা হবে, নইলে এই আমাদের চিরবিদায়! মুখে জোর করে ক্ষমা করলুম বলে তোমায় গ্রহণ করে আমি তো একটা মিথ্যাকে বরণ করে নিতে পারি নে। আমি চাই, প্রেমের অঞ্জন আমার এই মনের কালিমা মুছিয়ে দিক।

বেদৌরা অশ্রু ভরা হাসি হেসে বললে, — ফিরতেই হবে প্রিয়তম, ফিরতেই যে হবে তোমার! এ সংশয় দু-দিনই কেটে যাবে দেখবে, আমাদের সেই ভালবাসা কেমন ধৌত শুভ্র বেশে আরও গাঢ় পূত করে দিয়েছে! আমি তোমারই প্রতীক্ষায় গোলেস্তানের এই ক্ষীণ ঝরনাটার ধারে বসে গান আর মালা গাঁথব। আর তা যে তোমায় পরতেই হবে। ব্যথার পূজা ব্যর্থ হবার নয় প্রিয়!...

কোথায় যাই এখন, আর সে কোন পথে? ওগো আমার পথের চিরসাথি, কোথায় তুমি?

সয়ফুল্-মুল্‌কের কথা

* * *

আমি সেই শয়তান, আমি সেই পাপী, যে এক দেবীকে বিপথে চালিয়েছিল। ভাবলুম, এই ভুবনব্যাপী যুদ্ধে যে-কোনো দিকে যোগ দিয়ে যত শিগগির পারি এই পাপ-জীবনের অবসান করে দিই। তারপর? তারপর আর কি? যা সব পাপীদের হয়, আমারও হবে।

পাপী যদি সাজা পায়, তাহলে সে এই বলে শান্তি পায় যে, তার ওপর অবিচার করা হচ্ছে না, এই শাস্তিই যে তার প্রাপ্য। কিন্তু না পেলে ভিতরের বিবেকের যে দংশন, তা নরক-যন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক।

যা ভাবলুম, তা আর হল কই! ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছে। এরা মনে করছে, এদের এই মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে

অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিল যে, কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা-প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তিসঙ্ঘের একজন। আমার কালো বুকে অনেকটা তৃপ্তির আলোক পেলুম!

খোদা, আজ আমি বুঝতে পারলুম, পাপীকেও তুমি ঘৃণা কর না, দয়া কর। তার জন্যেও সব পথই খোলা রেখে দিয়েছ। পাপীর জীবনেরও দরকার আছে। তা দিয়েও মঙ্গলের সলতে জ্বালানো যায়। সে ঘৃণ্য অস্পশ্য নয়!

কিন্তু সহসা এ কি দেখলুম? দারা কোথা থেকে এখানে এল? সে-দিন তাকে অনেক করে জিজ্ঞেস করায় সে বললে, 'এর চেয়ে ভাল কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না, তাই এ-দলে এসেছি।'

আঘাত খেয়ে খেয়ে কত বিরাট গম্ভীর হয়ে গিয়েছে সে। আমাকে ক্ষমা চাইতেই হবে যে এই বেদনাতুর যুবকের কাছে; নইলে আমার কোথাও ক্ষমা নেই। এর প্রাণে এই ব্যথার আগুন জ্বালিয়েছি তো আমিই, একে গৃহহীন করেছি তো আমিই।

কি অচিন্ত্য অপূর্ব সমসাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করছে দারা। সবাই ভাবছে, এত অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্যে হাসতে হাসতে যে এমন করে বুকের রক্ত দিচ্ছে, সে বাস্তবিকই বীর, আর তাদের জাতিও বীরের জাতি! এমন দিন নেই, যে দিন একটা-না-একটা আঘাত আর চোট না খেয়েছে সে। সে-দিকে কিন্তু দৃষ্টিই নেই তার। সে যেন অগাধ অসীম এক যুদ্ধ-পিপাসা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে মৃত্যুর মত কঠোর হয়ে অন্যায়কে আক্রমণ করছে। যতক্ষণ এতটুকুও জ্ঞান থাকে তার, ততক্ষণ কার সাধ্য তাকে যুদ্ধস্থল থেকে ফেরায়! কি একরোখা জেদ! আমি কিন্তু বুঝতে পারছি, এ সংগ্রাম তার বাইরের জন্য নয়, এ যে ভিতরের ব্যথার বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান। আমি জানি, হয় এর ফল অতি বিষময়, নতুবা খুবই শান্ত-সুন্দর!

কদিন থেকে বোমা আর উড়োজাহাজ হয়েছে এর সঙ্গী। বাইরে ভিতরে এত আঘাত এত বেদনা অম্লান বদনে সহ্য করে কি করে একাদিক্রমে যুদ্ধ জয় করছে এই উন্মাদ যুবক? ভয়টাকে যেন আরব সাগরে বিসর্জন দিয়ে এসেছে!

আজ সে একজন সেনাপতি। কিন্তু এ কি অতৃপ্তি এখনও তার মুখে বুকে জাগছে! রোজই জখম হচ্ছে, কিন্তু তাকে হাসপাতালে পাঠায় কার সাধ্য! গোলন্দাজ সৈনিককে ঘুমাবার ছুটি দিয়ে ভাঙা-হাতেই সে কামান দাগছে। সেনাপতি হলেও সাধারণ সৈনিকের মত তার হাতে গ্রেনেডের আর বোমার থলি, পিঠে তরল আগুনের বালতি, আর হাতে রিভলভার তো আছেই। রক্ত বইছে, লোককে হত্যা করে তার যে কি আনন্দ, সে আর কি বলব! সে বলছে, — পরাধীন-লোক যত কমে ততই মঙ্গল।

আমি অবাক হচ্ছি, এ সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে যায়নি তো।

* * *

এ কি করলে খোদা। এ কি করলে? এত আঘাতের পরেও হতভাগা দারাকে অন্ধ আর বধির করে দিলে? এই পৈশাচিক যুদ্ধ-তৃষ্ণার ফলে যে এই রকমই একটা কিছু হবে, তা আমি অনেক আগে থেকেই ভয় করছিলাম। আচ্ছা করুণাময়, তোমার লীলা আমরা বুঝতে পারিনে বটে, কিন্তু এই যে নিরাপরাধ যুবকের চোখ দুটো বোমার আগুনে অন্ধ আর কান দুটো বধির করে দিলে, আর আমার মত পাপী শয়তানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগল না, এতেও কি বলব যে, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা লুকানো রয়েছে? কি সে মঙ্গল, এ অন্ধকে দেখাও প্রভু, দেখাও! এ অন্ধের দাঁড়াবার যষ্টিও যে ভেঙে দিয়েছি আমি! তবে আমার বাহিরটা অক্ষত রেখে ভিতরটাকে এমনি ছিন্ন-ভিন্ন আর ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে? ওগো ন্যায়ের কর্তা! এই কি আমার দণ্ড, — এই বিশ্বব্যাপী অশান্তি?...

* * *

আজ আমাদের ঈপ্সিত এই প্রধান জয়োল্লাসের দিনেও আমাদের জয়-পতাকাটা রাজ-অট্টালিকার শিরে থর থর করে কাঁপছে! বিজয়-ভেরীতে জয়নাদের পরিবর্তে যেন জান-মোচড়ানো শ্রান্ত 'ওয়ালট্‌জ-রাগিণীর আর্ত সুর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বেরুচ্ছে! তূর্য-বাদকের স্বর ঘন ঘন ভেঙে যাচ্ছে! আজ অন্ধ সেনানী দারার বিদায়ের দিন! অন্ধ-বধির-আহত দারা যখন আমার কাঁধে ভর করে সৈনিকদের সামনে দাঁড়াল, তখন সমস্ত মুক্তিসেবক সেনার নয়ন দিয়ে হু-হু করে অশ্রুর বন্যা ছুটেছে। আমাদের কঠোর সৈনিকদের কান্না যে কত মর্মন্তুদ, তা বোঝাবার ভাষা নেই। মুক্তিসেবক-সৈন্যাধ্যক্ষ বললেন, তাঁর স্বর বারংবার অশ্রুজড়িত হয়ে যাচ্ছিল, — 'ভাই দারাবী! আমাদের মধ্যে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস্', 'মিলিটারি ক্রস্' প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় না, কেন না আমরা নিজে নিজেই তো আমাদের কাজকে পুরস্কৃত করতে পারিনে। আমাদের বীরত্বের, ত্যাগের পুরস্কার বিশ্ববাসীর কল্যাণ; কিন্তু যারা তোমার মত এই রকম বীরত্ব আর পবিত্র নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখায়, আমরা শুধু তাদের বীর বলি।'

সৈন্যাধ্যক্ষ পুনরায় ঢোক গিলে আর কোটের আস্তিনে তাঁর অবাধ্য অশ্রু-ফোঁটা কটি মুছে নিয়ে বললেন, — 'তুমি অন্ধ হয়েছ, তুমি বধির হয়েছ, তোমার সারা অঙ্গে জখমের কঠোর চিহ্ন, — আমরা বলব, এই তোমার বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার! অনাহূত-তুমি বিশ্বের মঙ্গল-কামনায় প্রাণ দিতে এসেছিলে, তার বিনিময় খোদা নিজ হাতে যা দিয়েছেন, — হোক না কেন তা বাইরের চোখে নির্মম — তার বড় পুরস্কার, মানুষ আমরা কি দেব ভাই? 'খোদা নিশ্চয়ই মহান এবং তিনি ভাল কাজের জন্য লোকদের পুরস্কৃত করেন!' — 'এ যে তোমাদের পবিত্র কোরআনের বাণী। অতএব হে বীর সেনানী হয়তো তোমার অন্ধত্ব ও বধিরতার বুকেই সব শান্তি সব সুখ সুপ্ত রয়েছে। খোদা তোমায় শান্তি দিন!'

দারা তার দৃষ্টিহীন চোখ দুটি দিয়ে যতদূর সাধ্য সৈনিকগণের দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করে অশ্রুচাপা কণ্ঠে শুধু বলতে পেরেছিল — 'বিদায়, পবিত্র বীর ভাইরা আমার!'

আমিও অন্ধ দারার সঙ্গে আবার এই গোলেস্তানেই এলাম! আর এই তো আমার ব্যর্থ জীবনের সান্ত্বনা, এই নির্বিকার বীরের সেবা! দারা আমায় ক্ষমা করছে, আমায় সখা বলে কোল দিয়েছে! এতদিনে না হতভাগ্য যুবকের রিক্ত জীবন সার্থকতার পুষ্পে পুষ্পিত হয়ে উঠল! এতদিন না সত্যিকার ভালবাসায় তাকে ঐ অসীম আকাশের মতই অনন্ত উদার করে দিলে! রাস্তায় আসতে আসতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, — 'আচ্ছা ভাই, তুমি বেদৌরাকে ক্ষমা করেছ?'

সে কান্না-ভরা হাসি হেসে সাধকশ্রেষ্ঠ প্রেমিক রুমীর এই গজলটা গাইলে, —

'ওগো প্রিয়তম! তুমি যত বেদনার শিলা দিয়ে
আমার বুকে আঘাত করেছ, আমি তাই দিয়ে যে
প্রেমের মহান মসজিদ তৈরী করেছি!'

আমার বিশ্বাস, শিশুদের চেয়ে সরল আর কিছু নেই দুনিয়ায়! দারাও প্রেমের মহিমায় যেন অমনি সরল শিশু হয়ে পড়েছে। তার মুখে কেমন সহজ হাসি, আবার কেমন অসঙ্কোচ কান্না! তা কিন্তু অতি বড় পাষাণকেও কাঁদায়! আমি সেদিন হাসতে হাসতে বললাম, — 'হ্যাঁ ভাই, এই যে তুমি অন্ধ আর বধির হয়ে গেলে, এতে মঙ্গলময়ের কোন মঙ্গলের আভাস পাচ্ছ কি?'

সে বললে, — 'ওরে বোকা, এই যে তোদের আজ ক্ষমা করতে পেরেছি — এই যে আমার মনের সব গ্লানি সব ক্লেদ ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে, সে এই অন্ধ হয়েছি বলেই তো, — এই বাইরের চোখ দুটোকে কানা করে আর শ্রবণ দুটোকে বধির করেই তো! অন্ধেরও একটা দৃষ্টি আছে, সে হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি যা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি। এখন আমি দেখছি দুনিয়া-ভরা শুধু প্রিয়ার রূপ আর তারই হাসির অনন্ত আলো! আর এই কালা কান দুটো দিয়ে কি শুনছি, জানিস? শুধু তার কানে কানে-বলা গোপন-প্রেমালাপের মঞ্জু গুঞ্জন আর চরণ-ভরা মঞ্জীরের রুনু-ঝুনু বোল! — আমি যে এই নিয়েই মশগুল!' বলেই অভিভূত হয়ে সে গান সে ধরলে, —

'যদি আর কারে ভালবাস, যদি আর নাহি ফিরে আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো!
আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো,
তুমি ছাড়া মোর এ জগতে আর কেহ নাই কিছু নাই গো।'

কানাড়া রাগিণীর কোমল গান্ধারে আর নিখাদে যেন তা সমস্ত আবিষ্ট বেদনা মূর্তি ধরে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁদে যাচ্ছিল! কিন্তু কত শান্ত-স্নিগ্ধ বিরাট নির্ভরতা আর ত্যাগ এই গানে!

সবচেয়ে আমার বেশি আশ্চর্য বোধ হচ্ছে যে, বেদৌরাও আমাকে ক্ষমা করেছে, অথচ তার এ-বলায় এতটুকু কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা নেই। এ যেন প্রাণ হতে ক্ষমা করে বলা!

খোদা, তুমি মহান! 'যার কেউ নেই তুমি তার আছ।' এই প্রেমিকদের সোনার কাঠির স্পর্শে আমি-যে-আমি, তারও আর কোন গ্লানি নেই, সঙ্কোচ নেই! আজ এই বিনা কাজের আনন্দ — ওঃ, কত মধুর আর সুন্দর!

বেদৌরার কথা

গোলেস্তান

(নির্ঝরের অপর পার)

তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন একেবারে প্রাণ খুলে, হৃদয় হতে! এবার এ-ক্ষমায় এতটুকু দীনতা নেই। এ যে হবেই, তা তো আমি জানতামই, আর তাই যে এমন করে আমার প্রতীক্ষার সকাল-সাঁঝগুলো আনন্দে কেটে গিয়েছে! আমার এই আশায় বসে-থাকা দিনগুলো, বিরলে-গাঁথা ফুলহারগুলো আর বেদনাবারিসিক্ত বিরহ-গানগুলো তাঁরই পায়ে ঢেলে দিয়েছি। তিনি তা গলায় তুলে তার বিনিময়ে যা দিয়েছেন, সেই তো গো তাঁর আমায়-দেওয়া ব্যথার দান!

তিনি বললেন, — 'বেদৌরা! কামনা আর প্রেম, এ দুটো হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা আর প্রেম হচ্ছে ধীর, প্রশান্ত ও চিরন্তন। কামনার প্রবৃত্তি বা তার নিবৃত্তিতে হৃদয়ের দাগ-কাটা ভালবাসাকে যে ঢাকতেই পারে না, এ হচ্ছে ধ্রুব সত্য। এই রকম বিড়ম্বিত যে বেচারারা এই কথাটা একটু তলিয়ে দেখে ধীরভাবে বিশ্বাস করে না, তারা মস্ত ভুল করে, আর তাদের মত হতভাগ্য অশান্ত জীবনও আর কারুর নেই। বাদলার দিনে কালো মেঘগুলো সূর্যকে গ্রাস করতে যতই চেষ্টা করুক, তা কিন্তু পারে না। তবে তাকে খানিকক্ষণের জন্য আড়াল করে থাকে মাত্র। কেননা সূর্য থাকে মেঘের নাগাল পাওয়ার অনেক দূরে। কোন ফাঁকে আর সে কেমন করে যে অত মেঘের পুরু স্তর ছিঁড়ে রবির কিরণ দুনিয়ার বুকে প্রতিফলিত হয়, তা মেঘেও ভেবে পায় না, আর আমরাও জানতে চেষ্টা করি নে। তারপর মেঘ কেটে গেলেই সূর্য হাসতে থাকে আরও উজ্জ্বল হয়ে। কারণ, তাতে তো সূর্যের কোন অনিষ্ট হয় না, — সে জানে, সে যেমন আছে তেমনি অটুট থাকবেই; ক্ষতি যা তোমার আমার — এই দুনিয়ার। তাই বলে কি বাদলের মেঘ আসবে না? সে এসে আকাশ ছাইবে না? সে আসবেই, ও যে স্বভাব; তাকে কেউ রুখতে পারবে না। তবে অত বাদলেও সূর্য-কিরণ পেতে হলে মেঘ ছাড়িয়ে উঠতে হয়। সেটা তেমন

সোজা নয়, আর তা দরকারও করে না। কামনাটা হচ্ছে ঠিক বাদলের মতো; আর প্রেম জ্বলছে হৃদয়ে ঐ রবিরই মত এইভাবে সমান ঔজ্জ্বল্যে!

'কামনায় হয়তো তোমার বাহিরটা নষ্ট করেছে, কিন্তু ভিতরটা তো নষ্ট করতে পারে নি, তা ছাড়া, ও না হলে যে তুমি আমাকে এত বেশি করে চিনতে না, এত বড় করে পেতে না, বাইরের বাতাস প্রেমের শিখা নিবাতে পারে না, আরও উজ্জ্বল করে দেয়। আর আমার অন্ধত্ব ও বধিরতা? ওর জন্যে কেঁদো না বেদৌরা, এ-গুলো না থাকলে তো আমি তোমায় আর পেতাম না!'

পুষ্পিত সব গাছ থেকে অশ্রুচাপা কণ্ঠে 'পিয়া পিয়া' করে বুলবুলগুলো উড়ে গেল!

তিনি আবার বললেন, — 'দেখ বেদৌরা, আজ আমাদের শেষ বাসর-শয্যা হবে। তারপর রবির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি চলে যাবে নির্ঝরটার ও-পারে, আর আমি থাকব এ-পারে। এই দু-পারে থেকে আমাদের দু-জনেরই বিরহ-গীতি দুইজনকে ব্যথিয়ে তুলবে। আর ঐ ব্যথার আনন্দেই আমরা দু-জনে দু-জনকে আরও বড় — আরও বড় করে পাব!'

সেই দিন থেকে আমি নির্ঝরটার এ-পারে।

আমারও অশ্রু-ভরা দীর্ঘশ্বাস হু হু করে ওঠে, যখন মৌন-বিষাদে-নীরব সন্ধ্যায় তাঁর ভারি চাপা কণ্ঠ ছেপে একটা ক্লান্ত রাগিণী ও-পার হতে কাঁদতে কাঁদতে এ-পারে এসে বলে, —

'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন!'

The Offering of Pain

Dara's Account

Golestan! *Golestan*! After many days, I've returned to your embrace. Oh, my mother earth, how cool is your lap! Standing in the empty courtyard today, my first thought is of my mother's loving kisses and her endless, baseless anxieties about me, her desperate agony of hungry affection... that simple lullaby:

"Aunties of sleep, put us to sleep and go,
I'll fill your betel box, eat your fill!"

I also remember our countless baseless affections and demands as mother and son... where is that mother today? For a day or two, I think, perhaps it was my mother's blind affection that prevented me from truly knowing this great motherland of mine. I don't know if my mother in paradise can hear her pampered son crying, but I can say for sure that only by losing my mother, only by that immense chain of maternal affection breaking on its own, have I been able to recognize my motherland as even greater than my mother. However, I must also admit that only after giving my mother my heartfelt reverence, devotion, and love from the depths of my soul, have I learned to love my motherland, which is greater than my mother. I'm not belittling my mother. If anything, my mother is great. She taught me to love. She made the river of affection flow in my soul. She taught me to respond to every need, big or small! My mother showed me the path, and I followed it. People think, what a whimsical madman I am! What a thorny path of destruction I walk! But my mother knew about my journey, and only I know that.

Do people despise me? Ah, that's what I want! But a day will come when people will truly know about me and shed two drops of sympathetic tears. But I might not be able to see that then. And seeing it, I won't cry like those resentful, affection-deprived people. On that day, perhaps I'll be far beyond sorrow and tears.

Chaman

Alright, Mother! You found peace in death, but what a fire of unrest you ignited in my soul! I always said, "No, no, no, I cannot carry this burden of sin"; but did you listen? You just laughed it off, as if you knew all the thoughts in my heart, and what else!... Who is responsible for you thrusting this Bedoura onto my shoulders? Now all my work is hindered! I can't even escape anywhere! Today, Mother, I understand that for the stability of my restless, homeless heart, you put this garland of flowers on me with your own hands on the day of your eternal farewell. That very garland has become my torment! I have the power to break chains of iron, but I don't have the ruthless strength to crush chains of flowers… Hardness easily comes upon what is hard; but who would strike what is tender and pliable? I can't bear its blow anymore.

Unfortunate Bedoura! Do you remember that day? Mother's last day? That dreadful day? Death's messenger waited by Mother's head with a pallid face. An ethereal shadow of contentment gradually deepened on her pain-filled face. The last drop of her life's blood, as tears, fell upon our bowed heads for your welfare and mine. Mother's pure last tears were as hot with pain as they were cool and soothing with loving blessings! Your carelessly kept black, curly hair completely covered me, and many strands, soaked in our tears, entwined around my hands and neck. My mother, placing your tender hands like young leaves on my hands, commanded in a tear-choked voice, "*Dara*, promise me, you will never leave Bedoura."

Then her last words became even more entangled and heavy: "She has no one else, my child. I have made this orphaned girl so pampered and sensitive."

What a pained, desperate command, what a serene reliance of deep affection!

Then I remember, Bedoura, the deep mark of love, a deep crimson hue, gradually appearing in our adolescent hearts... Even sitting face to face, that desperate cry of the heart, do you remember all that, Bedoura? At that time, it felt as if the pain of

this attainment was the most poignant! Otherwise, when we would sit laughing in Golestan's grape garden under the silent evening sky, why would the laughter on our faces dry up in an instant, and our two souls be filled with a deep, sacred silence? Why would our hearts pound repeatedly with incomprehensible pain? Why would tears gather on our eyelids?...

Today, Bedoura, I understand that much more clearly. Because, with so many days of my life spent in separation from you, I haven't lost you but have found you even greater. The reason I had lost you was that I had obtained you too easily. The joy when the soul cries out "Priya, Priya" in the agony of separation is so intense that only the heart of one in separation understands it; no one else can ever express it. Among all the joys in the world, the pain of this separation is the most joyful.

And that day? That day, it truly pierced my heart like a great shock! I still remember that day, *Falgun* had set fire to the sky, to the air, to the flowers and leaves... and most of all, to the hearts of young men and women!

The clusters of grapes, dripping with juice and vitality, were like the perfectly healthy virgins of Persia! The pears, blushing like the vermillion cheeks of shy beauties! Bursting with juice, the pomegranate seeds spilled out like the pouty, crimson lips of sulking teenagers. In the blossoming pistachio fields, the nightingales' *Nowruz* fair was in full swing. Hidden in the bushes, cuckoos and quail-brides were practicing their voices, wondering how they would enchant their young husbands with their melodies... You fell into my arms in the intoxication and delight of a wave of fragrance carried by the unrestrained south wind. I had set aside Shiraz-Bulbul's *Diwan* and was trying to manage your disobedient, unruly hair, and tears flowed from both our eyes.

The sweet incompleteness of union was beautifully turning the pages of the first chapter of our lives in this way. Just then, everything turned upside down, like the pages of an open book becoming disorganized by the tyranny of a vast storm... How much effort I had to put in to rearrange those scattered pages,

Bedoura! Let it be. At least, by coming to this 'Chaman,' I have found you again. You are mine. A line from a Bengali poet's song comes to mind:

"You are mine,
You are mine,
The dweller of my desolate life!"

Afterwards do you remember that moment of separation, Bedoura? I was reciting that song of Shiraz's nightingale:

"See that day in the flower garden in the evening of *Falgun*,
The freshly bloomed lotus flower, its pollen scattered,
The bumblebee weeps to itself with incessant tears,
Suddenly, my flower picking was obstructed!
I said, 'Hey, brother bee! Why do you cry
Even today, with your beloved lotus bud in your heart?'"
Blushing, he kissed the lotus bud with tear-filled lips
and said, "O Poet, this is indeed the time to weep!
Only after obtaining the desired one, after so many days,
Does the bitter joy of reunion bring forth incessant tears!"

Just then, your uncle came and forcibly snatched you away from me; he didn't believe a word I said. He simply gave a disdainful laugh and informed me that as long as he was there, a union between Bedoura and a homeless wanderer like me was impossible...

Seeing my tears, he said that I too had gone mad from reading the *'Diwan'* of the mad poets of Iran. Seeing your pleas, he said that I had enchanted you.

After that, many days passed wandering by the bank of that restless flowing spring. When I came to my senses, the spring festival was still ongoing, but only you were gone! I saw that the marks of your *alta*-stained feet were gradually merging with the banks of the spring, and the broken pieces of your silk bangles were covered in sand.

Sometimes, in a moment of forgetfulness, I would stand on this side and call out, "Bedoura!"

After a long time, someone's weeping would come from the other side, across the rocky hill, and fade away in the middle—

"Ra—aah—ah!"

I searched all the mountains and jungles of Baluchistan and Afghanistan, but I couldn't find your cottage by the spring.

One morning, I saw a madman alone in a wide-open field, looking up at the sky, striking something and trying to grasp something with his clenched fists. I laughed heartily. Finally, I said, "Hey brother, Urtrange! Are you trying to catch sky-grasshoppers by leaping about?"

He leaped further and began to sing:

"I struck a knife from this side, it hit the banana tree,

Blood flows down my knee, blinding my eyes, oh father!"

This would make even a dead person laugh. In such sorrow, I laughed out loud and said, "Brother, are you a poet?"

He shook his hair with great delight and said, "Yes, yes, I am!"

I said, "But where is the rhyme in your poem?"

He said, "So what if it's not rhyming, blood is still flowing from my knee!" Saying this, he embarrassed me with a flurry of kisses on my freshly bearded cheeks and said, "If you try to catch the blue color of the wind, thinking it's the sky, it moves away and says, 'Oh, I am not the sky, I am the wind. I am emptiness, I cannot be caught. You have found me. Yet you come to catch me, saying you haven't, that is a big mistake of yours."

In an instant, the lively laughter on my face became mute and faded away. I thought, yes, that's right. Why all this fuss about wanting an external acquisition when I've already found it within, in the depths of my heart? So, that day, in my ruined house, I shed my last tears and said:

"Bedoura! I have found you in my heart –

In every drop of blood in my chest!"

And then, returning to Hindustan, wandering through its alleys disguised as a 'Kamliya,' was only to suppress that one

sorrow in my heart. I used to think my life would be spent wandering like this; but it didn't happen that way! I returned to Golestan! My earthen hut there has merged with the earth, but your footprints are etched in its damp heart... And they told me that you had come here looking for me, and finding me not, you only wept and returned!

That madman came again and informed me that you were withering away in Chaman...

I arrived and recognized you from afar. But why did you flee so hastily when you saw me? How you staggered like a drunkard, running and hiding behind those date palm trees! How unrestrained your tears flowed! And how much pained reproach was filled in that sorrowful gaze!

But where did you go? Bedoura, where are you?

Bedoura's Account

Bostan

Oh, Mother, what a pained, pale sky! All this rain that has fallen, isn't that the tears of the infinite sky? No, no, it's so generous, why would it cry? And even if it cried, its tears wouldn't be bitter and hot like water in our narrow, sin-filled eyes! See how cool it is!...

But am I dreaming? I ran straight from Chaman to Bostan. Well, at least my soul feels settled now... Oh, my heart! Why are these sobs, this breaking of the heart, coming? There's no greater misfortune than the human mind. That torment is consuming me! What? Are these tears because I saw him? What does that even mean?

He was bound to return, that much was known. But why after so long? Why at this inopportune time? Now my jasmine creeper is bare of flowers. Oh, how will I decorate our nuptial bed at this time of death, in this dark hour? If you came, why didn't you come two days earlier? Then I wouldn't have had to avoid you like this! That very day—the day I saw you again by the dry garden in Chaman—that very day I would have fallen into your arms and said, "Come, beloved, come back!"

We women, we can shed floods of tears at the slightest thing, but men cannot. It's as if their hearts are always weighed down by a stone. That's why when, with great pain, two unforgettable tears roll down the cheeks of these restrained men, I haven't seen any woman who can refrain from crying upon seeing them!

That day, when our eyes met after so many years, how much pleading, reproach, and hurt blossomed and materialized in the tearful gaze of all four of our eyes! Yes, and how he turned his head, trembling, calling out "Bedoura," and fell into that thorny date bush! Seeing that, how did I, a stone-hearted woman, manage to force my eyes shut with both hands and run this far, as if by some blind, inhuman force?

So many old memories are flooding my heart today! Like a pair of nightingales in Golestan, in union there was resentment, in union the pain of separation, and in its intense joy, countless tears! His thoughts are also so pain-filled. Then, being snatched away from my beloved's arms by that gambler, after much struggle to escape his grip, searching for my beloved! Oh, what he did to get him back! But he still didn't come then!

Then what a conflict raged within and without! Within, the argument ignited like a smoldering fire of chaff, and outside? Outside, the desolate breeze of *Falgun* ignited a fierce fire of desire in the heart! Just then, like a comet, *Saif-ul-Muluk* came and whispered to me—how vast, peaceful, and solemn love is, like the sharp *madhyam* of the *Bhairavi raga*! And how intense, sharp, and cruel this ugly desire is! The pleasure in this indulgence of desire is a devilish pleasure! It only consumes us like the *Deepak raga*! And yet that fire of *Deepak* will ignite in the new *Falgun* of our lives. If there is nothing like the comforting Cloud-*Mallar* nearby at that time, it will surely burn. Deepak will definitely burn it!

That's why, the day I was overflowing with the weight of blossoming youth, and someone came and propositioned me, I had no power to suppress this external inclination. I was blind then! Oh God, where were you that day! No one came to restrain me then! Alas, that day was my death! That day I became a beggar and sat on the road. Oh, on that day of my downfall, the dense

blackness of accumulated darkness settled heavily in my eyes; then, there was not even a speck of light like now to try and dispel that darkness. Perhaps a single ray of light, with a slight touch, would have made all the darkness flee that day. Then you would have seen, oh, who sits like an absolute monarch, king of kings, occupying the entire throne of my heart.

Yet, why did this downfall happen to me? I couldn't understand it then, nor can I understand it today. Everything seems so muddled! But if I say that my love—the great love hidden deep in the secret depths of my heart, which is always pure—remains just as pure and undefiled, and will always remain so, and no external oppression or misconduct has the power to scratch it—then who will understand? Who will forgive me? Still, I will say, love is always pure, unconquerable, and immortal; sin is always defiling, weak, and temporary.

Oh—Mother! What unbearable pain in every rib of my chest... What nonsense was I talking about just now? It's as if I was dreaming, right... Sin is temporary, but just as a flood leaves behind a layer of shrinking silt after it recedes, that isn't temporary; it might last for many people's entire lives. Even if a sinner reforms and does a thousand good deeds, they think, my bad name will stick to me forever, like mud! Even the moonlight of a full moon cannot hide the stain on it! How poisonous and sharp this repentance of sin is! It's as if thousands of needles are piercing every tender spot in my chest at once...

Again, I recall *Saif-ul-Muluk*, the devil who led me astray. He is the one who spoiled everything. If I could find him now, I would tear him apart with my nails.

We women, we think that our hearts become impure at such a slight thing, and we burn in repentance. We also think that perhaps men are not touched by sin so easily. And such intense repentance does not arise in their hearts. But that day, the day my thirst for desire dried up, and I was writhing in the intense burning sensation of drinking poison, thinking it was honey, and just then, suddenly and mightily, the purity of my inner love awakened with unhindered force—that force radiated from my

eyes—that day—that very day—how suddenly small *Saif-ul-Muluk* became! What an ugly distortion a pervasive, hateful shame brought to his face! From afar, he cast a frightened, startled glance at me, raised both hands, and cried out, "God! I will atone for my sins with my life! But please, God, let me give that life for a good cause, just this much!"

Then, like a madman, he rushed and fell at my feet, saying, "Goddess, forgive this devil! A goddess's divinity remains unbroken forever; it is not tainted by external defilement, rather it becomes even greater and brighter through conflict! But I? I? Oh, oh, oh!" He ran off gasping. I don't know if his running has stopped.

But what is this? Why is my mind trying to tempt me to go and see if he is still lying unconscious in that thorny date bush!... No, no, I cannot bear this heart-burning any longer, I cannot! Yes, I will meet him, I will, one last time, and then I will tell him, "Oh, your *Bedoura* is no more, she is dead, dead! Her soul has gone out searching for you! You are searching for her in vain! *Bedoura* is not there, not there, not there."

And then? And then, if he still wants me, what will I tell him, what will I do then? No, even then I will be as hard as wood and say, "Don't touch me, don't touch me, oh God, don't touch me! Don't defile your purity by touching my impure body."

Ah! Mother! Oh, what pain! It's as if someone is stabbing my heart with a knife, cutting it into pieces!

Dara's Account

Golestan

Are you that *Golestan*? But why are you so ugly today? Your flowers lack that beauty, only the foul smell of hell's guts. Your sky is no longer so generous; someone has made it murky and turbid! It's as if a hundred thousand pieces of glass are hidden in your Malayan breeze! It's as if your whole body is in pain!...

What did you do, *Bedoura*? *Bedoura*! No, this pain you gave, this cruel blow received from my beloved, surely God's blessings

are hidden within it! I will never forget, God, that you are indeed great and that the joys and sorrows you give are all equal and auspicious! There can be no inauspiciousness in your work, and no one knows the future but you! What a peaceful solace this is to the wounded heart!

Well, yet my mind doesn't agree. Why do I think this is surely a blow? When the thirsty *Chatak* bird, crying "Pure water, pure water," reaches the cloud, and the cruel cloud strikes its chest with thunder and laughs with a lightning smile, why do I think this is the cloud's great cruelty? Why?

But even after all this time, I couldn't know my true self! Earlier, I used to think I was so great, so lofty! Today, I see that I am not an iota greater than an ordinary person! If my mind and their minds were filled with such narrowness and meanness, why couldn't I simply forgive *Bedoura's* fault? No matter how great that fault is! Her outer self may have been corrupted, but her inner self remains just as pure and white! Many try to keep their outer self-pure while their inner self is impure, that is the greater fault. But knowing that *Bedoura's* inner self remains pure in her simple innocence, I couldn't wholeheartedly protect her, that fault is mine; because I am still very small. I did want to forgive her once, to force myself to be great, but that cannot happen. That wouldn't be from the heart! No, I must burn and become pure. If I can fix my mind from far away, then I will return, otherwise not. Oh, how lowly I am! When I first heard of *Bedoura's* fall from her own lips, I too sank straight into the pit of hell. I thought I would take revenge on *Bedoura* by adding fuel to my own dormant desires. Then, someone, holding my hand from the gates of hell, wiped my tears and brought me back. She said calmly, "This revenge is not against *Bedoura*, brother, this revenge is against yourself!" I thought, "Is this what I was doing, committing suicide out of wounded pride?" I returned again.

Then I told *Bedoura*, "*Bedoura*! If one day I have the power to forgive from the heart, then we shall meet again, otherwise this is our eternal farewell! I cannot embrace a falsehood by forcibly

forgiving you. I want the *kajal* of love to wipe away the darkness of my mind."

Bedoura smiled through her tears and said, "You must return, beloved, you must! This doubt will pass in a day or two, you'll see how our love has been cleansed and purified, becoming even deeper and holier in its bright new form! I will sit by this faint spring in *Golestan*, waiting for you, weaving songs and garlands. And you must wear them. The worship of pain is never in vain, beloved!"

Where do I go now, and by what path? Oh, my eternal companion on the path, where are you?

Saif-ul-Muluk's Account

I am that devil, I am that sinner, who led a goddess astray. I thought, in this worldwide war, I should join any side and end this sinful life as quickly as possible. And then? What then? Whatever happens to all sinners, will happen to me too.

If a sinner receives punishment, they find peace knowing that they are not being treated unjustly, that this punishment is their due. But if they don't, the torment of their inner conscience is far more terrifying than the tortures of hell.

What I thought, didn't happen! Wandering, I finally joined this army of freedom fighters. This army was overjoyed to see this foreigner join their ranks. They believed that their great selfless desire was gathering strength in the hearts of the world. They lovingly took me into their ranks and explained to me how much noble selflessness and pure altruism motivated them to stand with the oppressed people of the world and fight against tyranny, and that I too was one of those great individuals. My dark heart found a great deal of comforting light!

God, today I understand that you do not hate sinners, but pity them. You have left all paths open for them too. A sinner's life also has value. Even with it, the lamp of goodness can be lit. They are not to be despised or untouchable!

But suddenly, what did I see? Where did Dara come from? When I asked him repeatedly that day, he said, "I couldn't find a better job in this world, so I joined this group."

How vast and profound he has become through suffering! I must ask for forgiveness from this pain-stricken youth; otherwise, I have no forgiveness anywhere. It was I who ignited this fire of pain in his heart, it was I who made him homeless.

What an unthinkable and extraordinary courage Dara fights with! Everyone thinks that he is truly a hero, and their nation is a heroic nation, for he sacrifices his blood smilingly for the welfare of the world, tirelessly, without a thought for his own life! There isn't a day he hasn't suffered some wound or injury. But he doesn't even notice them. He is like an unfathomable, infinite thirst for battle, attacking injustice with tremendous speed, as hard as death itself. As long as he has an iota of consciousness, who can turn him back from the battlefield! What stubborn persistence! But I understand that this battle is not for external reasons; it's a futile campaign against inner pain. I know its outcome will either be extremely bitter or incredibly peaceful and beautiful!

For some days now, bombs and airplanes have been his companions. With so many external and internal blows and pains, how does this mad youth continuously win battles with an unblemished face? It's as if he has cast fear into the Arabian Sea!

Today he is a commander. But what an unquenched desire still lingers on his face and in his heart! He gets wounded every day, but who can send him to the hospital! Giving the artillery soldier a break from sleep, he fires the cannon with his broken arm. Even as a commander, he carries a bag of grenades and bombs like an ordinary soldier, a bucket of liquid fire on his back, and of course, a revolver in his hand. Blood flows, and what joy he finds in killing people, what can I say! He says, "The fewer dependent people there are, the better."

I am amazed, he hasn't truly gone mad.

What have you done, God! What have you done? After so many blows, you have made the unfortunate Dara blind and

deaf? I had feared something like this would happen long ago due to this devilish thirst for war. Well, merciful One, we may not understand your play, but when you blinded the eyes of this innocent youth with bomb fire and deafened his ears, and not a scratch touched a sinner and devil like me, can I still say that your auspicious will is hidden? What is that auspiciousness, show this blind man, Lord, show him! I have broken the staff that this blind man stands on! Then will you keep my outer self-unharmed while tearing apart and wounding my inner self like this? Oh Lord of justice! Is this my punishment—this worldwide unrest?

Even on this day of our desired great victory, our victory flag trembles atop the royal palace! Instead of shouts of triumph, the victory drum seems to emit the gasping, strained sound of a weary 'Waltz-melody' as if gasping for breath! The trumpeter's voice breaks frequently! Today is the farewell of the blind commander Dara! When the blind, deaf, and wounded Dara stood before the soldiers, leaning on my shoulder, floods of tears streamed from the eyes of all the freedom fighters. There are no words to express how heart-wrenching the tears of our hardened soldiers were.

The commander of the freedom fighters, his voice repeatedly choking with tears, said, "Brother Darabi! We do not award 'Victoria Cross,' 'Military Cross,' etc., because we ourselves cannot reward our own work. The reward for our heroism and sacrifice is the welfare of the world; but we only call those heroes who show such heroism and pure selfless sacrifice like you."

The commander again swallowed hard and, wiping away his unruly tears with his coat sleeve, said, "You are blind, you are deaf, your whole body bears severe marks of wounds. We will say, this is the greatest reward for your heroism! You came uninvited to give your life for the welfare of the world, and in return, what God has given with His own hands, no matter how cruel it may seem to outward eyes—what greater reward than that can we humans give, brother? 'God is indeed great, and He rewards people for good deeds!' This is the message of your Holy Quran! Therefore, O heroic commander, perhaps all peace and

happiness lie dormant in the very heart of your blindness and deafness. May God give you peace!"

Dara, with his sightless eyes, tried in vain to see the soldiers as best as he could and said, with a voice choked with tears, "Farewell, my holy heroic brothers!"

I also came back to Golestan with blind Dara! And this is the solace of my failed life, the service of this unperturbed hero! Dara has forgiven me, he has embraced me as a friend! Only now has the barren life of this unfortunate youth blossomed with the flowers of fulfillment! Only now has true love made him as infinitely generous as that limitless sky! As we came along the road, I asked him, "Well, brother, have you forgiven *Bedoura*?"

He smiled through his tears and sang this *ghazal* by Rumi, the greatest of lovers:

"Oh beloved! The stones of pain with which you struck my heart,
With those very stones, I have built a great mosque of love!"

I believe there is nothing simpler in the world than children! Dara too, in the glory of love, has become like such a simple child. How easy his smile, and how unrestrained his tears! They can make even the hardest stone cry! That day, I said with a laugh, "Hey brother, now that you've become blind and deaf, do you see any hint of the Auspicious One's blessing in this?"

He said, "Oh fool, it is because I have become blind, because these outer eyes have become sightless and these ears deaf, that I am able to forgive you today, that all the defilement and dirt of my mind have been washed clean! A blind person also has a vision that is inner vision, which is a transcendental vision. Now I see the world full of my beloved's form and the infinite light of her smile! And what do I hear with these deaf ears, do you know? Only the sweet murmur of her whispered secret love-talk and the melodious jingle of her anklets filling her steps! I am engrossed in this!" Saying this, overcome, he began to sing:

"If you love another, if you do not return,

Then may you get what you desire, no matter how much pain I endure!

My soul desires only you, only you,

Without you, there is no one and nothing in this world for me."

In the tender Gandhar and Nishad of the Kanada Raga, all his tormented pain seemed to twist and weep! But what a calm, serene, vast reliance and sacrifice in this song!

What surprises me most is that Bedoura has also forgiven me, and there is no artificiality or unnaturalness in her saying so. It's as if it comes from the heart!

God, you are great! "You are there for those who have no one." By the touch of the golden wand of these lovers, even I, who I am, have no more defilement, no more hesitation! Today, the joy of this idleness—Oh, how sweet and beautiful!

Bedoura's Account

Golestan

(On the other side of the stream)

He has forgiven me wholeheartedly, from the depths of his being! There is no hint of pity in this forgiveness. I knew this would happen, and that's why my mornings and evenings of waiting have passed in joy! I have poured all my days of waiting, my secluded garlands of flowers, and my tears-soaked songs of separation at his feet. He has worn them around his neck, and in return, what he has given me, that is the gift of pain from him to me!

He said, "Bedoura! Desire and love, these two are completely different things. Desire is a strong temporary excitement, and love is slow, peaceful, and eternal. The tendency or cessation of desire cannot obscure the deep-seated love in the heart, this is a constant truth. Those unfortunate people who are thus deceived and do not ponder this truth calmly and believe in it, make a great mistake, and no one else has such an unfortunate and restless life as they do. No matter how much the dark clouds try to swallow the sun on a rainy day, they cannot. They only conceal it for a little

while. Because the sun is far beyond the reach of the clouds. How and through what crack the sun's rays penetrate the thick layers of clouds and reflect on the earth, the clouds do not understand, and we do not try to know either. Then, when the clouds disperse, the sun shines even brighter. Because no harm comes to the sun; it knows it will remain as it is, intact; the harm is ours—this world's. Does that mean the rain clouds will not come? Will they not cover the sky? They will come, it is their nature; no one can stop them. However, to get sunlight even in such rain, one must rise above the clouds. That is not so easy, and it is not even necessary. Desire is exactly like rain; and love burns in the heart like the sun, with the same brilliance!

"Desire may have ruined your outer self, but it could not ruin your inner self. Besides, without it, you wouldn't have known me so much, wouldn't have gained me so greatly. The external wind cannot extinguish the flame of love, it makes it brighter. And my blindness and deafness? Don't cry for them, Bedoura, if I didn't have these, I wouldn't have found you!"

From all the blossoming trees, nightingales flew away, crying "Priya, Priya" with choked voices!

He said again, "Look, Bedoura, today will be our last nuptial bed. Then, with the rising of the sun, you will go to the other side of the spring, and I will remain on this side. From these two sides, the songs of separation of both of us will torment each other. And in the joy of that pain, we will find each other greater—even greater!"

From that day, I have been on this side of the spring.

My tears and deep sighs also rise up, "Hu, hu," when, in the silent, melancholic evening, his heavy, muffled voice, choked with tears, whispers a weary melody from the other side, coming to this side, saying:

"Lighting the lamp of all my sorrows, the day passed, I will offer it,

My worship of pain is not yet complete!"

Translated by Alamgir Mohammad

রাক্ষুসী

(বীরভূমের বাগদীদের ভাষায়)

[ক]

'আজ এই পুরো দুটো বছর ধরে ভাবছি, — আর সবচেয়ে আশ্চয্যি হচ্ছি, লোকে আমাকে দেখলেই এমন করে ছুটে পালায় কেন। পুরুষেরা, যাঁরা সব পর্দার আড়ালে গিয়ে মেয়ে-মহলে খুব জাঁদরেলি রকমের শোরগোল আর হল্লা করেন, আর যাঁদের সেই বিদঘুটে চেঁচানির চোটে ছেলেমেয়েরা ভয়ে 'নফসি নফসি' করে, সেই মদ্দরাই আবার আমায় দেখলে হুঁকো হতে দাওয়া হতে আস্তে আস্তে সরে পড়েন, তখন নাকি তাদের অন্দর-মহলে যাবার ভয়ানক 'হাজত' হয়! মেয়েরা আমাকে দেখলেই কাঁক হতে দুম করে কলসি ফেলে সে কি লম্বা ছুট দেয়! ছেলেমেয়েরা তো নাকমুখ সিঁটকে ভয়ে একেবারে আতকে উঠে! হাজার গজ দূর থেকে বলে, ওরে বাপরে, ঐ এল পাগলি রাক্ষুসী মাগী, পালা — পালা! খেলে, খেলে!' — কেনে! আমি কোন উনোনমুখো সুঁটকোর পাকা ধানে মই দিয়েছি? কোন খালভরা ড্যাকরার মুখে আগুন দিয়েছি? কোন চোখখাগী আবাগীর বেটির বুকে বসে তপ্ত খোলা ভেঙেছি? কার গতর আমকাঠ না কুল-কাঠের আখায় চড়িয়েছি? কোন ছেলেমেয়ের কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছি? বল তো বুন, তাদের কি 'সরোকার' আছে আমায় যা তা বলবার? কে তারা আমার? — মেরেছি? — বেশ করেছি, নিজের 'সোয়ামিক মেরেছি!... শুধু মেরেছি? দা দিয়ে কেটেছি! তাতে ওদের এত বুক চড়ু চড়ু করবে কেনে? ওদের কারুর বুক থেকে তো সোয়ামিকে কেড়ে লি নাই, আর হত্যেও করি নাই, তাতে ওদের কথা বলবার আর সাওখুড়ি করবার কি আছে? ওরা কি আমার সাতপুরুষে কুটুম না গিয়াত? যদি এই রকমই করতে থাকে, তবে আমি সত্যিকারের রাক্ষুসীই হয়ে দাঁড়াব বলে রাখছি তখন! এক এক দায়ের কোপে ওদের সোয়ামির মাথাগুলোর ধড় থেকে আলাদা করে দিব, মেয়েগুলোকে বুক ফেঁড়ে কলজেগুলো ধরে পিষে পিষে দিব, তবে না সে আমার নাম সত্যিসত্যিই রাক্ষুসী হয়ে দাঁড়াবে!

'আমায় পাগল করলে কে? এই মানুষগুলোই তো — আমি তো ফের তেমনি করেই — যেন কিছু হয় নাই — ঘর পেতেছিলুম। রাত্তির দিন আমার কানের গোড়ায় আনাচে-কানাচে, পথে-ঘাটে, কাজেকর্মে, মজলিসে-জৌলিসে আমার নামে রাক্ষুসী বলে কুৎসা, ঘেন্না, মুখ ব্যাঁকানি, চোখ রাঙানি, — এই সব মিলেই তো আমার মাথার মগজ বিগড়ে দিল? যে ব্যথাটাকে আমি আমার মনের মাঝেই চেপে রেখেছিলুম সেটাকে আবার জাগিয়ে তুললে চোখের সামনে সোজা করে ধরলে তো এরাই! আচ্ছা

তুই-ই বল তো বুন, এ পাগল হওয়ার দোষটা কার? একটা ভালো মানুষকে খোঁচা মেরে মেরে ক্ষেপিয়ে তুললে সে দোষটা কি সেই ভালোমানুষের, না যে ভালোমানুষেরা তাকে খেপিয়ে তোলে, তাদের? —

'আমার সোয়ামি ছিল সাদাসিধে মানুষ, সে তো সোজা ছাড়া বাঁকা কিছু জানত না। সে চাষ করত কিরষাণি করত, আমি সারাটি দিন মাছ ধরে চাল কেঁড়ে, ধান ভেনে' আনতুম। তা না হলে চলবে কি করে দিদি? তখন আমাদের তিনটে পুষ্যি, — বড় ছেলে সোমত্থ হয়ে উঠেছে, বেথা না দিলে 'উপর-নজর' হবে, মেয়েটাও ঢ্যাং-ঢেঙিয়ে বেড়ে উঠেছিল আর আমার কোলপুঁছা ছোট মেয়েটিরও তখন হাঁক্কো হোঁক্কো করে দুএকটি কথা ফুটছিল। ছা-পোষা মানুষ হলেও দিদি আমাদের সংসারে তো অভাব ছিল না কোন কিছুর, তোমার পাঁচজনের আশীর্বাদে। এই বিন্দিই তখন নাই নাই করে দিনের শেষে তিনটি সের চাল তরকারির জন্যে মাছ রে, শামুক রে, গুগলি রে পিথিমির জিনিস করে আনত তাছাড়া বড় ছেলেটাও তোমাদের শ্রীচরণের আশীর্বাদে ক'রে কর্মে দু-পয়সা ঘরে আনছিল। মেয়েটাও পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে যা দু-চারটে শাগ-মাছ আনত, তাতে নেহাৎ কম পয়সা হতো না। লুন-তেলের খরচটা ওর দিয়েই বেশ দিব্যি চলে যেত। এ সবের উপর সোয়ামি বছরের শেষে চাষবাস আর কিরষাণি করে যা ধান-চাল আনত, তাতে সারা বছর খুব 'সচল বচল' করে খেয়েও ফুরাত না। সংসারের তখন কি ছিরিই ছিল! লক্ষ্মী যেন মুখ তুলে চেয়েছিলেন। এত সব কার জন্যে ঐ ছেলে-মেয়েগুলির জন্যেই তো? সারাদিন রেতে একটি সেরের বেশি চাল রাঁধতুম না। বলি আহা, শেষে আমার ছেলেরা কষ্ট পাবে। সোয়ামি আর ছেলেগুলোকে দিতুম ভাত, আর নিজে খেতুম মাড় — শুদ্ধু ভাতের ফেন! মেয়েমানুষের আবার সুখ কি, ছেলেমেয়ে যদি ঠাণ্ডা রইল তাতেই আমাদের জান ঠাণ্ডা! নাইবা হলুম জমিদার। আমরা তো কারুর কাছে ভিক্ষে করতুম না, চুরি-দারিও করতুম না। নিজের মেহনতের পয়সা নেড়ে-চেড়ে খেতুম। নিজে খেতুম, আর পালে রে পার্বণে রে যেমন অবস্থা দু-দশটা অতিথ-ফকিরকেও খাওয়াতুম। আহা, ওতেই আমার বুক ভরে ছিল দিদি! লোকে বলত আমি নাকি বড্ডো 'কিরপণ'; কারণ আমি একটি পয়সা বাজে খরচ করতুম না। তা বল্‌লে আর কি করব, তাতে আমার বয়ে যেত না। তারা তো জানত না, আমার মাথায় কি বোঝা চাপান রয়েছে। দু-দুটো মেয়ে আর একটি ছেলের বিয়ে দিতে হবে, বাড়িতে বউ আসবে, জামাই আসবে, আমার এই মাটির ঘরই আনন্দে ইন্দিরপুরী হয়ে উঠবে, দুটো সাদ-আরলাদ আছে — তাতে কত খরচ বল দিকিনি বুন্? দায়ে ঠেকলে কেউ এক পয়সা কর্জ দিয়ে চালাবে, বাপরে বাপএই বিন্দির অজানা নেই গো, গলায় সাপ বেঁধে পড়লেও কোন বেটি একটি ক্ষুদকণা দিয়ে শুধোয় না। তার আবার গুমোর! আমার কাছে ও-সব শুধু

কথায় চিড়ে ভিজে না বাপু! তবে বুঝ্‌তুম, অনেক কড়ুই রাঁড়ীর বুক চচ্চড় করত হিংসেয়, আমাদের এই এতটুকু সুখ দেখে।

'এমনি করেই খুব সুখে দিন যাচ্ছিল আমাদের! আমি মনে করতুম, আর কটা দিন বাঁচি এমনি করে সোয়ামির সেবা করে, ছেলে-মেয়ে চরিয়ে, নাতিপুতি দেখে আমার হাতের নোওয়া অক্ষয় রেখে মরি; কিন্তু তা আমার পোড়া বিধাতার সইল না। আমার সাধের ঘরকন্না শ্মশানপুরী হয়ে গেল! আর এত আশা-ভরসা সব-তাতে চুলোর ছাই-পাঁশ পড়ুল! শুনে যা দিদি, শুনে যা সব,আর যদি দোষ দেখিস তো তোর ঐ মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে আমার বিষ ঝেড়ে দিয়ে যাস, সাত উনুনের বাসি ছাই আমার পোড়া মুখে দিয়ে দিস্! হায় বুন, আমার 'দুখখুর' কথা শুন্‌লে পাথর গলে মোম হয়ে যায়, কিন্তু গাঁয়ের এই বেদিল মানুষগুলো আমায় এতটুকু পেরবোধ তো দেয়ই না, তার উপর রাত্তির দিন নানান কথা বলে জানটাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে! মনে করি আমার সব পেটের কথা কারুর কাছে তন্ন তন্ন করে বলি আর খুব একচোট কেঁদে নিয়ে মনটাকে হালকা করি। তা যারই কাছ ঘেঁসতে চাই, সেই মনে করে এই আমায় খেলেরে! আমি যেন ডাইনি কুহুকীরও অধম! এই 'হেনস্থা' আর ভয় করার দরুণে আমার সমস্ত মগজটা চমচম করে ধরে যায়। কাজেই আমার পাগলামি তখন আরও বেড়ে যায়। সাধে কি আমার মুখ দিয়ে এত গালিগালাজ শাপমন্যি বেরোয়, বুন! তুই সব কথা শুনে আর নাথি মেরে আমার থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে যা!'

[খ]

'তু তো বরাবরই জানতিস্ দিদি, আমাদের পাঁচুর বাপ ছিল বরাবরকার সিদেসাধা মানুষ, সে হের-ফের বা কথার প্যাঁচ বুঝত না। নাকটা সোজাসুজি না দেখিয়ে হাতটা পিঠের দিক দিয়ে বাঁকিয়ে এসে দেখানোটা তার মগজে আদৌ ঢুকত না। কত আঁটকুঁড়ো নদী-ভরাই যে ওকে দিয়ে বিনি পয়সার বেগার খাটিয়ে নেত, হাত হতে পয়সা ভুলিয়ে নেত, তার আর সংখ্যা নাই! ঐ নিয়ে বেচারাকে আমি কতদিন গালমন্দ দিয়েছি, কত বুদ্ধি দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হই নাই। কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে' — ওর আর একটা বদ-অভ্যেস ছিল, ও বড্ড মদ খেত। কতদিন বলেছি, তুমি মদ খাও ক্ষতি নাই, দেখো তোমায় মদে যেন না খায়! কিন্তু সে তা শুনত না; একটু ফাঁক পেলেই যা রোজগার করত তা সব শুঁড়ির পায়ে ঢেলে আসত। যাক, ওরকম দুচারটে বদ-অভ্যাস পুরুষ মানুষের থাকেই থাকে — ওতে তেমন আসত যেত না, কিন্তু অমন শিবের মত সোয়ামি আমার শেষে এমন কাজ করের ফেললে, যা বুন তুই কেন — আমারও এখন বিশ্বাস হচ্ছে না। তার মত অমন

সোজা লোক পেয়ে কে কি খাইয়ে দিয়ে তাকে যে অমন করে দিয়েছিল, তা আমি নিজেই বুঝতে পারি নাই।

'জানিস ওপাড়ার রঘো বাগদীর দু-তিনটে 'স্যাঙ্গা-করা' কড়ই রাড়ী মেয়েটা কি-রকম পাড়া মাথায় করে তুলেছিল। ছুঁড়ি কখনও সোয়ামির ঘর তো করেই নাই, মাঝ থেকে পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের কাঁচা বুকে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর তার বাপ মাকেই বা কি বলব — ছি, আমারই মনে হতো যে, বিষ খেয়ে মরি! মাগো মা, বাগদী জাতটার ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে!' —

'তু তো জানিস মাখন-দি, ঝুটমুট আমাদের গাঁয়ের লোকের আর আমাদের বাগদীগুলোর বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের হাতে অনেক টাকা আছে। আবার সে কত পুতখাগীর বেটিরা লোকের ঘরে ঘরে রটিয়ে এসেছিল, আমরা নাকি যক্ষির টাকা পেয়েছি। বল বুন, এতে হাসি পায় না?

'হে, আমাদের ঐ টাকার লোভেই ঐ 'রাঁড় হয়ে ষাঁঢ় হওয়া' ছুড়িটা ঐ শিবির মতন সোজা ভোলানাথ সোয়ামিক আমার পেয়ে বস্‌ল। আর সত্যি বলতে কি, মিনসের চেহারাও তো আর নেহাৎ মন্দ ছিল না! ধুতি-চাদর পরিয়ে দিলে মনে হত একটি খাসা 'ভদ্দরনুক'।'

'ওর যেদিন আমি পেত্থম এই কথাটি শুনলাম, তখন আমার মনটা যে কেমন হয়ে গেল, তা বুন তোকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। মাথায় বাজ পড়লেও বোধ হয় লোকে অত বেথা পায় না। আমি সেদিন তাকে রাতে খুব ঝাঁটাপেটা করলুম! 'অ' বুনা! — যে অমন মাটির মানুষ, সাত চড়ে যার রা বেরোত না, সেও কিনা সেদিন আমার এই ঝুঁটি ধরে একটা চেলাকাঠ করে উঃ সে কি মার মারলে! কাঠটার চেয়েও বেশি ফেটে ফেটে আমার পিঠ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তখনকার এত যে বাইরের বেথা, তাত আমি বুঝতে পারছিলুম না, কেননা আমার বুকটা তখন আরো বেশি ফেটে গিয়েছিল! আমি যে সেদিন স্পষ্ট বুঝলুম, আমার নিজের সোয়ামি আজ পর হল! আমি দেখতে পেলুম, আমার কপাল পুড়েছে। তখন ঠিক যেন কেউ তপ্ত লোহা দিয়ে আমার বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁকা দিচ্ছিল — আমি ফুপিয়ে কেঁদে উঠলুম!

সে সঙ্গে আমার যত রাগ হলো সেই হারামজাদি বেটির উপর। মনে হতে লাগল এখন যদি তাকে পাই, তো নখে করে ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু কোনদিনই তার নাগাল পাই নাই। সে আমাকে দেখলেই সরে পড়ত।'

[গ]

'ক্রমেই আমার সোয়ামি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে। সে আর প্রায়ই ঘরে আসত না! মুনিব-ঘরে খাটত, খেত, আর ওদের ঘরটাতেই গিয়ে শুয়ে থাকত! আমি, আমার ছেলে, পাড়ার সব ভালো লোক মিলে কত বুঝালুম তাকে। কিন্তু হায়, তাকে আর ফিরাতে পারলুম না, ছুঁড়ি যে ওকে যাদু করেছিল! একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিল! তখন বুঝলুম এতদিনে মিনসের ভীমরতি ধরেছে; ওকে 'ঊনপঞ্চাশে পেয়েছে; তা নৈলে কি এমন চোখের মাথা খেয়ে বসে লোকে! একদিন পায়ে ধরে জানালুম, সে কত বড় ভুল করতে যাচ্ছে। সে আমার মুখে লাথি মেরে চলে গেল। আমার সারা দেহ দিয়ে আগুনের মত গরম কি একটা ঠিকরে বেরুতে লাগলো। বুঝলুম সে এত বেশি এগিয়ে গিয়েছে নরকের দিকে যে, তাকে ফেরানো যায় না।'

'তার উপর রাস্তায়-ঘাটে ঐ বিশ্রী কথাটা নিয়ে আমায় গঞ্জনা-খোঁচা আমি ক্ষেপার মত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলুম, শোধ নেব শোধ নেব। তবে আমার নাম বিন্দি!'

'আর একদিন মাঠ হতে এসে শুনলুম মিনসে নাকি আমার বাকস ভেঙ্গে জোর করে যা দু-চার পয়সা জমিয়েছিলুম সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, একটা কানাকড়িও থুয়ে যায় নাই। আরও শুনলুম, তার দুদিন পরেই নাকি ঐ ছুঁড়ির সঙ্গে তার 'স্যাঙ্গা' হবে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সে নাকি ঐ সমস্ত নগদ টাকা নিয়ে গিয়ে তার হবু-শ্বশুরের 'শীপাদপদ্দে' ঢেলেছে। — হায়রে আমার রক্তের চেয়েও পিয়ারা টাকা! তার এই দশা হলে শেষে? মানুষ এত নিচু দিকে যেতে পারে? তখন ভাববার ফুরসৎ ছিল না; ঐ দুদিনের মধ্যেই যা কর্‌বার একটা করে নিতে হবে, তারপর আর সময় পাওয়া যাবে না। ভাবতে লাগলুম, কি করা যায়? একটা দেবতার মত লোক সিধা নরকে নেমে যাচ্ছে এক-এক পা করে, আর বেশী দূর নাই, অথচ ফিরাবার কোনো উপায় নেই। তখন তাকে হত্যা করলে কি পাপ হয়? তা ছাড়া আমি তার 'স্ত্রী', আমারও তো একটা কর্তব্য আছে, আমার সোয়ামি যদি বেপথে যায়, ত আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে? আর সে এই রকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্মত আমিই দায়ী। ধর, আমি যদি তাকে এই সময়ে একেবারে শেষ করে ফেলি তাহলে তার তো আর কোন পাপ থাকবে না। যত পাপ হবে আমার। তা হোক সোয়ামির পাপ তার 'স্ত্রী' নেবে না ত কি নেবে এসে শেওড়া গাছের ভূত?'

'আমি মনকে শক্ত করে ফেললুম! হাঁ, হত্যেই করব যা থাকে কপালে! ভগবান, তুমি সাক্ষী রইলে, আমি আমার দেবতাকে নরকে যাবার আগে তার জানটা তোমায় পায়ে জবা ফুলের মত 'উচ্ছগু' করব, তুমি সব পাপ খণ্ডন ক'রে আমাকে শুধু দুখখু আর কষ্ট দাও! আমার তাই আনন্দ!'

'সেদিন সাঁঝে একটু ঝিমঝিম বিষ্টির পর মেঘটা বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এমন সময় দেখতে পেলুম, আমার সোয়ামি একা ঐ আবাগীদের বাড়ির পেছনে তেঁতুল গাছটার তলায় বসে খুব মন দিয়ে একটা খুরোয় র‍্যাদা বুলোচ্ছে! — কি করতে হবে ঝা করে ভেবে নিলুম! চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম কেউ কোথাও নাই। আমি পাগলামির মত ছুটে এসে দা-টা বের করে নিলুম সাঁঝের সূর্যটার লাল আলো দা'টার উপর পড়ে চকমক করে উঠল। ঐ ঝাপসা রোদেই আবার বিষ্টি নেমে এল — ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্! বাড়ির পাশে তখন একপাল ন্যাংটা ছেলে জলে ভিজতে ভিজতে গাইছিল।

রোদে রোদে বিষ্টি হয়,
খ্যাঁক শিয়ালের বিয়ে হয়।'

আমি আঁচলে দা-টা লুকিয়ে দৌড়ে বাঘিনীর মত গিয়ে, ওঃ সেকি জোরে তার বুকে চেপে বসলুম! সে হাজার জোর করেও আমায় উলটিয়ে ফেলতে পারলে না! তার ঘাড়ে মস্ত একটা কোপ বসিয়ে দিতেই আমার হাতটা অবশ হয়ে এল! তখন সে দৌড়ে পাশের পাটক্ষেতটায় গিয়ে চিৎকার করে পড়ল! আমি তখন রক্তমুখো হয়ে উঠেছি। আমি আবার গিয়ে দুটো কোপ বসাতেই তার ঘাড় হতেই মাথাটা আলাদা হয়ে গেল! তারপর খালি লাল আর লাল! আমার চারিদিকে শুধু রক্ত নেচে বেড়াতে লাগল! তারপর কি হয়েছিল আমার আর মনে নেই।

যেদিন আমার বেশ জ্ঞান হল সেদিন দেখলুম আমি একটা নতুন জায়গায় রয়েছি, আর তার চারদিকে সে কতই রং-বেরং-এর লোক! আর সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছিলুম এই দেখে যে, আমিও তাদের মাঝে খুব জোরে জাঁতা পিশছি! এতদিনের পর সূর্যের আলো — ওঃ সে কত সুন্দর সাদা হয়ে দেখালো! এর আগে চোখের পাতায় শুধু একটা লাল রং ধু ধু করত। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, ওটা শিউড়ির জেলখানা। আমার সাত বছরের জেল হয়েছে! এই-মাত্তর তিনমাস গিয়াছে। আমি নাকি ম্যাজিস্টর সাহেবের কাছে সব কথা নিজ মুখে স্বীকার করেছিলুম। তবে আমার শাস্তি অত হতো না — দারোগাবাবু গাঁয়ে গিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করায় আমি নাকি তাকে খ্যাংরাপেটা করে বলেছিলুম, সে যেন জোরজুলুম না করে গাঁয়ে, সে-ই নাকি সাহেবকে বলে এত শাস্তি দিইয়ে দিয়েছে।

'মাগো মা! সে কি খাটুনি জেলে! তবু দিদি, যতদিন মনে ছিল না কিছু ততদিন যে বেশ ভালো ছিলুম। জ্ঞান হয়ে সে কি জ্বালা! তখন কাজের অকাজের মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠত সেই ফিং-দিয়ে ওঠা হলকা রক্ত! ওঃ কত, সে রক্তের তেজ! বাপরে বাপ! সে মনে পড়েলেও আমি এখনও বেহুঁশ হয়ে পড়ি। মাথাটা যখন কাটা গেল, তখন ঐ আলাদা ধড়টা কাৎলা মাছকে ডেঙ্গায় তুললে যেমন করে, ঠিক তেমনি করে 'কাৎরে' 'কাৎরে' উঠছিল! এত রক্ত ও থাকে গো একটা এতটুকু মানুষের দেহে!

আমি এতটুকুও আঁধারে থাকতে পারতুম না ভয়ে! কেননা তখন স্পষ্ট এসে দেখা দিত সেই মাথাছাড়া দেহটা আর দেহছাড়া মাথাটা! — ওঃ —

তারপর দিদি, কোন জজ নাকি সাত-সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসে দিল্লির বাদশাহি তকতে বসলেন, আর সব কয়েদিরা খালাস পেলে! আমিও তাদের সাথে ছাড়া পেলুম।

দেখলি দিদি, ভগবান আছেন! তিনি তো জানেন, আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই। নিজের সোয়ামি-দেবতাকে নরকে যাবার আগেই ও-পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। পুরুষেরা ওতে যাই বলুক, আমি আর আমার ভগবান এই দুই জনাতেই জানতুম, এ একটা মস্ত সোজাসুজি সত্যিকার বিচার! আর পুরুষেরা ও-রকম চেঁচাবেই, — কারণ তারা দেখে আসছে যে, সেই মান্ধাতার আমল থেকে শুধু মেয়েরাই কাটা পড়েছে তাদের দোষের জন্যে। মেয়েরা প্রথম প্রথম এই পুরুষের মতোই চেঁচিয়ে উঠেছিল কিনা এই অবিচারে, তা আমি জানি না। তবে ক্রমে তাদের ধাতে যে এ খুবই সয়ে গিয়েছে এ নিশ্চয়। আমি যদি ঐ রকম একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামি ঐ জন্যে আমাকে কেটে ফেলত, তাহলে পুরুষেরা একটি কথাও বলত না। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বলত, হাঁ, ও রকম খারাপ মেয়েমানুষের ঐ রকমের মরা উচিত। কারণ তারাও বারবার দেখে আসছে, পুরুষের সাত খুন মাফ।

তা ছাড়া, আমি মানুষের দেওয়ার চেয়ে অনেক বড় শাস্তি পেয়েছিলুম নিজের মনের মাঝে। আমার জ্বালাটা যে সদা-সর্বদা কি রকম মোচড়ে মোচড়ে উঠতে, তা কে বুঝত বল দেখি, বুন? নিজের হাতে কাটলেও সে ত ছিল আমার নিজেরই সোয়ামি! কোন জজ নাকি তার নিজের ছেলের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন, তাহলেও — অত শক্ত হলেও — তার বুকে কি একটুকুও লাগে নাই ঐ হুকুমটা দিবার সময়? — আহা, যখন তার বুকে বসে একটা পেরকাণ্ড রাক্ষুসীর মতই তার গলায় দা-টা চেপে ধরলুম, তখন আঃ, কি মিনতি-ভরা গোঙানিই তার গলা থেকে বেরোচ্ছিল! চোখ কি সে একটা ভীত চাউনি আমার ক্ষমা চাইছিল। — আঃ! আঃ!

জেলে রাত্তিরদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে কোন কিছু ভাববার সময় পেতুম, না। মনটাকে ভাববারই সময় দিতুম না। কাজের উপর কাজ চাপিয়ে তাকে এত বেশি জড়িয়ে রাখতুম যে, শেষে যে ঘুম এসে আমাকে অবশ করে দিয়ে যেত, তা বুঝতেই পারতুম না। এখন, যেদিন ছাড়া পেলুম, সেদিন আমার বুকটা কিসের কান্নায় হা হা করে চেচিয়ে উঠল। এতদিন যে বেশ ছিলুম এই জেলের মাঝে! এতদিন আমার মনটা যে খুব শান্ত ছিল! এখন এই ছাড়া পেয়ে আমি যাই কোথা? ওঃ ছাড়া পাওয়ার সে কি বিষের মতন জ্বালা!'

ঘরেই এলুম! — দেখলুম আমার ছেলে বে করেছে। বেশ টুকটুকে মেণীপরা বৌটি! আমি ফিরে এসেছি শুনে গাঁয়ের লোকে 'হাঁ হাঁ' করে ছুটে এল; বললে 'গাঁয়ে এবার মড়কচণ্ডি হবে। বাপরে, সাক্ষাৎ তাড়কা রাক্ষসী এবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে, এবার আর রক্ষা নাই — নিঘঘাত যমালয়! —' পেথম আমি তাদের কথায় কান দিতুম না। মনে করলুম, 'কান করেছি ঢোল, কত বলবি বল'। শেষে কিন্তু আর কান না দিয়েও যে আর পারলুম না। তাদের বলার মাঝে যে একটুও থামা ছিল না! যেন কিছুই হয় নাই এই ভেবে আমি আমার বৌ-বেটা নিয়ে ঘর-সংসার নতুন করে পাতলুম, লোকে লণ্ডভণ্ড করে দিলে। মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলুম, কেউ বিয়ে করলে না, বললে, রাক্ষুসী হবে, এ ডাহা সত্যি কথা! এতদিন যে বেথাটা আমি দুহাত দিয়ে চাপা দিতে চাইছিলুম, সেইটাই দেশের লোক উসকে উসকে বের করে চোখের সামনে ধরতে লাগল! সোনার চাঁদ ছেলে আমার একটি কথাও শুনলে না — আমার যে কমন করে কি হল তা ভুলেও কোন কথার মাঝে জিজ্ঞেস করলে না, খুশি হয়েই আমাকে সংসারের সব ভার ছেড়ে দিলে; কেননা সে বুঝেছিল, যা গিয়েছে তার খেসারতের জন্যে আর একজনকে হারাব কেনে! আর এই কুঁড়াড়ী আঁটকুড়িরা যারা আমার আমার সাত পুরুষের গিয়াতকুটুম নয়, তারা কিনা রাত্তিরদিন খেয়ে না খেয়ে লেগে গেল আমার পেছনে! দেবতাদের শাপের মত এসে আমাদের সব সুখশান্তি নষ্ট করে দিলে! — আমার ছেলেকে তারা একঘরে পতিত করলে, তাতেও সাধ মিটল না। নানান প্রকারে নানান ছুতোয় এই দুটো বছর ধরে কিনা কষ্ট দিয়েছে এই গাঁয়ের লোক! দিদি পথের কুকুরকেও এত ঘেন্না হেনস্থা করে না। এতে যে ভালো মানুষকেই মাথা বিগড়ে যায়, আমার মত শতেক-খুয়ারী ডাইনী রাক্ষুসীর ত কথাই নাই! তাও যদি খুবই সয়ে থাকি, নিতান্ত বিরক্ত না করে তুললে ওদের গালমন্দ দিই না। বত্রিশ নাড়ি পাক দিলে তবে কখনো লোকের মুখ দিয়ে শাপমণ্যি বেরোয়!

'এখন তো তুই সব শুনলি দিদি, এখন বল, দোষ কার? আর তুই ঐ হাতের মালসাটা আমার মাথাটা ভেঙ্গে আমার মাথাটা চৌচির করে দে — সব পাপের শান্তি হোক! — ওঃ ভগবান!!'

Ogress

(**In the Language of the Bagdis of Birvum)**

[A]

"For two whole years now, I've been wondering, and most astonishingly, why do people run away from me the moment they see me? The men, who make such a racket and hullabaloo behind screens in the women's quarters, and whose hideous screams scare children into crying *'Nafsi*! *Nafsi'*! – Those very men, when they see me, slowly back away from their *hookahs*, claiming they have an urgent 'need' to go to the inner quarters! When women see me, they drop their water pots with a thud and take off running! And children, they wrinkle their noses and are utterly terrified! From a thousand yards away, they shout, 'Oh dear, here comes that mad ogress! Run! Run! She'll eat you!' Why? Have I put a plow through anyone's ripe field? Have I set fire to any filled pond? Have I sat on some hussy's daughter's chest and broken a hot *tawa*? Whose body have I put on the hearth, like a piece of wood or kindling? Have I chewed up and eaten any child's raw head? Tell me, sister, what 'business' do they have to say such things to me? Who are they to me? Did I kill her? Yes, I did! I killed my own husband! Did I only kill him? No, I hacked him to pieces with a dao! Why should their hearts pound so much because of that? I didn't snatch anyone's husband from their chest, nor did I commit murder against them. So what right do they have to speak and interfere? Are they my relatives or kin from seven generations back? If they keep acting like this, I tell you, I will truly become an ogress then! With a single stroke of the *dao*, I'll separate their husbands' heads from their bodies, and I'll rip open the women's chests and grind their livers to a pulp! Then my name will truly be Ogress!"

"Who made me mad? These very people! I had set up my home again, as if nothing had happened. Day and night, in every corner, on every path, at work, in gatherings, they slandered me, cursed me, made faces at me, glared at me, calling me an ogress – all of this together completely warped my brain! The pain I had suppressed deep in my heart, they were the ones who awakened it and placed it right before my eyes! Well, you tell me, sister, whose fault is this madness? If you poke and provoke a good person until they go mad, is it their fault, or is it the fault of those good people who drove them mad?"

"My husband was a simple man; he knew nothing but straight paths. He would farm and cultivate, and I would spend the whole day catching fish, husking rice, and pounding paddy to bring home. How else would we manage, sister? We had three dependents then: our elder son was growing up – if he didn't feel pain, he wouldn't gain 'upper sight' – our daughter was also growing tall, and my youngest daughter, whom I held in my lap, was just beginning to utter a word or two, huffing and puffing. Even though we were poor, sister, we never lacked for anything in our household, by your five blessings. This Bindu, at the end of the day, would somehow manage to bring back fish, snails, and mussels – all kinds of things from the earth – for three seers of rice and vegetables. Besides, with your blessings, my elder son was also earning a little money. And the two or four bundles of greens and fish our daughter brought back with the neighborhood wives and daughters also brought in quite a bit of money. Our salt and oil expenses were easily covered by her earnings. On top of all this, whatever paddy and rice my husband brought in from farming and cultivation at the end of the year was enough to last us the whole year, even with lavish eating. What a state our household was in then! It was as if Lakshmi herself had graced us with her gaze. All this was for whom? For those children, wasn't it? I wouldn't cook more than one *seer* of rice a day. I would say, 'Ah, my sons will suffer in the end.' I would give rice to my

husband and sons, and I myself would eat *maad* – just rice foam! What happiness is there for women if not to have their children content? Then our hearts are content! We didn't become *zamindars*. We never begged from anyone, nor did we steal. We earned our money through hard work and spent it. We ate ourselves, and on festivals and special occasions, we would feed two or ten guests and beggars, according to our means. Ah, my heart was full then, sister! People would say I was very 'stingy' because I didn't spend a single paisa unnecessarily. So what if they said that, it didn't matter to me. They didn't know what a burden I carried on my shoulders. I had to marry off two daughters and a son, bring daughters-in-law and sons-in-law into the house, and turn this humble mud house into a joyful Indra's palace. I had two desires – think, sister, how much would that cost? When trouble struck, would anyone lend even a paisa? My dear, this Bindu knows that even if a snake wrapped around her neck, no one would offer even a tiny crumb. And their pride! For me, such things are just talk, nothing more, young man! But I understood, many a barren woman's heart would churn with jealousy seeing our little happiness."

"Thus, our days were passing very happily! I used to think, 'Let me live a few more days like this, serving my husband, raising my children, seeing my grandchildren, and then die with my wealth intact.' But that was not my wretched fate's will. My beloved home became a cremation ground! And all those hopes and dreams turned to ashes! Listen to it all, sister, listen to it all, and if you find fault, then hit me with your broom and sweep away my poison, put seven ovens' worth of stale ashes on my burnt face! Oh, sister, if you hear my tale of sorrow, stone melts into wax, but these heartless people of the village not only offer me no sympathy, but they also provoke my soul day and night with various taunts! I feel like telling all the secrets of my heart to someone, bit by bit, and then crying my heart out to lighten my burden. But whoever I try to approach, they think I'm trying to

eat them! As if I'm worse than a witch! This humiliation and fear make my whole brain throb. And so, my madness only increases. Do I utter such curses and profanities for no reason, sister! You listen to everything and then kick my broken face and make it blunt!"

[B]

"You always knew, sister, Pachu's father was always a simple man; he didn't understand cunning or convoluted talk. He couldn't comprehend showing his nose by twisting his arm around his back instead of directly. How many cunning, river-filling people would exploit him for free labor, tricking money out of his hands, there was no end to it! I often scolded that poor fellow for it, tried to give him advice, but nothing ever worked. As the saying goes, 'Nature doesn't change even in death.'"

"He also had another bad habit; he drank a lot. How many times did I tell him, 'You can drink, no harm in that, but make sure the drink doesn't drink you!' But he wouldn't listen. As soon as he found a moment, whatever he earned, he would pour it at the liquor seller's feet. Well, men always have two or four such bad habits; it doesn't matter much. But then my husband, who was like Shiva himself, did something in the end that, sister, you wouldn't believe, and neither do I now. How could such a simple man like him fall for such a trick, I myself don't understand."

"You know how Raghu Bagdi's two or three 'hooked' barren daughters from that other village caused a ruckus throughout the village. That girl never even made a home with a husband, but instead, she was putting worms in the raw hearts of the neighborhood boys! And what can I say about her parents – oh, I felt like taking poison and dying! Oh mother, they made me despise the entire Bagdi community!"

"You know, *Makhan*-di, it was a false belief among our villagers and our Bagdis that we had a lot of money. And then, how many hussies' daughters spread rumors from house to house

that we had found *yaksha's* treasure! Tell me, sister, isn't that laughable?"

"Because of their greed for that money, that 'widow-turned-whore' girl preyed upon my simple, innocent husband, who was like Shiva. And to be honest, his appearance wasn't bad at all! If he wore a *dhoti* and shawl, he would look like a proper gentleman."

"The day I heard this news, sister, I can't explain to you how I felt. Perhaps people don't feel such pain even when lightning strikes them. That night, I thrashed him terribly! Oh, sister! Even though he, such a mild-mannered man who wouldn't even raise his voice for seven beatings, he grabbed my hair and struck me with a wooden stick! Oh, what a beating it was! My back started bleeding, more than the stick could have caused. But to tell you the truth, I couldn't feel any of that external pain then, because my heart had burst open even more! That day, I clearly understood that my own husband had become a stranger today! I saw that my fate was burnt. It was as if someone was branding my heart with a hot iron then—I burst into sobs!"

"Along with that, all my anger turned towards that accursed girl. I felt like tearing her apart with my nails if I could get my hands on her. But I never managed to catch her. She would always disappear when she saw me."

[C]

"Gradually, my husband started acting worse. He hardly ever came home anymore! He would work for the landlord, eat there, and sleep in their house! I, my son, and all the good people of the village tried to explain to him so much. But alas, we couldn't bring him back; that girl had enchanted him! She had turned him into a fool! Then I understood that my husband had finally lost his mind; he was 'taken by the age of 49'; otherwise, would a man be so blinded by love? One day, I fell at his feet and told him what a

big mistake he was making. He kicked me in the face and left. Something hot, like fire, started radiating from my whole body. I understood that he had gone so far down the path to hell that he couldn't be brought back."

"And then, being mocked and taunted on the streets about that disgusting affair, I swore like a madwoman, 'I will take revenge, I will take revenge! My name is Bindu!'"

"And one day, returning from the fields, I heard that my husband had broken my box and forcibly taken all the few *paisas* I had saved, leaving not a single cowrie behind. I also heard that two days later, he would have his 'hook-up' with that girl. Everything was arranged. He had reportedly taken all that cash and poured it at the 'holy feet' of his future in-laws. Oh, my money, dearer than my blood! Would it come to this in the end? Can a person sink so low? There was no time to think then; I had to do whatever needed to be done within those two days, after that, there would be no more time. I started thinking, what can I do? A god-like man was descending step by step into hell, not far now, yet there was no way to bring him back. Would it be a sin to kill him then? Besides, I am his 'wife', and I also have a duty. If my husband goes astray, who else will come and bring him back if I don't? And if he goes astray like this, morally, I am responsible before God. Suppose I end his life right now, then he will have no more sins. All the sin will be mine. So be it. If a husband's sin isn't taken by his 'wife', will the ghost of a *sheora* tree come and take it?"

"I hardened my heart! Yes, I will kill him, come what may! God, you are my witness, before my divine husband descends into hell, I will offer his life to you like a China-rose flower at your feet. You forgive all my sins and give me only sorrow and pain! That is my joy!"

"That evening, after a light drizzle, the sky had cleared nicely. At that moment, I saw my husband alone, sitting under the tamarind tree behind Hussy's house, intently carving something

with a small knife! I quickly figured out what to do! I looked around; there was no one anywhere. Like a madwoman, I rushed and took out the *dao*. The red light of the setting sun glinted on the *dao*. Then the rain started again in that hazy sunlight—drip, drip, drip!"

"Near the house, a group of naked boys were singing,
getting drenched in the rain:
'It rains in the sunshine,
Jackals get married.'"

"I hid the *dao* in my sari and ran like a tigress, and oh, with what force I sat on his chest! He couldn't throw me off, no matter how hard he tried! As I struck a massive blow on his neck, my hand went numb! Then he ran and fell, screaming, into the jute field nearby! By then, I had turned bloodthirsty. I went again and struck two more blows, and his head separated from his neck! After that, only red and red! Only blood danced around me! After that, I don't remember anything."

"The day I fully regained consciousness, I found myself in a new place, surrounded by so many different kinds of people! And I was most surprised to see that I, too, was crushing things vigorously among them! After all this time, the sunlight – oh, how beautifully white it looked! Before, my eyelids were just a vast expanse of red. I asked and learned that it was *Shuri* Jail. I had been sentenced to seven years in prison! Only three months had passed. I had apparently confessed everything to the Magistrate *Saheb* myself. My punishment wouldn't have been so severe, but the Daroga *Babu*, after going to the village and making a big fuss, claimed I had hit him with a broom and told him not to cause trouble in the village, and he had then told the *Saheb*, which resulted in such a heavy sentence."

"Oh, mother! What hard labor in jail! But sister, as long as I remembered nothing, I was quite fine. But once consciousness returned, what agony! Then, amidst work and idleness, that

splashing blood would float before my eyes! Oh, the intensity of that blood! My dear! Even now, when I remember it, I faint. When his head was cut off, that separated body part thrashed exactly like a *katla* fish when you pull it onto the bank! So much blood, how can so much blood be in such a small human body! I couldn't stand even a little darkness out of fear! Because then, that headless body and that bodiless head would clearly appear before me! Oh!"

"Then, sister, some judge, they say, came crossing seven seas and thirteen rivers and sat on the royal throne of Delhi, and all the prisoners were released! I too was released with them."

"You see, sister, God exists! He knows that I have done nothing but justice. I removed my husband-god from that path before he went to hell. Let men say what they want; only I and my God knew that this was a perfectly straightforward and true judgment! And men will shout like that, because they have seen from time immemorial that only women have been cut down for their faults. I don't know if women initially shouted against this injustice like men. But it is certain that over time, they have become quite accustomed to it. If I had caused such a ruckus and my husband had killed me for it, men would not have said a word. Women too would have said, 'Yes, such a bad woman deserves to die like that.' Because they too have repeatedly seen that men are forgiven for seven murders."

"Besides, I received a far greater punishment than what men could inflict, within my own heart. Who could understand, sister, how my agony would constantly twist and turn? Even though I cut him with my own hands, he was still my own husband! Some judge, they say, had given the order for his own son's hanging – even then, no matter how hard, did his heart not feel even a tiny bit of pain when giving that order? Oh, when I sat on his chest and pressed the *dao* against his throat like a dreadful ogress, oh, what a pleading moan escaped his throat! What a frightened look in his eyes, begging for my forgiveness! Oh! Oh!"

"In jail, day and night, I was busy with work and had no time to think. I wouldn't even give my mind time to think. I would pile work upon work and keep myself so entangled that I wouldn't even realize when sleep came and incapacitated me. Now, the day I was released, my heart cried out with some unknown sorrow. I had been so well inside this jail all this time! My heart had been so peaceful all this time! Now that I am free, where do I go? Oh, the agony of freedom is like poison!"

"I came home! I saw that my son had married. A very fair and charming daughter-in-law! When people in the village heard I had returned, they rushed over, crying, 'Hoo! Hoo!' They said, 'Now there will be death and destruction in the village! Oh dear, the *Taraka* ogress herself has returned to the village, now there's no escape—definitely *Yamaraja's* abode!' At first, I paid no attention to their words. I thought, 'I've made my ears into drums, say whatever you want.' But in the end, I couldn't ignore it anymore. There was no stopping their talking! Thinking that nothing had happened, I started a new household with my daughter-in-law and son, but people ruined it. I tried to marry off my daughter, but no one would marry her, saying, 'She'll become an ogress, this is the plain truth!' The pain I had tried to suppress with both hands all this time, the people of this country kept poking and prodding it, bringing it right before my eyes! My golden son didn't listen to a word! He didn't even ask in any conversation what had happened to me, even by mistake. He happily left all the responsibilities of the household to me, because he understood that he shouldn't lose another person to compensate for what was lost! And these barren, childless women, who are not my relatives from seven generations back, day and night, without eating or sleeping, they stuck to my heels! They came like curses from the gods and destroyed all our happiness and peace!"

"They ostracized my son, but even that didn't satisfy them. In various ways, with various excuses, these villagers have been

tormenting me for two years now! Sister, they don't even treat street dogs with such contempt and humiliation. This can drive even a good person mad, let alone a hundred-times-cursed witch-ogress like me! Even then, if I remain very patient and they don't utterly provoke me, I don't curse them. It takes thirty-two twists of the intestines for curses to ever come out of people's mouths!"

"Now, sister, you've heard everything. Now tell me, whose fault is it? And you, take that earthen pot in your hand and smash my head, split my head wide open—let all sins be punished! Oh God!!"

Translated by Alamgir Mohammad

রাজবন্দীর চিঠি

প্রেসিডেন্সী জেল, কলিকাতা
মুক্তি-বার, বেলা-শেষ

প্রিয়তমা মানসী আমার!
আজ আমার বিদায় নেবার দিন! একে একে সকলেরই কাছে বিদায় নিয়েছি। তুমিই বাকি। ইচ্ছা ছিল, যাবার দিনে তোমায় আর ব্যথা দিয়ে যাব না, কিন্তু আমার যে এখনও কিছুই বলা হয়নি। তাই ব্যথা পাবে জেনেও নিজের এই উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিটাকে কিছুতেই দমন করতে পারলুম না। তাতে কিন্তু আমার দোষ দিতে পারবে না, কেন না তোমার মনে তো চিরদিনই গভীর বিশ্বাস যে, আমার মতন এত বড় স্বার্থপর হিংসুটে দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

আমার কথা তোমার কাছে কোনদিনই ভাল লাগে নি (কেন, তা পরে বলছি), আজও লাগবে না। তবু লক্ষ্মী, এই মনে করে চিঠিটা একটু পড়ে দেখো যে, এটা একটা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া পথিকের অস্ত-পারের পথহারা পথে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বিদায়-কান্না। আজ আমি বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্মম। আমার কথাগুলো তোমার বে-দাগ বুকে না-জানি কত দাগই কেটে দিবে! কিন্তু বড় বেদনায় প্রিয়, বড় বেদনায় আজ আমায় এত বড় বিদ্রোহী, এত বড় স্বেচ্ছাচারী উন্মাদ করে তুলেছে। তাই আজও এসেছি কাঁদাতে। তুমিও বল, আমি আজ জল্লাদ, আমি আজ হত্যাকারী কসাই। শুনে একটু সুখী হই।

আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত। তাই কোন কথাই হয়তো গুছিয়ে বলতে পারব না। যার সারাজীবনটাই বয়ে গেল বিশৃঙ্খল আর অনিয়মের পূজা করে, তার লেখায় শৃঙ্খলা বা বাঁধন খুঁজতে যেও না। হয়তো যেটা আরম্ভ করব সেইটাই শেষের, আর যেটায় শেষ করব সেইটাই আরম্ভের কথা! আসল কথা, অন্যে বুঝুক চাই নাই বুঝুক, তুমি বুঝলেই হল। আমার বুকের এই অসম্পূর্ণ না-কওয়া কথা আর ব্যথা তোমার বুকের কথা আর ব্যথা দিয়ে পূর্ণ করে ভরে নিও। — এখন শোন।

প্রথমেই আমার মনে পড়ছে (আজ বোধ হয় তোমার তা মনেই পড়বে না), তুমি যেন একদিন সাঁঝে আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে, — কি করলে তুমি ভাল হবে?

তোমারই মুখে আমার রোগ-শিয়রে এই নিষ্ঠুর প্রশ্ন শুনে অভিমানের গুরু বেদনায় আমার বুকের তলা যেন তোলপাড় করে উঠল!

হায়, আমার অসহায় অভিমান! হায়, আমার লাঞ্ছিত অনাদৃত ভালবাসা! আমি তোমার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। দেওয়া উচিতও হতো না! তখন আমার হিয়ার বেদনা-মন্দিরে যেন লক্ষ তরুণ সন্ন্যাসীর ব্যর্থ জীবনের আর্ত হাহাকার আর বঞ্চিত যৌবনের সঞ্চিত ব্যথা-নিবেদনের গভীর আরতি হচ্ছিল। যার জন্যে আমার এত ব্যথা, সেই এসে কিনা জিজ্ঞেস করে, — তোমার বেদনা ভাল হবে কিসে?...

মনে হলো, তুমি আমায় উপহাস আর অপমান করতেই অমন করে ব্যথা দিয়ে কথা কয়ে গেলে। তাই আমার বুকের ব্যথাটা তখন দশ গুণ হয়ে দেখা দিল। আমি পাশের বালিশটা বুকে জড়িয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার সবচেয়ে বেশি লজ্জা হতে লাগল, পাছে তুমি আমার অবাধ্য চোখের জল দেখে ফেল! পাছে তুমি জেনে ফেল যে, আমার বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠছে! যে আমার প্রাণের দরদ বোঝে না, সেই বে-দরদীর কাছে চোখের জল ফেলা আর ব্যথায় এমন অভিভূত হয়ে পড়ার মত দুর্নিবার লজ্জা আর অপমানের কথা আর কি থাকতে পারে? কথাও কইতে পারছিলুম না, ভয় হচ্ছিল এখনই আর্দ্র গলার স্বরে তুমি আমার কান্না ধরে ফেলবে।

যাক, ভগবান আমায় রক্ষা করলেন সে বিপদ থেকে। তুমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলে। তারপর আস্ত আস্তে চলে গেলে। তুমি বোধ হয় আজ পড়ে হাসবে, যদি বলি যে, আমার তখন মনে হলো, যেন তুমি যাবার বেলায় ছোট্ট একটি শ্বাস ফেলে গিয়েছিলে। হায় রে অন্ধ বধির ভিখারি মন আমার! যদি তাই হতো, তবে অন্তত কেন আমি অমন করে শুয়ে পড়লুম, তা একটু মুখের কথায় শুধাতেও তো পারতে!

তুমি চলে যাবার পরেই ব্যথার অভিমানে আমার বুক যেন একেবারে ভেঙে পড়ল। নিষ্ফল আক্রোশে আর ব্যর্থ বেদনায় জ্বালায় আমি হুঁকরে হুঁকরে কাঁদতে লাগলুম। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তারপর ডাক্তার এল, আত্মীয়-স্বজন এল, বন্ধু-বান্ধব এল। সবাই বললে, — হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বড় অস্বাভাবিক। গতিক... ডাক্তার বললে, — রোগী হঠাৎ কোনো — ইয়ে — কোনো — বিশেষ কারণে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছে। এ কিন্তু বড্ডো খারাব। এতে এমনও হতে পারে যে...।

বাকিটুকু ডাক্তার আমতা আমতা করে না বললেও আমি সেটার পূরণ করে দিলুম, — 'একবারে নির্বাণ দীপ গৃহ অন্ধকার! না ডাক্তার বাবু? — বলেই হাসতে গিয়ে কিন্তু এত কান্না পেল আমার যে, তা অনেকেরই চোখ এড়াল না। সত্যিই তখন আমার কণ্ঠ বড় কেঁপে উঠেছিল, আর অধর কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিল। আমি আবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। অনেক সাধ্য-সাধনা

করেও কেউ আর আমায় তুলতে পারল না। আমার গোয়ার্তুমির অনেকক্ষণ ধরে নিন্দে করে বন্ধু-বান্ধবরা বিদায় নিলে। আমিও মনে মনে খোদাকে ধন্যবাদ দিলুম।

হায়, এই নিষ্ঠুর লোকগুলো কি আমায় একটু নিরিবিলি কেঁদে শান্তি পেতেও দেবে না?... তখনও তোমরা সবাই কেউ আমার পাশে, কেউ আমার শিয়রে বসেছিলে। হঠাৎ মনে হল, তুমি এসে আমার হাত ধরেছ। এক নিমিষে আমার সকল ব্যথা যেন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। এবারেও কান্না এল, কিন্তু সে যেন কেমন এক সুখের কান্না! তবে এ কান্নাতেও সে অভিমান ছিল না, তা নয়। তবু তোমার ঐ ছোয়াটুকুর আনন্দেই আমি আমার সকল জ্বালা সকল ব্যথা-বেদনা মান-অপমানের কথা ভুলে গেলুম। মনে হল, তুমি আমার — তুমি আমার — একা আমার! হায় রে শাশ্বত ভিখারি! চিরতৃষাতুর দীন অন্তর আমার! কত অল্প নিয়েই না তুই তোর আপন বুকের পূর্ণতা দিয়ে তাকে ভরিয়ে তুলতে চাস, তবু তোরই আপন জনকে আর পেলিনে।

খানিক পরেই আমি আবার সকলের সঙ্গে দিব্যি প্রাণ খুলে হাসি-গল্প জুড়ে দিলুম দেখে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে। কেউ বুঝল না, হয়তো তুমিও বোঝ না, কেমন করে অত অধীর বেদনা আমার এক পলকে শান্ত স্থির হয়ে গেল। সে সুখ সে ব্যথা শুধু আমি জানলুম আর আমার অন্তর্যামী জানলেন। হা, সত্যি বলব কি? আরও মনে হয়েছিল, সে ব্যথা যেন তুমিও একটু বুঝতে পেরেছিলে? দেখছ কি কি ভিখিরী মন আমার! তুমি না জানি আমায় কতই ছোট মনে করছ! আহা একবার যদি মিথ্যা করেও বলতে লক্ষ্মী যে, আমার ব্যথার কারণ অন্তত তুমি মনে মনে জেনেছ, তাহলে আমি আজ অমন করে হয়তো ফুটতে না ফুটতেই ঝরে পড়তুম না! আমার জীবন এমন ছন্ন-ছাড়া 'দেবদাস'-এর জীবন হয়ে পড়ত না! যাঃ, খেই হারিয়ে বসেছি আমার কথার।

হাঁ, সে দিন তোমার ঐ একটু উষ্ণ ছোঁয়ার আনন্দেই বিভোর হয়ে রইলুম। তার পরের দিন মনে হতে লাগল, তোমায় আড়ালে ডেকে বলি, কেন আমার এ বুক-ভরা ব্যথার সৃষ্টি সারাদিন তোমার পানে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলুম, যদি আবার এসে জিজ্ঞেস কর তেমনি করে, 'কি করলে তুমি ভাল হবে?'

হায়রে দুর্ভাগার আশা! তুমি ভুলেও আর সে-কথাটি আর একবার শুধালে না এসে! সারাদিন আকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে-শেষের সাথে সাথে আমারও প্রাণ যেন কেমন নেতিয়ে পড়তে লাগল। আমার কাঙাল আত্মার এক নির্লজ্জ বেদনা ভুলবার জন্যে আমার সব চেয়ে প্রিয় গানটা বড় দুঃখে বড় প্রাণ ভরেই গাইতে লাগলুম, —

'তুমি জান ওগো অন্তর্যামী
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি
ভাবনা আমার বাঁধল না কো বাসা।

কোমল তাদের স্রোতের পরেই ভাসা,
তবু আমার মনে আছে আশা,
তোমার পায়ে ঠেকবে তারা স্বামী
টেনেছিল কতই কান্না হাসি,
বারে বারেই ছিন্ন হল ফাঁসি
শুধোয় সবাই হতভাগ্য বলে —
'মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে?'
জানি জানি, নামবে তোমার কোলে
আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি!'

আমার কণ্ঠ আমার আঁখি আমারই ব্যথায় ভিজে ভারি হয়ে উঠল। আমার গানের সময় আমি আর বাহিরকে ফাঁকি দিতে পারি নে। সে-সুর তখন আমার স্বরে কেঁপে কেঁপে ক্রন্দন করে, সে সুর সে কান্না আমার কণ্ঠের নয়, আমার প্রাণের ক্রন্দসী। গান গেয়ে মনে হল, যেন এই বিশ্বে আমার মতন ছন্ন-ছাড়ারও অন্তত একজন বন্ধু আছেন, যিনি আমার প্রাণের জ্বালা, মর্ম-ব্যথা বোঝেন, আমার গান শুনে যার চোখের পাতা ভিজে ওঠে। তিনি আমার অন্তর্যামী। অমনি এ-কথাটিও মনে হয়েছিল যে, যদি সত্যি আমার কেউ প্রিয়া থাকত, তাহলে সে আমার ঐ 'শুধায় সবাই হতভাগ্য বলে, মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে? — ঐটুকু শুনবার পরই আর দূরে থাকতে পারত না, তার কোলে আমার মাথাটি থুয়ে সজল কণ্ঠে বলত, — 'ওগো আমার কোলে প্রিয়, আমার কোলে! তার করুণ কণ্ঠে করুণ মিনতি ব্যথায়-অভিমানে কেঁপে কেঁপে উঠত, — 'ছি লক্ষ্মী! এ গান গাইতে পারবে না তুমি!'

কী বিশ্রী লোভী আমি, দেখেছ? তুমি হয়তো এতক্ষণ হেসে লুটিয়ে পড়েছ আমার এই ছেলে-মানুষী আর কাতরতা দেখে! তুমি হয়তো ভাবছো, কি করে এত বড় দুর্জয় অভিমানী, দুরন্ত বাঁধন-হারা এমন করে নেতিয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়তে পারে, কেমন করে এক বিশ্বজয়ীর এত অল্প এমন আশ্চর্য এত বড় পরাজয় হতে পারে! তা ভাব, কোন দুঃখ নেই! আমিও নিজেই তাই ভাবছি। কিন্তু ভয় হয় প্রিয়, কখন তোমার এত গরব না-জানি এক নিমিষে টুটে গিয়ে সলিল বয়ে যাবে নয়ানে! সেই দিন হয়তো আমার এ ভালবাসার ব্যথা বুঝবে। আমার এই পরাজয়ের মানেও বুঝবে সে-দিন। যাক, যা বলছিলাম তাই বলি — গান গেয়ে কেন আমার মনে হল, আমার অন্তর্যামী আমার আঁখির আগে এসে নীরবে জল-ছল-ছল চোখে দাঁড়িয়ে। চোখের জল মুছে সামনে চাইতেই, — ও খোদা! কে তুমি দাঁড়িয়ে অমন করুণ চোখে আমার পানে চেয়ে? আহা, চটুল চোখের কালো তারা দুটি তাদের দুষ্টুমি চঞ্চলতা ভুলে গিয়ে ব্যথায় যেন নিথর হয়ে গেছে! সে পাগল-চোখের কাজল আঁখি-পাতা যেন জল-ভরাতুর। ওগো আমার অন্তর্যামী। তুমি কি সত্য সত্যই এই সাঁঝের তিমিরে আমার আঁখির আগে এসে দাঁড়ালে? হে আমার দেবতা! তবে কি আমার আজিকার এ সন্ধ্যা-

আরতি বিফলে যায় নি? আমি আমার সব কিছু ভুলে কেমন যেন আত্মবিস্মৃতের মত বলে উঠলুম, তুমি আমার চেয়ে কাউকে বেশি ভালবাসতে পাবে না! কেমন?
কোন কথা না বলে তুমি আমার কোলের ওপরকার বালিশটিতে এসে মুখ লুকালে। কেন? লজ্জায়? না সুখে? না ব্যথায়? জানি না কেন। তাই তো আজ আমার এত দুঃখ আর এত প্রাণ-পোড়ানি। তোমার প্রাণের কথা তুমি কোন দিনই একটি কথাতেও জানাও নি, তাই তো আজ আমার বুক জুড়ে এত না-জানার ব্যথা। অনেক সাধ্য-সাধনায় তুমি মুখ তুলে চাইলে, কিন্তু বললেনা, কেন অমন করে মুখ লুকালে। সে দিন একটিবার যদি মিথ্যা করেও বলতে, — হে আমার চির জনমের প্রিয়! যে,...। না, না, যাক সেকথা।

এইখানে একটা মজার খবর দিই তোমাকে। এই হাজত-ঘরে বসেও আমার এমন অসময়ে মনে হচ্ছে, যেন আমি একজন কবি! রোসো, এখনই হেসে লুটিয়ে পড়োনা! তোমার চেয়ে আমি ভাল করেই জানি যে, আমার কবি না হওয়ার জন্যে যা-কিছু চেষ্টা-চরিত্রির করার প্রয়োজন, তার কোনটাই বাদ দেননি ভগবান। তাই আমার বাহির-ভিতর সব কিছুই যেন খোট্টাই মুলুকের চোট্টাই ভেইয়্যার মতই কাঠখোট্টা! তবু যদি আমি কবি হতুম, তাহলে আমার এই ভাবটাকে কি সুন্দর করেই না বলতুম, —

শুধু অনাদর শুধু অবহেলা শুধু অপমান!

ভালবাসা? — সে শুধু কথার কথা রে!

অপমান কেন শুধু! প্রাণ দিলে পায়ে দলে যাবে তোর প্রাণ!

শুধু অনাদর, শুধু অবহেলা, শুধু অপমান!

যাক্ যা হই নি, কপাল ঠুকলেও আর তা হচ্ছি নে। এখন যা আছি, তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক।

দাঁড়াও, — অভিমান করে চেঁচিয়ে হয়তো ও-কথাটার অপমানই করছি আমি। নয় কি? আমার মতন হয়তো তুমিও ভাবছ, কার ওপর এ অভিমান আমার? কে আমায় এ অধিকার দিয়েছে এত অভিমান দেখাবার? একবিন্দু ভালবাসা পেলাম না, অথচ এক সিন্ধু অভিমান নিয়ে বসে আছি! তবু শুনে আশ্চর্য হবে তুমি যে, সত্যি-সত্যিই আমার বড্ড অভিমান হয়। যার ওপর অভিমান করি, সে আমার এ-অভিমান দেখে হাসবে, না দু-পায়ে মাড়িয়ে চলে যাবে, সে-দিকে ভ্রূক্ষেপও করি না। চেয়েও দেখি না, আমার এত ভালবাসার সম্মান সে রাখবে কিনা, শুধু নিজের ভালবাসার গরবে আর অন্ধতায় মনে করি, সেও আমায় ভালবাসে! তাই তো আজ আমার এত লাঞ্ছনা ঘরে-বাইরে!

অনেক পথিক-বালা এ পথিকের ব্যথা মুছিয়ে দিতে চেয়েছিল, হয়তো ভালও বেসেছিল (শুনে হেসো না), আমি কিন্তু ফিরেও চাইনি তাদের পানে। ওরমধ্যে আমার

কতকটা গরবও ছিল। মনে হতো, এ বালিকা তো আমার সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারবেনা অনর্থক কেন তার জীবনটাকে ব্যর্থ করে দেবো? যে-সে এসে আমার মতন বাঁধন হারা বিদ্রোহীর মনটাকে এত অল্প সাধনায় জয় করে নেবে, এও যেন সইতে পারতুম না। তাই কোন হতভাগির মনে আমার ছাপ লেগেছে বুঝতে পারলেই আমি অমনি দূরে — অনেক দূরে সরে যেতুম; আর দেখতুম, তার এ আকর্ষণের জোর কত — সে সত্যি আমায় ভালবাসে, না একটু করুণা করে, না ওটা মোহ? ঐ দূরে সরে যাবার আর একটা কারণ ছিল যে, আমাদের কাউকে যেন কোন দিন অনুতাপ করতে না হয় শেষে কোন ভুলের জন্যে।

আমার এক জায়গায় বড় দুর্বলতা আছে। স্নেহের হাতে আমার মত এমন করে কেউ বুঝি আত্মসমর্পণ করতে পারে না। তাই কেউ স্নেহ করছে বুঝলেই অমনি বাধা পড়বার ভয়ে আমি পালিয়ে যেতুম। ঐ দূরে গিয়ে কিন্তু অনেকেরই ভুল ধরা পড়ে গেছে। অনেকেই নাকি আমায় ভালবেসেছিল, কিন্তু তাদের সকলেরই মনের মিথ্যেটা আমি দেখতে পেয়েছিলুম ঐ দূরে সরে গিয়েই। তাদের কেউ আমায় তার জীবন ভরে পেতে চায় নি। আমি পথিক, তাই পথের মাঝে আমায় একটু ক্ষণের জন্যে পেতে চেয়েছিল মাত্র। তাই কেউ আমায় কোনদিনই তার হাতের নাগালের মধ্যেও পেলে না। অনেকে বলে, হয়তো এটাও আমার অভিমান। জানি না। কিন্তু দু-এক জায়গায় একটু আত্মবিস্মৃত হয়ে যেই নিকটে আসতে চেয়েছি, অমনি সে আমার দেবতার — আমার ভালবাসার বুকে জোর পদাঘাত ক'রেছে। তবু কি তুমি বলবে, ও আমার অহেতুক অভিমান?

এইখানে একটা কথা মনে রেখ কিন্তু যে, এই যে, যারা আমায় পেতে চেয়েছিল, তাদের সকলেই আগে আমায় ভালবেসেছিল, আমি কখনও তাদের ভালবাসি নি। অত পেয়েও আমার মন চিরদিন বলে এসেছে, — এ নহে, এ নহে!

হায় আমার অতৃপ্ত হিয়া! কাকে চাস তুই? কে সে তোর প্রিয়তমা? কে সে গরবিনী, কোথায় কোন্ আঙিনা-তলে তোর তরে মালা-হাতে দাঁড়িয়ে রে?... আমার মনের যে মানসী প্রিয়া, তাকে না পেয়েই তো কাউকে ভালবাসতে পারলুম না এ-জীবনে! কতগুলো কচি বুকই না দলে গেলুম আমার জীবনের আরম্ভ হতে না হতেই, তা ভেবে আজ আমার কষ্টের অন্ত নেই। তবে আমার এইটুকু সান্ত্বনা যে, আমি কখনও কারুর ভালবাসার অপমান করিনি। কাউকে ভালবেসেছি বলে প্রলোভন দেখিয়ে শেষে পথে ফেলে চলে যাই নি। উল্টো তাদের কাছে দুহাত জুড়ে ক্ষমাই চেয়েছি, অমনি করে সুদূর থেকেই। আমায় ভাল না বাসতে অনুরোধ করে তার পথ থেকে চিরদিনের মত সরে গিয়েছি। পাছে কোনদিন কোন কাজে তার বাধা পড়ে, সেই ভয়ে আর কোনদিন তার পথের পাশ দিয়েও চলি না। অনেকে আমায় অভিশাপও দিয়েছে আমার এই নির্মমতার জন্যে, অনেকে আবার অহঙ্কারী দর্পী বলে গালও দিয়েছে।

এমনি করে বিজয়ী বীরের মত আপন মনে পথে-বিপথে আমার রথ চালিয়ে বেড়াচ্ছিলুম। এমন সময় একদিন সকালে তোমায় আমায় দেখা। হঠাৎ আমার রথ থেমে গেল। আমার মন কি এক বিপুল সুখে আনন্দ-ধ্বনি করে উঠল, — পেয়েছি, পেয়েছি! আমার মনের পথিক বন্ধু-হঠাৎ ম্লান মুখে আমার সামনে এসে বলল — বন্ধু বিদায়! আর তুমি আমার নও, এখন তুমি, তোমার মানসীর! তোমার পথের শেষ হয়েছে। দেখলুম, সে-পথের শেষে দিগন্তের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এতদিন আমায় শত সাধ্য-সাধনা করেও পথিক-বালারা আমার রথ থামাতে পারেনি, কতজন রথের চাকার সামনে বুক পেতে শুয়ে পড়েছে, আমি হাসতে হাসতে তাদের বুকের ওপর রথ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছি, কিন্তু হায়, আজ আমার এ কি হল? রথ যে আর চলে না! তুমি শুধু আমার পানে চোখ তুলে চাইলে মাত্র, একটু সাধলেও না যে, পথিক! আমার দ্বারে একটু থাম!

তবু আমার দুঃখ হল না, মান-অপমান জ্ঞান রইল না, আমি মালা-হাতে রথ থেকে নেমে পড়লুম। তোমার গলায় আমার জন্ম-জন্মের সাধের গাঁথা মালা পড়িয়ে দিলুম। তুমি নীরবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলে। তোমার ঐ মৌন বুকের ভাষা বুঝতে পারলুম না। প্রাণ যেন কেমন করে উঠল। তুমি সুখী হলে, না ব্যথা পেলে, কিছুই বোঝা গেল না। অমনি চির-অভিমানী আমার বুকে বড়ই ব্যথা বাজল। ভগবান কেন অন্যের মনটি দেখবার শক্তি দেন নি মানুষকে? কিন্তু তোমার প্রতি অভিমান আমার যতই হোক, তোমাকে নালিশ করবার কিছুই ছিল না আমার (আজও নেই)। আমি যে তোমার মনটি না জেনেই তোমায় ভালবেসেছি। চিরদিন জয় করে ফিরে তোমার গলায় যে হার-মানা হার পরিয়েছি — তুমি যে আমার মানসী প্রিয়া! অমার মনে-মনে জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে ছবি আঁকা ছিল, যাকে খুঁজতে এমন করে আমার এমন চিরন্তন-পথিক বেশ, সে-মানসীকে দেখেই চিনে নিয়েছ। তাই আমি একটুক্ষণের জন্যেও ভেবে দেখিনি, তুমি এ পরাজিত বিদ্রোহীর নৈবেদ্য-মালা হেসে গ্রহণ করবে না, পায়ে ঠেলে চলে যাবে। তুমি যদি আমায় ভালবাসতে না পারো, তার জন্যে তো তোমায় দোষ দিতে পারি নে। আমি জানি, খুব জানি প্রিয়, যে, কোন মানুষেরই মন তার অধীন নয়। সে যাকে ভালবাসতে চায়, যাকে ভালবাসা কর্তব্য মনে করে, মন তাকে কিছুই ভালবাসবে না। মন তার মনের মানুষের জন্যে নিরন্তর কেঁদে মরছে, সে অন্যকে ভালবাসতে পারে না। কত জন্ম ধরে তোমায় খুঁজে বেড়িয়েছি এমনি করে, তুমি কিন্তু ধরা দাওনি। এবারেও ধরা দিলে না। কখন কোন জন্মে কোন নাম-হারা গাঁয়ের পাশে তোমায় আমায় ঘর বাঁধব, কখন তুমি আমায় ভালবাসবে জানি নে। তবু আমি তোমায় ভালবাসি, তাই আমার এই বিপুল অভিমান তোমার ওপর।

ধরো, আমার এ অভিমান যদি মিথ্যে হয়, যদি সত্যিই তুমি আমায় ভালবাস, তা'হলে হয়তো মনে করবে যে, আমি কেন তোমায় ভুল বুঝে এমন করে কষ্ট পাচ্ছি। কেন তোমাকে এমন করে ব্যথা দিচ্ছি। সেই কথাটি জানবার জন্যেই কাল সারা রাত্রির ধরে তোমার দয়ার দান চিঠি ক'টি নিয়ে হাজার বার করে পড়েছি, কিন্তু হায়, তাতেও এমন কিছু পেলুম না, যাতে করে আমার এই নির্মম ধারণা, কঠোর বিশ্বাস দূর হয়ে যেতে পারে। আমার দুঃখে, আমার বেদনায় করুণা-বিগলিত হৃদয়ে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছ, অনেক কিছু লিখেছ, অনেক জায়গায় পড়তে পড়তে চোখের জলও বাধা মানে না, কিন্তু 'তোমায় আমি ভালবাসি এই কথাটি কোথাও লেখনি — ভুলেও না। ঐ কথাটি ঢাকবার জন্যে যে সলজ্জ কুণ্ঠা বা আকুলতা, তাও নেই কোন চিঠির কোনোখানটিতেই। হায়রে অন্ধ বিশ্বাস আমার! তবু এতদিন কত অধিকার নিয়ে কত অপমানে আজ বুকের বেদনা শতগুণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, তবু কিন্তু আর তোমায় ছেড়ে চলে যেতে পারছি নে। এবার যে আমি আগে ভালবেসেছি! যে আগে ভালবাসে, প্রায়ই তার এই দুর্দশা এই লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। তাই বড় দুঃখে আজ অবিশ্বাসী নাস্তিকের মত এই বলে মরতে যাচ্ছি যে, পৃথিবীতে ভালবাসা বলে কোন জিনিস নেই। ভালবেসে ভালবাসা পাওয়া যায় না এই অবহেলার মাটির ধরায়। মানুষ কত বড় ঘা খেয়ে অবিশ্বাসী নাস্তিক হয়, তা যে নাস্তিক হয়, সেই বোঝে। জানি, ভালবেসে আত্মদানেই তৃপ্তি। বিশ্বাসও করি, যে, যাকে সত্যিকার ভালবাসা যায়, সে অপমান আঘাত করলে হাজার ব্যথা দিলেও তাকে ভোলা যায় না। প্রিয়ের দেওয়া সেই ব্যথাও যেন সুখের মতই প্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে এত প্রাণ-ঢালা ভালবাসার বিনিময়ে একটু ভালবাসা পাবার জন্যে প্রাণটা হা-হা করে কেঁদে ওঠে না, এ যে বলে সে সত্যি কথা বলে না।

পুরুষ জন্ম-জন্ম সাধনা করেও নারীর মন পাচ্ছে না। নারীর অন্তরে রহস্য বড় জটিল, বড় গোপন। নারী সব দিতে পারে, কিন্তু তার মনের গোপন মঞ্জুষার কুঞ্জিকাটি যেন কিছুতেই দিতে চায় না। শুনেছি, কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে তবে তার হাতে ঐ চাবিকাঠিটি নাকি সমর্পণ করে। তোমার ওপর আজ আমার এত অভিমান কেন, জান? তুমি আমার সকল আদর সকল সোহাগ আমার দুরন্ত ভালবাসার সকল বাড়াবাড়ি নীরবে সয়ে গেছ। কখনো এতটুকু প্রতিবাদ কর নি। তোমার মুখ দেখে কোনদিন বুঝতে পারি নি, তুমি আমার সে আদর-সোহাগে ব্যথা পেয়েছ, না সুখী হয়ে। তোমার মুখে কোনদিন এক রেখা হাসিও ফুটে উঠতে দেখি নি সে সময়। তাই আজ এই কথাটি ভাবতে বুক আমার ভেঙে পড়ছে যে, হয়তো তুমি দায়ে পড়েই আমার অত বাড়াবাড়ি নীরবে সয়েছ, হয়তো ওতে কত ব্যথাই পেয়েছ মনে মনে। কোন চিঠিতে ও-কথাটির ভুলেও উল্লেখ কর নি। তাই মনে হয়, ওটাকে কোন রকমে চাপা দেওয়াই তোমার ইচ্ছা। ফিরলেও আর সে-কথা কখনও তুলব না, না ফিরলে

তো নয়ই। তাতে প্রাণ যত বেশিই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাক না কেন। যদি ফিরি, তবে আর একবার আত্মদ্রোহী হবার শেষ চেষ্টা করব। কিন্তু হায়! কার কাছে এ-কথা বলেছি! কোন্ পাষাণ মৌন-নির্বাক দেবতা আমার এ তিক্ত ক্রন্দন শুনছে? যা বলছিলাম, তাই বলি।

আমি কেন সুখী হতে পারছি নে জানো? সাধারণ লোকের মতন সহজ ভালবাসায় তুষ্ট হতে পারছি নে বলে। আমারই চারি পাশে আর সক্কলে কেমন খাচ্ছে-দাচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করছে আবার তখনই মিল হয়ে যাচ্ছে, — এমনি করে তাদের সুখে-দুঃখে বেশ চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই সাধারণের পথ ধরে চলতে পারি নে বলেই ওদের একজন হয়ে সুখী হওয়া তো দূরের কথা, অমনি অসুখীও হতে পারলুম না। ওরা বিয়ে করে, ছেলে-পিলে হয়, বড় হলে বিয়ে দেয়, জামাই-বউ ঘরে আসে, — বাস্ আর কি চাই? ওরই মধ্যে হাসে, কাঁদে, সব করে। ওরা ওতেই সুখী। ওরা যা পেয়েছে তাতেই তুষ্ট। কিন্তু আমার মনে হয়, বেচারাদের শতকরা নব্বই জনই জানে না আর জানতে চায় না যে, যে মানুষটিকে নিয়ে এতদিন ঘরকন্না করছে, সেই মানুষটির মনটিই তার নয়। দুইজনাই দুই জনের মন কোনদিন বোঝে নি, বুঝবার দরকারও হয়নি। এত কাছাকাছি থেকেও তাই — মনের দেশে দুইজন দুইজনের সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই ফাঁকি আমার চোখে যে-দিন ধরা পড়েছে, সেই দিন থেকে আমি আর কাউকে সাথী করে ঘর বাঁধতে সাহস পাচ্ছি নে। সদা ভয় হয় আর ব্যথাও বাজে এই কথাটি ভাবতে যে, আমারই বুকে মাথা রেখে আমারই জীবন-সঙ্গিনী অন্যের কথা ভাববে, তার ব্যর্থ জীবনের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আর আমি তারই কাছে আমার ভালবাসার অভিনয় করে যাব, সেও দায়ে পড়ে দিব্যি সয়ে যাবে, — উঃ! এ-কথা ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে! আমি যাকে নিয়ে বাসা বাঁধব, আগে দেখে নেব তার মনের মানুষটি আমার মনের মানুষটিকে চিনেছে কিনা। তা যত জন্ম না হবে, তত জন্ম আমি হয় মায়ের লক্ষ্মী ছেলেটি হয়ে মায়ের কোলেই থাকব, নতুবা লোটা-কম্‌লি নিয়ে এমনি বোম্-বোম্ কয়ে বেড়িয়ে বেড়াব।

আমি মানুষ দেখেই তার মনের কথা ধরে দিতে পারি বলে বড্ডো গর্ব করে এসেছি এতদিন, আর অনেক জায়গাতেই চিনেওছি ঠিক। কিন্তু তোমার কাছে যে এমন করে আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবে যাবে, তা কে জানত! সত্যই,

'প্রেমের ফাঁদ ভুবনে, কখন্ কে ধরা পড়ে কে জানে!
সকল গরব হায়, নিমেষে টুটে যায়, সলিল বয়ে যায় নয়ানে!'

তা না হলে এত বড় দুর্দান্ত দুর্বার আমাকেও তুমি আজ শিশুর মতন করে কাঁদাচ্ছ! তুমি আর-সকলের কাছে এত সরল, আর আমার কাছেই কেন এত দুর্বোধ হয়ে পড়েছ, বলতে পার লক্ষ্মীমণি? — হাঁ, একটি কথা নিবেদন করে রাখি এর মধ্যে, — যখন জীবনে বড্ডো ক্লান্ত হয়ে পড়বে তোমার ভালবাসার অবমাননা দেখে,

দেখবে তোমার বুক-ভরা অভিমান পদাহত হয়ে ধুলোয় পড়ে লুটাচ্ছে, যখন নিরাশায় বুক ভেঙে যেতে চাইবে (খোদা না করুক), সে-দিন এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়ো প্রিয় আমার, যে, এই দুঃখের সংসারেও অন্তত একজন ছিল, যে তোমায় বড় প্রাণ ভরে ভালবেসেছিল। বিনিময়ে তার এক কণাও ভালবাসা সে পায় নি, তবু সে এতটুকু ব্যথা রেখে যায় নি তোমার জন্যে, এমনকি কোনদিন তোমার কাছে তা নিয়ে অনুযোগও করে নি। সে তোমায় পেলে মাথার মণি করে রাখত। তোমাকে রাজ-রাজেন্দ্রাণী করবার সকল ক্ষমতা, সকল সাধ তার ছিল। তোমার এত ভালবাসা এত অভিমানের অধিকারী হলে সে এমন করে তার বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা উদ্দাম তরুণ জীবনকে এত অল্প দিনে ব্যর্থ করে এমন করে বিদায় নিত না! সে অনেক — অনেক বড় কিছু বিশ্বের বিস্ময় হতে পারত। বড় ব্যথায় তার সারা জীবনটা বিদ্রোহ আর স্বেচ্ছাচারিতা করেই কেটে গেল। আরও মনে করো যে, পর-পারে গিয়েও সে শান্ত হতে পারে নি, চিরদিনের মত এবারেও সে সেখানে তোমারই তরে মালা হাতে করে তার অশান্ত জীবন বয়ে বেড়াচ্ছে পথে পথে ঘুরে। তোমায় বুকে করে তুলে নেবার জন্যে সে সকল সময় তোমার পানে তার সকল প্রাণ-মন নিয়োজিত করে রেখেছে। সে যে তোমায় সত্যিই ভালবাসে, তাই প্রমাণ করতে সে তার নিজের গর্দানে নিজে খড়্গ হেনে মরেছে! আরও মনে করো সেই দিন, যাকে তুমি একদিন মনে মনে তোমার সুখের পথের কাঁটা, তোমার জীবনের অভিশাপ মনে করেছিলে সে-ই তোমার সকল অকল্যাণ সকল অমঙ্গল থেকে বাঁচাবার জন্যেই চিরদিনের মত তোমার পথ হতে সরে গিয়েছে। মনে করো, যাকে তুমি অনাদর করেছ, তার এককণা ভালবাসা পাবার জন্যে বহু হতভাগিনী বহুদিন ধরে সাধনা করেছিল, কিন্তু সে কোনদিন তার মানসী-প্রিয়া — তোমায় ছাড়া আর কারুর পানে একটু হেসেও চাইতে পারে নি, পাছে তোমার অভিমান হয়, পাছে তুমি ব্যথা পাও ভেবে।

আর একটা ছোট কথা এইখানে মনে পড়ে গেল। শুনে তুমি হয়তো আমায় কি ভাববে, জানি না। তোমার বিরুদ্ধে যে-যে কারণে আজ এত বুক-জোড়া অভিমান নিয়ে যাচ্ছি, এটাও তারই একটা। সেটা আর কিছু নয়, কাল চিঠিগুলো তোমার পড়তে পড়তে হঠাৎ ও-কথাটা মনে পড়ে গেল। তুমি জান, আমি বড্ডো হিংসুটে। তোমায় অন্যে ভালবাসবে, এ-চিন্তাটাও সইতে পারিনে, দেখতে পারা তো দূরের কথা। সকলে তোমার খুব প্রশংসা করুক, তোমায় ভাল বলুক, তাতে খুবই আনন্দ আর গৌরব অনুভব করব, কিন্তু তাই বলে অন্যকে তোমায় ভালবাসতে তো দিতে পারি নে। আমি চাই, তুমি একা আমার — শুধু আমার — ভিতরে বাইরে পরিপূর্ণরূপে আমার হও, আর আমিও পূর্ণরূপে তোমার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে সুখী হই। আমি ছাড়া তোমাকে কেউ ভালবাসতে পারবে না — কখনই না, কিছুতেই না। তাই যখনই আমি দেখেছি যে, অন্যে তোমার দিকে একটু চেয়ে দেখেছে আর

তুমিও তার পানে হেসে চেয়েছ, অমনি মনে হয়েছে এক্ষুণি গিয়ে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিই। কিন্তু খোদা তোমাকে রূপ আর গুণ এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছেন যে, তোমায় দেখেই লোকে ভালবেসে ফেলে। ভালবাসা-পিয়াসী তৃষাতুর মানুষের মন তোমাকে যে ভাল না বেসেই পারে না। তাই কত দিন মনে হয়েছে যে, তোমাকে নিয়ে এমন বিজন বনে পালাই, যেখানে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ থাকবে না। চোখ মেললেই আমি তোমাকে দেখব, তুমি আমাকে দেখবে। আমার এ যেন রাহুর প্রেম। নয়? আমায় ছেড়ে অন্যকে তুমি ভালবাসবে, আমার এই ব্যথাটাই সব চেয়ে মর্মন্তুদ। তাই তো এমন করে তোমার কাছে যাঞ্চা করে এসেছি, যে, আমার চেয়ে বেশি কাউকে ভালবাসতে পারবে না — পারবে না। কিন্তু তুমি আমার অত সকরুণ মিনতি শুনেও কোনদিন কথা কয়ে জানাওই নি, একটু মিথ্যা করে মাথা দুলিয়েও বল নি, যে, হাঁ গো হাঁ!... শুধু নিস্তব্ধ মৌন হয়ে গেছ। তোমার তখনকার ভাবের মানেটা আজও বুঝতে পারছি নে বলেই আমার এত প্রাণপোড়ানী আর ছট্‌ফটানি। আজ আমি বড় সুখে মরতে পারতাম, যদি আমার এই চিরদিনের জন্যে ছাড়াছাড়ির ক্ষণেও জানতে পারতাম তোমার সত্যিকার মনের কথা। এখন জানতে চাইলেও হয়তো আর জানাতে পারবে না। যদিই পারতে, তাহলে চির-হতভাগা বলে একটু করুণা করে আমায় অনেক কিছু সিক্ত সান্ত্বনা দিয়ে আমায় প্রবোধ দিতে, কিন্তু হায় প্রিয় আমার, এ মৃত্যুপথের পথিককে আর ভুলাতে পারতে না, সে সুযোগ তাই আমি ইচ্ছা করেই দিলাম না তোমায়। যখন তুমি আমার এই চিঠি পড়বে, তখন আমি তোমার নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ব। দেখ, আজ মনে হচ্ছে, পুরুষদের মতন বোকা ভ্যাবাকান্ত আর নেই, অন্তত মেয়েদের কাছে। পুরুষ যেমন করে ভালবাসা পাবার হা-হা করে উন্মাদের মতন ছুটে যায়, তা দেখে মনে হয়, এর এ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা বুঝি স্বয়ং ভগবানও মেটাতে পারবে না, কিন্তু তাকে একটি ছোট্ট মিষ্টি কথা দিয়ে তোমরা এমনই ভুলিয়ে দিতে পার যে, তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এত বড় দুর্দান্ত দুর্বিনীতকে ঐ একটু মিষ্টি করে 'লক্ষ্মীটি' বলে গিয়ে একটু কপালে হাতটি রাখলে, বা গিয়ে তার হাতটি ধরলেই সে যত দূর-হতে-পারা-সম্ভব সুশীল সুবোধ বালকটির মতন শান্ত হয়ে পড়ে। তোমার মনে কি আছে, তা ভেবে দেখতে চায় না, ঐ একটু পেয়েই ভালবাসার কাঙাল পুরুষ এত বেশি বিভোর হয়ে পড়ে। তবু তোমরা এই বেচারা হতভাগা পুরুষদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দাও না। কিছুতেই তোমাদের মনের কথাটি পাওয়া যায় না, সব ভালবাসাটুকু পাওয়ার আশা তো মরীচিকার পেছনে ছোটার মতই। কোথায় যেন তোমাদের মনের সীমা-রেখা, কোথায় যেন তোমাদের ভালবাসার তল, কোথায় যেন তার শেষ! আমি তাই অবাক হ'য়ে অনেক সময় ভাবি আর ভাবি! মনে করো না যে, এগুলো সকলেরই মনের ভাব। আমি আমার এখনকার মনের ভাবগুলো সোজাসুজি জানাচ্ছি। তোমার সঙ্গে তা না মিলতেও পারে। এমনি

করে পুরুষ নারীর কাছে চিরদিন প্রতারিত হয়ে আসছে। কারণ, তারা বইরে যত বড় কর্মী বিদ্বান আর বীর হোক না কেন, তোমাদের কাছে তারা এক নম্বর বোকা, একেবারে ভেড়া বনে যায় বললেও অত্যুক্তি হয় না। তোমাদের কাছে থেকেও তোমাদের মন বুঝতে স্বয়ং ভগবান পারবে না, এ আমি আজ জোর গলায় বলছি। তোমরা নারী, তোমাদের স্বভাবই হচ্ছে স্নেহ করা, সেবা করা, যে কেউ হোক না কেন, তার দুঃখ দেখলে তোমাদের প্রাণ কেঁদে ওঠে, একটু সেবা করতে ইচ্ছে হয়। ওতে তোমাদের গভীর আত্মপ্রসাদ, নিবিড় তৃপ্তি। এইখানে তোমরা, দেবী সন্ন্যাসিনী। এই ব্যথিতের ব্যথা মুছাতে তোমরা সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করতে পার, কিন্তু তাই বলে সবাইকে ভালবাসতে পার না, আর ভালবাসও না। এইখানে পুরুষ সাংঘাতিক ভুল করে বসে। তোমাদের ঐ সেবা আর করুণাটুকু সে ভালবাসা বলে ভুল করে দেখে, অবশ্য যদি সে তোমায় ভালবেসে ফেলে। আর যাকে ভালবাসতে পারছ না; তা হলে তার জন্যেও তুমি সকল রকম বাইরের ত্যাগ স্বীকার করতে পার, তার সেবা কর, শুশ্রূষা কর, তার ব্যথায় সান্ত্বনা দাও, কত চোখের জল ফেল করুণায়, — তবু কিন্তু ভালবাসতে পার না। বাইরের সব সুখ জলাঞ্জলি দিতে পার তার জন্যে, কিন্তু মনের সিংহাসনে রাজা করে কিছুতেই তাকে বসাতে পার না। কিন্তু অন্ধ অবোধ পুরুষ তোমাদের ঐ স্বভাবজাত করুণাতেই ভালবাসা মনে করে বড় বেশি আনন্দ পায়, সুখ অনুভব করে। হায় রে অভাগা! তাকে পরে তার জন্যে আবার দুঃখও পেতে হয় অনেক গুণ বেশি। কারণ, মিথ্যা যা, তা একদিন না এক-দিন ধরা পড়েই। হঠাৎ একদিন নিশীথে বুকে জড়িয়ে ধরেও সে ধরে ফেলে যে, আমার এই নিকটতম মানুষটি আমার সব চেয়ে সুদূরতম। আমার বুকে থেকেও এ আমার নয়। একে হারিয়েছি, হারিয়েছি এ-জনমের মত। সে-যাতনা যে কি নিদারুণ, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। এ ভুল-ভাঙার সাথে সাথে অনেকেরই বুক নিষ্করুণভাবে ভেঙে যায়, তার জীবন চিরতরে নিষ্ফল ব্যর্থ হ'য়ে যায়! সে তখন নির্মম আক্রোশে নিজের ওপর নির্দয়তম ব্যবহার করে নিজের সে ভুলের শোধ নেয়! সে আত্মহত্যা করে, এক নিমেষে নয়, একটু একটু করে কচলিয়ে কচলিয়ে!

তোমাদের নারী জাতিকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি, প্রাণ হতে তাদের মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু তাদের ওপর আমার এই অভিযোগ চিরদিন রয়ে গেল যে, তারা পুরুষের ভালবাসা বড় অনাদর করে, বড় অবহেলা অপমান করে! তারা নিজেও জীবনে সুখী হয় না, অন্যকেও সুখী করতে পারে না। আমাদের সমাজের বেদনার সৃষ্টি এইখানেই। যে তাকে সকল রকমে সুখী করে তার বাহির ভিতরে রানি করে দেবী করে রাখতে পারত, রূপ-যৌবন-গরবিনী নারী তাকে পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়। সে-হতভাগার রক্ত-ঝরা প্রাণের ওপর দিয়ে হেঁটে পায়ে আল্‌তা পরে। পরে তাকে এর জন্যে অনুতাপ করতে হয় সারাটা জীবন ধরে, তা জানি। ভালবাসাকে অবমাননা

করে সে-ও জীবনে আর ভালবাসা পায় না, তখন তার জীবন বড় দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, বিষিয়ে ওঠে। তখন হয়তো তার বেশি করে তাকেই মনে পড়ে, যে তার এক কণা ভালবাসা পেলে আজ তাকে মাথায় নিয়ে নাচত। তোমরা হয়তো ভুরু কুঁচকে বলবে, এ আমার মিথ্যা ধারণা। তা বল, আমি যা দেখছি, তাই বলছি। তোমরা একটা কথা বলবে — নারী বড় ভালবাসার কাঙালিনী। একটু আদর পেলে তাকে সে মনে প্রাণে ভালবেসে ফেলে!...

শুনে হাসি পায় আমার। একটু আদর তো ছোট কথা, জন্ম-জন্ম ধরে পাখিটির মত করে বুকে রেখে, আদর — সোহাগ করে ভালবেসেও তোমার মন পাই নি, শুধু এই একটা উদাহরণ দেখিয়েই ক্ষান্ত হলুম। আমার মতন হতভাগ্য দু-দশটা প্রায় দেখতে পাবে পথে ঘাটে টোঁ-টোঁ কোম্পানির দলে। নেহাৎ চোখের মাথা না খেলে তোমরা তা অস্বীকার করতে পারবে না।

যাক, আমি হিংসের কথা বলতে গিয়ে কি সব বাজে বকলুম। আমি বলতেই চাই, যে, আমি তোমায় দেখিয়ে-দেখিয়ে তোমারই চোখের সামনে একে ওকে কত আদর করেছি, কিন্তু কোনদিন তোমার তাতে হিংসে হয় নি। তুমি কোনদিন বাইরে ভিতরে এতটুকু চঞ্চল বা বিচলিত হও নি। তুমি মনে মনে জান যে, তুমি আমার নও, তুমি আমায় ভালবাসতে পার না, অতএব আমি যাকেই যত আদর ভালবাসা, দেখাই, তাতে তোমার কিছুই আসে যায় না। আমার ওপর যখন তুমি কোন দাবিই রাখ না, তখন আমায় যে-কেউ ভালবাসুক বা আমি যাকেই ভালবাসি, তাতে তোমার কি আসে যায়?

আমার এখন মনে হচ্ছে কি, জান? আমি যদি তোমার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে হতে পারতুম, তাহলে তোমার ভালবাসার মানুষটিকে ভালবেসে দেখাতুম তোমার বুকে কেমন ব্যথা বাজে, কত বেদনা লাগে!

এত কথা কেন জানালুম, জানো? আমি আজ রাজ-বন্দী। প্রেসিডেন্সী জেলের হাজতে বসে তোমায় এই চিঠি দিচ্ছি। কাল আমার বিচার হবে। বিচারে দু'টি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড তো হবেই। জেলে এক কর্মচারী দৈবক্রমে আমারই এক বন্ধু — শৈশব কালের। আমাদের আজ আশ্চর্য রকমের দেখাশোনা। স্কুলে আমাদের দুইজনের মধ্যে বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট কে হবে এই নিয়ে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। ওঁরই কৃপায় এত বড় চিঠি এমন করে লেখবার অবসর আর সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছি, তা না হলে কাউকে কোন কিছু জানিয়ে যেতে পারতুম না। ভগবান বন্ধুর আমার মঙ্গল করুন।

তুমি মনে করবে, মাত্র দু-বছরের জেল হবে হয়তো, তার জন্যে এমন বিদায়-কান্না কেন? আবার তো ফিরে আসব। কিন্তু আমি জানি, আমি আর ফিরব না। তোমায় এতদিন বলি নি, লুকিয়ে রেখেছিলুম, কিন্তু আজ যাবার দিনে কষ্ট পাবে জেনেও জানিয়ে যাচ্ছি। আমার যক্ষ্মা হয়েছে — যাকে আমাদের দেশে শিবের অসাধ্য রোগ বলে। ডাক্তার কতবার আমায় পরিশ্রম করতে মানা করেছে, আমার কত বন্ধু আমায়

কত মিনতি করে হাতে-পায়ে ধরে এখন কিছু দিনের জন্যে বিশ্রাম করতে বলছে, আর আমি ততই দ্বিগুণ বেগে কাজ করেছি। সে সময় তুমি যদি আমায় একটিবার মানা করতে করুণা করে নয় — ভালবেসে, তাহলে কি করতুম, জানি না; কিন্তু তুমি তো আর আমার এ ভীষণ রোগের খবর জানতে না! তাহলে দয়া করে হয়তো আমায় মিনতি করে লিখতে ভাল হবার জন্যে।...

তবু কিন্তু তোমার সকল শাসন মেনে চলছি আমি আমার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এমন করে আর কেউ আমায় কথা শোনাতে পারে নি, এ-বিশ্বে এত বড় স্পর্ধা তুমি ছাড়া আর কারুর হয় নি, যে, আমায় শাসন করে, হুকুম শোনায়! — যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি তোমার কাছে কোনদিন, তবে তা ভুলে যেও না, ক্ষমা করো এই ভেবে যে, তুমি যাকে কিছুতেই ভালবাসতে পার নি, সে-ই তোমার সকল কথা তার শেষ দিন পর্যন্ত খোদার পবিত্র বাণীর চেয়েও পবিত্রতর মনে করে মেনে চলেছে। এইটুকু ভেবে পার তো একটু আনন্দ অনুভব করো। আমার মতন দুর্জয় বাঁধন-হারাকে তুমি জয় করেছিলে, এই ভেবেও একটু গৌরব করো।

দু-বছর না হয়ে যদি মাত্র ছয় মাসেরও সশ্রম কারাদণ্ড হয় আমার, তাহলে আমার ফিরবার কোন আশা নেই। যক্ষ্মায় আমার শরীরটাকে খেয়ে ফেলেছে, আর ব্যথায় আমার বুকে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। এর ওপর জেলের খাটুনি। কখন যে আমায় হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে, তা বলতে পারি নে। এখনই একটু পরিশ্রম করলেই আমার নাকে মুখে অসস্র ধারে রক্ত নির্গত হয়। হয়তো ইচ্ছা করলে বাঁচতে পারতুম, কেননা আমার ইচ্ছাশক্তির ও প্রাণ-শক্তির ওপর আমার গভীর বিশ্বাস আছে। কিন্তু আর সে ইচ্ছা নেই লক্ষ্মী। এখন ফিরাতে এলেও হয়তো আমি ফিরতে পারতুম না। বড় দুঃখেই বলতে হত, — 'অবেলায় প্রিয়তম, এ যে অবেলায়!' তাছাড়া, বাঁচতে পারতুম যদি জীবনটাকে অন্য কোন বড় দিক দিয়ে সার্থক করে তুলতে পারতুম, তাও পারলুম না। অনেক চেষ্টা-চরিত্তির করে দেখা গেল। আর পারবও না। তাই আজ হাল ছেড়ে দিয়ে বলছি — 'সন্ধ্যে হল গো, এবার আমায় বুকে ধর।' এত শ্রীঘ্র এমন করে ধরা পড়ব, তা আমি দুদিন আগে স্বপ্নেও ভাবি নি।' কেননা আমার আশা ছিল, এর চেয়ে অনেক বড় কাজ করে মরণ-বরণ করা। কিন্তু তা আর ঘটে উঠল না। কারণগুলো জেনে আর কি হবে বল!

তবে বিদায় হই। বিদায়-বেলা অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, যেন তুমি জীবনে একটি দিন সত্যিকার ভালবেসে দুঃখ পেয়ে আমার ব্যথা বোঝ! তোমার জীবনের অভিশাপ আজ এ পৃথিবী ছেড়ে চলল! আর ভয় নেই।

হাঁ, যদি পার আশীর্বাদ করো, যেন এবার জন্ম নিলে তুমি যাকে ভালবাস, সে-ই হয়ে জন্মগ্রহণ করি! — ওঃ! কি অন্ধকার! ... ইতি —

তোমার চির-জীবন-জোড়া অভিশাপ আর অমঙ্গল —
শ্রী ধূমকেতু

Letter from a Political Prisoner

Presidency Jail, Kolkata Day of Release, Evening

My Dearest Manasi!

Today is my day of departure! I have bid farewell to everyone, one by one. Only you remain. I wished, on the day of my leaving, not to cause you pain, but I haven't said anything yet. So, knowing you'll be hurt, I couldn't suppress this unruly nature of mine. But don't blame me for it, because in your heart there's always been a deep conviction that there's no one in this world as selfish and envious as me.

My words have never pleased you (why, I'll explain later), and they won't today either. Still, *Lakshmi*, please read this letter thinking it's the farewell cry of an unfortunate, star-crossed traveler lost forever on the path to the western horizon. Today, I am very cruel, very ruthless. My words, I don't know how many scars they will etch on your blemishless heart! But, my dear, great pain, great pain has made me such a rebel, such a self-willed madman today. That's why I've come to make you cry again. You too say, I am a hangman today, I am a murderous butcher today. Let me find some happiness in hearing that.

My mind is very scattered. So, I probably won't be able to say anything coherently. Don't look for order or structure in the writing of one whose entire life has been spent worshipping chaos and irregularity. Perhaps what I start with will be the end, and what I end with will be the beginning! The main thing is, whether others understand or not, it's enough if you do. Fill and complete the unsaid words and pain in my heart with the words and pain of your own. —Now listen.

First, I remember (today, perhaps, you won't even remember it), you once asked me, one evening, "What should you do to get well?" Hearing this cruel question about my illness from your own lips, my heart seemed to churn with the heavy pain of

wounded pride! Alas, my helpless pride! Alas, my disgraced, unheeded love! I couldn't answer your question. It shouldn't have been answered! At that moment, in the temple of my heart's pain, there was a deep *arati* of the anguished lament of a hundred young ascetics' failed lives and the accumulated pain-offering of deprived youth. The one for whom I suffer so much comes and asks, "What will make your pain better?"...

I felt you were mocking and insulting me, speaking such painful words. So, the pain in my heart intensified tenfold. I hugged the pillow beside me and lay face down. I felt the most ashamed, lest you see my unruly tears! Lest you discover that the pain in my heart was increasing again! What greater indignity and shame can there be than to shed tears and be so overwhelmed by pain before someone who doesn't understand the suffering of my soul, before such a heartless person? I couldn't even speak, fearing you would detect my crying in my moist voice.

Anyway, God saved me from that danger. You stood for a long time, thinking about something. Then you slowly left. You will probably laugh today when you read this, if I tell you that I then felt as if you had sighed a small sigh as you left. Oh, my blind, deaf, beggar heart! If that were true, then why didn't you at least ask in words why I lay down like that?

After you left, my heart felt completely broken by the pain and wounded pride. In silent anguish and the torment of futile pain, I sobbed uncontrollably. It was evening then. After that, the doctor came, relatives came, and friends came. Everyone said, "The heart's action is very abnormal." The doctor said, "The patient has suddenly, for some—um—special reason, become so overwhelmed. This is very bad. It could even lead to..." The rest of the doctor didn't say clearly, but I completed it for him, "Total darkness in the lamp house, doctor *babu*?" – Saying this, I tried to laugh, but then so many tears came that many couldn't ignore them. Indeed, my voice trembled greatly then, and my lips quivered, my eyelids became moist. I lay face down again. Despite many efforts, no one could make me get up. After my

friends condemned my stubbornness for a long time, they departed. I also thanked God in my heart. Alas, will these cruel people not even let me cry in peace to find solace?... Even then, you all, some by my side, some at my head, were sitting. Suddenly I felt you came and held my hand. In an instant, all my pain seemed to melt into water. This time too, tears came, but they were somehow tears of happiness! However, it wasn't that these tears were without that pride. Still, in the joy of your touch, I forgot all my torment, all my pain and suffering, and all my indignities. I felt, you are mine—you are mine—only mine! Oh, eternal beggar! My eternally thirsty, humble heart! With how little you wish to fill your own heart, yet you couldn't find your own person!

A little later, when everyone saw me chatting and laughing heartily again, they all breathed a sigh of relief. No one understood, perhaps you didn't either, how such restless pain became calm and still in an instant. That happiness, that pain, only I knew and my inner self knew. Yes, shall I tell the truth? I also felt, did you also understand a little of that pain? See what a beggar my heart is! You must think so little of me! Ah, if you had only said falsely, Lakshmi, that you at least knew the cause of my pain in your heart, then I wouldn't have withered away before blooming like this today! My life wouldn't have become such a scattered *'Devdas'* life! Oh, I've lost the thread of my words.

Yes, that day I remained lost in the joy of your warm touch. The next day, I felt like calling you aside and telling you why this heart-filled pain was created. All day I gazed expectantly at you, hoping you would come and ask again, "What will you do to get well?" Alas, the hope of the unfortunate! You never came and asked that question again, not even by mistake! All day, with intense longing, as the end approached, my soul too seemed to wither. To forget the shameless pain of my beggarly soul, I sang my dearest song with great sorrow and a full heart:

"You know, O my Inner Self, on the path, my mind wandered off. My thoughts found no home. On the gentle currents, it floated, yet there's hope in my heart, that at your feet they will

reach, my Lord. How much I have drawn, tears and laughter, again and again, the noose broke. Everyone asks, calling me unfortunate— 'Where will you rest your head when evening falls?' I know, I know, it will descend upon your lap where my head will fall and rest!"

My voice, my eyes, were heavy and wet with my own pain. I could no longer deceive the outside world when I sang. That tune then trembled and cried in my voice; that tune, that crying, was not of my throat, but the crying of my soul. After singing, I felt as if even an outcast like me had at least one friend in this world, who understood the torment of my soul, my inner pain, and whose eyelids became moist upon hearing my song. He is my Inner Self. Just then, this thought also came to me: if I truly had a beloved, then after hearing "Everyone asks, calling me unfortunate, where will you rest your head when evening falls?"—she wouldn't be able to stay away; she would place my head on her lap and say with a tearful voice, "Oh, on my lap, my dear, on my lap!" Her piteous voice would tremble with piteous pleading, pain, and wounded pride, "Fie, Lakshmi! You cannot sing this song!"

See what an ugly glutton I am! You've probably been rolling with laughter by now, seeing my childlike nature and my eagerness! You might be thinking, how can such an unconquerable, proud, and wild free spirit become so weak and fall at someone's feet, how can such a world-conqueror suffer such an astonishing and great defeat with so little? Think what you will, I have no sorrow! I'm thinking the same myself. But I fear, my dear, when your pride might shatter in an instant and tears flow from your eyes! On that day, perhaps, you will understand the pain of my love. You will understand the meaning of this defeat on that day.

Anyway, let me say what I was saying—why did I feel after singing that my Inner Self stood silently before my eyes, with tear-filled eyes? Wiping my tears and looking ahead— Oh God! Who are you standing there, looking at me with such pitying eyes? Ah, the dark pupils of those mischievous eyes have forgotten their

naughtiness and restlessness, and seem still with pain! The kohl-rimmed eyelids of those crazy eyes seem heavy with tears. Oh, my Inner Self! Did you truly appear before my eyes in the darkness of this evening? O my Lord! Then my evening offering today was not in vain? Forgetting everything, I spoke like one self-oblivious, "You cannot love anyone more than me! How about that?"

Without saying a word, you hid your face in the pillow on my lap. Why? Out of shyness? Or happiness? Or pain? I don't know why. That's why today I have so much sorrow and so much heartache. You never expressed your heart's feelings in a single word, that's why today my heart is filled with so much unknown pain. After much pleading, you looked up, but you didn't say why you hid your face like that. If only that day you had said, even falsely, "O my eternal beloved! That..." No, no, let that go.

Here's a funny piece of news for you. Even sitting in this prison cell, at this ill time, I feel like a poet! Wait, don't roll with laughter just yet! I know better than you that God has left no stone unturned in ensuring I don't become a poet. That's why my entire being, inside and out, is as rough as a raw log, like a clumsy brute! Still, if I were a poet, how beautifully I would have expressed this feeling of mine: "Only disregard, only neglect, only insult! Love?—That's just a word, friend! Why only insult! If you give your life, it will trample your life! Only disregard, only neglect, only insult!"

Anyway, what hasn't happened, won't happen even if I knock on my forehead. Let's discuss what I am now. Wait—perhaps by shouting out of pride, I'm insulting that statement. Am I not? Like me, you might be thinking, on whom is this pride of mine directed? Who gave me the right to show so much pride? I didn't get a drop of love, yet I sit with an ocean of pride! Still, you'll be surprised to hear that I truly, truly feel a lot of pride. The one on whom I feel proud, whether they laugh at my pride or trample me underfoot, I don't care. I don't even look to see if they will honor my great love, I only believe in the pride and blindness

of my own love that they too love me! That's why today I face so much humiliation, both at home and outside!

Many traveler-girls wished to wipe away this traveler's pain, perhaps they even loved me (don't laugh when you hear this), but I never looked back at them. There was some pride in me then. I felt, this girl cannot keep pace with me, why should I unnecessarily make her life futile? I couldn't bear that just anyone could conquer the mind of a rebellious free spirit like me with such little effort. So, as soon as I realized my mark had fallen on some unfortunate heart, I would immediately move far—very far away; and I would see how strong her attraction was— whether she truly loved me, or if it was just pity, or merely infatuation? Another reason for moving away was that neither of us should ever have to regret any mistake in the end.

I have a great weakness in one area. Perhaps no one else can surrender themselves as I do under a hand of affection. So, as soon as I sensed someone showing affection, I would flee, fearing entanglement. However, by moving away, many people's mistakes were revealed. Many supposedly loved me, but I saw the falseness in all their hearts by moving away like that. None of them wanted to have me for their entire life. I am a traveler, so they only wanted me for a brief moment on the path. That's why no one ever had me within their grasp. Many say, perhaps this too is my pride. I don't know. But in one or two places, when I forgot myself and tried to come closer, that person immediately struck my Lord—my love—with a forceful kick to the heart. Still, will you say that this is my unfounded pride?

Here, remember one thing, however: those who wanted me, all of them loved me first, I never loved them. Despite getting so much, my heart has always said, "Not this, not this!"

Alas, my unfulfilled heart! Whom do you seek? Who is your beloved? Who is that proud woman, where, under which veranda, does she stand with a garland for you?... Because I didn't find the beloved of my mind, I couldn't love anyone else in this life! Today, there's no end to my sorrow when I think about how many tender hearts I crushed before my life even truly began.

However, this is my small comfort: I have never insulted anyone's love. I have never enticed someone by pretending to love them and then abandoned them on the path. On the contrary, I have sought forgiveness from them with folded hands, from afar, in that manner. I requested them not to love me and moved away from their path forever. Fearing that I might hinder their work someday, I never again walked even near their path. Many have cursed me for my cruelty, and many have called me arrogant and proud.

Like a conquering hero, I was driving my chariot through paths and perils in my own mind. Then one morning, you and I met. Suddenly, my chariot stopped. My mind cried out in immense joy, "I've found it, I've found it!" My mind's traveler friend—suddenly, with a pale face, came before me and said, "Friend, farewell! You are no longer mine, now you are your *Manasi*'s! Your journey has ended." I saw him fade into the darkness of the horizon at the end of that path. Until now, even with a hundred pleas, the traveler-girls couldn't stop my chariot; many had laid their chests before the chariot wheels, and I had driven the chariot over their chests laughing, but alas, what has happened to me today? The chariot no longer moves! You only looked at me with your eyes, you didn't even plead, "Traveler! Stop for a moment at my door!"

Still, I felt no sorrow, no sense of honor or insult, I descended from the chariot with a garland in hand. I placed my garland, woven with the desires of countless births, around your neck. You stood silently, with bowed heads. I couldn't understand the language of your silent heart. My soul felt a strange pang. Whether you were happy or hurt, nothing was clear. Immediately, a great pain struck my ever-proud heart. Why did God not give humans the power to see into another's mind? But no matter how much pride I felt towards you, I had no complaint against you (and I still don't). For I loved you without knowing your heart. You are my *Manasi*, my beloved, on whom I bestowed the garland of my defeat, after conquering everything forever! The image that was painted in my mind for countless births, the one for whom I took this eternal traveler's guise, I recognized

Manasi at first sight. So, I didn't hesitate for a moment to think whether you would accept this defeated rebel's offering-garland with a smile, or kick it away. If you cannot love me, I cannot blame you for that. I know, I know very well, my dear that no human's mind is subject to their will. The mind will not love the one it wishes to love, the one it considers its duty to love. The mind continuously weeps for the person of its heart; it cannot love another. For how many births I have searched for you like this, but you haven't given yourself. You didn't give yourself this time either. I don't know when, in which birth, beside which nameless village, you and I will build a home, when you will love me. Still, I love you, that's why I have this immense pride towards you.

Suppose, if my pride is false, if you truly love me, then perhaps you will think why I am hurting myself by misunderstanding you like this. Why am I causing you such pain? To know that very thing, I read your kind gift, those letters, a thousand times all night yesterday, but alas, I found nothing in them that could remove this cruel notion, this harsh belief of mine. With a heart overflowing with pity, you offered much comfort in my sorrow, in my pain, wrote many things, and in many places while reading, tears wouldn't be restrained, but 'I love you' was nowhere written—not even by mistake. The shy reluctance or intense longing to hide that very sentence was also absent from any part of any letter. Oh, my blind faith! Still, after so much entitlement and so many insults, the pain in my heart is now surging a hundredfold, yet I can no longer leave you. This time, I loved it first! The one who loves first often has to suffer this misfortune, this humiliation. So, with great sorrow, today I am going to die like an unbelieving atheist, saying that there is no such thing as love on this earth. Love cannot be found in return on this neglected earth. How deeply wounded a person becomes to become an unbelieving atheist, only the atheist understands. I know that true love finds satisfaction in self-sacrifice. I also believe that the one who is truly loved, even if they insult and hurt a thousand times, cannot be forgotten. Even the pain given by the beloved becomes dear like happiness. But to say that one's heart

doesn't cry out in longing for a little love in exchange for such heartfelt love, that person is not telling the truth.

Men cannot obtain a woman's heart even after lifetimes of devotion. A woman's heart is a very complex, very secret mystery. A woman can give everything, but she seems unwilling to give the key to her secret casket. I've heard that if you love someone with your soul, then she supposedly entrusts that key to your hand. Do you know why I feel such pride towards you today? You have silently endured all my affection, all my tenderness, all the excesses of my unruly love. You never protested even a little. I never understood from your face whether my affection and tenderness caused you pain or made you happy. I never saw a single line of smile blossom on your face then. That's why today, when I think this, my heart breaks: perhaps you silently endured my excesses out of obligation, perhaps you suffered much pain in your heart because of it. You never mentioned that in any letter, not even by mistake. That's why I feel you wished to suppress it somehow. If I return, I will never bring up that matter again, and if I don't return, then certainly not. No matter how wounded my soul becomes. If I return, I will try once more to be self-destructive, for the last time. But alas! To whom am I saying this? Which stone-silent, speechless deity is listening to my bitter lament? Let me say what I was saying.

Do you know why I can't be happy? Because I can't be content with simple love like ordinary people. How everyone around me eats and drinks, quarrels with their wives and then reconciles immediately— that's how their lives pass happily and sorrowfully. But because I cannot follow this ordinary path, not only can I not be happy like them, I cannot even be as unhappy as them. They marry, have children, and marry them off when they grow up, daughters-in-law and sons-in-law come into the house— and that's it! What more do they want? They laugh, they cry, they do everything within that. They are happy with that. They are content with what they have received. But I feel that ninety percent of these poor souls do not know and do not wish to know that the heart of the person with whom they have built a home for so long is not theirs. Both have never understood each

other's hearts, nor was there any need to understand. Even being so close— in the realm of the mind, they are complete strangers to each other. The day this deception was revealed to me, from that day on, I dared not take anyone as my companion and build a home. I am always afraid and feel pain thinking that my life-partner, resting her head on my chest, will be thinking of another, sighing for her failed life, and I will be acting out my love to her, and she will silently endure it out of obligation—Ugh! Just thinking about this makes my skin crawl! The one with whom I will build a home, I will first see if her heart's person has recognized the person of my heart. As long as that doesn't happen, I will either remain my mother's good son, in my mother's lap, or I will wander around like this with a begging bowl and blanket, saying 'Om, Om.'

I have been very proud until now, thinking I can perceive people's inner thoughts just by looking at them, and in many places, I did recognize correctly. But who knew that all my pride would drown in tears like this when it came to you! Truly, "In the snare of love, in this world, who knows when one gets caught! All pride, alas, shatters in an instant, tears flow from the eyes!" Otherwise, you are making even me, so indomitable and unruly, cry like a child today! You are so simple with everyone else, why have you become so inscrutable to me, can you tell me, my Lakshmi? —Yes, let me convey one thing in between—when you are very tired in life, seeing the dishonor of your love, when you see your heart-filled pride trampled and rolling in the dust, when your heart wishes to break in despair (God forbid), on that day, my dear, find solace in this thought: that even in this world of sorrow, there was at least one person who loved you with a full heart. In return, he received not a single speck of love, yet he left no such pain for you, nor did he ever complain to you about it. Had he obtained you, he would have cherished you as a jewel on his head. He had all the power, all the desire to make you a queen of kings. If he had been the possessor of so much love and so much pride, he wouldn't have ended his passionate young life, filled with vast hopes and aspirations, so futilely in such a short time and departed like this! He could have been much— much greater,

a wonder to the world. With great pain, his entire life was spent in rebellion and self-will. Remember also that he couldn't find peace even in the other world; forever, even there, he wanders from path to path, carrying a garland for you, his restless life. To take you into his arms, he has always dedicated all his heart and soul to you. To prove that he truly loves you, he has struck the sword upon his own neck and died! Remember also that day, the one you once thought in your heart to be a thorn in your path to happiness, a curse on your life—that very person left your path forever to save you from all evil and misfortune. Remember, the one you disregarded, for a speck of whose love many unfortunate women had longed for a long time, yet he could never even look with a smile at anyone else besides his *Manasi*-beloved—fearing your pride, fearing you might be hurt.

One smaller thing comes to mind here. I don't know what you will think of me when you hear it. The reasons for which I am leaving today with such heart-filled pride against you, this is also one of them. It's nothing else, yesterday while reading your letters that thought suddenly came to me. You know, I am very envious. I cannot bear the thought of others loving you, let alone seeing it. Everyone can praise you greatly, speak well of you, and I will feel much joy and pride in that, but still, I cannot let others love you. I want you to be mine alone—only mine— completely mine, inside and out, and I too surrender myself completely into your hands and be happy. No one can love you besides me—never, never. That's why whenever I saw others look at you a little and you smiled back at them, I immediately felt like stabbing a knife into their chest. But God has given you so much beauty and virtue that people fall in love with you just by seeing you. The thirsty heart of a love-seeking person cannot help but love you. That's why for so many days I felt like running away with you to such a desolate forest where there would be no one but you and me. When I open my eyes, I will see you, and you will see me. This is like my *Rahu's* love. Isn't it? You will love someone else besides me; this pain of mine is the most agonizing. That's why I've come to you begging like this, that you cannot love anyone more than me—you cannot. But even after hearing my pitiable plea, you never spoke a word,

never even shook your head falsely and said, "Yes, yes!"—you just remained silent. Because I still cannot understand the meaning of your expression then, that's why I have so much heartache and restlessness. Today, I could have died happily, if only I could know your true feelings at this moment of eternal separation. Now, even if I wanted to know, you probably couldn't tell me. If you could, then out of pity for an ever-unfortunate soul, you would offer me much moist comfort and console me, but alas, my dear, you wouldn't be able to delude this traveler on the path of death, so I intentionally didn't give you that opportunity. When you read this letter, I will be beyond your reach. See, today I feel that there are no fools more bewildered than men, at least to women. The way men run like madmen, longing for love, makes one feel that even God himself cannot satisfy this world-devouring hunger, but you can deceive him so easily with one small, sweet word, that it's astonishing. Such a formidable, unruly person, just by being called 'Lakshmi' sweetly and having a hand placed on his forehead, or by having his hand held, becomes as calm as the most well-behaved, sensible boy possible. He doesn't want to think what's in your heart; the love-starved man becomes so overwhelmed by that little bit. Yet you women never completely give yourselves to these poor, unfortunate men. You can never truly grasp what's in their hearts; the hope of receiving all love is like chasing a mirage. Where is the boundary of your hearts, where is the bottom of your love, where is its end! So, I often wonder and wonder! Don't think these are everyone's feelings. I am directly expressing my current feelings. They might not match yours. Thus, men have always been deceived by women. Because, no matter how great workers, scholars, or heroes they may be outwardly, to you they are number one fools, it's no exaggeration to say they become absolute sheep. Even God himself, being with you, cannot understand your hearts; I declare this loudly today. You are women, your nature is to show affection, to serve; no matter who it is, when you see their suffering, your heart cries out, and you wish to serve a little. In that lies your deep self-satisfaction, your intense contentment. Here you are, divine ascetics. To wipe away the pain of this

suffering person, you can make all kinds of sacrifices, but that doesn't mean you can love everyone, nor do you. Here, men make terrible mistakes. They mistake your natural compassion and service for love, of course, if they fall in love with you. And if you cannot love someone; then for that person too, you can make all kinds of outward sacrifices, serve them, nurse them, comfort them in their pain, shed many tears out of pity— but still, you cannot love them. You can sacrifice all worldly happiness for them, but you can never enthrone them in your heart.

But the blind, ignorant man finds great joy and happiness in mistaking your innate compassion for love. Alas, the unfortunate one! He later has to suffer much greater pain for it. Because what is false will be exposed someday. Suddenly, one night, even while embracing, he discovers that this closest person is his furthest. Even in my arms, this person is not mine. I have lost her, lost her for this life. No one but the sufferer understands how unbearable that torment is. With the breaking of this illusion, many hearts are mercilessly broken, their lives forever become futile and still! He then takes revenge on his mistake with cruel anguish and the most merciless treatment towards himself! He commits suicide, not in one moment, but little by little, crushing himself!

I greatly respect the female gender, and I wish them well from my heart, but my complaint against them has always remained: that they greatly disregard, neglect, and insult men's love! They are neither happy in their own lives, nor can they make others happy. The origin of our society's pain is here. The one who could have made her happy in every way, kept her as a queen and goddess, inwardly and outwardly, the woman proud of her beauty and youth trampled him underfoot. She walks over the blood-soaked heart of that unfortunate man, staining her feet with *alta*. Later, she has to repent for this throughout her life, I know. By dishonoring love, she too never finds love in her life, then her life becomes very unbearable, poisoned. Then perhaps she remembers him even more, the one who, if he had received a speck of her love, would have danced with her on his head today. You might wrinkle your brows and say, "This is my false notion." Say that, I am saying what I see. You will say one thing: "Women are much starved for love. With a little affection, they love with

all their heart and soul!"... I laugh when I hear that. A little affection is a small matter, even after cherishing you in my heart like a bird for lifetimes, with affection and tenderness, I haven't won your heart, and I will stop after giving just this one example. You will find two or ten unfortunates like me wandering the streets, in the company of vagrants. Unless you have lost your sight, you cannot deny it.

Anyway, what nonsense I said while talking about envy. I just want to say that I showed affection to others right before your eyes, but it never made you envious. You never showed even a little outward or inward restlessness or agitation. You know in your heart that you are not mine, you cannot love me, and therefore no matter whom I show affection or love, it doesn't matter to you. When you have no claim on me, then what does it matter to you whom I love or who loves me?

Do you know what I'm thinking now? If I could be a girl more beautiful than you, then I would show your beloved how much pain strikes your heart, how much it hurts!

Do you know why I told you so much? Today I am a state prisoner. I am sending you this letter from Presidency Jail. Tomorrow I will be tried. I will certainly be sentenced to two years of rigorous imprisonment. A jail employee, by chance, is a friend of mine—from childhood. We met in a surprisingly strange way today. In school, there was always a strong rivalry between us over who would be first in class. By his grace, I have had the leisure and means to write such a long letter. Otherwise, I wouldn't have been able to tell anyone anything before leaving. May God bless my friend.

You will think, it's perhaps only two years in jail, why such a farewell cry? I will return again. But I know I will not return. I haven't told you until now, I kept it hidden, but today, on the day of my departure, even knowing it will be painful, I am telling you. I have tuberculosis—what our country calls Shiva's incurable disease. The doctor has forbidden me from working many times, many of my friends have pleaded with me, holding my hands and feet, asking me to rest for a few days now, and I have worked at double the speed. If then you had forbidden me even once, not out of pity— but out of love, I don't know what I would have

done; but you didn't know about my terrible disease! Then out of compassion, perhaps, you would have pleaded with me to get well by writing... Still, I have obeyed all your commands until my last moment. No one else in this world could make me listen like this, no one else had such audacity but you, to command and order me!—If I have ever committed any offense against you, then don't forget it, forgive me thinking that the one you could never love, has obeyed all your words, holding them more sacred than God's holy words, until his last day. If you can, feel a little joy thinking about this. Feel a little pride too, thinking that you conquered an unconquerable free spirit like me.

If it's not two years, but only six months of rigorous imprisonment for me, then I have no hope of returning. Tuberculosis has eaten away my body, and pain has infested my heart with termites. On top of this, the jail labor. I don't know when my heart will stop. Even a little effort now causes blood to stream from my nose and mouth. Perhaps I could have lived if I wished, because I have deep faith in my willpower and life force. But that desire is no longer there, Lakshmi. Now, even if you came to bring me back, perhaps I wouldn't be able to return. I would have to say with great sorrow, "It's too late, my dearest, it's too late!" Besides, I could have lived if I could have made my life meaningful in some other great way, but I couldn't. I tried very hard. And I can't anymore. So today I am giving up and saying, "Evening has fallen, now take me into your arms." That I would be caught so quickly like this, I didn't even dream two days ago. Because my hope was to die after doing something much greater. But that didn't happen. What's the point of knowing the reasons, you tell me!

So, farewell. At the time of farewell, I am leaving a curse, that you truly love someone one day in your life and understand my pain! Your life's curse is leaving this earth today! No more fear.

Yes, if you can, bless me, so that when I am born again, I am born as the one you love!—Oh! How dark! Yours, your life-long curse and ill-omen— Shree *Dhumketu*.

Translated by Alamgir Mohammad

শিউলিমালা

১

মিস্টার আজহার কলকাতায় নাম-করা তরুণ ব্যারিস্টার।

বাটলার, খানসামা, বয়, দারোয়ান, মালি, চাকর-চাকরানিতে বাড়ি তার হর্দম সরগরম।

কিন্তু বাড়ির আসল শোভাই নাই। মিস্টার আজহার অবিবাহিত।

নাম-করা ব্যারিস্টার হলেও আজহার সহজে বেশি কেস নিতে চায় না। হাজার পীড়াপীড়িতেও না। লোকে বলে, পসার জমাবার এও এক রকম চাল।

কিন্তু কলকাতার দাবাড়েরা জানে যে, মিস্টার আজহারের চাল যদি থাকে — তা সে দাবার চাল।

দাবা খেলায় তাকে আজো কেউ হারাতে পারে নি। তার দাবার আড্ডার বন্ধুরা জানে, এই দাবাতেই মিস্টার আজহারকে বড় ব্যারিস্টার হতে দেয় নি, কিন্তু বড় মানুষ করে রেখেছে।

বড় ব্যারিস্টার যখন 'উইকলি নোটস' পড়েন আজহার তখন অ্যালেখিন, ক্যাপাব্লাঙ্কা কিংবা রুবিনস্টাইন, রেটি, মরফির খেলা নিয়ে ভাবে, কিংবা চেস-ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে, আর চোখ বুঁজে তাদের চালের কথা ভাবে।

সকালে আর হয় না, বিকেলের দিকে রোজ দাবার আড্ডা বসে। কলকাতার অধিকাংশ বিখ্যাত দাবাড়েই সেখানে এসে আড্ডা দেয়, খেলা নিয়ে আলোচনা করে।

আজহারের সবচেয়ে দুঃখ, ক্যাপাব্লাঙ্কার মত খেলোয়াড় কিনা অ্যালেখিনের কাছে হেরে গেল। অথচ এই অ্যালেখিনই বোগোল-জুবোর মত খেলোয়াড়ের কাছে অন্তত পাঁচ পাঁচবার হেরে যায়!

মিস্টার মুখার্জী অ্যালেখিনের একরোখা ভক্ত। আজও মিস্টার আজহার নিত্যকার মত একবার ঐ কথা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে, মিস্টার মুখার্জী বলে উঠলো — 'কিন্তু তুমি যাই বল আজহার, অ্যালিখিনের ডিফেন্স — ওর বুঝি জগতে তুলনা নেই। আর বোগোল-জুবো? ও যে অ্যালিখিনের কাছে তিন-পাঁচে পনেরবার হেরে ভূত হয়ে গেছে! ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় অমন দুচার বাজি সমস্ত ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানই হেরে থাকেন! চব্বিশ দান খেলায় পাঁচ দান জিতেছে। তা ছাড়া, বোগেল-জুবোও ত যে সে খেলোয়াড় নয়!'

আজহার হেসে বলে উঠল, 'আর রাখ তোমার অ্যালিখিন। এইবার ক্যাপাব্লাঙ্কার সাথে আবার খেলা হচ্ছে তার, তখন দেখো একবার অ্যালিখিনের দুর্দশা! আর বোগল-জুবোকে তো সেদিনও ইটালিয়ান মন্টিসেলি বগল-দাবা করে দিলে! হাঁ, খেলে বটে গ্রানফেল্ড।'

বন্ধুদের মধ্যে একজন চটে গিয়ে বললে, 'তোমাদের কি ছাই আর কোনো কম্ম নেই? কোথাকার বগলঝুপো না ছাইমুণ্ড, অ্যালেখিন না ঘোড়ার ডিম — জ্বালালে বাবা।'

মুখার্জী হেসে বল্‌ল 'তুমি তো বেশ গ্রাবু খেলতে পার অজিত, এমন মাহ ভাদর, চলে যাওনা স্ত্রীর বোনেদের বাড়িতে! এ দাবার চাল তোমার মাথায় ঢুকবে না!'

তরুণ উকিল নাজিম হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলে উঠ্‌লে, 'ও জিনিস মাথায় না ঢোকাতে বেঁচে গেছি বাবা! তার চেয়ে আজহার সাহেব দুটো গান শোনান, আমরা শুনে যে যার ঘরে চলে যাই। তারপর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বস।'

দাবাড়ে দলের আপত্তি টিকল না। আজহারকে গাইতে হল। চমৎকার ঠুংরি গায়। বিশুদ্ধ লক্ষ্ণৌ ঢং-এর অজস্র ঠুংরি গান তার জানা ছিল। এবং তা এমন দরদ দিয়ে গাইত সে, যে শুনত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। আজ কিন্তু সে কেবলি গজল গাইতে লাগল।

আজহার অন্য সময় সহজে গজল গাইতে চাইত না।

মুখার্জী হেসে বলে উঠল, — 'আজ তোমার প্রাণে বিরহ উথলে উঠল নাকি হে? কেবল গজল গাচ্ছ, মানে কি? রংঢং ধরেছে নাকি কোথাও?'

আজহারও হেসে বলল, 'বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।'

এতক্ষণে যেন সকলের বাইরের দিকে নজর পড়ল। একটু আগের বর্ষা-ধোওয়া ছলছলে আকাশ। যেন একটি বিরাট নীল পদ্ম। তারির মাঝে শরতের চাঁদ যেন পদ্মমণি। চারপাশে তারা যেন আলোক-ভ্রমর।

লেক-রোডের পাশে ছবির মত বাড়িটি।

শিউলির সাথে রজনীগন্ধার গন্ধ-মেশা হাওয়া মাঝে মাঝে হলঘরটাকে উদাস-মদির করে তুলছিল!

সকলেরি চোখ মন দুই যেন জুড়িয়ে গেল!

নাজিম সোজা হয়ে বসে বলল 'ওই দাবার গুটি নিয়ে বসলে কি আর এসব চোখে পড়ত?'

আজহার দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, 'সত্যিই তাই।'

মুখার্জী বলে উঠল, 'না; এ শালার শিউলির ফুল আজ দাবা খেলতে দেবে না দেখছি!'

আজহার বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, 'তোমারও শিউলি!ফুলের সঙ্গে কোনো কিছু জড়িত আছে নাকি হে?'

তারা কিছু বলবার আগেই অজিত বলে উঠল, 'আরে ছোঃ! দাবাড়ের আবার রোমান্স! বেচারার জীবনে একমাত্র লাভ-অ্যাফেয়ার স্ত্রীর সঙ্গে! নিজের স্ত্রীর প্রেমে পড়া! রাম বল! তাও — সে স্ত্রী চলে গেছেন বাপের বাড়ি — ঐ দাবার জ্বালায়! ওর আবার শিউলি ফুল!'

সকলে হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। মুখার্জী চটে গিয়ে বলে উঠল, 'তুই থাম অজিত! পাগলের মত যা তা বকলেই তাকে রসিকতা বলে না!'

অজিত মুখ চুন করার ভান করে বলে উঠল, 'আমি তো রসিকতা করি নি দাদা। তুমি সত্যসত্যিই তোমার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছ — দশজনের বদনাম দেয়, তাই আমিও বললাম। ওঁরা যদি তা শুনে হাসেন, তাতে আমার কি দোষ হল?'

আজহার হেসে বলে উঠল, 'এ কি তোমার অন্যায় অপবাদ অজিত? স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে দাবাড়ের কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না, এ তুমি কি করে জানলে?'

অজিত বললে, 'প্রথমে মিস্টার মুখার্জী তারপর তোমাকে দেখে!'

আজহার বলে উঠল, 'আরে আমি যে বিয়েই করি নি।'

অজিত বলে উঠল, 'তার মানে, তোমার অবস্থা আরো শোচনীয়। ও বেচারা তবু অন্তত স্ত্রীর সঙ্গে লভে পড়ল, তোমার আবার স্ত্রীই জুটল না!'

নাজিম টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল্ 'ব্রাভো! বেঁচে থাকুন অজিত বাবু! এইবার জোর বলেছেন।'

এমন সময় মালি শিউলিফুলের একজোড়া চমৎকার গোড়ে মালা টেবিলের উপরে রেখে চলে গেল। অজিত গম্ভীরভাবে মালা দুটি ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখতেই হেসে উঠল। অতি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অভিনয় করার সুরে বলে উঠল, 'হে ব্র্যাকেট-সুন্দরী! আজি এই শুক্লা শারদীয়া নিশিতে এই সেঁউতি মালার —'

আজহার ম্লান হাসি হেসে বাধা দিয়ে বলল 'দোহাই অজিত। ও মালা নিয়ে বিদ্রূপ করিসনে ভাই! ও মালা আমার নয়!'

অজিত না-ছোড় বান্দা! তার বিস্ময়কে চাপা দিয়ে সে বলে উঠল, 'তবে এ মালা কার বন্ধু? থুড়ি — কার উদ্দেশ্যে বন্ধু?'

নাজিম বলে উঠল, 'দেখ, দাবাড়ের নাকি রোমান্স নেই?'

আজ্‌হার বলে উঠে, 'আমি প্রতি বছর এমনি পয়লা আশ্বিন শিউলিফুলের মালা জলে ভাসিয়ে দেই। এ-মালা জলের — অন্য কারুর নয়।' মুখে বিষাদ-মাখা হাসি।

মায় দাবাড়ের দল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠে বসল। অজিত বয়কে হাঁক দিয়ে চা আনতে বলে ভাল করে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে বসে আজহারের দিকে চেয়ারটা ফিরিয়ে বলে উঠল, 'তারপর, বলত বন্ধু, ব্যাপারটা কি! সঙিন নিশ্চয়ই! পয়লা আশ্বিন প্রতি বছর শিউলি-মালা জলে ভাসিয়ে দেওয়া। চমৎকার গল্প হবে! বলে ফেল। নৈলে, এইখানে সকলে মিলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দেবো!'

সকলে হেসে উঠল, কিন্তু সায় দিল সকলে অজিতের প্রস্তাবে।

অনেক পীড়াপীড়ির পর আজহার হেসে বলে উঠল, 'কিন্তু তারও যে দাবা খেলা দিয়ে!'

অজিত লাফিয়ে বলে উঠল, 'তা হোক! ও পলতার সুক্তো খেয়ে ফেলা যাবে কোনো রকমে, শেষের দিকে দই-সন্দেশ পাব।'

মুখার্জী বলে উঠল, 'এ দাবা-খেলায় নৌকোর কিস্তিই বেশি থাকবে হে! গজ ঘোড়া সব কাটাকাটি হয়ে যাবে! ভয় নেই!'

২

সকলের আর এক প্রস্থ চা খাওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে মিনিটখানিক ধূম্র উদগীরণ করে আজহার বল্‌তে লাগল —

তখন সবেমাত্র ব্যারিস্টারি পাস করে এসেই শিলং বেড়াতে গেছি। ভাদ্র মাস। তখনো পূজার ছুটিওয়ালার দল এসে ভিড় জমায় নি। তবে আগে থেকেই দু'একজন করে আসতে শুরু করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার দাবাখেলার ওপর বড্ডো বেশি ঝোঁক ছিল। ও ঝোঁক বিলেতে গিয়ে আরো বেশি করে চাপল। সেখানে ইয়েট্‌স, মিচেল, উইন্টার, টমাস প্রভৃতি সকল নাম-করা খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেছি এবং কেম্ব্রিজের হয়ে অনেকগুলো খেলা জিতেওছি। শিলং গিয়ে খুঁজতেই দু'একজন দাবা খেলোয়াড়ের সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে গেল। তবে তারা কেউ বড় খেলোয়াড় নয়। তারা আমার কাছে ক্রমাগত হারত। একদিন ওরির মধ্যে একজন বলে উঠল, 'একজন বুড়ো রিটায়ার্ড প্রফেসর আছেন এখানে, তিনি মস্ত বড় দাবাড়ে, শোনা যায় — তাঁকে কেউ হারাতে পারে না — যাবেন খেল্‌তে তাঁর সাথে?'

আমি তখনি উঠে পড়ে বললাম, 'এখনই যাব, চলুন। কোথায় তিনি?'

সে ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, 'চলুন না, নিয়ে যাচ্ছি! আপনার মত খেলোয়াড় পেলে তিনি বড় খুশি হবেন। তাঁরও আপনার মতই দাবা-খেলার নেশা! অদ্ভুত খেলোয়াড় বুড়ো, চোখ বেঁধে খেলে মশাই!'

আমি ইউরোপে অনেকেরই 'বাইন্ড ফোল্ডেড্' খেলা দেখেছি, নিজেও অনেকবার খেলেছি। কাজেই এতে বিশেষ বিস্মিত হলাম না।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আকাশে এক ফালি চাঁদ, বোধ হয় শুক্লপঞ্চমীর। যেন নতুন আশার ইঙ্গিত। সারা আকাশে যেন সাদামেঘের তরণীর বাইচ খেলা শুরু হয়েছে। চাঁদ আর তারা তার মাঝে যেন হাবুডুবু খেয়ে একবার ভাসছে একবার উঠছে।

ইউক্যালিপটাস আর দেওদারু তরুঘেরা একটি রঙিন বাংলোয় গিয়ে আমরা উঠতেই দেখি, প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়েস এক শান্ত সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি তরুণীর সঙ্গে দাবা খেলছেন।

আমাদের দেশের মেয়েরাও দাবা খেলেন, এই প্রথম দেখলাম।

বিস্ময়-শ্রদ্ধা-ভরা দৃষ্টি দিয়ে তরুণীর দিকে তাকাতেই তরুণীটি উঠে পড়ে বললে, 'বাবা, দেখ কারা এসেছেন!'

খেলাটা শেষ না হতেই মেয়ে উঠে পড়াতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন একটু বিরক্ত হয়েই আমাদের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই হাসিমুখে উঠে বল্‌লেন 'আরে, বিনয় বাবু যে! এঁারা কারা? এস, বস। এঁদের পরিচয় — '

বিনয় বাবু — যিনি আমায় নিয়ে গেছিলেন, আমার পরিচয় দিতেই বৃদ্ধ লাফিয়ে উঠে আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'আপনি — এই তুমিই আজহার? আরে, তোমার নাম যে চেস-ম্যাগাজিনে, কাগজে অনেক দেখেছি। তুমি যে মস্ত বড় খেলোয়াড়! ইয়েটসের সঙ্গে বাজি চটিয়েছ, একি কম কথা! এইত তোমার বয়েস! — বড় খুশি হলুম!... ওমা শিউলি, একজন মস্ত দাবাড়ে এসেছেন! দেখে যাও! বাঃ, বড় আনন্দে কাটবে তা হলে। এই বয়সেও আমার বড্ডো দাবা-খেলার ঝোঁক, কি করি, কাউকে না পেয়ে মেয়ের সাথেই খেলছিলুম!' বলেই হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে শান্ত সন্ধ্যাকে মুখরিত করে তুললেন।

শিউলি নমস্কার করে নিরবে তার বাবার পাশে এসে বসল। তাকে দেখে আমার মনে হল এ যেত সত্যই শরতের শিউলি।

গায়ে গোধূলি রং-এর শাড়ির মাঝে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মুখখানি — হলুদ রং বোঁটায় শুভ্র শিউলিফুলের মতই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমার চেয়ে থাকার মাত্রা হয়ত একটু বেশিই হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধের উক্তিতে আমার চমক ভাঙল।

বৃদ্ধ যেন খেলার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। চাকর চায়ের সরঞ্জাম এনে দিতেই শিউলি চা তৈরি করতে করতে হেসে বলে উঠল, 'বাবার বুঝি আর দেরি সইছে না?' বলেই আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কিছু মনে করবেন না! বাবা বড্ডো দাবা খেলতে ভালবাসেন! দাবা খেলতে না পেলেই ওঁর অসুখ হয়!' বলেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এইবার চা খেতে খেতে খেলা আরম্ভ করুন, আমরা দেখি।'

বিনয় হেসে বল্‌লে, 'হাঁ এইবার সমানে সমানে লড়াই। বুঝলে মিস চৌধুরী, আমাদের রোজ উনি হারিয়ে ভূত করে দেন।'

খেলা আরম্ভ হল। সকলে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল, কেউ কেউ উপরচালও দিতে লাগল। মিস চৌধুরী ওর্ফে শিউলি তার বাবার যা দুএকটি ত্রুটি ধরিয়ে দিলে, তাতে বুঝলাম—এও এর বাবার মতই ভাল খেলোয়াড়।

কিছুক্ষণ খেলার পর বুঝলাম, আমি ইউরোপে যাঁদের সঙ্গে খেলেছি — তাঁদের অনেকের চেয়েই বড় খেলোয়াড় প্রফেসর চৌধুরী। আমি প্রফেসর চৌধুরীকে জানতাম বড় কেমিস্ট বলে, কিন্তু তিনি যে এমন অদ্ভুত ভাল দাবা খেলতে পারেন, এ আমি জানতাম না।

আমি একটা বেশি বল কেটে নিতেই বৃদ্ধ আমার পিঠ চপড়ে তারিফ করে ডিফেন্সিভ খেলা খেলতে লাগলেন। তিনি আমার গজের খেলার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। শিউলি বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে আমার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু একটা বল কম নিয়েও বৃদ্ধ এমন ভাল খেলতে লাগলেন যে, আমি পাছে হেরে যাই এই ভয়ে খেলাটা ড্র করে দিলাম। বৃদ্ধ বারংবার আমার প্রশংসা করতে করতে বল্‌লেন, 'দেখলি মা শিউলি, আমাদের খেলোয়াড়দের বিশ্বাস, গজ ঘোড়ার মত খেলে না। দেখলি জোড়া গজে কি খেললে! বড় ভাল খেল বাবা তুমি! আমি হারি কিংবা হারাই, ড্র সহজে হয় না!'

শিউলি হেসে বললে, 'কিন্তু তুমি হার নি কত বৎসর বল ত বাবা!'

প্রফেসর চৌধুরী হেসে বললেন, 'না মা হেরেছি। সে আজ প্রায় পনর বছর হল একজন পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোক — আধুনিক শিক্ষিত নন — আমায় হারিয়ে দিয়ে গেছিলেন। ওঃ, ওরকম খেলোয়াড় আর দেখি নি!'

আবার খেলা আরম্ভ হতেই বিনয় হেসে উঠল, 'এইবার মিস চৌধুরী খেলুন না মিস্টার আজহারের সাথে!'

বৃদ্ধ খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ তো! তুই-ই খেল মা, আমি একবার দেখি!'

শিউলি লজ্জিত হয়ে বলে উঠল, 'আমি কি ওঁর সঙ্গে খেলতে পারি?'

কিন্তু সকলের অনুরোধ সে খেলতে বসল। মাঝে চেস-বোর্ড একধারে চেয়ারে শিউলি — একধারে আমি! তার কেশের গন্ধ আমার মস্তিষ্ককে মদির করে তুলছিল। আমার দেহে মনে যেন নেশা ধরে আসছিল। আমি দুএকটা ভুল চাল দিতেই শিউলি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নত করে ফেললে। মনে হল, তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। সে হাসি যেন অর্থ-পূর্ণ।

আবার ভুল করতেই আমি চাপায় পড়ে আমার একটা নৌকা হারালাম। বৃদ্ধ যেন একটু বিস্মিত হলেন। বিনয় বাবুর দল হেসে বলে উঠলেন — 'এইবার মিস্টার আজহার মাত হবেন।' মনে হল, এ হাসিতে বিদ্রূপ লুকানো আছে।

আমি এইবার সংযত হয়ে মন দিয়ে খেল্‌তে লাগলাম। দুই গজ ও মন্ত্রী দিয়ে এবং নিজের কোটের বোড়ে এগিয়ে এমন অফেন্সিভ খেলা খেলতে শুরু করে দিলাম যে, প্রফেসর চৌধুরীও আর এ-খেলা বাঁচাতে পারলেন না। শিউলি হেরে গেল! সে হেরে গেলেও এত ভাল খেলেছিল যে, আমি তার প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। আমি বললাম — 'দেখুন, মেয়েদের ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ান মিস মিনচিকের সাথেও খেলেছি, কিন্তু এত বেশি বেগ পেতে হয় নি আমাকে, আমি তো প্রায় হেরেই গেছিলাম।'

দেখলাম ,আনন্দে লজ্জায় শিউলি কমলফুলের মত রাঙা হয়ে উঠেছে! আমি বেঁচে গেলাম। সে যে হেরে গিয়ে আমার উপর ক্ষুব্ধ হয় নি — এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করলাম।

প্রফেসর চৌধুরীর সঙ্গে আবার খেলা হল, এবারও ড্র হয়ে গেল।

বৃদ্ধের আনন্দ দেখে কে! বল্‌লেন, হাঁ, এতদিন পরে একজন খেলোয়াড় পেলুম, যার সঙ্গে খেলতে হলে অন্তত আট চাল ভেবে খেলতে হয়।'

কথা হল, এরপর রোজ প্রফেসর চৌধুরীর বাসায় দাবার আড্ডা বসবে।

উঠবার সময় হঠাৎ বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'মা শিউলি, এতক্ষণ খেলে মিস্টার আজ্‌হারের নিশ্চই বড্ডো কষ্ট হয়েছে, ওঁকে একটু গান শোনাও না!' আমি ততক্ষণ বসে পড়ে বললাম, 'বাঃ এ খবর জানতাম না।'

শিউলি কুণ্ঠিতস্বরে বলে উঠল, 'এই শিখছি কিছুদিন থেকে, এখনো ভাল গাইতে জানিনে!'

শিউলির আপত্তি আমাদের প্রতিবাদে টিকল না। সে গান করতে লাগল।

সে গান যারই লেখা — হোক আমার মনে হতে লাগল — এর ভাষা যেন শিউলিরই প্রাণের ভাষা — তার বেদনা নিবেদন।

এক একজনের কণ্ঠ আছে — যা শুনে এ কণ্ঠ ভাল কি মন্দ বুঝবার ক্ষমতা লোপ করে দেয়! সে কণ্ঠ এমন দরদে ভরা — এমন অকৃত্রিম যে, তা শ্রোতাকে প্রশংসা করতে ভুলিয়ে দেয়। ভালমন্দ বিচারে বহু ঊর্ধ্বে সে কণ্ঠ, কোনো কর্তব্য নেই, সুর নিয়ে কোনো কৃচ্ছ্রসাধনা নেই, অথচ হৃদয়কে স্পর্শ করে। এ প্রশংসাবাণী উথলে উঠে মুখে নয় — চোখে!

এ সেই কণ্ঠ! মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে একবার বলতে গেলাম, 'অপূর্ব!' গলার স্বর বেরুল না। শিউলির চোখে পড়ল — আমার চোখের জল। সে তার দীর্ঘায়ত চোখের পরিপূর্ণ বিস্ময় নিয়ে যেন সেই জলের অর্থ খুঁজতে লাগল।

হায়, সে যদি জানত — কালির লেখা মুছে যায়, জলের লেখা মোছে না!

সেদিন আমায় নিয়ে কে কি ভেবেছিল — তা নিয়ে সেদিনও ভাবি নি, আজও ভাবি না। ভাবি — শিউলিফুল যদি গান গাইতে পারত, সে বুঝি এমনি করেই গান গাইত। গলায় তার দরদ, সুরে তার এমনি আবেগ!

সুরের যেটুকু কাজ সে দেখাল, তা ঠুংরি ও টপ্পা মেশানো। কিন্তু বুঝলাম, এ তার ঠিক শেখা নয় — গলারও কাজটুকু স্বতঃস্ফূর্ত! কমল যেমন না জেনেই তার গন্ধ-পরাগ ঘিরে শতদলের সুচারু সমাবেশ করে — এও যেন তেমনি।

গানের শেষে বলে উঠলাম, 'আপনি যদি ঠুংরি শেখেন, আপনি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী হতে পারেন! কি অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর।'

শিউলি ফুলের শাখায় চাঁদের আলো পড়লে তা যেমন শোভা ধারণ করে, আনন্দ ও লজ্জা মিশে শিউলিকে তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শিউলি তার লজ্জাকে অতিক্রম করে বলে উঠল, 'না না, আমার গলা একটু ভাঙা। সে যাক, আমার মনে হচ্ছে আপনি গান জানেন। জানেন যদি, গান না একটা গান।'

আমি একটু মুশকিলে পড়লাম! ভাবলাম, 'না' বলি। আবার গান শুনে গলাটাও গাইবার জন্য সুড়সুড় করছে! বল্‌লাম 'আমি ঠিক গাইয়ে নই, সমঝদার মাত্র। আর, যা গান জানি, তাও হিন্দি।'

প্রফেসর চৌধুরী খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'আহা হা হা! বলতে হয় আগে থেকে! তা হলে যে গানটাই আগে শুনতাম তোমার। আর গান হিন্দি ভাষায় না হলে জমেই না ছাই। ও ভাষাটিই যেন গানের ভাষা। দেখ, ক্লাসিকাল মিউজিকের ভাষা বাংলা হতেই পারে না। কীর্তন বাউল আর রামপ্রসাদী ছাড়া এ ভাষায় অন্য ঢঙের গান চলে না!' আমি বললাম, 'আমি যদিও বাংলা গান জানিনে, তবু বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এতটা নিরাশাও পোষণ করি না।'

গান করলাম। প্রফেসর চৌধুরী তো ধরে বসলেন, তাঁকে গান শেখাতে হবে কাল থেকে। শিউলির দুই চোখে প্রশংসার দীপ্তি ঝলমল করছিল।

বিনয় বাবুর দলও ওস্তাদি গানেরই পক্ষপাতী দেখলাম। তাদের অনুরোধ দুচারখানা খেয়াল ও টপ্পা গাইলাম। প্রফেসর চৌধুরী সাধুবাদের অতিশয্যে আমার গানের অর্ধেক শোনাই গেল না। শেষের দিকে ঠুংরিই গাইলাম বেশি।

গানের শেষে দেখি আমাদের পিছন দিকে আরো কয়েকটি মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। শিউলি পরিচয় করে দিল — 'ইনি আমার মা — ইনি মামিমা — এরা আমার ছোট বোন।'

তার পরের দিন দুপুরে প্রফেসর চৌধুরীর বাড়িতে নিমন্ত্রিত হলাম। ফিরবার সময় নমস্কারান্তে চোখে পড়ল শিউলির চোখ। চোখ জ্বালা করে উঠল। মনে হল,

চোখে এক কণা বালি পড়লেই যদি চোখ এত জ্বালা করে — চোখে যার চোখ পড়ে তার যন্ত্রণা বুঝি অনুভূতির বাইরে!

৩

দেড় মাস ছিলাম শিলং-এ। হপ্তাখানেকের পরেই আমাকে হোটেল ছেড়ে প্রফেসর চৌধুরীর বাড়ি থাকতে হয়েছিল গিয়ে। সেখানে আমার দিন-রাত্রি নদীর জলের মত বয়ে যেতে লাগলো। কাজের মধ্যে দাবা-খেলা আর গান।

মুশকিলে পড়লাম — প্রফেসর চৌধুরীকে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে দাবা-খেলা ত আছেই — তাঁকে গান শেখানোই হয়ে উঠল আমার পক্ষে সব চেয়ে দুষ্কর কার্য।

শিউলিও আমার কাছে গান শিখতে লাগল। কিছুদিন পরেই আমার তান ও গানের পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে গেল।

মনে হল আমার গান শেখা সার্থক হয়ে গেল। আমার কণ্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত করে তার কণ্ঠে ঢেলে দিলাম।

আমাদের মালা বিনিময় হল না — হবেও না এ জীবনে কোনদিন — কিন্তু কণ্ঠ বদল হয়ে গেল! আর মনের কথা- সে শুধু মনই জানে!

অজিত বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কণ্ঠ বা কণ্ঠী বদল বাবা? শেষটা নেড়ানেড়ীর প্রেম? ছোঃ!'

আজহার কিছু না বলে আবার সিগার ধরিয়ে বলে যেতে লাগল —

একদিন ভোরে শিউলির কণ্ঠে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে গাচ্ছিল —

'এখন আমার সময় হল
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।'

গান শুনতে শুনতে মনে হল — আমার বুকের সকল পাঁজর জুড়ে ব্যথা। চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না। চোখে জল ভরে এল।

আশাবরী সুরের কোমল গান্ধারে আর ধৈবতে যেন তার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা গড়িয়ে পড়েছিল! আজ প্রথম শিউলির কণ্ঠস্বরে এত অশ্রুর আভাস পেলাম।

ঠং করে কিসের শব্দ হতেই ফিরে দেখি, শিউলি তার দুটি কর-পল্লব ভরে শিউলি ফুলের অঞ্জলি নিয়ে পূজারিণীর মত আমার টেবিলের উপর রাখছে। চোখে তার জল।

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে তার অশ্রু লুকাবার কোনো ছলনা না করে জিজ্ঞাসা করল — আপনি কি কালই যাচ্ছেন?

উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে হৃদয়াবেগ সংযত করে আস্তে আস্তে বল্‌লাম — 'হাঁ ভাই! আরো যেন কি বলতে চাইলাম। কিন্তু কি বলতে চাই ভুলে গেলাম।

শিউলি, শিউলি ফুলগুলিকে মুঠোয় তুলে অন্যমনষ্কভাবে অধরে কপোলে ছুঁইয়ে বল্‌লে, 'আবার কবে আসবেন।'

আমি ম্লান হাসি হেসে বললাম 'তা ও জানিনে ভাই! হয়ত আসব!'

শিউলি ফুলগুলি রেখে চলে গেল। আর একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না।

আমার সমস্ত মন যেন আর্তস্বরে কেঁদে উঠল — ওরে মূঢ়, জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ তোর এই এক মুহূর্তের জন্যই এসেছিল, তুই তা হেলায় হারালি, জীবনে তোর দ্বিতীয়বার এ শুভ মুহূর্ত আর আসবে না, আসবে না!

একমাস ওদের বাড়িতে ছিলাম। কত স্নেহ যত্ন, কত আদর। অবাধ মেলা-মেশা — সেখানে কোনো নিষেধ, কোনো গ্লানি, কোনো বাধাবিঘ্ন কোনো সন্দেহ ছিল না। আর এসব ছিল না বলেই বুঝি এতদিন ধরে এত কাছে থেকেও কারুর করে কর-স্পর্শ-টুকুও লাগে নি কোনোদিন। এই মুক্তিই ছিল বুঝি আমাদের সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কেউ কারুর মন যাচাই করিনি। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কথাও উদয় হয় নি মনে। একজন অসীম আকাশ — একজন অতল সাগর। কোনো কথা নেই — প্রশ্ন নেই, শুধু এ ওর চোখে, ও এর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে।

কেউ নিষেধ করলে না, কেউ এসে পথ আগলে দাঁড়াল না! সেও যেন জানে-আমাকে চলে আসতেই হবে, আমিও যেন জানি — আমাকে যেতেই হবে।

নদীর স্রোতই যেন সত্য — অসহায় দুই কূল এ ওর পানে তাকিয়ে আছে। অভিলাষ নাই — আছে শুধু অসহায় অশ্রু-চোখে চেয়ে থাকা।

সে চলে গেলে টেবিলের শিউলি ফুলের অঞ্জলি দুই হাতে তুলে মুখে ঠেকাতে গেলাম। বুঝি বা আমারও অজানিতে আমি সে ফুল ললাটে ঠেকিয়ে আবার টেবিলে রাখলাম। মনে হল, এ ফুল পূজারিণীর — প্রিয়ার নয়! ভাবতেই বুক যেন অব্যক্ত বেদনায় ভেঙে যেতে লাগল।

চোখ তুলেই দেখি, নিত্যকার মতই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে শিউলি বলছে — 'আজ আর গান শেখাবেন না?'

আমি বল্‌লাম — 'চল, আজই তো শেষ নয়!'

শিউলি তার হরিণ-চোখ তুলে আমার পানে চেয়ে রইল। ভয় হল বলে তার মানে বুঝবার চেষ্টা করলাম না।

ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল, আমি যেন ভীরু ভোরের হাওয়া — যত ভালোবাসা, তত ভয়! ও বুঝি ছুঁলেই ধুলায় ঝড়ে পড়বে।

এ যেন পরির দেশের স্বপ্নমায়া, চোখ চাইলেই স্বপ্ন টুটে যাবে!

এ যেন মায়া-মৃগ — ধরতে গেলেই হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে!

গান শেখালাম — বিদায়ের গান নয়। বিদায়ের ছাড়া আর সব কিছুর গান! বিদায় বেলা তো আসবেই — তবে ওর কথা বলে ওর সব বেদনা সব মাধুর্যটুকু নষ্ট করি কেন?

সেদিনকার সন্ধ্যা ছিল নিষ্কলঙ্ক — নির্মেঘ — নিরাভরণ। আমি প্রফেসর চৌধুরীকে বললাম — আজকের সন্ধ্যাটা আশ্চর্য ভালমানুষ সেজেছে তো! কোনো বেশভূষা নেই।

বলতেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর চৌধুরী বলে উঠলেন, — 'সন্ধ্যা আজ বিধবা হয়েছে!'

এই একটি কথায় ওঁর মনের কথা বুঝতে পারলাম। এই শান্ত সৌম্য মানুষটির বুকেও কি ঝড় উঠেছে বুঝলাম। মনে মনে বললাম — তুমি অটল পাহাড়, তোমার পায়ের তলায় বসে শুধু ধ্যান করতে হয়! তোমাকে ত ঝড় স্পর্শ করতে পারে না!

বৃদ্ধ বুঝি মন দিয়ে আমার মনের কথা শুনেছিলেন। ম্লান হাসি হেসে বল্‌লেন, 'আমি অতি ক্ষুদ্র বাবা! পাহাড় নয়, বল্মীকস্তূপ! তবু তোমাদের শ্রদ্ধা দেখে গিরিরাজ হতেই ইচ্ছা করে।'

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই শিউলি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল — 'এই যে সন্ধ্যা দেবী!' বলেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

শিউলির সোনার তনু ঘিরে ছিল সেদিন টকটকে লাল রং-এর শাড়ি। ওকে লাল শাড়ি পরতে আর কোনোদিন দেখি নি। মনে হল, সারা আকাশকে বঞ্চিত করে সন্ধ্যা আজ মূর্তি ধরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তার দেহে রক্ত-ধারা রং-এর শাড়ি, তার মনে রক্ত-ধারা, — মুখে অনাগত নিশীথের ম্লান ছায়া! চোখ যেমন পুড়িয়ে গেল, তেমনি মনে পূরবীর বাঁশী বেজে উঠল।

শিউলির কাছে দু-একটা বাংলা গান শিখেছিলাম। আমি বল্‌লাম — 'একটা গান গাইব?' শিউলি আমার পায়ের কাছে ঘাসের উপর বসে পড়ল বলল — 'গান!'

আমি গাইলাম —

'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে এল
সোনার গগন রে!'

প্রফেসর চৌধুরী ওঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'বাবাজী, আজ একবার শেষবার দাবা খেলতে হবে!'

চৌধুরী সাহেব ওঠে যেতে আমি বললাম — 'আচ্ছা ভাই শিউলি, আবার যখন অমনি আশ্বিন মাস — এমনি সন্ধ্যা আসবে — তখন কি করব বলতে পার?'

শিউলি তার দু চোখ ভরা কথা নিয়ে আমার চোখের উপর যেন উজাড় করে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল — 'শিউলি ফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিও!'

আমি নিরবে সায় দিলাম — তাই হবে! জিজ্ঞাসা করলাম — 'তুমি কি করবে!' সে হেসে বললে, 'আশ্বিনের শেষে তো শিউলি ঝরেই পড়ে!'

আমাদের চোখের জল লেগে সন্ধ্যাতারা চিকচিক করে উঠল।

রাত্রে দাবা-খেলার আড্ডা বসল। প্রফেসর চৌধুরী আমার কাছে হেরে গেলেন। আমি সেই হারাই আমার গলার হার হয়ে রইল।

সকালে যখন বিদায় নিলাম — তখন তাদের বাঙলোর চারপাশে উইলো-তরু তুষারে ঢাকা পড়েছে!

আর তার সাথে দেখা হয় নি — হবেও না! একটু হাত বাড়ালেই হয়ত তাকে ছুঁতে পারি, এত কাছে থাকে সে। তবু ছুঁতে সাহস হয় না। শিউলি-ফুল — বড় মৃদু, বড় ভীরু, গলায় পরলে দু' দণ্ডে আঁউরে যায়! তাই শিউলি-ফুলের আশ্বিন যখন আসে — তখন নিরবে মালা গাঁথি আর জলে ভাসিয়ে দিই!

The Ballad of Shiuli

1.

Mr. Azhar is a renowned young Barrister in Kolkata.

His house is always bustling with a butler, servants, an old guard, a gardener, and maids.

But the real charm of the house is missing. Mr. Azhar is unmarried.

Despite being a famous Barrister, Azhar doesn't readily take on many cases, even with much insistence. People say it's a way to hoard money.

But the chess players of Kolkata know that if Mr. Azhar has a strategy, it's a chess strategy**.** No one has ever been able to defeat him in chess. His chess club friends know that this very chess game prevented Mr. Azhar from becoming a great Barrister but kept him a great human being.

While a great Barrister reads "Weekly Notes," Azhar thinks about games by Alekhine, Capablanca, or Rubinstein, Reti, Morphy, or reads chess magazines, and closes his eyes, pondering their moves.

It doesn't happen in the mornings, but a chess club meets daily in the evenings. Most famous chess players from Kolkata come there to chat and discuss games.

Azhar's greatest regret is that a player like Capablanca lost to Alekhine. Yet, this very Alekhine loses to players like Bogoljubov at least five times!

Mr. Mukherjee is a staunch admirer of Alekhine. Today, when Mr. Azhar expressed his usual sorrow about that, Mr. Mukherjee exclaimed, "But whatever you say, Azhar, Alekhine's defense—is there any comparison in the world? And Bogoljubov? He's become a ghost, losing fifteen times to Alekhine in three out of five games! All world champions lose such crucial matches in

World Championship games! He won five out of twenty-four games. Besides, Bogoljubov isn't just any player either!"

Azhar chuckled and said, "Enough of your Alekhine! Now he's playing with Capablanca again; then you'll see Alekhine's plight! And Bogoljubov was even defeated by the Italian Monticelli in a blindfold game that day! Yes, Grandfield plays well."

One of the friends, annoyed, said, "Don't you two have anything else to do? Who cares about Bogoljubov or whoever, Alekhine or rotten eggs – you're driving me crazy!"

Mukherjee smiled and said, "You play quite well, Ajit, you're such a good-for-nothing, why don't you go to your wife's relatives' house! This chess strategy won't enter your head!"

Young lawyer Nazim yawned and snapped his fingers, exclaiming, "I'm lucky I didn't get that in my head! Instead, Mr. Azhar sang a couple of songs, and we'll listen and go home. Then you two can sit with your kings and queens."

The chess group's objection didn't hold. Azhar had to sing. He sang *Thumri* wonderfully. He knew countless pure Lucknowi-style Thumri songs. And he sang them with such a feeling that whoever listened was mesmerized. Today, however, he only sang *Ghazals*. Azhar usually didn't readily sing Ghazals at other times.

Mukherjee smiled and exclaimed, "Has separation welled up in your heart today? You're only singing *Ghazals*, what's the meaning? Have you fallen in love somewhere?"

Azhar also smiled and said, "Look outside once."

At last, everyone's gaze fell outside. The glistening, rain-washed sky from a moment ago was like a giant blue lotus. In its midst, the autumn moon was like a lotus gem. Around it, the stars were like luminous bees. The house, like a picture, stood by the lake road. The air, mingled with the scent of Shiuli and tuberose, occasionally made the hall nostalgic and intoxicating! Everyone's eyes and minds seemed to be refreshed!

Nazim sat up straight and said, "If we were engrossed in those chess pieces, would we have noticed all this?"

Azhar sighed and absently exclaimed, "Truly so."

Mukherjee exclaimed, "No; I see this damn *Shiuli* flower won't let us play chess today!"

Azhar, surprised, exclaimed, "Do you have something connected to the *Shiuli* flower too?"

Before they could say anything, Ajit exclaimed, "Oh, nonsense! A chess player and romance! The poor fellow's only love affair is with his wife! Falling in love with his own wife! What nonsense! And that too – his wife has gone to her father's house – because of this chess madness! And he talks about ***Shiuli*** flowers!"

Everyone laughed loudly. Mukherjee, annoyed, exclaimed, "You shut up, Ajit! Talking rubbish like a madman isn't humor!"

Ajit pretended to be hurt and exclaimed, "I wasn't joking, *dada*! You really did fall in love with your wife – people say bad things about it, so I also said it. If they laugh hearing that, what's my fault?"

Azhar chuckled and said, "Is this an unfair accusation, Ajit? How do you know that a chess player can't have any incident with anyone other than his wife?"

Ajit said, "First by seeing Mr. Mukherjee and then you!"

Azhar exclaimed, "But I'm not even married!"

Ajit exclaimed, "That means your situation is even more pathetic! At least he, the poor fellow, fell in love with his wife; you didn't even get a wife!"

Nazim thumped the table and shouted, "Bravo! Long live Ajit Babu! You've really hit the nail on the head this time!"

Just then, the gardener placed two beautiful garlands of *Shiuli* flowers on the table and left. Ajit laughed as he gravely hung the garlands on a bracket. Ajit, turning his face away, said dramatically, "Oh Bracket-Beauty! On this bright autumnal night, this *Shiuli* garland..."

Azhar interrupted with a faint smile, "For God's sake, Ajit! Don't mock that garland, brother! That garland isn't mine!"

Ajit was persistent! Suppressing his surprise, he exclaimed, "Then whose garland is this, friend? No, I mean, for whom, friend?"

Nazim said, "See, they say chess players have no romance?"

Azhar said, "Every year on the first day of *Ashwin*, I float *Shiuli* garlands in the water. This garland is for the water – not for anyone else." A sad smile lingered on his face.

The chess group even sat up straight. Ajit called the old servant to bring tea, arranged his clothes, turned his chair towards Azhar, and exclaimed, "Then, tell us, friend, what the matter is! It must be something serious! Floating *Shiuli* garlands in the water every year on the first day of Ashwin. It'll be a great story! Tell us! Otherwise, we'll all start a *Satyagraha* right here!"

Everyone laughed, but all agreed to Ajit's proposal. After much insistence, Azhar chuckled and exclaimed, "But that too, through a chess game!"

Ajit jumped up and exclaimed, "So be it! We'll somehow swallow that bitter gourd at the beginning and get curd and sweets at the end!"

Mukherjee said, "In this chess game, there will be more boat pieces, friend! All the elephants and horses will be cut down! Don't be afraid!"

2.

After everyone had another round of tea and Azhar lit a cigarette, puffing smoke for a minute, he began to speak:

"I had just passed the barrister exam and went to Shillong for a visit. It was the month of *Bhadra*. The Durga Puja holiday crowd hadn't arrived yet. However, a few people had already started coming. From my childhood, I had a great passion for chess. That passion intensified when I went abroad. There, I played with renowned players like Yates, Michell, winter, Thomas, and won many games for Cambridge. In Shillong, I searched and became acquainted with a couple of chess players. However, they weren't

great players. They consistently lost to me. One day, one of them exclaimed, 'There's an old retired professor here; he's a great chess player, it's said – no one can defeat him – will you go play with him?'

I immediately stood up and said, 'I'll go now, let's go! Where is he?'

The gentleman said, 'Come on, I'll take you! He'll be very happy to meet a player like you. He has the same passion for chess as you! The old man is an amazing player, sir, he plays blindfolded!'

I had seen many 'blindfolded' games in Europe and played many myself, so I wasn't particularly surprised.

It was evening by then, with a sliver of moon in the sky, perhaps of the fifth day of the waxing moon. It was like a sign of new hope. The entire sky seemed to have begun a game of white cloud boats. The moon and stars seemed to be bobbing and floating in their midst, sometimes sinking, sometimes rising.

We entered a colorful bungalow surrounded by eucalyptus and deodar trees and saw an old gentleman, almost sixty, with a calm and gentle face, playing chess with a young woman. This was the first time I saw a girl from our country playing chess.

As I looked at the young woman with a gaze filled with wonder and respect, she stood up and said, 'Father, see who has come!'

The old gentleman, perhaps a little annoyed that the game wasn't finished and his daughter had gotten up, looked at us and immediately rose with a smile, saying, 'Oh, it's Binay Babu! Who are these gentlemen? Come, sit. Their introduction—'

Binay Babu – who had brought me – introduced me, and the old man jumped up, embraced me, and exclaimed, 'You – are you Azhar? Oh, I've seen your name many times in chess magazines and newspapers. You're a great player! Challenging Yates, that's no small feat! And you're so young! I'm so happy!... O Ma *Shiuli*, a great chess player has come! Come and see! Bah, then it will be a lot of fun. Even at this age, I have a great passion for chess, but

what can I do, I was playing with my daughter because I couldn't find anyone else!' Saying this, he laughed heartily, filling the calm evening with his joyous laughter.

Shiuli bowed and silently sat beside her father. Seeing her, I felt that she was truly an autumn *Shiuli*. Her unblemished white face amidst the twilight-colored sari – with a yellow *bindi* – looked as beautiful as a white *Shiuli* flower. My prolonged gaze was perhaps a little too much. The old man's words broke my spell.

The old man seemed impatient for the game. When the servant brought the tea things, *Shiuli*, while making tea, chuckled and exclaimed, 'Father can't wait anymore, can he?' Saying this, she looked at me and exclaimed, 'Don't mind! Father loves playing chess very much! He gets sick if he can't play chess!' Saying this, she offered a teacup and said, 'Now, start playing while drinking tea, and we will watch.'

Binay smiled and said, "Yes, now it's an equal fight. You understand, Miss Chowdhury, he makes us into ghosts every day."

The game began. Everyone watched eagerly, some even offering suggestions. Miss Chowdhury, alias *Shiuli*, pointed out a couple of her father's errors, and from that, I understood – she was a good player, just like her father.

After playing for a while, I realized that Professor Chowdhury was a greater player than many of those I had played with in Europe. I knew Professor Chowdhury as a great Chemist, but I didn't know he could play chess so astonishingly well.

When I captured an extra pawn, the old man patted me on the back, praised me, and started playing defensively. He greatly praised my rook play. *Shiuli* looked at me repeatedly with wonder and admiration. But even with one less pawn, the old man played so well that I, fearing I might lose, drew the game. The old man repeatedly praised me, saying, "Did you see, my daughter *Shiuli*, our players don't play like rook and knight players. Did you see what you played with two rooks! You play very well, my son! Whether I lose or win, a draw doesn't come easily!"

Shiuli chuckled and said, "But tell me, Father, how many years has it been since you lost?"

Professor Chowdhury chuckled and said, "No, my dear, I have lost. It was about fifteen years ago, a gentleman from a village – not a modern educated person – defeated me. Oh, I haven't seen a player like that since!"

As the game started again, Binay chuckled, "Now, Miss Chowdhury, why don't you play with Mr. Azhar!"

The old man, pleased, said, "Excellent! You play, my dear, I'll watch once!"

Shiuli, embarrassed, exclaimed, "Can I play with him?"

But at everyone's request, she sat down to play. The chessboard was between us – *Shiuli* on one side of the chairs – me on the other! The scent of her hair intoxicated my mind. A sort of drunkenness seemed to overcome my body and mind. When I made a couple of wrong moves, *Shiuli* looked at me and then lowered her eyes. I felt a line of a smile at the corner of her lips. That smile seemed meaningful.

When I made another mistake, I was pressured and lost a rook. The old man seemed a little surprised. Binay Babu's group laughed and exclaimed, "Now Mr. Azhar will be checkmated!" I felt a hint of mockery in that laughter.

This time, I composed myself and played with concentration. With two rooks and a queen and advancing my pawns, I started playing such an offensive game that Professor Chowdhury couldn't save this game either. *Shiuli* lost! Even though she lost, she had played so well that I couldn't help but praise her. I said, "Look, I've played with the women's world champion, Miss Minic, but I didn't have to struggle this much; I almost lost!"

I saw *Shiuli* blushing like a lotus flower with joy and embarrassment! I was relieved. I considered it my good fortune that she wasn't angry with me for losing.

Another game with Professor Chowdhury resulted in a draw again.

The old man's joy was immense! He said, "Yes, after so many years, I've found a player with whom I have to think at least eight moves ahead to play!"

It was decided that from then on, the chess club would meet daily at Professor Chowdhury's house. As we were about to leave, the old man suddenly exclaimed, "My daughter *Shiuli*, Mr. Azhar must be very tired from playing for so long, why don't you sing him a song!" I quickly sat down and said, "Oh, I didn't know this news!"

Shiuli said hesitantly, "I've only been learning for a few days, I still don't sing well!"

Shiuli's objection didn't stand against our protest. She started to sing. Whatever the song's words, it felt to me that its language was the language of *Shiuli's* heart – her expression of pain. There are some voices that, when heard, make one lose the ability to judge whether the voice is good or bad! That voice is filled with such feelings – so unpretentious that it makes the listener forget to praise. That voice is far above good or bad judgment; there is no obligation, no arduous practice with the melody, yet it touches the heart. This praise overflows not in words – but in tears!

This was that voice! I was mesmerized. I didn't want to say anything. For courtesy's sake, I tried to say, "Wonderful!" My voice wouldn't come out. *Shiuli* noticed – the tears in my eyes. With complete wonder in her wide eyes, she seemed to search for the meaning of those tears. Oh, if she only knew – ink written fades, but tears written do not!

What anyone thought of me that day – I didn't think about it then, nor do I think about it now. I think – if the *Shiuli* flower could sing, it would sing like this. Its voice would have such feeling, its melody such emotion!

The musical work she displayed was a blend of Thumri and Tappa. But I understood that this wasn't proper training – the work of her voice was spontaneous! Just as a lotus, without knowing it, beautifully arranges a hundred petals around its fragrance and pollen – so was this.

At the end of the song, I exclaimed, "If you learn Thumri, you can become an unrivaled singer in the country! What a wonderfully melodious voice!"

Just as moonlight falling on a *Shiuli* branch makes it beautiful, *Shiuli* looked equally beautiful, a blend of joy and embarrassment.

Shiuli, overcoming her shyness, exclaimed, "No, no, my voice is a little broken. Anyway, I think you know how to sing. If you do, please sing a song."

I was in a bit of a predicament! I thought, "No." But after hearing her sing, my voice also yearned to sing! I said, "I'm not exactly a singer, just an appreciator. And what I know to sing is also Hindi."

Professor Chowdhury, pleased, exclaimed, "Ah, ha, ha! You should have said that earlier! Then we would have heard your song first! And a song isn't good unless it's in Hindi! That language seems to be the language of song! Look, the language of classical music can't be Bengali! Except for *Kirtan*, *Baul*, and *Ramprasadi*, other styles of music don't work in this language!" I said, "Although I don't know Bengali songs, I don't harbor such despair about the Bengali language."

I sang. Professor Chowdhury insisted that I teach him singing from tomorrow. The admiration in *Shiuli's* eyes sparkled.

Binay Babu's group also seemed to favor classical music. At their request, I sang a couple of *Khayal* and *Tappa* songs. Professor Chowdhury's excessive applause meant that half of my singing went unheard. Towards the end, I sang more *Thumri*.

At the end of the song, I saw several other ladies standing behind us. *Shiuli* introduced them, "This is my mother – this is my aunt – these are my younger sisters."

The next day at noon, I was invited to Professor Chowdhury's house. As I was leaving, *Shiuli's* eyes caught mine. My eyes burned. I felt, if a grain of sand makes the eye burn so much – the pain of one whose eye meets another's eye is perhaps beyond feeling!

3.

I was in Shillong for a month and a half. After about a week, I had to leave the hotel and stay at Professor Chowdhury's house. My days and nights there flowed like river water. My activities included playing chess and singing.

I found myself in a predicament – with Professor Chowdhury. Playing chess with him was one thing – teaching him to sing turned out to be the most difficult task for me.

Shiuli also started learning music from me. After a few days, my stock of melodies and songs was almost exhausted.

I felt that my music lessons had been worthwhile. I poured all the accumulated wealth of my voice into her voice.

We did not exchange garlands – and never will in this life – but our voices exchanged! And what's in the heart – only the heart knows!

Ajit interrupted and exclaimed, "Voice or vocalist exchanged? In the end, a mad love? Phooey!"

Azhar said nothing, lit another cigarette, and continued to speak:

"One morning, I awoke to *Shiuli's* voice. She was singing:

'Now it is my time to go, open the door, open.'

Listening to the song, I felt – my whole chest ached. I tried, but I couldn't get up. My eyes filled with tears.

In the gentle Gandhar and Dhaivat of the Ashavari raga, all the pain of her heart seemed to have flowed! Today, for the first time, I felt such a hint of tears in *Shiuli's* voice.

With a clang, something clinked, and I turned to see *Shiuli* placing a handful of *Shiuli* flowers, like a priestess, on my table, her hands cupped. Tears were in her eyes.

As our eyes met, she made no pretense to hide her tears and asked, "Are you leaving tomorrow?"

My voice choked with tears as I tried to answer. With full strength, I controlled my emotions and slowly said, "Yes,

brother!" It was as if I wanted to say something more, but I forgot what I wanted to say.

Shiuli, holding the *Shiuli* flowers in her fist, absently touched them to her lips and cheek and said, "When will you come again?"

I said with a faint smile, "I don't know that either, brother! Perhaps I will come!"

Shiuli left the flowers and walked away. She didn't ask another question.

My whole being seemed to cry out in anguish – Oh fool, the auspicious moment of your life came for this one instant, and you lost it carelessly; this blessed moment will never come again in your life, never!

I stayed at their house for a month. So much affection, so much care, so much love. Unrestricted interaction – there was no prohibition, no shame, no hindrance, no suspicion. And perhaps because there was none of this, despite being so close for so long, no one's hand ever touched another's. This freedom was perhaps our most insurmountable barrier. No one probed another's heart. No question arose in our minds. One was an endless sky – the other a bottomless ocean. There were no words – no questions, only one gazing into the other's eyes, and the other into theirs.

No one forbade it, no one stood in the way! It was as if she also knew – I had to leave, and I also knew – I had to go.

The current of the river was the truth – two helpless banks gazed at each other. There was no desire – only helpless, tear-filled gazing.

When she left, I picked up the *Shiuli* flowers from the table with both hands and tried to touch them to my face. Perhaps unknowingly, I touched the flowers to my forehead and then placed them back on the table. I felt that these flowers were for a priestess – not a beloved! Thinking this, my heart felt like it would break with an unexpressed pain.

I looked up and saw *Shiuli* standing there, smiling as usual, saying, "Won't you teach me to sing today?"

I said, "Come on, today isn't the last day!"

Shiuli looked at me with her deer-like eyes. I was afraid and didn't try to understand their meaning.

She was like a touch-me-not flower, and I was like the timid morning breeze – the more love, the more fear! It was as if she would crumble into dust if touched. This was like the dream-like magic of a fairy tale, if you look closely, the dream will break! This was like a mirage – if you try to catch it, it will vanish into thin air!

I taught her to sing – not a song of farewell. A song of everything but farewell! Farewell time would come – so why destroy its pain and sweetness by speaking of it?

That evening was unblemished – cloudless – unadorned. I said to Professor Chowdhury, "This evening has become strangely good-natured today! There's no disguise."

As I spoke, Professor Chowdhury interrupted me and exclaimed, "The evening has become a widow today!"

With this one sentence, I understood what was in his heart. I understood that a storm had also risen in the chest of this calm and gentle man. I said to myself, "You are an unyielding mountain; one should only meditate at your feet! A storm cannot touch you!"

The old man seemed to have heard my thoughts. With a faint smile, he said, "I am very insignificant, my son! Not a mountain, but an anthill! Yet, seeing your reverence, I wish to become a king of mountains."

Before I could answer, *Shiuli* came and stood before us. Suddenly, "Here is Evening Goddess!" escaped my lips, and I was embarrassed.

Shiuli's golden body was draped in a bright red sari that day. I had never seen her wear a red sari before. It felt as if the evening, having deprived the entire sky, had descended to earth in physical form today. Her body wore a blood-red sari, her heart was blood-red, and a faint shadow of the coming night was on her face! As my eyes burned, the flute of the east played in my mind.

I had learned a couple of Bengali songs from *Shiuli*. I said, "Shall I sing a song?" *Shiuli* sat on the grass at my feet and said, "Song!"

I sang:

"The golden sky has arrived, colored in the hues of marriage!"

Professor Chowdhury got up. As he left, he said, "My son, today we must play one last game of chess!"

After Professor Chowdhury left, I said, "Well, brother Shiuli, when will such an *Ashwin* month, such an evening come again – then what will I do, can you tell me?"

Shiuli poured out the tears in her eyes onto mine. Then slowly, she said, "Take a garland of *Shiuli* flowers and float it in the water!"

I silently agreed – So be it! I asked, "What will you do?" She chuckled, "*Shiuli* falls at the end of *Ashwin* anyway!"

As our tears fell, the evening stars twinkled.

That night, the chess club met. Professor Chowdhury lost to me. That loss remained as a necklace around my throat.

When I bid farewell in the morning – their bungalow was covered in frost from the willows surrounding it!

I never saw her again – and never will! Perhaps I could touch her if I reached out, she remains so close. Yet, I don't dare to touch her. The *Shihuli* flower – so delicate, so timid, it wilts in a moment if worn around the neck! That's why, when the *Ashwin* of the *Shiuli* flower comes – I silently string garlands and float them in the water!

Translated by Alamgir Mohammad

সালেক

[ক]

আজকার প্রভাতের সঙ্গে শহরে আবির্ভূত হয়েছেন এক অচেনা দরবেশ। সাগরমন্থনের মত হুজুগে লোকের কোলাহল উঠেছে পথে, ঘাটে, মাঠে, — বাইরের সব জায়গায়। অন্তঃপুরচারিণী অসূর্যস্পশ্যা জেনানাদের হেরেম তেমনি নিস্তব্ধ নীরব, — যেমন রোজই থাকে দুনিয়ার সব করলব 'হ-য-ব-র-ল'র একটেরে! বাইরে উঠেছে কোলাহল, — ভিতরে ছুটছে স্পন্দন।

সবারই মুখে এক কথা, 'ইনি কে? যাঁর এই আচমকা আগমনে নূতন করে আজ নিশিভোরে ঊষার পাখির বৈতালিক গানে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁপে উঠল আগমনীর আনন্দ-ভৈরবী আর বিভাস?'

ছুটেছে ছেলে মেয়ে বুড়ো সব একই পথে ঘেঁষাঘেঁষি করে দরবেশকে দেখতে। তবুও দেখার বিরাম নাই। দুঃশাসন টেনেই চলেছে কোন দ্রৌপদীর লজ্জাভরণ, এক মুক বিস্ময়-বিস্ফারিত-অক্ষি বিশ্বের চোখের সুমুখে, আর তা বেড়েই চলেছে! তার আদিও নেই, অন্তও নেই। ওগো, অলক্ষ্যে যে এমন একটি দেবতা রয়েছেন, যিনি গোপনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেন না!

দরবেশ কথাই কয় না, — একবারে চুপ!

অনেকে বায়না ধরলে, দীক্ষা নেবে; দরবেশ ধরা-ছোঁয়াই দেয় না। যে নিতান্তই ছাড়ে না, তাকে বলে, কাপড় ছেড়ে আয়! সে ময়লা কাপড় ছেড়ে খুব 'আমিরানাশানের' জামা জোড়া পরে আসে। দরবেশ শুধু হাসে আর হাসে, কিছুই বলে না।

শহরের কাজি শুনলেন সব কথা। তিনিও ধন্না দিতে শুরু করলেন দরবেশের কাছে। দরবেশ যতই আমল দিতে চায় না, কাজি সাহেব ততই নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকেন। দরবেশ বুঝলেন, এ ক্রমে 'কমলিই ছোড় তো নেই' গোছের হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার মুখে ফুটে উঠল ক্লান্ত সদয় হাসির ঈষৎ রেখা।

[খ]

দরবেশ বললেন, 'শুন কাজি সাহেব, আমি যা বলব তাই করতে পারবে?

কাজি সাহেব আস্ফালন করে উঠলেন, 'হাঁ, হুজুর, বান্দা হাজির।'

দরবেশ হাসলে, তারপর বললে, 'দেখ, কাল জুম্মা। মুলুকের বাদশা আসছেন এখানে। নামাজ পড়বার সময় তোমায় 'ইমামতি' করতে বলবেন। তুমি সেই সময় একটা কাজ করতে পারবে?' কাজি সাহেব বলে উঠলেন, 'আলবৎ হুজুর, আলবৎ। কি করতে হবে।'

দরবেশ বললে, 'তোমার দু-বগলে দুটি মদের বোতল দাবিয়ে নিয়ে যেতে হবে; তারপর যেই নামাজ দাঁড়াবে, অমনি মদের বোতল দুটি দিব্যি 'জায়নামাজের' উপর ভেঙ্গে দেবে।'

কাজি সাহেবের মুখ হয়ে গেল নীল। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হুজুর, তাহলে আপনি আমা হতে মুক্তি পাবেন সত্যি, কেননা ওর পরেই আমার মাথা ধর হতে আলাদা হয়ে যাবে, — কিন্তু আমার মুক্তি হবে কি?'

দরবেশ বললেন, 'অনেককেই ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছ তুমি, একবার নিজের মুক্তিটাও তো দেখতে হবে!'

কাজী সাহেব চলে এলেন। ভাব্‌লেন, 'যা থাকে অদৃষ্টে, কাল নিয়ে যাওয়া যাবে দুটো মদের বোতল মসজিদে। নিশ্চয় আমার চেয়ে বেশি জানেন!'

[গ]

বাদশাহ এসেছেন। সঙ্গে আছে সেনা-সামান্ত উজির-নাজির সব। জুম্মার নামাজ হচ্ছে। 'এমাম' (আশ্চর্য) হয়েছেন কাজি সাহেব। একটু পরই কাজি সাহেবের বগলতলা হতে খসে পড়ল দুটি ধেনো মদের বোতল! আর এটা বলাই বাহুল্য যে, সে বোতল সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে যে বিশ্রী গন্ধে মসজিদ ভরিয়ে তুললে তাতে সকলেই একবাক্যে সমর্থন করলে যে, কাজী সাহেবের তো মাতাল আর বিশ্বব্রাহ্মণ্ডে হয় নি, হবে নাও। যে মদ খায় তার ক্ষমা আছে, কিন্তু যাকে মদে খায় তার ক্ষমাও নেই, নিস্তরও নেই।

বৈঠক বসল, এ অসমসাহসিক মাতালের কি শাস্তি দেওয়া দরকার! উজির ছাড়া সভাস্থ সকলেই বললে, 'এর আবার বিচার কি জাঁহাপনা? শূলে চড়ানো হোক।' মন্ত্রী উঠে বললেন, এ বান্দার গোস্তাখি মাফ করতে আজ্ঞা হয় হুজুর! আমার বিবেচনায় এর মত পাপিষ্ঠ লোকের মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি নয়। সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে যদি তারপর আর পদবি কেড়ে নেন, আর যা কিছু সম্পত্তি তা বাজেয়াপ্ত করে নেন। মৃত্যুদণ্ড হলে তো সব ল্যাঠা চুকেই গেল। কিন্তু এই যে, তার জীবনব্যাপী 'লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, তা তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে মারবে।' বাদশা সমেত সভাস্থ সকলেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তাই ভালো।'

পাশ দিয়ে উড়ো খইয়ের মত পাগলা যা তা বকে যাচ্ছিল, এই সব লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাই তো চন্দন! আর ওতে কিছু দগ্ধ হয় না, ভাই, স্নিগ্ধই হয়।

[ঘ]

বাদশার দরবারে কাজি সাহেব যখন এই রকম লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে, সব হারিয়ে একটা অন্ধকার গলির বাঁকে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর দুর্দশা দেখে পথের কুকুরও কাঁদে! 'হাতি আড় হলে চামচিকেও লাথি মারে।' তিনি যখন শহরের কাজি ছিলেন, তখন হয়ত ন্যায়ের জন্যেও যাদিগে শাস্তি দিয়েছিলেন, তারাই সময় পেয়ে উত্তম-মধ্যম প্রহারের সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে, চিরদিন কারুর সমান যায় না। আর যা দিগে অবিচার করে শাস্তি দিয়েছিলেন, তার প্রতিশোধ নিলে তারা যে রকম নিষ্ঠুরভাবে, তার চেয়ে শূলে চড়ে মৃত্যুও ছিল শ্রেয়ঃ।

এত লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার মধ্যেও সে কার স্নিগ্ধ সান্ত্বনা ছুঁয়ে গেল আচমকা এসে ঠিক যেন জ্বরের কপালে বাঞ্ছিতা প্রেয়সীর গাঢ় করুণ পরশের মত! কাজী সাহেব শুকনো হাড়গুলোকে আকড়ে ধরে কেঁদে উঠ্‌লেন, 'খোদা এমনি করে আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবিয়ে দিলে!'

'ওগো দরবেশ, কোথায় তুমি? কোন সুদূরের পারে?'

তারপর সেই সন্ধ্যায় সরীসৃপের মত বুকের উপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে কাজি সাহেব যখন তার বাঞ্ছিত পথ বেয়ে দরবেশের আস্তানায় এসে পঁহুচলেন, তখন একটা শান্ত ঘুমের সোহাগ-ভরা ছোঁওয়ার আবেশে আঁখির পাতা জড়িয়ে আসছে! তবুও একবার প্রাণপণে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'দরবেশ, দীক্ষিত কর! — আমি এসেছি, আর যে সময় নাই!'

পুরবীর মীড়ে, সন্ধ্যা গোধূলির সম্মিলনে যে একটা ব্যথার কাঁপুনি বয়ে গেল, তা কেউ লক্ষ্য করলে না!

কার শান্ত-শীতল ক্রোড় তাঁকে জানিয়ে দিলে, 'এই যে বাপ! এস এখন তোমার মলিন বস্ত্র আর মলিন অহঙ্কার চোখের জলে ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে!'

দরবেশ সুরবাহারটায় ঝঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠলেন,

'বমে সাজ্জাদা রঙ্গিন কুন গরৎ পীরে মাগাঁ গোয়েদ!
কে সালেক বেখবর না বুদ জেরাহোরসমে মঞ্জেল হা।'
'জায়নামাজে শারাব-রঙিন কর মুর্শেদ বলেন যদি!
পথ দেখায় যে, জানে সে যে, পথের কোথায় অন্ত আদি।'

সৎমা-তাড়ানো মাতৃহারা মেয়ের মতো আশ্রু আর অভিমান-আর্দ্র মুখে একটা ভারি কালো মেঘ সব ঝাপসা ক্রমে অন্ধকার করে দিলে।

কাজি সাহেব প্রাণের বাকি সমস্ত শক্তিটুকু একত্রে করে ভাঙ্গা গলায় বললেন, 'কে? ওগো পথের সাথী! তুমি কে?'

অনেকক্ষণ কিছু শোনা গেল না! নদীর নিস্তব্ধ তীরে তীরে দুলে গেল আর্ত-গম্ভীর প্রতিধ্বনি, তু—মি—কে?'

খেয়া পার হতে খুব মৃদু একটা আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে কয়ে গেল, 'মাতাল হাফিজ!'

Salek

(a)

Dawn brought to the city that day a dervish no one had seen before. As if a sea in spate streets, docks and fields started overflowing with excited, voluble people—all open spaces were filling up. The harems in zenanas deep inside houses where lived inmates who were sheltered from the sun, however, were as quiet as ever—as if every day the whole world stirred in one direction only. Outside was tumult, inside though life throbbed on.

On everyone's lips there was only one query, "Who was he? Who could have appeared so suddenly at sunrise like an aubade sung by birds' chirping away, creating ripples of delight as would a welcoming song tuned in morning's raga, *bhairavi*?"

Men and women, young or old, all jostled against each other to get a glimpse of the dervish. And yet there seemed to be no end to the line of people wanting to take a look at him. Despite the unruly crowd, women veiled in all modesty to hide themselves from disapproving faces on this occasion fronted hushed, amazed eyes in a public space; their numbers too kept increasing all the time. There seemed to be no beginning and no end to the queue. After all, there was a godly figure still not visible, someone who would not slight those who had veiled themselves from the public eye.

But the dervish said not a word—he was completely silent!

Many kept insisting that they would like to have his blessings in one form or the other. But the dervish evaded all their pleas. Only to someone who was absolutely unrelenting in wanting to be blessed by him, the dervish said, "Take your clothes off and come." The man shed his dirty clothes and put on his own unique suit of clothes and came to him. But all the dervish did was laugh and laugh; he said nothing more to the man.

The Kazi or the city magistrate heard about what was going on. Soon, he himself began to frequent the dervish's place. The

more the dervish appeared to ignore him, the more resolute became Kazi Shaheb in seeking his attention. The dervish realized that here was someone who was not going to be shaken off easily. His face eventually showed traces of a tired but empathetic smile.

(b)

The dervish said, "Listen, Kazi Shaheb, you'll have to do what I tell you to do!"

Kazi Shaheb said confidently, "Yes, Sir; I'm ready to do your biding!"

The dervish smiled and said, "Look, tomorrow is Jumma, the weekly Friday afternoon prayer. The Emperor of this realm will be coming here. He will tell you to lead the congregation when he comes. Could you do one thing then?"

Kazi Shaheb said, "Certainly, Sir, certainly! What can I do for you Sir?"

The dervish said, "You'll have to carry in each of your armpits a liquor bottle; when everyone has lined up for prayer, fling the two bottles on the prayer mat so that they shatter into pieces there."

Kazi Shaheb's face paled immediately. Trembling, he said, "You will end up free of me, surely, my head will be severed from my body then. Will I be able to flee the scene?"

The dervish said, "You've freed many people from worldly pain in your lifetime; why not you pursue the path of freedom from all worldly cares at least once?"

Kazi Shaheb came away convinced. He said to himself, "Let what will be will be. I'll take two bottles of liquor to the mosque tomorrow. No doubt the dervish is wiser than I am.'

(c)

The emperor arrived. With him came his retinue— ministers— officers—soldiers—all of them! The Jumma prayer began. As the head of the congregation, Kazi Shaheb led the prayer service. In no time at all, two bottles of liquor dropped from where he had concealed them under his arms pits. Needless to say, the awful smell of the liquor filled the mosque as did the sound of the bottles smashing into pieces on its floor. Everyone agreed unanimously that the whole wide world did not have a drunkard as rotten as Kazi Shaheb and that no one ever would be able to match him in this regard. Someone who consumes alcohol could be forgiven, but someone who is consumed by alcohol could not be shown any mercy and should not be let off.

A meeting was summoned. What punishment did this supremely brazen drunkard deserve? Except for the minister of state, everyone said in one voice, "What is there to deliberate upon in such a case, O Emperor? Put him on the docks!" The minister, however, said, "Your Highness, forgive this servant's impertinence for speaking in front of you, but in our estimation a death sentence is not punishment severe enough for a sinner of this magnitude. The harshest punishment that can be meted out to him will be to take away his position and his title, and to confiscate all his property. A death sentence would merely be a quick fix solution. But when he is subject to reproaches and rebukes all life long and will feel his disgrace forever, he will die a slow, painful death." The emperor and everyone else present in the assembly concurred. "This is a great idea!"

A mad man who was passing by at that time and who was saying things that did not seem to make any sense at all as he passed by, things that seemed to be floating randomly like straw in the air do, said then. "Such a punishment is like marking one's forehead with sandal wood paste; nothing can be smeared that way; all it does is soften things."

(d)

After the Kazi Shaheb had been humiliated and abused in this manner in the court of the emperor, and when he had been stripped of everything he had and would stand in the bend of a dark road, even the roadside dog would begin to whimper. As the proverb goes, "When the elephant is sprawling in the dirt, even the titmouse will give it a kick." Perhaps those whom he had punished justly when he was the city magistrate were now seizing the occasion to flay him any way which they could to let him know that none could enjoy good fortune forever. And those whom he had punished unjustly before were now taking their revenge on him in such cruel ways that it would have been better for him to have been beheaded on a dock than face the remorseless manner in which they were going about taking revenge on him.

But amidst such humiliation and abuse, someone seemed to touch him softly and gently, just as a loving person would touch avidly as well as tenderly the burning forehead of one who had fever. Kazi Shaheb clasped his shriveled chest at this and burst out crying, "Lord! Is this how you decided to drown my pride in tears?"

"Oh dervish, where are you now? In which far-away land could you be?"

That evening, like a reptile would, with great effort and painfully, Kazi Shaheb crawled towards his destination, which was the dervish's dwelling place. By the time he reached the place his eyelids were drooping at sleep's gentle embrace. And yet he cried out soulfully at one point, "Dervish, initiate me in your ways, I've come and am running out of time!"

No one would feel the kind of melancholic quivering going on inside him that was not unlike the doleful sound created when a player strums the notes of evening's raga, Purabi, on his stringed instrument.

Someone's peaceful and cold lap seemed to beckon him, "Child! Come to me. Here all your worn out clothes and fading pride have all been washed in tears and purified fully."

The dervish now stroked his Surbahar or bass sitar till it rang out and sang these lines:

"Make your prayer mat wine-colored, if this is what your spiritual guide wants;

Only the one who shows the way can tell you where the path begins and ends".

As with a girl whose mother had passed away, and who had been driven out by her step-mother, and consequently had tear-filled eyes and a moist face, a thick cloud gradually plunged everything into darkness.

Kazi Shaheb now gathered all the strength that was left in him and said in a voice that seemed to be cracking, "Who is it? Who is going to be my companion in the road ahead of me? Who are you?"

For a long while nothing broke the silence that followed. Across the quiet of the river banks reverberated a solemn echo "Who are you?"

As the boat rowed across the water, a very soft voice said tremulously, "" Drunkard Hafiz"!

Translated by Fakrul Alam

Essays
প্রবন্ধ

আমার ধর্ম

দেশে একটা কথা উঠেছে যে, মুক্তির জন্য যে আন্দোলন আমরা চালাচ্ছি আমাদের তা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে। দেশে যখন মুক্তির জন্যে ভাঙ ভাঙ বলে রব করে লাখ লাখ লোক আগল ভেঙে বেরিয়ে এল, তখন তারা এক নতুনভাবে মাতোয়ারা হয়ে মানুষের মতো মানুষ দেখে তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল। কিন্তু আজ যখন তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হলো তখন তাঁর মতে ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক উঠে সঙ্ঘ ভেঙে যাবার যোগাড় হলো। এমনি করেই যুদ্ধের পরই সঙ্ঘ থেকে জীবন চলে গিয়েছিল, পড়েছিল শুধু বাইরের একটা আচার। ঠিক তেমনি আজ যেন আমাদের ভিতর থেকে প্রাণটুকু বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে—তার্কিকেরা তাকে ধরে রাখবার কোনো চেষ্টাই করছেন না। কেউ কেউ এত বেশি গোঁড়া আর সাবধানী হয়ে পড়েছেন, কিন্তু ধ্বংসকে ডেকে আনবার মতো সাহস বা ক্ষমতা তাদের আছে বলে মনে হয় না। কারণ আমাদের মনে তো কই সাড়া খুঁজে পাচ্ছি না।

আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, আমাদের ধর্মের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। কিসের জন্যে আমাদের ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে ? ওরে শূদ্র, তুই এবার ওঠ। উঠে বল্, 'আমি ব্রাহ্মণ নই যে ধর্মের ব্যাখা নিয়ে পড়ে থাকব। আমি আর তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকব না। আমায় বাঁচতে হবে—যেমন করে হোক বাঁচবো'। ওরে পতিত, ওরে চিরলাঞ্ছিত, তুই দেখ সারা বিশ্ব তোকে ধ্বংস করতে উদ্যত। দেবতা তাঁর জল ঝড় নিয়ে, প্রকৃতি তার রোগ মহামারী নিয়ে তোকে পিষে ফেলতে ব্যস্ত। আচার তার জগদ্দল পাথর তোর বুকে বসিয়ে দিয়েছে—সমাজ তোর কণ্ঠরোধ করে ফেলেছে। ধনীর অট্টহাস্য তোর প্রাণের করুণ কাঁদুনি ঢেকেছে।

কিসের ধর্ম ? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। দেবতার জল-ঝড়কে আমি বাঁধবো, প্রকৃতিকে আমি প্রতিঘাত দেবো। আচারের বোঝা ঠেলে ফেলে দেবো, সমাজকে ধ্বংস করবো। সব ছারে-খারে দিয়েও আমি বাঁচবো।

আমার আবার ধর্ম কি ? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি ? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মতো মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই-বোন বাপ-মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি ? দু'বেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যেই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি ?

মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি ? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি ?

ওরে আমার তরুণ, ওরে আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল, তোরা আয়, তোরা ছুটে আয়—এই ভণ্ডামি থেকে চলে আয়। তোরা বল্ আমাদের আগে বাঁচতে হবে। কিসের শিক্ষা ? কে শেখাবে ? দাস কখনও দাসকে শেখাতে পারে ? আমরা কিছু শিখবো না, আমরা কিছু শুনবো না; আগে বাঁচবো—আমরা বাঁচবো।

একবার মনে ভেবে দেখো—তাদের কথা ভেবে দেখো। দেশছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার দল আজ কোন্ বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে জানে তারা কত মরে গেছে, কত ঘা সয়েছে ? তারা তো কথাটি কয়নি। সেই কবে গৃহহীন হয়ে প্রবাস বরণ করে, হাটে মাঠে বেড়াচ্ছে, তবু তারা কথাটি কয়নি। তাদের তপ্তশ্বাস আজ কি তোমার বুকে বয়ে যাচ্ছে না ? তুমি যে পথ দিয়ে দিনের পর দিন শুধু সুখের সন্ধানে চলে যাও, তারই একপাশে বদ্ধ ঘরে তারা যে দিনের পর দিন তিল তিল করে মরতে চলেছে, সে খবর তুমি রাখ কি ? সেই অন্ধকারে সহস্র আঘাত খেয়ে তারা যে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছে, তাদের ধর্ম কি ?

তারা বুঝেছে বাঁচাই তাদের ধর্ম—তারা জানে এই তিল তিল করে মরার ভিতরেই জীবন। তাই তারা ঐ মরণের পথ বেছে নিয়েছে।

ওগো তরুণ, আজ কি তুমি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে—তুমি কি বাঁচবার কথা ভাববে না ? ওরে অধীন, ওরে ভণ্ড তোর আবার ধর্ম কি ? যারা তোকে ধর্ম শিখিয়েছে, তারা শত্রু এলে বেদ নিয়ে পড়ে থাকতো ? তারা কি দুশমন এলে কোরআন পড়তে ব্যস্ত থাকতো ? তাদের রণ কোলাহলে বেদমন্ত্র ডুবে যেত, দুশমনের খুনে তাদের মসজিদের ধাপ লাল হয়ে যেত। তারা আগে বাঁচতো।

My religion

We are told we have to follow our religion. What for? Oh *Sudra*, rise up. Just say that you are not a *Brahmin, that* you will just indulge in religious interpretations. Say you need to live, come what may, you need to live.

Oh downfallen, dear neglected and downtrodden, the whole world is about to destroy you. The deities bring you water, storms, nature brings epidemics and want to crush you. Tradition has placed heavy stones on your chest, society has stifled your voice. The boisterous laugh of the rich has drowned the painful tears emerging from your heart.

What religion? Staying alive is my religion. I shall quell the storm and floods of the deities, I shall face the vagaries of nature. I shall shun the customs and rituals, I shall destroy society. I shall finish them all, and live.

So what religion do I have? One who has no right to speak from his own home, one who wakes up to nightmares in the night, one who has no might to stare back at the barbaric acts, has no religion? One who can be killed like an animal at his own place, one who cannot utter a word when his brother, sister, father or mother is killed, how can he have a religion? They just live to eat two square meals a day and spend a few moments of leisure, they don't have any religion.

You are a slave, so what religion do you have? You have no right to speak about religion.

My young ones, my rootless ones, I beckon you - come and leave hypocrisy behind. Just say that, 'We need to live first, what education? Who is going to teach us? One slave cannot teach another slave. We shall not listen to anything, nor learn anything. First we shall live.'

Just think of them once, how these rootless people are being forced to live in the woods. Who knows how many of them have

died and what pain they have suffered, they have not talked. For ages they have been forced to be homeless and live elsewhere, yet they have not spoken. Do I not feel their hot breath on my chest? Do you even know that they are dying a slow death, very next to the path where you trod everyday in search of happiness? They have had hundreds of painful experiences and spent years after years enduring the same, what religion do they have?

They understand that this existence is their religion, they know that their lives are a struggle amidst this slow death.That is why they have chosen the path of death.

Dear youth, are you going to engross yourselves in religion? Will you not think of living? The enslaved ones, what is your religion? Think of those who taught you religion, did they adhere to their *Veda* when the enemies attacked them? Did they start reading the Quran when they were attacked? They would immerse themselves in war and forget the *Veda*, they would colour their mosques with the blood of their enemies. They would live first!

Translated by Nashid Kamal

আমার লীগ কংগ্রেস

আমার স্বধর্মী কোনো কোনো ভাই বা তাঁদের কাগজে প্রচার করছেন—আমি নাকি মুসলিম লীগ বিদ্বেষী। বিদ্বেষ আমার ধর্ম-বিরুদ্ধ। আমার আল্লাহ্ নিত্য-পূর্ণ-পরম-অভেদ, নিত্য পরম-প্রেমময়, নিত্য সর্বদ্বন্দ্বাতীত। কোনো ধর্ম, কোনো জাতি বা মানবের প্রতি বিদ্বেষ আমার ধর্মে নাই, কর্মে নাই, মর্মে নাই। মানুষের বিচারকে আমি স্বীকারও করি না, ভয়ও করি না। আমি শুধু একমাত্র পরম বিচারক আল্লাহ্ ও তাঁর বিচারকেই মানি। তবু যাঁরা ভ্রান্ত বা বিদ্বেষবশত আমার এই নিন্দাবাদ করছেন তাঁদের ও আমার প্রিয় মুসলিম জনগণের অবগতির জন্য আমার সত্য অভিমত নিবেদন করছি।

আমি 'নবযুগে' যোগদান করেছি, শুধু ভারতে নয়, জগতে নবযুগ আনার জন্য। এ আমার অহঙ্কার নয়, এ আমার সাধ, এ আমার সাধনা। এই বিদ্বেষ-কলহ-কলঙ্কিত, প্রেমহীন, ক্ষমাহীন অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে, শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে—আল্লার বান্দা রূপেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। 'ইসলাম' ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে—কোরান মজিদে এই মহাবাণীই উত্থিত হয়েছে।... এক আল্লাহ্ ছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই। তাঁর আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র মানব-ধর্ম। আমি যদি আমার অতীত জীবনে কোনো 'কফুর' বা 'গুণাহ' করে থাকি তার শাস্তি আমি আমার প্রভু আল্লার কাছে থেকে নেবো, তার শাস্তি কোনো মানুষের দেওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ্ লা-শরিক, একমেবাদ্বিতীয়ম। কে সেখানে 'দ্বিতীয়' আছে যে আমার বিচার করবে? কাজেই কারও নিন্দাবাদ বা বিচারকে আমি ভয় করি না। আল্লাহ্ আমার প্রভু, রসুলের আমি উম্মত, আল-কোরান আমার পথ-প্রদর্শক।

এ ছাড়া আমার কেহ প্রভু নাই, শাফায়ত দাতা নাই, মুর্শিদ নাই। আমার 'আল্লাহ্ আল্ ফাদালিল্ আজিম'—পরম দাতা। তিনিই আমাকে জাতির কাছ থেকে, কৌমের কাছ থেকে, কোনো দান নিতে দেননি। যে দক্ষিণ হাত তুলে কেবল তার কৃপা ভিক্ষা করেছি তাঁর দাক্ষিণ্য ছাড়া কারুর দানে সে-হাত কলঙ্কিত হয়নি। আজ তিনিই এই পথভ্রষ্ট, অন্ধ আশ্রয়-ভিক্ষুকের হাত ধরে একমাত্র তাঁর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমার ক্ষমাসুন্দর আল্লার পূর্ণ ক্ষমা পেয়েছি, সত্য পথের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর বান্দা হবার অধিকার পেয়েছি। আমার আজ আর কোনো অভাব নাই, চাওয়া নাই, পাওয়া নাই।

আমার কবিতা আমার শক্তি নয় ; আল্লার দেওয়া শক্তি—আমি উপলক্ষ মাত্র! বীণার বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে-গুণী, সমস্ত প্রশংসা তারই। আমার কবিতা যাঁরা পড়ছেন, তাঁরাই সাক্ষী : আমি মুসলিমকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য তাদের জড়ত্ব, আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি। বাংলার মুসলমানকে শির উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য—যে শির এক আল্লাহ ছাড়া কোনো সম্রাটের কাছেও নত হয়নি—আল্লাহ্ যতটুকু শক্তি দিয়েছেন তাই দিয়ে বলেছি লিখেছি ও নিজের জীবন দিয়েও তার সাধনা করেছি। আমার কাব্যশক্তিকে তথাকথিক 'খাটো' করেও গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামী গান রেকর্ড করে নিরক্ষর তিন কোটি মুসলমানের ইমান অটুট রাখারই চেষ্টা করেছি। আমি এর প্রতিদানে সমাজের কাছে জাতির কাছে কিছু চাইনি। এ আমার আল্লার হুকুম আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি মাত্র। আজো আমি একমাত্র তাঁরই হুকুমবর্দাররূপে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেছি—আমার দীর্ঘদিনের গোপন তীর্থযাত্রার পর।

আমি আজ জিজ্ঞাসা করি : আমি লীগের মেম্বার নই বলে কি কোনো লীগ-কর্মী বা নেতার চেয়ে কম কাজ করেছি ? আজো 'নবযুগে' এসেছি শুধু মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে—তাদের প্রবল করে তুলতে—তাদের আবার 'মার্টায়ার'—শহীদি সেনা করতে। বাংলার মুসলমান বাংলার অর্ধেক অঙ্গ। কিন্তু এই অঙ্গ আলস্যে জড়তায় পঙ্গু। এই অঙ্গকে প্রবল না করলে বাংলা কখনো পূর্ণাঙ্গ হবে না। বাংলার এই ছত্রভঙ্গ ছিন্নদল মুসলমানদের আবার এক আকাশের ছত্রতলে, এক ঈদগাহের ময়দানে সমবেত করার জন্যই আমি চিরদিন আজান দিয়ে এসেছি। 'নবযুগে' এসেও সেই কথা বলেছি ও লিখেছি! এই 'নবযুগে' আসার আগে বাংলার মুসলমান নেতায় নেতায় যে ন্যাতা টানাটানির ব্যাপার চলেছিল—সেই গ্লানিকর বিদ্বেষ ও কলহকে দূর করতেই আমি লেখনী ও তলোয়ার নিয়ে, আমার অনুগত নির্ভীক, দুর্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী 'নৌ-জোয়ানদের' নিয়ে—ভাইয়ে ভাইয়ে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে এসেছি। আমি কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করতে আসিনি। আল্লাহ্ জানেন, আর জানেন—যাঁরা আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাঁরা—আমি কোনো প্রলোভন নিয়ে এই কলহের কুরুক্ষেত্রে যোগদান করিনি। 'লীগ' কেন, 'কংগ্রেস'কেও আমি কোনদিন স্বীকার করিনি। আমার 'ধূমকেতু' পত্রিকা তার প্রমাণ। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কোনোদিন লিখিনি—কিন্তু তার নেতাদের বিরুদ্ধে লিখেছি। যে কোনো আন্দোলনেরই হোক, নেতারা যদি নির্লোভ, নিরহঙ্কার ও নির্ভয় না হন, সে আন্দোলনকে একদিন না একদিন ব্যর্থ হতেই হবে।

লীগের আন্দোলন যেমন 'গদাই লস্করি' চালে চলছিল তাতে আমি আমার অন্তরে কোনো বিপুল সম্ভাবনার আশার আলোক দেখতে পাইনি।...

আমি 'লীগ' 'কংগ্রেস' কিছুই মানি না, মানি শুধু সত্যকে, মানি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে, মানি সর্বজনগণের মুক্তিকে। এক দেশের সৈন্যদল অন্যদেশ জয় করতে যায় বরং তাদেরও স্বীকার করি—কিন্তু স্বীকার করি না ভীরুর আস্ফালনকে, জেল কয়েদিদের মারামারিকে। এক খুঁটিতে বাঁধা রামছাগল, এক খুঁটিতে বাঁধা খোদার খাসি, কারুর গলার বাঁধন টুটল না, কেউ খুঁটি মুক্ত হলো না, অথচ তারা তাল ঠুকে এ ওকে ঘুস মারে ! দেখে হাসি পায়।

মুসলমানের জন্য আমার দান কোনো নেতার চেয়ে কম নয় ; যে-সব মুসলমান যুবক আজ নবজীবনের সাড়া পেয়ে দেশের জাতির কল্যাণের সাহায্য করছে তাদের প্রায় সকলেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা-ঝুলি থেকে।

আল্লার সৃষ্টি এই পৃথিবী আজ অসুন্দরে, নির্যাতনে, বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষ আল্লার খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি—'ভাইসরয়।' মানুষ আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ চেষ্টা করলে সমস্ত ফেরেশতাকেও বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে, ত্রি-লোকের বাদশাহী পেতে পারে—এ আল্লাহ্‌র নির্দেশ। মানুষ মাত্রেই আল্লার সৈনিক। অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে সর্ব নির্যাতন, সর্ব অশান্তি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে মানুষের জন্ম। আমি সেই কথাই আজীবন বলে যাব, লিখে যাব, গেয়ে যাব; এই জগতের মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশকে আবার পূর্ণ শুদ্ধ পূর্ণ নির্মল করব—এই আমার সাধনা। পূর্ণ চৈতন্যময় হবে আল্লার সৃষ্টি এই আমার সাধ। পূর্ণ আনন্দময়, পূর্ণ শান্তিময় হবে এ পৃথিবী—এ আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাস আল্লাতে বিশ্বাসের মতোই অটল। 'ফিরদৌসআলা'—পূর্ণ আনন্দধাম থেকে আমরা এসেছি। পৃথিবীতে সেই আনন্দধামেরই প্রতিষ্ঠা করব—এই আমাদের তপস্যা। এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর একমাত্র আল্লাহ্‌। যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবি করে তারা শয়তান। সে শয়তানদের সংহার করে আমরা আল্লার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করব। যে মুসলমানের ক্ষাত্রশক্তি নাই, সে মুসলমান নয়। যে ভীরু সে মুসলমান নয়। এই ভীরুতা, এই তামসিকতা, এই অপৌরুষকে দূর করাই আমার লীগ, আমার কংগ্রেস। এ-ছাড়া আমার অন্য লীগ-কংগ্রেস নাই।

দৈনিক 'নবযুগ'
১৯৪১

My League Congress

Some of my co-religionist brothers or their newspapers are spreading the news that I am against **Muslim League**. Hatred is against my religion. My **Allah** is eternally perfect, supremely One, eternally supremely loving, eternally beyond all duality. There is no hatred in my religion, in my actions, or in my heart, towards any religion, any nation, or any human being. I neither acknowledge nor fear human judgment. I only obey the one supreme Judge, Allah, and His judgment. Yet, for the understanding of those who, due to error or hatred, are leveling this accusation against me, and for my beloved Muslim public, I present my true opinion.

I have joined **'Nabajug'** not just to bring about a new age in India, but in the world. This is not my arrogance; this is my desire, this is my spiritual endeavor. To make this world—stained by hatred, conflict, and quarrels, devoid of love and forgiveness, unsightly—beautiful, to establish it in peace—I have descended into the field of action as a servant of Allah. The religion of Islam has come to earth to establish complete peace and equality—this great message has been uttered in the ***Holy Quran***. ... Except for one Allah, I have no Lord. To obey His command is my only human duty. If I have committed any ***kufr*** (disbelief) or ***gunah*** (sin) in my past life, I will take my punishment from my Lord Allah; no human has the right to punish me. Allah is ***La Sharik*** (without partner), ***Ekameva-dvitīyam*** (one without a second). Who else is 'second' there to judge me? Therefore, I do not fear anyone's condemnation or judgment. Allah is my Lord, I am a follower of the Prophet, *and Al-Quran* is my guide.

Besides this, I have no other Lord, no intercessor, no spiritual guide. My ***'Allah-ul-Faddalil Azim'***—the supreme Giver. He has never allowed me to accept any gift from the community, from the nation. This hand, which I have raised to beg only for His grace, has not been stained by anyone's charity except His. Today, He Himself, holding the hand of this misguided, blind, refuge-

seeking beggar, is leading him on His sole path. I have received the full forgiveness of my forgiving and beautiful Allah, I have found the path of truth. I have obtained the right to be His servant. Today, I have no lack, no desire, and no gain.

My poetry is not my power; it is the **power given by Allah**—I am merely the instrument! Music plays on the strings of the *Vina*, but all praise belongs to the skilled one who plays it. Those who have read my poetry are witnesses: I have strived my whole life to unite Muslims, to remove their inertia, laziness, aversion to work, impotence, and disbelief—to make the Muslims of Bengal stand with their heads held high—that head which has never bowed to any emperor except one Allah—with whatever power Allah has given me, I have spoken, written, and even practiced it with my own life. Even by 'reducing' my poetic power, I have recorded hundreds of Islamic songs on gramophone records, striving to keep the faith of three crore illiterate Muslims unshaken. In return, I have asked for nothing from society or the nation. This is my Allah's command, and I have only obeyed His command. Even today, I have descended into the field of action as His sole obedient servant—after my long, secret pilgrimage.

Today I ask: Have I done less work than any League worker or leader just because I am not a member of the League? Even today, I have come to 'Nabajug' only to unite the Muslims—to make them powerful—to make them again 'martyrs'—martyr soldiers. The Muslims of Bengal are half the body of Bengal. But this limb is paralyzed by laziness and inertia. If this limb is not made powerful, Bengal will never be complete. To gather these scattered, fragmented Muslims of Bengal again under one sky, on one *Eidgah* ground, I have always come by giving the call to prayer. Even after coming to 'Nabajug,' I have spoken and written those same words! Before coming to this 'Nabajug,' the degrading tug-of-war that was going on among the Muslim leaders of Bengal—to remove that shameful hatred and conflict, I have come with pen and sword, with my obedient, fearless, invincible, immortal 'sailors'—to make full efforts for brotherly unity. I have not come to help any individual. Allah knows, and those who are personally familiar with me know—I have not joined this

Kurukshetra of conflict with any temptation. Why 'League,' I have never even recognized 'Congress.' My newspaper ***'Dhumketu'*** (The Comet) is proof of that. I have never written against the Muslim League—but I have written against its leaders. No matter what the movement, if its leaders are not selfless, humble, and fearless, that movement is bound to fail one day.

Since the League's movement was proceeding with such 'slow military' progress, I did not see any light of immense potential hope in my heart...

I recognize neither 'League' nor 'Congress.' I recognize only Truth, I recognize universal brotherhood, I recognize the liberation of all people. I even acknowledge the army of one country going to conquer another—but I do not acknowledge the bluster of the coward, the infighting of prison inmates. Ram-goats tied to one post, *Khoda's* goats tied to one post, no one's noose breaks, no one is freed from the post, yet they clap and punch each other! It makes me laugh.

My contribution to Muslims is no less than any leader's; almost all the Muslim youths who today feel the call of a new life and are helping the welfare of the country and nation have received inspiration from this beggar's begging bowl.

Allah's creation, this earth, has today become filled with ugliness, oppression, and hatred. Man is Allah's *Khalifa*, meaning His representative—a 'Viceroy.' Man is Allah's greatest creation. If man tries, he can make all angels submit, he can attain the kingship of the three worlds—this is Allah's command. Every human is Allah's soldier. Man is born to make this unsightly earth beautiful, to free the earth from all oppression, all unrest. I will continue to speak, write, and sing these words throughout my life; to make the soil, water, fire, air, and sky of this world again perfectly pure, perfectly clean—this is my spiritual endeavor. To make Allah's creation fully conscious—this is my desire. This earth will be perfectly joyful, perfectly peaceful—this is my belief. This belief is as unwavering as faith in Allah. We have come from ***Firdausala***—the abode of perfect joy. To establish that abode of joy on earth—this is our penance. The sole monarch of this earth

is Allah. Those who claim their own kingdom on this earth are *Satan*. We will destroy those ***Satans*** and establish the kingdom of Allah. The Muslim who does not have martial spirit is not a Muslim. He who is a coward is not a Muslim. To remove this cowardice, this inertia, this unmanliness is my League, my Congress. Other than this, I have no other League-Congress.

'Dainik Nabajug' 1941

Translated by Alamgir Mohammad

আমার সুন্দর

আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। 'ধূমকেতু' 'লাঙল' 'গণবাণী'তে, তারপর এই 'নবযুগে' তাঁর শক্তি-সুন্দর প্রকাশ এসেছিল ; আর তা এল রুদ্র-তেজে, বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হয়ে। বলতে ভুলে গেছি, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন হক সাহেবের দৈনিক পত্র 'নবযুগে' কি লেখাই লিখলাম, আজ তা মনে নেই ; কিন্তু পনের দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

এই গান লিখি ও সুর দিই যখন, তখন অজস্র অর্থ, যশ-সম্মান, অভিনন্দন, ফুল, মালা—বাংলার ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা পেতে লাগলাম। তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ, সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশন-ব্রত পালন করি, রাজবন্দিদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে আমাকে জেলের নানারকম শৃঙ্খল-বন্ধন ('লিঙ্ক-ফেটার্স', 'বার-ফেটার্স', 'ক্রস-ফেটার্স' প্রভৃতি) ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদ-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব-জ্বালা যন্ত্রণা, অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মতো নগণ্য তরুণ কবিতা-লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেননি। আজ এই প্রথম মনে হলো, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার সুন্দরের আশীর্বাদ এসেছিল, জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে। তখন কিন্তু একথা মনে হয়নি।

তখনো একথা ভাবতে পারিনি, এ লেখা আমার নয়, এ লেখা আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মা-বিজড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।

জেলে আমার সুন্দর শৃঙ্খলের কঠিন মালা পরিয়েছিলেন হাতে-পায়ে; জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমার অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাংলাদেশ দিয়েছিল ফুলের শৃঙ্খল, ভালোবাসার চন্দন, আত্মীয়তার আকুলতা। আট বৎসর ধরে বাংলাদেশের প্রায় প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, ছোট বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে, কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভালোবাসলাম। মনে হলো, এই আমার মা। তাঁর শ্যাম-স্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা-

নীলে আমার দেহ-মন-প্রাণ শান্ত-উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দর রূপে, আমার জননী জন্মভূমিরূপে।

আমি সেদিনের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও নেত্রীদের আহবানে বাংলাদেশ পরিক্রমণ করেছি ; আমি তরুণদের সাথে মিশেছি—বন্ধু বলে, আত্মার আত্মীয় মনে করে। তারাও আমায় আলিঙ্গন করেছে বন্ধু বলে, ভাই বলে—কিন্তু কোনো দিন আমার নেতা হবার লোভ হয়নি, আজো সে লোভ হয় না। আমার কেবলই যেন মনে হতো, আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি। জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনোদিনও ছিল না, আজো নেই। আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেননি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি প্রথম আমার যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দরকে দেখলাম।

তারপর আমর সুন্দর এলেন শোক-সুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এল নিবিড় স্নেহ-সুন্দর হয়ে। বাইরে মোমের মতো ছিল সে সুন্দর, মমতার মধু-মাধুরী, রস-সুরভি ভরা ছিল তার অন্তরে। সে আমাকে আত্মার মতো জড়িয়ে ধরল। যেখানে যেতাম, সো আমার সাথে যেত। সে আমার সাথেই খেলত, মান-অভিমান করতো। যে সুর শেখাতাম, সে সুর দুবার শুনেই সে শিখে নিত। তখন তার তিন বছর আট মাস বয়স। একদিন রাত্রে বলল, 'বাবা, চাঁদের মধ্যে কে একটি ছেলে আমাকে বাঁশি বাজিয়ে ডাকছে।' হঠাৎ আমার দেহে-মনে কি যেন বিষাদের, বিরহের, বেদনার ঢেউ দুলে উঠলো। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। সেই রাত্রে তার প্রবল জ্বর এল। ভীষণ বসন্ত-রোগে ভুগে হাসতে হাসতে আনন্দধামের শিশু আনন্দধামে চলে গেল।

আমার সুন্দর পৃথিবীর আলো যেন এক নিমিষে নিভে গেল। আমার আনন্দ, কবিতা, হাসি, গান যেন কোথায় পালিয়ে গেল, আমার বিরহ, আমার বেদনা সইতে না পেরে। এই আমার শোক-সুন্দর !

এই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগল—কোন্ নিষ্ঠুর এই সৃষ্টি করে, কেন সে শিশু-সুন্দরকে কেড়ে নেয় ? এই শোকের মাঝে জেগে উঠল স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অভিমান, সেই অভিমান ঘনীভূত হয়ে আমার সর্ব অস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌন বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব হয়ে। চারিদিকে কেবল ধ্বনি উঠতে লাগল, "সংহার কর ! ধ্বংস করো ! বিনাশ করো !' কিন্তু শক্তি কোথায় পাই! কোথায়, কোন্ পথে পাব সেই প্রলয়-সুন্দরের, সংহার-সুন্দরের দেখা? আমি বসে চিন্তা করতে লাগলাম। কোথা হতে একজন সাথি এসে বললেন—'ধ্যান করো, দেখতে পাবে।' আমি বললাম, 'ধ্যান কি ?' তিনি বললেন, 'একমাত্র তাঁকে ডাকা ও তাঁর চিন্তা করা।' এই প্রথম এলেন আমার

ধ্যান-সুন্দর। মাঝে মাঝে ভালো লাগত, মাঝে মাঝে লাগত না। মাঝে মাঝে ভ্রান্তি, মায়া আমাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগলো। তাঁরা বলল, 'আমরা তোমার প্রলয়-সুন্দরের প্রলয়-শক্তি, আমাদের সাথে পথ চল, তাহলে স্রষ্টাকে দেখতে পাবে—তাহলে আমাদের শক্তিতে সংহার করতে পারবে।' আমার যে সহজ সাবলীল আনন্দ-চঞ্চলতা, যৌবনের মদির উন্মাদনা, গান, কবিতা ও সুরের রসমাধুরী ছিল, এদের সাথে পথ চলে যেন সব শুকিয়ে গেল।

আমি আমার প্রলয়-সুন্দরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম, "পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও।' কে যেন স্বপ্নে এসে বলল, 'কোরান পড়ো; ওতে যা লেখা আছে, তা পড়লে তোমার প্রলয়-সুন্দরকে—আমারও ঊর্ধ্বে তোমার পূর্ণতাকে দেখতে পাবে।' আমি নমস্কার করে বললাম, 'তুমিই কি আমার কবিতায়, লেখায় বিদ্রোহ হয়ে বিপ্লব-বাণী হয়ে আমার কল্পনায়, আমার চেতনায় প্রকাশিত হয়েছিলে?' তিনি আমায় বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তোমারই পূর্ব-চেতনা —প্রিকনস্যাসনেস।' ইংরাজিতে বললেন, বোধ হয়, আমি যদি পূর্ব-চেতনার অর্থ না বুঝি তাই। আমি বললাম, 'আবার তোমার সাথে দেখা হবে ?' তিনি বললেন, 'আমি যে নিত্য তোমার মাঝে আছি, আমি যে তোমার বন্ধু !' তিনি চলে গেলেন। সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেল, কিন্তু শিরায়-শিরায় অণু-পরমাণুতে সেই স্বপ্নের আনন্দ-অমৃতের শিহরণ সর্ব অঙ্গে জড়িয়ে রইল প্রিয়ার পুষ্প-মালার মতো হয়ে।

গোপনে পড়তে লাগলাম, বেদান্ত, কোরান। আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোনো বজ্রনাদে ও তড়িৎ-লেখার তলোয়ারে বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন আরো, আরো ঊর্ধ্বে যেতে লাগলাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণ-সুন্দর জ্যোতি। এই আমার স্বর্ণ-জ্যোতি সুন্দরকে প্রথম দেখলাম।

সহসা যেন কোন্ করাল ভয়ঙ্কর-শক্তি আমায় নীচের দিকে টানতে লাগল। বলতে লাগল, 'তোমার মাতৃ-ঋণ—তোমার স্বদেশের ঋণ শোধ না হতে কোথায় যাবে উন্মাদ?' আমি বললাম, 'সাবধান! আমার মাঝে আমার প্রলয়-সুন্দর আছেন।' সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ শক্তি প্রবলবেগে নিম্নপানে টানতে লাগল। বলল, 'সেই প্রলয়-সুন্দর তোমার মতো অজ্ঞানোন্মাদ নন, তোমার সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণ, বাংলার ঋণ, মানব-ঋণ, তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না করে তুমি যেতে পারবে না।' আমি বললাম, 'তুমিই কি কোরানে লিখিত অভিশপ্ত শক্তি—শয়তান !' সে হেসে বলল, 'হাঁ, চিনতে পেরেছ দেখে আনন্দিত হলাম।

কোরানে কি পড় নাই, আমার ঋণ শোধ না করে তুমি স্রষ্টার কাছে যেতে পারবে না, তাঁকে দেখতে পাবে না, আমার বাধাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না !' অনুভব করতে লাগলাম, আমার প্রলয়-সুন্দর আর যেন সাহায্য করছেন না। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলাম। এই পৃথিবীর মাটির মায়া আমাকে মায়ের মতো প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরলেন, চুম্বন করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন। আমি বিদ্রোহ করে এই বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সেই ভয়ঙ্কর শক্তি পৃথিবীর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ভীষণ প্রহার করতে লাগলেন। আমার সহধর্মিণী অর্ধাঙ্গিনী শক্তিকে অর্ধপঙ্গু করে শয্যাশায়ী করে দিলেন ! অর্থ কমিয়ে দিলেন, ভীষণ ঋণ-দেনার রজ্জু বন্ধন করে প্রহার করতে লাগলেন।

আমার পৃথিবী এসে আমাকে ধরে আমার জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন। এমন সময় এলেন আমার এক না-দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু, আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফতে আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন। আমি আবার এই প্রথম ধরিত্রী-সুন্দর মাকে ভালবাসলাম, জড়িয়ে ধরলাম ! আমার সমস্ত জ্বালা যেন ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল ! আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল ! আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাংলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম, দৈন্যে, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে তিনি জর্জরিতা হয়ে গেছেন ! তাঁর মুখে-চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈন্য-দানব-রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত। আমি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বললাম, 'আমি ব্রহ্ম চাই না, আল্লাহ্ চাই না, ভগবান চাই না। এই সব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন ! আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রী মাতার ঋণ আছে ! আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আবার পূর্ণশ্রী-সুন্দর আনন্দ-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, আমার শান্তি নেই।'

ভয়ঙ্কর শক্তি আনন্দে হেসে উঠল। আমি বললাম, 'এ তোমার অভিনয় !' সে বলল, 'এই আমি প্রথম তোমার কাছে সত্যি করে হাসলাম, অভিনয় করিনি।' চেয়ে দেখি, আমার পানে চেয়ে পৃথিবীর ফুল আনন্দে ঝরে পড়ল। আমি মাটি থেকে তাকে বুকে তুলে বললাম, 'কেন তুমি ঝরলে ?' ফুল বললে, 'আমার মা-লতাকে জিজ্ঞাসা কর, আমার রূপ-রস-সুরভি-মধুকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি যে এই পৃথিবীর সুন্দর মানুষ, তোমার মাঝে আমার সুন্দর আছেন, সেই সুন্দরকে দেখে আমি আনন্দে ঝরে পড়লাম।' আমি ফুলকে চুম্বন করলাম, অধরে বক্ষে কপোলে রেখে আদর করলাম।

ফুল বলল, 'আমার সুন্দরকে পেয়েছি, আমার এই রূপ-রস-মধু-সুরভি নিয়ে তোমার মাঝে নিত্য হয়ে থাকব।' এই আমি প্রথম পুষ্পিত সুন্দরকে দেখলাম। এইরূপে চাঁদের আলো, সকাল-সন্ধ্যার অরুণ-কিরণ, ঘনশ্যাম-সুন্দর বনানী, তরঙ্গ-হিল্লোলিতা ঝর্ণা, তটিনী, কূলহারা নীর-ঘন সাগর, দশদিক-বিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মতো সখার মতো, কথা কইল। আমায় 'আমার সুন্দর' বলে ডাকল।

সহসা এল ঊর্ধ্ব-গগনে বৈশাখী ঝড়, প্রগাঢ় নীলকৃষ্ণ মেঘমালাকে জড়িয়ে। ঘন ঘন গম্ভীর ডমরু ধ্বনিতে, বহ্নিবর্ণা দামিনী-নাগিনীর ত্বরিত চঞ্চল সঞ্চারণে আমার বাহিরে-অন্তরে যেন অপরূপ আনন্দ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। সহসা আমার কণ্ঠে গান হয়ে আবির্ভূত হলো—'এল রে প্রলয়ঙ্কর সুন্দর বৈশাখী ঝড় মেঘমালা জড়ায়ে!' আমি সজল ব্যাকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম, 'তুমি কে—কে ?' মধুর সহজ কণ্ঠে উত্তর এল, 'তোমার প্রলয়-সুন্দর বন্ধু।'

আমি তখন বললাম, 'তুমি তো আমায় ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে, আবার কি জন্যে এলে ?' সে আমার আত্মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি স্রষ্টাকে সংহার করে, তোমার মাকে সংহার করতে, মাতৃহত্যা করতে চেয়েছিলে, আত্মসংহার করতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমার দু'ধারি তলোয়ার কেড়ে নিয়ে অভিমানে ফিরে গেছি। তোমার চৈতন্য ফিরে এসেছে, তোমার মাঝেই তোমার স্রষ্টাকে দেখতে পাবে আজ—সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, রস-ভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখদায়ী সমীরণে, তোমার সৃষ্টিসুন্দরকে প্রকাশ-স্বরূপে দেখেছ ! তোমার না-দেখা পরম প্রিয়তম, পরম বন্ধুকে পেতে, বিপুল অসহ তৃষ্ণা, স্বপ্ন, সাধ, কল্পনা, বাঁধ-না-মানা বেগসহ অসীমের পানে প্রবল প্রবাহ নিয়ে উজান গতিতে ঊর্ধ্বের পানে চলেছিলে, আজ সেই পরম পূর্ণতার, পরম শান্তির, পরম মুক্তির আনন্দবাণী নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি তোমার বন্ধু হয়ে। এই পৃথিবীতেই তাঁর সঙ্গে তোমার অপরূপ পূর্ণ মিলন হবে! তার আগে তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে হবে ; সর্ব অসাম্য, ভেদকে দূর করতে হবে। মানুষ যে তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে পরম বিলাস, পরম বিহার।'

শুনে আমি অপরূপ আনন্দে মাভৈঃ ধ্বনি করে বললাম, 'তবে দাও বন্ধু আমায় দু'ধারি তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ-শিঙ্গা, দাও আমায় অসুর-দৈত্য-সংহারী ত্রিশূল ডমরুধ্বনি! দাও আমায় ঝঞ্ঝার জটিল জটা, দাও আমায়

বাংলার সুন্দরবনের বাঘাম্বর। দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমার জটাজুটে শিশু শশীর স্নিগ্ধ হাসি। দাও আমায় তৃতীয় নয়ন, দাও সেই তৃতীয় নয়নে অসুর-দানব-সংহারের শক্তি। দাও আমার কণ্ঠে এই পৃথিবীর বিষ, করো আমায় বিষ-সুন্দর নীলকণ্ঠ। দাও আমায় দামিনী-তড়িতের কণ্ঠমালা। দাও আমার চরণে নটরাজের বিষম তালের নৃত্যায়িত ছন্দ।'

বন্ধু হেসে বললেন, 'সব পাবে, তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নেই। আর কিছু দিন দেরি আছে। তুমি অভিমান করে বিদ্রোহ করে নিজের কি ক্ষতি করেছ, নিজে কি কখনো চেয়ে দেখেছ ? তুমি অরণ্য-কণ্টক-কর্দমাক্ত পথে নিজের সর্বাঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত শক্তিহীন করে ফেলেছ। তোমার এইসব অপূর্ণতা পূর্ণ হোক, তখন তোমার প্রলয়-সুন্দর তোমার সর্বদেহে আবির্ভূত হবেন। তোমার সুন্দরকে তুমি লতার মত জড়িয়ে ধরবে, তার না-শোনা বাণী তোমার লেখায় ফুলের মত ঝরে পড়বে।" আমি বললাম, 'তথাস্তু!' প্রলয়-সুন্দর বললেন, 'সাধু! সাধু! তথাস্তু!'

My Beauty

['Amar Sundor' (My Beauty) is a landmark to undrstand the literary conception and philosophical evolution of Kazi Nazrul Islam. It was first published in the Daily *Novojug* (The New Era) in a new phase, on 02 June 1942 as an editorial article signed by the poet. Karunamaya Goswami in his book *Kazi Nazrul Islam : A Biography* (Nazrul Institute, Dhaka, 1996) writes about the writing of `Amar Sundor' and the causes behind it. In the essay Nazrul "narrated in a highly poetical language how he felt the revelation of the Beautiful through his creative works and through all the events related to his life tinged with happiness or sorrow. Unfortunately enough this was a kind of counter writing absolutely ugly in tone. This was no new thing for Nazrul. He was our object of virulent attack from many quarters long since" (P-153). In 'On Nazrul's Aesthetics' Mohammad Nurul Huda comments on Nazrul's Sundor :

> ... In his attempt to combine loud proclamation of man's rebellious self with the introvert mystic within him, he outlined an aesthetics of his kind with Beauty, metaphorized as swarna-jyoti or golden glow, remaining central to its core. Beauty is multi-shaded and multi-coloured synonym of various realities, both positive and negative, as he explained in his Amar Sundar (My Beauty). It is, indeed, a unique idea of beauty growing out of the equation between the hunger of heart and hunger of body that creates a singnificant aesthetic cognition in his works. The paper briefly presents the making of poetlore in Nazrul stressing on the fact that as an outspoken feminist, a humanist, an advocate of unification of diverse religions etc he also propagated the globalization of man, the individual.
>
> He never promulgated any aesthetic declaration like many of his contemporaries, mostly university wits, who heralded a tactical literary revolt against great bangali poet Rabindranath Tagore who was reigning supreme in the-then literary firmament of Bengal. However his confessional prose named Amar Sundar Surprisingly reveals his inscape-the aesthetic stream of the poet. Here he narrates what he wrote, why he wrote paralled to the inner and outer occurrences influencing his life. So almost all his writings, prose of poetry, can be explained inter-textually parallel to this brief confession, which is why this confession may suitably be describeed as the aesthetic outobiography of Nazrul himself. (Nazrul Institute Journal, Nazrul Institute, Dhaka, Vol. 5, January 1999, P-14)

It is worthy to mention that Nazrul did no keep well after its publication. Physically and mentally he began to be much disturbed. From the beginning of July, 1942 his physical conditon was deteriorating and on 09 July he was attacked

severely. He lost his speech, and gradually lost his capacity to think and remember.

'Amar Sundor' was published in the book from titled *Dhumketu* in 1960. In *Nazrul Rochonavoli* (Works of Nazrul) Vol. 4 published by the Bangla Accademy, Dhaka it has been placed under the title 'Probondho' (Essays).]

My beauty first came in the form of short stories, then came in the form of poetry. Latter on in the form of songs, melodies, rhythms and ideas. Sometimes he came as novels, plays and prose. His might, the beauty was exposed in *Dhumketu, Langol, Gonovani* and last of all in *Novojug*. And that came with much sprit, as the messege of revolution and rebellion. I have forget to say that I cannot recollect what I would write for Mr. Huq's daily *Novojug* when I returned from the battlefield.

When I wrote songs and gave them melody, I began to receive much money, fame, reception, flowers and garlands, alongwith the love of the youths of Bengal. Then I was only twenty five of six. The reason behind my getting so much honour is that among the writers and literateurs I got imprionment first, observed forty days hunger strike protesting the injustice on the prisoner. For this disobedience, I had to suffer various punishment ('link-fetters', 'bar-fetters', 'cross-fetters' etc.) in the prison. That time Rabindranath dedicated his play *Bosonto* (The Spring) to me. I forget all the suffering, punishment and fasting in the prison for this garland of blessing. Only he knew why he pleased an insignificant person like me. I have never inquired about it, neither he told. Today for the first time it seems that from his right hand the blessing of beauty came to me to remove all my pains and sufferings in the jail. This idea did not come to my mind then.

Then I did not realize that I am not the writer of all these. My beauty, the very existence of my soul is the writer of them. In the prison my beauty gave me the fetters on my hands and legs; when I came out of the whole country gave me the fetters of flowers, love and intimacy. For eight years I have been roaming in most of the districts, sub-divisions, and big villages of Bangladesh singing for freedom and lecturing for it. Thus for the first time I loved my motherland. It seemed that it is my mother. My body, mind and

soul began to dance with the joyous rhythms of her deeo love, affection and the blue and turquoise blue of her sky. The exposition of the beauty of my inner soul first appeared as expression, the beauty as my mother in motherland.

I have travelled through Bangladesh at the call of the greatest leaders of the country; I took the youths with me as friends, as my relation of my soul. They have embraced me as their friend and brother. but I never wanted to be a leader, neither I want to be. I have never had any discrimination between caste and religion neither I have now. So no Hindu man ever hated me. the Brahmins took me to their side and ate with me and fed me. Then for the first time I realized my youth, the beauty and my love, the beauty.

Afterwards my beauty came in the guise of agony, the beauty. My son was born as affection, the beauty. Outwardly he was as beautiful as candle, inwardly he was full of affection and feeling. He embraced me as my own soul. Wherever I went, he accompanied me. He would play with me, would make pique against me. He would learn any melody at the second attempt that I taught him. Then he was only at three years and eight months. One night he told me, "Baba, a boy in the moon is calling me blowing him flute". Suddenly my mind and body experienced a wave of pain, suffering and grief. I bathed in my tears. That night he was attacked by fever. Suffering much from pox, the little baby of the pleasure-dome left for its previous place.

The light of my beauteous world put off in a moment. Failing to bear my misery, all my pleasures, poems, laughter and song fled away. This is my agony, the beauty.

For the first time the question arose in me, what cruel person creates it, why does he take away the childlike beauty? Among these agonies I attained a deep perturbation against the Creator- the perturbation concentrated with me as a silent revolt and rebellion. Around me I heard the call 'Destroy, devastate and demolish'. But what is my source of power! Where, in what way shall I meet that cataclysmic beauty? I began to think over it. From somewhere a friend came to me and said, "Contemplate and you

will see". I asked him, "What is contemplation?" He answered, "It's only to remember Him and think about Him". This was how I met my contemplation, the beauty initially. Sometimes I liked it, some other times I did not. Every now and then illusion and deception tried to provoke me. They told, "We're your cataclysmic beauty's power, come with us and you'll meet the Creator - then you'll be able to destroy with our power". All my easy and joyous movement, dance of my youthfulness, feeling of my songs, poems and notes dried up keeping pace with them.

Whole-heartedly I began to call the cataclysm, the beauty, "Show me, show me the way of you." Someone told me in my dream, "Read the Holy Quran. You'll see your cataclysm, the beauty, - above me - above your fullness, if you read what is written in it". Saluting him I asked, "Were you the exposition of my rebellion and my rebellious-message in my thoughts and consciousness that I expressed in my writings?" He answered, "Yes, I'm your pre-consciousness." He told me these in English, possibly thinking if I failed to get the true idea of pre-consciousness. I asked, "Will you meet me again?" He answered, "I'm always with you, I'm your companion!" He went away. The happy dream shattered, but that pleasure remained in every shred of my existence throughout my whole body as a garland from a lady-love.

I began to read the Vedas and the Holy Quran secretly. The sky of the world burst out for some thunderstorm and sword-like lightning. I began to go high to higher. From far I saw the beautiful golden rays. Then I saw the golden glow, the beauty.

Suddenly some dangerous power began to pull me down. It said, "Where'll you go, mad, without compensating your owe to your mother, your motherland?" I replied, "Stop! You know I have cataclysm, the beauty in me." The powerful anti-force pulled me forcefully down. It said, "That cataclysm, the beauty is not so mad as you. You can't leave before paying your debts to your world, to Bharot, to Bengal, to humanity, to your kith and kin." I asked, "Are you that devilish power that is cited in the Quran?" Smiling he answered, "I'm happy that you've accurately

identified me. Haven't you read in the Quran that without paying me you can't move to the Creator or see Him or cross the barriers by me?" I felt that my cataclysm, the beauty is not helping me more. I, the man of this soil, came back to it again, The attraction of the soil of the earth embraced me deeply. it kissed me, and cried me. When I violently tried to free myself from all these attraction, that fearful power began to beat me taking away from the reality. He crippled my better half and made her bed-ridden. He shortened my income and beat me by encircling me with debts.

Coming to me my earth softened me. At that time came an unacquainted friend of me. He gave me the unseen consciousness through one of his rebel-friends. My sufferings began to calm down. My blindness dispelled. Looking at my mother-earth, my Bengal, my Bharat, I saw that they were suffering from meanness, poverty, want, and villainous power. I shouted, "I don't want Brahma of Allah or God. If there is any physical existence of these names, He Himself will come to me. I've huge tasks to do, I've much debt to my mother-earth. I can't get freedom till I can free my imprisoned mother from the tyranny of the demons."

Then that dangerous power laughed out. I told, "This is your pretense." He answered, "No, this is for the first time I'm laughing to you." I saw, the flowers dropped in joy looking at me. Lifting it from the ground I told, "Why did you drop?" The flower said, "Ask my mother-plant, ask my beauty-juice-samll honey. Seeing my beauty in you, I've dropped that. You are a man of beauty, beauty live in you." I kissed the flower, embraced him with my lips, breast and cheeks. The flower said, "I've got my beauty, I'll remain with my beauty - juice-smell and honey." Thus for the first time I saw the flower, the beauty. Thus the moonshine, the sun-light of the morning and evening, the bottle green greenery, the water springs, rivers, fathomless blue ocean, the air that is flowing around embraced me. Like a friend they talked with me in sweet tones and called me, "My Beauty".

Suddenly there appeared storms in the higher skies with the blackish-blue clouds. Repeated sounds of the drums, the quick movement of the *Boishakh**[1]*** have come embracing the clouds. All

on a sudden their appeared in my voice in the form of song and melody "There comes the terrible *Boishakhi* storm (nor-wester) alongwith the clouds." With eager and tearful voice I shouted, "Who're you, who?" A soft voice answered, "Friend, your danger, the beauty".

Then I said, "You had left me away but why have you come now?" He embraced my soul and said, "You wanted to destroy your Creator, your mother and your own self. So I went back snatching away your two-edged sword. Your conscience has come back, you will see your Creator in you in His Creation-earth, sky-air, juicy fruit, scented flower, cool soil, cold water, pleasing air. You were speedily running high to get your unseen beloved and intimate friend with much thirst, dream, expectation and uncontrollable speed. Today I've come back to you with the message of best perfection extreme peace, and final freedom. In this world you will have an excellent unity with Him. Before that you are to better this imperfect world into a perfect one and remove all inequalities and differences. After that you will have a joyous pastime and sport with your Beauty".

Hearing this, I happily told "*Mavoi****[2]*** then give me my two edged sword, your *shinga****[3]*** of revolution, *trishool****[4]*** and *domru****[5]*** for killing giant-demons, *jota****[6]*** of storms, tiger-skins of the tiger of the Sunderbans. Give a mark of shining burn on my forehead, give a moonlight of the crescent moon on my matted hair! Give me a third eye, and power in that eye to destroy all devils. Give me the venom of this earth in my throat, make me a blue-eyes poisonous beauty". Give me a garland of lightning and the dancing rhythms of *Notoraj****[7]*** in my feet.

Translated by Subrata Kumar Das

---

[1] The first month of the Bengali Year (BS).
[2] Don't fear.
[3] Trumpet of lord Shiva, the god of destruction.
[4] Three edged spear.
[5] Small drum.
[6] Matted hair.
[7] Dancing posture of the god Shiva.

আমি সৈনিক

এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে-সেবক সৈনিক হতে পারবে।

সেবার ভার নেবে নারী কিংবা সেই পুরুষ যে-পুরুষের মধ্যে নারীর করুণা প্রবল। নারীর ভালোবাসা আর পুরুষের ভালোবাসা বিভিন্ন রকমের। নারীর ভালোবাসায় মমতা আর চোখের জলের করুণাই বেশি। পুরুষের ভালোবাসায় আঘাত আর বিদ্রোহই প্রধান।

দেশকে যে নারীর করুণা দিয়ে সেবা করে, সে পুরুষ নয়, হয়তো মহাপুরুষ। কিন্তু দেশ এখন চায়, মহাপুরুষ নয়। দেশ চায়, সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহ করা আঘাত করার পশুত্ব বা পৈশাচিকতাকে যে অনুভূতি নিষ্ঠুরতা বলে দোষ দেয় বা সহ্য করতে পারে না, সেই অনুভূতিই হচ্ছে নারীর অনুভূতি, মানুষের ঐটুকুই হচ্ছে দেবত্ব। যারা পুরুষ হবে, যারা দেশ-সৈনিক হবে, তাদের বাইরে ঐ পশুত্বের বা অসুরত্বের বদনামটুকু সহ্য করে নিতে হবে। যে-ছেলের মনে সেবা করবার, বুকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসার ইচ্ছাটা জন্মগত প্রবল, তার সৈনিক না হওয়াই উচিত। দেশের দুঃখ-আর্ত পীড়িতদের সেবার ভার এই সব ছেলেরা খুব ভালো করেই করতে পারবে। যেমন উত্তর-বঙ্গের বন্যা-পীড়িতদের সেবা সাহায্য। বাংলার ত্যাগী ঋষি প্রফুল্লচন্দ্র আজ মায়ের মমতা নিয়ে দু'হাতে অন্নবস্ত্র বিলাচ্ছেন, এরূপ জগদ্ধাত্রীর, এরূপ অন্নপূর্ণার, এরূপ এ মূর্তি তো রুদ্রের নয়, প্রলয়ের দেবতার চোখে এমন মায়ের করুণা ক্ষরে না। এই যে হাজার হাজার ছেলেরা এই আর্তদের সেবার জন্য দু'বাহু বাড়িয়ে ছুটেছে, এ-ছোটা যে মায়ের ছোটা, এ-করুণা, এ-সেবা-প্রবণতা নারীর, দেবতার। আমরা এঁদের পূজা করি, কিন্তু এতে তো দেশের বাইরের মুক্তি স্বাধীনতা আনবে না। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাংলার দেবতা, তাঁদের পূজার জন্য বাংলার চোখের জল চির-নিবেদিত থাকবে। কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র? সে-পুরুষ এসেছিল বিবেকানন্দ, সে-সেনাপতির পৌরুষ হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।

ওরে আমার ভারতের সেরা, আগুন খেলার সোনার বাংলা! কোথায় কোন্ অগ্নিগিরির তলে তোর বুকের অগ্নি-সিন্ধু নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হয়ে পড়ল? কোন্ অলস-করা

করুণার দেবতার বাঁশির সুরে সুরে তোর উত্তাল অগ্নি-তরঙ্গ-মালা স্তব্ধ-নিথর হয়ে পড়ল? কোথায় ভীমের জন্মদাতা পবন? ফুঁ দাও, ফুঁ দাও এই নিবন্ত অগ্নি-সিন্ধুতে, আবার এর তরঙ্গে তরঙ্গে নিযুত নাগ-নাগিনীর নাগ-হিন্দোলা উলসিয়া উঠুক। ওগো করুণার দেবতা, প্রেমের বিধাতা, বাঁশির রাজা। তোমরা মুক্ত বিশ্বের, তোমরা এ ঘুমন্ত দাস — অলস ভারতের নও। এই অলস জাতিকে তোমাদের সুরের অশ্রুতে আরো অলস-উতল করে তুলো না। তোমাদের সুরের কান্নায় কান্নায় এদের অলস আর্ত আত্মা আরো কাতর, আরো ঘুম-আর্দ্র হয়ে উঠল যে, এ সুর তোমাদের থামাও। আঘাত আনো, হিংসা আনো, যুদ্ধ আনো, এদেরে এবার জাগাও, কান্না-কাতর আত্মাকে আর কাঁদিয়ো না। আমরা যে আশা করে আছি, কখন সে মহা-সেনাপতি আসবে যার ইঙ্গিতে আমাদের মতো শত কোটি সৈনিক বহ্নি-মুখ পতঙ্গের মতো তার ছত্রতলে গিয়ে 'হাজির হাজির' বলে হাজির হবে। হে আমার অজানা প্রলয়ঙ্কর মহা-সেনানী, তোমায় আমি দেখি নাই, কিন্তু তোমার আদেশ আমি শুনেছি, আমি শুনেছি। আমায় যুদ্ধ-ঘোষণার যে তূর্য-বাদনের ভার দিয়েছ, সে ভার আমি মাথা পেতে নিয়েছি। এ যে তোমার হুকুম। সাধ্য কি, আমি তার অমান্য করি? হে আমার অনাগত অব্যক্ত মহা-শক্তি! বাজাও, বাজাও, এমনি করে আমার কণ্ঠে তোমার প্রলয়-শিঙ্গা বাজাও! তোমার রণ-ভেরী আমারই ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠুক। ঘরের পরের সকল মার, সকল আঘাত যেন নির্বিকার চিত্তে, হাসিমুখে সহ্য করে আমি তোমারই দেওয়া তূর্যে যুদ্ধ-ঘোষণা করতে পারি। হে আমার অপ্রকাশ মহাবিদ্রোহী, তুমিই আমায় বল দিয়ো। যেদিন তুমি আসবে সেদিন যেন তোমারই পতাকা-তলে তোমার দেওয়া তরবারিকে, রক্ত-সৈনিক বেশে দাঁড়াতে পারি। সেদিন কলিজার শোণিত-মাখা তরবারি তোমার পদতলে অর্ঘ্য দিয়ে যেন তোমার রক্ত-আঁখির প্রসাদ-চাওয়ায় বঞ্চিত না হই। যখন দুশমনের বর্শা-ফলক আমার বুকে বিদ্ধ হয়ে আমায় সৈনিকের গৌরব-দীপ্ত মরণের অধিকারী করবে যখন আমার রক্ত-হীন দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়বে সেদিন তুমি বলো প্রভু, 'বৎস! তুমি আমার কর্তব্য করেছ।' মনে করি, হয়তো এ তূর্য-বাদনের শক্তি আমার নাই, কিন্তু ছাড়তে তো পারি না, তোমার অব্যক্ত-শক্তি, আমায় ছাড়তেও দেয় না, পিছুতেও দেয় না। সে ক্রমেই অগ্রে, আরো অগ্রে, ঠেলে নিয়ে যায়। আমার অসম্পূর্ণতা আমার অপ্রকাশ যা তোমার চোখে ক্ষমার, তা যে অন্যের চক্ষে অপরাধের প্রভু। আমার বিদ্রোহের মাঝে যেটুকু অহঙ্কার, শুধু সেইটুকু আমার হোক, তুমি শুধু বল—আমার কণ্ঠে এসে বলো—'এ বিদ্রোহ আমার।'

ঐ অহঙ্কারের দুর্নামটুকু আমি মাথা পেতে নিতে পারি, সেই শক্তি আমায় দাও। আমার মাঝে বিদ্রোহী বেশে যখন এলে, হে আমার অনাগত মহাবিদ্রোহী বিপুল শক্তি, তখন তো বুঝিনি যে আমায় শুধু বাইরের আঘাত, ঘরের মারটুকুর অধিকারী করে নিলে, তখন তো বুঝিনি যে, এই বিদ্রোহের প্রসাদ, এর কল্যাণ-ক্ষীরটুকু তোমার।

আজ শুধু ডাকছি আর ডাকছি, আমায় এবার তোমার যুদ্ধ পতাকা-তলে ডেকে নাও, মরণের মাঝে ডেকে নাও। আমায়-দেওয়া তোমার তূর্য-কেতন অন্য সৈনিককে দাও।

সেবার মাঝে আমায় সাড়া দিবার অধিকারী করলে না। বললে,—

'আর্তের অশ্রুমোচন আমার নয়, আমার রণ-তূর্য। আমি প্রলয়ের, আমি প্রেমের নই। আমি রুদ্রের, আমি করুণার নই। আমি সেবার নই, আমি যুদ্ধের। আমি সেবক নই, আমি সৈনিক। আমি পূজার নই। আমি ঘৃণার। আমি অবহেলার, আমি অপমানের। আমি দেবতা নই, আমি হিংস্র, বন্য, পশু। আমি সুন্দর নই, আমি বীভৎস। আমি বুকে নিতে পারি না, আমি আঘাত করি। আমি মঙ্গলের নয়, আমি মৃত্যুর। আমি হাসির নয়, আমি অভিশাপের।' হে আমার মাঝের তিক্ত শক্তি, রুদ্র-জ্বালা, বিষ-দাহন। হে আমার যুগে-যুগে নির্মম নিষ্ঠুর সৈনিক-আত্মা, তোমায় আমি যেন প্রশংসার লোভে খাটো না করি। তোমাকে দেবতা বলে প্রকাশ করবার ভণ্ডামি যেন কোনোদিন আমার মাঝে না আসে। আমি নিজে যতটুকু, ঠিক ততটুকুই যেন প্রকাশ করি। যুগে-যুগে পশু-আমার সৈনিক-আমার জয় হউক!!

I am a soldier

At present we need the services of a soldier who can be both a soldier and a caregiver.

Women take the role of caregivers, but it can be taken up by those men who, like women, have a lot of empathy. Women's love is different from that of men. Women's love is imbibed in tenderness and tears. Men's love is manifest in hurt and rebellion.

The one who serves the country with the empathy of a woman is equivalent to a great human being. However, the country does not need great human beings right now, it needs men who are able to rebel and retaliate. He will not only shed tears for his country, he will inflict hurt, accept the consequences and will also rebel. Those who condemn the animalism in inflicting wounds maybe seen similar to women, that part is his greatness. Those who will be men and be patriotic soldiers will have to tolerate this branding by others. Those who like to hug others and provide selfless love should not become soldiers. They can serve the nation by taking on the responsibilities of the poor of the country. For example, they can help the flood affected people of north Bengal. *Mr. Prafulla Chandra* has assumed this role and is distributing food and clothes among the distressed people of Bengal. This image is of the all-forgiving deity, the provider but not of rebellion or destruction.

Thousands of sons of the soil have lunged forward to help the poverty stricken people of the country. These are feminine roles, roles of the deities too. We worship them but they cannot lead us to independence.

Tagore, Arabindo, Prafullo are the deities of Bengal, our hearts always go out to them. But where is the commander in chief? Where is the soldier? Where is the one who can hit back and lead to destruction? *Swami Vivekanda* emerges in that role. He roars out loud as a commander in chief.

This golden Bengal is the most coveted region of India. Why did the fiery river in its heart stop beating, smothered under some volcano? Which lazy melody of the flute played by the deity is hushed up the exuberant fiery waves? Where is *Pavan*, who gave birth to *Vishwma*? Stir up the almost dying yet fiery rivers, let there be gleeful dances of a million snakes in every wave! Oh deity of empathy, love and king of the flute, you are from the free independent world, you are not the sons of a lazy India! Do not sing lullabies to this lazy nation and lull it further. Your soft renderings are making them worse, they are becoming drowsy, please stop this tune. Strike them, make them jealous, bring war, awaken them, do not sadden the already tearful nation. We are waiting for the commander in chief whose command will bring us under the same umbrella and just like thousands of moths attracted to a flame, we shall converge and enroll. Oh dear chief soldier, I have not seen you, but I have heard your command. I have accepted the role of the war herald and played the drums of war. It is your command, I can never disobey it. Oh unseen imminent force! Sound the trumpets of war through my voice. Let your war boat roar out in anguish through my trembling voice. Let me be able to digest all kinds of vagaries at home and elsewhere and steadily play the war drums without interruption.

Oh my unseen rebel, supply me with the strength, so that on the day that you arrive we can carry the swords given by you and assemble under the same flag in the guise of blood–laden soldiers. Let us not be deprived of the acknowledgement in your eyes when we submit our swords colored with the blood from our hearts. When the arrows of the enemy pierce my heart and bring me the victorious death and my bloodless body lies on the ground, you should say, `Dear follower, you have completed your duty.' I feel that I don't have the strength to be the drum player of this group, but neither can I quit. Your unexpressed strength doesn't allow me to quit or retreat. It continues to push me forward and march. My lord, whatever inadequacy I have is pardonable in your eyes, but tantamount to crime in the eyes of others. In this rebellion whatever pride there is let that be only

mine, all I want you to say through my voice is that 'This rebellion is mine!'

Give me the strength so that I can bear the ill repute caused by this pride. Dear Lord, when you emerged through me as a rebel, I failed to understand that all the sticks in this journey were mine, while all the carrots were yours alone. I am now beckoning you to call me under the flag of war, summon me to death. Please give this responsibility to some other soldier.

You did not let me join the group of caregiver. You said, `You are not here to remove the tears of the distressed, your job is to play the drums. I am of destruction, not of love. I am the rebel, not the tender one. I am not for caring, I am for war. I am not a caregiver, I am a soldier. I am not for worship, I am to be detested. I am to be ignored, insulted. I am not a deity, I am a ferocious wild beast. I am not beautiful, I am ugly. I cannot exhibit tender love, I only impart hurt. I don't bring welfare, I bring death. I am not amusing, I am a curse.'

You are a bitter force inside me, a burning sensation, poisonous fire. Oh my soldier's soul of time immemorial! Let me not belittle you with the temptation of praises. Let me never have the false vanity of declaring you a deity. Let me be exactly what I am. Hail the beast, the soldier in me!

Translated by Nashid Kamal

আয়নার ফ্রেম

আয়না : আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত গল্পগ্রন্থ

এমনি আয়নায় শুধু মানুষের বাইরের প্রতিচ্ছবিই দেখা যায় কিন্তু আমার বন্ধু শিল্পী আবুল মনসুর যে আয়না তৈরি করেছেন, তাতে মানুষের অন্তরের রূপ ধরা পড়েছে। যে-সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোশ পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপমূর্তি—বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখোশপরা এই বহুরূপী বনমানুষগুলোর সবাইকে মন্দিরে, মসজিদে, বক্তৃতার মঞ্চে, পলেটিক্সের আখড়ায়, সাহিত্য-সমাজে যেন বহুবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রচনার যা কদর আছে, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সাহিত্যে তা নেই। ইংরেজি সাহিত্যে জেরোম ও বার্নার্ড শ-র সুউচ্চ আসনই ইংরেজি পাঠক-সাধারণের রসগ্রাহিতার প্রমাণ দিচ্ছে। শুধু ইংরেজি সাহিত্য নয়, সমৃদ্ধিশালী সমস্ত সাহিত্যেই ব্যঙ্গ-সৃষ্টি অভিনন্দিত হয়েছে। ইউরোপীয় সমস্ত সাহিত্যই 'ল্যামপুন' ও 'স্যাটায়ার'-এ সমৃদ্ধিশালী এবং তার স্রষ্টারা বিশেষ সম্মানের অধিকারী।

বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ-সাহিত্য খুব উন্নত হয়নি, তার কারণ, ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। এ যেন সেতারের কান মলে সুর বের করা—সুরও বেরুবে, তারও ছিঁড়বে না। আমি একবার এক ওস্তাদকে লাঠি দিয়ে সরোদ বাজাতে দেখেছিলাম। সেদিন সেই ওস্তাদের হাত সাফাই দেখে তাজ্জব হয়েছিলুম। আর আজ বন্ধু আবুল মনসুরের হাত সাফাই দেখে বিস্মিত হলুম। ভাষার কান মলে রস সৃষ্টির ক্ষমতা আবুল মনসুরের অসাধারণ। এ যেন পাকা ওস্তাদী হাত।

আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন হয় সে ব্যাঙ। কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন হয় সে সাপ ; আর সে কামড় গিয়ে যার গায়ে বাজে তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মতোই করুণ।

কিন্তু সে হাসির পিছনে যে অশ্রু আছে, সে কামড়ের পিছনে যে দরদ আছে, তা যাঁরা ধরতে পারবেন, আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের সত্যিকার রসোপলব্ধি করতে পারবেন তারাই। বন্ধুবরের এই রসাঘাত কশাঘাতেরই মতো তীব্র ও ঝাঁঝালো। কাজেই এ রসাঘাতের উদ্দেশ্য সফল হবে, এটা নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে।

বন্ধুর আয়নার এই-ই আমার ফ্রেম।

Frame of a Mirror

Mirror: A Collection of Stories by Abul Mansur Ahmed

Ordinary mirrors only reflect a person's outward appearance, but the mirror my friend, artist Abul Mansur, has crafted captures the inner form of people. Those individuals who wander freely in our society wearing various masks—their true selves, with a wild ferocity—have emerged within Abul Mansur's mirror. It feels as though I've seen these masked, polymorphic wild men many times in temples, mosques, on lecture stages, in political arenas, and within literary societies.

Unfortunately, the value placed on satirical writing in our literature is not what it is in other languages. The high positions of Jerome and Bernard Shaw in English literature prove the discerning taste of the English reading public. Not just English literature, but all prosperous literatures have celebrated satirical creations. All European literature is rich in 'lampoon' and 'satire', and their creators are held in special esteem.

Satirical literature has not developed significantly in the Bengali language, and the reason for this is that creating satire requires extraordinary talent. It's like twisting the ear of a sitar to bring out a melody—the tune will emerge, and the string won't break. I once saw a master playing the *sarod* with a stick. That day, I was astonished by the skill of that master's hand. And today, I am amazed at the skill of my friend Abul Mansur's hand. Abul Mansur possesses an extraordinary ability to twist the ear of language and create humor. This is like the hand of a seasoned master.

A unique characteristic of Abul Mansur's satire is that when it makes you laugh, it becomes a frog (playful, harmless). But when it bites, it becomes a snake; and the expression on the face of the person struck by that bite becomes as pitiable as the face of the frog in the snake's mouth.

However, only those who can grasp the tears behind that laughter, the compassion behind that bite, will truly appreciate Abul Mansur's satire. My dear friend's witty attack is as sharp and biting as a lash. Therefore, it can certainly be hoped that the purpose of this witty attack will be successful. This is my frame for my friend's mirror.

Translated by Alamgir Mohammad

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

—রবীন্দ্রনাথ

আজ আমাদের এই নূতন করিয়া মহাজাগরণের দিনে সেই শক্তিকে ভুলিলে চলিবে না—যাহাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করিতেছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সে হইতেছে, আমাদের দেশের তথাকথিত 'ছোটলোক' সম্প্রদায়। আমাদের আভিজাত্য-গর্বিত সম্প্রদায়ই এই হতভাগাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনো যন্ত্র দিয়া এই দুই শ্রেণীর লোকের অন্তর যদি দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ তথাকথিত 'ছোটলোক'-এর অন্তর কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং ঐ আভিজাত্যগর্বিত তোমাদের 'ভদ্রলোকের' অন্তর মসীময় অন্ধকার। এই 'ছোটলোক' এমন স্বচ্ছ অন্তর, এমন সরল মুক্ত উদার প্রাণ লইয়াও যে কোনো কার্য করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার। সে বেচারা জন্ম হইতে এই ঘৃণা, উপেক্ষা পাইয়া নিজেকে এত ছোট মনে করে, সঙ্কোচ জড়তা তাহার স্বভাবের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায় যে, সেও যে আমাদেরই মতো মানুষ—সেও যে সেই এক আল্লাহ্-এর সৃষ্টি, তাহারও যে মানুষ হইবার সমান অধিকার আছে,—তাহা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। যদি কেউ এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে, অমনি আমাদের ভদ্র সম্প্রদায় তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। এই হতভাগাদিগকে—আমাদের এই সত্যিকার মানুষদিগকে আমরা এই রকম অবহেলা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অধঃপতন। তাই আমাদের দেশে জনশক্তি বা গণতন্ত্র গঠিত হইতে পারিতেছে না। হইবে কিরূপে? দেশের অধিবাসী লইয়াই তো দেশ এবং ব্যক্তির সমষ্টিই তো জাতি। আর সে-দেশকে, সে-জাতিকে যদি দেশের, জাতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা একই কথা। তোমাদের এই আভিজাত্য-গর্বিত, ভণ্ড, মিথ্যুক ভদ্র সম্প্রদায় দ্বারা—(যাহাদের অধিকাংশেরই দেশের জাতির প্রতি সত্যিকার ভালবাসা নাই) মনে করো কি দেশ-উদ্ধার হইবে, জাতি গঠন হইবে? তোমরা ভদ্র সম্প্রদায়, মানি, দেশের দুর্দশা, জাতির দুর্গতি বুঝো, লোককে বুঝাইতে পারো এবং ঐ দুর্ভাগ্যের

কথা কহিয়া কাঁদাইতে পার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কার্য করিবার শক্তি তোমাদের আছে কি? না, নাই। এ-কথা যে নিরেট সত্য, তাহা তোমরাই বুঝো। কাজেই তোমাদের এই দেশকে, জাতিকে উন্নত করিবার আশা ঐ কথাতেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যদি একবার আমাদের এই জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পার, তাহাদিগকেও মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগের শক্তির উন্মেষ করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ করিতে পারিতেছ না, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে। একথা হয়তো তোমার বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু এই সেদিনকার সত্যাগ্রহ, হরতালের কথা মনে করো দেখি, —একবার মহাত্মা গান্ধীর কথা ভাবিয়া দেখো দেখি! তিনি আজ ভারতের কি অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন!

তিনি যদি এমনি করিয়া প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত না মিশিতেন, ইহাদের সুখ-দুঃখের এমন করিয়া ভাগী না হইতেন, ইহাদিগকে যদি নিজের বুকের রক্ত দিয়া, তাহারা খাইতে পাইল না বলিয়া নিজেও তাহাদের সঙ্গে উপবাস করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত আপনার করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে কে মানিত? কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত? কে তাঁহার একটি ইঙ্গিতে এমন করিয়া বুক বাড়াইয়া মরিতে পারিত? তাঁহার আভিজাত্য-গৌরব নাই, পদ-গৌরবের অহঙ্কার নাই, অনায়াসে প্রাণের মুক্ত উদারতা লইয়া তোমাদের ঘৃণ্য এই 'ছোটলোক'কে বক্ষে ধরিয়া ভাই বলিয়া ডাকিয়াছেন—সে-আহ্বানে জাতিভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই, সমাজ-ভেদ নাই,—সে যে ডাকার মতো ডাক,—তাই নিখিল ভারতবাসী, এই উপেক্ষিত হতভাগারা তাহার দিকে এত হা হা করিয়া ব্যগ্রবাহু মেলিয়া ছুটিয়াছে। হায়, তাহাদের যে আর কেহ কখনো এমন করিয়া এত বুকভরা স্নেহ দিয়া আহ্বান করেন নাই! এ মহা-আহ্বানে কি তাহারা সাড়া না দিয়া পারে? যদি পার, এমনি করিয়া ডাক, এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন কর—দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার, তোমার কি অধিকার আছে? ইহা তো আত্মার ধর্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, আর একই মহা-আত্মার অংশ। তোমার জন্মগত অধিকারটাই কি এত বড়? তুমি যদি এই চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার মতো ভদ্রলোকদের দেওয়া এই সব হতাদর উপেক্ষার আঘাত, বেদনার নির্মমতা একবার কল্পনা করিয়া দেখো দেখি,—ভাবিতে তোমার আত্মা কি শিহরিয়া উঠিবে না?

আমরা ভারতবাসীরাই শুধু আত্মার এত অবমাননা করিতে সাহস করি, আর তাই আমাদের এই শোচনীয় অধঃপতন,—তাই বিশ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার

আমাদের স্থান নাই। এই আত্মার অপমানে যে সেই অনাদি অনন্ত মহা-আত্মারই অপমান করা হয়। ভয়ে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে না কি? খোদার সৃষ্টি—তাহার আনন্দের বিকাশস্বরূপ এই মানুষকে ঘৃণা করিবার অধিকার তোমায় কে দিয়াছে? তোমাকেই বা বড় হইবার অধিকার কে দিয়াছে, তুমি কিসের জন্য ভদ্র বলিয়া মনে কর? এ-সব যে তোমারই নিজের সৃষ্টি,—খোদার উপর খোদকারি। এ মহা-অপরাধের মহাশাস্তি হইতে তোমার রক্ষা নাই,—রক্ষা নাই। মানুষের প্রতি এই যে হিংসা, দ্বেষ, তোমার দেশের, গাঁয়ের প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি এই যে অকারণ ঘৃণা, আক্রোশ, ইহাই তোমার মুখের বর্ণ কালো করিয়া দিয়াছে—তোমার চেহারায় কালি ছড়াইয়া দিয়াছে। মরিতে তো বসিয়াছ,—যদি এখনও এই মৃত হতভাগ্যদের হাত ধরিয়া না উঠিয়া একা উঠিতে যাও, তবে আরো মার খাইয়া মরিবে। কিসের পতিত ইহারা? ইহাদের প্রাণ যত উন্মুক্ত—ইহাদের অন্তর যেমন সরল,—তুমি কি সে রকম হইতে পারো? হইতে পারে অশিক্ষিত সে, কিন্তু ইহার প্রাণ তোমার চেয়ে অনেক বড়, সে প্রাণে বিরাট বিপুল শক্তি-সিংহ সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে—যদি পারো সেই শক্তিকে জাগাও।

আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মতো দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চ শিরে ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে। এস, আমাদের উপেক্ষিত ভাইদের হাত ধরিয়া আজ ভারত-বেদীর সামনে দাঁড়াইয়া বোধন-বাঁশিতে সুর দিই—

'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!'

Awakening the Power Denied

"O my unfortunate land! those that you have humiliated,
you have to equal them in your own humiliation."

Rabindranath Tagore

On this day of our great awakening we must not forget a power source upon which much of our power lies, yet which we have constantly denied. This is the so-called "low class" community. It's our arrogant aristocracy which has given such a label to an unfortunate lot. But if you can find an instrument with which to look into the hearts of these two classes, then you would see that the heart of the so-called "low class" is clear as a mirror and that the heart of the aristocratic "gentleman" (or "upper class") is very dark indeed. That this "low class" with such clear hearts, as well as simple and open minds can't do any work is due to the tyranny of the "gentleman" community. This poor "low class" fellow who's been subjected to such contempt and disregard ever since he (or she) was born-consequently thinking so little of himself, internalizing such a sense of hesitancy and inertness—that he totally forgets that he too is a human being like any of us, that he too is a creature of the same God, that he too has equal rights to his human destiny. If anyone ever rebels against this oppression, immediately the "gentleman" community casts a tremendous blow on his head, making him unconscious. It's our disregard for this unfortunate lot—this true humanity—that has led to such a downfall for us. That's the reason why public-power or democracy is not developing in our country. How can it? It's the inhabitants of a country which make up the country and it's the total number of individuals which

makes up the people. If this is not understood by all people, then to hope for any improvements in such a country is the equivalent of trying to construct a building in midair. Do you ever expect to free your country or form a nation with this arrogant,

hypocrite and liar "gentleman" community (most of whom have no real love for the country and people)? The "gentleman" community—I admit that you are aware of the country's miserable condition and suffering of its people, that you can make people understand all that enough to the point of shedding tears. But do you have the power to do anything about it? No-you don't. That's the truth-and you know it. Consequently all your hopes of improving this country and its people end right there. But if you could just for once awaken the power of people, with an open heart greet them in your arms as fellow human beings, as friends, arousing in them their inherent power-then you would see that you have succeeded in accomplishing in one day what you have not succeeded in accomplishing-despite your desperate efforts-in over a hundred years. You may not believe this, but remember Gandhiji's satya-graha (truth-force), his boycotts. What unattainables he succeeded in attaining!

If he didn't mingle among them with an open heart, didn't share their joys and sorrows, didn't, in exchange of his own blood and hunger strikes-because they were hungry-take them intimately as his own, then who would bother to listen to him? Who would bother to lend him their ears? Who would be willing to face the bullet by his mere suggestion? He showed no arrogance of aristocracy or position. Freely and open- heartedly he sent out a call embracing as his own family this "low class" which you disdain. In that call there were no distinctions of castes or religions or social strata. It was a call as a call should be. That is why the entire people of India— this ignored and unfortunate lot-run to him with eager arms.

Alas, never before did anyone call them with such heartfelt affection. Could they ever not respond to such a great call? If you can, call them like that. Bring to realization the power that is denied-you'll see how they change time, attain the unattainable. What right do you have to ignore them, to treat your fellow human beings with contempt? This is not the religion of the Soul. Their souls are just as luminous as yours, a part of the same great Soul. Is your birth-right that which is oming end of rigonads most important? Had you been born in a low caste-just imagine the

pain and cruelty of being ignored by the "gentleman" community like yours! Doesn't that shudder your soul?

It's only us, the Indians, who dare to humiliate the Soul as we do and that's why our pathetic downfall. That's why we have no place in the world to stand with pride, with our heads raised high. This humiliation of the soul is to humiliate the eternal, great Soul. Doesn't the fear of doing that shudder your body? God's joyous creation is the human being-who has given you the right to despise him? Who has given you the right to greatness, what makes you consider yourself as "gentle" (or "superior")? It's all your own fabrication-playing god over God. There's no escape from the punishment for this great sin- no escape at all! Your face is darkened by your hatred, contempt, disdain for fellow human beings. You are dying, but if you still don't reach out for the unfortunate lot-who are dying too-and try instead to get yourself up, then you'll end up getting only more beaten. Why are they outcastes? Can you be as open and simple hearted as they? They may be uneducated, but they have a heart much bigger than yours-and in that heart lies dormant an enormous power. If u can-awaken that power!

Come forward to embrace these outcasted, low-caste, low class friends as your own, dress humbly as them, connect with

them through your hearts, and stand up with pride on India's soil-you'll see, the world will bow before you in respect. Come, holding hands with our ignored brothers and sisters, standing before the altar of India, let's play the flute of realization to the tune of—

"What sorrow? What poverty?

What shame? What pain?"*

*From a Bengali patriotic song by D. L. Roy, an elder contemporary of Nazrul. This section of the song reads as follows: "What sorrow, what poverty,/what shame, what pain?/ We'll dispel all your gloom, Mother,/we are human beings, not sheep!"

Translated by Sajed Kamal

তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা

গত ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' সুলেখক হেমেন্দ্র বাবুর 'সঞ্চয়ে' 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে বোধ হয় অনেকেই ক্ষুণ্ন হয়েছেন। ততোধিক মর্মাহত হয়েছেন বোধ হয় আমাদের নতুন কবি ভায়ারা। লেখাটা যে তাঁদের নাকের ডগায় মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো আবির্ভূত হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করে গেছে ! সেই 'মান্ধাতার আমলের পুরানো' এক মহাকবি-প্রসিদ্ধিতে এমন একটা প্রচণ্ড লাঠ্যাঘাত, কি সাংঘাতিক কথা!

তবে ও সম্বন্ধে এ গরিবের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

প্রথমত 'New York Herald' নামক আমেরিকান সংবাদপত্রের অচিন লেখকের তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিয়েই আমার ভয়ানক একটা খট্‌কা বেঁধে গেছে। আজকাল অনেক লেখক ঘরে বসেই দুনিয়ার যে-কোনো স্থানের ভ্রমণ-কাহিনী অসঙ্কোচে লিখে থাকেন; এ একটি নিষ্করুণ সত্যি কথা। তাঁরা হয় বিখ্যাত ভ্রমণকারীর কাছে থেকে শুনে নতুবা কোনো ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়ে এবং তাতে কিছু ঘরের তেল-মসলা সংযোগ করে আমাদের সামনে এনে হাজির করেন এবং আমরাও 'কৃতার্থ' হয়ে যাই। আমিও ঐ লেখা পড়েছি, তাতে তিনি যে তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। হতে পারে তিনি কিছুদিন বা খুব বেশিদিন সেখানে ছিলেন, কিন্তু তিনি—আমার যতদূর সম্ভব সাদা চোখে কিছুই দেখেননি। 'সাহেব' তুর্কদের সম্বন্ধে অন্যান্য যে-সব বাজে বকেছেন, সে-সম্বন্ধে কিছু না বলে আমি কেবল তুর্ক মহিলার সৌন্দর্য সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলে এই নীরস গদ্যের অবসান করব।

পাশ্চাত্য প্রদেশে যে পৌরাণিক প্রবাদের মতো তুর্ক তরুণীর বিশ্ব-বিমোহিনী সৌন্দর্যের গুণ-কীর্তন হয়ে আসছে, আর শুধু পাশ্চাত্য প্রদেশ কেন, জগতের সমস্ত দেশের নূতন-পুরাতন সকল কবি ও লেখকই যে 'পঞ্চমুখে' তুর্ক রমণীর ভুবনে-অতুল সুষমার বর্ণনা করে যাচ্ছেন, সব কি তাহলে বিলকুল মিথ্যা ? তবে কি তাঁরা কোনো কিছু না দেখে-শুনেই চক্ষু বুঁজে, শুধু কল্পনার নেশায় মনের চোখে বেচারি তুর্ক-তরুণীদের মূর্তি এঁকে তা'দিগকে একেবারে হুর-পরীর সঙ্গে সমান আসন দিয়েছেন ? এমন অনেক জগদ্বিখ্যাত কবি ও লেখক তুর্ক মহিলার রূপ বর্ণনা করতে করতে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন, যাঁরা দস্তুরমতো তুর্ক দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁরা যে নেহাৎ কবিত্বপূর্ণ মোলায়েম ধরনে চক্ষু বুঁজে বেড়িয়ে বেড়াননি, এ বোধ হয় বিশ্বাস করা

যেতে পারে। তাছাড়া তুর্কদের দেশ পাশ্চাত্য দেশেরই অন্তর্গত, আর তা নেহায়েত দূরও নয়, অথচ বাবা আদমের কাল হতে আজ পর্যন্ত তুর্ক রমণীদের মুখচন্দ্র কেউ দেখেননি ? এবং খামাখা ঘরের খেয়ে বেচারিদের রূপ বর্ণনায় মুখে ফেনা উঠিয়েছেন ? আর ঐ আমেরিকান লেখক মহাশয় একজন 'হাম্বা চোম্বা' অবতারের মতো সটান তুর্কস্থানে অবতীর্ণ হয়ে সারা দুনিয়ার চোখের উপরকার একটা মস্ত পর্দা ফাঁক করে ধরলেন ? লেখকের 'কেরদানি'কে বাহাদুরি দিতে হয় কিন্তু! আর হেমেন্দ্র বাবুও সানাইয়ের পোঁ ধরার মতো তাঁর দগ্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছেন যে হুরপরী দেখা আর তাঁর ভাগ্যে ঘটলো না। তাই দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর মতো গানে-গল্পে-কবিতায় প্রসিদ্ধা হুরপরী নামে আখ্যাতা তুর্ক রমণীর রূপ-মাধুর্য শুনেই কোনো রকমে নিজের 'আকুল পিয়াসা' দমন করে রেখেছিলেন,—এমন সময় 'দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠের' মতো সশরীরে আমেরিকান লেখক মশায় মৃত্তিকা ভেদ করে উঠে একেবারে 'চিচিং ফাঁক' করে দিলেন বা মাঝ মাঠে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন। আসল তুর্ক রমণীরা (দো-আঁসলা নয় অবশ্য !) বাস্তবিকই হুরপরীর চেয়েও সুন্দরী। ও বিষয়ে আমার মতো অধমাধমের অদৃষ্ট দগ্ধ না হয়ে খুব স্নিগ্ধই বলতে হবে, কারণ আমি আমার এই চর্মচক্ষে বাস্তব-জগতে যে কয়জন তুর্ক রমণীকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তার অন্তত একজন এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টকে বাংলার স্টেজে হাজির করতে পারলে অনেকেরই 'মূর্ছা ও পতন' হতো এবং মাথা খারাপ হয়ে যেত, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। দুনিয়ার সকল জাতির রমণীই (বিশেষত যাঁরা সৌন্দর্যের জন্য বিশ্ব-বিশ্রুত, উদাহরণস্বরূপ—পার্শি, ইরানি, ইহুদি, আরবি প্রভৃতি) দু-দশজন করে আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে দেখবার সুযোগ পেয়েছি এবং তা স্বপ্নে নয়, দিবালোকে, কল্পনায় নয় বহাল খোশ-তবিয়তে, আর প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত করে। কিন্তু কই তুর্ক মহিলার মতো এমন ভুবন ভুলানো রূপ, অতুলনীয় সৌন্দর্য তো আর পোড়া চোখে পড়লো না। তবে হতে পারে, হয়তো ঐ তরুণীদের রূপাগ্নি আমার চোখ ঝলসে দিয়েছে, তাই আর দুনিয়ার কোথাও সুন্দরী দেখতে পাই না।

হেমেন্দ্র বাবু পরের মুখে ঝাল খেয়ে একেবারে লম্ফঝম্প দিয়ে বলে ফেলেছেন, 'তুর্ক রমণীরা মোটেই সুন্দরী নয়।' কেননা একজন সাহেব বলেছেন যখন, তখন তা বেদবাক্য। একটু রসিকতার লোভে তাঁর মতো লোকের পক্ষে একজন খামখেয়ালি লেখকের ছেঁদো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না। সাহেবের সুরারাগরঞ্জিত নয়নে ওঁদেরই স্বজাতির মতো 'ওল ছিলা' চেহারা হলেই বোধ হয় বেশ সুন্দরীটি হতো। তবে এর সর্বশেষ প্রমাণ পেতে হলে আমাদের দুইজনকেই আবার 'আস্তানা' পর্যন্ত ছুটতে হয়, সেও তো এক সাংঘাতিক ব্যাপার। হেমেন্দ্র বাবু ইচ্ছা করলে অন্তত শিরাজী সাহেবের কাছেও এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানতে পারতেন।

পিকিং হতে আমদানি বেঢপ মুখ, হাবশির দেশ হতে রপ্তানি বিটকেল কুচকুচে মুখ, 'লিভান্টিয়ান,' 'সার্কোসিয়ান' বা 'স্কান্ডিনেভিয়ান' দেশের চ্যাপ্টা বেখাপ্পা মুখ ইত্যাদি যে সব পাঁচমিশেলি মুখ সাহেব-পুঙ্গব তুর্কিদের মাঝে দেখেছেন, তাই নিয়ে যদি তুর্ক তরুণীর সুষমা সম্বন্ধে ঐ রকম বীভৎস মত পোষণ করেন, তাহলে আমাদের বলবার কিছুই নাই। তাহলে সাহেবেরই জয় ! তাছাড়া লেখক জানেন এবং স্বীকারও করেছেন, 'তুর্কিরা নানা দেশ হতে নানা জাতের বন্দিনী জোগাড় করে আনত, আর তাদেরই সঙ্গে অবাধ রক্ত-মিশ্রণের ফলে এই অসংখ্য ও বিচিত্র মুখাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে।' অতএব সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে শুধু এই গজঘণ্ট, রঙ-বেরঙের মুখ আদৌ তুর্কির নয়, ওসব হচ্ছে বাঁদীদের মিশ্র মুখ। ঐ সব পাঁচমিশেলি মুখই বোধ হয় ঘোমটা খুলে বাইরে বেরিয়ে সাহেবের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে।

তুর্কিরা আধুনিক পাশ্চাত্য কায়দা-কানুনে কেতাদুরস্ত হলেও তাদের মেয়েরা পথে ঘোমটা খুলে বেরোয়নি, আর বেরুলেও এমন সাধারণ জায়গায় বেরোয়নি, যাতে তাদের ঐ স্বর্গীয় সুষমা-মাধুরী সাহেবের বিড়াল-নয়ন সার্থক করে দিয়েছিল। সম্ভ্রান্ত আসল তুর্কি মহিলারা হাজার শিক্ষিতা হলেও এখনও রীতিমতো বোরকা দিয়ে পথে বের হন। কাজেই অন্যান্য দেশের মতো 'ঘোমটার আড়ালে খেমটার নাচ' দেখা লেখকের আর পোড়া কপালে জোটেনি।

এইসব খামখেয়ালি লেখকের কাণ্ড দেখে আমি নির্ভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, সেই-সাহেব যদি বাংলায় আসেন, তাহলে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার নমুনা স্বরূপ আমাদের কুললক্ষ্মীদের রূপ বর্ণনা নিম্নলিখিতরূপে করবেন—

'বাঙালি মেয়েগুলো বিশ্রী কালো, তদুপরি তৈলচিক্কণ হওয়ায় বোধ হয় যেন আবলুস কাঠে ফ্রেঞ্চ পালিস বুলানো হয়েছে। এই জাতীয় স্ত্রীলোক পাড়াগাঁয়ে থাকে। (বাগদিদের মেয়ে দেখে সাহেব আমাদের বনফুলের মতো সুন্দরী কুলবধূদের সম্বন্ধে এই রকম সাংঘাতিক ধারণায় উপনীত হবেন।) তারপর শহুরে তাবৎ স্ত্রীলোকই খুব বেশি রকমের স্থূলাঙ্গিনী, দেহের অনুপাতে উদর ঢক্কা-সম ভীষণ প্রশস্ত, পরিধানে কম-সে-কম দুই তিন থান কাপড়, অঙ্গে খুব ভারি ভারি অলংকার, মুখটি চন্দ্রের মতো নয়ই—তবে অনেকটা মালসার মতো।' (মাড়োয়ারি মেয়েদের দেখে এ-কথাই লিখবে সাহেব, কারণ তারাই বেশির ভাগ বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় ধুলো উড়োতে উড়োতে কাঁইয়ো মাইয়ো করে যায়। সাহেবের এ বর্ণনা ডাহা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, আর তাই পড়ে আমাদের সুন্দরী তরুণীরা হাত-পা কামড়িয়ে মরবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যদি কখনও আমার নসিবে হুরপরী দেখা থাকে তবে তারা কখনও তুর্কি যুবতীর চেয়ে সুন্দরী হবেন না, এ-বিষয়ে আমি স্থির-

সিদ্ধান্ত হয়ে বসে আছি। এমন ডাঁশা আঙুর আর পাকা ডালিমের মতো মিশানো লাবণ্য, আর আয়নার মতো স্বচ্ছ তরল সৌন্দর্য বোধ হয় বেহেস্তেও দুষ্প্রাপ্য। রমণী বিশ্বে সৌন্দর্যের সার যে কত বেশি সুন্দরী হতে পারে, তা তুর্কি তরুণী না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আমিও আমার সোনার বীণার তারে ঘা দিয়ে আকুল কণ্ঠে গেয়ে উঠতাম—

'আগার ফেরদৌস্ বর রুয়ে জামিন আস্ত।
হামিনাস্ত-ও হামিনাস্ত-ও হামিনাস্ত ॥

Removing the veil from the faces of Turkish women

I think that many people have been enraged after reading the article on `Removing the veil from the faces of Turkish women' written by *Hemendra Babu*, published in the magazine titled `*Bharatborhso*'. Specifically, the new poets have been really hurt because the write up appeared to be a spoilsport right in front of their eyes and created great turmoil. It is like a thunderbolt striking the age old traditions with great fervor.

But, even if it seems insignificant, this humble being has something to say about the article.

Firstly, I have a hesitation about the unknown writer from New York Herald and his experience with the Turks. Nowadays, we find many people being non-chalant about writing travel stories from inside his own hearth. They have either heard something from famous travellers or have read some travelogue and added their personal accessorize and presented in front of us and we became so enthralled. I have read that article and I didn't feel that he had any experience with the Turks. It is possible that he stayed there for a few days, but am sure he did not have the ability to internalize their ways. In the article he has given some descriptions of Turkish men, but I shall just write a few words about the beauty of Turkish women and end this uninteresting prose.

Is it true that western people (and why only western?) who are praising Turkish women in superlatives and comparing them with the beauty of the angels from heaven, have lost their sanity? Is it possible that without even witnessing anything, they have just extrapolated their imagination and have given descriptions of the exquisite beauty of Turkish women? Many poets of international repute, who have actually visited Turkey in details, have written volumes in praise of the beauty of Turkish women.

At least we can conclude that they have not been mesmerized by unrealistic dreams and have actually written from their experience and we can trust our instincts and believe that. For the western world, Turkey is a part of their geographical territory and in any case, it is not too far, so is it possible that no one has ever witnessed the faces of Turkish women, before embarking to write about them? They would not be wasting their time, unnecessarily writing about imaginative beauty! So here comes this huge American, almost like a deity, and he removes the veil from the eyes of the people of the entire world. I must give credit to his creativity! To follow the tune of the American pied piper, Mr Hemendra has also expressed his ill fate at not being able to witness the angels from heaven! He thus had to pacify his burning desire by listening to odes to their beauty that were expressed through the songs, poems and stories and thereby, contain his thirst. It was then that this American just arrived out of nowhere and revealed this mysterious matter and the truth came out! Actually Turkish women (not those of mixed origin) are definitely more beautiful than the angels of heaven. At least, I am not so ill -fated because I have had the pleasure of meeting some Turkish women in real life and I am sure that even if I present the `worst looking' amongst them, many people will swoon over their beauty! In totality, by the grace of my friends, I have personally had the pleasure of meeting many women from those origins (famed for their beauty) such as Persian, Iranian, Arabian and Jews. But, I have never met any women, other than Turkish women, who posses such all encompassing beauty! However, it is possible that the glare of their beauty has dazzled my eyes and I am no longer able to spot the beauty in other women!

Hemendra Babu indirectly quotes the American writer and expresses his final verdict that `Turkish women are not at all beautiful', just because a white

man has written this, it must be considered the gospel truth. He should have more sense than that to believe this fictitious comment from a white man! The sense of beauty in the eyes of the writer could perhaps pertain to calling their own (American) women beautiful alone! I have no proof of this statement, so we

both might need to visit the premises or at least visit Mr. Seraji who may enlighten us.

If this writer likes a Chinese face, or a dark or Livantian or Circosian or Scandinavian face and thus criticized the Turkish women, then I have nothing more to add. Let him score the point. The writer has admitted that ,` The Turks used to enslave women from various races and the result of that is obvious amongst their off springs, it offers so much variety! It is obvious that the writer has been disillusioned by the variety of faces inherited from slaves and thus his disgusting remarks have been born.

Although the Turks are modern and progressive, their women have not come out of the hijab. .Even if they have come out in some places, their actual spotless beauty was not spotted by the catty eyes of the writer. Turkish women, from elitist families, even though highly educated, continue to practice covering their faces. So, there can be no scope for the writer to see anything unless the veil was removed.

From this write up, I am pretty confident that if people with this kind of attitude visit beautiful women of Bangladesh, they will go back and write something like this about them.

`Bengali women are dark and look atrocious, moreover, their skins are sparkling and it seems that dark wood has been varnished with dark pitch. These kind of women live in the villages (he may say these about women from the ethnic minority called `*bagdi*' and make such remarks). The women of the city are all overweight, compared to their body, their behinds are disproportionately large, they wear at least three/ four layers of clothing, heavy jewelry, face is not at all like the moon, more like an earthen bowl! (He maybe writing this about women from Marowar, who are mostly seen cackling on the roads).No one will be able to vanquish these remarks made by the writer, and our beautiful women will just read it and spend their nights in anguish.

In conclusion I would like to say that if ever I have the good fortune of meeting an angel then I know she shall never be more beautiful than the Turkish women. Their lavish beauty can be

compared with ripe grapes and ripe pomegranate only, their skin is translucent, I think rare, even in heaven! In the entire female world, Turkish women are the proof of how beautiful women can be ,and if one has not seen a Turkish adolescent, they are yet to witness something. If I were a poet, I would hit the strings of my golden lute and sing out in desperate voice

`If heaven is to be on earth
It's here, it's here, it's here'.

Translated by Nashid Kamal

ধর্ম ও কর্ম

যে স্বধর্মে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশের কোনো অধিকার নাই। আজ যাঁরা দেশের কর্মী বলে খ্যাত, তাঁদের অনেকেই অনধিকারী বলেই ক্ষেত্রে লাঙলই চালিয়ে গেলেন, ফসল আর ফল্‌ল না। সামান্য যা ফসল ফল্‌ল, তাকে রক্ষা করার প্রহরী, সৈন্য পেলেন না। যিনি নিজে স্বাধীন হলেন না, তিনি দেশের, জাতির স্বাধীনতা আনবেন কেমন করে ? যাঁর নিজের লোভ গেল না, যিনি নিজে দিব্য সত্তা লাভ করেননি, তিনি কেমন করে লোভীকে তাড়াবেন, কোন্ শক্তিতে দৈত্য, অসুর, দানবকে সংহার করবেন ? ধর্মভাব মানে এ নয় যে শুধু নামাজ, রোজা, পূজা, উপাসনা নিয়েই থাকবেন। কর্মকে যে ধার্মিক অস্বীকার করলেন, কর্মকে সংসারকে যিনি মায়া বলে বিচার করলেন, কর্ম, সংসার ও মায়ার স্রষ্টার তিনি বিচার করলেন। যিনি একমেবা দ্বিতীয়ম্ যাঁর কোনো শরীক নাই, যিনি একমাত্র বিচারক, তাঁর সৃষ্টির বিচার করবে কে ? এই পলাতকের শাস্তি সঞ্চিত আছে। তবে মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতে হয়, একেবারে পগার পার হয়ে গেলে চলবে না। সমুদ্রের জল আকাশে পালিয়ে যায় বলেই বৃষ্টিধারা হয়ে ঝরে পড়ে।

নবনীরদ পাহাড়ে পালিয়ে যায় বলেই নদী-স্রোত হয়ে ফিরে আসে। এই উপরের দিকে উড়ে যাওয়া—অর্থাৎ আমাদের পরম প্রভুর ধ্যান করা মানে সময় নষ্ট করা নয়, আমাদেরই না-জানা পূর্ণতাকে স্বীকার করা ; আমারই ঘুমন্ত অফুরন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। নির্লোভ, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বাতীত হলে—লোভ, অহঙ্কার ও দ্বন্দ্বের মাঝে নেমে অবিচলিত শান্ত চিত্তে কর্ম করা যায়। প্রশংসা, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন তখন কর্মীকে ফানুসের মতো ফাঁপিয়ে তোলে না। নিন্দা, হিংসা, অপমান, পরাজয় তখন কর্মীকে নিরাশ করতে পারে না, তাঁর অটল, ধৈর্য ও বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। মন্দ-ভালো দুয়ের মধ্যেই ইনি পূর্ণ-অভয়চিত্তে বিচরণ করতে পারেন। তসবী অর্থাৎ জপমালা ও তরবারি দুই-ই তখন তাঁর সমান প্রিয় হয়ে ওঠে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের অতীত হয়েও ইনি ওই তিনগুণে নেমে বিপুল কর্ম করতে পারেন। এই সেনাপতি সাগরের মতো কখনো শান্ত, কখনো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। এঁরই আহবানে, এরই আকর্ষণে ছুটে আসে দেশ-দেশান্তর থেকে স্রোতস্বিনী দুর্নিবার অনিরুদ্ধপ্রবাহ নিয়ে।

ত্যাগ ও ভোগ—দুয়েরই প্রয়োজন আছে জীবনে। যে ভোগের স্বাদ পেল না, তার ত্যাগের সাধ জাগে না। ক্ষুধিত উপবাসী জনগণের মধ্যে এই সেনাপতি, অগ্রনায়ক আগে প্রবল ভোগের তৃষ্ণা জাগান। অবিশ্বাসী নিদ্রাতুর জনগণের বুকে রাজসিক শক্তি জাগিয়ে তাদের তামসিক জড়তা নৈরাশ্যকে দূর করেন। রাজসিক শক্তিকে একমাত্র সাত্ত্বিকী শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই ভগ্নতন্দ্রা বিপুল গণ-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন যে-অগ্রনায়কের কথা বলেছি—তিনি।

জনগণকে শুধু ঊর্ধ্বে কথা বললে চলবে না। তাদের বুকে ভালো খাবার, ভালো পরবার উদগ্র তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই জাগ্রত ক্ষুধিত সিংহ ও সুন্দরবনের বাঘের দল যাতে উৎপাত না করে, তার ভার নেবেন সেই মায়াবী অগ্র-নায়ক। যিনি এই ভীষণ শক্তিকে জাগাবেন, তাকে সংযত করার শক্তি যেন তাঁর থাকে। নইলে জগৎ আবার পশ্চিমের রাজসিক উন্মত্ততায় রক্ত-পঙ্কিল হয়ে উঠবে। নিজেরাই হানাহানি করে মরবে।

এদের ভোগের ক্ষুধাও জাগাতে হবে, ত্যাগের আনন্দ রসের তৃষ্ণাও জাগাতে হবে।

আমি একবার 'নিউমার্কেটে'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি, এক ভদ্রলোকের নগ্নবক্ষে যজ্ঞোপবীত, আর দুই হাতের এক হাতে একগোছা রজনীগন্ধা ও আর এক হাতে দুইটি রাম-পাখি—মুরগি। আমার অত্যন্ত আনন্দ হলো, তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম : 'ফেয়ার ও ফাউলের' এমন 'কম্বিনেশন'—সঙ্গতি আর দেখি নাই ! ভদ্রলোকও আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন : 'নিত্য আপনার হাতে ফুল, পাতে মুরগি পড়ুক।'

মুরগির সাথে রজনীগন্ধার তৃষ্ণাও থাকবে ?

বড় ত্যাগ তাঁর জন্য, যিনি সকলকে বড় করবেন। জনগণকে তাই বলে ধর্মের আশ্রয়চ্যুত করবার অধিকার কারুর নেই। এ অধিকারচ্যুত করতে চাইবেন যিনি, তিনি মানবের নিত্য কল্যাণের, শান্তির শত্রু। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ রাজসিক শক্তি দিতে পারে না। মানুষ পেট ভরে খেয়ে, গা-ভরা বস্ত্র পেয়ে সন্তুষ্ট হয় না, সে চায় প্রেম, আনন্দ, গান, ফুলের গন্ধ, চাঁদের জ্যোৎস্না। যদি শোকে সান্ত্বনা দিতে না পারেন, কলহ-বিদ্বেষ দূর করে সাম্য আনতে না পারেন, আত্মঘাতী লোভ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে না পারেন, তা হলে তিনি অগ্রনায়ক নন। ধর্ম ও কর্মের যোগসূত্রে যদি মানুষ না বাঁধা পড়ে, তাহলে মানুষকে এমনি চিরদিন কাঁদতে হবে।

Religion and Work

One who is not established in his own religion has no right to enter the work force. And many of those who claim to be patriots are actually unqualified and their efforts can only amount to some ploughing, no harvest is visible. There are no sentries to guard whatever little produce sees the light of the day. How do we expect independence from one who is not independent himself? How do we expect one to vanquish the greedy when his own greed still exists? He hasn't achieved that state of equilibrium, he cannot drive away the demons, nor kill them. Religion does not mean that you will just offer prayers, observe fasts, worship the gods. One who disregards his work and thinks that work is just another form of attachment, is actually judgemental. We know that God is only one, He is the only judge and there is no sharer, so how do you sit in judgement of His creations? For this coward there is punishment in store. Yes, we need to run away, but not forever. The water from the seas flies to the sky and hence we get the rains.

The new moon vanishes in the mountains and thus the river gets the currents. This ascension means spending time in the pursuit of God, not wasting time. It means to fulfill ourselves with whatever is hitherto unknown. I awaken the infinite strength in me. If I am not greedy, not proud and have no inner conflict, I should exist among the greedy, proud and hesitant and work in peace. At these points, praises, cries and applauds do not inflate the ego. Similarly, criticism, jealousy and insults do not deter the worker. His steely patience and faith remains unmoved. He can then exist in both evil and good. Both the swords and the rosary beads become his favorite. He is able to rise above darkness, grains of dust as well as spiritual essence but can contribute to the same. This general is sometimes quiet like the sea and sometimes fiery. Similar fiery troops start pouring in from different parts of the world at his beckoning.

There is a need for both sacrifice and enjoyment in life. One who has not enjoyed life will not feel sacrificial. The general must evoke the thirst for enjoyment amongst the famished and hungry people. Only the selfless can control this kind of kingly might. I am talking about the one who controls the huge population who are only half awake.

It is not enough to speak to them about progress. We have to evoke the thirst for good food and clothes in them. The leader should take responsibility so that these hungry lions and the tigers of the Sundarbans do not harm them. Let God give the restraint to the person who will arouse the great strength amongst others. Otherwise, we shall become a toy to the Western might and become muddy and bloody all over again. We shall die fighting amongst ourselves.

We have to do both, evoke the need for enjoyment as well as the joy of sacrifice.

Once I was near the New Market shopping centre, I saw a bare bodied man with the holy Hindu string around his neck, holding a bunch of tuberoses in one hand and two birds in the other, chickens to be exact. I have never seen such a combination of fair and fowl, I embraced him happily. He was overjoyed too and said, "Bless you, so that you have flowers in your hand and chickens for meals every day."

The thirst for both must be there.
We will make large sacrifices for those who will make others big. This doesn't mean that the people have to be deprived of their religion. One who wants to do that can be termed an enemy. The failure to provide basics cannot give everything. Once you are well fed and clothed, you want love, joy, music, the fragrance of flowers, the full moon. If the leader cannot offer consolation during vulnerable times, cannot bring amity to quarreling sections, cannot save the people from self devouring greed, then he is no leader. If people cannot tie the knot between work and religion,they will remain miserable forever.

Translated by Nashid Kamal

নবযুগের সাধনা

[১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে নব-পর্যায়ে প্রকাশিত 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্তিক মঙ্গলবারের 'নবযুগ'-এ 'নবযুগের সাধনা' শিরোনামে নজরুলের স্বাক্ষরিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২৫.৮.১৯৪৫ তারিখের কলকাতা গেজেটের বিজ্ঞপ্তি-অনুসারে তৎকালীন অখণ্ড বাংলার জনশিক্ষা বিভাগের মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক তৎপ্রাণীত 'মঞ্জুমালা' সমগ্র বঙ্গদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য-পুস্তকরূপে অনুমোদিত হয়। উক্ত পুস্তকের প্রথম লেখা হিসেবে ছাপা হয় নজরুলের 'যুগের সাধনা'—'নবযুগের সাধনা' নিবন্ধেরই 'ঈষৎ-পরিবর্তিত' পাঠ। নজরুলের 'নবযুগের সাধনা' ছিল কথ্য ভাষায় লেখা এবং দীর্ঘ; সেটিকে পাঠ্য-পুস্তকের চাহিদা-অনুসারে সাধু ভাষার ঈষৎ পরিবর্তিত ও সংক্ষেপিত করা হয়। মূল 'নবযুগের সাধনা' সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না বলে অগত্যা 'যুগের সাধনা' এখানে সংকলিত হলো—সম্পাদক]

যুগে যুগে আদর্শবাদীরাই জগতকে আনন্দে, শান্তিতে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা বৃহতের চিন্তা করেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করেন। ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকিলে জীবন, যৌবন ও কর্মের শক্তি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। পুকুরের জল গ্রামের কল্যাণ করে, কিন্তু সংক্রামক রোগের একটি জীবাণু পড়িলেই সে জল দূষিত ও অপেয় হইয়া যায়। কেননা, পুকুরের জলের চারিধারে বন্ধন ; তার বিস্তৃতি নাই, গতি নাই, প্রবাহ নাই। নদীর জলেরও চারিধারে বন্ধন, —এক ধারে পাহাড়, এক ধারে সমুদ্র, দুই ধারে কূল। কিন্তু তার বিস্তৃতি আছে, তাই গতি ও প্রবাহ নিত্যসাথী। এই প্রবাহের জন্যই নদীর জলে নিত্য শত রোগের বীজাণু পড়িলেও তাহা অশুদ্ধ হয় না, অব্যবহার্য হয় না। তাই নদী পুকুরের চেয়ে দেশের বৃহৎ কল্যাণ করে। নদীর নিত্য তৃষ্ণা সমুদ্রের দিকে, অসীমের দিকে। অসীম সমুদ্রকে পাইয়াও সীমাবদ্ধ দেশকে সে স্বীকার করে,—তার বক্ষচ্যুত হয় না। আমাদের আদর্শ পরম পূর্ণের ; পরম নিত্যের তৃষ্ণা হইলেও আমরা কর্মচ্যুত হইব না, বৃহৎ কর্ম করিব।

বৃহৎ কর্মের অধিকারী হইতে হইলে, দেশের মানুষের বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করিতে হইলে, বৃহৎ শক্তির আধার হইতে হয়। নিত্য পরম ক্ষমাময় আল্লাহ্‌র তৃষ্ণা থাকিলে এই বৃহৎ কর্মের অধিকারী হওয়া যায়। নদী সমুদ্রের তৃষ্ণা নিয়ে ছোটে, তাই সমুদ্রকে পায়। সমুদ্রের তৃষ্ণা ছাড়া নদীর অন্য তৃষ্ণা নাই, তবু যাইতে যাইতে তার দুই কূলকে শস্য শ্যামল, ফুলে ফলে ফুল্ল করিয়া যায় ; দুই কূলের লোকের সমস্ত অশুদ্ধিকে নিজের দেহে নেয় ; তার দুই কূলের আবহাওয়াকে শুদ্ধ রাখে।

আত্মত্যাগী সাধকেরাই আনিবেন বদ্ধ জীবনে প্রাণশক্তির দুর্জয় প্রবাহ। যাঁহারা নবযুগের ছেলেমেয়ে, তাঁহারা এই প্রবাহে যুক্ত হইয়া এই প্রবাহ-তরঙ্গকে গগনস্পর্শী করিয়া তুলুন—ইহাই নিপীড়িত মানবাত্মার প্রার্থনা।

The Realization of the New Age

Throughout the ages it is the idealists who have brought joy, peace and equality to this world. It is only the ones who can think big who can bring about large scale welfare to the world. Confined to smallness, the vitality of life, youth and work shrinks to smallness. A pond is beneficial to a village, but one contagious germ can contaminate the water and make it undrinkable. This can happen because a pond is bound on all four sides. It has no expanse, no movement, no flow. A river is bound too-on one side is the mountain, on one side is the ocean, and on two sides the banks. But it is spread out, therefore it has daily movements and flows. It is because of the flows that hundreds of germs cannot contaminate its water or make it unusable. That is why a river is more beneficial than a pond. The river thirsts for the ocean-for the boundless. Even after reaching the boundless ocean, it accepts the land-it doesn't move away from its bosom. Our ideal is the highest fulfilment; even with the utmost thirst for the day, we must not deviate from our purpose, and work on great tasks.

To accomplish a great task, to bring about large scale welfare to people, one has to have great power. This can be realized through thirsting for the ever-forgiving God. The river runs with its thirst for the ocean, and gets it. The river has no thirst other than its thirst for the ocean. Yet, along the way, it transforms both its banks into a land which is green with crops and vegetation and blossoming fruits and flowers. It collects all the impurities of the people on both banks in its own body and purifies the air.

It is the self-sacrificing seekers who will bring about the flow of the unconquerable power of life to the confined life. May the children of the new age be free by this flow and make the waves of the flow rise to touch the sky. This is the prayer of the oppressed humanity.

Translated by Sajed Kamal

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলীর Skylark-এর মতো, মিল্টনের Birds of Paradise-এর মতো এই ধূলি-মলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না ; কেবলি ঊর্ধ্বে—আরো ঊর্ধ্বে উঠে স্বপনলোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপন-বিহারী।

আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে—অন্ধকার নিশীথে, ভয়ের রাতে বিহবল শিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে—তরুলতা যেমন করে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী-মাতাকে ধরে থাকে—তেমনি করে। এইখানে সে মাটির দুলাল।

ধূলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না, তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে বলে : স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলির ধরাতে নামিয়ে আনব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব। এর এ-ঔদ্ধত্যে সুর-লোকের দেবতারা হাসেন। বলেন : অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাতলামি ! এরাও চোখ পাকিয়ে বলে : আভিজাত্যের আস্ফালন, লোভীর নীচতা !

গত মহাযুদ্ধের পরের মহাযুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই।

ঊর্ধ্বলোকের দেবতারা ভ্রূকুটি হেনে বলেন : দৈত্যের এ-ঔদ্ধত্য কোনোকালেই টেকেনি !

নীচের দৈত্য-শিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে : কেন যে টেকেনি তার কৈফিয়তই তো চাই দেবতা ! আমরা তো তারই আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

দুই দিকেই বড় বড় রথী-মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েট্‌স্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী, আর একদিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ', বেনাভাঁতে প্রভৃতি।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

এর অন্যরূপও যে নেই, তা নয়। এই দুই extreme-এর মাঝে যে, সে এই মাটির মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর দুঃখে সে অশ্রু বিসর্জন করে, পঙ্খীরাজে চড়ে তাকে মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় সে পাগল হয়ে ওঠে। সে তার মাটির মাকে ভালবাসে, তাই বলে স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করে না। এই শিশু মনে করে—স্বর্গ এই পৃথিবীর সতীন নয়, সে তার মাসি-মা। তবে সে তার মায়ের মতো দুঃখিনী নয়, সে রাজরানী, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী। সে জানে, তারই আত্মীয় স্বর্গের দেবতাদের কোনো দুঃখ নেই, তারা সর্বপ্রকারে সুখী—কিন্তু তাই বলে তার উপর তার আক্রোশও নেই। সে তার বেদনার গানখানি একলা ঘরে বসে বসে গায়—তার দুঃখিনী মাকে শোনায়।—তার আর ভাইদের মতো, তার অশ্রুজলে কর্দমাক্ত হয় যে মাটি, সেই মাটিকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোষে স্বর্গের দিকে ছোঁড়ে না।

এঁদের দলে—লিওনিদ, আঁদ্রিভ, ক্লুট হামসুন, ওয়াদিশ্‌ল, রেমঁদ প্রভৃতি।

বার্নার্ড শ', আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাঁতের মতো হলাহল এঁরাও পান করেছেন, এঁরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান করে এঁরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদ্‌গার করেননি।

যাঁরা ধ্বংসব্রতী—তাঁরা ভৃগুর মতো বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন : এ দুঃখ, এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্ত-মাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল-নল্‌চে দুই বদ্‌লে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা সৃজন করব।

স্বপ্নচারীদের Keats বলেন :

A thing of beauty is a joy forever. (ENDYMION)
Beauty is truth, truth beauty.

প্রত্যুত্তরে মাটির মানুষ Whitman বলেন :

Not Physiognomy alone—
Of physiology from top to toe I sing,
The modern man I sing.

গত Great War-এর ঢেউ আরব-সাগরের তীর অতিক্রম করেনি, কিন্তু এবারকার এই idea-জগতের Great War বিশ্বের সকল দেশের সবখানে শুরু হয়ে গেছে।

দশ মুণ্ড দিয়ে খেয়ে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হলো না, সেই Capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদের বলে হনুমান। এই

লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরই ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রসারপাইন যমবাজ প্লুটোরই হবে সেবিকা। সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষ-সেনা দেয় তার লেজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাতমুখ যদি পোড়েই—তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব—বলেই দেয় লম্ফ।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে—এ আপনারা যে-কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন বোধ হয়। না দেখতে পেলে চশমাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেই দেখতে পাবেন। দুরবিনের দরকার হবে না।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করার পুণ্যবলে মুখপোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে। সে আজো পূজা পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে যে দুঃসাহসীদের মুখ পুড়ছে—তারাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পূজো পাবে না।—এ কথা কে বলবে ?

এইবার কিন্তু আপনাদের সকলেরই আমার সাথে লঙ্কা ডিঙাতে হবে। অবশ্য, বড় বড় পেট যাদের, তাঁদের বলছিনে, হয়তো তাতে করে তাঁদের মাথা হেঁটই হবে।...

এই সাগর ডিঙাবার পরই আমাদের চোখে সর্বপ্রথম পড়ে 14th December—১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের 14th December—এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি Merezhkovsky-র বেদনা-চিৎকার '14th December!' এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি বর্বর রুশ-সম্রাট নিকোলায়ের দণ্ডাজ্ঞায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত শতাধিক প্রতিভাদীপ্ত কবি ও সাহিত্যিকের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস। এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুশ্‌কিনের ফাঁসির রজ্জুতে লট্‌কানো মৃত্যুপাণ্ডুর মূর্তি।

এই দিনই নির্যাতনের কংস-কারায় জন্ম নেয় অনাগত বিপ্লবী শিশু। বীণাবাদিনী সরস্বতী এইদিন বীণা ফেলে খড়্গ হাতে চামুণ্ডা-রূপ পরিগ্রহ করে। এর পরেই পাতাল ফুঁড়ে আসতে লাগল দলে দলে অগ্নিনাগ-নাগিনীর দল। কেতকী-বিতানের শাখায় শাখায় দুলে উঠল বিষধর ভুজঙ্গের ফণা।

১এই নির্বাসনের সাইবেরিয়ায় জন্ম নিল দস্তয়ভস্কির 'Crime and Punishment'। রাস্কলনিকভ যেন দস্তয়ভস্কিরই দুঃখের উন্মাদ মূর্তি, সোনিয়া যেন

---

১ সেন্ট পিটার্সবুর্গে উবপবসনৎরংঃু জবাড়ষঃ হয়েছিল ; সেই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি পুশ্‌কিন সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, এমনকি Decembrist Welfare Society-র গুপ্তসভায়ও তিনি যোগ দিতেন, এ-সব তথ্য অধুনা জানা গেছে। কিন্তু 'ফাঁসির রজ্জুতে' প্রাণ দিয়েছিলেন, এ-তথ্য ঠিক নয়। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আলেকজান্দার পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭) কিঞ্চিদধিক

ধর্ষিতা রাশিয়ারই প্রতিমূর্তি। যেদিন রাঙ্কলনিকভ এই বহু-পরিচর্যারতা সোনিয়ার পায়ের তলায় পড়ে বলল, 'I bow down not to thee, but to suffering humanity in you !' সেদিন সমস্ত ধরণী বিস্ময়ে-ব্যথায় শিউরে উঠল। নিখিল-মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ফেনিয়ে উঠল। টলস্টয়ের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে। সে মহাপ্লাবনে Noah-র তরণীর মতো ভাসতে লাগল সৃষ্টি—প্লাবন-শেষ নতুন দিনের প্রতীক্ষায়।

তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মতো—ভয়াবহ সাইক্লোনের মতো বেগে ম্যাক্সিম গোর্কি। চেকভের নাট্যমঞ্চ ভেঙে পড়ল, সে বিস্ময়ে বেরিয়ে এসে এই ঝড়ের বন্ধুকে অভিবাদন করলে। বেদনার ঋষি দম্ভয়ভস্কি বললে : তোমার সৃষ্টির জন্যেই আমার এ তপস্যা। চালাও পরশু, হানো ত্রিশূল ! বৃদ্ধ ঋষি টলস্টয় কেঁপে উঠলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলে উঠলেন : That man has only one God and that is Satan ! কিন্তু এই তথাকথিত শয়তান অমর হয়ে গেল, ঋষির অভিশাপ তাকে স্পর্শও করতে পারলে না।

গোর্কি বললেন : দুঃখ-বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব।

'লক্ষ কণ্ঠে গুরুজির জয়' আরাবে বাসুকীর ফণা দোল খেয়ে উঠল। নির্জিতের বিক্ষুব্ধ অভিযানের পীড়নে পায়ের তলার পৃথিবী চাকার নীচের ফণিনীর মতো মোচড় খেয়ে উঠল।

দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্কস্ যে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে-লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে। জার গেল—জারের রাজ্য গেল—ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংস-ক্লান্ত পরশুরামের মতো গোর্কি আজ ক্লান্ত-শ্রান্ত—হয়তো বা নব-রামের আবির্ভাবে বিতাড়িতও। কিন্তু তার প্রভাব আজ রুশিয়ার আকাশে বাতাসে।

কার্ল মার্কসের ইকনমিক্স্-এর অঙ্ক এই জাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে। পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মতো এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে।

গোর্কির পরে যে সব কবি-লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কি-না তা আজও বলা দুষ্কর।

---

৩৭ বছর বয়সে তাঁর স্ত্রীর আপন ভগ্নিপতি ব্যারন জর্জেস্ দ্য আঁথেস (ইধৎড়হ এবড়ৎমবঞ্ অহঃযবং)-এর সঙ্গে দ্বৈতদ্বন্দ্বে (ফঁবষ-এ) পিস্তলের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান।—সম্পাদক।

রাশিয়ার পরেই আসে স্ক্যান্ডিনেভিয়া।—আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত বলে দাবি রাশিয়া যেমন করে—তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স-জার্মানিও এ অধিকারের সবটুকুই পেতে দাবি করে।

আজকের নরওয়ের ক্লুট হামসুন, যোহান বোয়ার—শুধু নরওয়ের কথাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের জীবিত ছোট বড় সব Realistic লেখকই বুঝি বা ইব্‌সেনের মানস-পুত্র। হামসুন, বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্ধেক dreamer, অর্ধেক ঔপন্যাসিক। বোয়ারের Great Hunger-এর Swan যেন ভারতেরই উপনিষদের আনন্দ। তাঁর The Prisoner Who Sang-এর নায়ক যেন পাপেপুণ্যে অবিশ্বাসী নির্বিকার উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। হামসুনের Growth of the Soil-এর Pan-এর ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ঋষিদের মতো স্তবের আকুতি। যে করুণ-সুন্দর দুঃখের, যে পীড়িত মানবাত্মার বেদনা এঁদের লেখায় সিন্ধুতীরের উইলো তরুর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—তার তুলনা কোনো কালের কোনো সাহিত্যেই নেই।

এই দুঃসহ বেদনা আমরা লাঘব করি লেগারলফের রূপকথা পড়ে—মাতৃহারা শিশু যেমন করে তার দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার আড়ালে নিজের দুঃখকে লুকাতে চায়, তেমনি।

রাশিয়া দিয়েছে Revolution-এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা ; স্ক্যান্ডিনেভিয়া দিয়েছে অরুন্তুদ বেদনার অসহায় দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিয়েছে হাতে রক্ত তরবারি ; নরওয়ে দিয়েছে দু'চোখে চোখভরা জল। রাশিয়া বলে এ-বেদনাকে পুরুষ-শক্তিতে অতিক্রম করব, ভুজবলে ভাঙব এ-দুঃখের অন্ধ কারা। নরওয়ে বলে, প্রার্থনা কর ! ঊর্ধ্বে আঁখি তোলো ! সেথায় সুন্দর দেবতা চিরজাগ্রত—তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না !

এই প্রার্থনার সব স্নিগ্ধ প্রশান্তিটুকু উবে যায় হঠাৎ কোন্ অবিশ্বাসীর নির্মম অট্টহাস্যে। সে যেন কেবলি বিদ্রূপ করে। চোখের জলকে তারা মুখের বিদ্রূপ-হাসিতে পরিণত করেছে। মেঘের জল শিলাবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। পিছন ফিরে দেখি, চার্বাকের মতো, জাবালির মতো, দুর্বাসার মতো দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল বার্নার্ড শ', আনাতোল ফ্রাঁস, জেসিঁতো বেনাভাঁতে। তাঁদের পেছন থেকে উঁকি দেয় ফ্রয়েড। শ' বলেন : Love-টাভ কিছু নয়—ও হচ্ছে মা হবার insticnt মাত্র, ওর মূলে Sex। আনাতোল ফ্রাঁস বলেন : কি হে ছোকরারা, খুব তো লিখছ আজকাল। বলি, ব্যালজ্যাক—জোলা পড়েছ ?

বেনাভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওঁদের মধ্যেই একটু ভীরু। হাসি লুকাতে গিয়ে কেঁদে ফেলে Leonardo-র মুখ দিয়ে বলে : 'বন্ধু ! যে জীবন মরে ভূত হয়ে

গেল—তাকে ভুলতে হলে ভাল করে কবরের মাটি চাপা দিতে হয়। মানুষের যতক্ষণ আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে ততক্ষণ সে কাঁদে, কিন্তু সব আশা যখন ফুরিয়ে যায়—সে যদি প্রাণ খুলে হেসে আকাশ ফাটিয়ে না দিতে পারে তবে তার মরাই মঙ্গল।'

তাঁর মতে হয়তো আমাদের তাজমহল—শাহজাহানের মোমতাজকে ভাল করে কবর দিয়ে, ভাল করে ভুলবারই চেষ্টা।

বেনাভাঁতে হাসে, সে নির্মম ; কিন্তু সে বার্নার্ড শ'র মতো অবিশ্বাসী নয়।

এরি মাঝে আবার দুটি শান্ত লোক চুপ করে কৃষাণ-জীবনের সহজ সুখ-দুঃখের কথা বলে যাচ্ছে—তাদের একজন ওয়াদিশল রেমন্ট—পোলিশ, আর একজন গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা—ইতালিয়ান।

কিন্তু গল্প শোনা হয় না। হঠাৎ চম্‌কে উঠে শুনি—আবার যুদ্ধ-বাজনা বাজছে—এ যুদ্ধ-বাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাতের। দেখি তালে তালে পা ফেলে আসছে—সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত সেনা। তাদের অগ্রে ইতালির দ্যু-অনন্‌ৎসিও, কিপ্‌লিং প্রভৃতি। পতাকা ধরে মুসোলিনি এবং তার কৃষ্ণ-সেনা।

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢুলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশির ধ্বনির মতো শ্রেষ্ঠ স্বপনচারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী—'The sound of the bell that leaves the bell itself.' তারপরেই সে বলে : 'আমি গান শোনার জন্য তোমার গান শুনি না। ওগো বন্ধু, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্তব্ধতা আনে তারি অতলতায় ডুব দেওয়ার জন্য আমার এ গান শোনা।' শুনতে শুনতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে। ধুলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তবগান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায় ! স্বপ্নে শুনি—পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্রচালকের বাঁশি,—তুরস্কের নেকাব-পরা মেয়ের মোমের মতো দেহ!

তখনো চারপাশে কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির হোলি-খেলা চলে। আমি স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠি—'Thou wast not born for death, immortal bird!'

Contemporary World literature

If we look at the contemporary literature, we find that there are two streams. Firstly, it is like the skylark of *Shelly* and *Milton's* birds of paradise which soar high in the sky and look for heaven, the feet not touching the ground. It soars higher and higher in search of the heavenly song, a dream seeker.

In another stream it embraces this dusty earth with great affection-just as a frightened child clasps his mother on a dark night, just as the tree clings to the soil with thousands of roots, a loving son of the soil.

It is not that this mud-clad child does not acknowledge beauty or not want the heaven. He says, "If there is a heaven then he wishes to bring heaven to earth. Our world has always been enslaved at its feet, now we shall make it the slave of the earth." The deities of the musical world laugh at this. They say, "This is the pride of the demon, and the drunkenness of the beast." In response they glare angrily and say, "These are the mutterings of the elite, the lowliness of the greedy."

After the last world war, another world war begins here.

The deities from above frowned and said, "The arrogance of the demons has never lasted through."

The demon-child makes a fist and says, "We need an answer as to why it did not last. Let us settle this matter once and for all."

We have stalwarts on both sides. On the one hand we have the dreamers *Noguchi, Yeats, Rabindranath Tagore* and others. On the other hand are *Gorky, Johan Bojer, Bernard Shaw, Benavente* and others. In contemporary literature, both these streams have gained prominence.

Not that there is nothing else in between. In between these two extremes, there is one who listens to stories of heaven while lying upon his earthly mother's breast. He sheds tears at the

sorrow of the princess in the fairy tale. He gets ready to ride the mythical flying horse and free her. He loves his earthly mother, but has no grudge against heaven. He thinks heaven is not his other wife, but his aunt. She is not sad like his mother, but a wealthy princess. He knows that his relatives are the deities of heaven and they have no sadness, grief, but he is not hateful towards them. He sings his sad song alone at home, rendering bits to his mother. Unlike his brothers, he doesn't throw fistfuls of tear-dampened soil at heaven in anger.

Among them would be *Leonid, Andreev, Knut Hamsun, Wladyslaw Reymont* and others.

Like *Bernard Shaw*, *Anatole France*, *Benavente*, they are also drunk, but unlike others they have not spilled the drink, they have reached the status of deities.

Those who are destructive, are rebellious like *Vreegu*. According to them, "We want an end to this sadness and sorrow. The reforms will emerge not from evolution, but through blood bathed revolution. We need to make overall changes and create new. We shall strive and our perseverance will bring a new creator and new creations."

Keats says to the dreamers

`A thing of beauty is joy forever
Beauty is truth, truth is beauty'.

In return, *Whitman* from the other school,says

Not physiognomy alone
Of physiology from top to toe I sing
The modern man I sing.

During the last great war, they could not cross the Arabian Sea, but now the idea is that this great war has spread everywhere in the world.

The capitalists have been devouring like the *Ravanas* with ten heads and have been stealing with twenty hands and along with their keepers termed *Hanuman,* they are still not satisfied. These greedy people say that the *Sitas* of the earth are to be enjoyed by the best people of the earth, and *Projerpine* should be the nurse for *Pluto*! When the *Hanuman* goes to save *Sita*, the sentry ignites his

tail. Then Hanuman jumps upon Sita and says, "If I am to burn with fire in my tail,then I shall burn all your gold ornaments too."

In contemporary world literature we find that the Hanumans are jumping and the gold ornaments are burning and I think that you have been able to see that with your naked eyes. If not, then please clean your glasses, there is no need for binoculars.

It is mentioned in the *Ramayana* that by virtue of saving *Sita*, Hanuman has become immortal. He is being worshipped in the homes of India. And who knows, those who are getting burnt today may become immortal later!

And now you shall have to cross the Lanka with me. Of course, I'm not calling upon those with big bellies, they may be humiliated!

After crossing the sea we first notice 14th December 1825 when I can hear the sadness of *Merezhkovsky* crying ` 14 December'. I can hear the cries of talented poets and litterateurs who were exiled in Siberia by *Nicholas*, the ruthless ruler of Russia.This is where I stand and see the pale, distorted face of *Pushkin*, one of the best poets of this world, hanging from the noose.

On this very day the emerging rebellious child was born from the oppressed. On this day *Saraswati* left her lute and took a different form. At this very moment we found some fiery snakes emerging from below the earth, waving their poisonous tails in the branches of the beautiful flowering trees!

During these exiled times in Siberia, *Dostoyevsky* created 'Crime and Punishment'. *Roskolnikov* seemed like the sad, angry face of Dostoyevsky himself. And Sonia the representative of raped Russia. The entire world was grief stricken and awed to see the Roskolnikov falling at the feet of the ever caring Sonia and saying, `I bow down not to thee,but to suffering humanity in you'. The entire human world shared the sufferings of the downtrodden, and *Tolstoy's* `God and Religion' was washed away by the waves of the sea. Like Noah's Ark, the creations started floating and waited for the new dawn at the end of the storm.

After this round came a greater storm named *Maxim Gorky*. *Chekov's* stage fell and he came out to greet the friend of storm. Poet of sadness Dostoyevsky said, `My meditation is for your creation.' The old hermit Tolstoy shook in his seat. He screamed aloud in anger,` That man has only one God and that is Satan'. But this alleged ` Satan' became immortal, the curse of the hermit could not touch him.

Gorky said, `We shall not be quiet singing the songs of sadness, we shall take revenge. To regain our sanctity, we shall soak the world in a blood bath.

Basuki wagged his tail from the Arab world, `Hail our mentor'. Crushed by the angry expedition of the oppressed, the earth beneath the feet rolled like the angry snake. The death warrants issued by hermit *Karl Marx* near the distant seas finally appeared in the palace like vicious hidden reptiles and bit the enemy.

The Tzar fell, his kingdom too and the palaces were strewn to the ground with the help of hammers and shovels. Like *Porshuram*, the God of destruction, Gorky is also tired and maybe feeling left out at the arrival of new heroes, but his influence is all over Russia.

The economic theories of Karl Marx have fallen into the hands of the magician and transformed into world theories. The piles of stones have turned into a beautiful Taj Mahal. Like the faded glow of the morning, the beauty of the Taj has enthralled the world.

Scandinavia is right after Russia, both Norway and Russia can claim their positions on their innovative ideas. France and Germany can claim their glory too.

Knut Hamson, Johan Boyer of Norway, and not just Norway alone, every realistic all living beings of the world are ideological sons of Ibsen.

Hamsun, Boyer are half dreamers and half novelists. The character Swan in Boyer's Great Hunger reminds us of the character `Anondo' from the Upanishod. Similarly, the

characteristics of his `Prisoner who sang' reminds us of the saintly Shochidanondo[1] (from Upanishad). In Hamsun's 'Growth of the Soil', we find a similar character and praises like the sages in the *Vedas*. The sad-beautiful sagas and the utter miseries of human beings captured in these writings, sighing like the willows near the sea, are incomparable.

Just as a motherless child sits listening at his grandmother's feet, trying to avoid his own sorrows, we are able to reduce our burden by reading the fairy tales of Legarlof. Russia has imparted us the unbearable pains of `revolution', Scandinavia has given us sighs of misery. Russia has given us the blood-stained sword and Norway has given us tears. Russia is determined to overcome this grief with their manly strength, they shall break the dark prison. Norway says, let us pray and look above, we can see the deities there, they are awake and will not tolerate any insult.

Suddenly when a disbeliever laughs out loud, all these soothing, serene scenes disappear in a second. As if he is being cynical, they have turned the tears into smiles of cynicism, the cloud has turned into hailstorms. I look back and find Bernard Shaw, Anatole France and Jacinto Benevante standing like Chirbak, Jabali and Durbasa. Freud starts peeping behind them. Shaw says, `Love is nothing, it is an instinct towards motherhood, all targeted towards sex.' Anatole France says, 'Guys, you have been writing a lot. I wonder if you have read Balzac or Zola?'

Benvante just smiles because he is the most timid amongst them. In an attempt to hide his smile, he starts crying. He speaks through his character Leonardo, he says `Friend, if you want to get rid of this life, you will have to put lots of earth on the grave. People cry as long as they live and have some hope. If they cannot laugh heartily then all hope ends, and dying is better than having no hope.'

According to him, the *Taj Mahal* of India is the attempt of *Shahjahan* to forget *Mumtaz* by making a proper grave and laying her within.

Benavante laughs because he is ruthless, but not godless like Bernard Shaw.

In the meantime two quiet people tell the stories of the peasants. One of them is Polish, *Wladyslaw Reymont*, and the other is *Grazia Deledda*, Italian.

I had no time to listen to stories, I am startled by the noises of the war, war music is from many centuries ago from the West. I spot the imperialists expansionists and fascists marching to these tunes. The cheerleaders are Italian *De Onontio* and *Kipling*. The flag bearers are *Mussolini* and his black soldiers.

I feel tired and lean against the darkness of the night. Suddenly, I hear the meaningful words of the best dreamer Noguchi, like the flute, "The sound of the bell that leaves the bell itself", and then says, "I do not listen to your songs, just for the sake of listening. Your songs bring a closure and the stillness that follows allows me to go deep, that's my attraction." My eyes close as I listen. In this dusty earth I fall asleep listening to the praises of beauty and aspire for the new sun in the new morning. In my dreams, I listen to the bulbul birds of Persia, the whistle of the camel driver in Arab, the beautiful candle –like bodies of the veiled women of Turkey.

Around me the mudslinging continues. In my dreams I speak out, "Thou were not born for death, immortal bird!"

Translated by Nashid Kamal

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান

আমাদের বাংলার মুসলমান সমাজ যে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে আশাতীতভাবে উন্নতি দেখাইয়াছেন, ইহা সকলেই বলিবেন, এবং আমাদের পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। সাধারণ অসাধারণ প্রায় সকল বাঙালি মুসলমানই এখন বাংলা পড়িতেছেন, বাংলা শিখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বড়ই আশা ও আনন্দের কথা। বাংলা সাহিত্যে পাকা আসন দখল করিবার জন্য সকলেরই মনে যে একটা তীব্র বাসনা জাগিয়াছে, এবং ইহার জন্য আমাদের এই নতুন পথের পথিকগণ যে বেশ তোড়জোড় করিয়া লাগিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই সাহিত্যে আমাদের জীবনের লক্ষণ। ইহারই মধ্যে আমাদের কয়েকজন তরুণ লেখকের লেখা দেখিয়া আমাদের খুবই আশা হইতেছে যে, ইহারা সাহিত্যে বহু উচ্চ আসন পাইবেন।

এখন আমাদের বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সর্বপ্রথমে আমাদের লেখার জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝর্ণার মতো ঢেউভরা চপলতা ও সহজ মুক্তি আনিতে হইবে। যে সাহিত্য জড়, যাহার প্রাণ নাই, সে নির্জীব-সাহিত্য দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকেরই লেখায় মুক্তির জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ফুটিতে দেখা যায়। হইবে কোথা হইতে? সাহিত্য হইতেছে প্রাণের অভিব্যক্তি, যাহার নিজের প্রাণ নাই, যে নিজে জড় হইয়া গিয়াছে, সে লেখার প্রাণ দিবে কোথা হইতে? যাহার নিজের বুকে রঙের আলিপনা ফুটে না, সে চিত্রে রঙ ফুটাইবে কেমন করিয়া? আমাদের অধিকাংশই হইয়া গিয়াছে জড়, কেননা আমাদের জীবন ভয়ানক একঘেয়ে; তাহাতে না আছে বৈচিত্র্য, না আছে কোন সৌন্দর্য। তাছাড়া, 'বোঝার উপর শাকের আঁটির' মতো আমরা নাকি আবার জন্ম হইতেই দার্শনিক, কাজেই বয়স কুড়ি পার না হইতেই আমরা গম্ভীর হইয়া পড়ি অস্বাভাবিক রকমের। আর, গম্ভীর হইলেই অম্‌নি নির্জীব অচেতন প্রাণীর মতো হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এই যে চলার আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জড়ভরতের মতো বসিয়া থাকা, ইহাই আমাদের প্রাণশক্তিকে টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে। সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকিবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ এবং ঢেউ-এর কল-গান ও চঞ্চলতা।

আমাদিগকে, বিশেষ করিয়া আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক যুবকের লেখা দেখিয়া মনে হয়, ইহা যেন কোনো এক জরাগ্রস্ত বুড়োর লেখা; তাহাতে না আছে প্রাণ, না আছে চিন্তাশক্তি, না আছে ভাব, —শুধু আবর্জনা, কঙ্কাল আর জড়তা। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। সাহিত্যকে এই প্রাণের সোনার কাঠি দিয়া জাগাইবার যে জাদু-শক্তি, ইহা লাভ করিতে হইলে আমাদের তরুণ সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শরীর নীরোগ হইলে মনে আপনি একটা বিমল আনন্দ উছলিয়া পড়িতে থাকে। দেখিবেন, যে-সাহিত্যিকের স্বাস্থ্য যত ভাল, যিনি যত বেশি প্রফুল্লচিত্ত, তাঁর লেখা তত বেশি স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, তত বেশি কলমুখর। নবীন সাহিত্যিকগণ সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিবার জন্য যদি এক-আধটু করিয়া সংগীতের আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন তাহাদের লেখার মধ্যে এই সংগীত, সুরের এই ঝঙ্কার উন্মুক্ত প্রফুল্লচিত্তের এই মোহন-বিকাশ ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাদের লেখার মধ্যে এক নূতন মাদকতা, অভিনব শক্তি দান করিতেছে। অধিকাংশ 'পুঁয়ে মারা' পিলে-রোগাক্রান্ত সাহিত্যিকের লেখাই দেখিবেন অসুস্থ (morbid); ইহাই সাহিত্যের স্বচ্ছ ধারায় আবিলতা আনে। যাঁহার চিত্ত যত নিরাবিল, নির্মল, হাস্য-মুখর, তাঁহার লেখাও তত নূতন নূতন সম্পদে ভরা (rich)। ইউরোপের লোকেরা যেমন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, খেলাধুলা, দৌড়-ঝাঁপ, মারামারি, হাসি-খুশি যেমন তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তাহাদের লেখার মধ্যেও ঠিক তাহাদের জীবনের ঐসব গুণ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে।

অপর পক্ষে, উহারই বিপরীত সমস্ত দোষসম্পন্ন বলিয়া আমাদের লেখা, আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টি আবার তেমনি সঙ্কীর্ণ, ভণ্ডামি, অসত্য, রোগের বীজাণু প্রভৃতিতে ভরা। লেখকের লেখা হইতেছে তাঁহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক সত্য, তাঁহার লেখাতেও সে-সত্য সত্যভাবেই ফুটিয়া উঠিবে; যেখানে লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে তিনি হাজার চেষ্টা করিলেও লুকাইতে পারিবেন না। সাধারণের চক্ষে যদি না পড়ে তবে জহুরির চক্ষে তাহা পড়িবেই পড়িবে। সাহিত্যে এই প্রাণ, এই উদ্দাম-চঞ্চলতা, এই উদার মুক্তি আনয়নের চেষ্টা আপাতত আমাদের মাত্র দুই একজন তরুণ সাহিত্যিক ভিন্ন অন্য কারুর লেখায় দেখিতে পাইতেছি না। সেই গড্ডালিকা প্রবাহ। সাহিত্যে যে একটা নূতন ধারা চলিয়াছে, সে-সম্বন্ধে আমাদের অনেক নূতন লেখক এখনো অন্ধ। এই সব কারণে সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মতো উন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোন ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়-ছোট জ্ঞান থাকিবে না। বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্যসাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড়-ঘরেই মারা যাইবে। যাঁহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড় সাহিত্যিক। কারণ, সাহিত্য হইতেছে

বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন। সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোনো লোক বলিতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা; ইহা তাঁহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতেছিল না। এইরূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে বলে সাহিত্যে সার্বজনীনতা।

এই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ রবীন্দ্রনাথ এমন জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পায় না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, খুব জোর দু'দিন আদর লাভের পর তাহার মৃত্যু হয়। আমাদিগকেও তাই এখন করিতে হইবে সাহিত্যে সার্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া। যিনি যে দেশেরই হউন, সকলেরই অন্তরের কতকগুলি সত্য আছে, সূক্ষ্মতম ভাব আছে, যাহা সকল দেশের লোকের পক্ষেই সমান; সাহিত্য-সৃষ্টির সময় ভিতরের এইসব সূক্ষ্মদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের গূঢ় রহস্যকে বিশ্লেষণ করিয়া সত্যের সৌন্দর্য ও মঙ্গল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে,—এই মহাশক্তি আমাদের তরুণ লেখক সম্প্রদায়কে অর্জন করিতে হইবে। সত্য যদি লক্ষ্য হয়, সুন্দর ও মঙ্গলের সৃষ্টি সাধনা ব্রত হয়, তবে তাঁহার লেখা সম্মান লাভ করিবেই করিবে। অন্যের ঠিক প্রাণে গিয়া আঘাত করিবার মতো শক্তি পাইতে নিজের প্রাণ থাকা চাই। এসব কথা আমরা শুধু কোনো বিশেষ লেখক-সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়া বলিতেছি না; ইহা ঔপন্যাসিক, কবি, ছোট গল্পলেখক সকলেরই প্রতি প্রযোজ্য। এই তিন রকমের লেখকের মধ্যে কেহই ছোট নন, কারণ প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য—সৃষ্টি। তিনিই আর্টিস্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ, বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের নবীন তরুণ আর্টিস্ট সাহিত্যিক ও কবিগণ এই কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টির দিকে চেষ্টা ও প্রাণ প্রয়োগ করিবেন, ইহাই আমাদের বাসনা। আমাদের এ আশা পূর্ণ হউক!

Role of Muslims in Bengali literature

It is with great joy that I notice that the Muslims of Bengal have accepted Bangla as their mother tongue and have started exhibiting flying colours in a very short time. Among the Muslims of Bengal, both the commoners and the gentry have been reading Bangla in an attempt to learn the language. The fact that everyone is genuinely eager to carve a permanent niche in Bangla literature proves the statement that literature is a reflection of our lives. A few young newcomers have been writing very well and I hope that they will reach high places in the near future.

To be able to make a permanent mark in Bangla literature we should work on removing the stiffness in our writing and fill ourselves with the infectious energy and waves of spring and bring some ease to it. We shall not be benefitted by literature which is static and lifeless. It shall never have a permanent impact on literature. Save *Rabindranath Tagore*, very few writers have been able to imbibe their literary works with the lively spark of freedom. This is because literature is an expression of the person. If the person is lifeless, how will he be able to impart life to his work? One who doesn't have variety of colours within him, cannot bring it out in his work. Most of us have become like static rocks, because our lives are monotonous, with no variety, no beauty. To add insult to injury, we Bengalis are known to be 'philosophers', hence just as we cross twenty we become reserved and withdrawn. Hence we have to sit in one position and maintain our stance, this static existence kills the joy of life. In free literature we need joy, the speed of the currents and the songs of the waves and their playfulness.

We, and especially the young generation, will have to pay special attention to this. When I read the write ups of some young people, I feel that it is coming from some old person. There seems to be no life, no thoughtfulness, no expression, only garbage, just skeletons and hard stone. It is all very sad. To obtain the magic

wand that will change all, the young fellows need to focus on their bodies first. When the body is without ailment the whole being bursts with the joy of life. You will note that those writers who are healthy, who are delightful at heart, their work is equally so, just an image of their youthfulness. If these young writers can practice a bit of music then you will see that their write ups are full of melody. The symphony of music will be obvious in their work and give it some new sensuality. A novel force will be obvious. Most writers who are suffering from various gastric disorders are writing morbid stuff, and they impede the easy flow of literature. The youthfulness in literature is proportionate to that of the person himself. The more joyous he is, the more delightful is his work. People of Europe are used to their routine exercises, running,jumping,having fun and their work reflects the same.

On the other hand, our writings are full of malice, full of narrowness, lies and viruses. A writer's write up is the reflection of the truth emerging from his soul. When the writer is truthful, his work will reflect the same. When he is a liar, his work will bear witness to that, no matter how hard he tries to hide. Even if the common reader does not spot this, the sensitive one will surely do so. Other than a couple of young writers, I do not notice any spirited enthusiasm in any of the works. Everything is so monotonous, none has caught up with the new trends in literature. The soul of the poet, the writer, should be generous and liberated like the sky. They should not discriminate against religion, nationality, gentry or commoner. If the life of a litterateur is like the small pond then their literature will only be muddy and murky and they will fail as writers. Those whose hearts are big and generous, shall attain high positions in literature. Literature belongs to the whole world. It is not the property of one person alone. A litterateur will speak his mind, and from the experience of his own pain will show empathy to the world, offer balm where it is hurting. Even if he discusses a very complicated theory, the whole world should be able to recognize the thoughts as a solution to their own. It is as if the words were stuck in their heart, not finding a way to surface. This is how world literature is created and this is called universality.

Tagore has become a world renowned figure because he has been able to create world literature. That which cannot make an impact in world literature, is not literature at all. It can have some temporary fame and then it dies its own death. We should strive for universality without sacrificing our national identities and specialties. Whatever nationality we possess there are some feelings, some expressions and innermost thoughts which are common to all, and one must be conscious of these thoughts while creating literature. Our young writers must thrive to attain this quality of heeding the innermost sensitivities of all human beings and express the beauty of truth by exploring these secret mysteries of life. If his goal is to express truth and project beauty, then his work will surely get due recognition. My suggestion is not towards any particular writer, it includes all poets, novelists, short story writers. Amongst these three categories, none can be ranked, they are all creative people. They are artists because they can express art. Art means the execution of the truth. Truth is always beautiful, forever beneficial. Art can be termed as creation, joy, man and nature. However, expressing the truth is the main goal of art. The young artists, litterateurs and poets should remember these words and should try to focus their efforts at creating world literature. That is our wish. Let this wish be fulfilled.

Translated by Nashid Kamal

বাঙালির বাংলা

বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে—'বাঙালির বাংলা'—সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট-সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা-শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তম, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় ; দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। যারা যত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এই অবিদ্যা তাদেরই তত বাধা দেয়—বিঘ্ন আনে। এই জড়তা মানবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিছুতেই অমৃতের পানে আনন্দের পথে যেতে দেয় না। এই তমকে শাসন করতে পারে একমাত্র রজগুণ, অর্থাৎ ক্ষাত্র-শক্তি। এই ক্ষাত্রশক্তিকে না জাগালে মানুষের মাঝে যে বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্মশক্তি আছে তা তাকে তমগুণের নরকে টেনে এনে প্রায় সংহার করে ফেলে। বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। তাদের ক্ষাত্রশক্তি জাগলো না বলে দিব্যশক্তি কোনো কাজে লাগলো না—বাঙালির চন্দ্রনাথের আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্‌গিরণ করলো না। এই ক্ষাত্রশক্তিই দিব্য তেজ। প্রত্যেক মানুষই ত্রিগুণান্বিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ। সত্ত্বগুণ, ঐশীশক্তি অর্থাৎ সৎশক্তি সর্ব অসৎ শক্তিকে পরাজিত করে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। এই সত্ত্ব গুণের প্রধান শত্রু তমঃ গুণকে প্রবল ক্ষাত্র শক্তি দমন করে। অর্থাৎ, আলস্য, কর্ম-বিমুখতা, পঙ্গুত্ব আসতে দেয় না। দেহ ও মনকে কর্মসুন্দর করে। জীবনশক্তিকে চির-জাগ্রত রাখে, যৌবনকে নিত্য তেজ-প্রদীপ্ত করে রাখে। নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, জরা ও ক্লৈব্যকে আসতে দেয় না। বাঙালির মস্তিষ্ক ও হৃদয় ব্রহ্মময় কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়। কাজেই এই বাংলার অন্তরে-বাহিরে যে ঐশ্বর্য পরম দাতা আমাদের দিয়েছেন, আমরা তাকে অবহেলা করে ঋণে, অভাবে, দৈন্যে, ব্যাধিতে, দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছি। বাংলার শিয়রে প্রহরীর মতো জেগে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গিরি হিমালয়। এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি-যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তাঁরা সর্ব দৈব-শক্তির লীলা-নিকেতন বলেছেন। এই হিমালয়ের গভীর হ্রদ-গুহার অনন্ত স্নেহধারা বাংলার শত শত নদ-নদী রূপে আমাদের মাঠে-ঘাটে ঝরে পড়েছে। বাংলার সূর্য অতি তীব্র দহনে দাহন করে না।

বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলার বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী। বাংলার জল নিত্য প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্য-উর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা ফলে। এত ধান আর কোনো দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। পৃথিবীর আর কোনো দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত আনন্দ, এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত ধর্মবোধ—আল্লাহ, ভগবানের উপাসনা, উপবাস-উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাংলার কয়লা অপরিমাণ, তা কখনো ফুরাবে না। বাংলার সুবর্ণ-রেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণরেণু। বাংলার অভাব কোথায় ? বাংলার মাঠে মাঠে ধেনু, ছাগ, মহিষ। নদীতে ঝিলে বিলে পুকুরে ডোবায় প্রয়োজনের অধিক মাছ। আমাদের মাতৃ-ভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায়? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্ম-বিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ ধান পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশী লুটে নিয়ে যায়, আমরা তার প্রতিবাদ করি না, উল্‌টো তাদের দাসত্ব করি; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লেখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি; সহস্র সহস্র ফকির-দরবেশ ওলি-গাজির দর্গা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা-মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

আজ আমাদের আলস্যের, কর্ম-বিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালি সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারে তারাই আজ হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারি। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অজগর বনের বাঘ নিয়ে বাস করে, তারা আজ নিরক্ষর বিদেশীর দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, সারা দেহমনে আসে প্রলয়ের কম্পন, সারা বক্ষ মন্থন করে আসে অশ্রুজল। যাদের মাথায় নিত্য স্নিগ্ধ মেঘ ছায়া হয়ে সঞ্চরণ করে ফিরে, ঐশী আশীর্বাদ অজস্র বৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে, শ্যামায়মান অরণ্য যাকে দেয় স্নিগ্ধ-শান্তশ্রী, বজ্রের বিদ্যুৎ দেখে যারা নেচে উঠে,—হায় তারা এই অপমান এই দাসত্ব বিদেশী দস্যুদের এই উপদ্রব নির্যাতনকে কি করে সহ্য করে? ঐশী ঐশ্বর্য—যা আমাদের পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে তাকে বিসর্জন করে

অর্জন করেছি এই দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব লাঞ্ছনা। বাঙালি সৈনিক হতে পারলো না। ক্ষাত্র শক্তিকে অবহেলা করলো বলে তার এই দুর্গতি—তার অভিশপ্তের জীবন। তার মাঠের ধান পাট রবি ফসল তার সোনা তামা লোহা কয়লা—তার সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশী দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বসে দেখে। বলতে পারে না 'এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য ! খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ করবে—তাকে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিয়ে বিনাশ করবো, সংহার করবো।'

বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও :

'এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির—আমাদের।
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।'

বাংলা বাঙালির হোক ! বাংলার জয় হোক ! বাঙালির জয় হোক।

নবযুগ
৩রা বৈশাখ, ১৩৪৯

The Bengal of the Bengalis

The day Bengalis in unison will speak of the 'Bengal of the Bengalis', they will attain the unattainable. They can achieve India's freedom by themselves. No nation — whether in Asia or even in the whole world — possesses the kind of power to know and love (brain centered and heart centered) which the Bengalis possess. But since they do not have the strength to work, this divine power of theirs remains overcast by gloom. Their aversion to work, their inertia, their fear of death, laziness, drowsiness, sleepiness, — all these are the very reason for their unwillingness to do business and trade. Since they are overwhelmingly ruled by their lowliest qualities, they have lost their power to think. This lowly nature, gloom and inertia stand for ignorance. Ignorance can only take us along the path of darkness, of delusions. It can only dim our divine power and make it lifeless. However pure and thoughtful people may be, —this ignorance hampers them, creates obstacles. Inertia is deadly for human beings. It does not at all allow one to advance towards feeling delicious, along the path to enjoyment. Lowliness can only be brought under control by spiritedness, energy, in other words by our vigorous qualities. If we don't awaken this vigor, our world conquering power of the Self is drawn down towards infernal depths, and is nearly killed. Bengalis are forever suffused by divine power. Since their vigor has not been aroused, their divine power remains ineffective. *Chandranath's* volcanic power of the Bengalis has not ignited fire. Yet our vigor is celestial, mighty.

Each human being is pervaded by three qualities. These three qualities are our virtuousness, our energetic quality and our lowly nature. The qualities of moral strength and Divine power or the power of Truth, — these can conquer all lack of virtue, and take us on the path to fulfillment. The principal enemy of virtuousness is gloom which can be controlled by the power of vigor. Laziness, i.e. lack of laboring strength, and paralysis then are not allowed

to crop up. The body and the mind are beatified. Our life-energy is completely invigorated, our youthfulness keeps radiating. Desperation, lack of confidence, decay and impotence are not able to take over. The brain and the heart of the Bengalis are pervaded with the Self, but the body and the mind are stony.

In fact, we have ignored the divineness which the Supreme ruler bequeathed on us, in Bengal and beyond. We have thus fallen into debt, have become impoverished and are visited by sickness and misery. At the crest of Bengal, like a sentry, the world's highest mountains, the Himalayas, stand guard. In these Himalayas, the best prophets, *rishis* and ascetic *jogis* have performed their arduous religious practices. They have called the Himalayas the abode of pleasure of the world's Divine Power. From the very bosom of the Himalayas, a stream of affection has descended on our fields and riverbanks, by way of hundreds of rivers.

The sun of Bengal radiates with modest rays. Bengal's moon is always sweet. The air of Bengal is always bright, in Bengal's breezes the spring is ever present, and its autum is very sweet. Bengal's water always flows in abundance, and is entirely pure. Bengal's soil is always fertile, golden crop forever sprouts here. The harvesting of paddy in no country is as rich as in ours. Jute only grows in Bengal. In no other country of the world can jute be produced. So many flowers and birds, songs and voices. So much of embroidery, so many shades, so much of compassion all these cannot be found anywhere else on earth. Nowhere else in the world does one find so much pleasure, noise-making and affection for one's relatives. The amount of religiosity that one finds here, of veneration for Allah and *Bhagwan*, of fasting and festivities, one can't find anywhere else.

Bengal's coal is available in unlimited quantities. In the gold-striped sand and water of Bengal there are golden grains. Why speak of Bengal's lack of wealth? Throughout the fields of Bengal one finds milch cows, goats and buffaloes. In our rivers, tanks and ponds there is an abundance of fish, more than we need. Our motherland is like paradise on earth, with its everlasting divine

beauty. What is all this talk of scarcity? Yet all our abundance has ultimately turned us into a nation prone to luxury, a nation which is comfort-seeking, lazy and averse to work. Hundreds of foreigners take away our fish, our paddy, our jute, our wealth. We don't protest against them, but instead serve them as slaves, we help them loot us.

A hundred fifty years back, Bengalis merely armed with sticks tried to defend their freedom. Even today, our boys have sacrificed themselves for the cause of freedom and have shown unequalled courage. Their bravery will be recorded with golden letters in the annals of our history. Bengal is the abode of all Divine power. Here hundreds of thousands of *jogis*, prophets and *rishis* have erected their abodes of austerity and centers of meditation. The thousands of shrines of wandering ascetics and saints are supremely holy. Here, in our villages, the call for Muslim prayer, the *azan*, resounds, side-by-side with the call for worship of the Hindus blowing their conch shells. The rulers who ruled here in the past already declared the country's independence. In Bengal's surroundings, a power already exists animating us to declare our independence. Our Bengal is forever glorious, always beautiful, ever holy.

Today, given our laziness, our apathy and lack of manliness, — we are miserable, and more so than anybody else. The very same Bengalis who in the past were hospitable, who daily received people from all over the world, today are at everybody's doorstep begging for alms. The very same people who brave forest tigers living next door, are serving illiterate foreigners as slaves. Hearing all this, you feel like clenching your fist in rage, your body and mind start shivering terribly, and the flow of tears agitates your whole breast. How come we tolerate all these insults, this slavery under foreign enemies, and this irritating oppression? How come we allow it to happen, —even as refreshing clouds pass daily over our heads; as divine benevolence wrapped up in incessant rains pours down on us; as the forests give us serene calmness, and we dance being electrified by thunder?

We have earned this misery, poverty, scarcity and suffering, because we have sacrificed the Divineness which is spread out over our roads, our landing places and fields. Bengalis have failed to become soldiers. In failing to nurture our vigor, we have become wretched, our life is cursed. All the paddy, the jute and the *rabi* crops, all the gold, the copper, iron and coal of the Bengalis all this divine wealth is being looted and is taken away by foreign enemies. Meanwhile they, the Bengalis, sit by and watch it happen. Can't they say, 'This is a grant from *our* God, this is our original wealth'? Can't they say, '*Khabardar!* Wait a minute! We will destroy them shooting arrows, we'll kill them, the demons, the *rakhosh,* who come to grab, the enemies who dare touch this divine wealth of ours.'

Teach the Bengalis,
the boys and girls of the Bengalis,
just this one *mantra* from their childhood:
This sacred Bangladesh
belongs to the Bengalis, to us;
With the help of *Dhananjay,* the guard
we'll expel them, we aren't afraid
No matter how many foreign enemies and looters may come,
women beauties and mighty men
May Bengal be of the Bengalis!
Let Bengal be victorious!
May the Bengalis be victorious!

Nabajug,
3rd of Baishakh, 1349

Translated by Peter Custers

ভাব ও কাজ

ভাবে আর কাজে সম্বন্ধটা খুব নিকট বোধ হইলেও আদতে এ-জিনিস দুইটায় কিন্তু আসমান-জমিন তফাৎ।

ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো, একটা অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র। তাই বলিয়া কাজ মানে যে সৌরভবিহীন পুষ্প, ইহা যেন কেহ মনে করিয়া না বসেন। কাজ জিনিসটাই ভাবকে রূপ দেয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে বস্তুজগতের।

তাই বলিয়া ভাবকে যে আমরা মন্দ বলিতেছি বা নিন্দা করিতেছি, তাহা নহে; ভাব জিনিসটা খুবই ভাল। মানুষকে কব্জায় আনিবার জন্য তাহার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁওয়া দিয়া তাহাকে মাতাইয়া না তুলিতে পারিলে তাহার দ্বারা কোনো কাজ করানো যায় না, বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভাব-পাগল দেশে। কিন্তু শুধু ভাব লইয়াই থাকিব, লোককে শুধু কথায় মাতাইয়া মশগুল করিয়াই রাখিব, এও একটা মস্ত বদ-খেয়াল। এই 'ভাব'কে কার্যের দাসরূপে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভাবের কোনো সার্থকতাই থাকে না। তাহা ছাড়া ভাব দিয়া লোককে মাতাইয়া তুলিয়া যদি সেই সময় গরমা-গরম কার্যসিদ্ধি করাইয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে পরে সে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। অবশ্য, এখানে কার্যসিদ্ধি মানে স্বার্থসিদ্ধি নয়। যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হইতে হইবে। তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। তাঁহাকে একটা খুব মহত্তম উদ্দেশ্য ও কল্যাণ কামনা লইয়া ভাবের বন্যা বহাইতে হইবে, নতুবা বানভাসির পর পলিপড়ার মতো সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদা-ঢাকা পড়িয়া যাইবে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, লোকের কোমল অনুভূতিতে ঘা দেওয়া পাপ। কেননা অনেক সময় অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত ইহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলে। আগে হইতে সমস্ত কার্যের বন্দোবস্ত করিয়া বা কার্যক্ষেত্র তৈয়ার রাখিয়া তবে লোকদিগকে সোনার কাঠির ছোঁওয়া দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নতুবা তাহারা যখন জাগিয়া দেখিবে যে, তাহারা অনর্থক জাগিয়াছে, কোনো কার্য করিবার নাই, তখন মহা বিরক্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িবে এবং তখন আর জাগাইলেও জাগিবে না। কেননা, তখন যে তাহারা জাগিয়া ঘুমাইবে এবং জাগিয়া ঘুমাইলে তাহাকে কেহই

তুলিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা বরং কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভালো, সে-ঘুম ঢোল কাঁসি বাজাইয়া ভাঙানো বিচিত্র নয়।

এ-কথাটা যে একটা মস্ত সত্যি, তাহা এতদিনে আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। এই যে সেদিন একটা হুজুগে মাতিয়া হুড়হুড় করিয়া হাজার কতক স্কুল-কলেজের ছাত্রদল বাহির হইয়া আসিল, কই তাহারা তো তাহাদের এই সৎ সঙ্কল্প, এই মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। কেন এমন হইল? একটা সাময়িক উত্তেজনার মুখে এই ত্যাগের অভিনয় করিতে গিয়া 'স্পিরিট'কে কি বিশ্রী ভাবেই না মুখ ভ্যাঙচানো হইল! যাহারা শুধু ভাবের চোটে না বুঝিয়া না শুনিয়া শুধু একটু নামের জন্য বা বদনামের ভয়ে এমন করিয়া তাহাদের 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট করিল, তাহারা কি দরকার পড়িলে আবার কাল এমনি করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে? আজ যাহারা মুখে চাদর জড়াইয়া কল্যকার ত্যক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার মুখটি চুন করিয়া ঢুকিল, কাল দেশের সত্যিকার ডাক আসিলে তাহারা কি আর তাহাতে সাড়া দিতে পারিবে? হঠকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল বা ভ্রম করিল, তাহারই অনুশোচনাটা তাহারা কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না—বাহিরে যতই কেন লা-পরওয়া ভাব দেখাক না। এখন সত্যিকার ডাক শুনিয়া প্রাণ চাহিলেও সে লজ্জায় তাহাতে আসিয়া যোগদান করিতে পারিবে না। এইরূপে আমরা আমাদের দেশের প্রাণশক্তি এই তরুণদের 'স্পিরিট'টাকে কুব্যবহারে আনিয়া মঙ্গলের নামে দেশের মহা শত্রুতা সাধনই করিতেছি না কি? রাগিবার কথা নয়, এখন ইহা রীতিমতো বিবেচনা-সাপেক্ষ। আমাদের এই আশা-ভরসাস্থল যুবকগণ এত দুর্বল হইল কিরূপে বা এমন কাপুরুষের মতো ব্যবহারই বা করিল কেন? সে কি আমাদেরই দোষে নয়? সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুরমতো সাপুড়ে হওয়া চাই, শুধু একটু বাঁশি বাজাইতে পারিলেই চলিবে না। আজ যদি সত্যিকার কর্মী থাকিত দেশে, তাহা হইলে এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না। ত্যাগী অনেক আছেন দেশে, কিন্তু কর্মীর অভাবে বা তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সত্য সাধনার অভাবে তাঁহারা কোনো ভাল কাজে আর কোনো অর্থ দিতে চাহেন না, বা অন্য কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও রাজী নন। কি করিয়া হইবেন? তাঁহারা তাঁহাদের চোখের সামনে দেখিতেছেন যে, কত লোকের কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে, কল্যাণের নামে আদায় করিয়া বাজে লোকে নিজেদের উদর পূর্ণ করিতেছে। যাঁহারা সত্যিকার দেশকর্মী—সে বেচারারা সত্যি কথা স্পষ্টভাবে বলিতে গিয়া এই সব কর্মীদের কারচুপিতে পুয়ালচাপা পড়িয়া গিয়াছে। বেচারারা এখন ভালো বলিতে গেলেও এই সব মুখোশ-পরা ত্যাগী মহাপুরুষগণ হট্টগোল বাধাইয়া লোককে সম্পূর্ণ উল্টা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে একদম খেলো, ঝুটা ইত্যাদি প্রমাণ করিয়া দেন। সহজ জনসাধারণের সরল মন এ-সব না

ধরিতে পারার দরুন তাহাদের মতো অতি অল্পেই ঐ সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া উঠে। 'দশচক্রে ভগবান ভূত' কথাটা মস্ত সত্যি কথা।

তাহা হইলে এখন উপায় কি? এক সহজ উপায় এই যে, এখন হইতে জনসাধারণের বা শিক্ষিত কেন্দ্রের উচিত, ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড ভালমন্দ জ্ঞান হারাইয়া না ফেলা। ভাব জিনিসটা মদের নেশার চেয়েও গাঢ়। পাঁড়-মাতালরা বলে, 'মদ খাও, কিন্তু তোমায় যেন মদে না খায়।' আমরাও বলিব, ভাবের সুরা পান কর ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না। তাহা হইলে তোমার পতন, তোমার দেশের পতন, তোমার ধর্মের পতন, মনুষ্যত্বের পতন! ভাবের দাস হইও না, ভাবকে তোমার দাস করিয়া লও। কর্মে শক্তি আনিবার জন্য ভাব-সাধনা কর। 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগাইয়া তোল, কিন্তু তাই বলিয়া কর্মকে হারাইও না। অন্ধের মতো কিছু না বুঝিয়া না শুনিয়া ভেড়ার মতো পেছন ধরিয়া চলিও না। নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্মশক্তিকে জাগাইয়া তোল। তোমার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। এ-সব জিনিস ভাব-আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না। কোমর বাঁধিয়া কার্যে নামিয়া পড়িতে হইবে এবং নামিবার পূর্বে ভাল করিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া লইতে হইবে, ইহার ফল কি। শুধু হোড়ের মতো বা উদ্‌মো ষাঁড়ের মতো দেওয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁসড়াইয়া নিজের চামড়া তুলিয়া ফেলা হয় মাত্র। দেওয়াল প্রভু কিন্তু দিব্যি দাঁড়াইয়া থাকেন। তোমার বন্ধন ওই সামনের দেওয়ালকে ভাঙ্গিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে।

আবার বলিতেছি, আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না। আগে ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া দেখ। কার্যের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা অগ্রে বিবেচনা করিয়া পরে কার্যে নামিলে তোমার উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হইবে না। মনে রাখিও, তোমার 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোনো অধিকার নাই। তাই পাপ—মহাপাপ!

Expression and work

The relationship between thought and action seems very close but in reality they are poles apart.

Thought is like fragrance without a flower, just an extra exuberance. That doesn't mean that action is a flowering plant free of fragrance. Action gives rise to thought and it is a materialistic pursuit.

That does not mean we are denigrating `expression' or demeaning it. It is a good pursuit. In our country full of emotional and sensitive people, it will be impossible to rouse them to do anything fruitful unless you are able to touch a chord and arouse their emotions. However, just being immersed in thought and tantalizing people with rhetoric, is wrong. If the `expression' cannot be translated into `action', it is useless. Moreover, during this period of heightened emotions, if people cannot be galvanized into action, then thoughts disappear like a volatile liquid. Here I don't mean `getting work done' as in selfish actualization. One who will mesmerize the audience with emotional expressions or thoughts should behave like a sage, be sacrificial. His aim is to guide the people for their own benefit not for any personal gain. He has to have a very selfless attitude to play the flute and get the audience to dance to his tune, otherwise the people will be swayed in the flood of words and silt will set in their lives which will result in mud and sludge. People say that it is a crime to hit people in their vulnerable spots, often it does more harm than good. It is better to prepare the ground from before and then attempt to rouse the people with the magic wand. If they wake up and find that their efforts are useless, there is really nothing to look forward to or work upon, they will go back to slumber and even if they are aroused again they will never feel like going back to sleep. The sleep of *Kumbhakarna* is better than this, that sleep cannot be broken with the sounds of cymbals and other percussions.

We have stumbled several times before realizing this. Only a few days back some thousand children from various schools and colleges were motivated to take to the streets. However, their efforts had not been channelized for any fruitful gain. I wonder why this happened? Just creating a temporary `high' amongst them and causing them unrest will just snub the `spirit'. Those who have taken advantage of their vulnerability and just for some temporary fame or fear of ill fame have caused havoc to the `spirit'. They shall not get a repeat performance when needed. Those who had pledged themselves wholeheartedly may not be available tomorrow, they may pretend to be nonchalant, but the insult to their enthusiasm is not easily forgotten. Even if they are beckoned again, they may not come and join. They will be reminded of their past experiences and horrors. By quelling the `spirit' of the youngsters of the country aren't we causing them more injury? I'm not getting angry, I am just trying to make sense. The youth of the country is surely its future. Wonder why they behaved like cowards? Isn't it our fault? If we wish to play with snakes, we need to be proper snake-charmers, just playing the flute is not enough. If we really had some genuine workers then we would not have lost the golden opportunity. There are some sages in the country, due to the lack of genuine workers (or due to the presence of `so called' workers) no one wishes to invest money nor do they wish to make any sacrifices. How do we blame them? They are witnessing that the hard earned money of the people is being collected by these so called `workers' and instead of doing something beneficial, they are just amassing wealth. The genuine workers have lost their voice under the thumping of the so- called ones. If they speak out, then the so- called workers point their fingers at them and call them just the opposite, liars, cheats, etc. The audience is often confused by this ruse and become angry at the genuine workers.

So what should we do now? One easy way out is not to be so influenced by the expressions and thoughts preached by so-called workers. The effect of `expressions' is even stronger than alcohol. Drunkards maintain `Have a drink but don't let the drink have you'. I will say the same, `Take the nectar of emotions but do not

lose your senses'. It will result in your failure, your country's failure, failure of your religion as well as failure of humanity. Do not become the servant of emotions, let emotions be your servant. To bring strength to your work, take the help of emotions, expressions, thoughts. Bring out the power of the `spirit' but do not lose your work.

Don't just be blind or be a sheep following the herd. Use your strength and might, this inner strength differentiating you from others, will propel the country towards its freedom. One cannot just be emotional and taken away, one has to be really ready for it and understand the consequences beforehand. If you are like a bull and just brush yourself against the wall, it results in nothing, even the wall stands steadfast without budging an inch. If you intend to break the wall you have to use a shovel to hit the wall at its very foundation.

I mention one more time, do not exist in the world of thoughts, keep your eyes wide open. If you weigh the consequences of your work, then your spirit will not be deterred unnecessarily. Just remember, you have no right to destroy your `spirit' due to the provocation from others. That is called a `sin' , in fact a `great sin'.

Translated by Nashid Kamal

মন্দির ও মস্‌জিদ

'মারো শালা যবনদের!' 'মারো শালা কাফেরদের!'—আবার হিন্দু মুসলমানী কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর মাথা-ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম—তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে,—'বাবা গো, মা গো!'—মাতৃ-পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে!

দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।

মন্দির-মসজিদের ললাটে লেখা এই রক্তকলঙ্ক-রেখা কে মুছিয়া ফেলিবে, বীর? ভবিষ্যৎ তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে!

সেই রুদ্র আসিতেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ঐ মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ভাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের গম্বুজ-তলে লইয়া আসিবেন।

জানি, স্রষ্টার আপনি-মোড়ল 'প্রাইভেট সেক্রেটারি'রা হ্যাট খুলিয়া, টুপি তুলিয়া, টিকি নাচাইয়া আমায় তাড়না করিবে, তবু ইহাদের পতন হইবে। ইহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের এল্‌কোহল পান করিয়াছে।

পুসিফুট জনসন মাতালদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বহু মার খাইয়াছেন।

মুহম্মদকে যাহারা মারিয়াছিল, ঈসা-মুসাকে যে-সব ধর্ম-মাতাল প্রহার করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধর আবার মারিতেছে মানুষকে—ঈসা-মুসা-মুহম্মদের মতো মানুষকে!

যে-সব অবতার-পয়গম্বর মানুষের মার হইতে মানুষকে বাঁচাইতে আসিয়া মানুষের মার খাইয়া গেলেন, তাঁহারা আজ কোথায়? মানুষের কল্যাণের জন্য আসিয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহাদেরই মাতাল পশু শিষ্যেরা আজ মানুষের সর্ব অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠিল।

যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দানখানায়, গীর্জার মড়ধষ-এ বন্দি। মোল্লা-পুরুত, পাদরী-ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডের মতো তাহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।

একস্থানে দেখিলাম, ঊনপঞ্চাশ জন ভদ্র-অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে, আর একস্থানে দেখিলাম, প্রায় ঐ সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মতো মারিতেছে। দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল অসহায় মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে যেমন করিয়া বুনো জংলি বর্বরেরা শূকরকে খোঁচাইয়া মারে। উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত! হিংসায়, কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ!

উহাদের দুই দলেরই নেতা একজন, তাহার আসল নাম শয়তান। সে নাম ভাঁড়াইয়া কখনো টুপি পরিয়া পর-দাড়ি লাগাইয়া মুসলমানদের খেপাইয়া আসিতেছে, কখনো পর-টিকি বাঁধিয়া হিন্দুদের লেলাইয়া দিতেছে, সে-ই আবার গোরা সিপাই গুর্খা সিপাই হইয়া হিন্দু-মুসলমানদের গুলি মারিতেছে! উহার ল্যাজ সমুদ্রপারে গিয়া ঠেকিয়াছে, উহার মুখ সমুদ্রপারের বুনো বাঁদরের মতো লাল!

দেখিলাম, আল্লার মসজিদ আল্লা আসিয়া রক্ষা করিলেন না, মা-কালীর মন্দির কালী আসিয়া আগলাইলেন না! মন্দিরের চূড়া ভাঙিল, মসজিদের গম্বুজ টুটিল!

আল্লার এবং কালীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আকাশ হইতে বজ্রাঘাত হইল না মুসলমানদের শিরে, 'আবাবিলের' প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না হিন্দুদের মাথার উপর।

এই গোলমালের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ছেলে আসিয়া গোঁফ-দাড়ি-কামানো দাঙ্গায়-হত খায়রু মিয়াকে হিন্দু মনে করিয়া 'বল হরি হরিবোল' বলিয়া শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া গেল, এবং কতকগুলি মুসলমান ছেলে গুলি খাইয়া হত দাড়িওয়ালা সদানন্দ বাবুকে মুসলমান ভাবিয়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়িতে পড়িতে কবর দিতে লইয়া গেল।

মন্দির এবং মসজিদ চিড় খাইয়া উঠিল, মনে হইল যেন উহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে!

মারামারি চলিতেছে। উহারি মধ্যে এক জীর্ণা-শীর্ণা ভিখারিনী তাহার সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে। শিশুটির তখনো নাড়ি কাটা হয় নাই। অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে সে যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে আসার প্রতিবাদ করিতেছিল। ভিখারিনী বলিল, 'বাছাকে আমার একটু দুধ দিতে পারছি না বাবু! এই

মাত্র এসেছে বাছা আমার! আমার বুকে এক ফোঁটা দুধ নেই!' তাহার কণ্ঠে যেন বিশ্ব-জননী কাঁদিয়া উঠিল। পাশের একটি বাবু বেশ একটু ইঙ্গিত করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাবা! এই তো চেহারা, এক ফোঁটা রক্ত নেই শরীরে, তবু ছেলে হওয়া চাই!'

ভিখারিনী নিষ্পলক চোখে তাকাইয়া রহিল লোকটার দিকে। সে কি দৃষ্টি! চোখ দুটো তার যেন তারার মতো জ্বলিতে লাগিল। ও যেন নিখিল হতভাগিনী নারীর জিজ্ঞাসা! এমনি করিয়া নির্বাক চোখে তাহারা তাকাইয়া থাকিয়াছে তাহারই দিকে—যে তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। আমি যেন তার দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সে বলিতে চায়, 'পেটের ক্ষুধা এত প্রচণ্ড বলিয়াই তো দেহ বিক্রয় করিয়াও সে ক্ষুধা মিটাইতে হয়!'

যে-লোকটি বিদ্রূপ করিল সে-ই হয়তো ঐ শিশুর গোপন পিতা! সে না হয়, তারই একজন আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু অথবা তাহারই মতো মানুষ একজন ঐ শিশুর জন্মদাতা!

ঐ যে এক আকাশ তারা, উহারা ইহারই মতো দুর্ভাগিনী ভুখারিনীদের চোখ, অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ-তৃপ্ত বিশ্ববাসীকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে।

তিনদিন পরে আবার দেখিলাম, পথে দাঁড়াইয়া সেই ভিখারিনী। এবার তাহার বক্ষ শূন্য। চক্ষুও তাহার শূন্য। যেদিন শিশু ছিল তার বুকে, সেদিন চক্ষে তার দেখিয়াছিলাম বিশ্বমাতার মমতা। অনন্ত নারীর করুণা সেদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার চোখের তারায়, তাই সে সেদিন অমন সিক্ত কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছিল। আজ তাহার মনের মা বুঝি-বা মরিয়া গিয়াছে তাহার শিশুর সাথে! আজও সে ভিক্ষা চাহিতেছে, কিন্তু আর সে কাতরতা নাই তাহার কণ্ঠে, আজ যেন সে চাহিবার জন্যই চাহিতেছে!...

আমায় সে চিনিল। আমি সেদিন তাহাকে আমার ট্রাম ভাড়ার পয়সা ছয়টি দিয়াছিলাম।—ভিখারিনীর শুষ্কচক্ষে হঠাৎ অশ্রুপুঞ্জ দুলিয়া উঠিল! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোর ছেলে কোথায়?' সে ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। তাহার পর একটু থামিয়া আমায় বলিল, 'বাবু, আমার সাথে একটু আসবেন?' আমি সাথে সাথে চলিলাম।

পথের ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছ। তারই পাশে ডাস্টবিন। শহরের যত আবর্জনা জমা হয় ঐ ডাস্টবিনে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভিখারিনী ডাস্টবিনের অনেকগুলো আবর্জনা তুলিয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো কি একটা যেন তুলিয়া লইয়া 'যাদু আমার সোনা আমার' বলিয়া উন্মাদিনীর মতো চুমা খাইতে লাগিল।

এই তাহার খোকন।—এই তাহার যাদু, এই তাহার সোনা! ভিখারিনী ইহার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর শিশুটিকে আবার ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, 'বাবু, ঐ পয়সা কয়টি দিয়ে সেদিন একটা খারাব-হয়ে-যাওয়া বার্লির টিন কিনেছিলুম। এ-কয়দিন দিয়েছি ঠাণ্ডা জলে গুলে শুধু ঐ পচা বার্লি, আমিও খেয়েছি একটু করে—যদি আমার বুকে দুধ আসে! দুধ এল না এই হাড়-চামড়ার শরীরে! এক ফোঁটা দুধ পেলে না বাছা আমার, এই তিন দিনের মধ্যে! শেষে আর বার্লিও দিতে পারলুম না, আজ সে চলে গেল! ভালই হয়েছে, বাছা আমার এবার খুব বড় লোকের ঘরে জন্মায় যেন। একটু পেটে দুধ খেয়ে বাঁচবে!'

চলে গেল ভিখারিনী আবার ভিক্ষা মাগতে!

ডাস্টবিন হইতে ভিখারিনীর পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আমি চলিলাম গোরস্থানের দিকে।...

কাল এমনি করিয়া প্রতি বৎসর বাংলার দশ লক্ষ সন্তানের মরা লাশ বুকে ধরিয়া চলিতেছে শ্মশানের পানে, গোরস্থানের পথে।

যাইতে যাইতে দেখিলাম, সেদিনো মন্দির আর মসজিদের ইট-পাথরের স্তূপ লইয়া হিন্দু-মুসলমান সমানে কাটাকাটি করিতেছে।

শিশুর লাশ-কোলে আমি বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শিশুর লাশ যেন একটা প্রতিকার প্রার্থনা, একটা কৈফিয়ত তলবের মতো দেখাইতে লাগিল। ধর্ম-মদান্ধদের তখন শিশুর লাশের দিকে তাকাইয়া দেখিবার অবসর ছিল না! তাহারা তখন ইট-পাথর লইয়া বীভৎস মাতলামি শুরু করিয়া দিয়াছে!

এমনি করিয়া যুগে যুগে ইহারা মানুষকে অবহেলা করিয়া ইট-পাথর লইয়া মাতামাতি করিয়াছে। মানুষ মারিয়া ইট-পাথর বাঁচাইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-জননী তাহার দশ লক্ষ অনাহার-জীর্ণ রোগশীর্ণ অকালমৃত সন্তানের লাশ লইয়া ইহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই! ইহারা মানুষের চেয়ে ইট-পাথরকে বেশি পবিত্র মনে করে! ইহারা ইট-পূজা করে! ইহারা পাথর-পূজারী!

ভূতে-পাওয়ার মতো ইহাদেরে মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদেরে মসজিদে পাইয়াছে! ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে!

যে-দশ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎসর মরিতেছে শুধু বাংলায়,—তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ—স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি!

মানুষের কল্যাণের জন্য ঐ-সব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য

মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠে—যাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গমর্ত্যের সেতু—তবে ভাঙ্গিয়া ফেল ঐ মন্দির-মসজিদ! সকল মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচুক এক আকাশের ছত্রতলে, এক চন্দ্র-সূর্য-তারা-জ্বলা মহামন্দিরের আঙ্গিনাতলে!

মানুষ তাহার পবিত্র পায়ে-দলা মাটি দিয়া তৈরি করিল ইট, রচনা করিল মন্দির-মসজিদ। সেই মন্দির-মসজিদের দুটো ইট খসিয়া পড়িল বলিয়া তাহার জন্য দুই শত মানুষের মাথা খসিয়া পড়িবে? যে এ কথা বলে, আগে তাহারই বিচার হউক।

দুইটা ইটের ঋণ যদি দুই শত মানুষের মাথা দিয়া পরিশোধ করিতে হয়, তবে বাঙালি জাতির যে এই বিপুল দেহ-মন্দির হইতে দশ লক্ষ করিয়া মানুষ খসিয়া পড়িতেছে প্রতি বৎসরে শোষণ-দৈত্যের পেষণে, এই মহা-ঋণের পরিশোধ হইবে কত লক্ষ মানুষের মাথা দিয়া?

মন্দির-মসজিদের চূড়া আবার গড়িয়া উঠিবে এই মানুষেরই পায়ে-দলা মাটি দিয়া, পবিত্র হইয়া উঠিবে এই মানুষেরই শ্রমের পবিত্রতা দিয়া; শুধু তাহারাই আর ফিরিয়া আসিবে না, যাহারা পাইল না একটু আলো, একটু বাতাস, এক ফোঁটা ওষুধ, দু'চামচ জল-বার্লি! যাহারা তিলে তিলে মরিয়া জাতির হৃদয়হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে! যাহাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়া সমগ্র জাতি মরিতেছে তিলে তিলে!

আমি ভাবি, যখন রোগ-শীর্ণ জরা-জীর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট বিবস্ত্র বুভুক্ষু সর্বহারা ভুখারিদের দশ লক্ষ করিয়া লাশ দিনের পর দিন ধরিয়া ঐ মন্দির-মসজিদের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তখন খসিয়া পড়ে না কেন মানুষের ঐ নিরর্থক ভজনালয়গুলো? কেন সে ভূমিকম্প আসে না পৃথিবীতে? কেন আসে না সেই রুদ্র—যিনি মানুষ-সমাজের শিয়াল-কুকুরের আড্ডা ঐ ভজনালয়গুলো ফেলবেন গুঁড়িয়ে? দেবেন মানুষের ট্রেডমার্কার চিহ্ন ঐ টিকি-টুপিগুলো উড়িয়ে?

মন্দির-মসজিদের সামনে বাজনা বাজাইলে হয় তার প্রতিকার, আসে তার জন্যে মুদ্রা হাজার হাজার, আসে তার জন্য ছপ্‌পর ফুঁড়িয়া নেতার দল—গো-ভাগাড়ে শকুনি পড়ার মতো!—শুধু দশ লক্ষ লাশের আর প্রতিকার হইল না!

মানুষের পশু-প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্ম-মদান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল।

সকল কালে সকল দেশে সকল লাভ-লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাংলার তরুণের দল—ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক ভাইরা, ঐ দশ লক্ষ অকালমৃতের লাশ তোমাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া! তারা প্রতিকার চায়!

তোমরা ঐ শকুনির দলের নও, তোমরা আগুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই।

তোমরা আলোর, তোমরা গানের, তোমরা কল্যাণের। তোমরা বাহিরে এস, এই দুর্দিনে তাড়াও ঐ গো-ভাগাড়ের পড়া শকুনির দলকে!

আমি শুনিতেছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা এক সাথে উত্থিত হইতেছে উর্ধ্বে —স্রষ্টার সিংহাসনের পানে। আমি দেখিতেছি, সারা আকাশ যেন খুশি হইয়া উঠিতেছে।

The Temple and The Mosque

[Nazrul Islam is a Bengali poet whose voice and pen stirred millions of Bengalis, Hindus as well as Muslims like Nazrul, to defy the foreign occupation of the British. Nazrul has lived for many years now in Calcutta, his health broken, unable to speak, a living shell of the fiery rebel he was in his reckless youth. The results was of his ceaseless demands for liberation and justice are to be seen outside India, east of Calcutta, in the fact that the Muslim peasants of East Bengal chose to join the Muslims of the Punjab and other western provinces in a single state of Pakistan.

This fact is ironic though not surprising if we recall the context. The Muslim peasants of Bengal and their forebears for generations had endured the exploitation of imperial masters, the Mughals or the British, and local landlords and money-lenders, mostly Hindus. As independence approached there emerged the fear that democracy would leave the Muslims a relatively weak minority in the new India which would be dominated politically as well as economically by the Hindus. This prospect was viewed as no freedom at all by those Muslim leaders who were urging that the aspirations of the Bengali Muslim peasants be merged with demand being voiced by economically and militarily more powerful Muslims in the western and northern parts of British India. That demand, heralded, incidentally, by another poet, Muhammad Iqbal, was for a seperate independent state for Muslims, what since has come into being as the Islamic Republic of Pakistan.

The irony—and, as it now appears, the tragedy—of the Bengali Muslims' decision to join with the Punjabis and the others in the single Muslim state becomes evident when read a bit of Nazrul Islam, the prophetic voice of the Muslims of Bengal. Nazrul wrote and sang tirelessly for the liberation of all humanity, not just the Muslims; he challenged vested interests whatever their type political or religious, foreign or domestic, Hindu, Muslim, Christian or whatever the mock behind which Satan might instigate fanatic violence. Yet the audience and the historical scene to which he spoke channeled into an equally passionate surge toward the ideal of a separale state for Muslims. But in opting for the separate Muslim state the Bengali Muslims retained. I think, much of the iconoclastic prophetic spirit of Islam that is found in Nazrul's searing essay— 'The Temple and the Mosque'. There is reason to believe that the typical Bengali Muslim's ideal of a Muslim state is one that is constitutionally quite open and tolerant of non-Muslim participation, that is in significant respects secular in form, but a state that gives voice and teeth to the divine injunctions of justice, care of the poor, and destruction of exploitation and idolatry that load to human degradatiion.

The typical ideal of the Muslim state brought by the Punjabis and some of the other groups comprising West Pakistan is quite different, and in fact is deeply divided into two types. The one is quite westernized. It favors a great deal of modernization, economic development, and relaxation of social customs. It is not in principle incompatible with the more prophetic humanistic aspirations of the Bengali Muslims. In practice however, the strategy of economic development adopted by this ruling elite has called for holding back the Bengali wing of the country while building up fast the more easily tapped resources of West Pakistan. The outcome of this strategy; whatever its motives, has, of course, run directly counter to the Bengali demand for an end to exploitation be it by Hindus, Europeans or Punjabi Muslims.

The ideal of the Muslim state shared by the bulk of the West Pakistani population, at least until the recent emergence of leftist partie's into prominence there, has been redically different from that of the bengali rebels and modernising elite. It calls for revival of precisely those values, norms and procedures set out concretely in the revealed Qur'an in or in the precedents set by the seventh century arabian Muslims. This ideal calls for an islamic state that explicitly incorporates the revealed law into its constitution and legislation. And the ideal is such that any action against the state is viewed as an offense against God. The rebel is an apostatce, one who has broken faith, or in current Pakistani parlance, a 'miscreant'. In the eyes of the west pakistani revivalists, the readiness of Bengali Muslims to frat crnize with their Hindu neighbours, to enjoy Bengali literature written by non-Muslims, to espouse Six pointas for autonomy which make no mention of special safeguards for Islam can be seen as treachery and backsliding, as being duped by the Hindu minority who are cast in the role of an Indian fifth column. For the Bengali Muslim on the other hand such accommodation with neighbours who share the same language and culture is all considered quite normal and within the bounds of an acceptable understanding of Islam, a religious faith that is supposed to effect brotherhood and liberation.

I have translated Nazrul Islam's “Mandir o Masjid” to provide an illustration of the intensity of the Bengali passion for justice and rebellion, for a radical humanism that in its iconoclasm stops short of denying God, but which unleashes a savage critique of those institutions which claim to link God and man, but tend in practice to imprison God. The skull-cracking of a generation ago between Bengali Muslims and Bengali Hindus is not, to the best of my knowledge, a major factor in the present exodus of refugees from East Bengal. Such communal fanatism as Nazrul excoriated has been remarkably absent within India where millions of Muslims would be in jeopardy should the admirable restraint of there months even give way to reprisal for what the Punjabi Muslim's have one. But the eyes of helpless Bengali mothers watching there infants diearc piercing more desperately than ever.]

'Kill the damn foreigners'. 'Kill the danin infidels' The Hindu Mussulman affair has broken out again. First verbal abuse began, then the cracking of skulls. But I have noticed that those who so long have been screaming madly about saving the 'prestige' of Allah or of Mother Kali, quit mentioning the name of Lord Allah or Queen Kali when violence turns upon them. Then Hindus and Muslims living side by side give out the same cry of pain, 'O Father! O Mother!' Like two children of different roligions abandoned by their mothers they cry for their mothers in the same words.

I have noticed that amid the cries of those struck dead the mosque did not stir nor did the stone deity of the temple respond. Their sanctuaries simply remained for a long time polluted with the blood of foolish men.

O Hero, who will wipe away the bloody mark of disgrace that is written on forehead of mosque and temple?

For that the future stands ready.

That Rudra [Rudra is a Hindu nane for God as destroyer of the world at the end of each acon.] is coming to destroy these temples. mosques and churches, these dons of religious madman, and assemble all mankind beneath the one dome of heaven.

I know that the self-appointed private secretarics of the Creator will threaten me as they doff their hats, raise their caps and wave their tufts of hair, but their fall will come. They are drunk with religion [Dharma].They do not drink the light of truth; they have imbibed the alcohol of texts.

Marching against the madmen of pussyfoot johnson, many got themselved killed [Presumable a British offier].

Of those who attached Muhummad and of all those craked with religion who tormented jesus and Mosus the descendants now are attacking humanity, humanity like Jesus and Moses and Muhammad.

Where Today are all those avataras [Descents. Divine incarnations] and prophets who came to free humanity from violence and have undergone violence? Today the disciples even

of those who came to do good to humanity have sprung up like animals solely for the harm of mankind.

He, the God of all mankind. today is the prisoner of the temple's dungeon, the mosque's lockup, the church's jail. *Molla*. priest, padre and monk keep watch over Him like. wardens of a prison. [*Molla et. al.* are Muslim. Hindu, Christian. and Buddhist religious specialists respectively.

On one occasion I saw fifty-one Hindus, educated and uneducated alike, together give a merciless beating to an emaciated Muslim day laborer and elsewhere I have seen almost as many Muslims together beating a single weak Hindu as if he were an animal. At the hands of two groups of beasts weak and helpless mankind is being brutalized. They are tormenting humanity like savages of the jungle as they hunt and kill the boar. The face of each is more terrifying than Satan's uglier than the boar's. The stench of endless hells is in their bodies thanks to their foul brutality.

There is a single leader for both these groups, his name is Satan. Hiding his name he sometimes puts on the cap and wears a beard and incites the Muslims. Sometimes wearing a tuft of hair he inflames the Hindus. And again in the guise of white soldiers or gurkha soldiers he fires upon the Hindus and Mussulmans with bullets. His tail reaches across the sea. His face is sed like the savage ape across the sea [The British].

I have noticed that Allah did not come to salvage the mosque of Allah. Nor did Mother Kali come to guard her temple. The pinnacle of the temple broke off: the dome of the mosque cracked. There was not the least sound from Allah and Kali. No bolt of lightning crashed from heaven upon the head of the Mussulman. No shower of baked clay fell on the heads of the Hindus. [Reference to the Qur'an 105.4] In the midst of the uproar several Hindu lads thought that Khayru Mina, killed in the battle, was a Hindu, because his moustache and beard were shaven off. Singing 'Bol Hari, Hari bol'

Hindu prayer at funeral. 'say Hari (God)'

They carried him to the cremation grounds for burning. Several Mussulman lads thnk that Sadanand Babu, who wore a beard, was a Musulman killed by bullets. Reciting " La'ilaha 'Illa 'Llah'. [There is no god but God' a muslim prayer.] they took him for burial. Temple and mosque began to crack, I suspect because glancing at one another they were laughing.

The fighting goes on, in the midst of it a worn out thin begging woman holds at her breast a new born infant as she begs a penny in alms. The infant's umbilical cord is not cut. It is as though in his weak helpless voice he is protesting, arrival in this world of suffering. The begging woman says, Sir, I am unable to give milk for my child. My child has just been born. There is not a drop of milk in my breast.' It is as though the mother of the universe cries out in her vioce. Off to the side a man gestures and speaks up in a mocking voice. 'sir what a sight, There's not a drop of blood in her body, yet she wants a child!' The begging woman remains staring toward the man with unblinking eyes. What a stare! Her two eyes begin to glow like stars. As if concentrating in these silent eyes the accusation of all woman left helpess she stares at the one who had caused her downfal. I could surmise the meaning of her gaze. She wished to say 'The hunger in my stomach is so great that I sell my body for less than it takes to satisfy the huger This man who was mocking is perhaps himself the unknown father of this child. If not, then some friend or relative or some other person like him is the child's father. This is the way Sita, abandoned by Rama had begged in the forests, clutching Lava and Kusha to her breast. [Sita et. al. are personages in the sacred Hindu epic, the Ramayanal. The stars of the one sky are the eyes of unfortunate victims of hanger like her. forever questioning the inhabitants of the world whose hunge. is satisfied.

Three days later I saw the same begging woman standing by the road. This time her breast was empty, her eyes too were empty. On the day when the child was at her breast I had seen in her eyes the affection of the universal mother. The accumulated love of countless women that day had welled up in the pupil of her eye: thus on that day she had been begging with such an earnest moise voice. This day, I supposed the mother in her heart

was dead together with her infant. This day also she begged for alms, but that earnestness was no longer in her voice. This day she seemed to beg just for the sake of begging.

She recognized me. That other day I had given her my six cents tram fare. In the begging woman's dry eyes suddenly a flood of tears welled up. I asked, 'Ware is your child?' She indicated by pointing upwards with her finger. Then after a moment's silence she said, 'Sir, will you come with me a bit?' I walked along with her. By the side of the road there is a Krishnacura tree. Next to it is a dustbin. All the city's refuse is piled up in this dustbin. I began to tremble. The begging woman moved a lot of rubbish in the dustbin and lifted up something wrapped in soiled rags and saying 'My darling. My Shona,' began to kiss it like a mad woman. This was her child, this her darling, her 'Shona'. [Shona is a proper name meaning 'golden'.] The begging woman stood motionless for a little while, then depositing the baby again in the dustbin she started to speak. 'Sir, the other day I took the several cents and bought a can of barley that was going bad. These few days I have given the baby only cold water with the spoiled barley mixed in. I ate a little myself too, to bring milk to my breast. No milk came to this body of skin and bones. My baby did not get a drop of milk during these three days. Finally I was unable to give even any barley; today he went. It was just as well, if my baby is born again into a very rich man's house he will get a little milk into his stomach and live.' The begging woman walked off to beg for alms.

Taking up the begging woman's baby from the dust bin, I went off toward the burial ground carrying him at my breast. Time, in the same way every year carries off toward the cremation ground or down the road to the cemetery the dead bodies of one million children of Bengal.

Going along I noticed on that day too that the Hindus and Mussulmans were attacking each other equally with the piles of bricks and stones from the temple and the mosque. With the baby's corpse at my side I stood there for a long time. The infant's corpse began to appear as a prayer for retribution, a demand for explanation. But there was no opportunity then for those blinded

with the intoxication of religion to look toward the baby's corpse; they had begun the frightful orgy of brick and stones. So it is that time after time they ignore humanity while getting excited over brick and stones. Killing humans they stockpile brick and stone. Year after year the mother of Bengal walks past them bearing the bodies of her million children. withered from lack of food, emaciated by disease, prematurely dead. They do not so much as notice. They think brick and stone much purer then humanity. They worship brick. They are devotees of stone. Their temple has possessed them like an evil spirit, and mosque likewise. They shall have to suffer much.

Those million humandying every year in Bengal alone are not simply Hindus, not simply Mussulmans; they are humans, the Creator's favorite creation. It is for the good of mankind that these places of worship are constructed. Man is not created for the sake of the places of worship. If today on account of our madness those very places of worship which were intended as a causeway between heaven and earth, become the cause of harm to mankind, then destroy the temple and the mosque. Let all humanity come and stand beneath the single canopy of the sky, in the courtyard of the one great temple illumined by the moon and sun and stars.

Man forming bricks from clay pressed by his holy feet, has fashioned temple and mosque. If a couple of bricks have fallen from the temple and the mosque, must the heads of two hundred humans foil on that account? Whoever would say 'Yes' should first consider. If the debt for two bricks is to be absolved by the heads of two hundred humans, then how many millions of heads will be needed to absolve this great debt, the million humans yearly falling from the vast temple-body of the Bengali poeple into the mortar and pestle of oppression? The pinnacles of the temple and the mosque will rise again from the clay pressed by the feet of humanity. Only they will never rise who failed to get a little light, a little breeze, a drop of medicine, two spoonsfull of barley-water. As they die bit by bit as a penance for the meanness of heart of the race, the whole race dics bit by bit in their death.

I wonder why, when the corpses of the million victims of hunger who are wasted by disease, dried up with fever, pained by lack of food, wanting clothing, hungry, having lost everything, go past the mosque and temple day after day, why do not then these houses of worship, useless to mankind, disintegrate? Why does no tremor strike the earth? Why does the Rudra not come to pulverize these houses of worship, these dons of dogs and jealots who prey upon human societys and to scatter these tufts of hair and these human trademarks? The temple and mosque will be restored by playings music in front of them. For that there will come thousands of coins, for that there will come tumbing in a host of bigshots like the decent, vultures where lies a cow's carcuss. Only for the one million dead bodies will there be no restoration. Taking advantage of the bestial aspects of humanity by stirring up these blinded with religious intoxication, how many base persons today have become bigmen !

In every country in every age the youth overcome all gain and greed. O company of youth of Bengal, O my brothers unafraid to play with fire, look at the hundred thousand corpses of those dead before their time standing at your door. They seek redress. You are not a flock of vultures. You are the flame of fire. You bearmo prejudice. You are of the light, you are of song, you are of happiness. Come out this evil day, attack the swarm of vultures descending upon the cow's carrion. I hear the mosque's call to prayer and the sounding conch shell in the temple. They rise up in unison toward the Creator's throne above. I can see the whole sky growing joyful.

Translated by Josheph T. O. Connell

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা

[১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।]

আজ আপনাদের কাছে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে আগে মনে হচ্ছে কবির একটা লাইন,—'ঝড় আসে নিমিষের ভুল!' সেদিনের পশ্চিমে-ঝড় যখন এসেছিল বদ্ধ দ্বারের জিঞ্জিরে নাড়া দিতে, সেদিন যখন সে বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে গেয়েছিল—

'কারাগারে দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে?
আপনি তুমি ভেতর থেকে
চেপে আছ দ্বারখানা।'

তখন আপনারা তাকে বরণ করেছিলেন খাঞ্চা-ভরা সওগাত, রেকাবি-ভরা শিরনি দিয়ে, শিরিন নজরের নজরানা দিয়ে। আপনাদের হাতের ফুলে তার কণ্ঠের নীল বুকের কাঁটা ঢাকা পড়ে গেছিল। আপনাদের শিরোপার ভারে তার শির সেদিন আপনি নুয়ে পড়েছিল। সে-বার শুধু যে তার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করা ছাড়া প্রতিদানে কিছুই দিয়ে যেতে পারেনি।

আজ সে আবার এসেছে সেই পরিচিত দুয়ারে ফুলের লোভে নয়, মালার আশায় নয়, তার স্মরণতীর্থ জিয়ারত করতে। সেবারে সে বলেছিল—

খুলব দুয়ার মত্ত বলে,
তোদের বুকের পাষাণ-তলে
বন্দিনী যে ঝর্নাধারা
মুক্তি দেবো মুক্তি তায়।

হারিয়ে গেছে দোরের চাবি,
তাই কেঁদে কি লোক হাসাবি?
আঘাত হেনে খুলব দুয়ার,
আয় যাবি কে সঙ্গে আয়।
দ্বারের মায়া করে তোরা

বন্দি রবি নিজ কারায়?
নাই কো চাবি, হাত আছে তোর,
খুলব দুয়ার তার সে ঘায়।

সেই ঝড় আবার এসেছে—হয়তো বা তেমনি নিমেষের ভুলেই। এবার সেই ঝোড়ো হাওয়া 'পুবের হাওয়া' হয়ে। তার রূপ সুর দুই-ই হয়তো বদলে গেছে। আজ হয়তো সে বলতে চায়—

'ঘা দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান গেয়ে দ্বার খোলাবো।'

সেবার যে এসেছিল তরবারির বোঝা নিয়ে, এবার সে এসেছে ফুল ফোটানোর মন্ত্র শিখে।

এমনই হয়। ফাল্গুনের মলয়-সমীর বৈশাখে দেখা দেয় কালবৈশাখী-রূপে, শ্রাবণে সে-ই আসে পুবের হাওয়া হয়ে। হৈমন্তীর আঁচল ভরে ওঠে তারি শিশিরাশ্রুতে, আঁচল দুলে ওঠে তারই হিমেল হাওয়ায়। পউষে তারি দীর্ঘশ্বাস পাতা ঝরায়।

* * *

ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়তো আমার হাতে বোঝা, কিন্তু তাই বলে তাকে আমি ফেলেও দেইনি। আমি গোধূলি বেলায় রাখাল ছেলের সাথে বাঁশি বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলিয়ে আজান দেই, আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবার নিয়ে রণভূমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন আমার খেলার বাঁশি হয়ে ওঠে যুদ্ধের বিষাণ, রণশিঙ্গা।

সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে — সেই অসুরের জন্য।

কিন্তু কিছু বলবার আগে আমি স্মরণ করি সেই বিরাট পুরুষকে যার কীর্তি শুধু তাঁকে মহিমান্বিত করেনি, আপনাদের চট্টলবাসী মুসলমানদের—তথা বাংলার সারা মুসলিম সমাজকে নর-নারী-নির্বিশেষে মহিমান্বিত করেছে। তিনি আপনাদেরই এবং আমাদেরও পুণ্যশ্লোক মরহুম খানবাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব। শাহজাহানের তাজমহল গড়ে উঠেছিল শুধু মমতাজের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে—তাজমহল সুন্দর। কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র করে। এ তাজমহল শুধু beautiful নয়, এ sublime মহিমাময়!

ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁকে জানবার সুবিধা পাইনি। চাঁদ দেখিনি, কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার দেখেছি। জোয়ার শুধু পূর্ণিমার চাঁদই জাগায় না, মৃত্যুর অমাবস্যার অন্তরালে ঢাকা পড়ে যে চাঁদ — সেও জোয়ার জাগায়। তাঁকে দেখিনি কিন্তু তাঁকে

অনুভব করেছি এবং আজো করছি আপনাদের জাগরণের মাঝে—আমাদের নারী-জাগরণের উদয়-বেলায়।

এমনি করে এক একটা সর্বভোলা সর্বত্যাগী মানুষ আসে আমাদের মাঝে। আমাদের স্বার্থের কালো চশমা দিয়ে তখন তাঁকে দেখি মলিন করে, তাঁকে বলি, হয় পাগল নয় স্বার্থপর। কোকিল যখন আসে বাগে বাহারের খোশ-খবরি নিয়ে, কর্তব্যপরায়ণ কাক তখন দল বেঁধে তাকে তাড়া করে। তার গানকে তারা মানে করে উৎপাত। অভিমানী কোকিল বসন্ত শেষে উড়ে যায় নতুন বুলবুলিস্তানের সন্ধানে, তখন সারা কানন জুড়ে জাগে বিরাট একটা অভাববোধ, পেয়ে হারানোর তীব্র বেদনা।

পাখি উড়ে যায়—তারপর আসে সেই সুদিন যার আগমনী গান সে গেয়েছিল। তখন সেই সুদিনের সুন্দর আলোকে স্মরণ করি সেই সকলের-আগে-জাগা গানের পাখিকে। কিন্তু পাখি তখন থাকে না কো, থাকে পাখির স্বর।

আমি তাঁরই মতো গানের পাখি—আপনাদের এই স্মরণ-বেলায় আমিও এসেছি তাই তীর্থযাত্রী হয়ে তাঁকেই স্মরণ করতে—যিনি আমাদের বহু আগে জেগেছিলেন। তাঁর পাক কদমে আমার হাজার সালাম।

তিনি আজ আমার সালাম নিবেদনের বহু ঊর্ধ্বে, বহু দূরে; তবু এ ভরসা রাখি যে আমার এই অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া ফুল তাঁর চরণ ছুঁয়ে ধন্য হবেই। আমি জানি, এ বিশ্বে কোনো কিছুই নশ্বর নয়, কোনো কিছুই হারায় না কোনোদিন। যে-রূপে যে-লোকেই হোক তিনি আছেন এবং আমার এই ভাসিয়ে দেওয়া সালামি-ফুলও সেই না জানার অকূলে কূল পাবেই পাবে।

আমরা বড় কাউকে যখন হারাই, তখন তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি — তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর সাধনাকে শ্রদ্ধা করে, তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে। যে বিরাট আত্মার নৈকট্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, তার দুঃখ বহু পরিমাণে ভুলতে পারব, যদি তাঁরই অসমাপ্ত সাধনাকে আমাদের সাধনা বলে গ্রহণ করতে পারি। চট্টলের 'আজিজ' নাই, কিন্তু বাংলার আজিজেরা—দুলাল ছেলেরা আজো বেঁচে আছে—তাদেরই মধ্যে তাঁকে ফিরে পাব পরিপূর্ণরূপে, এই হোক আপনাদের—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাধনা! এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই।

তাঁর কাজ তিনি করে গেছেন। তাঁর 'বাহারে'র মতো বাহার হয়তো বা থাকতেও পারে, কিন্তু তাঁর 'নাহারে'র মতো নাহার আপনাদের চট্টলের মুসলমানের ঘরে কয়টি আছে আমার জানা নেই।

তিনি সুর ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, এখন একে 'সমে' পৌঁছে দেওয়া আপনাদের কাজ। উস্তাদ নেই, শিষ্যরা তো আছেন। একজন উস্তাদের অভাব কি শত শিষ্যেও পূরণ করতে পারবে না?

বন্ধু-বান্ধব অনেকের কাছেই শুনেছি আপনাদের উস্তাদের লক্ষ্য ছিল অসীম, আশা ছিল বিপুল, আকাঙ্ক্ষা ছিল বিরাট।

সাগর যাদের চরণ ধোয়ায়, পর্বতমালা যাদের শিয়রের বিনিদ্র প্রহরী, নদী-নির্ঝরিণী যাদের সেবিকা, অগ্নিগিরি যাদের বুকের ওপর, উচ্ছল জলপ্রপাত যাদের অবিনাশী প্রাণধারা, কানন-কুঞ্জ যাদের শ্রী-নিকেতন, বন্য-হিংস্র শার্দুল-সর্প যাদের নিত্য সহচর, তারা সেই মহান পুরুষের বিরাট দায়িত্বকে গ্রহণ করতে ভয় করে একথা আর যে বলে বলুক, আমি বলব না।

* * *

আপনাদের শিক্ষা-সমিতিতে এসেছি আমি আর একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সে হচ্ছে, আপনাদের সমিতির মারফতে বাংলার সমগ্র মুসলিম সমাজের বিশেষ করে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে,—আমি যে মহান স্বপ্ন দিবা-রাত্রি ধরে দেখছি,—তা-ই বলে যাওয়া। এ স্বপ্ন যে একা আমারই তা নয়। এই স্বপ্ন বাংলার তরুণ মুসলিমের, প্রবুদ্ধ ভারতের, এ স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর নব-নবীনের। আমি চাই, আপনাদের এই পার্বত্য উপত্যকায় সে স্বপ্ন রূপ ধরে উঠুক।

আমি চাই, এই পর্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুসলিম, যেমন করে শীতের শেষে বেরিয়ে আসে জরার খোলস ছেড়ে বিষধর ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব অভ্যুদয়-দিনে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলুক আমার নিদ্রোত্থিত ভাইরা।

আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্য হোক, আদাওতি করে আসন জয় করা নয়—দাওত দিয়ে মনের সিংহাসন অধিকার করা।

আপনাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান—আরফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থ-যাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না—ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব—এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্য পানেই তুলে ধরেছি এতোদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি সমুদ্র বেশি দূরে নয়, আমাদের এ-লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে! আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মতো আমাদেরও

কালচারের, সভ্যতার, জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন—আমাদের মতো শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মতো করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্যি সত্যিই বুলবুলিস্তানে পরিণত হোক—ইরানের শিরাজের মতো। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমি, জামি, শমশি-তবরেজ এই শিরাজবাগে—এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদ্‌কির মতো আপনাদের বদ্ধ প্রাণধারাকে মুক্তি দিন।

আমি এইরূপ 'কালচারাল সেন্টারের' প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে। একটি কারণ তার রাজনৈতিক।

পলিটিক্সের নাম শুনে কেউ যেন চমকে উঠবেন না। আমি জানি, আপনাদের এই সমিতি রাজনীতি আলোচনার স্থান নয়, তবু যেটুকু না বললে নয়, আমি শুধু ততটুকুই বলব এবং সেটুকু কারুর কাছেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে না। আমি তাই একটু খুলে বলব মাত্র।

ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি—শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে—তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের অপরিচ্ছন্ন অশিক্ষিত কৃষাণ-মজুরদের—(আর, তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে বেশি) দেখে মনে করে, মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া। হয়তো বা এরা যথা পূর্বম্ তথা পরম্। দরিদ্র মূর্খ কালিমদ্দি মিয়াই তার কাছে এ্যাভারেজ মুসলমানের মাপকাঠি।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে-সংগীতে সাহিত্যে মুসলমানের বিরাট দানের কথা হয় তারা জানেই না, কিংবা শুনলেও আমাদের কেউ তাদের সামনে তার সত্যকার ইতিহাস ধরে দেখাতে পারে না বলে বিশ্বাস করে না; মনে করে—ও শুধু কাহিনী। হয়তো একদিন ছিল, যখন হিন্দুরা মুসলমানদের অশ্রদ্ধা করত না। তখন রাজভাষা state language ছিল ফার্সি, কাজেই হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে ফার্সি শিখতেন—এখন যেমন আমরা ইংরেজি শিখি। আর ফার্সি জানার ফলে তাঁরা মুসলমানদের

বিশ্বসভ্যতায় দানের কথা ভালো করেই জানতেন। কাজেই সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ আসার পূর্ব পর্যন্ত কোন মুসলমান নওয়াব বাদশার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও সমগ্র মুসলমান জাতি বা ধর্মের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেননি। শিবাজি প্রতাপ যুদ্ধ করেছিল আওরঙ্গজেব আকবরের বিরুদ্ধে, মুসলমান ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নয়। তখনকার সেই অশ্রদ্ধা ছিল ব্যক্তির বিরুদ্ধে person এর against এ— গোষ্ঠীর বা সমগ্র জাতটার ওপর একেবারেই নয়।

কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, আমরা সবচেয়ে কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম করে জানি। আমরা ইংরাজের কৃপায়, ইংরাজি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, চেক, স্ক্যানডিনেভিয়ান, চিন, জাপানি, হনলুলু, গ্রিনউইচের ভাষা জানি, ইতিহাস জানি, তাদের সভ্যতার খবর নিই, কিন্তু আমারই ঘরের গায়ে গা লাগিয়ে যে প্রতিবেশীর ঘর তারই কোনো খবর রাখিনে বা রাখার চেষ্টাও করিনে। বরং ঐ না জানার গর্ব করি বুক ফুলিয়ে। একেই বলে বোধ হয়, Penny wise pound foolish!

হিন্দু আরবি, ফার্সি, উর্দু জানে না, অথচ আমাদের শাস্ত্র-সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছুর ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবিদের মতই ঐ তিন ভাষার হেরেমে বন্দি। বিবিদের হেরেমের প্রাচীর বরং একটু করে ভাঙতে শুরু হয়েছে, ওদের মুখের বোরকাও খুলছে, কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীর বা বোরকা-মুক্ত হল না আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের দানের মহিমা। অতএব, অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমাদের কোনো কিছু জানে না বলে দোষ দেবার অধিকার আমাদের নেই। অবশ্য আমরাও অনুস্বারের সঙ্গীন ও বিসর্গের কাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনে বা তার চেষ্টাও করিনে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু তবু কতকটা কিনারা করেছে সে সমস্যার। তারা প্রাদেশিক ভাষায় তাদের সকল কিছু অনুবাদ করে ফেলেছে। সংস্কৃতের সঙ্গীন-উঁচানো দুর্গ থেকে রূপ-কুমারীকে গোপনে মুক্তিদান করেছে। তার ভবনের আলো আজ ভুবনের হয়ে উঠেছে।

মাতৃভাষায় সে সবের অনুবাদ হয়ে এই ফল হয়েছে যে, অন্তত বাংলার মুসলমানেরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে যত পরিচিত, তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদির সাথে।

কোনো মুসলমান যদি তার সভ্যতা ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোনো কিছু জানতে চায় তাহলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভালো করে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গি রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাংলাও ভালো করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি! কাজেই

ন মণ তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। আর যাঁরা ও ভাষা শেখেন, তাঁদের অবস্থা 'পড়ে ফার্সি বেচে তেল।' আর তাদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ হালুয়া-রুটির জন্য। কয়জন মওলানা সাহেব আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবি-ফার্সির সমুদ্র মন্থন করে অমৃত এনে দিয়েছেন জানি না। সে অমৃত তারা একা পান করেই 'খোদার খাসি' হয়েছেন।

কিন্তু এ খোদার খাসি দিয়ে আর কতদিন চলবে? তাই আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছি—এবং আপনাদের মারফতে বাংলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে, অর্থ আছে—যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমির যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক ধর্ম ধর্ম বলে ইসলাম বলে চিৎকার করবেন না।

আমাদের next door neighbour-এর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে, আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামিরও অবসান হবে সেইদিন, যেদিন হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে competition হবে সে competition হবে cultured মনের chivalrous competition — sportsman like competition.

'বুলবুল'
ফাল্গুন, ১৩৪৩

The Practice of Muslim Culture

[Delivered as the Presidential speech on the occasion of the foundation of Chittagong Education Society in A.D.1929]

Today, standing amidst you, I recall a line of a poet in the very beginning: 'Storm comes as a flaw of a moment!' When the western-storm arrived that day to shake the shackles of the sealed door, he sang standing in your outside court yard –

When the janitor comes to the vault
Does that grant you freedom?
As you yourself from inside
Are holding on to the door.

That time you welcomed him with containers full of gifts, dishes full of sweetmeats and pleasant tributes. With your flowers, his neck and chest got covered. With the weight of your awards, his head got bowed that day. That time he could give nothing but his courteous salutation to you in return.

Today he's come up again at that familiar door, not in the craving the flowers or the hoping for garlands but he's appeared to visit his holy place of memories. Previously he said –

I would unclose the door as I am crazed,
Under the stone of your heart
The stream of fount here
I would give it the liberty.
The key to the door is lost,
So would you make others laugh by crying?
I would open the door through blow,
Come with me whoever want to go!
Caring for the door
Would stay locked in your vault?
If there is no key, you have the hands,
We would open the door with their smack!

The storm's come back again – maybe because of the flaw of moment. This time that storm's come in the shape of 'Eastern wind'. Its form and tune both might have changed. Maybe today it wants to say –

I would not open the door with blows
I would do it with singing!

That time it came with the heft of sword, this time it's come having learned the charm to bloom the flowers. That's the way it goes. The gentle breeze of Falgun appears as the nor-wester during Baishakh, and as the eastern-wind in the Shrabon. The flattering end of the of the late autumn gets wet with its tears of dew, and it gets waved through its icy zephyr. In Poush, its sighs mould the leaves.

* * *

My sole function is to blossom the flowers. The sword might be a burden for me, but I haven't thrown that away. During the twilight, I blow flute with the cowboy; I perform the Azan in the similar tune with the muezzin; again during a bright afternoon, I leap into the battleground with my sharp sword. Then my flute turns into the trumpet of war, the bugle of destruction.

Divinity's for my splendour, and the sword's for that demon who defies the splendour.

But before saying anything else, I remember the great man whose deeds glorified not only him but also all you dwellers of Chittagong – and so, irrespective of men or women, his acts have glorified the entire Muslim society of Bangla. He's late Khan Bahadur Abdul Aziz** Sahib who's yours very own and our hymn of praise. Shahjahan's Tajmahal was built centering only the love of Mamataj – Tajmahal is gorgeous. But the Tajmahal of this self-oblivious man has been built centering the grief of all the people of all times. This Tajmahal is not only beautiful; it's sublime and majestic.

I didn't get the privilege in my personal life to know him. I've never seen the moon, but I've observed the flow-tide in the ocean. The flow-tide doesn't get roused only by the full moon; the moon

that gets covered under the deadly darkness, also rouses the flow-tide. I've never seen him but I've felt him and still can feel him among you – during the rising time of the women-consciousness.

That's how a all-oblivious and ever-sacrificing man comes amidst us. We observe him hazily through the dark spectacles of self-interest. We reckon him as either insane or selfish. When the cuckoo comes with the good-news of flourishment in the orchard, the dutiful crows run after them in groups. They think of the cuckoo's song to be a menace. The sensitive cuckoo flies away in search of a new Bulbulistan in the end of the spring, then a emptiness appears all over the orchard, rises a great feeling of grief for some loss.

Birds fly away – then comes the great day about which it had sung. Then in the light of that great day, we remember the bird that had risen before all. But the bird doesn't stay there at that time, what stays is only its voice.

I'm a songbird just like that – so I've come to your memorial assembly to remember him only – who had risen long before us. I offer thousands of salutes on his feet.

He's far above today from our salutations and offerings; yet I hope that the flower that I've floated towards nowhere, would get sacred by touching his feet. I know, there's nothing indestructible in this world, nothing fades away forever. He's always in the shape of something in some world and the flowers of salutation floated by me are destined to touch his feet somewhere.

When we lose someone great, we pay our tribute to him – through respecting his focus and creation, through reviving him. The soul from whose intimacy we've deprived ourselves, we'd be able to forget the grief about it if we can accept his incomplete venture as our own. The Aziz from Chittagong is no more, but the other Azizs of Bangla, its adored sons are still alive – we'd locate him in a complete form among them, may that be your and your institution's focus! I've got no greater prayer than that.

He's done his job. There might be 'Bahars' as that one he possessed, but I don't know how many 'Nahars' are there that he had, in your Muslim houses of Chittagong.

He's given us the tune; now it's up to you to take it to the completion. There's no Ustad, yet there are the disciples. Would the emptiness of a Ustad not be filled by hundreds of disciples? I've heard from many a friends that Ustad had an infinite goal, his hope was immense, his crave was vast.

The people whose feet are washed by ocean, by whose heads the mountains stand as sleepless guard, whose nurses are the streams, whose bust is the volcano, whose restless waterfall's are the imperishable source of vigour, whose orchard is the home, whose mates are the wild and savage tigers and snakes; are afraid of carrying the task of that great man - anyone might say that but I won't.

* * *

I've come to your association on education with a purpose, which is, through your institution, to talk about the great dream that I've dreamt for days and nights to the entire Muslim society of Bengal, especially, the wealthy and educated community. This is not only my dream. This dream belongs to the Muslim youth of Bangla, to the ancient Indians, and to the young generation of the twentieth century. I want, this dream to get accomplished in this mountainous valley of yours.

I want the young fresh Muslims come out from this chasm of the hills, just as the poisonous reptiles come out leaving their skins at the end of winter. And that the wakened up brothers walk holding each others' hands in this day of new emergence of the world.

Let the motto of your unity be: Not to win the position by force, but to win the throne by invitation.

May your Islamabad be the seat of oriental culture – the field of Arafat. May the pilgrims form here and abroad gather here. Today we're very much indebted to the newly emerged world, we won't just indemnify the debt - we'll give them some debt, we'd, make the world indebted with our debt – let that be your extreme focus. So far we've just thrown our empty hands towards emptiness, we'd make amends for that disgrace today. Today's the day for us to open our hands. If we can't do so, then the

ocean's not far away, let all our shame get drown under its fathomless depth forever. I will say: Like Shantiniketan of Rabindranath, do take the responsibility to lay the foundation of the center or the central point for the refinement of our culture. Hundreds of servers like us would bestow all the desires of our life like a tribute in the feet of that endeavour.

May this blissful ground of nature truly turn into a Bulbulistan – like the Shiraz of Iran. May hundreds of Sadi, Hafiz, Khayyam, Rumi, Jami, Shomshi-Tobrej born in this Shirazbag – this Bulbulistan. You take the responsibility of that invitation of that occasion. Free your sealed run of life.

I feel the necessity of this sort of a 'cultural center' for various reasons. One of the reasons is political.

Just don't get startled to listen to the name of politics. I know that this association of yours is not a place to discuss politics. But I'd say that's just as per necessity. And that won't seem very horrific to anybody. I'd just say a few things in discussion.

As India's still dependent today and as it hasn't started its walk towards freedom – as only the design of happenings are going on and the occurring are also being hampered – the only reason behind that is the mutual jealousy and disrespect of our Hindus and Muslims. We, the Muslims, feel jealous to see the prosperity of our very own neighbours, the Hindus. And the Hindus disrespect us seeing downfallen. The biggest harm that the English reign's done to us is: with the charm of their education, they've spell-bounded us so much that we, the two communities, don't have enough information about each other's wisdom, culture and glory. The Hindus, looking at the dirty, illiterate peasants among us who are the majority, think that all the Muslims are similarly dirty, illiterate and extremist. They make think them like the rest. The poor Kalimuddi Mia is the standard for them to judge an average Muslim.

There are talks of huge contributions by the Muslims to science and knowledge music and literature, but they don't know about it or they just don't believe it even if they are shown the real history. They just think of it to be a myth. Maybe there was a day

when the Hindus and the Muslims didn't disrespect each other. Then the state language was the Persian language, so even the Hindus were bound to learn it – just as we learn English. And as they knew Persian language, they very well knew about the contribution of the Muslims to the world civilization. So at that time i.e. before the arrival of the English, they might have been disrespectful to some of the Muslim Nawabs or Badshahs, but they weren't hopeless with the entire Muslim community or the religion. Shibaji Pratap fought against Aurangzeb or Akbar, not against Islam or its followers. Till then the hostility was against the personalities, surely not against the community or the religion.

But today the biggest tragedy of our national life is that, we know the persons, nearest neighbours, least. Through the grace of the English, we know the language, the history and the culture of the English, Greek, Latin, Hibru, French, German, Italian, Spanish, Czech, Scandinavian, Chinese, Japanese, Honolulu, and even Greenwich. But we don't even try to know about the neighbours who've been living alongside us. Rather we feel proud not to do so. Probably this is called - Penny wise pound foolish!

The Hindus don't know Arabic, Persian or Urdu. But the history of all our culture, civilization, wisdom, science are locked in like our wives in those three languages. Rather the walls of the caves of the wives have started to break down a bit, their veils are also getting raised, but our history haven't been able to get rid of the veil of those three languages. So we don't deserve to blame people from other religion saying that they don't know about our history. Also we can't or don't try to cross the border to enter the fort of Sanskrit. But the Hindus of the nineteenth century have solved the problem somewhat. They've translated their everything in their provincial languages. From the high fort of Sanskrit, they've secretly released the princess. The light of her house has enlightened the world today.

The result of translating them into the vernacular language is, the Muslims of Bengal are not one percent as familiar with history

of their own religion as they are with the culture, wisdom and civilization of the Hindus.

If a Muslim has to learn something about the history of his religion, he'll have to practise hard to jump over the walls of Arabic, Persian or Urdu. He'll have to see the English form of Islam in English language. But Arabic and Persian are too much to deal with for an average Muslim who doesn't even learn Bangla well. So Radha would never dance as there would never arrive nine maunds of ghee. And the condition of those who learn those languages is even disastrous. And most of them learn it to earn their bread and butter. I don't know how many of our maulanas have struck gold for the mother-language by searching through the ocean of Arabic and Persian languages. They've just helped themselves by those learning and have become roly-poly people.

But how long will we persist with these roly-poly people? That's why I've come here to request you – and through you, I request all the thoughtful Muslims of Bengali that, you've got the strength and wealth – if you can, do establish the center for practising and translating the history of your literature, culture, wisdom and civilization in your mother language. If you can't do so, then please don't shout in the name of Islam.

In this solitary way, we'll have to remove the disrespect from the minds of our next door neighbours and only then the road for the independence for India will be broadened. All the insanity in the name of communities would come to an end that day, when the Hindus and the Muslims would embrace each other with complete respect. The competition that'd take place that day, would be a chivalrous competition of cultured minds – a sports-man like competition.

Translated by Mozaffar Hossain & Subrata Kumar Das

* Aziz: Khan Bahadur Abdul Aziz (1837-1926) contributed hugely to education, particularly of Chittagong region. Habibullah Bahar Chowdhury (1906-1966) and Shamsun Nahar Chowdhury (1908-1964) are two grand children of him who became eminent personalities of contemporary Bangal.

মোহর্‌রম

ফিরে এসেছে আজ সেই মোহর্‌রম—সেই নিখিল-মুসলিমের ক্রন্দন-কাৎরানির দিন। কিন্তু সত্য করে আজ কে কেঁদেছে বলতে পার হে মুসলিম? আজ তোমার চোখে অশ্রু নাই। আজ ক্রন্দন-স্মৃতি তোমার উৎসবে পরিণত! তোমার অশ্রু আজ ভণ্ডামি, ক্রন্দন আজ কৃত্রিম কর্কশ চিৎকার। 'হায় হাসান, হায় হোসেন!' বলে মিথ্যা বীভৎস চিৎকার করে আর মা ফাতেমার পুত্র-শোকাতুর আত্মাকে পীড়িত করে তুলো না। এ ক্রন্দন-অভিনয় দেখিয়ে আল্লার মুখ আর কালো করে দিয়ো না। তোমাদের ঐ যে উদ্দাম বুক-চাপড়ানির বীভৎসতা, সে ব্যর্থ হয়নি ভীরুর দল! সে-আঘাত আল্লার হাবিব হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বুকে গিয়ে বেজেছে। যাঁরা ধর্মের জন্যে সত্যের জন্য জান কোরবান করেছেন, আজ সেই শহীদ বীরদের জন্যে ক্রন্দন-অভিনয় করে আর তাঁদের আত্মার অপমান করো না, নৃশংস অভিনেতার দল। তোমার ধর্ম নাই, অস্তিত্ব নাই, তোমার হাতে শম্‌শের নাই, শির নাঙ্গা, তোমার কোরআন পর-পদদলিত, তোমার গর্দানে গোলামির জিঞ্জির, যে শির আল্লাহর আরশ ছাড়া আর কোথাও নত হয় না, সেই শিরকে জোর করে সেজ্‌দা করাচ্ছে অত্যাচারী শক্তি—,আর তুমি করছ আজ সেই শহীদদের—ধর্মের জন্য স্বাধীনতার জন্য শহীদের—'মাতমে'র অভিনয়! আফ্‌সোস মুসলিম! আফ্‌সোস!!

কোথায় কারবালা-মাতম তা কি দেখেছ, অন্ধ? একবার চোখ খুলে দেখ, দেখবে কোথায় কারবালার দুপুরে মাতম হাহাকার-রবে ক্রন্দন করে ফিরছে। আজ কারবালা শুধু আরবের ঐ ধূ-ধূ সাহারার বুকে নয়, ঐ ফোরাত নদীর কূলে নয়—আজ কারবালার হাহাকার ঐ নিখিল নিপীড়িত মুসলিমের বুকের সাহারায়, তোমার অপমান-জর্জরিত অশ্রু-নদীর কূলে কূলে।

মা ফাতেমা আরশের পায়া ধরে কাঁদছেন, স্কন্ধে তাঁর হাসানের বিষ-মাখা নীল পিরান আর হোসেনের খুন-মাখা রক্ত-উত্তরীয়। পুত্র-হারার আকুল ক্রন্দনে খোদার আরশ কেঁপে উঠছে। হে যুগে-যুগে শোক-অভিনেতা মুসলিমের দল! থামাও—থামাও মা ফাতেমার ক্রন্দন—থামাও আল্লার আরশের ভীতি-কম্পন। তোমার স্বাধীনতাকে তোমার সত্যকে তোমার ধর্মকে যে-এজিদের বংশধরেরা লাঞ্ছিত নিপীড়িত করছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের ভূ-অবলুণ্ঠিত শির উঁচু হয়ে উঠুক। তোমার ইসলামকে অক্ষতদেহ উন্নত-শির করে রাখ, তোমার স্বাধীনতা তোমার সত্যকে রক্ষা কর,

দেখবে পুত্র-শোকাতুরা জননী মা ফাতেমার ক্রন্দন থেমে গিয়েছে, আল্লার আরশের কম্পন থেমেছে। ঐ শোন কাসেমের অতৃপ্ত আত্মা ফরিয়াদ করে ফিরছে—'তৃষ্ণা, তৃষ্ণা!' কে দেবে এ-তৃষ্ণাতুর তরুণকে তৃষ্ণার জল? এ-তৃষ্ণা আবে-জমজম আবে-কওসরেও মিটবার নয়। এ-কারবালার মরু-দগ্ধ পিয়াসী চায় নিখিল-মুসলিম তরুণের রক্ত, ধর্ম আর স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণ-বলিদান। কে আছ অরুণ-খুনের তরুণ শহীদ মুসলিম, কাসেমের এ-তৃষ্ণা এ-ক্রন্দন-তিক্ততা মেটাবে?

ঐ শোনো সদ্য স্বামীহারা বালিকা সকিনার মর্মভেদী ক্রন্দন, সে চায় না তার স্বামী কাসেমের প্রাণ, সে চায় ইসলামের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে কাসেমের মতো প্রাণ-বলিদান।

আজ নিখিল মুসলিম-অঙ্গন তোমার কারবালা-প্রান্তরে হে মুসলিম! তার মাঝে আকুল অবিশ্রাম ক্রন্দন গুম্‌রে ফিরছে—'তৃষ্ণা—তৃষ্ণা!'

আল্লার পানে তাকাও, রসূলের দিকে চেয়ে দেখ, মা ফাতেমা, হজরত আলীর মাতম শোনো, কাসেমের, সকিনার—অতৃপ্তির আকুল কাঁদন-রণরণি শোনো, কচি শিশু আসগরের তীর-বেঁধা কাঁচা কলিজার খুন-খারাবির কথা স্মরণ কর, আর তোমার কর্তব্য নির্ধারণ কর, হে মুসলিম! মোহরমের খুন-খারাবি আজ তোমার লক্ষ্য স্থির করে দিল।

Muharram

Once again the month of Muharram is knocking at our door, a grievous day for the Muslims of the world. Can we really say who has cried in grief? There are no tears in your eyes, this grievous day has been turned into a festival. Your tears are fake, your cries just crude utterances. Don't just cry out 'Oh *Hasan*, Oh *Husayn*' and torture the soul of *Bibi Fatimah* who lost her sons on this day. Do not pretend and put on a show of crying and bring shame to God. Your gestures of beating your bare breast have not gone in vain. That hurt will strike the chest of the Prophet Hazrat Muhammad (SWT). It is not necessary to exhibit fake tears for those victorious sons of the soil who have sacrificed their lives for truth and religion.

You have no religion, no existence, you have no sword, your head is bare, others have condemned your Quran, a noose of control hangs around your neck, the head which should never bow down to anyone but God, is now coerced by the oppressive forces, and you are enacting a scene of grief on behalf of these martyrs. Shame on the Muslims, shame!

Hey blind man, have you even seen the grief in Karbala. Open your eyes and see the place in Karbala where people are crying out in grief. Today *Karbala* is not only in the Sahara desert in Arabia, not only on the banks of the river *Furat,* this grief and suffering is in the heart of the Muslims of the entire world!

Mother Fatimah is crying at the feet of God's seat, on her shoulder rests the blue garment of Hasan, dipped in poison, and the blood stained scarf of Husayn. God's seat trembles as the mother cries, grieving for her sons. Stop, stop this acting, stop the cries of Mother Fatimah, stop the trembling of God's seat, stop acting. Your independence, your truth and religion is being insulted and oppressed by the descendants of *Yazid*, raise your heads against them. You must keep your Islam, untouched and

above all, you must save your independence and your truth and you will find all crying mothers like Fatimah have stopped crying, God's seat no longer trembling. The unquenched soul of *Qasim* is crying out loud in thirst, who will bring water to this thirsty young man? This thirst will not be quenched by the water of *Aab e Zamzam* or *Aab e Kausar*. This young man burnt by the scorching Karbala desert wants the blood of the world's Muslims, they want this as a sacrifice to save their religion, their independence. I beckon that young man to come forward, come to quench the thirst of Qasim.

Listen to the soulful cries of the young widow *Sakina*, she doesn't want her husband back, she wants many more sacrificial young men who can save the independence of Islam.

Oh Muslim brothers, today the entire Muslim world is at the Karbala, they are crying out loud for water.

Oh Allah, look at Allah, look at his Prophet, listen to the outcries of Fatimah (the mother), *Hazrat Ali*. Listen to the hue and cries of *Qasim, Sakina*, listen to their unhappy uttering, hear the cry from the infant *Asghar*, the cry from his heart where the arrow struck, and then make up your mind about your duties.

Translated by Nashid Kamal

রাজবন্দীর জবানবন্দী

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে রাজার মুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আর জন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে—নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য—জাগ্রত ভগবান।

আমার বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ-মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারির একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন—ন্যায়, ধর্ম। সে-আইন কোন বিজেতা মানব কোনো বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরি করে নাই। সে-আইন বিশ্ব-মানবের সত্য উপলব্ধি হতে সৃষ্ট; সে-আইন সার্বজনীন সত্যের, সে-আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে—পরমাণু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি; আমার পক্ষে—আদি অন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা।

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ; আমার পক্ষে যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে-বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে-বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ সত্য-স্বরূপ।

সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজ-দণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্-প্রকাশের বীণা, যে-বীণায় চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে? একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন—চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণী রুদ্ধ করছে, সত্যের

বাণীকে মূক করতে চাচ্ছে, সেও তাঁরই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্টি অণু। তাঁরই ইঙ্গিত-আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে, কাল হয়তো থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের আর অন্ত নাই; সে যাহার সৃষ্টি তাহাকেই সে বন্দি করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়! কিন্তু অহঙ্কার একদিন চোখের জলে ডুব্‌বেই ডুব্‌বে!

যাক, আমি বলছিলাম, আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র। সে-যন্ত্রকে অপর কোনো নির্মম শক্তি অবরুদ্ধ করলেও করতে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে; কিন্তু সে-যন্ত্র যিনি বাজান, সে-বীণায় যিনি রুদ্র-বাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ করবে কে? সে বিধাতাকে বিনাশ করবে কে? আমি মর, কিন্তু আমার বিধাতা অমর। আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে, কিন্তু কোনো কালে কোনো কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি — তার বাণী মরেনি। সে আজো তেমনি করে নিজেকে প্রকাশ করছে এবং চিরকাল ধরে করবে। আমার এই শাসন-নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশি কেড়ে নিলেই সে বাঁশির সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আর এক বাঁশি নিয়ে বা তৈরি করে তাতে সুর ফোটাতে পারি। সুর আমার বাঁশির নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশি সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশিরও নয় সুরেরও নয়; দোষ আমার, যে বাজায়; তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়; দোষ তাঁর—যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই; প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দিবার মতো রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাঁহাকে বন্দি করবার মতো পুলিশ বা কারাগার আজো সৃষ্টি হয় নাই।

রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে, তার প্রাণকে অনুবাদ করেনি। তার অনুবাদে রাজ-বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে, কেননা তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।

আমি জানি এবং দেখেছি—আজ এই আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দি সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজনিযুক্ত বিচারক সত্য-বিচারক হতে পারে না। এমনি বিচার-প্রহসন করে যেদিন খ্রিস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হলো, গান্ধিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, সেদিনও ভগবান

এমনি নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছিল। নইলে সে তার ঐ বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থরথর করে কেঁপে উঠত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু হয়তো সে শাস্তি দেবে, কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।

তবু জিজ্ঞাসা করছি, এই যে বিচারাসন—এ কার? রাজার, না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে? রাজা না ভগবান? অর্থ না আত্মপ্রসাদ?

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষ-খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-ঊষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না। না, আবার বাজে কথা বললাম।

আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো—একি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়তো সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায়-শাসন-ক্লিষ্ট বন্দি সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না—এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল-নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয়-হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারাবাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংল্যান্ডই ভারতের অধীন হতো এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলন্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মতো অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতোই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থে নীত হতেন, তাহলে সে সময় এই বিচারক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।

আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,—কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই,—আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে,—তার জন্য ঘরে-বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহঙ্কার নয়, আত্ম-উপলব্ধির আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তাহলে যে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার এই দেহ-মন্দিরে জাগ্রত দেবতার আসন বলেই তো লোকে এ-মন্দিরকে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কী? একে শুধাবে কে? তাই আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়-তূর্য বেজে উঠেছিল; আমার হাতের ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশান-পুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণ রূপ ধরে ধ্বংস-নাচন নেচেছিল। এ ধ্বংস-নৃত্য সব সৃষ্টির পূর্ব-সূচনা। তাই আমি নির্মম নির্ভীক উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম, তাঁর তূর্য বাজিয়েছিলাম। অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্য রক্ষার, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন ... প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি। কারাগার-মুক্ত হয়ে

আমি আবার আঘাত-চিহ্নিত বুকে, লাঞ্ছনা-রক্ত ললাটে, তাঁর মরণ-বাঁচা-চরণমূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তাঁর সকরুণ প্রসাদ চাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আমায় শ্রান্ত, আমায় সঞ্জীবিত অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ আমি, আবার তাঁর তরবারি-ছায়াতলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব। সেই আজো-না-আসা রক্ত-ঊষার আশা, আনন্দ, আমার কারাবাসকে—অমৃতের পুত্র আমি হাসিগানের কলোচ্ছ্বাসে স্বর্গ ক'রে তুলবে। চিরশিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতন লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ-পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায়-অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব, মাভৈঃ, ভয় নাই।

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোল এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীন অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কি-না জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব। আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি 'অমৃতস্য পুত্রঃ'। আমি জানি —

'ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয়;
সেই সত্য আমার ভাগ্য-বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।'

প্রেসিডেন্সি জেল, কলিকাতা
৭ই জানুয়ারি, ১৯২৩
রবিবার—দুপুর।

Confessions of a State Prisoner

My crime is that I have rebelled against the state. I am a state prisoner, hence a convict of the state.

On one hand is the crown of the state and on the other is a flaming comet. One is the king with the mandate to convict. The other is the truth, bearing the torch of justice. The state is represented by state- appointed lawyers while I am represented by the Judge of all judges, the truth that prevails forever, the ever-alert God.

No one has appointed my judge. In His court, the ruler and the ruled, the happy and the oppressed, the rich and poor, are all equal. The beggar's single-stringed *ektara* and the King's sceptre lie side by side in this court. The prevalent laws are fairness and religion and it has not been written for any victorious community by any victorious human being. This law has been created from the realization of truth of all human beings of the world. The laws pertain to truth, the laws allude to the secular God. The king is thus represented by a fraction of the God's creation while for me, I am represented by God himself!

The King is supported by smallness while I am supported by roughness. The king is represented by the selfish ones who seek money, interest. One who represents me is seeking the truth and the joy of eternity.

The king's words are like bubbles, mine are like the endless sea. I am a poet and have been commissioned to this world by God to express the unexpressed truth and to create an accord for those unborn. God speaks through the voice of the poet. My writings are the messages of truth, the messages from God. These messages may be considered treason in the eyes of the king, but in the eyes of justice, they are not, they do not violate the truth. It may result in punishment in the king's court, in the light of

religion, in the light of fairness they are the harmless, unblemished, clear, invincible truth.

Truth is self explanatory. It cannot be daunted by blood red angry eyes or the king's threats. I am that eternal lute, which has played the tunes of truth. I am the lute which God had played. One can break the lute but how does one vanquish God? It is clearly established that truth prevails, God prevails. This has been forever and will remain so. One who is trying to stifle the truth is also a small part of God's creation. He is alive as per the will of God and might not be there tomorrow. Stupid people have some fake pride in destroying the One who created them. But their pride will be drowned in their tears.

What I was saying is that, I am a machine which speaks the truth. Some cruel force may have the power to capture this machine and destroy it. However, none can capture the one who runs the machine, who uses the instrument to declare the stern messages, how to capture that one? Who will destroy that deity? I am mortal, but my God is immortal. I will die, my king will die too; because many state prisoners have met with death, many such kings have also died, truth has never died - neither has it been barred from being published. He has expressed himself in the open and will always do so. If you stifle my voice, the words will be expressed through another voice. If you snatch my flute I can take another flute or create another one to play the tune. The music is not from the flute, it is on my mind and the ability to make the flute is my creativity. The flute is not at fault, nor the music. The fault is mine — the one who has played the flute. Similarly, I am not responsible for writing the lyrics. The fault is neither mine nor is it of the lute. The fault is his who had played the flute through me. Hence, I am not the state prisoner, it is the one who plays the lute meaning God, who is the state prisoner. There is no other God, no other princely force that will punish HIM. No prison has been created that can jail Him.

The princely translator, employed by the king has translated my writings using princely language and has only translated the words, not the life in them. His language speaks of rebellion

against the state, it is written to please the king, my truth and fierceness and life have not been reflected there. My aim is to worship God, my writings are the true swords raised in support of the oppressed and downtrodden people of the world. I have not rebelled against the king, I have rebelled against wrong doing.

I know and I have seen that in this day I am not the only one standing here as the accused, God is right behind me. Through the years He has always stood behind those who have been convicted of state crimes. The state- appointed judge can never judge the truth. In the same way, through a series of farcical trials, Christ was crucified and Gandhi was sent to jail, and God had stood right behind them. The judges could not see God, because the Emperor stood between them. He lost his sight and conscience in fear of the Emperor, otherwise he would shiver in his judicial chair, he would turn blue, and his chair would burn into ashes!

The judge knows that whatever I have said or written are not erroneous in the eyes of God, nor would they be improper in the eyes of the jurist. However, he may choose to accuse me because he serves the king and he doesn't serve the truth. He is not an independent person, he is a servant of the king!

Even then I ask, whether the seat of justice belongs to the king, or the religion? Regarding the judge, does he have to answer to the king, or does he answer to his conscience, truth or God? Who accords recognition to this judge, king or God? Is he paid with money or satisfaction?

I heard that my judge is a poet and this brought me immense joy that the rebel poet is to be judged by another poet. However, for him the last boat is about to leave its anchor and for me, I look forward to the crimson morning and the sounds of the shells announcing the welcome tune of enormous upcoming events. Death beckons him, while life beckons me. Hence, I am not sure whether the dying star and the rising one will ever meet. Anyhow, these are beside the point.

India is an occupied territory and its inhabitants are slaves. That is the truth. But I cannot call a slave a slave, that will be tantamount to treason against the state. This cannot be called the

rule of law, it amounts to coercion and forcing people to call the truth a lie, making the illegal legal and turning the day into the night. One cannot tolerate this and this cannot be a permanent solution. Perhaps, truth was lying idle and thus this situation has been tolerated. Truth is now awake and the aware heart is now specially recognizing the truth. I was speaking about the soulful cries of the unlawful captivity of the hurtful truth, that's why I am a traitor. Is this my solo cry? No, it is a loud chorus of the cries of the silent oppressed people of the world. I know that this dangerous roar is not mine alone, it is the painful outburst from the souls of the world. Just scaring me will not bring an end to the cry. Suddenly you will find this missing cry of mine coming out as a roar from another voice!

Suppose everything was the reverse. England was a subject of India and weaponless and oppressed people of England were keen like the Indians (today) to liberate their land, and exactly at that moment if I would be a judge and just like me, another traitor would appear before my court, and speak to the judge, I am speaking exactly in that same language today.

I am very self confident. I have just spoken against wrong and called a spade a spade. I have not buttered up anyone. I have not praised anyone or played the role of a sycophant. I have not only spoken against the unlawful ways of the king, I have raised my voice against society, the nation, the country and held high the truth of my sword. For this, I have tolerated cynicism, insults, hurt and many more from all quarters. I have not bowed down to any fear, I have not sacrificed my ideals or my God, or sold myself to any kind of greed, nor felt lowly about my own accomplishments, because I am God's favourite one, I am the lute in the hands of the truth. I am a poet, my soul is like the truth-seeking soul of a sage. I have been born with unknown fulfillment. This is not my pride, this is my self realization and a simple, honest statement arising from that. I cannot accept a lie in blind faith, or due to some greed, for fear of the king, or his subjects. If I accept the oppression, my God will leave me.

My physical being is an embodiment of God and hence demands respect from the people. If God leaves, this body will be an empty temple, none will respect that. My voice had dared to blow the northwesterly dangerous trumpet announcing war, the fiery flag of the comet swaying in my hands. At the tail end of the destructive flag, the deity *Nat Narayan* carried out a dangerous dance. This dance of destruction is the prelude to new creations and that's why I held the flag with ruthless, fearless skill and head held high in pride and became the lead trumpeter. I could hear the imminent beckoning of the mighty, the ruthless. I was able to understand the hint from his blood-shot eyes. I had immediately understood that I was assigned to be the red solider of the world that preserves the truth and establishes the rule of law. He had sent me as the lead trumpeter to this delirious and sleepy, green graveyard of Bengal. I am just a humble soldier and have tried to follow his instructions to the letter and spirit. He knew that I would be the subject of the first hit. I therefore, consider myself privileged to be the first casualty of this declaration of annihilation. After being released from captivity when I shall return with my hurt-laden chest, insult–laden forehead, I shall surrender myself to life and death at his feet. His elixir of life will enliven my tired body and soul and will rejuvenate me. I shall receive fresh instructions from him and will have new inspirations, and again I shall stand under the shades of his upright sword. The gaiety of the imminent red sun will enliven my captivity. I am the son of elixir- hence the joys and sorrows will turn this captivity into heaven. God has taught me not to ask for the ability to turn the iron hand which tortures me into a jewel studded one with the simplicity and vivaciousness of the child. I have no fear or sorrow, because God lives with me. My incomplete tasks will be completed by others. The pangs of expressing the truth will not be harmed. The comet in my hand will turn into a flaming torch in the hand of God and will burn away all injustice and oppression. On this occasion God will ride my fiery aircraft. Hence, bravo! Fear not.

The jails have beckoned this useless son to the dark chambers like a mother's lap. I don't know if I shall get a place in the laps of

the occupied, orphan mother. If I do, then I shall offer my tearful thanks to the judge. I repeat, `I have no fear, no sorrow. I am the son of elixir, I know that:

The oppressed hurts you for the truth
He shall decay
The truth is my fate
Only God can play.

Translated by Nashid Kamal

Written on Sunday afternoon
Presidency Jain, Kolkata
7 January 1923.

রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন

একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদের পৃথিবী ধ্বংস (প্রলয় বা রোজ-কেয়ামত) হইবার দিন যত দূর মনে করি, বাস্তবিক তত দূর নয়। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে-সব আলোচনা হইয়াছে, সেই সব লইয়াই আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ইহা লক্ষ্য হইতেছে যে, দক্ষিণ পোলার প্রদেশে ভাসমান তুষারের স্তূপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এডমন্টের ক্যাপ্টেন স্মিথার্থ সর্বপ্রথম ৫৮০ ফুট উচ্চ এক তুষার-স্তূপ দেখিতে পান। অতঃপর স্কট সাহেব ৬০০ ফুটেরও উঁচু এক বরফের পাহাড় দেখিতে পান। কিন্তু এজনেটার একজন নাবিক সমুদ্রের উপরেও হাজার ফুটের বেশি উচ্চ এক পর্বত-প্রমাণ বরফ স্তূপ আবিষ্কার করেন এবং তাহাতে সমস্ত পৃথিবী চমকিত হইয়া যায়। পরে নির্ধারিত হয় যে, এই তুষার পর্বত ৯৬১২ ফুট পুরু অর্থাৎ পৌনে দুই মাইলেরও বেশি চওড়া।

দক্ষিণ বিষুবরেখায় অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার-পর্বতসমূহের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। আর এই জন্যই দক্ষিণ-পোলার প্রদেশসমূহ ভয়ানক উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। উত্তর দিকস্থ বহু দূরের ভাসমান তুষারস্তূপসমূহ দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় অত্যধিক শীতের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানেই শৈত্যের সঙ্গে অন্য স্থানের তুলনাই হয় না। 'বুইনস এরিস' নামক স্থানে সম্প্রতি এক তুষার-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই দেশে আর কখনও তুষার-বৃষ্টি হয় নাই।

এ-সবের মানে কি? প্রফেসর লুইস ও অন্যান্য বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণের মতে আমাদের পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাপ্লাবন বা মহাধ্বংস অতি আসন্ন। যদি সমস্ত দুনিয়াও ধ্বংস না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর একাংশ যে ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাস্তি।

দক্ষিণ মেরুতে যে গগন-চুম্বী বরফের মহা আচ্ছাদন রহিয়াছে, তাহা লম্বাতে চৌদ্দ শত মাইল এবং কত শত মাইল যে পুরু তাহার ইয়ত্তাই নাই! এখন এই যে দক্ষিণ মেরুর আবহাওয়া এই রকমে ক্রমেই অসহ্য উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, ইহার পরিণাম কি? সকলেই জানেন বরফ গরম হইলে গলিয়া যায়। সুতরাং এখন দক্ষিণ মেরুর এই অত্যধিক উষ্ণতার দরুন সেখানের ঐ সহস্র সহস্র যোজন-ব্যাপী তুষারের মহাপর্বতসমূহ ভাঙ্গিয়া গলিয়া যাইবে, এবং আকাশ-সমান সচল হিমালয়ের মতো

তরঙ্গের রাশি চতুর্দিক ধুইয়া-মুছিয়া লইয়া যাইবে। প্রথমে এই মহা-প্লাবনে আক্রান্ত হইবে পৃথিবীর ঢালু দিক অর্থাৎ দক্ষিণ মহাদেশসমূহ।

পুরাকালে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ধূমকেতুকে ভয়ানক ভয় করিতেন, কেননা তাঁহারা জানিতেন না যে, ধূমকেতু কী? আমাদের পরবর্তী পিতাগণ এ-সম্বন্ধে বেশি জানিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও ধূমকেতুকে অত্যন্ত ভয় করিতেন ও অলক্ষুণে মনে করিতেন। কারণ, তাঁহারা মনে করিতেন এই সব ধূমকেতুর মস্তক নিরেট, সুতরাং পৃথিবীর এত নিকটে আসার দরুন যদি তাহার সহিত দৈবক্রমে পৃথিবীর সংঘর্ষ হইয়া যায়, তাহা হইলে সারা দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে।

এখন আমরা জানিতে পারি, ধূমকেতু নিরেট শক্ত নয়, উহা কুয়াশার মতো নীহারময়। সুতরাং যদি দৈবক্রমে এক-আধটা ধূমকেতুর পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষও হইয়া যাইত, তাহা হইলে ইহা দ্বারা পৃথিবীর কোনো অংশ গভীর গর্তও হইয়া যাইত না, বা ইহা আমাদিগকে পৃথিবীর আকর্ষণের বাহিরে ছুঁড়িয়া দিতেও সক্ষম হইত না।

কিন্তু ফ্রান্সের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মঁসিয়ে ক্যামিল্লি ফ্লামারিয়ন সাহেব এক বিভীষিকাময় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহা এই যে, ধূমকেতুর ঐ যে নীহারময় পুচ্ছ তাহা বিষাক্ত গ্যাসে ভরপুর। সেই জন্য ধূমকেতু যদি একবার পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিতে পারে, তাহা হইলে ঐ বিষাক্ত গ্যাসে সমস্ত পৃথিবী এক নিমেষে প্রাণীশূন্য হইয়া যাইবে, তাহার রূপ-রস-গন্ধ চিরদিনের তরে ধুইয়া-মুছিয়া সাফ হইয়া যাইবে!

ধূমকেতু সৃষ্টির রাসায়নিক ব্যাখ্যা এখনও সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় নাই, কিন্তু ইহা সহজে সকলে বুঝিতে পারেন যে, ধূমকেতু ইহার পুচ্ছে নিশ্চয়ই গ্যাস ভরিয়া রাখে। এই গ্যাস অনায়াসে আমাদের পৃথিবীর বাতাস হইতে যবক্ষারজান শুষিয়া লইতে পারে; এবং তাহা হইলে যেদিকে যাও সেই দিকেই মরণ আর কি! সাধে কি আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই জিনিসটাকে এত অপছন্দ করিতেন! কথায় বলে, 'ধূমকেতুর মত সে এসে আমার অদৃষ্টে উদয় হলো!' পৃথিবীর অদৃষ্টেও ধূমকেতু বাস্তবিকই অলক্ষুণে বা অমঙ্গলজনক।

যাক্, যদি ইহা যবক্ষারজান বাতাস হইতে শুষিয়া লয়, তাহা হইলে আমরা শুধু অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্পই পাইব। সত্য বটে যে, অম্লজান বাষ্প রক্তসঞ্চালন এবং মানসিক ও শারীরিক কর্মপটুতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাই বলিয়া শুধু অম্লজান বাষ্প আবার ভয়ানক মারাত্মক। সুতরাং নিশ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু উত্তেজক অম্লজান বাষ্প পাইয়া আমাদের শরীর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং ক্রমে আমরা জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইব।

কয়লা-যুগের সময় এই পৃথিবীর বাতাস কার্বনিক এসিডের দরুন ভারি ছিল। সে-সময় সে-বাতাস মানুষে সহ্য করিতে পারিত না। কেবল মৎস্য ও সরীসৃপ জাতীয় জীববৃন্দ স্রোতময় জলাভূমিতে ও নিশ্চল বাতাসে বাঁচিয়া ছিল। ক্রমশ উদ্ভিদ ও গাছ-গাছড়ার বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষাক্ত নিশ্চল বাতাস দূর হইয়া যাইতে লাগিল, আকাশ পরিষ্কার হইল এবং এইরূপে এই বাতাস উষ্ণ রক্তময় জীবের উপযোগী হইয়া উঠিল।

বর্তমানে মানব জাতি কয়লা খনন কার্যে ও তাহার সাহায্য গ্রহণে বিষম ব্যস্ত। এই কয়লা কখনকার জানেন কি? ইহা ঐ বহু লক্ষ যুগ পূর্বের কার্বনিক এসিড-ভরা বাতাসের কালের এবং এই কয়লা সেই সময়কার গাছ-গাছড়ারই পরিণতি হইতে পারে, কেননা বনের গাছ-গাছড়াই এখনো ঐ কার্বনিক এসিড শোষণ করিতে ওস্তাদ।

প্রত্যেক কয়লার চাপ ও প্রত্যেকটি দেশলাই যাহা জ্বালানো হয়, তাহা প্রত্যহ আমাদের দরকারী অম্লজান বাষ্প নিঃশেষ করিতেছে।

একজন বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, জগতের অম্লজান ক্রমশই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, এবং বাতাসও সেই জন্য ক্রমেই কলুষিত হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং সেদিন আগতপ্রায়—যেদিন পৃথিবীর সমস্ত কিছু কার্বনিক এসিডময় যুগের জীবে পরিণত হইয়া যাইবে।

মানুষ ক্রমেই ক্ষুদ্র ও দুর্বল হইতে হইতে শেষে লিলিপুটিয়ানদের মতো হইয়া পড়িবে, তারপর একেবারেই নেস্তনাবুদ! তারপর আদির মতোই অন্ত! অর্থাৎ প্রথমে যেমন মৎস্য আর সরীসৃপ জাতিই ছিল, পরেও তেমনি য়্যা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহা-মৎস্য আর মহা-সরীসৃপ অবতারগণ বহাল খোশ-তবিয়তে বিরাজ করিবেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের খুব সরু লম্বা ঘৃণ্য সরীসৃপ জাতও—যেমন কি কেঁচো সাপ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আবার আমাদের ঢিপেয় রাজত্ব করিবে।

যদি মানবজাতি বর্তমানের এই অনিষ্টকারী কয়লার মহা-খরচা ছাড়িয়া দেয় (শুধু কয়লা জ্বালানোর জন্যই বৎসরে ১৬০০ মিলিয়ন টন অম্লজান বাষ্প নষ্ট হইতেছে।) এবং তৎপরিবর্তে ইলেক্‌ট্রিক দিয়া কয়লার কাজ চালাইয়া লয়, তাহা হইলে আমাদিগকে আবার আর এক নূতন বিপদের মুখ-গহ্বরে পড়িতে হইবে! অর্থাৎ যেদিকেই যাও, নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ!

আগে হইতে আবহাওয়ার ক্রম-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। বজ্রঘাত—বিশেষ করিয়া শীতকালে বজ্রপতন—ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, আর ইহার একদম সোজা কারণ রহিয়াছে যে, পৃথিবীর আর বাতাসের ইলেক্‌ট্রিসিটি ঠোকাঠুকির

দরুনই এই বজ্র উৎপাতের সৃষ্টি! তাহা হইলে কঃ পন্থা? সেই জন্যই বুঝি পান্নাময়ী আগে হইতেই গাহিয়া রাখিয়াছে, 'মরিব মরিব সখি, নিশ্চয়ই মরিব!!'

আচ্ছা ধরুন, যদি বায়বীয় ইলেক্‌ট্রিসিটির উপরে বর্তমান অপেক্ষা শত বা সহস্র গুণ ভার চাপানো হয় তাহা হইলে আর কি বসন্তে ফুল ফুটিবে—কচি পাতা গজাইবে? আর কি তবে বর্ষার ব্যাকুল বরিষণ পৃথিবীর বক্ষ সিক্ত করিবে? না গো না! তার বদলে বজ্র-পতনই হইবে আমাদের পৃথিবীতে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রোজ শত শত বজ্রপাতে পৃথিবী ছিন্না-ভিন্না হইয়া যাইবে। একজন ধুরন্ধর উল্কাতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, হাঁ হাঁ, তাহাই হইবে অবশেষে! কি ভয়ানক! আমাদের এখন উচিত যে, আমরা সবাই মিলিয়া প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া বিশ্বাস করি, ও-ভদ্রলোকের কথা মিথ্যা এবং তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। ঐ যে আমাদের আলোকদাতা সবিতা সূয্যিমামা,—উনি শুধু যে আলো আর উষ্ণতারই সৃষ্টি করেন তা নয়, তিনি ইলেকট্রিক শক্তিরও জনক। আর এই আমাদের একমাত্র মামা যিনি প্রকৃতির এই প্রহেলিকাময় অজানা শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সব দিক সমঝাইয়া চলিবেন। মামা জীবতু!

বর্তমান সূয্যিমামার ক্ষমতা এত উগ্র প্রচণ্ড যে, যদি এঁর সমস্ত রশ্মি আর উগ্রতা শুধু আমাদের এই গরীব পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে মাত্র দেড় মিনিটের মধ্যেই ঐ যে আগে মহামহা বরফ-পর্বতের কথা বলিয়াছি, সে সমস্তই গলিয়া টগবগ করিয়া ফুটিত; এবং আর এগারো সেকেণ্ড থাকিলে দুনিয়ার এত বড় সমুদ্র, সমস্ত শুকাইয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া হাঁ করিয়া থাকিত।

কিন্তু সূয্যিমামাও দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইয়া চলিয়াছেন। দৈনিক কতটুকু করিয়া যে তাঁহার বর-বপুর সঙ্কোচন হইতেছে তাহা এখনো জানা যায় নাই। প্রফেসর বার্নস জোরের সঙ্গে বলেন যে, সূয্যিমামার এই সঙ্কোচন বড় জোরেই চলিতেছে। এত জোরে যে আমরা তাহার একটা মোটামুটি ধারণাও করিতে পারি না। অতি অল্প কালের মধ্যেই সূর্যের উত্তাপের কম্‌তি দেখিয়া বুঝিতে পারিব যে, সতি-সত্যিই সূর্য ছোট হইয়া যাইতেছে কি-না।

এই রকম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে যখন সূয্যিমামা পটল তুলিবেন, অর্থাৎ তাঁহার আর অস্তিত্বই থাকিবে না, তখন যে দুর্দশা হইবে পৃথিবীর, তাহার চিন্তাও মহা-ভয়াবহ। যত জল জমিয়া একেবারে পাথরের চেয়েও শক্ত হইয়া উঠিবে, কিন্তু দেখিতে হইবে খাসা—একেবারে হীরের টুকরোর মতন জ্বলজ্বলে! এই যে বাতাস যাহাকে এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা তখন বৃষ্টির মোটামোটা ফোঁটার মতো হইয়া ঝরিয়া পড়িবে। এই সব আবার গহ্বরে গহ্বরে জমিয়া কাঁচের চেয়েও স্বচ্ছ সরোবরে পরিণত হইবে, কিন্তু তাহাতে ঢেউ খেলিবে না, শুধু নির্বিকার, প্রশান্ত! কেননা তখন

বাতাসই যে বহিবে না। সমস্ত পৃথিবী তখন নির্দয় শীতের প্রকোপে জমিয়া স্থির নিশ্চল হইয়া যাইবে। শুধু নীহারিকা আর অস্পষ্ট কুয়াশা।

সূর্য আস্তে আস্তে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে, আবার সারাদিন অম্‌নি রক্তবর্ণ থাকিবে। ঠিক যেন আধো-নির্বাপিত একটা জ্বলন্ত গলিত লৌহপিণ্ড! দিনেই তখন সমস্ত আকাশ আরো উজ্জ্বল তারায় ভরিয়া উঠিবে! আল্লাহু আকবর!

Doomsday

A vastly experienced and wise scientist has recently come to the conclusion that doomsday is not as far away as we think. Let's go over what's been discussed over the last few years.

There's an indication that over the last half a century the icebergs in the southern polar regions have gradually gotten bigger. Edmont's Captain Smitherth first saw a 580 feet high iceberg. Then Mr. Scott saw one higher than 600 feet. But a sailor of Ezneta discovered an iceberg the size of a one thousand foot high mountain above sea level, startling the world. Later it was proven that this ice mountain was 9612 feet thick, meaning more that one and three-quarters miles wide.

The number of huge ice-capped mountains in the southern equatorial regions is increasing. Consequently the southern polar regions are warming up severely. The distant floating icebergs in the north are causing severe cold in southern Africa and southern America. The coldness here is not comparable to any other place. Recently it snowed at a place called Buenos Aires. There hasn't been snowfall in this country before.

What does it all mean? According to Professor Lewis and other major scientists, the Second Great Flood or Great Destruction is imminent on our Earth. Even if the whole world is not destroyed, without a question, at least a part of it will.

The ice-cap in the South Pole is fourteen hundred miles long; there is no reckoning of its width. Now, what are the consequences of this intolerable warming of the atmosphere in the South Pole? Everyone knows that ice melts when it's heated. Therefore, due to the excessive warming of the South Pole, its countless linked snow mountains will melt and disintegrate and sky-high waves like moving Himalayas will wash away everything in every direction. The first victim of this Great Flood

will be the lower regions of the Earth, that is, the southern continents.

During ancient times our ancestors were terrified of comets because they didn't know what a comet was. Our later ancestors learned more about it—still they too were very afraid of it and thought of it as a bad omen. They thought that the head of the comet was solid and if by chance one clashed against the Earth—that would be the end of the world.

Now we know that a comet is not solid or hard, rather, like fog, it is nebulous. Therefore, even if a comet clashed against the Earth, it wouldn't make a deep dent on the Earth's surface, nor would it succeed in throwing the Earth out of its orbit.

However, the famous French astronomer Camille Flammarion has arrived at a terrifying conclusion. That is, the nebulous tail of a comet is filled with poisonous gas. Therefore, if a comet comes in touch with the Earth, then due to the poisonous gas, instantly the Earth will turn lifeless, all its beauty and flavor will be wiped out forever!

The chemistry of a comet is not yet fully understood. But it is easy enough for all to understand that its tail is full of gas. This gas can easily suck-up the nitrogen from our Earth's atmosphere. If that's the case, then it's death in every direction! No wonder our ancestors disliked it so much! There's a saying: "He appears in my fate like a comet!" In the fate of the Earth too the comet is a bad omen or harmful.

So if it sucks-up the nitrogen, all we are left with is oxygen. True, oxygen enhances blood circulation and both mental and physical efficiency. But oxygen by itself is deadly. Therefore, breathing in and out the stimulant oxygen only will keep heating up our bodies—to our eventual ruin.

During the Coal Age the air of the Earth's atmosphere was very heavy due to carbonic acid. It was intolerable for humans. Only fish and reptilian creatures survived in flowing-water marshes and still air. Gradually, with the vast growth of floras and trees that poisonous still air began to disappear, the sky cleared and, as such, the air became suitable for warm blooded creatures.

Presently, human beings are very busy digging for and utilizing coal. Do you know how old this coal is? It is from the age of carbonic-acidic air many millions of years ago. And this coal may be the current state of trees and other vegetations of that period because it is the trees and other vegetations that are still capable of masterfully sucking up the carbonic acid.

Every coal burning or lighting up a match stick daily exhausts our useful oxygen.

A famous English scientist has recently announced that the world supply of oxygen is being depleted and consequently the air too is getting increasingly polluted. Therefore, the day is coming when everything in the world will transform to the creatures of the carbonic acid age.

Human beings will turn smaller and weaker, like Lilliputians, totally discomforted. Then, like it was in the beginning, these gigantic fish and serpent creatures will happily roam the Earth!

Many pre-historic slim, long, abhorrable reptilians-like the earthworm and snake-will rule our hills!

If humankind stops using the harmful coal (just the burning of coal destroys 1600 million tons of oxygen per year) and turns to using electricity, then we will face a new kind of problem. That means, whichever direction you turn to, death is inevitable. In the water, it's the crocodile, on the land, the tiger!

We can notice the gradual change in the climate. Thundering—especially during winter—is increasing. The simple reason—the collision between the electricity of the Earth and the air. So which way do we go? Perhaps that's why the song: "We'll die, my friend, we'll definitely die!!"

Suppose we multiply the use of electricity by a hundred or thousand times. Then, will flowers blossom in the spring, will plants grow new leaves? No. Instead, thundering will become our daily incidents. Hundreds and thousands of thunders will shred the world apart. A leading meteorolgist agrees with that. How terrible! What we should be doing now is to close our eyes and try our very best to believe that he is wrong and has misunderstood.

That giver of the light, the Sun—god-the Uncle Sun—not only does he generate light and heat, he is also the source of electrical energy. This uncle is the only one who understands the balancing of this mysterious power of Nature. Long live Uncle!

The power of the Sun is so immense that if all its rays and heat fell on our poor Earth then within a minute and a half, all the gigantic icebergs I mentioned earlier would begin to boil with a bubbling noise; and in another eleven seconds, all the vast oceans would evaporate and their bottoms would lie dried, cracked and shattered.

But the Sun itself is gradually shrinking, though it's not known by how much. Professor Burns claims that it is happening quite rapidly—beyond our imagination. In the near future, from the lowering heat from the Sun we'll be able to better understand whether or not the sun is shrinking.

It's terrible even to think about the condition of the Earth after the Sun has demised from shrinkage. All the water will solidify—even harder than rocks—but will be quite attractive to look at, like pieces of sparkling diamond. This invisible air will then drip down like thick drops of rain. These will then collect in pits to turn them into ponds or lakes—but without waves—only calm and peaceful! No wind will blow. The whole Earth will be motionless from the severity of merciless cold. Only the nebula and obscure fog will cover the Earth.

The sun will slowly turn crimson and stay that way throughout the day. Like a half-extinguished burning molten ball of iron. Even during the daytime the sky will be covered with bright stars! *Allahu-Akbar!**

*God is Great!, in Arabic.

Translated by Sajed Kamal

সত্যবাণী

ইসলাম জাগো! মুসলিম জাগো! আল্লাহ তোমার একমাত্র উপাস্য, কোরআন তোমার সেই ধর্মের, সেই উপাসনার মহাবাণী,—সত্য তোমার ভূষণ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা তোমার লক্ষ্য,—তুমি জাগো ! মুক্ত বিশ্বের বন্যশিশু তুমি, তোমার পোষ মানায় কে ? দুরন্ত চঞ্চলতা, দুর্দমনীয় বেগ, ছায়ানটের নৃত্য-রাগ তোমার রক্তে, তোমাকে থামায় কে ? উষ্ণ তোমার খুন, মস্ত তোমার জিগর, দারাজ তোমার দিল, তোমাকে রুখে কে ? পাষাণ কবাট তোমার বক্ষ, লৌহ তোমার পঞ্জর, অজেয় তোমার বাহু—তোমায় মারে কে? জন্ম তোমার আরবের মহামরুতে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা তোমার পর্বত গুহায়, উদাত্ত তোমার বিপুল বাণীর প্রথম উদ্বোধন 'কোহ-ই তুরের' নাঙ্গা শিখরে,—তুমি অমর, চির জাগ্রত। 'আল্লাহু আকবর' তোমার ওঙ্কার, আলি তোমার হুঙ্কার, তুমি অজেয় ! বীর তুমি, তোমার চিরন্তন মুক্তি, শাশ্বত বন্ধনহীনতা, 'আজাদীর' কথা ভুলায় কে ? তোমার অদম্য শক্তি, দুর্দমনীয় সাহস, তোমার বুকে খঞ্জর চালায় কে ? ইসলাম ঘুমাইবার ধর্ম নয়, মুসলিম শির নত করিবার জাতি নয়। তোমার আদিম জন্মদিন হইতে তুমি বুক ফুলাইয়া, শির উচ্চ করিয়া দুর্লংঘ, মহা পর্বতের মতো দাঁড়াইয়া আছ, তোমার গগনচুম্বী শিখরে আকাশ-ভরা তারার আলো, অর্ধচন্দ্রের প্রদীপ্ত প্রশান্তি জ্যোতি—তোমার সে মহাগৌরবের কথা বিশ্বে চির-মহিমান্বিত। মনে পড়ে কি, তোমার সেই রক্ত-পতাকা যাহা বিশ্বের সিংহদ্বারে উড়িয়াছিল,—তোমার সেই শক্তি যাহা দুনিয়া মথিত আলোড়িত করিয়াছিল? বলো বীর, বলো আজ তোমার সে শক্তি কোথায় ? বলো ভীরু, তোমার সে প্রচণ্ড উগ্র মহাশক্তিকে কে পদানত করিল ? উত্তর দাও ! তোমায় আমি আল্লার নামে আহবান করিতেছি, উত্তর দাও ! তোমার অপমান কেহ কখনও করিতে পারে নাই, ইসলাম অবমাননা সহে নাই। তুমি সত্য, ইসলাম সত্য, তোমার-আমার বা ইসলামের অপমান যে সত্যের অপমান। তাহা যে সহ্য করে, সে ভীরু—সে ক্ষুদ্র। যেদিন তুমি তোমার উদারবাণী মহাশিক্ষা ভুলিয়া স্বাধীনতার বদলে অধীনতার ছায়া মাড়াইতে গিয়াছ সেই দিনই তোমার শিরে মিথ্যার, দুশমনের ভীম প্রহরণ বাজিয়াছে। ইসলাম এক মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও নিকট শির নোয়ায় না। তোমার চির-উচ্চ চির-অটল ঋজু সেই শির আনত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাই আজ তুমি আঘাত পাইয়াছ, তাই তোমার বক্ষে বজ্রবেদন, শক্তিশেল বাজিয়াছে ! যদি আঘাতই খাইয়াছ, যদি আজ এমন করিয়া গভীর বেদনাই তোমার মর্মে বাজিয়াছে, যদি এই প্রথম অবমানিত হইয়াছ, তবে তোমার লাঞ্ছিত

সত্য, ক্ষুব্ধ শক্তি আবার উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের মতো উদ্বেলিত হইয়া উঠুক ! বলো, ইসলাম ভিক্ষা করে না, যাচঞা করে না। বলো, দুর্বলতা আমাদের ধর্মে নাই ! বলো, আমাদের প্রাপ্য আমাদের মুক্তি আমরা নিজের শক্তিতে লাভ করিব !... তোমার বাঁধে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, তোমাকে ইহা হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। তাই আজ আমরা আমাদের সারা বিশ্বের লাঞ্ছিত বিক্ষুব্ধ শক্তি লইয়া এই মুক্ত মহা-গগন-তলে দাঁড়াইয়া বলিতে চাই—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন!' এই মুক্ত গগনতল তোমার মহাতীর্থস্থান—আরাফাতের ময়দান অপেক্ষাও পবিত্র। এইখানে গৃহহীন পথহারা নিপীড়িত মুসলিম সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব পাইয়াছে, ঈদের দিনের মতো পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছে, বুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। এই উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া মুসলিম, আবার বলো, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' যদিও তুমি সর্বস্বহারা হও, কোথাও তোমার মাথা গুঁজিবার ঠাঁই না থাকে, কুছ পরোয়া নেই, তোমার মাথা নত করিও না। আবার সকলি পাইবে। মুসলিম হীন, এ ঘৃণার কথা শুনিবার পূর্বে কর্ণরন্ধ্রে সিসা ঢালিয়া বধির হইয়া যাও! তোমাদের এই 'ইখওয়াৎ'-কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের অন্তরের সত্য স্বাধীন শক্তিকে যেন কোনোদিন বিসর্জন না দিই। তোমার বীর ভাইগুলি ঐ যে তোমার দক্ষিণপার্শ্বে ইসলামের এই শাশ্বত সত্য রক্ষার জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, সেই শহীদায়েন নব্য তুর্কি-তরুণদের দেখো, আর গৌরবে তোমার বক্ষ ভরিয়া উঠুক। তাহাদের পানে তাকাও, তাহাদের অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা শোনো—তাহাদের হুঙ্কারে তোমার হিম-শীতল রক্ত উষ্ণ হইয়া বহিয়া যাক তোমার শিরায় শিরায়। মেঘ-মুক্ত প্রাবৃট-মধ্যাহ্নের রক্ত ভাস্কর তোমার বিপুল ললাটের ভাস্বর রাজটিকা হউক ! তুমি অমর হও ! তুমি স্বাধীন হও! তোমার জয় হউক !

The Word of Truth

Islam, awaken! Muslims, awaken! Allah is your sole object of worship. The Quran is the mighty word of that religion that worship. Truth is your adornment, equality, fraternity, and freedom are your goals—you, awaken! You are the wild child of the free world; who can tame you? Untamed restlessness, irresistible momentum, the dance-rhythm of a shadow-dancer are in your blood; who can stop you? Your blood is hot, your liver is strong, your heart is vast; who can hold you back? Your chest is a stone door, your ribs are iron, your arms are unconquerable—who can kill you? Your birth is in the great desert of Arabia, your life established in mountain caves, the first utterance of your vast words, grand and majestic, on the naked peak of *Koh-i-Tur*—you are immortal, eternally awake. *Allahu Akbar* is your roar, Ali is your battle cry; you are unconquerable! You are a hero. Who can make you forget your eternal liberation, your perpetual boundlessness, the talk of *Azadi* (freedom)? Who can stab your breast with a dagger against your indomitable strength, your irresistible courage? Islam is not a religion of slumber; the Muslim is not a people to bow their heads. From your primal birthday, you have stood with a puffed chest, head held high, like an insurmountable, mighty mountain. On your sky-kissing peak are the light of stars filling the sky, the radiant, tranquil glow of the crescent moon—your great glory is eternally glorified in the world.

Do you remember that **blood-stained banner** of yours that flew over the lions gate of the world—that power of yours that churned and stirred the world? Tell me, hero, where is that power of yours today? Tell me, coward, who brought your terrible, fierce great power to its knees? Answer me! I call upon you in the name of Allah, answer me! No one has ever been able to insult you; Islam has not tolerated dishonor. You are the truth, Islam is the truth. An insult to you—or to me, or to Islam—is an insult to truth. He who tolerates it is a coward—he is insignificant. The day you forgot your noble message and great teaching, and stepped into

the shadow of subservience instead of freedom, on that very day the terrible blows of falsehood, of the enemy, struck your head. Islam bows its head to no one but the one great Allah. Your eternally high, eternally unwavering forehead was ready to bow, that is why you have been wounded today, that is why a thunderous pain, a powerful blow, has struck your breast! If you have been wounded, if such deep pain has struck your core today, if you have been dishonored for the first time, then let your disgraced truth, your angered power, surge again like turbulent ocean waves!

Say, Islam does not beg, it does not plead. Say, weakness is not in our religion**!** Say, we will achieve our due, our freedom, by our own strength**...** Your dam has begun to crack; you must be saved from this. That is why today, with our disgraced, agitated power from all over the world, we stand beneath this open, vast sky and wish to declare—'Attain the mantra or sacrifice the body!' This open sky is your great holy place—even holier than the plain of Arafat. Here, homeless, lost, oppressed Muslims have found universal brotherhood, embraced each other like on Eid day, and held each other close to their hearts. Standing in this open expanse, Muslim, say again, 'Attain the mantra or sacrifice the body**.'** Even if you lose everything, even if you have no place to hide your head, no matter what, do not bow your head. You will gain everything again. Muslim is lowly—before hearing this hateful word, pour lead into your ears and become deaf! Let us never abandon the true, free power of our inner selves, centered on your '*Ikhwat*' (brotherhood).

Look at your heroic brothers on your right side who are sacrificing their lives with disdain to protect this eternal truth of Islam; behold the new Turkish youths in that field of martyrs, and let your breast be filled with pride. Look at them, listen to the clang of their weapons—let your ice-cold blood heat up and flow through your veins with their roar. May the blood-red sun of a cloudless midday be the shining royal mark on your vast forehead! May you be immortal! May you be free! May you be victorious!

Translated by Alamgir Mohammad

সত্য-শিক্ষা

তোরণে তোরণে ভৈরব-বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে—'জাগো পুরবাসি!' দিকে দিকে মঙ্গল-শঙ্খে তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিয়া আমাদের রক্তে রক্তে ছায়ানটের নৃত্যরাগ তুলিয়াছে। এই যে আমাদের জীবনের উন্মাদ নট-নৃত্য, এ শুধু বিশ্বের কল্যাণ-মুক্তিতে নয়, এই মুক্তি-যুগে আমরাও আমাদের ভাবী সিংহ-দ্বারের পূর্বতোরণে নহবতের বাঁশি শুনিয়াছি বলিয়া। তাই আর আমরা শুধু দার্শনিকের ভিতরের যুক্তিতে সন্তুষ্ট নই, এখন চাই বাইরের ব্যবহারিক জীবনে মুক্তি। এই 'আজাদী'র সাড়া না পাইলে আমাদের জীবনে আজ এমন তরুণের উচ্ছৃঙ্খলতা, সবুজের স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিত না। রক্তনিশান লইয়া আজ আমাদের নূতন করিয়া যাত্রা শুরু; এই শোভাযাত্রার দুর্মদ অগ্রযাত্রী আমাদের যে কিশোর আর তরুণের দল, সর্বাগ্রে তাহাদিগেরই অন্তরে বাহিরে 'আজাদী'র নেশা জমাইয়া তুলিতে হইবে। কারণ, ইহাদেরই নৃত্যবিদ্রোহে অলস ভীরু জীবন-পথ-যাত্রীর বুকে সাহস সঞ্চার হইবে। আমরা কিন্তু আমাদের এই উন্মুক্ত উদার প্রাণগুলির চারিপাশে নিত্য বন্ধন-বাধা সৃজন করিয়া তাহাদিগের উচ্ছল গতিকে অচল করিতেছি। তাই বিজাতির বিভিন্ন শৃঙ্খল কাটিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া আমরা আজ এত আনন্দধ্বনি করিতেছি। যাহাতে এই জাগরণ-যুগের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বাহিরে না হইয়া অন্তরে হয়, সেই জন্যই আমরা এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। আজ ইংরাজের সহযোগিতা বর্জন করিতেছি বলিয়াই যে রাগের মাথায় যেন-তেন-প্রকারণে দুই-একটা ঠাটকবাজি-গোছ জাতীয় স্কুল-কলেজ দাঁড় করাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহা নয়; অসহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও জাতীয়তার দিক দিয়া আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালো-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায়, আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহায়েৎ খর্ব করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মাঝেই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। তাই, এই সহযোগিতা বর্জনের দিনে 'খোশখবর কা ঝুটা ভি আচ্ছা' স্বরূপ আমাদের দীর্ঘ পরিপোষিত আশার কার্যে পরিণত হইবার কথা শুনিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ভাবী দেশসেবকের চরিত্র ও জীবন গঠিত হইবে, বিদেশের বিজাতির বিষাক্ত বাষ্প লাগিয়া তাহাদের মঞ্জুরিত জীবন-পুষ্প শুকাইয়া যাইবে না, বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে মিথ্যা স্বজাতি-স্বদেশে-অনাস্থা শিখাইয়া আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী অলস অকেজো করিয়া তোলা হইবে না,—ইহা কি কম সুখের কথা! তাহারা শিখিবে দেশের কাহিনী, জাতির বীরত্ব, ভ্রাতার পৌরুষ, স্বধর্মের সত্য—দেশের ভাইয়ের কাছ হইতে, তাহারা শিখিবে বীরের আত্মোৎসর্গ, কর্মীর ত্যাগ ও কর্ম, নির্ভীকের সাহস, দেশের উদাহরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া,—ইহা কি কম আনন্দের কথা! তাই আবার বলিতেছি, শুধু হুজুগে মাতিলে চলিবে না, গলাবাজির চোটে স্টেজ ফাটাইয়া তুলিতে হইবে না,—আমরা দেখিতে চাই কোন্ নেতার চেষ্টায় কোন্ দেশ-সেবকের ত্যাগে কতটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল! আমরা দেখিতে চাই, আমাদের কতগুলি তরুণের বুকে এই মহাশিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল! আমরা দেশ-সেবক চিনিব ত্যাগে, বক্তৃতায় নয়। আমরা দেখিতে চাই কবির ভবিষ্যদ্বাণী—"আসিবে সে দিন আসিবে" গান দিকে দিকে বৈতালিক-কণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে, —"দিন আগত ঐ!"

True Education

From gate to gate, the formidable horn has sounded: "Awaken, residents of the city!" Its echo rises in all directions with the auspicious conch, raising a shadow-dance in our blood. This ecstatic, wild dance of our lives is not only for the welfare and liberation of the world, but also because in this age of liberation, we too have heard the bugle call at the eastern gate of our future lion-gate. That's why we are no longer satisfied with mere philosophical arguments; now we seek liberation in practical life outside. If we didn't feel this call for *Azadi* (freedom), the current youth's unrestrained enthusiasm, the green's self-will, wouldn't be visible in our lives today.

With the banner of blood, our journey begins anew today; the indomitable vanguards of this procession, our groups of adolescents and youth, must first and foremost be filled with the intoxicating spirit of *Azadi* in their hearts and minds. Because their rebellious dance will infuse courage into the hearts of lazy, timid life-travelers. Yet, we constantly create bonds and barriers around these open, generous hearts of ours, immobilizing their vibrant movement. That's why we celebrate so much today upon hearing about the establishment of national schools, cutting through various chains of foreign rule. To ensure that the establishment of these national schools, as a symbol of this age of awakening, takes place internally rather than merely externally, we are discussing this matter briefly. It's not that simply because we are boycotting British cooperation today, we must, in a fit of rage, hastily set up a few showy national schools and colleges and then withdraw; the establishment of our national schools should have happened much earlier from a nationalistic perspective, even if the season of non-cooperation hadn't arrived. Through foreign imitation, we are gradually losing our national distinctiveness. In most cases, our blind imitation has turned into laughable 'apeing.' Accepting all good and bad of others as good severely curtails the self, one's own power, and national truth. Losing one's own power and the

distinctiveness of one's own nation is a great insult to humanity. One must find the world within one's own country, and play the melody of the infinite within the finite. Therefore, on this day of boycotting cooperation, we feel satisfied to hear that our long-cherished hope is turning into reality, like the saying, "Even a false good news is good."

The character and life of our future nation-builders will be formed based on national distinctiveness; their blossoming life-flowers will not wither from the poisonous vapor of foreign lands and foreign races, nor will they be forcibly taught false disbelief in their own nation and country, rendering them faithless, lazy, and useless in their self-power—is this not a great joy! They will learn the story of their country, the heroism of their nation, the manliness of their brothers, the truth of their own religion—from their countrymen; they will learn the self-sacrifice of heroes, the dedication and work of activists, the courage of the fearless, inspired by the examples of their own land—is this not a great joy! So, I say again, it's not enough to merely get caught up in the fervor; there's no need to burst the stage with shouts and cheers—we want to see how many national schools have been established through the efforts of which leader and the sacrifice of which nation-builder! We want to see how many of our youth have instilled the spirit of this great education in their hearts! We will recognize nation-builders by their sacrifice, not by their speeches. We want to see the poet's prophecy—"That day will come, that day will come" being proclaimed in panegyric voices everywhere, —"The day has arrived!"

Translated by Alamgir Mohammad

হিন্দু-মুসলমান

একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন, দেখ, যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?

হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারেবারে গুরুদেবের ঐ কথাটাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উদয় হয় মনে, যে এ-ন্যাজ গজালো কি করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়? ঐ সঙ্গে এটাও মনে হয়, ন্যাজ যাদেরই গজায়—তা ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক—তারাই হয়ে ওঠে পশু। যে সব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে—শৃঙ্গরূপে, তাদের তত ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেই সব পশুদের দেখে—যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা ফুটে বেরোয়নি! শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ব্যাঘ্র-ভল্লুক জাতীয় পশুগুলো বেশি হিংস্র—বেশি ভীষণ। এ হিসেবে মানুষও পড়ে ঐ শৃঙ্গহীন বাঘ-ভালুকের দলে। কিন্তু, বাঘ-ভালুকের তবু ন্যাজটা বাইরে, তাই হয়তো রক্ষে। কেননা, ন্যাজ আর শিং দুই-ই ভেতরে থাকলে কী রকম হিংস্র হয়ে উঠতে হয়, তা হিন্দু-মুসলমানের ছোরা-মারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।

যে প্রশ্ন করছিলাম, এই যে ভেতরের ন্যাজ, এর উদ্ভব কোথায়? আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে। টিকিপুর ও দাড়ি-স্তানই বুঝি এর আদি জন্মভূমি। পশু সাজবার মানুষের একি 'আদিম' দুরন্ত ইচ্ছা!—ন্যাজ গজাল না বলে তারা টিকি দাড়ি জন্মিয়ে যেন সান্ত্বনা পেল!

সে দিন মানব-মনের পশু-জগতের না জানি কী উৎসবের সাড়া পড়েছিল, যে দিন ন্যাজের বদলে তারা দাড়ি-টিকির মত কোনো কিছু একটা আবিষ্কার করলে!

মানুষের চিরন্তন আত্মীয়তাকে এমনি করে বৈরিতায় পরিণত করা হলো দেওয়ালের পর দেওয়াল খাড়া ক'রে। ধর্মের সত্যকে সওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্র যুগে যুগে অসহনীয় হয়ে উঠেছে বলেই তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষও বিদ্রোহ করেছে। হিন্দুত্ব-মুসলমানত্ব দুই-ই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব! তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত

চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ারে কোনো দিনই ঠোকাঠুকি বাঁধবে না, কারণ তাঁরা দুইজনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের ওপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম গিয়ে মিশেছে ওঁর মধ্যে। এত মারামারির মধ্যে এইটুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে 'ক্লিন'। টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।

অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রিশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি—আলোর মতো, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রিস্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রিস্ট ক্রিশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রিস্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি! আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে। বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় আমরা সূর্য নিয়ে ঝগড়া করতাম। এ বলতো আমাদের পাড়ার সূর্য বড়; ও বলতো আমাদের পাড়ার সূর্য বড়! আমাদের গভীর বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক পাড়ায় আলাদা আলাদা সূর্য ওঠে! স্রষ্টা নিয়েও ঝগড়া চলেছে সেই রকম। এ বলছে আমাদের আল্লা; ও বলছে আমাদের হরি। স্রষ্টা যেন গরু-ছাগল! আর তার বিচারের ভার পড়েছে জাস্টিস স্যার আবদুর রহিম, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির ওপর! আর বিচারের ফল মেডিক্যাল কলেজে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে!

নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে দেখি, একটা লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ-প্রশ্ন করবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান। একজন মানুষ ডুবছে, এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটা হিন্দু—তার জন্য তো তার আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় না। তার মন বলে, 'আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি—আমারই মতো একজন মানুষকে।'

কিন্তু আজ দেখছি কি? ছোরা খেয়ে যখন খায়রু মিয়া পড়ল, আর তাকে যখন তুলতে গেল হালিম, তখন ভদ্র সম্প্রদায় হিন্দুরাই ছুটে আসলেন, 'মশাই করেন কি? মোচলমানকে তুলছেন! মরুক ব্যাটা!' তারা 'অজাতশ্মশ্রু' হালিমকে দেখে চিনতে পারেনি যে সে মুসলমান। খায়রু মিয়ার দাড়ি ছিল। ছোরা খেয়ে যখন ভুজালি সিং

পড়ল পথের উপর তাকে তুলতে গিয়ে তুর্কিছাঁট-দাড়ি শশধর বাবুরও ঐ অবস্থা!

মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর ন্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার ওপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুঙ্গিকে, মারছে নেঙ্গোটিকে; মারছে টিকিকে, দাড়িকে! বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই!

মানুষ কি এমনি অন্ধ হবে যে, সুনীতি বাবু হয়ে উঠবেন হিন্দু-সভার সেক্রেটারি এবং মুজিবর রহমান সাহেব হবেন তঞ্জিম তব্‌লিগের প্রেসিডেন্ট?...

রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম, একটা বলদ যাচ্ছে, তার ন্যাজটা গেছে খসে। ওরই সাথে দেখলাম, আমার অতি বড় উদার বিলেত-ফেরত বন্ধুর মাথায় এক য়্যাব্বড় টিকি গজিয়েছে!

মনে হলো, পশুর ন্যাজ খসছে আর মানুষের গজাচ্ছে!

Hindu and Muslim

On one occasion I was speaking to poet *Rabindranath Tagore* about the problems among Hindus and Muslims. Tagore said, "When there is a tail outside of someone's body that can be cut off, but how to cut the tail within the body?"

When we speak about the differences between Hindus and Muslims, that is what comes to my mind, and immediately I also wonder when did this tail come into being and at what point? I also thought that those who have tails (be it inside or out) are actually animals. Some of these animals with tails are known to be ferocious and that seems straightforward. I am afraid of those animals that have hidden horns, but are ferocious anyway. In general, the animals without horns such as tigers and bears are more ferocious than the cows or buffaloes (with horns). Human beings also fall under the category of tigers and bears, only the latter have a tail outside. If one sees the riots between Hindus and Muslims they will have an idea about the ferociousness of animals which possess both tails and horns within.

I have asked where the tail inside the body came from. I think that the pious topknot and the beard are the breeding grounds of the tail. What a longing for men to pose as `animals'! Because they could not grow a tail, they are trying to compensate by growing a topknot of hair and keeping a beard. When a beard and the topknot were discovered instead of a tail, it must have caused a great ripple in the lives of the animals with a human mind.

People have had commonalities and friendship, to turn that into enmity is to build walls between them. We can accept the truth of religion, but dogmas are becoming so repulsive that humans are rebelling against them. Hinduism is tolerable, so are

Islamic traits, what is not tolerable is the beard-ism and topknot-ism, because they are at loggerheads. The topknot display is not Hinduism, it is of the pundits. Beards are also not Islamic symbols, but the signs of the mollahs. We are having fights between the long hair of these two kinds of `ism'. Today's fight is between the pundits and the mollahs, it is not a fight between Hindus and Muslims.

There is no fight between the swords of Narayan and Allah, because they are the same and the sword from one hand will not hurt the other. He is universal, He has been internalized by all and the good thing is that Allah alias Narayan is neither Hindu nor Muslim. He is really ` clean', he neither has a beard nor a topknot. I am upset with the beard and topknot because they are constant reminders of our differences. These external signs prevent people from being close to each other through their brotherhood.

None of the deities or prophets has ever claimed that they have arrived for Hindus or Muslims or Christians. They have said, we are here for the people, like the light, like the sun, we are for everyone. But followers of Krishna claimed that he was for the Hindus, Mohammadans claimed Mohammad was for them and Christian followers claimed that they were for the Christians. Krishna- Mohammad- Christ turned into national assets, and hence the problems with property. No one fights about the sunlight, but people do fight about cows and goats. I remember when we were young we used to fight about the sun. One group said that the sun in their village was larger and another group said, no there's was. We were most certain that every area had its own sun. We are fighting about the Creator in a similar fashion. One says this is our Allah, another uses the name of Hari. As if the Creator is equivalent to cows and goats. The judges are Justice Abdur Rahim and Pundit Modonmohan Malabba, and the results are obvious if you can visit the patients in the medical colleges!

When someone passes by a river and finds a person drowning, he never asks if the drowning man is a Hindu or Muslim. His first thought is to save the person, so he jumps into the river. If a Hindu saves a Muslim or vice versa, it does not affect the satisfaction of the rescue. He tells himself, "One human has saved another."

But what do we find today? If Khairul Miah was hurt by a dagger and Halim goes to save him, the Hindu guys run after him saying, "Oh you are saving a Muslim? Let him die." They could not recognize their eternal enemy Halim, he was a Muslim! Khairul Miah had a beard and hence recognizable. When Bhujali Singh was injured by a dagger and fell into the road Mr. Shoshodhor faced the same problem, he had a beard like a Muslim, everyone thought he was so (actually he was a Hindu).

People have become animals and forgotten their eternal bondage as human beings. The animals have hair all over their faces and even over their head. They are hitting out at *lungis* and loin cloths, they are hitting out at beards and topknots. There's no end to the fights over these superficial signs!

Why should people become so blind and why should Suniti become the secretary of the Hindu society and Mujibur Rahman the president of Tanjim Tablig?

When I was walking down the road, I found a cow without a tail. At that instance, I met my friend who had just returned from England, he had just grown a long topknot. I felt that the animal was shedding its tail and the human is acquiring one!

Translated by Nashid Kamal

Speeches and Addresses
অভিভাষণ ও প্রতিভাষণ

জন-সাহিত্য

[১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা ৫নং ম্যাঙ্গো লেন দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার অফিসগৃহে, জন-সাহিত্য সংসদের শুভ-উদ্বোধনে সভাপতি কাজী নজরুল ইসলামের প্রদত্ত ভাষণ।]

সাহিত্যে সবারই প্রয়োজন আছে, দুনিয়ায় হাতিও আছে, আরশুলাও আছে। তাদের কে বড় কে ছোট, বলা যায় না। তার কারণ, হাতি খুব বড়, কিন্তু আরশুলা উড়তে পারে।

জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হল জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের পরিবেশন করা। আজকাল সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা জনগণের একটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে; এর সমাধানও জনসাহিত্যের একটা দিক। সাময়িক পত্রিকাগুলোর দ্বারা আর তাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্বারা কিছুই হবে না। সম্পাদকীয় মত উপর থেকে উপদেশের শিলাবৃষ্টির মতো শোনায়। তাতে জনগণের মনের উপর কোনো ছাপ পড়ে না—জনমতও সৃষ্টি হয় না।

যাঁদের গ্রামের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সেখান থেকেই তাঁদের সাহিত্য আরম্ভ করুন। স্থায়ী সাহিত্য চাই। বক্তৃতা, প্রবন্ধ তাদের প্রাণে দাগ কাটতে পারে না। তাদের মতো করে তাদের কথা, তাদের গল্প বলুন। তারা তো বুঝতে পারে না। কিন্তু সাবধান, আপনাদের মুরুব্বিয়ানা ভাব প্রকাশ না পায় তার মধ্যে, তা হলে তারা পালিয়ে যাবে। চাষীরাও আয়না রাখে; নিজেদের চেহারা যদি তার মধ্যে দেখতে পায় তবে যত্ন করে রাখবে।

আমিও একবার ভাবছিলাম; জারির গান, গাজির গান ওদের ভাষায় লিখে ওদের জন্য চালাব তা হয়ে ওঠে নাই।

এ প্রসঙ্গে আমার নিজের বিষয়ে কিছু বক্তব্য আমার আছে। কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি, আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সংগীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনো আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সংগীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।

আমি আট বছর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন যৌবন ছিল, আর আমিও তার চঞ্চলতা নিয়ে যুবক। কিছুর ভয় করিনি। খেতাম হোটেলে, শুতাম মসজিদে, ছেলেদের খুব ভালবাসতাম, কিন্তু বহু মেশার পরেও আমি দেখলাম তাদের সাথে যেন আমার মিশ খাচ্ছে না। আমি নিজেকে দোষ দিয়েছি; আমার নিজের ব্যর্থতায় আমি নিজেকেই দায়ী করেছি। তারপর সে-পথ ছেড়ে যে-পথে আজ চলেছি সে-পথে এসে পড়লাম। আর মনে করলাম, ও-পথের যোগ্য আমি নই। ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার আত্মবিশ্বাস নেই। আমার নিজের উপর যে-সম্বন্ধে নিজেরই বিশ্বাস নেই, সে-সম্বন্ধে নেতৃত্ব করা আমার সাজে না।

আজকাল জনসাধারণের জন্য দরদ জেগেছে সবার মধ্যে, কত রকম 'ইজম' মতবাদ এরজন্য সৃষ্টি হয়েছে। যা-ই হোক, তাদের এই দরদ যদি সত্যিকারের প্রাণের দরদ হয়, তবেই মঙ্গলের। বাইর থেকে তাদের দরদ দেখালে তারা বিশ্বাস করে না। তাদেরই একজন হতে হবে। তাদের কাছে টর্চলাইট হাতে নিয়ে গেলে তারা সরে দাঁড়াবে, কেরোসিনের ডিবে হাতে করে গেলে, তার থেকে যত ধোঁয়াই বের হোক না কেন, তাদেরকে আকর্ষণ করবেই। কারণ, টর্চলাইটে তারা অনভ্যস্ত। ওতে তাদের চোখ ঝলসায়। কেরোসিনের ডিবে ওদের নিজেদের জিনিস। অবশ্য যাদের টর্চ-লাইটই সম্বল, তাদের পথ শহরের দিকে; গ্রামের দিকে, জনসাধারণের দিকে গেলে তাদের ঠিক হবে না। যাঁরা ইনটলেকচুয়াল, তাঁদের আমি জনসাহিত্য গড়ার জন্য আসতে বলি না। কিন্তু এমনও তো সাহিত্যিক আছেন, যাঁদের সম্বল কেরোসিনের ডিবে। এ পথ কিন্তু সোজা নয়। কঠিন। ত্যাগ চাই এর পিছনে। পরে দুঃখ করলে কোনো লাভ হবে না। জনসাধারণের সে সমস্যা, তা সাহিত্যিকরাই সমাধান করতে পারবেন।

জনগণের সাথে সম্বন্ধ করতে হলে তাদের আত্মীয় হতে হবে। তারা আত্মীয়ের গালি সহ্য করতে পারে, কিন্তু অনাত্মীয়ের মধুর বুলিকে গ্রাহ্য করে না।

ওদের জন্য যে সাহিত্য, তা ওরা এখনো যেমনভাবে পুঁথি পড়ে, আমির হামজা, সোনাভান, আলেফ লায়লা, কাছাছল আম্বিয়া পড়ে, তখনো সেইভাবে পড়বে। ওদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ওদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। যা বলবার বলতে হবে। কিন্তু যেন মাস্টারি-ভাব ধরা না পড়ে। সে জন্য তথাকথিত ভদ্র-পোশাক-পরিহিত ভদ্রলোকদের নেমে আসতে হবে কাদার মধ্যে—ওদেরকে টেনে তোলার জন্য। নেমে এসে যদি ওদের ওঠানোর চেষ্টা করা হয়, তবে সে-চেষ্টা সফল হবে, নইলে না।

আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজ-নীতি সবই টবের গাছ। মাটির সাথে সংস্পর্শ নেই। কিন্তু জনসাহিত্যের জন্য জনগণের সাথে যোগ থাকা চাই। যাদের সাহিত্য সৃষ্টি করব, তাদের সম্বন্ধে না জানলে কী করে চলে?

একমাত্র সন্তান মরে গেছে, পুরুষ বিদ্রোহ করে খোদার বিরুদ্ধে, কিন্তু স্ত্রী তাকে বলে খোদার মহান উদ্দেশের উপর বিশ্বাস রাখতে। এদের খবর, এদের প্রাণের খবর কে রাখে? এদের কাছে যেতে জানতে হবে এদের।

নিজের কওমের যদি মঙ্গল করতে চাই, তবে তার জন্য অপর কাউকে গাল দেয়ার দরকার করে না। যারা অপরকে গাল দিয়ে 'কওম' 'কওম' করে চিৎকার করে, তারা ঐ এক-পয়সায় মক্কা-মদিনা-দেখানোওয়ালাদেরই মতো। তারা কওমের জন্য চিৎকার করতে করতে হয়ে যান মন্ত্রী, আর ত্যাগ করতে করতে বনে যান জমিদার। কওমের খেদমত করতে করতে কওম যাচ্ছে গরিব হয়ে, আর গড়ে উঠেছে নেতাদের দালান-ইমারত। হজরত ওমর, হজরত আলি এঁরা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছেন; কিন্তু নিজেরা কুঁড়ে-ঘরে থেকেছেন, ছেঁড়া কাপড় পরেছেন, সেলাই করে, কেতাব লিখে, সেই রোজগারে দিনপাত করেছেন। ক্ষিধেয় পেটে পাথর বেঁধে থেকেছেন; তবু রাজকোষের টাকায় বিলাসিতা করেননি। এমন ত্যাগীদের লোকে বিশ্বাস করবে না কেন?

কওমের সত্যিকার কল্যাণ করতে হলে ত্যাগ করতে হবে হজরত ইব্রাহিমের মতো।

দুদিন বাদে কোরবানির ঈদ আসছে। ঈদের নামাজ আমাদের শিখিয়েছে, সত্যিকার কোরবানি করলেই মিলবে নিত্যানন্দ। আমরা গরু-ছাগল কোরবানি করে খোদাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছি। তাতে করে আমরা নিজেদেরকেই ফাঁকি দিচ্ছি। আমাদের মনের ভিতর যেসব পাপ, অন্যায়, স্বার্থপরতা ও কুসংস্কারের গরু-ছাগল—যা আমাদের সৎবৃত্তির ঘাস খেয়ে আমাদের মনকে মরুভূমি করে ফেলছে—আসলে কোরবানি করতে হবে সেইসব গোরু-ছাগলের। হজরত ইব্রাহিম নিজের প্রাণতুল্য পুত্রকে কোরবানি করেছিলেন বলেই তিনি নিত্যানন্দের অধিকারী হয়েছিলেন। আমরা তা করিনি বলে আমরা কোরবানি শেষ করেই চিড়িয়াখানায় যাই তামাসা দেখতে। আমি বলি ঈদ করে যারা চিড়িয়াখানায় যায় তারা চিড়িয়াখানায় থেকে যায় না কেন?

এমনি ত্যাগের ভিতর দিয়ে জনগণকে যারা আপনার করে নিতে পারবে তারাই হবে জনগণের নায়ক।

নয়া জামানা
১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৪৫

Public Literature

[Kazi Nazrul Islam's speech as president at the inaugural ceremony of the "Public Literature Council" at the office of the daily "Krishak" newspaper at 5 Mango Lane, Calcutta, in 1938.]

There is a need for everyone in literature. In the world, there are both elephants and cockroaches. It is impossible to say who is bigger or smaller. The reason is that elephants are very big, but cockroaches can fly.

The purpose of public literature is to create public opinion and to provide enjoyment for the people. Nowadays, the issue of communalism has become a huge problem for the people; its solution is also one aspect of public literature. Nothing will be accomplished by the temporary magazines or their editorial essays. Editorial opinions sound like a shower of advice from above. They do not make any impression on the minds of the people—nor is public opinion created.

Those who have experience of village life should start their literature from there. We need lasting literature. Speeches and essays cannot leave a mark on their souls. Speak to them in their own way, tell their stories. They will understand. But be careful, do not let a patronizing attitude be expressed within it, or they will run away. Farmers also keep mirrors; if they see their own faces in them, they will cherish them.

I also once thought; I would write *Jari* songs and *Gazi* songs in their language and distribute them for them, but it didn't happen.

In this regard, I have something to say about myself. I don't know what I have given to poetry and literature. I have simply expressed what came from my emotions, I have said what I felt. There was no pretense in it. But I have faith that what I have given to music—even if there is no discussion about it today—when there is a discussion in the future, when history is written,

everyone will remember my words. I do not know the extent of my contribution to literature. But I remember this much: I have been able to contribute something to music.

I have spent eight years wandering from village to village. I was in my youth, and I was a young man with its restlessness. I was afraid of nothing. I would eat at hotels and sleep in mosques. I loved the boys very much, but after a lot of socializing, I saw that I didn't seem to fit in with them. I blamed myself; I blamed myself for my own failure. Then I left that path and came to the path I am on today. And I thought, I am not worthy of that path. I have no self-confidence about that literature. It is not becoming of me to lead on something that I have no faith in myself.

Nowadays, a love for the common people has awakened in everyone. Many different types of "isms" have been created for this purpose. Whatever it is, it is only for the good if this love is a sincere love from the heart. If you show them love from the outside, they will not believe you. You must become one of them. If you go to them with a flashlight in your hand, they will move away. If you go with a kerosene lamp in your hand, no matter how much smoke it emits, it will attract them. Because they are not used to flashlights. It blinds their eyes. The kerosene lamp is their own thing. Of course, those who only have flashlights as their resource, their path is towards the city; it would not be right for them to go towards the village, towards the common people. I do not ask intellectuals to come and create public literature. But there are also writers whose resource is a kerosene lamp. But this path is not easy. It is difficult. It requires sacrifice. There is no use in regretting it later. The problems of the common people can only be solved by writers.

To connect with the people, you must become their kin. They can tolerate an insult from a relative but will not pay attention to the sweet words of a stranger.

The literature for them is what they still read, just as they read *Puthis like* Amir Hamza, Sonabhan, Alif Laila, and Qasas-al-Anbiya. You have to educate them through their literature. You have to say what needs to be said. But do not be a teacher. For

that, the so-called gentlemen in polite clothes must come down into the mud—to lift them up. If an attempt is made to lift them up after coming down, that effort will be successful, otherwise it will not.

Nowadays, our literature and social policy are all like pot plants. They have no contact with the soil. But for public literature, there must be a connection with the people. How can we write literature for them if we don't know about them?

A man's only child has died, and he rebels against God, but his wife tells him to have faith in God's great purpose. Who takes notice of their news, the news of their souls? To go to them, you have to know them.

If you want to do good for your community, you do not need to insult others. Those who shout "community, community" while insulting others are like those who show Mecca-Medina for one pice. While shouting for the community, they become ministers, and while making sacrifices, they become landowners. While serving the community, the community becomes poor, and the leaders' buildings and mansions are built. *Hazrat* Omar, *Hazrat* Ali—they ruled half the world; but they stayed in huts, wore torn clothes, and lived their lives by sewing and writing books. They stayed with a stone tied to their hungry stomachs; yet they did not live extravagantly with the money of the state treasury. Why would people not believe in such selfless people?

To do true good for the community, one must make sacrifices like *Hazrat* Ibrahim.

The festival of *Eid-ul-Adha* is coming in two days. The Eid prayer has taught us that we will find eternal joy only if we make a true sacrifice. We are trying to deceive God by sacrificing cows and goats. By doing so, we are deceiving ourselves. The cows and goats of sin, injustice, selfishness, and superstition within our minds—which have eaten the grass of our good qualities and made our minds a desert—it is those cows and goats that we must truly sacrifice. It is because Hazrat Ibrahim sacrificed his son, who was as dear as his own life that he became the owner of eternal joy. Because we have not done that, we go to the zoo to watch a

show after Eid. I say, those who go to the zoo after Eid, why don't they stay there?

Only those who can make the people their own through such sacrifice will become the leaders of the people.

Naya Jamana 1st year, 4th issue Falgun, 1345

Translated by Alamgir Mohammad

প্রতিভাষণ

[১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর মোতাবেক ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিপুল সমারোহে ও আন্তরিকতা সহকারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনা-সভার সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণের পর জাতির পক্ষ থেকে 'নজরুল-সংবর্ধনা সমিতির সভ্যবৃন্দ' কবিকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। সভায় মানপত্রটি পাঠ করেন মি. এস. ওয়াজেদ আলি। অভিনন্দনের উত্তরে কবি নিম্নলিখিত 'প্রতিভাষণ' দান করেন। কবির প্রত্যুত্তরের পর শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু আবেগোচ্ছল কণ্ঠে কবির স্বদেশী-সংগীত ও দেশাত্মবোধমূলক কবিতার প্রশংসা করে এক বক্তৃতা দেন।]

বন্ধুগণ!

আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে দিলেন, আমি তা মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটিমাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

এক-বন ফুল মাথা পেতে নেবার মতো হয়তো মাথায় আমার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কী দিয়ে? আমার হৃদয়-ঘট যে ভরে উঠলো!

নদীর জল মঙ্গল অভিষেকের ঘটে বন্দি হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বলতে না পারি, আপনারা আমার সে অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে-নদীর জলধারা, সেই নদীকূলে যাবেন আপনারা, তবে না চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান সেখানে শুনতে পাবেন।

আজ বলবার দিন আপনাদেরই, আমার নয়। তাছাড়া, আপনাদের ভালোবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্তত আজকের দিনে যে হারিয়ে দিতে পারব, সে ভরসা আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভদৃষ্টির বধূর মতো লাজকুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচুনে মেয়েই হয়, অন্তত আজকের দিনে তাকে নাচতে বলবেন না।

আজ হয়তো সত্যি-সত্যিই আমার অভিনন্দন হয়ে গেল। এ শুধু আপনাদের—যাঁরা এ-সভায় এসেছেন ফুলের সওগাত নিয়ে, তাঁদের বলছিনে। আমি নেপথ্যের সেই বড় বন্ধুদের কথা বলছি, যাঁরা এখানে না এলেও আমার কথা ভুলতে

পারছেন না এবং হয়তো একটু বেশি করেই স্মরণ করছেন,—ফুল-ফোটানোর চেয়ে হুল-ফোটানোতেই যাঁদের আনন্দ!

ও-দিক দিয়ে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যিই একটু বেশি রকমের প্রসন্ন। যাঁরা আমার বন্ধু, তাঁরা যেমন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভালোবাসেন, যাঁরা বন্ধুর উল্টো, তাঁরা তেমনি চুটিয়ে বিপক্ষতা করেন। ওতে আমি সত্যি-সত্যিই আনন্দ উপভোগ করি। পানসে বন্ধুত্বের চেয়ে চুটিয়ে শত্রুতা ঢের ভালো। বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ বাগসই করে জড়িয়ে ধরতে না পারলে হয় না। যিনি আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকেন, তিনি আমার নিশ্চয়ই পরম অথবা চরম আত্মীয়। আজকের দিনে তাঁদেরও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-নমস্কার নিবেদন করছি।

আমার বন্ধুরা যেমন পাল্লার একধারে প্রশংসার পর প্রশংসার ফুলপাতা চড়িয়েছেন, অন্য পাল্লায় অ-বন্ধুর দল তেমনি নিন্দার ধুলো-বালি-কাদামাটি চড়িয়েছেন, এবং ঐ দুই তরফের সুবিবেচনার ফলে দুই ধারের পাল্লা এমন সমভার হয়ে উঠেছে যে, মাঝে থেকে আমি ঠিক থেকে গেছি, এতটুকু টলতে হয়নি।

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো লেগেছে'-টাকে ভালো করে বলতে পারার এই উৎসবে আমার একটিমাত্র করণীয় কাজ আছে, সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ করে মুক্তি দিন। আমাকে বড়-বলার বড়-বলি করবেন না। সভার যূপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সবার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক বলেই যদি আমায় ধরে এনে শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধরে এনে তাঁকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।

শুধু লেখা দিয়ে নয়, আমায় দিয়ে যাঁরা আমায় চেনেন, অন্তত তাঁরা জানেন যে, সত্যি-সত্যিই আমি ভালো মানুষ। কোনো অনাসৃষ্টি করতে আসিনি আমি। আমি যেখানে ঘা দিয়েছি, সেখানে ঘা খাবার প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। পড়-পড় বাড়িটাকে কর্পোরেশনের যে-কর্মচারী এসে ভেঙে দেয়, অন্যায় তার নয়, অন্যায় তার যে ঐ পড়-পড় বাড়িটাকে পুষে রেখে আরো দশজনের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করে রাখে।

আমাকে 'বিদ্রোহী' বলে খামাখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোন দিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

এ-কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কিটসের মতো আমারও মন্ত্র—'Beauty is truth, truth beauty.'

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে; কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি, আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি। যেন মরুপথে পথ না হারাই। এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ-শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান-সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথযাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিলফণা ভুজঙ্গ প্রখর-দর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি! এবং তাদের নখর-দংশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

ঈশান-কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষারঘন প্রশান্তি দেখে, নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশি যেদিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আসবে তার পূর্ব-পরিচয় নিয়ে। নব-বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মতো হলুম না বলে, তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি। বনের পাখি নীড়ের ঊর্ধ্বে উঠে গান করে বলে বন তাকে কোনোদিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে বলে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়তো সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেইটুকুই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। আমগাছকে চৌ-মাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠেঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পারবে না। উল্টো এ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে।

যৌবনের রক্ত-শিখা মশাল ধরে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই বলে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না—আমিও আছি তাঁদের দলে; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান

হয়ে। ফুল-মেলার নওরোজে আমায় খরিদদাররূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যানমূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠবে সেদিন আমিও আসব ঐ মেলায় শাহজাদা খুররমের মতোই আমার চোখে তাজের স্বপ্ন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।

কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডসেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে-হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে, আমার গাঁটছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।...

বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধুলো-বালি, এত ধোঁয়া, এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপবর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভবে, আমিও মরব।

কিন্তু এ যদি বেদনা-সাগর মন্থনের হলাহলই হয় তা হলে ঐ সমুদ্র-মন্থনের সব দোষ অসুরদেরই নয়, অর্ধেক দোষ এর দেবতাদের। তাঁদের সাহায্য ছাড়া তো এ সমুদ্র-মন্থন-ব্যাপার সহজ হত না। তবু তাঁদের বলি, আজকের হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা—র'সে খান, অমৃত আছে, সে উঠল বলে।

আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি-নমস্কার জানাচ্ছি। আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হতে এসেছি আজ। আপনাদের আমার অজস্র ধন্যবাদ।

A Word in Response

[On Sunday, December 15, 1929 (19th of *Agrahayana*, 1336 according to the Bengali calendar), poet Kazi Nazrul Islam was honored with a huge celebration and sincere reception by the Hindus and Muslims of Bengal at the Albert Hall in Calcutta. Following the welcome address by the president of the reception ceremony, Acharya Prafulla Chandra Roy, the members of the "Nazrul Reception Committee" presented the poet with a citation on behalf of the nation. Mr. S. Wajed Ali read the citation at the meeting. In response to the tribute, the poet delivered the following "Word in Response." After the poet's reply, Subhas Chandra Bose gave an emotional speech, praising the poet's patriotic songs and poems.]

My friends!

I accept the gift you have placed in my hands and hold it to my head. My whole body, mind, and soul have now become like a *vina*, resonating with a single tune: I am blessed, I am blessed.

Just as a forest of flowers may lack a head to receive them, perhaps my head lacks enough hair for all this, but with what can I receive such heartfelt love? My heart's vessel is overflowing!

The water of the river, confined to the holy urn for a blessing, has lost its voice. If I am unable to say anything today, please forgive my inadequacy. Go to the bank of the river, for I am a stream of that river. Then, without even asking, you will hear my language, my song, there.

Today is your day to speak, not mine. Besides, I have no hope of being able to overcome your exaggerated affection, at least not today. Today my language is like a timid and veiled bride with an auspicious gaze. Even if she is a dancing girl, please don't ask her to dance today.

Perhaps today my reception has truly taken place. I am not speaking only to those of you who have come to this meeting with

a gift of flowers. I am talking about those great friends behind the scenes, who, even though they are not here, cannot forget me and perhaps remember me a little more—those who find joy in making thorns bloom rather than flowers!

In that regard, my Lady Luck has been truly a little more generous. Just as my friends love me with all their hearts, those who are the opposite of friends oppose me with all their might. And I truly enjoy that. A fervent animosity is much better than a bland friendship. Great friendships and great enmities are only possible when you can embrace them tightly. He who is so close to my heart is surely my ultimate or extreme kin. I am offering my heartfelt respect and reverence to them as well today.

Just as my friends have scattered flowers of praise on one side of the scale, the group of non-friends have scattered dirt, dust, and mud of criticism on the other. And because of the thoughtful consideration of both sides, the two pans have become so balanced that I have remained perfectly in the middle, not having to tilt at all.

You honored me on the very day you liked my writing. In this festival of being able to properly express that 'liking,' I have only one thing to do: to humbly and reverently offer my respectful greetings with a smiling face. Please accept just that from me today and grant me freedom. Don't make a great thing out of a great man. I have been running away and hiding from meetings and everyone out of fear of being sacrificed at the sacrificial pillar of a meeting. If you have caught me and arranged for my punishment because I am a fugitive, your goal has been achieved. You have caught the tainted moon and shamed him enough in front of Prafulla Chandra.

Those who know me through me, not just through my writing, at least they know that I am a truly good person. I did not come to create any monstrosity. Where I have struck, the need for a blow had been building for a long time. The corporate employee who comes and demolishes a dilapidated house is not the one who is wrong. The one who is wrong is the person who keeps that

dilapidated house, thereby endangering the lives of ten more people.

Some have unnecessarily instilled fear in people's minds by calling me a 'rebel.' I have never had the desire to scratch, bite, or chase after this innocent nation. As for those who have been chased, death has been chasing them for a long time. I have only helped a little.

I am not ashamed to admit today that I have not yet been able to rise beyond the beautiful in strength and the beautiful in form. Like Keats, the devoted darling of beauty, my *mantra* is also, 'Beauty is truth, truth beauty.'

I don't know how much of anyone's hunger has been satisfied by what I have given; but I know that I have not yet been able to give myself completely, my hunger for giving has not yet been satisfied. Please bless me so that I do not diminish the glory of the high mountain peak, the same peak from which I am a fugitive stream of water seeking the sea. May I not lose my way in the desert.

I was born in the age of the impossible possibilities of the twentieth century. Let my greatest identity be that I am one of the trumpet players of this army of expeditions.

I know that at every turn and bend of this journey, there are cunning vipers, sharp-toothed tigers, and the frowns of the king of beasts! And the wounds of their claws and teeth are still on my body. Still, that is my path, that is my movement, that is my fixed star.

Do not curse the black cloud in the northeast that sleeps on the bosom of the mountain, looking at its snowy tranquility, its indifference. The day the flute of the storm blows, this madman will come running with his former identity. One must wait all winter for the new spring.

To those who complain that I have not become like them, I request that they see the bird of the sky, the flower of the forest, and the poet of song as everyone's. Just because I was born in this country and this society does not mean that I only belong to this

country and this society. I belong to all countries, all people. The meditation on the beautiful, the singing of his praises is my worship, my religion. The clan, the society, the religion, the country in which I am born is my fate. I am a poet because I have been able to rise above it. The forest never complains when the bird of the forest rises above its nest to sing. No one would probably support the cuckoo becoming a crow because the crow, thinking the cuckoo ungrateful, chases it away. Please accept what I can give with a cheerful heart. No matter how much you tie and beat a mango tree, it will never be able to bear the necessary jackfruit. On the contrary, by enduring this beating, its power to bear mangoes will also disappear.

Those who complain that I am not a fellow traveler of the wedding party that holds up the blood-flame of youth as a torch to remove the veil of death do not know that I, too, am in their party; but not as the torch in their hand, but as the song without a throat in their voice. To those who are disappointed that they did not see me as a buyer at the flower fair of Nowruz, I also say, the meditative statue of my future Taj Mahal has not yet emerged. The day it does, I will also come to that fair, just like Prince Khurram, with the dream of the Taj in my eyes.

I have not only seen the beautiful with a *vina* in hand and a lotus at his feet, I have also seen his eyes full of tears. I have seen him walking with pained feet, a hungry figure on the path of the crematorium, on the path of the graveyard. I have seen him on the battlefield, I have seen him in the dark cell of the prison, I have seen him on the gallows. My song is a hymn of praise for seeing that beautiful one in beautiful, unprecedented forms.

Some say my words are Hebrew, some say they are infidel. I say they are neither. I have only tried to bring Hindus and Muslims together in one place for a handshake, to turn insults into embraces. If that handshake is more unsightly than a fistfight, they will separate on their own. They will not have to struggle to cut my knotted bond. Because one person has a stick in his hand, and the other has a knife up his sleeve…

So much dust, smoke, and noise has been raised about literature at present that if I try to find my way with a small candle in the middle of it, my candle will be extinguished, and I will also die.

But if this is the deadly poison churned from the ocean of sorrow, then not all the fault for this churning belongs to the demons; half of it belongs to the gods. Without their help, this churning of the ocean would not have been easy. Still, I say to them, today's poison is not the truth, do not be impatient, gods—the nectar is there, it will rise soon.

I once again offer my respect, love, and reverence from the bottom of my heart. I have not come to bless, I have come to be blessed today. My countless thanks to you.

Translated by Alamgir Mohammad

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা

[১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।]

আজ আপনাদের কাছে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে আগে মনে হচ্ছে কবির একটা লাইন,—'ঝড় আসে নিমিষের ভুল!' সেদিনের পশ্চিমে-ঝড় যখন এসেছিল বদ্ধ দ্বারের জিঞ্জিরে নাড়া দিতে, সেদিন যখন সে বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে গেয়েছিল—

'কারাগারে দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে?
আপনি তুমি ভেতর থেকে
চেপে আছ দ্বারখানা।'

তখন আপনারা তাকে বরণ করেছিলেন খাঞ্চা-ভরা সওগাত, রেকাবি-ভরা শিরনি দিয়ে, শিরিন নজরের নজরানা দিয়ে। আপনাদের হাতের ফুলে তার কণ্ঠের নীল বুকের কাঁটা ঢাকা পড়ে গেছিল। আপনাদের শিরোপার ভারে তার শির সেদিন আপনি নুয়ে পড়েছিল। সে-বার শুধু যে তার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করা ছাড়া প্রতিদানে কিছুই দিয়ে যেতে পারেনি।

আজ সে আবার এসেছে সেই পরিচিত দুয়ারে ফুলের লোভে নয়, মালার আশায় নয়, তার স্মরণতীর্থ জিয়ারত করতে। সেবারে সে বলেছিল—

খুলব দুয়ার মত্ত বলে,
তোদের বুকের পাষাণ-তলে
বন্দিনী যে ঝর্নাধারা
মুক্তি দেবো মুক্তি তায়।

হারিয়ে গেছে দোরের চাবি,
তাই কেঁদে কি লোক হাসাবি?
আঘাত হেনে খুলব দুয়ার,
আয় যাবি কে সঙ্গে আয়।

দ্বারের মায়া করে তোরা
বন্দি রবি নিজ কারায়?
নাই কো চাবি, হাত আছে তোর,
খুলব দুয়ার তার সে ঘায়।

সেই ঝড় আবার এসেছে—হয়তো বা তেমনি নিমেষের ভুলেই। এবার সেই ঝোড়ো হাওয়া 'পুবের হাওয়া' হয়ে। তার রূপ সুর দুই-ই হয়তো বদলে গেছে। আজ হয়তো সে বলতে চায়—

'ঘা দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান গেয়ে দ্বার খোলাবো।'

সেবার যে এসেছিল তরবারির বোঝা নিয়ে, এবার সে এসেছে ফুল ফোটানোর মন্ত্র শিখে।

এমনই হয়। ফাল্গুনের মলয়-সমীর বৈশাখে দেখা দেয় কালবৈশাখী-রূপে, শ্রাবণে সে-ই আসে পুবের হাওয়া হয়ে। হৈমন্তীর আঁচল ভরে ওঠে তারি শিশিরাশ্রুতে, আঁচল দুলে ওঠে তারই হিমেল হাওয়ায়। পউষে তারি দীর্ঘশ্বাস পাতা ঝরায়।

* * *

ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়তো আমার হাতে বোঝা, কিন্তু তাই বলে তাকে আমি ফেলেও দেইনি। আমি গোধূলি বেলায় রাখাল ছেলের সাথে বাঁশি বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলিয়ে আজান দেই, আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবার নিয়ে রণভূমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন আমার খেলার বাঁশি হয়ে ওঠে যুদ্ধের বিষাণ, রণশিঙ্গা।

সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে — সেই অসুরের জন্য।

কিন্তু কিছু বলবার আগে আমি স্মরণ করি সেই বিরাট পুরুষকে যার কীর্তি শুধু তাঁকে মহিমান্বিত করেনি, আপনাদের চট্টলবাসী মুসলমানদের—তথা বাংলার সারা মুসলিম সমাজকে নর-নারী-নির্বিশেষে মহিমান্বিত করেছে। তিনি আপনাদেরই এবং আমাদেরও পুণ্যশ্লোক মরহুম খানবাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব। শাহজাহানের তাজমহল গড়ে উঠেছিল শুধু মমতাজের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে—তাজমহল সুন্দর। কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র করে। এ তাজমহল শুধু beautiful নয়, এ sublime মহিমাময়!

ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁকে জানবার সুবিধা পাইনি। চাঁদ দেখিনি, কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার দেখেছি। জোয়ার শুধু পূর্ণিমার চাঁদই জাগায় না, মৃত্যুর অমাবস্যার

অন্তরালে ঢাকা পড়ে যে চাঁদ — সেও জোয়ার জাগায়। তাঁকে দেখিনি কিন্তু তাঁকে অনুভব করেছি এবং আজো করছি আপনাদের জাগরণের মাঝে—আমাদের নারী-জাগরণের উদয়-বেলায়।

এমনি করে এক একটা সর্বভোলা সর্বত্যাগী মানুষ আসে আমাদের মাঝে। আমাদের স্বার্থের কালো চশমা দিয়ে তখন তাঁকে দেখি মলিন করে, তাঁকে বলি, হয় পাগল নয় স্বার্থপর। কোকিল যখন আসে বাগে বাহারের খোশ-খবরি নিয়ে, কর্তব্যপরায়ণ কাক তখন দল বেঁধে তাকে তাড়া করে। তার গানকে তারা মানে করে উৎপাত। অভিমানী কোকিল বসন্ত শেষে উড়ে যায় নতুন বুলবুলিস্তানের সন্ধানে, তখন সারা কানন জুড়ে জাগে বিরাট একটা অভাববোধ, পেয়ে হারানোর তীব্র বেদনা।

পাখি উড়ে যায়—তারপর আসে সেই সুদিন যার আগমনী গান সে গেয়েছিল। তখন সেই সুদিনের সুন্দর আলোকে স্মরণ করি সেই সকলের-আগে-জাগা গানের পাখিকে। কিন্তু পাখি তখন থাকে না কো, থাকে পাখির স্বর।

আমি তাঁরই মতো গানের পাখি—আপনাদের এই স্মরণ-বেলায় আমিও এসেছি তাই তীর্থযাত্রী হয়ে তাঁকেই স্মরণ করতে—যিনি আমাদের বহু আগে জেগেছিলেন। তাঁর পাক কদমে আমার হাজার সালাম।

তিনি আজ আমার সালাম নিবেদনের বহু ঊর্ধ্বে, বহু দূরে; তবু এ ভরসা রাখি যে আমার এই অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া ফুল তাঁর চরণ ছুঁয়ে ধন্য হবেই। আমি জানি, এ বিশ্বে কোনো কিছুই নশ্বর নয়, কোনো কিছুই হারায় না কোনোদিন। যে-রূপে যে-লোকেই হোক তিনি আছেন এবং আমার এই ভাসিয়ে দেওয়া সালামি-ফুলও সেই না জানার অকূলে কূল পাবেই পাবে।

আমরা বড় কাউকে যখন হারাই, তখন তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি — তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর সাধনাকে শ্রদ্ধা করে, তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে। যে বিরাট আত্মার নৈকট্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, তার দুঃখ বহু পরিমাণে ভুলতে পারব, যদি তাঁরই অসমাপ্ত সাধনাকে আমাদের সাধনা বলে গ্রহণ করতে পারি। চট্টলের 'আজিজ' নাই, কিন্তু বাংলার আজিজেরা—দুলাল ছেলেরা আজো বেঁচে আছে—তাদেরই মধ্যে তাঁকে ফিরে পাব পরিপূর্ণরূপে, এই হোক আপনাদের—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাধনা! এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই।

তাঁর কাজ তিনি করে গেছেন। তাঁর 'বাহারে'র মতো বাহার হয়তো বা থাকতেও পারে, কিন্তু তাঁর 'নাহারে'র মতো নাহার আপনাদের চট্টলের মুসলমানের ঘরে কয়টি আছে আমার জানা নেই।

তিনি সুর ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, এখন একে 'সমে' পৌঁছে দেওয়া আপনাদের কাজ। উস্তাদ নেই, শিষ্যরা তো আছেন। একজন উস্তাদের অভাব কি শত শিষ্যেও পূরণ করতে পারবে না?

বন্ধু-বান্ধব অনেকের কাছেই শুনেছি আপনাদের উস্তাদের লক্ষ্য ছিল অসীম, আশা ছিল বিপুল, আকাঙ্ক্ষা ছিল বিরাট।

সাগর যাদের চরণ ধোয়ায়, পর্বতমালা যাদের শিয়রের বিনিদ্র প্রহরী, নদী-নির্ঝরিণী যাদের সেবিকা, অগ্নিগিরি যাদের বুকের ওপর, উচ্ছল জলপ্রপাত যাদের অবিনাশী প্রাণধারা, কানন-কুঞ্জ যাদের শ্রী-নিকেতন, বন্য-হিংস্র শার্দুল-সর্প যাদের নিত্য সহচর, তারা সেই মহান পুরুষের বিরাট দায়িত্বকে গ্রহণ করতে ভয় করে একথা আর যে বলে বলুক, আমি বলব না।

* * *

আপনাদের শিক্ষা-সমিতিতে এসেছি আমি আর একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সে হচ্ছে, আপনাদের সমিতির মারফতে বাংলার সমগ্র মুসলিম সমাজের বিশেষ করে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে,—আমি যে মহান স্বপ্ন দিবা-রাত্রি ধরে দেখছি,—তা-ই বলে যাওয়া। এ স্বপ্ন যে একা আমারই তা নয়। এই স্বপ্ন বাংলার তরুণ মুসলিমের, প্রবুদ্ধ ভারতের, এ স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর নব-নবীনের। আমি চাই, আপনাদের এই পার্বত্য উপত্যকায় সে স্বপ্ন রূপ ধরে উঠুক।

আমি চাই, এই পর্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুসলিম, যেমন করে শীতের শেষে বেরিয়ে আসে জরার খোলস ছেড়ে বিষধর ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব অভ্যুদয়-দিনে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলুক আমার নিদ্রোত্থিত ভাইরা।

আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্য হোক, আদাওতি করে আসন জয় করা নয়—দাওত দিয়ে মনের সিংহাসন অধিকার করা।

আপনাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান—আরফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থ-যাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না—ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব—এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্য পানেই তুলে ধরেছি এতোদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি সমুদ্র বেশি দূরে নয়, আমাদের এ-লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে! আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মতো আমাদেরও

কালচারের, সভ্যতার, জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন—আমাদের মতো শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মতো করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্যি সত্যিই বুলবুলিস্তানে পরিণত হোক—ইরানের শিরাজের মতো। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমি, জামি, শমশি-তবরেজ এই শিরাজবাগে—এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনারা গ্রহণ করুন। আপনারা রুদ্‌কির মতো আপনাদের বদ্ধ প্রাণধারাকে মুক্তি দিন।

আমি এইরূপ 'কালচারাল সেন্টারের' প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে। একটি কারণ তার রাজনৈতিক।

পলিটিক্সের নাম শুনে কেউ যেন চমকে উঠবেন না। আমি জানি, আপনাদের এই সমিতি রাজনীতি আলোচনার স্থান নয়, তবু যেটুকু না বললে নয়, আমি শুধু ততটুকুই বলব এবং সেটুকু কারুর কাছেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে না। আমি তাই একটু খুলে বলব মাত্র।

ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি—শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে—তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের অপরিচ্ছন্ন অশিক্ষিত কৃষাণ-মজুরদের—(আর, তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে বেশি) দেখে মনে করে, মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া। হয়তো বা এরা যথা পূর্বম্ তথা পরম্। দরিদ্র মূর্খ কালিমদ্দি মিয়াই তার কাছে এ্যাভারেজ মুসলমানের মাপকাঠি।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিল্পে-সংগীতে সাহিত্যে মুসলমানের বিরাট দানের কথা হয় তারা জানেই না, কিংবা শুনলেও আমাদের কেউ তাদের সামনে তার সত্যকার ইতিহাস ধরে দেখাতে পারে না বলে বিশ্বাস করে না; মনে করে—ও শুধু কাহিনী। হয়তো একদিন ছিল, যখন হিন্দুরা মুসলমানদের অশ্রদ্ধা করত না। তখন রাজভাষা state language ছিল ফার্সি, কাজেই হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে ফার্সি শিখতেন—এখন যেমন আমরা ইংরেজি শিখি। আর ফার্সি জানার ফলে তাঁরা মুসলমানদের

বিশ্বসভ্যতায় দানের কথা ভালো করেই জানতেন। কাজেই সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ আসার পূর্ব পর্যন্ত কোন মুসলমান নওয়াব বাদশার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও সমগ্র মুসলমান জাতি বা ধর্মের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেননি। শিবাজি প্রতাপ যুদ্ধ করেছিল আওরঙ্গজেব আকবরের বিরুদ্ধে, মুসলমান ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নয়। তখনকার সেই অশ্রদ্ধা ছিল ব্যক্তির বিরুদ্ধে person এর against এ— গোষ্ঠীর বা সমগ্র জাতটার ওপর একেবারেই নয়।

কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, আমরা সবচেয়ে কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম করে জানি। আমরা ইংরাজের কৃপায়, ইংরাজি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, চেক, স্ক্যানডিনেভিয়ান, চিন, জাপানি, হনলুলু, গ্রিনউইচের ভাষা জানি, ইতিহাস জানি, তাদের সভ্যতার খবর নিই, কিন্তু আমারই ঘরের গায়ে গা লাগিয়ে যে প্রতিবেশীর ঘর তারই কোনো খবর রাখিনে বা রাখার চেষ্টাও করিনে। বরং ঐ না জানার গর্ব করি বুক ফুলিয়ে। একেই বলে বোধ হয়, Penny wise pound foolish!

হিন্দু আরবি, ফার্সি, উর্দু জানে না, অথচ আমাদের শাস্ত্র-সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছুর ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবিদের মতই ঐ তিন ভাষার হেরেমে বন্দি। বিবিদের হেরেমের প্রাচীর বরং একটু করে ভাঙতে শুরু হয়েছে, ওদের মুখের বোরকাও খুলছে, কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীর বা বোরকা-মুক্ত হল না আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের দানের মহিমা। অতএব, অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমাদের কোনো কিছু জানে না বলে দোষ দেবার অধিকার আমাদের নেই। অবশ্য আমরাও অনুস্বারের সঙ্গীন ও বিসর্গের কাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনে বা তার চেষ্টাও করিনে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু তবু কতকটা কিনারা করেছে সে সমস্যার। তারা প্রাদেশিক ভাষায় তাদের সকল কিছু অনুবাদ করে ফেলেছে। সংস্কৃতের সঙ্গীন-উঁচানো দুর্গ থেকে রূপ-কুমারীকে গোপনে মুক্তিদান করেছে। তার ভবনের আলো আজ ভুবনের হয়ে উঠেছে।

মাতৃভাষায় সে সবের অনুবাদ হয়ে এই ফল হয়েছে যে, অন্তত বাংলার মুসলমানেরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে যত পরিচিত, তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদির সাথে।

কোনো মুসলমান যদি তার সভ্যতা ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোনো কিছু জানতে চায় তাহলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভালো করে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গি রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাংলাও ভালো করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি! কাজেই

ন মণ তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। আর যাঁরা ও ভাষা শেখেন, তাঁদের অবস্থা 'পড়ে ফার্সি বেচে তেল।' আর তাদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ হালুয়া-রুটির জন্য। কয়জন মওলানা সাহেব আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবি-ফার্সির সমুদ্র মন্থন করে অমৃত এনে দিয়েছেন জানি না। সে অমৃত তারা একা পান করেই 'খোদার খাসি' হয়েছেন।

কিন্তু এ খোদার খাসি দিয়ে আর কতদিন চলবে? তাই আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছি—এবং আপনাদের মারফতে বাংলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে, অর্থ আছে—যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমির যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক ধর্ম ধর্ম বলে ইসলাম বলে চিৎকার করবেন না।

আমাদের next door neighbour-এর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে, আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামিরও অবসান হবে সেইদিন, যেদিন হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে competition হবে সে competition হবে cultured মনের chivalrous competition — sportsman like competition.

'বুলবুল'
ফাল্গুন, ১৩৪৩

A Discourse on Muslim Culture

[This address was given by poet Kazi Nazrul Islam as the president of a function on the occasion of the establishment of the Chittagong Education Society in 1929.]

Standing before you today, the first thing that comes to mind is a line from a poet: "The storm comes as a momentary mistake!" When the western storm came that day to rattle the chains of the bolted door, when it stood outside and sang:

O doorkeeper of the prison, does freedom come right then?

You yourself from within are holding the door shut.

That day, you welcomed him with a basket full of gifts, a platter full of sweetmeats, and a gaze full of sweet affection. The flowers in your hands covered the thorns on his blue-hued heart. That day, his head bowed down on its own from the weight of the honors you bestowed. That time, he was unable to give anything in return except to offer his respectful greetings.

Today he has come to that familiar door again, not for the lure of flowers, not for the hope of garlands, but to visit the pilgrimage site of his memory. That time he said:

I will open the door in a mad frenzy, I will free the captive stream, the one trapped beneath the stone of your hearts.

The key to the door is lost, so why make people laugh by crying? I will open the door with a blow, Come, who wants to join me.

You are holding the sun captive in your own prison, out of love for the door? No key? You have hands, you will open the door with that very blow.

That storm has returned—perhaps again as a momentary mistake. This time, that stormy wind has become a "spring

breeze." Perhaps both its form and its tune have changed. Today, perhaps it wants to say:

I will not open the door with a blow, I will open the door by singing a song.

The one who came with the burden of a sword that time has now come having learned the *mantra* of making flowers bloom.

This is how it is. The gentle breeze of *Falgun* appears as a nor'wester in *Baishakh*, and in *Shravan*, it returns as the eastern wind. The corner of the *Hemanti's sari* is filled with its dewy tears, and the corner of the sari sways in its wintry wind. In *Paush*, its long sigh makes the leaves fall.

Making flowers bloom is my religion. The sword may be a burden in my hand, but that doesn't mean I have thrown it away. At dusk, I play the flute with the shepherd boy, at dawn I sing the *adhan* in tune with the muezzin, and again, in the bright midday, I jump into the battlefield with a sharp sword. At that time, my playful flute became a trumpet of war, a battle horn.

My tune is for the beautiful, and the sword is for the ugly demon who insults the beautiful.

But before I say anything, I remember that great man whose fame not only glorified him but also glorified the Muslims of your Chittagong—and the entire Muslim community of Bengal, men and women alike. He is your and our virtuous departed Khan Bahadur Abdul Aziz Saheb. Shah Jahan's Taj Mahal was built centered on his love for Mumtaz—the Taj Mahal is beautiful. But the Taj Mahal of this selfless man was built centered on the sorrow of all people of all ages. This Taj Mahal is not just beautiful, it is sublime, glorious!

In my personal life, I did not have the opportunity to know him. I did not see the moon, but I saw the tide of the sea. The tide is not only awakened by the full moon, but also by the moon that is hidden behind the new moon of death—it also awakens the tide. I did not see him, but I felt him and still do in your awakening—in the dawn of our women's awakening.

In this way, a selfless, sacrificing person comes among us. Then we look at him with the black glasses of our own self-interest and see him as tainted, calling him either a madman or a selfish person. When the cuckoo comes with the good news of the garden of spring, the dutiful crows gang up and chase it away. They consider its song a nuisance. The resentful cuckoo flies away at the end of spring in search of a new land of nightingales, and then a great sense of emptiness awakens throughout the garden, the sharp pain of having and losing.

The bird flies away—and then comes the good day whose coming it had sung about. Then, in the beautiful light of that good day, we remember that early-waking singing bird. But where is the bird then? The bird's voice remains.

I am a singing bird just like him—so in this time of remembrance of yours, I too have come as a pilgrim to remember him—the one who woke up long before us. My thousand greetings to his holy feet.

Today he is far above and far away from my salutations; yet I hold this hope that the flower I have set adrift in this ocean will surely touch his feet and be blessed. I know that nothing in this world is perishable, nothing is ever lost. In whatever form, in whatever world he may be, he is there, and my flower of salutation, set adrift, will surely find its shore in that unknown ocean.

When we lose someone great, we pay homage to him by honoring his creation and his endeavor, and by keeping him alive. We can forget a great deal of the sorrow of being deprived of the proximity of that great soul if we can accept his unfinished work as our own endeavor. The 'Aziz' of Chittagong is no more, but the 'Azizes' of Bengal—the darling boys—are still alive. We will find him back in them in a complete form. Let this be the goal of you, the entrepreneurs of this institution! I have no greater prayer than this.

He did his work and left. There may be a 'Bahar' (spring) like his, but I don't know how many *'Nahars'* (rivers) like his exist in the homes of the Muslims of your Chittagong.

He set the tune, and now it is your job to bring it to its conclusion. The master is gone, but the disciples are still here. Can't a hundred disciples fill the void of one master?

I have heard from many friends and relatives that the goal of your master was limitless, his hope was immense, and his aspiration was great. Those whose feet are washed by the sea, whose heads are guarded by mountains, whose servants are rivers and springs, on whose chests are volcanoes, whose indestructible life-flow is the gushing waterfall, whose home is the forest grove, and whose constant companions are wild, predatory tigers and snakes, those people are afraid to take on the great responsibility of that great man. Let others say it, I will not.

I have come to your education society with one more purpose. That is, to talk about the great dream I see day and night through your society to the entire Muslim community of Bengal, especially the rich and educated section. This dream is not just mine. This dream belongs to the young Muslims of Bengal, to awaken India. This dream belongs to the new-age youth of the twentieth century. I want that dream to take shape in this mountainous valley of yours.

I want fresh, young Muslims to emerge from the caves of this mountain, just as the venomous snakes emerge from their old skins at the end of winter. May my sleeping brothers walk hand in hand with everyone in this new dawn of the world.

Let the goal of your society not be to conquer seats through hostility, but to conquer the throne of hearts through invitations.

Let your Islamabad be the center of Oriental culture—the field of Arafat. May pilgrims from home and abroad gather here. Today we are indebted to the newly awakened world in many ways. We will not only repay that debt today, but we will also give loans. We will make the world indebted to us through our giving. Let this be your ultimate goal. We have held our hands up to the void for so long; today we will repay that shame. Today is the day to turn our hands over. If we cannot do that, the sea is not far away. May the end of our shame be in its unfathomable water forever! I say, just as Rabindranath's *Shantiniketan* is a center of

peace, you must take on the great responsibility of establishing a center of our culture, civilization, and knowledge. Hundreds of young servants like us will offer all their strength, hopes, aspirations, and lives as an offering at the feet of your endeavor.

May this playground of nature truly be transformed into a land of nightingales, like Shiraz of Iran. May hundreds of *Saadis, Hafezes, Khayyams, Rumis, Jamis, and Shamsi-Tabrezi* be born in this Shiraz garden—in this land of nightingales. Take on the grave responsibility of this invitation. Like Rudaki, give freedom to your confined life-stream.

I feel the need for such a "Cultural Center" for various reasons. One of them is political.

No one should be startled by the name of politics. I know this society of yours is not a place for political discussion, but I will only say what needs to be said, and that much will not be terrifying to anyone. So I will just explain it a little more clearly.

The only reason why India is still under foreign rule and has not yet started its journey on the path of independence—with only a show of arrangements and broken arrangements—is our mutual hatred and disrespect between Hindus and Muslims. We Muslims are jealous of the progress of our Hindu neighbors, and Hindus disrespect us when they see our degradation. The greatest harm of British rule is that it has so mesmerized us with the glitter of its education and culture that neither of our two communities takes notice of the glory of the other's education and civilization. The Hindu, seeing our unclean, uneducated peasants and laborers—(and their number is greater in our community)—thinks that all Muslims are dirty, ignorant, and stubborn. Maybe they are now as they were before. The poor, ignorant Kalimuddin Mia is their yardstick for the average Muslim.

Perhaps they do not know about the great contributions of Muslims in knowledge, science, industry, music, and literature, or if they hear about it, they don't believe it because none of us can present its true history to them; they think it's just a story. Perhaps there was a time when Hindus did not disrespect Muslims. At that time, the state language was Persian, so Hindus were also forced

to learn Persian—just as we learn English now. And by knowing Persian, they knew well about the contributions of Muslims to world civilization. Therefore, at that time, that is, until the arrival of the British, even if someone was hostile to a Muslim *Nawab* or emperor, they were not hostile to the entire Muslim community or religion. *Shivaji* fought against Aurangzeb and Akbar, not against the Muslim religion or its followers. The disrespect of that time was against the person, not at all against the community or the entire nation.

But the greatest tragedy of our national life today is that we know the person closest to us the least. By the grace of the British, we know English, Greek, Latin, Hebrew, and from French, German, Italian, Spanish, Czech, Scandinavian, Chinese, Japanese, Honolulu, and Greenwich, we know their languages, their history, and their civilization, but we do not know anything about our neighbor whose house is next to ours, or we don't even try to know. On the contrary, we proudly boast of that ignorance. This is probably called, "Penny wise, pound foolish!"

Hindus do not know Arabic, Persian, or Urdu, yet the history of all our scriptures, civilization, knowledge, and science is imprisoned in those three languages, just like the women of our homes. The walls of the women's harem have started to break a little, and their veils are also coming off, but the walls of those three languages and the veil over our past history and the glory of our contributions have not yet been removed. Therefore, we have no right to blame people of other religions for not knowing anything about us. Of course, we also cannot enter the fort of Sanskrit by crossing the friend of the *anusvara* and the thorn fence of the *visarga*, nor do we try. But the Hindus of the nineteenth century have at least solved that problem to some extent. They have translated all their things into the provincial language. They have secretly freed the form-maiden from the sword-wielding fort of Sanskrit. The light of its palace has today become the light of the world.

The result of translating everything into the mother tongue is that the Muslims of Bengal are at least as familiar with Hindu

culture, scriptures, and civilization as they are with their own religion and civilization.

If a Muslim wants to know anything about his civilization, history, or scriptures, he must first learn good gymnastics to jump over the walls of Arabic, Persian, or Urdu. He has to see the foreign form of Islam in the English language. But the common Muslim does not even learn Bengali well, and then Arabic-Persian! As a result, neither the oil comes nor the ***Radha*** dances. And the condition of many of those who do learn those languages is 'read Persian and sell oil.' And many of them learn it only for a livelihood. I don't know how many *Maulana Saheb* have churned the sea of Arabic-Persian and brought the nectar to the vessel of our mother tongue. They drank that nectar alone and became *'Khoda's* special ones.'

But how long will this last with these *'Khoda's* special ones?' That is why I have come to request you—and through you, all the thoughtful Muslims of Bengal, I am requesting that you have power, you have money. If you can, establish a center for the translation and practice of your literature, knowledge, science, history, and civilization in your mother tongue, wherever it may be. If you cannot do that, do not shout 'religion, religion' or 'Islam' for no reason.

This disrespect of our next-door neighbor toward us will be removed in this one way, and then the path to India's independence will be cleared. The madness of all communalism will also end on that day, the day when Hindus and Muslims can embrace each other with complete respect. The competition that will take place that day will be a chivalrous competition of a cultured mind—a sportsmanlike competition.

"Bulbul" *Falgun*, 1343

Translated by Alamgir Mohammad

যদি আর বাঁশি না বাজে

[১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ও ৬ই এপ্রিল কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি-রূপে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের এই শেষ অভিভাষণ প্রদান করেন।]

আপনারা এই ভিখারিকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির' জুবিলি উৎসবে সভাপতি কেন যে মনোনীত করলেন, যিনি বিশ্বভুবনের পরম পতি, পরমগতি, পরমপ্রভু, তিনিই জানেন। আপনাদের কাছে আজ অজানা নেই যে ঘরে-বাইরে, সভায় বা সমাধির গোপন গুহায় কোথাও পতিত্ব করার ইচ্ছা বা সাধ আমার নেই। যিনি সকল কর্মের, ধর্মের, জাতির, দেশের, সকল জগতের একমাত্র পরম স্বামী—পতিত্ব বা নেতৃত্ব করার একমাত্র অধিকার তাঁর। এ অধিকার মানুষেও পায় মানি। কিন্তু সে পাওয়া যদি তাঁর কাছ থেকে না হয়, তারে বলে অহঙ্কার। এই অহঙ্কারকে আমি অসুন্দরের দূত বলে মনে করি। এ অহঙ্কার Divine নয় Demon। অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ পরম সুন্দর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়-ঘন সুন্দর, প্রেম-ঘন সুন্দর, রস-ঘন সুন্দর, আনন্দ-ঘন সুন্দর। আপনাদের আহ্বানে যখন কর্মজগতের ভিড়ে নেমে আসি, তখন আমার পরম সুন্দরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হই, আমার অন্তরে বাহিরে দুলে ওঠে অসীম রোদন। আমি তাঁর বিরহ এক মুহূর্তের জন্যও সইতে পারি না। আমার সর্ব অস্তিত্ব জীবন-মরণ-কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত যে তাঁরই নামে শপথ করে তাঁকে নিবেদন করেছি। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমার ক্ষমাসুন্দর প্রিয়তম আমার আমিত্বকে গ্রহণ করেছেন।

আমার বহু আত্মীয়াধিক প্রিয় সাহিত্যিক ও কবিবন্ধু আমায় অভিযোগ করেন, আমার নাকি দান করার অপরিমেয় শক্তি ছিল দেশকে, জাতিকে, সাহিত্যরস-পিপাসু মনকে—শুধু কার্পণ্য করে বা স্বার্থপরের মতো আপন মুক্তির প্রচেষ্টায় সেই দক্ষিণাদানের দক্ষিণ হস্তকে ঊর্ধ্বে, না-জানা শূন্যের পানে তুলে ধরেছি। তাঁরা আমায় আত্মীয়ের চেয়েও ভালবাসেন; তাঁরা যখন এ-কথা বলেন, আমার চোখের জলে বুক ভেসে যায়। সে অভিমান তাঁরা আমার উপর করেন, সেই অভিমান জানাই আমি আমার নির্বিকার উদাসীন একাকিত্ব নিয়ে আমার পরম সুন্দরকে। যে মহাসাগর থেকে ঝড়ের রাতে শ্যাম-ঘন-মেঘ-রূপে আমি সহসা এসেছিলাম ঘন ঘন বিদ্যুৎছটায়, বজ্রের রোলে, ঘোর তিমির-ঘন-ঘটায়, মুক্তজটায় দিক-দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছিলাম, অজস্র বারিবর্ষণে তৃষিত মাঠ-ঘাট-প্রান্তরের তৃষা মিটিয়েছিলাম; আমার রুদ্র-সুন্দর

নৃত্য দেখে যাঁরা দেখতে পাননি যে, এই অশান্ত মেঘ-ঘন রূপ শুধু রুদ্রের ডমরু বিষাণ নিয়েই আসেনি, এরই করুণ নয়নের অশ্রুধারায় পৃথিবীতে ফুটেছে প্রেমের ফুল, শতদল, বৃন্ত; বনলতা হয়ে উঠেছে আনন্দে কণ্টকিত; এই মেঘই এনেছে আনন্দ-বন্যা, ছন্দের নূপুর-ধ্বনি, সুরের সুরধুনী গানের প্রবাহ,—সেই মেঘ একদিন দেখতে পেল সে তুষারীভূত হয়ে শ্বেত শুভ্ররূপে হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে পড়ে আছে। তার শক্তি—তার প্রিয়াও যেন মহাশ্বেতা রূপে তার বামে সমাধিস্থা। সেই সমাধির মাঝে আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেই সমুদ্রকে স্মরণ করতাম। সহসা মনে হত, এই মহাসমুদ্র এল কোথা থেকে। খুঁজতে গিয়ে মন বুদ্ধি অহঙ্কার—সবকিছু হারিয়ে যেত আকাশের পর আকাশ পেরিয়ে কোন এক পরম শূন্যে। তাই বন্ধুদের বলছি, এ আমার কার্পণ্য নয়, স্বার্থপরতা নয়—এ আমার স্বধর্ম, এ আমার স্বভাব। তাঁরা তুষারীভূত আমাকে ভেঙে যেটুকু বরফ পেয়েছেন, তাতে তাঁদের তৃষ্ণা দূরীভূত হয় না। বলছেন আমি তাঁদের আমার অসহায় অবস্থার কথা বললে বিশ্বাস করেননি। ঘুড়ি উড়তে উড়তে গেছে ডালে আটকে, টানাটানি করলে সুতো ঘুড়ি সব যাবে ছিঁড়ে—অবুঝ হাত তবু টানাহেঁচড়া করতে ছাড়ে না।

আপনাদের এই সাহিত্যসভায় রসের জলসায় আপনারা আমার অসহায় জীবনী শুনতে আসেননি। আমি আমার এ অসহায় অবস্থার কথা আগেই জানিয়েছিলাম। যার গলায় হয়েছে টনসিল বা বেঁধেছে কুলের আঁটি, সে সংগীতশিল্পীকে জোর করে গান গাওয়ালে সে যত না গাইবে গান তার চেয়ে অনেক বেশি করে প্রকাশ করবে তার কণ্ঠের অসহায় অবস্থা; সুরের চেয়ে আঁটি আর টনসিলের ব্যথাই বড় হয়ে উঠবে। আপনারা ইচ্ছা করে শাস্তি গ্রহণ করছেন, আমি নিরপরাধ। যে সিংহ আছে খাঁচায় আটকে—তার ন্যাজ ধরে টেনে ন্যাজ ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, হুঙ্কারও শুনতে পারেন, কিন্তু তাকে টেনে বের করতে পারবেন না। যিনি বন্ধ করেছেন, তিনি দয়া করে দুয়ার না খুললে আমার বাইরে আসার কোন উপায় নেই।

আনন্দ-রস-ঘন স্বর্ণবর্ণের এক না-জানা আকাশ থেকে যে শক্তি আমায় রস সরবরাহ করতেন—আগেই বলেছি, তিনি মহাশ্বেতা-রূপে মাঝে মাঝে হয়ে যান সমাধিস্থা। তখন আমিও হয়ে যাই নীরব, আমার বাঁশি আর বাজে না, রসস্রোত হয়ে যায় তুষারভূত, আমার আনন্দময় তনু হয়ে যায় পাষাণ-বিগ্রহ। এ মৃত্যু নয়, কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও নিরানন্দ। আজ আপনাদের কাছে বলে যাব—আবার নিদ্রিতা সমাধিস্থা শক্তি জেগেছেন, তবে তন্দ্রার ঘোর-সমাধির বিহ্বলতা কাটেনি। আমার সেই আনন্দময়ী শক্তি যদি আবার সমাধিস্থা না হন, আমায় পরম শূন্যে নিয়ে গিয়ে চিরকালের জন্য লয় না করেন, তাহলে এই পৃথিবীতে যে প্রেমের যে সাম্যের যে আনন্দের গান গেয়ে যাব—সে গান পৃথিবী বহু কাল শোনেনি। আমার চির-জনমের

প্রিয়া এই প্রেমময়ীর প্রেম যদি না পাই—তাহলে বুঝব আমার এ বারের মত খেলা ফুরালো। আমার বাঁশি বিরহ-যমুনার তীরে ফেলে চলে যাব। শুষ্ক যমুনার বালুচর থেকে সেই বেণু কুড়িয়ে যদি অন্য কেউ বাজাতে পারেন, আমার ফেলে-যাওয়া বাঁশি ধন্য হবে।

যাঁর ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্য-মধুর রূপ দর্শন করেছি তিনি যদি আমার সর্বঅস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, সেই শক্তির চোখে আবার যদি অশ্রুর বন্যা বয়, তাঁর অঙ্গে যদি আবার অমৃত-রস ধারা প্রবাহিত হয়, আবার যদি তাঁর চরণে রাস-নৃত্যের ছন্দ জাগে—তাহলে আমি এই বিদ্বেষ-জর্জরিত কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা-ভেদজ্ঞান-কলুষিত অসুন্দর-অসুর-নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব; এই তৃষিত পৃথিবী বহুকাল যে প্রেম, অমৃত, যে আনন্দ-রসধারা থেকে বঞ্চিত—সেই সাম্য, অভেদ, শান্তি, আনন্দ প্রেম সে আবার ফিরে পাবে। আমি হব উপলক্ষ মাত্র, আধার মাত্র; সেই সাম্য, অভেদ, শান্তি, আনন্দ, সেই প্রেম আসবে আমার নিত্য পরম সুন্দর পরম-প্রেমময়ের কাছ থেকে। নিরস তরুকে নিঙড়ে আপনারা রস পাবেন না। তাকে রসায়িত হবার অবকাশ দিন। আপনাদের আনন্দের, মুক্তির রসের তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে জানি—তবু অপেক্ষা করতে হবে। আমি এই আনন্দের এই প্রেমের ভিক্ষা-পাত্র নিয়েই তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি; যদি আমি না পাই আপনাদের কেউ পান—সেই পরম সুন্দরের নামে শপথ করে বলছি—তাহলে আমি নিজে পেলে যে আনন্দ পেতাম তেমনি সমান আনন্দ পাব—সর্বাগ্রে আমি গিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করব—সেবক হয়ে, দাস হয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন করব। যদি আপনাদের তৃষিত নয়ন আমাকেই কেন্দ্র করে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করে আছে বলেন, তাহলে আশীর্বাদ করুন যে, আমার অর্ধ-জাগ্রতা আনন্দময়ী শক্তি যেন আবার সমাধিমগ্না না হন, আবার যেন তাঁর সুন্দর নয়নের প্রসাদ পাই, তাঁর প্রেমের প্রবাহকূলে আবার যেন জ্ঞানে, শক্তিতে আনন্দে নিত্য-পূর্ণ হয়ে নৃত্য করতে পারি।

যদি আর বাঁশি না বাজে—আমি কবি বলে বলছিনে—আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি—আমায় ক্ষমা করবেন—আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি—আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম—সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

হিন্দু-মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণস্তূপের মতো জমা হয়ে আছে—এই অসাম্য,

এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সংগীতে, কর্মজীবনে, অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম—অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম—আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না—তবু—আপনারা আদর করে যখন নেতৃত্বের আসনে বসান, তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারি না। তাঁর আদেশ পাইনি, তবু রুদ্র-সুন্দররূপ আবার আপনাদের নিয়ে এই অসুন্দর, এই কুৎসিত অসুরদের সংহার করতে ইচ্ছা করে। যদি আপনাদের প্রেমের প্রবল টানে আমাকে আমার একাকিত্বের পরম শূন্য থেকে অসময়েই নামতে হয়—তাহলে সেদিন আমায় মনে করবেন না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেক দিন আগে মৃত্যুর খিড়কি দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেদিন আমাকে কেবল মুসলমানের বলে দেখবেন না—আমি যদি আসি, আসব হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির ঊর্ধ্বে যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম তাঁরই দাস হয়ে। আপনাদের আনন্দের জুবিলি উৎসব আজ যে পরম বিরহীর ছায়াপাতে বর্ষাসজল রাতের মতো অন্ধকার হয়ে এল, আমার সেই বিরহ-সুন্দর প্রিয়তমকে ক্ষমা করবেন, আমায় ক্ষমা করবেন—মনে করবেন—পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।

সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কি করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর। পদ্ম যেমন সূর্যের ধ্যান করে, তারই জন্য তার দল মেলে, আমিও আমার ধ্যানের প্রিয়তমের দিকে চেয়েই গড়ে উঠেছি। আমি কোনো বাধা-বন্ধন স্বীকার করিনি, বিস্মৃত দিনের স্মৃতি আমার পথ ভুলায়নি, আমি আমার বেগে পথ কেটে চলেছি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সাথে আমার যোগাযোগ বহু দিনের। কয়েকজন বন্ধুর আহ্বানে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আড্ডায় আশ্রয় নিই, এখানে আমি বন্ধুরূপে পাই মি. মুজাফ্‌ফর আহমদ, মি. আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুগণকে। আমাদের তখনকার আড্ডা ছিল সত্যিকারের জীবন্ত মানুষের আড্ডা। আমরা এই তথাকথিত অ্যারিস্টোক্রাট বা 'আড়ষ্ট-কাক' ছিলাম না। বোমারু বারীন-দা এসে একদিন আমাদের আড্ডা দেখে বলেছিলেন—হ্যাঁ, আড্ডা বটে? আজকালের তরুণেরা যে নীড় সৃষ্টি করে বসে আছে, আমরা তা করিনি; আমরা করেছিলাম জীবনকে উপভোগ।

যাক, সেদিন যদি সাহিত্য সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত তবে হয়তো কোথায় ভেসে যেতাম, তা আমি জানি না। এই ভালোবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম নীড় বেঁধেছিলাম; এ আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হত কি না, আমার জানা নেই।

সাহিত্য সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখতে, একে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে—বিশেষভাবে অর্থ-সাহায্য পুষ্ট করে তুলতে সকলকে আবেদন জানাচ্ছি। সাহিত্য সমিতি বিত্তশালী হলে বহু তরুণ প্রতিভাকে আশ্রয় দিতে পারবে, তাদের প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করতে পারবে।

If the Flute No Longer Plays

[This was the last address of poet Kazi Nazrul Islam's life, delivered as the president of the Silver Jubilee festival of the Bengali Muslim Literary Society at the Calcutta Muslim Institute Hall on April 5 and 6, 1941.]

Why did you choose me, a beggar, to be the president of the Jubilee festival of the Bengali Muslim Literary Society, only He knows—the supreme Lord, the supreme Path, the supreme Master of the universe. It is no longer unknown to you that I have no desire or ambition to be a master, whether at home or outside, in a gathering or in the secret cave of a tomb. He, the one and only supreme Master of all deeds, religions, nations, countries, and the entire universe, has the sole right to leadership or mastery. Humans also receive and accept this right. But if that reception is not from Him, it is called arrogance. I consider this arrogance to be a messenger of the unbeautiful. This arrogance is not divine, but demonic.

My devotion is not to the unbeautiful; my Allah is the supremely beautiful. To me, He is the eternally beloved, profoundly beautiful, profoundly loving, profoundly blissful, and profoundly joyous. When I come down into the crowd of the world of work at your call, I am deprived of the proximity of my supremely beautiful one, and an immense wailing stirs within and outside of me. I cannot bear separation from Him for a single moment. All my existence—my life, death, and work, my past, present, and future—I have sworn in His name and dedicated to Him. Today, I have no hesitation in saying that my forgiving and beautiful beloved has accepted my selfhood.

Many of my literary and poet friends, who are dearer than relatives, accuse me of having had an immeasurable power to give to my country, to my nation, to the minds thirsty for the nectar of literature—but that, like a miser or a selfish person, in my effort

for my own liberation, I raised that giving right hand toward an unknown void. They love me more than relatives; when they say this, my heart overflows with tears. I convey that complaint they have against me, with my detached and lonely indifference, to my supremely beautiful one. I came as a dark, thick cloud on a stormy night from that great ocean with flashes of lightning, rolls of thunder, and a dense, dark mass, and I covered the horizon with my loose hair. With countless showers of rain, I quenched the thirst of the thirsty fields, riverbanks, and plains. Those who saw my furious, beautiful dance could not see that this restless, thick, cloudy form did not just come with the ***damaru*** (drum) and trumpet of fury, but that from the tears of its compassionate eyes, flowers of love, lotuses, and stems bloomed on the earth; the forest creeper became choked with joy; this cloud brought a flood of joy, the tinkling of anklets, the flow of the river of music in song. That cloud one day saw that it had frozen and lay on the highest peak of the Himalayas in a white, pure form. It was as if its power—its beloved—was also in a state of (*samadhi*) on its left in the form of the Great White Goddess. Within that *samadhi*, I would remember that ocean from which I had come. Suddenly, it would seem, where did this great ocean come from? In searching for it, my mind, intellect, and ego—everything would be lost, crossing over sky after sky into some supreme void. So, I say to my friends, this is not my miserliness, not my selfishness—this is my ***dharma***, my nature. The piece of ice they got by breaking my frozen self-did not quench their thirst. They say that when I told them about my helpless state, they didn't believe me. A kite, flying high, gets caught in a branch. If you keep pulling on it, the thread and the kite will both tear. But the ignorant hand doesn't stop pulling and tugging.

You have not come to this literary gathering, this musical session, to listen to my helpless life story. I had already informed you of this helpless state of mine. If you force a musical artist who has tonsillitis or a knot in his throat to sing, he will not sing as much as he will express the helplessness of his throat; the pain of the knot and the tonsils will become greater than the tune. You are willingly accepting punishment; I am innocent. You can grab

the tail of the lion that is trapped in a cage and pull on it until you tear off its tail, and you can hear its roar, but you cannot drag it out. If He who has locked me up does not mercifully open the door, there is no way for me to get out.

The power that used to supply me with nectar from an unknown sky of golden joy and nectar—as I said before, she occasionally becomes absorbed in *samadhi* in the form of the Great White Goddess. Then I also become silent, my flute no longer plays, the flow of nectar freezes, and my blissful body becomes a stone idol. This is not death, but it is more joyless than death. Today I am leaving you with the message that the sleeping, *samadhi*-absorbed power has awakened again, but the bewilderment of the profound trance of slumber has not yet passed. If my joyful power does not become absorbed in *samadhi* again, if He does not take me to the supreme void and merge me for eternity, then the song of love, equality, and joy that I will sing on this earth—that song the earth has not heard for a long time. If I do not receive the love of this beloved of my eternal life—then I will understand that my game is over for this time. I will leave my flute on the bank of the river of separation and depart. If someone else can pick up that flute from the dry sandy shore of the river and play it, my abandoned flute will be blessed.

If He, by whose will I have seen the eternally sweet form of the transcendental within my body today, accepts my entire being and gives me back my joyful, loving power, if the flood of tears flows again from her eyes, if the stream of immortal nectar flows again through her body, if the rhythm of the **rasa** dance awakens again at her feet—then I will make this world, ravaged by hatred, defiled by ugly communalism and discrimination, and oppressed by demons, beautiful again. This thirsty earth has been deprived of love, nectar, and the stream of joy for a long time—it will find equality, non-discrimination, peace, joy, and love again. I will be just a medium, just a vessel; that equality, non-discrimination, peace, joy, and love will come from my eternally supreme, supremely loving one. You will not get juice by squeezing a juiceless tree. Give it a chance to become juicy. I know that your thirst for the nectar of joy and liberation has become strong—yet

you have to wait. I am standing at His door with this beggar's bowl of joy and love; if you get it and I don't—I swear in the name of that supremely beautiful one—then I will feel the same joy as if I had received it myself. I will first go and worship His feet—I will serve Him as a servant, as a slave, and I will obey His command. If you say that your thirsty eyes are waiting for that auspicious day, centering on me, then bless me so that my half-awake joyful power does not become immersed in *samadhi* again, and so that I may again receive the grace of His beautiful eyes and be able to dance, eternally filled with knowledge, power, and joy, on the bank of the flow of His love.

If the flute no longer plays—I am not saying this as a poet—I am saying this by the right of the love I received from you—forgive me—forget me. Believe me, I did not come to be a poet, I did not come to be a leader—I came to give love, I came to get love—because I did not get that love, I took leave from this loveless, juiceless earth forever with silent resentment.

The strife between Hindus and Muslims day and night, hatred between nations, war and conflict, on one hand, extreme poverty, debt, and want in people's lives, on the other, millions of rupees accumulated like stone pillars in the bank of a greedy demon—I came to remove this inequality, this discrimination. In my poetry, in my music, in my work life, I established a non-discriminatory beauty of equality—I came to forgive the ugly, to destroy the demon—you are my witness, and my supremely beautiful one is my witness. I do not want fame, I do not want renown, I do not want prestige, I do not want leadership—yet—when you affectionately seat me on the throne of leadership, I cannot hold back my tears. I have not received His command, yet the beautiful, furious form of mine wishes to take you and destroy these ugly, hideous demons. If I have to come down from my supreme void of solitude prematurely due to the powerful pull of your love—then do not think of me as that Nazrul. Nazrul died long ago, escaping through the crooked door of death. On that day, do not see me as merely a Muslim—if I come, I will come as a slave of the One, who is above all nations, Hindu and Muslim. May my supremely beautiful one, my beautiful beloved of

separation, forgive me for making your joyful Jubilee festival dark like a night of monsoon rain with the shadow of a supremely separated one. Forgive me—remember that a restless young man came to this earth with a thirst for perfection, and it is his departed soul that cried among you in a dream, in the pain of imperfection.

Literature is the expression of personality. The identity of what I have done in literature is within my personality. Just as a lotus meditates on the sun, and for it, its petals open, I, too, have been shaped by looking toward the beloved of my meditation. I have not accepted any obstacles or bonds, the memories of forgotten days have not made me lose my way, and I have continued to cut my path with my own momentum.

My connection with the Bengali Muslim Literary Society goes back a long time. At the invitation of a few friends, I took refuge in the *adda* (gathering) of the Bengali Muslim Literary Society, where I found literary friends like Mr. Muzaffar Ahmad and Mr. Abul Kalam Shamsuddin as friends. Our *adda* at that time was a truly lively *adda* of living people. We were not these so-called aristocrats or "stiff crows." One day, *Baren*-da, a bomber, came and saw our *adda* and said, "Yes, this is an **adda**!" The youth of today have created nests and are sitting there; we did not do that; we enjoyed life.

Anyway, if the Literary Society had not given me refuge that day, I don't know where I would have drifted. It was in this bond of love that I first built a nest; I don't know if it would have been possible for me to become a poet without this refuge.

I appeal to everyone to keep the Literary Society alive and to help it in every way—especially to strengthen it with financial assistance. If the Literary Society becomes wealthy, it will be able to give refuge to many young talents and help them in the development of their talent.

Translated by Alamgir Mohammad

স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ

[১৩৪৭ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।]

আজকের ঈদ-সম্মেলনে আমাকে আপনারা সভাপতি নির্বাচিত করে গৌরব দান করেছেন, এজন্য আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাদিগকে 'ঈদ মোবারক হো' বলে প্রথমেই অভিনন্দিত করছি। ঈদের উৎসব আনন্দের উৎসব, ত্যাগের উৎসব। আল্লার রাহে সব কিছু কোরবানি করার ইঙ্গিতই এই উৎসব বয়ে এনেছে। কোরআনের ছুরে বকরায় এই কোরবানির কথা রয়েছে এবং ছুরে নূরের ভিতর উল্লেখিত জয়তুন ও রওগণের যেসব কথা রয়েছে, তার অর্থ সকলকে আমি অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহর নামে সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ কোরবানি করতে হবে। একটা গরু কোরবানি করেই সবকে ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আল্লাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর নয়।

সকল ঐশ্বর্য সকল বিভূতি আল্লার রাহে বিলিয়ে দিতে হবে। ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এই নীতি স্বীকার করেই ইসলাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বেশ বোঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবি আছে—এ শিক্ষাই ইসলামের। জগতের আর কোনো ধর্ম এত বড় শিক্ষা মানুষের জন্য নিয়ে আসেনি। ঈদের শিক্ষার ইহাই সত্যিকার অর্থ।

আজ মুশায়েরার সম্মেলন। কবি ও সাহিত্যিকদের আজ সমাবেশ হয়েছে। কবি ও সাহিত্যিক, সুরশিল্পী মানুষের আনন্দলোকের, সৌন্দর্যলোকের বাণী বয়ে আনে। এজন্য সাহিত্যিক, কবি, শিল্পীরা মানব-সভ্যতার গৌরব। আনন্দ ও সৌন্দর্যের তৃষ্ণা মানুষের চিরন্তন। মানুষ অন্নের জন্য ক্ষুধা অনুভব করে, তেমনি করে সৌন্দর্য-পিপাসাকে অনুভব। মানুষের এই সৌন্দর্য-ক্ষুধা থেকেই কাব্যের সৃষ্টি, কবির জন্ম। মানুষের আনন্দ ও সৌন্দর্য পরিবেশন করার জন্যই কবিরা এসে থাকেন। জল কমল ফোটায়; জল না থাকলে কমল ফুটত কি? অকবির সৌন্দর্যক্ষুধা মিটাবার জন্যই কবির আগমন। সকল মানুষের আটপৌরে জীবনের সাথে চলে এই সৌন্দর্য-জীবনের দাবি। আমি একদিন একজন লোককে বাজার থেকে ফিরে আসবার সময় লক্ষ করলাম তার

এক হাতে মুরগি ও আর এক হাতে রজনীগন্ধা ফুল। আমি তাকে আদর জানিয়ে বললাম, এমন fair and foul-এর সমাবেশ একত্রে কোথাও দেখিনি?

এই সৌন্দর্যের, অমৃত পরিবেশনের ভার কবি ও সাহিত্যিকদের হাতে। এ পথে সাহিত্যিকদের হয়তো দুঃখ-কষ্ট আছে অনেক, কিন্তু তাদের ভীতু হলে চলবে না। মানুষ ক্ষুধার অন্ন মিটিয়েই অবকাশ পায় না। ধান গাছ জন্মিয়ে মানুষ মাঠের পর মাঠকে অরণ্য করে তোলে, কিন্তু গোলাপের চাষের আয়োজন এদেশে করে কজন? আরও দুর্ভাগ্য এই যে, এদেশের শিক্ষিতদের মধ্যে সৌন্দর্যের পিপাসা কম। এজন্য বহু দুঃখ-কষ্ট আমাদের দেশের সাহিত্যিকদিগকে ভোগ করতে হয় জীবনে। এজন্য বিচলিত হলে চলবে না। দুঃখের আঘাতকে আনন্দের মতোই বরণ করে নিতে হবে। কবি ও সাহিত্যিকের জীবন ও তাঁর সৃষ্টি যেন শতদল। তার এক একটি দল জন্ম নিয়েছে এই দুঃখ-বেদনার আঘাত পেয়ে।

আমার আজ বেশ মনে পড়ছে—একদিন আমার জীবনে এই মহানুভূতির কথা। আমার ছেলে মরেছে, আমার মন তীব্র পুত্রশোকে যখন ভেঙে পড়ছে, ঠিক সেদিন সে সময়ে আমার বাড়িতে হাস্নাহেনা ফুটেছে। আমি প্রাণ ভরে সেই হাস্নাহেনার গন্ধ উপভোগ করেছিলাম। এভাবেই জীবনকে উপভোগ করতে হবে—এই-ই হল পূর্ণ জীবন। এই জীবনের অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করতে চেয়েছি। আমার কাব্য, আমার গান আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য হতে জন্ম নিয়েছে। আমি জীবনের ছন্দে গেয়ে চলেছি—এসব তারই প্রকাশ। আমার কাব্য ও গান বড় হয়েছে কি ছোট হয়েছে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু এ-কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই—আমি জীবনকে উপভোগ করেছি পরিপূর্ণভাবে। দুঃখকে বিপদকে আমি দেখে ভয় পাইনি। আমি জীবনের তরঙ্গে তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। ক্লাসে ছিলাম আমি ফার্স্ট বয়। হেডমাস্টারের বড় আশা ছিল—আমি স্কুলের গৌরব বাড়াব, কিন্তু এ সময় এল ইউরোপের মহাযুদ্ধ। একদিন দেখলাম, এদেশ থেকে পল্টন যাচ্ছে যুদ্ধে। আমিও যোগ দিলাম এই পল্টন দলে। চাঁটগায়ে গিয়েছি—সমুদ্র দেখেছি—তাতে ঝাঁপ দিয়ে জীবনকে করেছি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ। একদিন একজন পুলিশ আমার মাথার সম্মুখে পিস্তল উঠিয়ে বললে, 'তোমাকে আমি মেরে ফেলতে পারি।' আমি বল্লাম, 'বন্ধো! মৃত্যুকেই তো আমি চিরদিন খুঁজে বেড়াই।'

তরুণদের কাছে আমি চাই—তারা যেন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে অগ্রসর হয়। আজ আমার সম্মুখে যে তরুণ সমাজকে দেখছি, তাতে আমাকে নিরাশ হতে হয়েছে। তারা যেন জরায় আবৃত। জীবনের উজ্জ্বলতা ও প্রাণৈশ্বর্য আজ তাদের মধ্যে দেখতে পাই না। দুকূলপ্লাবী জীবন ও যৌবনের জোয়ার তাদের জীবনে আসুক এটাই আজ তাদের নিকট আমি চাই। সকল প্রকারের ভীরুতা হতে জীবনকে মুক্তি

দিতে হবে। এই সৃষ্টির সকল কিছুকে বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাকে উপভোগ করতে হবে। এই জন্যই শ্রদ্ধা হয় এ-যুগের বৈজ্ঞানিকদের প্রতি। তাঁরা চেয়েছেন সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার করতে। কি দুর্জয় তাঁদের প্রতিজ্ঞা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। সকল বিশ্বকে, সকল সৃষ্টিকে জানব, বুঝব ও উপলব্ধি করব—এই আত্মবিশ্বাস আমাদের তরুণদের জীবনে রূপায়িত হোক। এই-ই আমরা চাই। জীবনের পাত্র আমরা আবর্জনা দিয়ে বোঝাই করে রেখেছি, এই আবর্জনা হতে আমাদের জীবনকে মহতের উপযুক্ত আধার করতে হবে। নদীতে নুড়ি থাকে, এক ফোঁটা জল সে পায় না। কারণ, অন্তর তার শূন্য নয়। এমন করে আমাদের অন্তর মুক্ত করে বৃহৎকে জীবনে বরণ করে আনতে হবে। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। প্রকাণ্ড তাঁর সৃষ্টি। সে সৃষ্টির পশ্চাৎভূমিতেই জন্ম নিয়েছে চন্দ্র-সূর্য-তারকার সৃষ্টির ঐশ্বর্য। এই বৃহৎকে বুঝবার সাধনাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এ-জন্যই চাই সেই মুক্ত ও বিরাট জীবন।

সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বিসর্জন দিতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নয়, ন্যায়ের অধিকারের দাবিতেই আমাদিগকে বাঁচতে হবে। আমরা কারও নিকট মাথা নত করব না—রাস্তায় বসে জুতা সেলাই করব, নিজের শ্রমার্জিত অর্থে জীবন যাপন করব, কিন্তু কারো দয়ার মুখোপেক্ষী হব না। এই স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ আজ বাংলার মুসলমান তরুণদের মধ্যে দেখতে চাই। এইই ইসলামের শিক্ষা; এ শিক্ষা সকলকে গ্রহণ করতে বলি। আমি আমার জীবনে এ-শিক্ষাকেই গ্রহণ করেছি। দুঃখ সয়েছি, আঘাতকে হাসিমুখে বরণ করেছি, কিন্তু আত্মার অবমাননা কখনও করিনি। নিজের স্বাধীনতাকে কখনও বিসর্জন দেইনি। 'বল বীর, চির উন্নত মম শির'—এ গান আমি আমার এ-শিক্ষার অনুভূতি হতেই পেয়েছি। এই আজাদ-চিত্তের জন্ম আমি দেখতে চাই। ইসলামের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী—ইসলামের ইহাই মর্মকথা।

The Awakening of an Independent Mind

[Presidential address given at the *Eid* conference of the Bengali Muslim Literary Society in Calcutta in 1347 (Bengali Calendar).]

I thank the authorities of the Bengali Muslim Literary Society for the honor of electing me as president of today's Eid conference. I greet you first by saying, "*Eid* Mubarak." The festival of *Eid* is a festival of joy, a festival of sacrifice. This festival brings with it the hint of sacrificing everything for the sake of Allah. The Quran's *Sura Al-Baqarah* speaks of this sacrifice, and I urge everyone to comprehend the meanings of the olive and olive tree mentioned in *Sura An-Nur*. The Quran says that all possessions, all wealth must be sacrificed in the name of Allah. It may be possible to deceive everyone by sacrificing a cow, but it is not possible to deceive Allah.

All wealth and all blessings must be surrendered for the sake of Allah. All people have equal rights to the wealth of the rich and the knowledge of the learned. By accepting this principle, Islam has been able to earn the respect of all as the world's greatest religion. If one examines the history of the world's revolutionary political movements today, it becomes quite clear that the source of communism and socialism is embedded in Islam. You may not have a right to my food when I am hungry, but you certainly have a claim to my surplus wealth—this is the teaching of Islam. No other religion in the world has brought such a great teaching for humanity. This is the true meaning of Eid's lesson.

Today is a conference of poets and writers. Poets and writers have gathered today. Poets, writers, and artists bring the message of joy and beauty. For this reason, writers, poets, and artists are the glory of human civilization. The thirst for joy and beauty is eternal in human beings. Just as a person feels hunger for food, they also feel a thirst for beauty. From this hunger for beauty, poetry is created and poets are born. Poets come to provide joy and beauty to all people. Water makes lotuses bloom; if there were no water, would lotuses bloom? A poet's arrival is to satisfy the

hunger for beauty of those who are not poets. The demand for this beautiful life runs alongside the mundane lives of all people. I once noticed a person returning from the market with a chicken in one hand and a tuberose flower in the other. I affectionately said to him, "I have never seen such a combination of fair and foul together anywhere."

The responsibility of providing this beauty and this nectar is in the hands of poets and writers. On this path, writers may have many sorrows and hardships, but they must not be timid. People do not get leisure just by satisfying their hunger for food. By planting rice, people turn fields after fields into forests, but how many people in this country make arrangements for growing roses? And it is even more unfortunate that the educated people of this country have a lesser thirst for beauty. For this reason, the writers of our country have to endure a lot of sorrow and hardship in their lives. Therefore, one must not be disturbed. The blow of sorrow must be welcomed like joy. The life and creation of a poet and writer are like a hundred-petaled lotus. Each of its petals is born from the blow of this sorrow and pain.

I remember this feeling of greatness very well today. My son died, and my mind was shattered by intense grief. Right at that moment, tuberoses bloomed in my house. I enjoyed the scent of those tuberoses with all my soul. This is how life must be enjoyed—this is a full life. I wanted to attain this experience of life. My poetry and my songs were born from the experience of my life. I have continued to sing to the rhythm of life—all of this is its expression. I do not know whether my poetry and songs are great or small. But I want to say with force—I have enjoyed life to the fullest. I have not been afraid of sorrow or danger. I have jumped into the waves of life. I was the first in my class. The headmaster had a great hope—that I would increase the school's glory. But at this time, the Great War of Europe began. One day I saw a regiment from this country going to war. I also joined this regiment. I went to Chittagong—I saw the sea—I plunged into it and enjoyed life to the fullest. One day, a policeman raised a pistol in front of my head and said, "I can kill you." I said, "Friend! It is death that I have been searching for my whole life."

I want the youth to move forward and enjoy life to the fullest. I am disappointed to see the young people in front of me today. They seem to be covered in old age. I do not see the brilliance and vitality of life in them today. I want them to have the flood of life and youth in their lives. Life must be freed from all kinds of timidity. All of creation must be understood, known, and fully enjoyed. For this reason, I respect the scientists of this age. They have wanted to discover the mystery of creation. How indomitable are their vows and their faith in their own strength. To know, understand, and realize all of the universe and all of creation—may this self-confidence be embodied in the lives of our youth. This is what we want. We have filled the vessel of our lives with garbage; our lives must be made into a vessel worthy of greatness from this garbage. There are pebbles in a river, so it does not get a single drop of water. This is because its heart is not empty. In this way, we must free our hearts and welcome the great into our lives. Allah is the greatest creator. His creation is vast. The glory of the creation of the moon, sun, and stars was born against that backdrop of his creation. The devotion to understanding this greatness is the greatest devotion of life. For this, we need that free and great life.

All timidity, weakness, and cowardice must be abandoned. We must live on the claim of justice, not with a beggar's bag. We will not bow our heads to anyone. We will sew shoes on the street and live our lives with our self-earned money, but we will not be dependent on anyone's pity. I want to see this awakening of an independent mind in the young Muslims of Bengal today. This is the teaching of Islam; I ask everyone to accept this teaching. I have accepted this teaching in my life. I have endured sorrow, welcomed hardship with a smile, but I have never dishonored my soul. I have never surrendered my freedom. "Say, O hero, my head is forever high"—I have received this song from the feeling of this teaching of mine. I want to see the birth of this free spirit. This is the greatest message of Islam—this is the essence of Islam.

Translated by Alamgir Mohammad

Letters
পত্রাবলি

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ-কে লিখিত পত্র

[১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'নওরোজ' পত্রিকায় নজরুল ইসলামের নিকট লিখিত অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর 'একখানি পত্র' প্রকাশিত হয়েছিল; সেই 'চিঠির উত্তরে' ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'সওগাত'-এ নজরুলের এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়।]

শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খান সাহেব!

আমাদের আশি বছরে নাকি স্রষ্টা ব্রহ্মার একদিন। আমি অত বড় স্রষ্টা না হলেও স্রষ্টা তো বটে, তা আমার সে সৃষ্টির পরিসর যত ক্ষুদ্রই হোক। কাজেই আমারও একটা দিন অন্তত তিনটে বছরের কম যে নয়, তা অন্য কেউ বিশ্বাস করুক চাই না করুক, আপনি নিশ্চয়ই করবেন।

আপনার ১৯২৫ সালের লেখা চিঠির উত্তর দিচ্ছি ১৯২৭ সালের আয়ু যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন। এমনও হতে পারে, ১৯২৭-এর সাথে সাথে হয়তো বা আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, তাই আমিও আমার অজ্ঞাতে কোনো অনির্দেশের ইঙ্গিতে আমার শেষ বলা বলে যাচ্ছি আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার সুযোগে। কেননা, আমি এই তিন বছরের মধ্যে কারুর চিঠির উত্তর দিয়েছি, এত বড় বদনাম আমার শত্রুতেও দিতে পারবে না—বন্ধুরা তো নয়ই। অবশ্য আয়ু আমার ফুরিয়ে এসেছে—এ সুসংবাদটা উপভোগ করবার মতো সৎ সাহস আমার নেই, বিশ্বাসও হয়তো করিনে; কিন্তু আমারই স্বজাতি অর্থাৎ কবি জাতীয় অনেকেই এ বিশ্বাস করেন এবং আমিও যাতে বিশ্বাস করি তার জন্যে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণেই করছেন। কিন্তু আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে তাঁরা যে নিশ্বাস মোচন করেন, তা হ্রস্ব নয় এবং সে নিশ্বাস বিশ্বাসীরও নয়! হতভাগা আমি, তাঁদের এই আমার প্রতি অতি মনোযোগ নাকি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনে—মন্দ লোকে এমন অভিযোগও করেছে তাঁদের দরবারে।

লোকে বললেও আমি মনে করতে ব্যথা পাই যে, তাঁরা আমার শত্রু। কারণ একদিন তাঁরাই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আজ যদি তাঁরা সত্য সত্যই আমার মৃত্যু কামনা করেন, তবে তো আমার মঙ্গলের জন্যই, এ আমি আমার সকল হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি। আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি—তাদের হাতের আঘাত যত বড় এবং যত বেশিই পাই। মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হলে তার মুখ উল্টে যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয় উল্টে গেলে সে যে ভূতের চেয়েও কত ভীষণ ও

প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র হয়ে ওঠে, তা-ও আমি ভালো করেই জানি। তবু আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি—ভালোবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি, কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে, চিররহাস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধুলোর নিচে স্বর্গ টেনে আনবে, এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, ওদের সাথে প্রাণ ভরে যেন কাঁদতে পাই!

কিন্তু এ তো আপনার চিঠির উত্তর হচ্ছে না। দেখুন, চিঠি না লিখতে লিখতে চিঠি লেখার কায়দাটা গেছি ভুলে। তাতে করে কিন্তু লাভ হয়েছে অনেক। যদিও চোখ-কান বুঁজে উত্তর দিয়ে ফেলি কারুর চিঠির, সে উত্তর পড়ে তাঁর প্রত্যুত্তর দেবার মতো উৎসাহ বা প্রবৃত্তির ইতি ঐখানেই হয়ে যায়। কেননা, সেটা তার চিঠির উত্তর ছাড়া আর সব কিছুই হয়। এ-বিষয়ে ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য নিতে পারেন। সুতরাং এটাও যদি আপনার চিঠির উত্তর না হয়ে আর কিছু হয়, তবে সেটা আপনার অদৃষ্টের দোষ নয়, আমার হাতের অখ্যাতি।

আমাদের দেখা না হলেও শোনার ত্রুটি কোনো পক্ষ থেকেই ঘটেনি দেখছি। আপনাকে চিনি, আপনি আমায় যতটুকু চেনেন তার চেয়েও বেশি করে; কিন্তু জানতে যে আজো পারলাম না, তার জন্য অভিযোগ আমার অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাকে করব বলুন। এতদিন ধরে বাংলার এত জায়গা ঘুরেও যখন আপনার সঙ্গে দেখা হল না, তখন আর যে হবে সে আশা রাখিনে। বিশেষ করে—আজ যখন ক্রমেই নিজেকে জানাশোনার আড়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ ভালোই হয়েছে—অন্তত আপনার দিক থেকে। আমার দিকের ক্ষতিটাকে আমি সইতে পারব এই আনন্দে যে, আপনার এত শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয়েছে বলে দুঃখ করবার সুযোগ আপনাকে দিলাম না। এ আমার বিনয় নয়; আমি নিজে অনুভব করেছি যে, আমায় শুনে যাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন, দেখে তাঁরা তাঁদের সে শ্রদ্ধা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাই আমি অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করছি, কাছ থেকে যাঁদের কেবল ব্যথাই দিলাম, দূরে গিয়ে অন্তত তাঁদের সে দুঃখ ভুলবার অবসর যদি না দিই, তবে মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা সত্য নয়।

তাছাড়া নৈকট্যের একটা নিষ্ঠুরতা আছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় কলঙ্ক নেই, কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক আছে। দূরে থেকে চাঁদ চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু মৃত চন্দ্রলোকে গিয়ে কেউ খুশি হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বাতায়ন দিয়ে যে-সূর্যালোক ঘরে আসে তা আলো দেয় কিন্তু চোখে দেখার সূর্য দগ্ধ করে। চন্দ্র-সূর্যকে আমি নমস্কার করি, কিন্তু তাঁদের পৃথিবী-দর্শনের কথা শুনলে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। ভালোই হয়েছে ভাই, কাছে গেলে হয়তো আমার কলঙ্কটাই বড় হয়ে দেখা দিত।

তারপর শ্রদ্ধার কথা। ওদিক দিয়ে আপনার জিতে যাবার কোনো আশা নেই, বন্ধু। শ্রদ্ধা যদি ওজন করা যেত, তাহলে আমাদের দেশের একজন প্রবীণ সম্পাদক—যিনি মানুষের দোষগুণ বানিয়ার মতো করে কড়ায়-গণ্ডায় ওজন করতে সিদ্ধহস্ত, তাঁর কাছে গিয়েই এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যেত! গ্রহের ফেরে তার কাঁচিপাকি ওজনের ফের আমার পক্ষে কোনাদিনই অনুকূল নয়; তা সত্ত্বেও আপনিই হারতেন, এ আমি জোর করে বলতে পারি।

হঠাৎ মুদির প্রসঙ্গটা এসে পড়বার কারণ আছে, বন্ধু! জানেন তো, আমরা কানাকড়ির খরিদ্দার। কাজেই ওজনে এতটুকু কম হতে দেখলে প্রাণটা ছ্যাঁক করে ওঠে। মুদিওয়ালার ওতে লাভ কতটুকু জানিনে, কিন্তু আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আমরা ছাড়া কেউ বুঝবে না;— মুদিওয়ালা তো নয়ই। তবু মুদিওয়ালাকে চুল-দাঁড়ি ধরতে দেখলে একটু ভরসা হয় যে, চোখের সামনে অতটা ঠকাতে তার বাধবে; কিন্তু তার পাঁচসিকে মাইনের নোংরা চাকরগুলো যখন দাঁড়ি-পাল্লার মালিক হয়ে বসে, তখন আর কোনো আশা থাকে না। আগেই বলেছি, আমরা দরিদ্র খরিদদার। থাকত বড় বড় মিঞাদের মতো সহায়-সম্বল, তাহলে এ অভিযোগ করতাম না।

পায়াভারি লোকের ভারি সুবিধে। তা সে পায়াভারি পায়ে ফাইলেরিয়া গোদ হয়েই হোক, বা ভারগুণেই হোক। এঁদের তুলতে হয় কাঁধে করে, আর কাছে যেতে হয় মাথাটা ভুঁই-সমান নিচু করে। ব্যবসা যারা বোঝে, তারা অন্য দোকানির বড় খদ্দেরকে হিংসা ও তজ্জনিত ঘৃণা যতই করুক, তাঁকে নিজেদের দোকানে ভিড়াতে তার দোকানের সবটুকু তেল তাঁর ভারি পায়ে খরচ করতে তার এতটুকু বাধে না। দরকার হলে তার পুত্র ছোটে তেলের টিন ঘাড়ে করে, সাঁতরে পার হয় রূপনারায়ণ নদ, তাঁর ভারি পায়ে ঢালে তেল—তা সে পা যতোই কেন ঘানি-গাছের মতো অবিচলিত থাক। সাথে সে ভাঁড় ও স্তুতিগাইয়ে নিয়ে যেতেও ভোলে না।

যাক, এখন এসব বাজে কথা। অনেক কথার উত্তর দিতে হবে।

আমি আপনার মতো অসঙ্কোচে 'তুমি' বলতে পারলাম না বলে ক্ষুণ্ন হবেন না যেন। আমি একে পাড়াগেঁয়ে স্কুল-পালানো ছেলে, তার ওপর পেটে ডুবুরি নামিয়ে দিলেও 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না। (পেটে বোমা মারার উপামাটা দিলাম না স্পেশাল ট্রিবিউনালের ভয়ে।) যদি বা 'খাজা' বা ইবরাহিম খানকে 'তুমি' বলতে পারতাম, কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের নাম শুনেই আমার হাত-পা একেবারে পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে। আরে বাপ? স্কুলের হেড মাস্টারের চেহারা মনে করতেই আমার আজো জলতেষ্টা পেয়ে যায়, আর কলেজের প্রিন্সিপাল, সে না জানি আরো কত ভীষণ! আমার স্কুলজীবনে আমি কখনও ক্লাসে বসে পড়েছি, এত বড় অপবাদ আমার চেয়ে এক নম্বর কম পেয়ে যে 'লাস্ট বয়' হয়ে যেত—সেও দিতে

পারবে না। হাই বেঞ্চের উচ্চাসন হতে আমার চরণ কোনোদিনই টলেনি, ওর সাথে আমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেছিল। তাই হয়তো আজো বক্তৃতামঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলে মনে হয়, মাস্টারমশাই হাইবেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

যার রক্তে রক্তে এত শিক্ষক-ভীতি, তাকে আপনি সাধ্যসাধনা করেও 'তুমি' বলাতে পারবেন না, এ স্থির নিশ্চিত।

এইবার পালা শুরু।

বাংলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কিনা জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতি মাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব করে আসছি বহুদিন হতে। আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনোদিন অভিযোগ করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের-আখ্যায় বিভূষিত হবার মতো বড় তো আমি হইনি। অথচ হাফেজ-খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষের সাথে কাফেরের পঙক্তিতে উঠে গেলাম।

হিন্দু-লেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহ—যে নিবিড় প্রীতি-ভালোবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি, তাহলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দু-সভাওয়ালা' আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনাও করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদের আঙুল দিয়ে গোনা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত। এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দুসমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিব না। তাছাড়া আজকার সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ—আমি যত বেশি অসাম্প্রদায়িক হই না কেন।

প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল—এটা অস্বীকার করিনে; কিন্তু তাই বলে মুসলমানেরা যে আমায় কদর করেননি, এটাও ঠিক নয়। যাঁরা দেশের সত্যিকার প্রাণ, সেই তরুণ মুসলিম বন্ধুরা আমায় যে ভালোবাসা, যে প্রীতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে নিন্দার কাঁটা বহু নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রবীণদের আশীর্বাদ—মাথার মণি হয়তো পাইনি, কিন্তু তরুণদের ভালোবাসা, বুকের মালা আমি পেয়েছি। আমার ক্ষতির ক্ষেতে ফুলের ফসল ফলেছে।

এই তরুণদেরই নেতা ইব্রাহীম খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর, ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেন। আর এই বন্ধুরাই তো

আমায় বড় করেছেন, এই তরুণদের বুকে আমার জন্য আসন পেতে দিয়েছেন—প্রীতির আসন! ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফরিদপুরে যারা তাদের গলার মালা দিয়ে আমায় বরণ করল, তারা এই তরুণদেরই দল। অবশ্য এই তরুণের জাত ছিল না। এরা ছিল সকল জাতির।

সকলকে জাগাবার কাজে আমায় আহ্বান করেছেন। আমার মনে হয়, আপনাদের আহ্বানের আগেই আমার ক্ষুদ্র শক্তির সবটুকু দিয়ে এদের জাগাবার চেষ্টা করেছি—সে শুধু লিখে তা নয়,—আমার জীবনী ও কর্ম-শক্তি দিয়েও।

আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি—লিখেছি, বলেছি, চারণের মতো পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নাই, কিন্তু সামর্থ্য যেটুকু আছে, তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত কোনোদিন হয়েছি, এ-বদনাম আর যে-ই দিক, আপনি দেবেন না বোধ হয়। আমার এই দেশসেবার সমাজসেবার 'অপরাধের' জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজির আমার উপর দৃষ্টি অতি মাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলোই গেল বাজেয়াফত হয়ে। এই সেদিনও পুলিশ আবার জানিয়ে দিয়েছে, আমার নব-প্রকাশিত 'রুদ্র-মঙ্গল' আর বিক্রি করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে। আমি যদি পাশ্চাত্য ঋষি হুইটম্যানের সুরে সুর মিলিয়ে বলি :

> 'Behold, I do not give a little charity.
> When I give, I give myself.'

তাহলে সেটাকে অহঙ্কার বলে ভুল করবেন না।...

আপনি সমাজকে 'পতিত, দয়ার পাত্র' বলেছেন। আমিও সমাজকে পতিত ফবসড়ৎধষবুবফ মনে করি—কিন্তু দয়ার পাত্র মনে করতে পারিনে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার সমাজকে মনে করি ভয়ের পাত্র। এ-সমাজ সর্বদাই আছে লাঠি উঁচিয়ে; এর দোষ-ত্রুটির আলোচনা করতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আপনি হয়তো হাসছেন, কিন্তু আমি তো জানি, আমার শির লক্ষ্য করে কত ইট-পাটকেলই না নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভালো করা যাবে না। যদি সে রকম 'সাইকিক-কিওর'-এর শক্তি কারুর থাকে, তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ফোঁড়া যখন পেকে পচে ওঠে তখন রুগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র-চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়তো কখন আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়ে ঐ গলিত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা শুনে রুগীরও খুশি হয়ে উঠবার কথা। কিন্তু বেচারি 'অবিশ্বাসী' অস্ত্রচিকিৎসক তা বিশ্বাস করে না। সে বেশ করে তার ধারালো

ছুরি চালায় সে-ঘায়ে; রোগী চেঁচায়, হাত পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। সার্জন তার কর্তব্য করে যায়। কারণ সে জানে, আজ রুগী গালি দিচ্ছে, দু-দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা করে আসবে।

আপনি কি বলেন? আমি কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ তো হাত-পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে; তা সইবার মতো শক্ত চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজ-সেবা হয়তো চলবে না। এই জন্যই আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতীদলকে। এ-সংস্কার সম্ভব হবে শুধু তাদের দিয়েই। এরা যশের কাঙাল নয়, মনের ভিখারি নয়। দারিদ্র্য সইবার মতো পেট, আর মার সইবার মতো পিঠ যদি কারুর থাকে, তো এই তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নূতন সাহিত্য, এরাই আনবে নূতন ভাবধারা, এরাই গাইবে 'তাজা-ব-তাজা'র গান।

আপনি হয়তো আমায় এদেরই অগ্রনায়ক হতে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আপনার মতো আমিও ভাবি, আজো ভাবি যে, কে সে ভাগ্যবান এদের অগ্রনায়ক। আমার মনে হয়, সে ভাগ্যবান আজো আসেনি। আমি অনেকবার বলেছি, আজ বলছি—সে ভাগ্যবানকে আমি দেখিনি, কিন্তু দেখলে চিনতে পারব। আমার বাণী—তাঁরই আগমনী-গান। আমি তাঁরই অগ্রপথিক তূর্যবাদক। আমার মনে হয়, সেই ভাগ্যবান পুরুষেরই ইঙ্গিতে আমি শুধু গান গেয়ে চলছি—জাগরণী গান। আঘাত, নিন্দা, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা দশদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে আমার উপর, তবু আমি তাঁর দেওয়া তূর্য বাজিয়ে চলছি। এ-বিশ্বাস কোথা হতে কি করে যে আমার মাঝে এল, তা আমি নিজেই জানিনে। আমার শুধু মনে হয়, কার যেন আদেশ—কার যেন ইঙ্গিত আমার বেদনার রন্ধ্রপথে নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তাঁর আসার পদধ্বনি আমি নিরন্তর শুনছি আমার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি আক্ষেপে।

তবে, এও আমি বিশ্বাস করি, সেই অনাগত পুরুষের, আমাদের যে-কারুর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করা বিচিত্র নয়।

আমি এতদিন তাঁকে খুঁজেছি আমার ঊর্ধ্বে। তাঁকে আমারই মাঝে খুঁজতেও হয়তো চেয়েছি। দেখা তাঁর পেয়েছি এমন কথা বলব না, তবে এ-কথা বলতেও আমার আজ দ্বিধা নেই যে, আমি ক্রমেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করছি। এমনও মনে হয়েছে কতদিন, যেন আর একটু হাত বাড়ালেই তাঁকে ধরতে পারি।

আপনার 'হাত বাড়াবে কি?' কথাটা আমায় সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আমি খুঁজে ফিরছি নিরাশ-হতাশ্বাসে নেই নিশ্চিত শান্তি—যার ধ্যানলোকে বসে আমি তপস্যাপ্রোজ্জ্বল নেত্রে আমার অবহেলিত আমাকে খুঁজে দেখবার অবকাশ পাব। এ-শান্তি আমার এ জীবনে পাব কিনা জানি না; যদি পাই—আপনার জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর দিয়ে যাব সেদিন।

আপনার কয়েকটি মৃদু অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব এবার।

আপনি আমার যে-দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন, সে-দায়িত্ব আমার সত্যিকার কাব্য-সৃষ্টির, না সমাজ-সংস্কারের? আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে।

'এই সৃষ্টি করলে আর্টের মহিমা অক্ষুণ্ন থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুঁটো হয়ে পড়ে'—এমনতর কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বলগা কষে কষে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবার গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলেই আর্টের পরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হল—এ কথা মানতে আর্টিস্টের হয়তো কষ্টই হয়, প্রাণ তার হাঁপিয়ে ওঠে। জানি, ক্লাসিকের কেশো রোগীরা এতে উঠবেন হাড়ে হাড়ে চটে, তাঁদের কলম হয়ে উঠবে বাঁশ। এরই মধ্যে হয়েও উঠেছে তাই। তবু আজ এ-কথা জোর গলায় বলতে হবে নবীনপন্থীদের। এই সমালোচকদের নিষেধের বেড়া যাঁরাই ডিঙিয়েছেন, তাঁদেরই এঁদের গোদা পায়ের লাথি খেতে হয়েছে, প্রথম শ্রেণি হতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে নেমে যেতে হয়েছে।

বেদনা-সুন্দরের পূজা যাঁরাই করেছেন, তাঁদের চিরকাল একদল লোক হুজুগে বলে নিন্দা করেছে। আর, এরাই দলে ভারি। এরা মানুষের ক্রন্দনের মাঝেও সুর-তাল-লয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে হল্লা করে যে, ও কান্না হাততালি দেবার মতো কান্না হল না বাপু, একটু আর্টিস্টিকভাবে নেচে নেচে কাঁদো! সকল সমালোচনার উপরে যে-বেদনা, তাকে নিয়েও আর্টশালারক্ষী—এই প্রাণহীন আনন্দ-গুণ্ডার কুশ্রী চিৎকারে হুইটম্যানের মতো ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল।

আমার হয়েছে সাপের ছুঁচো-গেলা অবস্থা। 'সর্বহারা' লিখলে বলে—কাব্য হল না; 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট' লিখলে বলে—ও হল ন্যাকামি! ও নিরর্থক শব্দ-ঝঙ্কার দিয়ে লাভ হবে কি? ও না লিখলে কার কি ক্ষতি হত?

'লিরিক' নাকি 'লভ' এবং 'ওয়ার' নিয়ে। আমাদের দেশে যুদ্ধ নাই (হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ ছাড়া); কাজেই মানুষের নির্যাতন দেখে তার সেই মর্মব্যথার গান গাইলে এখানে হয় তা 'বীভৎস বিদ্রোহ-রস'। ওটা দিয়ে নাকি মানুষের প্রশংসা সহজলভ্য হয় বলেই আজকালকার লেখকেরা রসের চর্চা করে।

'আমার লেখা কাব্য হচ্ছে না, আমি কবি নই'—এ বদনাম সহ্য করতে হয়তো কোনো কবিই পারে না। কাজেই যারা করছিল মানুষের বেদনার পূজা, তারা এখন করতে চাচ্ছে প্রাণহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি। এমন একটা যুগ ছিল—সে সত্যযুগই হবে হয়তো—যখন মানুষের দুঃখ আজকের মতো এত বিপুল হয়ে ওঠেনি। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে ধ্যানের তপোবনে শান্ত সামগান গাইবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র মানুষ নিপীড়িত হতে লাগল, অমনি সৃষ্টি হল বেদনার

মহাকাব্য—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড প্রভৃতি। আর তাতে সমাজের আজকালকার বেঁড়ে-ওস্তাদ সমালোচকদের তথাকথিত 'বীভৎস বিদ্রোহ বা রুদ্র রসের' প্রাধান্য থাকলেও—তা কাব্য হয়নি, এখন কথা কেউ বলবে না।

এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্যস্রষ্টাদের জন্য নূতন সিংহাসন গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপস্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়, পুশকিন, দস্তয়ভসকি, হুইটম্যান, গোর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই। এই ধূলির আসনই একদিন সোনার সিংহাসনকে লজ্জা দেবে; এই তো আমাদের সাধনা।

দুঃখী বেদনাতুর হতভাগাদের একজন হয়েই আমি বেদনার গান গেয়েছি,—সে-গানে হয়তো রূপ-রঙ ফুটে ওঠেনি আমি ভালো ইংরেজ নই বলে; কিন্তু সেই বেদনার সুরকে অশ্রদ্ধা করবার মতো নীচতা মানুষের কেমন করে আসে। অথচ এই সব গালাগালির বিপক্ষে কোনো প্রতিবাদও তো হতে দেখিনি।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে, শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণে এতটা বিচলিত হওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার দিনের সূর্য ওদের শরনিক্ষেপে মুহূর্তের তরে আড়াল পড়লেও চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়বে না—আমার এ বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এর জন্য দুঃখও করিনে। অন্তত আমি তো জানি, আমার এই তো চলার আরম্ভ, আমার সাহিত্যিক জীবনের এই তো সবেমাত্র সেদিন শুরু। আজই আমি আমার পথের দাবি ছাড়ব কেন? ওদের রাজপথে ওরা চলতে যদি না-ই দেয়, কাঁটার পথেই চলব সমস্ত মারকে সহ্য করে। অন্তত পথের মাঝ পর্যন্ত তো যাই। আমার বনের রাখাল ভাইরা যে মালা দিয়ে আমায় সাজাল, সে-মালার অবমাননা-ই বা করব কেমন করে? ঠিক বলেছ বন্ধু, এবার তপস্যাই করব—পথে চলার তপস্যা।

'বিদ্রোহী'র জয়-তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকেই কলঙ্ক-তিলক বলে ভুল করেছে, কিন্তু আমি করিনি। বেদনা-সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য-সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন-পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়তো আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রূপার খাপের ঝকমকানিটাকেই দেখাইনি—এই তো আমার অপরাধ। এরই জন্য তো আমি বিদ্রোহী। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি, এর দরকার ছিল মনে করেই।

যাক। আগেই বলেছি, এ কুম্ভকর্ণ-মার্কা সমাজকে জাগাতে হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে। একদল প্রগতিশীল বিদ্রোহীর উদ্ভব না হলে এর চেতনা আসবে না।

কুম্ভকর্ণের পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বা চিমটি কেটে এর ঘুম ভাঙাবার যেসব পলিসির উল্লেখ আছে, তা একেবারে মোলায়েম নয়। সেই পলিসিই একবার একটু পরখ করে দেখুকই না ছেলেরা! এতে কি আর এমন হবে! আপনি বলবেন, কুম্ভকর্ণ না হয় জাগল ভায়া, কিন্তু জেগে সে যে রকম 'হাঁ'টা করবে, সে 'হাঁ' তো সংকীর্ণ নয়, তখন! আমি বলি কি, তখন কুম্ভকর্ণ তাদেরই ধরে 'জলপানি' করবে, যারা তার ঘুম ভাঙাতে গিয়েছিল।

এতেই তো মরেছে, নাহয় আরো দু-দশটা মরবে! আপনি বলবেন, ভয় তো ঐখানেই, বন্ধু : বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে এগোয় কে? আমি বলি, সে দুঃসাহস যদি আমাদের কারুর না থাকে, তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে সকলে 'আসহাব কাহাফে'র মতো রোজ-কিয়ামত তক ঘুমোতে পারেন। সমাজকে জাগাবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিন! কারুর পান থেকে এতটুকু চুন খসবে না, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না; তেল-কুচকুচে নাদুস-নুদুস ভুঁড়িও বাড়বে এবং সমাজও সাথে জাগতে থাকবে—এ আশা আলেমসমাজ করতে পারেন, আমরা অবিশ্বাসীর দল করিনে।

আমার কথাগুলো 'মরিয়া হইয়া'র মতো শুনাবে, কিন্তু বড় দুঃখে দেখে-শুনে তেতো-বিরক্ত হয়ে এসব বলতে হচ্ছে। তাই তো বলি যে, 'বাবা! তোকে রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। মরতে হয় তো এদেরই একজনের হাতে মর বেশ একটু হাতাহাতি করে; তাতে সুনাম আছে। কিন্তু ঐ হনুমানের হাতে মরিস কেন? হনুমানের হাতে মরার চেয়ে বরং কুম্ভকর্ণকে জাগাতে গিয়ে মরা ঢের ভালো।' কথাগুলো যখন বলি, তখন লোকে হাততালি দেয়, 'আল্লাহু আকবর', 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিও করে; কিন্তু তারপর আর তাদের খবর পাইনে।

আমিও মানি, গড়ে তুলতে হলে একটা শৃঙ্খলার দরকার। কিন্তু ভাঙার কোনো শৃঙ্খলা বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করিনে। নূতন করে গড়তে চাই বলেই তো ভাঙি—শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নূতন করে গড়ার আশাতেই তো যত শীঘ্র পারি ভাঙি—আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি। আমিও জানি, তৈমুর, নাদির সংস্কারপ্রয়াসী হয়ে ভাঙতে আসেনি, ওদের কাছে নতুন-পুরাতনের ভেদ ছিল না। ওরা ভেঙেছিল সেরেফ ভাঙার জন্যই। কিন্তু বাবর ভেঙেছিল দিল্লি-আগ্রা-ময়ূরাসন-তাজমহল গড়ে তোলার জন্য। আমার বিদ্রোহ 'যখন চাহে এ মন যা'র বিদ্রোহ নয়, ও আনন্দের অভিব্যক্তি সর্ববন্ধন-মুক্তের—পূর্ণতম স্রষ্টার।

আপনার 'মুসলিম-সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয়তো। ওর মানে কি মুসলমানের-সৃষ্ট-সাহিত্য না মুসলিম-ভাবাপন্ন সাহিত্য? যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার

বাইরের একটা ধর্ম থাকবে নিশ্চয়। ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্যরচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোনো ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি; গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি তো স্বীকার করিই, যাঁরা ইসলামধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য কেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমার গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে-গানের সুর। উঠতে পারেও না। তাহলে তা কাব্য হবে না। আমার বিশ্বাস কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়। আপনি কি চান, তা আমি বুঝতে পারি—কিন্তু সমাজ যা চায়, তা সৃষ্টি করতে আমি অপারগ। তার কাছে এখনও—

'আল্লা আল্লা বলো রে ভাই নবি করো সার।
মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাব ভবনদীর পার ॥'

রীতিমতো কাব্য। বুঝবার কোন কষ্ট হয় না, আল্লা বলতে এবং নবিকে সার করতে উপদেশও দেওয়া হল, মাজাও দুলল এবং ভবনদী পারও হওয়া গেল! যাক, বাঁচা গেল—কিন্তু বাঁচল না কেবল কাব্য। সে বেচারি ভবনদীর এপারেই রইল পড়ে। ঝগড়ার উৎপত্তি এইখানেই। কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে, তারা বলে—মাজা যদি দুলাতেই হয় দাদা, তবে ছন্দ রেখে দোলাও, পারে যদি যেতেই হয়, তবে তরী একেবারে কমল বনের ঘাটে ভিড়াও। অমৃত যারা পান করেনি—আর এরাই শতকরা নিরানব্বই জন—তারা বলে, কমলবন, টমলবন জানিনে বাবা, সে যদি বাঁশবন হয়, সেও-ভি আচ্ছা—কিন্তু একেবারে ভবনদীর পারঘাটায় লাগাও নৌকা। এ-অবস্থায় কি করব বলতে পারেন? আমি 'হুজ্জতুল ইসলাম' লিখব, না সত্যিকার কাব্য লিখব?

এরা যে শুধু হুজ্জতুল ইসলামই পড়ে, এ আমি বলব না; রসজ্ঞানও এদের অপরিমিত। আমি দেখেছি, এরা দল বেঁধে পড়ছে—

'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।'

অথবা—

'লাখে লাখে ফৌজ মরে কাতারে কাতার।
শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার ॥'

আর এই কাব্যের চরণ পড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে। উম্মর উম্মিয়ার প্রশংসায় রচিত—

'কাগজের ঢাল মিঞার তালপাতার খাঁড়া
আর লগির গলায় দড়ি দিয়ে বলে চল্ হামারা ঘোড়া।'

পড়তে পড়তে আনন্দে গদগদ হয়ে উঠেছে।

বিদ্রূপ আমি করছিনে, বন্ধু এ আমার চোখের জল-মেশানো হাসির শিলাবৃষ্টি। সত্য সত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়, তাহলে আর মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজি আছি। কিন্তু আমার এ ভালোবাসার আঘাতকে এরা সহ্য করবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ-ত্রুটি-কুসংস্কার নিয়ে কিনা কশাঘাত করেছেন সমাজকে;—তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানের দোষ-ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নেই। সংস্কার তো দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ করে নিয়ে লেখককে হয়তো ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দুজাতি যে এক নবতম বীর্যবান জাতিতে পরিণত হতে চলেছে, তার কারণ তাদের অসমসাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।

আমি জানি যে, বাংলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্মজাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ।

হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে। কিন্তু ইসলামের 'সভ্যতা-শাস্ত্র-ইতিহাস' এ-সমস্তকে কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার নয় কি?

আমার মনে হয়, আমাদের নূতন সাহিত্যব্রতীদল এর এক-একটা দিক নিয়ে রিসার্চ ও আলোচনার দায়িত্ব নিলে ভাল হয়। আগেই বলেছি, নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার পূর্ণ শান্তি কোনোদিন পাইনি। যদি পাই, সেদিন আপনার এই উপদেশ বা অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা যেন করতে পারি—তাই প্রার্থনা করছি আজ।

আবার বলি, যাঁরা মনে করেন—আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তাঁরা অনর্থক এ-ভুল করেন। ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে—তাকে ইসলাম বলে না-মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান? এ-ভুল যাঁরা করেন, তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া করে—এ ছাড়া আমার কি বলবার থাকতে পারে?

আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা যে, হাফেজ-রুমিকে শ্রদ্ধা করেন—এ-ও আমার মনে হয় না। আমি তো আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদেরে। এঁরা কি মনে করেন, হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে? তাহলে মুসলমান কবি দিয়ে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি কোনোকালেই সম্ভব হবে না—জৈগুণ বিবির পুঁথি ছাড়া।

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিলে বাংলা ভাষার অর্ধেক

ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরেজি সাহিত্য হতে গ্রিক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায় হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য-প্রচলিত মুসলমানি শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্যে অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয়েছে। তবু আমি জেনেশুনেই তা করেছি।

কিন্তু বন্ধু, এ কর্তব্য কি একা আমারই? আমার শক্তি সম্বন্ধে আপনার যেমন বিশ্বাস, আপনার উপরও আমার সেই একই বিশ্বাস—একই শ্রদ্ধা। আপনিও 'কামাল পাশা' না লিখে এই হতভাগ্য মুসলমানদের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে আরম্ভ করুন না কেন? আমার মনে হয়, ওদিকে আপনার জুড়ি নেই অন্তত আমাদের মধ্যে কেউ। 'কামাল পাশা'র দরকার আছে জানি, কিন্তু তার চেয়েও দরকার—আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই জীবনের এই ট্রাজেডি তুলে ধরা। কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখকের আমাদের অভাব নেই। নাটক-লিখিয়ের অভাবও আপনাকে দিয়ে পূরণ হতে পারে। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব কথাসাহিত্যিকের। এর তো কোনো আশা-ভরসাও দেখছিনে কারুর মধ্যে। অথচ কথাসাহিত্য ছাড়া শুধু কাব্যের মধ্যে আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে কেউ পারবেন না। অনুবাদকের দিক দিয়েও আমরা সবচেয়ে পিছনে। সংগীত, চিত্রকলা, অভিনয় ইত্যাদি ফাইন আর্টের কথা না-ই বললাম।

এত অভাবের কোনো অভাব পূর্ণ করব আমি একা, বন্ধু! অবশ্য একাই হাত দিয়েছি অনেকগুলি কাজে—তাতে করে হয়তো কোনোটাই ভালো করে হচ্ছে না।

জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব আমি নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।

আপনার এত সুন্দর, এমন সুলিখিত চিঠির কি বিশ্রী করেই না উত্তর দিলাম। ব্যথা যদি দিয়ে থাকি, আমার গুছিয়ে বলতে না পারার দরুন, তাহলে আমি ক্ষমা না চাইলেও আপনি ক্ষমা করবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।

আপনার বিরাট আশা, ক্ষুদ্র আমার মাঝে পূর্ণ যদি না-ই হয়, তবে তা আমাদেরই কারুর মাঝে পূর্ণত্ব লাভ করুক, আমি কায়মনে এই প্রার্থনা করি।

—কাজী নজরুল ইসলাম

Written to Principal Ibrahim Khan

[Principal Ibrahim Khan's "A Letter" to Nazrul Islam was published in the *Bhadra* 1334 issue of **'Nowroj'** magazine; this letter from Nazrul was published in the *Poush* 1334 issue of **'Saugat'** as a 'reply to that letter'.]

Respected Principal Ibrahim Khan Saheb!

For the Creator *Brahma*, it is said that eighty of our years constitute a single day. Even if I'm not that great a creator, I am a creator nonetheless, no matter how small the scope of my creation. So, a day of mine is at least three years long; whether others believe it or not, I'm sure you will.

I am replying to your letter from 1925 now, when 1927 is drawing to a close. It might even be that my own life is ending with 1927, and so, unknowingly, at the hint of some unknown command, I am uttering my last words under the pretext of replying to your letter. For in these three years, even my enemies wouldn't accuse me of having replied to anyone's letter – let alone my friends.

Of course, my life is ending – I don't have courage to enjoy this piece of good news, nor do I perhaps believe it; but many of my own kind, that is, many poets, believe it, and they have spent a considerable amount of money and effort to make me believe it too. However, the sighs they heave when they look at my physique are not short, nor are they the sighs of believers! Unfortunately for me, I apparently cannot accept their excessive attention towards me with a cheerful heart – bad people have even made such complaints in their court.

Even if people say it, it pains me to think of them as my enemies. Because once, they were my best friends. If today they truly wish for my death, it must be for my good, and I believe this with all my heart. I have not lost faith in humanity, no matter how

great and numerous the blows I receive from them. When a human face twists, it becomes a ghost, or if they become a ghost, their face twists; but when a human's heart twists, I know very well how much more terrifying and vengeful they become than a ghost. Still, I respect and love humanity. I haven't seen the Creator, but I have seen humans. These dust-covered, sin-laden, helpless, suffering humans will one day control the world, unveil eternal mysteries, and bring heaven down to this dust. I believe this with all my heart and soul. I feel myself in the pain of all the suffering, in the tears of all the helpless; I am not exaggerating in the slightest. In the mirror of these sorrowful tears, I seem to see my own reflection. If I can do nothing, may I at least cry wholeheartedly with them!

But this isn't answering your letter. You see, I've forgotten how to write letters from not writing them. But that has brought many benefits. Even if I close my eyes and ears and reply to someone's letter, reading that reply ends their enthusiasm or inclination to respond further. Because it becomes everything but a reply to their letter. You can take the testimony of those who have suffered this experience. So, if this, too, turns out to be something other than a reply to your letter, it's not a fault of your destiny, but the ill repute of my hand.

Even if we haven't met, there seems to have been no lack of hearing from either side. I know you; you know me even better than I know you. But whom else can I complain to but my destiny for not having truly known you until today?

Since we haven't met after all these years of my traveling to so many places in Bengal, I no longer hope we will. Especially now, when I am increasingly withdrawing myself from public acquaintances. But this has been good – at least from your perspective. I can bear the loss on my side with the joy that I did not give you the opportunity to regret that your great respect was misplaced. This is not my humility; I have felt that those who respected me based on what they heard found themselves embarrassed by that respect when they saw me. Therefore, deep down, I pray that if I do not give those whom I only caused pain

from close by the chance to forget that sorrow by staying far away, then my love for humanity is not true.

Moreover, proximity has a cruelty. The moonlight has no blemish, but the moon has blemishes. From afar, the moon pleases the eye, but I don't think anyone would be happy visiting the dead lunar landscape. The sunlight that enters through the window provides light, but the sun seen directly burns. I bow to the moon and the sun, but I am terrified when I hear of their visiting Earth. It's a good thing, brother, if I had come closer, my blemishes might have appeared larger.

Then there's the matter of respect. In that regard, you have no hope of winning, my friend. If respect could be weighed, a veteran editor of our country – who is adept at weighing people's merits and faults like a merchant, down to the last penny – would have settled it decisively! Due to the fickle nature of planets, the balance of his scales has never been favorable to me; yet, I can confidently say that you would still lose.

There's a reason for the sudden mention of the grocer, my friend! You know, we are penny-pinching customers. So, when we see even a slight shortage in weight, our hearts skip a beat. I don't know how much profit the grocer makes from it, but no one will understand the extent of our loss except us – certainly not the grocer. Still, when we see the grocer grabbing his hair and beard, there's a little hope that he'll hesitate to cheat us so openly; but when his low-paid, dirty servants take ownership of the scales, there's no hope left. As I said before, we are poor customers. If we had resources like the big *miyans*, I wouldn't be complaining.

Heavy-footed people have it easy. Whether their heavy feet are due to elephantiasis or simply their inherent weight. They have to be carried on shoulders, and one has to approach them with a bowed head, level with the ground. Those who understand business, no matter how much they envy and consequently despise another shopkeeper's big customer, will not hesitate to spend all their oil on that customer's heavy feet to lure them to their own shop. If necessary, their son will run with a tin of oil on his shoulder, swim across the Rupnarayan River, and pour oil on

their heavy feet – no matter how unmoving those feet are, like the pole of an oil press. And he doesn't forget to bring along a flatterer and a sycophant.

Anyway, enough of this nonsense. I have many things to answer.

Please don't be annoyed that I couldn't address you with the informal *'tumi'* as freely as you did. I am a village boy who ran away from school, and even if you were to send a diver into my stomach, you wouldn't find the letter *'ka'*. (I didn't use the bomb analogy for fear of the Special Tribunal.) Even if I could have addressed *Khaja* or Ibrahim Khan as *tumi*, hearing the name of a college Principal made my limbs shrink into my stomach. Oh, my goodness? Just remembering the face of my school Headmaster still makes me thirsty today, and a college Principal, who knows how much more terrifying he must be! Not even the 'last boy' who got one mark less than me could accuse me of ever having sat in class during my school life. My feet never faltered from the high bench, it was a permanent settlement for me. That's why even today, when I'm made to stand on a lecture stage, I feel like the teacher has made me stand on the high bench.

Someone with such blood-deep fear of teachers, you cannot persuade them to use *tumi*, that's for sure.

Now the game begins.

I don't know if the Bengali Muslim society is poor in wealth, but I have been feeling with pain for a long time that it is poor in spirit, and excessively so. I have accepted with bowed head the title of *Kafir* that the Muslim society has bestowed upon me. I don't recall ever complaining that it was an injustice. However, I have felt ashamed thinking that I haven't grown great enough to be adorned with the epithet of *Kafir*. Yet, I found myself in the same row of *Kafirs* as great personalities like Hafez, Khayyam, and Mansur.

If I deny today the debt of affection, the intense love and regard with which Hindu writers and the general public have elevated me, no one will believe that I have human blood in my veins. Of course, a few dirty Hindu and Brahmo writers, out of

envy, have been abusing me in vulgar language for some time, and a few orthodox 'Hindu Sabha-walas' are spreading false rumors about me, but these can be counted on one's fingers. Their animosity is entirely communal or personal. I have not blamed, nor will I blame, the entire Hindu society for their injustice. Moreover, in these days of communal intoxication, the fact that I am a Muslim has become a crime for many Hindus – no matter how non-communal I am.

I do not deny that the first storm of abuse came from my own side, that is, from the Muslims; but that does not mean that Muslims did not appreciate me. The real lifeblood of the country, the young Muslim friends, welcomed me with such love and affection that the thorns of criticism are buried deep beneath. I may not have received the blessings – the crown jewel – of the elders, but I have received the love of the youth, the garland for my chest. Flowers have bloomed in my field of loss.

The leaders of these youths are Ibrahim Khan, Kazi Abdul Wadud, Abul Kalam Shamsuddin, Abul Mansur, Wazed Ali, Abul Husain. And these friends are the ones who have made me great, who have laid a seat for me in their hearts – a seat of affection! Those in Dhaka, Chittagong, Noakhali, Faridpur who welcomed me with their garlands, they were from this group of youths. Of course, these youths had no caste. They were of all castes.

You have called upon me to awaken everyone. I believe I have tried to awaken them with all my meager strength even before your call – not just by writing, but also through my life and actions.

My strength is limited, yet for eight years I have traveled from country to country, village to village, trying to organize farmers, laborers, and youth – I have written, spoken, and sung on the roads like a bard. I have no wealth, but I have never hesitated to spend what little ability I possess. No one else may accuse me of that, but you, I hope, will not. For this 'crime' of national service and social work, the benevolent government *babaji* has fixed their gaze upon me with excessive sharpness. My most popular books

have been confiscated. Just the other day, the police again informed me that if I sold my newly published "Rudra-Mangal" again, I would be arrested for sedition. If I were to echo the Western sage Whitman and say:

'I behold, I do not give a little charity.
When I give, I give myself.'

Please do not mistake that for arrogance...

You have called society 'fallen, an object of pity.' I too consider society fallen and demoralized – but I cannot consider it an object of pity. From my practical experience, I consider my society to be an object of fear. This society is always ready with a raised stick; if one tries to discuss its faults and flaws, one gets into trouble with one's own head. You may be laughing, but I know how many bricks and stones have been thrown at my head.

Do you know what I think? This rotten society cannot be improved by a gentle touch. If anyone has such 'psychic-cure' power, they can try to soothe it. When an abscess ripens and rots, the patient fears the surgeon most. A quack doctor might reassure them that he will cure the putrid wound with a gentle touch, and the patient might be happy to hear that. But the poor 'unbelieving' surgeon doesn't believe it. He skillfully wields his sharp knife on the wound; the patient screams, thrashes, curses. The surgeon continues his duty. Because he knows that today the patient is cursing, but in two days, when the wound heals, he himself will go and praise him.

What do you say? I, however, am in favor of surgery. Society will thrash and curse; those who don't have tough enough skin to endure that, perhaps they won't be able to serve society. That's why I keep calling out to fearless young volunteers. This reform will only be possible through them. They are not hungry for fame, nor beggars of the heart. If anyone has a stomach strong enough to bear poverty, and a back strong enough to bear blows, it's these young people. They will create new literature, they will bring new ideas, and they will sing the song of freshness.

You have perhaps hinted that I should be their vanguard. But like you, I too wonder, and still wonder, who that fortunate leader of theirs is. I believe that fortunate one has not yet arrived. I have said many times, and I say today – I have not seen that fortunate one, but if I see him, I will recognize him. My words are the song of his arrival. I am his forerunner, the trumpeter. I believe that it is at the signal of that fortunate man that I am merely singing – songs of awakening. Blows, criticisms, ridicule, insults are raining down on me from all directions, yet I continue to play the trumpet he gave me. Where and how this belief came to me, I myself do not know.

I just feel as if someone's command – someone's hint – is constantly resounding through the crevices of my pain. I constantly hear the footsteps of his coming in the rhythm of my heartbeat, in every beat of my breath.

However, I also believe that it is not strange for that unborn person to embody himself within any of us. I have sought him above me all this time. I have also perhaps tried to seek him within myself. I wouldn't say I have seen him, but I have no hesitation in saying today that I am increasingly feeling his presence. Many times, it has seemed as if I could grasp him if I just reached out a little further.

Your question, 'Will you reach out?' has truly made me ponder. That's why I'm searching for that certain peace in despair and hopelessness – a peace where I can sit in contemplation and with eyes bright with spiritual fervor, seek out my neglected self. I don't know if I will find this peace in this life; if I do, I will give you the final answer to your question that day.

Now I will try to answer a few of your mild complaints.

The responsibility you mentioned, is it for my true poetic creation or for social reform? I don't know the precise definition of art, and even if I did, I wouldn't accept it. To say that 'this creation preserves the glory of art, this creation makes art lame' – to bridle the speed of art's great horse at every step with such fixed rules, obstructing and injuring it, and then to claim that this is the perfectly controlled expression of art, an artist probably

finds it difficult to accept, their soul gasps for air. I know that the 'classic-sick' patients will be utterly annoyed by this, their pens will turn into bamboo. It has already become so. Yet today, the new school must boldly assert this. Those who have crossed the fence of these critics' prohibitions have had to receive kicks from their clumsy feet, they have had to descend from the first class to the second.

Those who have worshipped sorrow-beauty have always been criticized by a group of people as being sensationalists. And these are numerous. They will make a commotion even if they see the slightest deviation in rhythm or tune in human wails, saying, "That crying isn't clapping-worthy, dear, cry with a bit of artistic dancing!" Even for sorrow, which is above all criticism, the art-house guards – these lifeless pleasure-thugs with their ugly shouts – made even a sage like Whitman fall into the category of non-poets.

I'm in a 'swallowed snake' situation. If I write "Sarbahara", they say it's not poetry; if I write "Dolan Champa", "Chayanat", they say it's mawkishness! What's the point of such meaningless wordplay? What harm would it do if I didn't write it?

'Lyric' is supposedly about 'love' and 'war'. We have no war in our country (except for the Hindu-Muslim war); so, when one sings of the deep pain caused by human oppression, it becomes 'grotesque rebellious sentiment' here. They say modern writers cultivate this sentiment because it easily earns public praise.

'My writing isn't poetry, I'm not a poet' – perhaps no poet can tolerate this accusation. Consequently, those who were worshipping human pain now want to create lifeless beauty. There was a time – perhaps it was the *Satya Yuga* – when human suffering hadn't become as immense as it is today. Then, people had the leisure to sing peaceful *Samaveda* hymns in the meditative groves of tranquility with secure trust. But as soon as people began to be oppressed, then came the epic poems of sorrow – *Ramayana, Mahabharata, Iliad*, etc. And even if they were dominated by what modern society's self-proclaimed 'masters'

and critics call 'grotesque rebellion or fierce sentiment' – no one would say they weren't poetry.

By singing these songs of sorrow, our new literary creators must build new thrones. If they cannot sit beside creators of beauty like **Kalidasa**, Yeats, Tagore, they will certainly have the right to sit on a dusty seat beside Pushkin, Dostoevsky, Whitman, Gorky, and Joan Baez. This dusty seat will one day shame the golden throne; this is our aspiration.

As one of the suffering, pained, unfortunate ones, I have sung songs of sorrow. Perhaps form and color didn't emerge in those songs because I'm not a good Englishman; but how can people have the baseness to disrespect the tune of that sorrow? Yet, I haven't seen any protest against all this abuse.

Today, however, I feel that I shouldn't have been so agitated by the arrows fired by my enemies. Even if the sun of my day was momentarily obscured by their arrows, it wouldn't be covered forever – I should have had this faith. But I don't regret it either. At least I know that this is just the beginning of my journey, my literary life has only just begun. Why should I give up my claim to the path today? If they don't let me walk on their royal road, I will walk on the thorny path, enduring all the blows. At least I'll go halfway. How can I dishonor the garland that my forest-herder brothers adorned me with? You are right, my friend, this time I will meditate – the meditation of walking the path.

The victorious mark of 'Rebel' became immortal on my forehead with the love of my young friends. Many have mistaken it for a mark of disgrace, but I haven't. Have I rebelled against truth-beauty just because I sang the song of sorrow-beauty? I have rebelled – I have sung the song of rebellion against injustice, against oppression, against what is false, corrupted, old and rotten, against that false eternal, against hypocrisy and superstition in the name of religion. Perhaps I couldn't say everything softly, I didn't hide the sword and only showed the glitter of its silver scabbard – this is my crime. That's why I'm a rebel. I have rebelled against this injustice, fearlessly crossed the

boundaries of all social superstitions and prohibitions, because I felt it was necessary.

Anyway, As I said before, to awaken this Rip Van Winkle-esque society, it must be awakened by blows. Without the emergence of a progressive group of rebels, it will not awaken. The policies mentioned for waking *Kumbhakarna* by tickling his feet or pinching him are not at all gentle. Let the boys try that policy just once! What more could happen? You will say, "*Kumbhakarna* might wake up, brother, but then the 'gasp' he'll make will not be narrow!"

I say, then *Kumbhakarna* will catch and feast on those who went to wake him. They've already died, so what if a few more die! You'll say, "That's the fear, my friend: who will dare to bell the cat?" I say, if none of us have that courage, everyone can put mustard oil up their noses and sleep like the 'Companions of the Cave' until the Day of Judgment. Give up all hope of awakening society! No one will suffer the slightest scratch, not a hair will be out of place; their oily, plump bellies will grow, and society will awaken along with them – the scholars may hope for this, but we, the unbelievers, do not.

My words may sound 'desperate,' but I have to say all this out of much pain and bitterness from what I have seen and heard. That's why I say, 'Child! If *Rama* kills you, he will, if *Ravana* kills you, he will. If you must die, die by the hand of one of them after a good fight; there is honor in that. But why die by the hand of that Hanuman? It's far better to die trying to wake *Kumbhakarna* than to die by Hanuman's hand.' When I say these words, people clap, they shout *Allahu Akbar,* and *Bande Mataram*; but then I hear no more from them.

I also agree that to build, a certain discipline is necessary. But I don't believe that breaking requires any discipline or caution. I break precisely because I want to build anew – my song of breaking is not for the sake of breaking alone. And with that hope of building anew, I break as quickly as I can – inflicting ruthless blows to cast down the rotten old. I also know that **Timur** and Nadir did not come to break with reform in mind; for them, there

was no distinction between new and old. They broke simply for the sake of breaking. But Babur broke in order to build Delhi, Agra, the Peacock Throne, and the Taj Mahal. My rebellion is not a rebellion of 'whatever this heart desires'; it is the expression of joy of the most complete Creator, free from all bonds.

Many Muslim literati will probably question the meaning of your phrase **'Muslim literature'**. Does it mean literature created by Muslims, or literature with a Muslim sensibility? If it is truly literature, it will belong to all nations. However, it will certainly have an external religion. Poetry can be written based on the truth of Islam, but not on its scriptures. Not just Islam, I don't believe poetry can be written based on the scriptures of any religion. The true lifeblood of Islam is popular power, democracy, universal brotherhood, and egalitarianism. I acknowledge this novelty and superiority of Islam, and even those who are not followers of Islam acknowledge it. Centering on this great truth of Islam, not just poetry, but epics can be created. I am a small poet, and through many of my writings, I have sung the glory of Islam.

However, the tune of that song has not overshadowed the poetry. Nor can it. If it did, it wouldn't be poetry. I believe that when the purpose overshadows the poetry, the poetry suffers. I understand what you want – but I am unable to create what society wants. For them, even now –

'Say Allah Allah, O brothers, make the Prophet your guide.

Swaying your waist, we shall cross the river of existence.' is truly poetry. There's no difficulty in understanding, advice is given to say Allah and follow the Prophet, the waist is swayed, and the river of existence is crossed! Well, we're saved – but only the poetry isn't. It's left behind on this side of the river of existence. This is where the quarrel begins. Those who have drunk the nectar of poetry say – if you must sway your waist, brother, then sway it in rhythm; if you must cross, then bring the boat directly to the lotus forest's ghat. Those who haven't drunk the nectar – and they are ninety-nine percent – they say, we don't know about lotus forests or anything, even if it's a bamboo grove, that's fine too – but bring the boat directly to the ghat of the river of existence. In

this situation, what can I do, tell me? Should I write 'Hujjat-ul-Islam' or real poetry?

I wouldn't say they only read Hujjat-ul-Islam; their aesthetic sense is also boundless. I have seen them reading in groups:

'The horseman rode, but walked on foot.'
Or
'Lakhs of troops died row upon row.
Counting them, I found fifty thousand.'

And they have wept profusely reading these lines of poetry. And they were overjoyed reading the praise of Umar Ummiya:

'The gentleman's shield of paper, sword of palm leaf,
And tying a rope to a pole, he says, "Let's go, my horse!"'

I am not being sarcastic, my friend, this is a hailstorm of laughter mixed with my tears. Truly, if my writing can bring consciousness to my dying society, for its good, I am even willing to lower my poetic ideals. But whether they will endure this blow of my love is the big question. Didn't Hindu writers lash out at their society for its flaws, faults, and superstitions? Yet they did not lose the respect of society. But this unfortunate Muslim has no way even to speak of faults and flaws. Reform is far off, even if one tries to correct it, they will misinterpret it and perhaps stab the writer. The reason why the Hindu nation is transforming into a new, valiant nation today is the sharp pen of their incredibly courageous writers.

I know that the greatest welfare of the country lies in the upliftment of the Muslims of Bengal. Because their self-awakening has not occurred, the path to India's freedom is blocked today. I also agree that nothing will become of this cursed country unless the mutual disrespect between Hindus and Muslims is removed. And I also know that this disrespect can only be removed through literature.

But isn't it difficult to express Islam's 'civilization, scriptures, history' through poetry?

I think it would be good if our new literary volunteers took on the responsibility of researching and discussing each of these aspects. As I said before, I have never experienced the complete peace of a secure life. If I do, I pray that day I can uphold the honor of your advice or request.

Again, I say, those who think I am an opponent of Islam or that I am rebelling against its truth are making an unnecessary mistake. Is not acknowledging the superstitions and false debris accumulated in the name of Islam as Islam an act of rebellion against Islam? Those who make this mistake, please read my writings carefully – what else can I say?

Those who rebel against me after reading my "Bidrohi" – I don't think they respect Hafiz or Rumi either. I consider them even more rebellious than myself. Do they think that mentioning Hindu deities makes one a *Kafir*? Then Bengali literature can never be created by Muslim poets – except for *Zaigun Bibi's punthi* (folk literature).

Bengali literature, though not a daughter of *Sanskrit*, is an adopted daughter. Therefore, Hindu thought is so inextricably intertwined with it that if it were removed, half the force of the Bengali language would be lost. No one can imagine removing the influence of Greek mythology from English literature. Bengali literature belongs to both Hindus and Muslims. Just as it is wrong for Muslims to be angry at seeing Hindu deities' names in it, it is equally wrong for Hindus to frown upon seeing everyday Muslim words, commonly used by Muslims, in their written literature.

I believe completely in the unity of Hindus and Muslims. That's why I use Muslim words or mention Hindu deities' names to strike at these prejudices. Of course, this has sometimes harmed the beauty of my poetry. Still, I did it knowingly.

But my friend, is this duty mine alone? Just as you have faith in my strength, I have the same faith and respect in you. Why don't you also start writing plays about the lives of these unfortunate Muslims instead of writing 'Kamal Pasha'? I think you have no equal in that regard, at least among us. I know

'Kamal Pasha' is needed, but even more needed is to portray this tragedy of our own lives before our eyes.

We don't lack poets and essayists. The lack of playwrights can also be filled by you. Our biggest lack is in fiction writers. I see no hope in anyone for this. Yet, without fiction, no one can portray our lives and ideals merely through poetry. We are also most behind in terms of translators. Not to mention music, painting, acting, and other fine arts.

How can I alone fill so many deficiencies, my friend! Of course, I have started many tasks alone – which means perhaps none of them are being done well.

No matter how sorrowful my life may be, I will sing songs of joy and sorrow, I will give myself away completely to everyone, and I will live on in everyone's lives. This is my vow, this is my devotion, and this is my penance.

What a terrible reply I have given to your beautiful, well-written letter. If I have caused you pain due to my inability to express myself properly, I believe you will forgive me even if I don't ask for it.

If your great hope cannot be fulfilled in my humble self, then may it find fulfillment in one of us; I pray for this with all my heart and soul.

Kazi Nazrul Islam

Translated by Alamgir Mohammad

কাজী অনিরুদ্ধ-কে লিখিত পত্র

বাবা নিনামণি,

তোমারও চিঠি পেয়েছি—চমৎকার লেখা তোমার। তোমাকে এইবার মায়ের বাড়িতে চাকরি করে দেব। তোমার ফুল পেয়েছি। চমৎকার ফুল—সুন্দর গন্ধ। ভগবানকে দিয়েছি তোমার ফুল। তিনি তোমার ফুল পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। তোমাকে চুমু দিয়েছেন তিনি। কালি ফুরিয়ে গেল তাই পেন্সিলে লিখছি, তোমরা বীর ছেলে হয়ে উঠবে, দুষ্টুমি করো না, কেঁদো না, জল ঘেঁটোনা। আমি রোজ তোমাদের দেখে আসি, চুমু খাই, তোমরা যখন ঘুমোও। চণ্ডীর সঙ্গে খেলা করবে। ঘুমোলে আমায় দেখতে পাবে। তখন আমি কোলে নেব। আরো ফুল পাঠিয়ো, তোমাদের ভগবানকে দেবো। এতগুলো চুমু নাও। ইতি—

তোমার বাবা

Written to Anirudwh Kazi

Baba Ninimoni,
I have received your letter. You write brilliantly. This time, I will appoint you in *Ma's* home. I have got your flowers. Beautiful flowers! They smell fantastic. I have placed your flowers in *Bhagoban*. HE has become elated after having your flower. He offered you a kiss. Ink ran out, that's why I am writing with a Pencil. You will be grown up as a hero, do not be naughty, and do not cry. Do not play with water. When you sleep, every night, I pay you a visit to you, give you a kiss. Play with Chandi. When you sleep, you will see me then. I will take you to my lap. Send more flowers, I will offer them to *Bhagoban*. Take lots of kisses.
Yours,
Baba

Translated by Alamgir Mohammad

নার্গিস আসার খানম-কে লিখিত পত্র

[১৩২৮-এর ৩রা আষাঢ় বিয়ের তারিখ নির্ধাতি হয় কিন্তু কাবিননামার শর্ত নিয়ে মতভেদের কারণে নজরুল বিয়ের আসর ছেড়ে সেই রাত্রেই দৌলতপুর ত্যাগ করেন এবং কুমিল্লায় চলে আসেন। এই ঘটনার দীর্ঘ পনরো বছর পর নার্গিস নজরুলকে একটি চিঠি দেন তার উত্তরে নজরুল নার্গিসকে এই চিঠি লেখেন।]

106, Upper Chitpur Road
'Gramophone Rehearsal Room'
Calcutta
1.7.37

কল্যাণীয়াসু!

তোমার পত্র পেয়েছি—সেদিন নববর্ষার নবঘন-সিক্ত প্রভাতে। মেঘ-মেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনর বছর আগে এমনি আষাঢ়ে এমনি বারিধারার প্লাবন নেমেছিল—তা তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পার। আষাঢ়ের নব মেঘপুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলো কালিদাসের যুগে, রেবা নদীর তীরে, মালবিকার দেশে তাঁর প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চয়। এই আষাঢ় আমার কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে। যাক, তোমার অনুযোগের অভিযোগের উত্তর দিই।

তুমি বিশ্বাস কর, আমি যা লিখছি তা সত্য। লোকের মুখে শোনা কথা দিয়ে যদি আমার মূর্তির কল্পনা করে থাক, তা হলে আমায় ভুল বুঝবে—আর তা মিথ্যা।

তোমার উপর আমি কোনো 'জিঘাংসা' পোষণ করি না—এ আমি সকল অন্তর দিয়ে বলছি। আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি—তা দিয়ে তোমায় কোনোদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমানিক না দিলে আমি অগ্নি-বীণা বাজাতে পারতাম না—আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না। তোমার যে কল্যাণ-রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথমে দেখেছিলাম, সে রূপ আজো স্বর্গের পারিজাত-মন্দারের মতো চির-অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের আগুন বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারেনি।

তুমি ভুলে যেও না, আমি কবি—আমি আঘাত করলেও ফুল দিয়ে আঘাত করি। অসুন্দর, কুৎসিত সাধনা আমার নয়। আমার আঘাত বর্বরের কাপুরুষের আঘাতের মতো নিষ্ঠুর নয়। আমার অন্তর্যামী জানেন (তুমি কি জানো বা শুনেছো,

জানি না) তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার কোনো অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, দাবিও নেই।

আমি কখনো কোনো 'দূত' প্রেরণ করিনি তোমার কাছে। আমাদের মাঝে যে অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর 'সেতু' কোনো লোক তো নয়ই—স্বয়ং বিধাতাও হতে পারেন কি না সন্দেহ। আমায় বিশ্বাস কর, আমি সেই 'ক্ষুদ্র'দের কথা বিশ্বাস করিনি। করলে পত্রোত্তর দিতাম না। তোমার উপর আমার কোনো অশ্রদ্ধাও নেই, কোনো অধিকারও নেই—আবার বলছি। আমি যদিও গ্রামোফোনের ট্রেড মার্ক 'কুকুরে'র সেবা করছি, তবুও কোনো কুকুর লেলিয়ে দিই নাই। তোমাদেরই ঢাকার কুকুর একবার আমায় কামড়েছিল আমার অসাবধানতায়, কিন্তু শক্তি থাকতেও আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি—তাদের প্রতি আঘাত করিনি।

সেই কুকুরদের ভয়ে ঢাকায় যেতে আমার সাহসের অভাবের উল্লেখ করেছ, এতে হাসি পেল। তুমি জান, ছেলেরা (যুবকেরা) আমায় কত ভালোবাসে। আমারই অনুরোধে আমার ভক্তরা ক্ষমা করেছিল। নইলে তাদের চিহ্নও থাকত না এ পৃথিবীতে। তুমি আমায় জানবার যথেষ্ট সুযোগ পাওনি, তাই এ কথা লিখেছ... যাক তুমি রূপবতী, বিত্তশালিনী, গুণবতী, কাজেই তোমার উমেদার অনেক জুটবে—তুমি যদি স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হও, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। আমি কোন অধিকারে তোমায় বারণ করব—বা আদেশ দেব? নিষ্ঠুরা নিয়তি সমস্ত অধিকার থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন।

তোমার আজকার রূপ কি, জানি না। আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবীমূর্তির মতো আমার হৃদয়-বেদীতে অনন্ত প্রেম অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ দেবীর মতোই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদী-পীঠ।... জীবনভরে সেইখানেই চলেছে আমার পূজা-আরতি। আজকার তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ, তাই তাকে পেতে চাইনে। জানিনে হয়তো সে রূপ দেখে বঞ্চিত হবো, অধিকতর বেদনা পাব,—তাই তাকে অস্বীকার করেই চলেছি।

দেখা? না-ই হলো এ ধূলির ধরায়! প্রেমের ফুল এ ধূলিতলে হয়ে যায় ম্লান, দগ্ধ, হতশ্রী। তুমি যদি সত্যই আমায় ভালোবাসো, আমাকে চাও, ওখানে থেকেই আমাকে পাবে। লায়লী মজনুকে পায়নি, তবু তাদের মতো করে কেউ কারো প্রিয়তমকে পায়নি। আত্মহত্যা মহাপাপ, এ অতি পুরাতন কথা হলেও পরম সত্য। আত্মা অবিনশ্বর আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শ যদি পেয়ে থাকো তা হলে তোমার মতো ভাগ্যবতী কে আছে? তারি মায়া স্পর্শে তোমায় সকল কিছু আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে। দুঃখ নিয়ে একই ঘর থেকে অন্য

ঘরে গেলেই সেই দুঃখের অবসান হয় না। মানুষ ইচ্ছে করলে সাধনা দিয়ে তপস্যা দিয়ে ভুলকে ফুল-রূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যদি কোনো ভুল করে থাকো জীবনে এই জীবনেই তার সংশোধন করে যেতে হবে; তবেই পাবে আনন্দ, মুক্তি; তবেই হবে সর্ব দুঃখের অবসান। নিজেকে উন্নত করতে চেষ্টা করো। স্বয়ং বিধাতা তোমার সহায় হবেন। আমি সংসার করছি, তবু চলে গেছি এই সংসারের বাধাকে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বলোকে—সেখানে গেলে পৃথিবীর সকল অসম্পূর্ণতা সকল অপরাধ ক্ষমা সুন্দর চোখে পরম মনোহর মূর্তিতে দেখা দেয়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল পনের বছর আগেকার কথা। তোমার জ্বর হয়েছিল, বহু সাধনার পর আমার তৃষিত দুটি কর তোমার শুভ্র সুন্দর ললাট স্পর্শ করতে পেরেছিল; তোমার সেই তপ্ত ললাটের স্পর্শ যেন আজো অনুভব করতে পারি। তুমি কি চেয়ে দেখেছিলে? আমার চোখে ছিল জল, হাতে সেবা করার আকুল স্পৃহা, অন্তরে শ্রীবিধাতার চরণে তোমার আরোগ্য লাভের জন্য করুণ মিনতি। মনে হয় যেন কালকার কথা। মহাকাল সে স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলে না। কী উদগ্র অতৃপ্তি; কী দুর্দমনীয় প্রেমের জোয়ারই সেদিন এসেছিল! সারা দিনরাত আমার চোখে ঘুম ছিল না।

যাক—আজ চলেছি জীবনের অস্তমান দিনের শেষ রশ্মি ধরে ভাঁটার স্রোতে। তোমার ক্ষমতা নেই সে পথ থেকে ফেরানোর। আর তার চেষ্টা করো না। তোমাকে লেখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক। যেখানেই থাকি বিশ্বাস কর, আমার অক্ষয় আশীর্বাদী কবচ তোমায় ঘিরে থাকবে। তুমি সুখী হও, শান্তি পাও—এই প্রার্থনা। আমায় যতো মন্দ বলে বিশ্বাস করো, আমি ততো মন্দ নই—এই আমার শেষ কৈফিয়ৎ। ইতি—

নিত্য শুভার্থী
নজরুল ইসলাম

P.S. আমার 'চক্রবাক' নামক কবিতা-পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছ? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে। তোমার কোনো পুস্তকে আমার সম্বন্ধে কটূক্তি ছিলো। ইতি—

'Gentleman'

Written to Nargis Asar Khanam

106, Upper Chitpur Road
'Gramophone Rehearsal Room'
Calcutta
1.7.37

Dearest,

I got your letter in a morning drenched with the first rain. The sky was weeping on that day. Perhaps you may remember, fifteen years ago on a similar day, it happened the same. *Namaskar* to the new clouds of *Ashar*. This god of clouds carried the words of heartless to the era of *Kalidas*, to the shore of *Reba*, and to the country of *Malobika*. The blessings of these patches of cloud brought the lyric of sadness in my life. This *Ashar* has carried me to the world of sorrows from my world of fancifulness. Whatever, let me reply to your reproof.

Believe me, what I am writing is true. If you believe what others say about me, it will be a great mistake. Moreover they are not true.

I do not feel any malice towards you. I am telling this from the heart. My Almighty knows how much pain I am bearing in my soul. How deep the injury is! Although I have been suffering from the fire of this sadness, I have never wanted to make you suffer from this. If you didn't ignite the fire inside me, I would not have been able to play the flute of ***Ognibina***. I wouldn't be able to rise to the present day position. The good spirit that I saw in you is still ever fresh in my heart. The fire burning inside couldn't be able to hurt my appearance.

Do not forget that I am a poet. If I hurt, it is with the stroke of flowers. Exercising ill is not my cup of tea. My heart is not as barbarous as the one of a coward. My Almighty knows (I do not

know what you heard or knew) I do not have any complaint, any malice or any right to you.

I never sent any messenger to you. The kind of distance that has been created between us cannot be bridged by anyone human born- even the Almighty might not. Believe me, I did not believe the words of those meanest. Again, I am telling you that I do have neither disrespect nor any right to you. Although I am serving the trademark dogs of the Gramophone, I have not deployed any dog against you. Once I have been beaten by some dogs from your Dhaka due to my unawareness, but despite having the strength I did not avenge or attack them in return.

In your letter you accused me of being afraid of those dogs and not going to Dhaka fearing them. After reading this I felt like laughing. It is known to you how much the boys love me and they forgave the dogs only for my request, otherwise they would have been diminished from the world. You did not get enough time to know me. That's why you are blaming me thus. Whatever, you have beauty, property and virtues. Thus many will run after you, if you want to choose a husband for yourself, I do not have any objection. On which ground should I bar you? Cruelties of fate have deprived me of claiming any right on you.

I do not know how you look now. Your beauty of youth is known to me, and I have placed your angel-like appearance in my mind with deepest respect and love. You ignored that offer of mine. Like an angel of the cruelties you chose the abode of pains. I have been serving offerings to that abode throughout life. To me your present status is a lie for me, I do not long for you now. I will have to suffer that's why I have been ignoring this.

Seeing you? - May it not happen! The flower of love loses its glamour, gets burned and appears awkward on earth. If you really love and desire me, you will have me from there. **Laili** did not get **Majnu**, none gets their beloved as they will. 'Self- Killing is a great sin'-though it's an old saying, it carries much worth. The soul is indelible- none can destroy it. If you have got the gleams of love, then who else is luckier than you? With its touch, everything will get enlightened. With grief if you migrate from

one abode to another, it does not bring an end. If human beings try, they can transform a mistake into a flower. If you have done any wrong in this mundane life, you have to amend this, make an end to this wrong; then, you will get relief and elation. Try to develop yourself. The Almighty will be your resort. I am leading a family life but from this, I have stepped into a newer world, from where everything can be seen in other's eye, and all the unfulfilled desires of the mundane world can be forgiven.

Suddenly, the memory of fifteen years ago has come before you. You fell prey to fever, after attempting many times, my two lips touched your heavenly eyes. Still, I cannot forget that lightning-like touch. Did you notice tears in my eyes? My eyes were full of tears, hands with passionate intensity to care for you. It seems all these happened yesterday. Eternity cannot delete this memory. What an unquenchable thirst. What an indomitable flow of love came on that day! My eyes lacked sleep day and night.

Whatever, now I am heading towards the last ray of life. Everything is on the wane. You cannot call me back from this journey. Do not try more. This is my first ever and the last letter to you. Wherever you go, remember one thing; my blessings will be with you. Be happy and find peace- this is my prayer. My last explanation is: I am not as bad as you believe.

Yours,
Nazrul

P.S. Have you read the poems of the *Chakrobak*? You will get answers to many of your questions. You satirized me in any of your books.

Yours,
Gentleman

Translated by Alamgir Mohammad

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ-কে লিখিত পত্র

[বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে লিখিত। ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বুলবুল' পত্রিকায় 'চিঠি' শিরোনামে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল; তার শেষে পাদটীকায় বলা হয়েছিল : 'চিঠিখানি কবি নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত কোনো বালিকাকে কয়েক বৎসর আগে লিখেছেন।']

কৃষ্ণনগর
১১-৮-২৬
সকাল

স্নেহের নাহার,

কাল রাত্তিরে ফিরেছি কলকাতা হতে। চট্টগ্রাম হতে এসেই কলকাতা গেছলাম। এসেই পড়লাম তোমার দ্বিতীয় চিঠি—অবশ্য তোমার ভাবীকে লেখা। আমি যেদিন তোমার প্রথম চিঠি পাই, সেদিনই—তখনই কলকাতা যেতে হয় মনে করেছিলাম কলকাতা গিয়ে উত্তর দেবো। কিন্তু কলকাতার কোলাহলের মধ্যে এমনই বিস্মৃত হয়েছিলাম নিজেকে যে কিছুতেই উত্তর দেবার অবসর করে নিতে পারিনি। তাছাড়া ভাই, তুমি অত কথা জানতে চেয়েছ, শুনতে চেয়েছ, যে কলকাতার হট্টগোলের মধ্যে সে বলা যেন কিছুতেই আসত না। আমার বাণী হট্টগোলকে এখন রীতিমতো ভয় করে, মূক হয়ে যায় ভীরু বাণী আমার—ঐ কোলাহলের অনবকাশের মাঝে। চিঠি দিতে দেরি হলো বলে তুমি রাগ কোরো না ভাই লক্ষ্মীটি। এবার হতে ঠিক সময়ে দেবো, দেখে নিও। কেমন? বাহারটাও না জানি কতো রাগ করেছে, কী ভাবছে। আর তোমার তো কথাই নেই, ছেলেমানুষ তুমি, পড়তে না পেয়ে তুমি এখনো কাঁদো! বাহার যেন একটু চাপা, আর তুমি খুব অভিমানী না? কী যে করেছ তোমরা দুটি ভাই-বোনে যে এসে অবধি মনে হচ্ছে যেন কোথায় কোনো নিকটতম আত্মীয়কে আমি ছেড়ে এসেছি। মনে সদাসর্বদা একটা বেদনার উদ্বেগ লেগেই রয়েছে। অদ্ভুত রহস্যভরা এই মানুষের মন! রক্তের সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যার, সে-ই কখন পথের সম্বন্ধকে সকল হৃদয় দিয়ে অসঙ্কোচে স্বীকার করে নেয়। ঘরের সম্বন্ধটা রক্তমাংসের, দেহের কিন্তু পথের সম্বন্ধটা হৃদয়ের অন্তরতম-জনার। তাই ঘরের যারা, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, মেনে চলি, কিন্তু বাইরের আমার-জনকে ভালোবাসি, তাকে না-মানার দুঃখ দিই। ঘরের টান কর্তব্যের, বাইরের টান প্রীতির—মাধুর্যের। সকল মানুষের মনে সকল কালের এই বাঁধনহারা মানুষটি ঘরের আঙিনা পেরিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে। যে নীড়ে জন্মেছে এই পলাতক, সেই নীড়কেই সে অস্বীকার করেছে সর্বপ্রথম উড়তে শিখেই! আকাশ আলো কানন ফুল, এমনি সব না-চেনা

জনেরা হয়ে ওঠে তার অন্তরতম। বিশেষ করে গানের পাখি যারা, তারা চিরকেলে নিরুদ্দেশ দেশের পথিক। কোকিল বাসা বাঁধে না, 'বৌ কথা কও'-এর বাসার উদ্দেশ্য আজো মিলল না, 'উহু উহু চোখ গেল' পাখির নীড়ের সন্ধান কেউ পেল না! ওদের আসা-যাওয়া একটা রহস্যের মতো। ওরা যেন স্বর্গের পাখি, ওদের যেন পা নেই, ধূলার পৃথিবীতে যেন বসবে না, ওরা যেন ভেসে-আসা গান। তাই ওরা অজানা ব্যথার আনন্দে পাগল হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দেশে বিদেশে, বসন্ত-আসা বনে, ফুল-ফোটা কাননে, গন্ধ-উদাস চমনে। ওরা যেন স্বর্গের প্রতিধ্বনির টুকরার—আনন্দের উল্কাপিণ্ড! সমাজ এদের নিন্দা করেছে, নীতিবাগীশ বায়স তার কুৎসিত দেহ—ততোধিক কুৎসিত কণ্ঠ নিয়ে এর ঘোর প্রতিবাদ করেছে, এদের শিশুদের ঠুকরে 'নিকালো হিঁয়াসে' বলে তাড়িয়েছে, তবু আনন্দ দিয়েছে এই ঘর-না-মানা পতিতের দলই। নীড়-বাঁধা সামাজিক পাখিগুলি দিতে পারল না আনন্দ, আনতে পারল না স্বর্গের আভাস, সুরলোকের গান...।

এত কথা বললাম কেন, জানো? তোমাদের যে পেয়েছি এই আনন্দটাই আমায় এই কথা কওয়াচ্ছে, গান গাওয়াচ্ছে। বাইরের পাওয়া নয়, অন্তরের পাওয়া। গানের পাখি গান গায় খাবার পেয়ে নয়; ফুল পেয়ে আলো পেয়ে সে গান গেয়ে ওঠে। মুকুল-আসা কুসুম-ফোটা বসন্তই পাখিকে গান-গাওয়ায়, ফল-পাকা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় নয়। তখনো পাখি হয়তো গায়, কিন্তু ফুল যে সে ফুটতে দেখেছিল, গন্ধ সে তার পেয়েছিল—গায় সে সেই আনন্দে, ফল পাকার লোলুপতায় নয়। ফুল ফুটলে পায় গান, কিন্তু ফল পাকলে পায় খিদে; আমি পরিচয় করার অনন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি মানুষের মাঝে, কিন্তু ফুল-ফোটা মন মেলে না ভাই, মেলে শুধু ফল-পাকার ক্ষুধাতুর মন। তোমাদের মধ্যে সেই ফুল-ফোটানো বসন্ত, গান-জাগানো আলো দেখেছি বলেই আমার এত আনন্দ, এত প্রকাশের ব্যাকুলতা। তোমাদের সাথে পরিচয় আমার কোনো প্রকার স্বার্থের নয়, কোনো দাবির নয়। ঢিল মেরে ফল পাড়ার অভ্যেস আমার ছেলেবেলায় ছিল, যখন ছিলাম ডাকাত, এখন আর নেই। ফুল যদি কোথাও ফোটে, আলো যদি কোথাও হাসে সেখানে আমায় গান গাওয়ায় পায়, গান গাই। সেই আলো, সেই ফুল পেয়েছিলাম এবার চট্টলায়, তাই গেয়েছি গান। ওর মাঝে শিশিরের করুণা যেটুকু, সেটুকু আমার আর কারুর নয়। যাক, কাজের কথাগুলো বলে নিই আগে।

আমায় এখনো ধরেনি, তার প্রমাণ এই চিঠি। তবে আমি ধরা দেওয়ার দিকে হয়তো এগোচ্ছি। ধরা পড়া আর ধরা দেওয়া এক নয়, তা হয়তো বোঝো। ধরা দিতে চাচ্ছি, নিজেই এগিয়ে চলেছি শত্রু-শিবিরের দিকে, এর রহস্য হয়তো বলতে পারি। এখন বলব না। অত বিপুল যে সমুদ্র, তারও জোয়ারভাটা আসে অহোরাত্রি।

এই জোয়ার-ভাটা সমুদ্রেই খেলে, আর তার কাছাকাছি নদীতে; বাঁধ-বাঁধা ডোবায়, পুকুরে জোয়ার-ভাটা খেলে না। মানুষের মন সমুদ্রের চেয়েও বিপুলতর। খেলবে না তাতে জোয়ার-ভাটা! যদি না খেলে, তবে তা মানুষের মন নয়। ঐ শান-বাঁধানো ঘাট-ভরা পুকুরগুলোতে কাপড় কাঁচা চলে, ইচ্ছে হলে গলায় কলসি বেঁধে ডুবে মরাও চলে, চলে না ওতে জাহাজ, দোলে না ওতে তরঙ্গদোলা, খেলে না ওতে জোয়ার-ভাটা... আমি একবার অন্তরের পানে ফিরে চলতে চাই, যেখানে আমার গোপন সৃষ্টি-কুঞ্জ, যেখানে আমার অনন্ত দিনের বধূ আমার জন্য বসে মালা গাঁথছে। যেমন করে সিন্ধু চলে ভাটিয়ালি টানে, তেমনি করে ফিরে যেতে চাই গান-শ্রান্ত ওড়া-ক্লান্ত আমি। আবার অকাজের কথা এসে পড়ল। পুষ্প-পাগল বনে কাজের কথা আসে না, গানের ব্যথাই আসে, আমায় দোষ দিও না।

'অগ্নি-বীণা' বেঁধে দিতে দেরি করছে দফতরি, বাঁধা হলেই অন্যান্য বই ও 'অগ্নি-বীণা' পাঠিয়ে দেবো একসাথে। ডি.এম. লাইব্রেরিকে বলে রেখেছি। আর দিন দশকের মধ্যেই হয়তো বই পাবে। আমার পাহাড় ও ঝর্নাতলে তোলা ফটো একখানা করে পাঠিয়ে দিও। গ্রুপের ফটো একখানা (যাতে হেমন্তবাবু ও ছেলেরা আছে), আমি, বাহার ও অন্য কে একটি ছেলেকে নিয়ে তোলা যে ফটোর তার একখানা এবং আমি ও বাহার দাঁড়িয়ে তোলা ফটোর একখানা—পাঠিয়ে দিও আমায়। ফটোর সব দাম আমার বই বিক্রির টাকা হতে কেটে নিও।

এখন আবার কোনদিকে উড়ব, ঠিক নেই কিছু। যদি না ধরে কোথাও হয়তো যাব, গেলে জানাব। এখন তোমার চিঠিটার উত্তর দিই। তোমার চিঠির উত্তর তোমার ভাবীই দিয়েছে শুনলাম। আরো শুনলাম, সে নাকি আমার নামে কতগুলো কী সব লিখেছে তোমার কাছে। তোমার ভাবীর কথা বিশ্বাস কোরো না। মেয়েরা চিরকাল তাদের স্বামীদের নির্বোধ মনে করে এসেছে। তাদের ভুল, তাদের দুর্বলতা ধরতে পারা এবং সকলকে জানানোই যেন মেয়েদের সাধনা। তুমি কিন্তু নাহার, রেগো না যেন। তুমি এখনও ওদের দলে ভিড়োনি। মেয়েরা বড্ড অল্পবয়সে বেশি প্রভুত্ব করতে ভালোবাসে। তাই দেখি, বিয়ে হবার এক বছর পর ষোলো-সতেরো বছর বয়সেই মেয়েরা হয়ে ওঠে গিন্নি। তাঁরা যেন কাজে-অকাজে, কারণে অকারণে-স্বামী বেচারিকে বকতে পারলে বেঁচে যায়। তাই সদাসর্বদা বেচারা পুরুষের পেছনে তারা লেগে থাকে গোয়েন্দা পুলিশের মতো। এই দেখো না ভাই, ছটাকখানেক কালি ঢেলে ফেলেছি চিঠি লিখতে লিখতে একটা বই-এর ওপর, এর জন্য তোমার ভাবীর কী তম্বিহ, কী বকুনি। তোমার ভাবী বলে নয়, সব মেয়েই অমনি। স্ত্রীদের কাছে স্বামীরা হয়ে থাকে একেবারে বেচারাম লাহিড়ী।

একটা কথা আগেই বলে রাখি, তোমার কাছে চিঠি লিখতে কোনো সঙ্কোচের আড়াল রাখিনি। তুমি বালিকা এবং বোন বলে তার দরকার মনে করিনি। যদি দরকার মনে করো, আমায় মনে করিয়ে দিও। আমি এমন মনে করে চিঠি লিখিনি, যে কোনো পুরুষ কোনো মেয়েকে চিঠি লিখছে। কবি লিখছে চিঠি তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা কাউকে, এই মনে করেই চিঠিটা নিও। চিঠি লেখার কোথাও কোনো ত্রুটি দেখলে দেখিয়ে দিও।

আমার 'উচিত আদর' করতে পারোনি লিখেছ, আর তার কারণ দিয়েছ; পুরুষ নেই কেউ বাড়িতে এবং অসচ্ছলতা। কথাগুলোয় সৌজন্য প্রকাশ করে খুব বেশি, কিন্তু ওগুলো তোমাদের অন্তরের কথা নয়। কারণ, তোমরাই সবচেয়ে বেশি করে জানো যে তোমরা যা আদর-যত্ন করেছ আমার, তার বেশি করতে কেউ পারে না। তোমরা তো আমার কোথাও ফাঁক রাখোনি আমার শূন্যতা নিয়ে অনুযোগ করবার। তোমরা আমার মাঝে অভাবের অবকাশ তো দাওনি তোমাদের অভাবের কথা ভাববার; এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমি সহজেই সহজ হতে পারি সকলের কাছে, ওটা আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কিন্তু তোমাদের কাছে যতটা সহজ হয়েছি—অতটা সহজ বুঝি আর কোথাও হইনি। সত্যি নাহার আমায় তোমরা আদর-যত্ন করতে পারনি বলে যদি সত্যিই কোনো সংকোচের কাঁটা থাকে তোমাদের মনে, তবে তা অসংকোচে তুলে ফেলবে মন থেকে। অতটা হিসেব-নিকেশ করবার অবকাশ আমার মনে নেই, আমি থাকি আপনার মন নিয়ে আপনি বিভোর। মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে বলতেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, খেই হারিয়ে ফেলি কথার। আমার গোপনতম কে যেন একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে আদেশ করে। আর আর্থিক অসচ্ছলতার কথা লিখেছ। অর্থ দিয়ে মাড়োয়ারিকে, জমিদার মহাজনকে বা ভিখিরিকে হয়তো খুশি করা যায়, কবিকে খুশি করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতাটি পড়েছ? ওতে এই কথাই আছে।—কবি রাজদরবারে গিয়ে রাজাকে মুগ্ধ করে রাজপ্রদত্ত মণি-মাণিক্যের বদলে চাইলে রাজার গলার মালাখানি। কবি লক্ষ্মীর প্যাঁচার আরাধনা কোনো কালে করেনি, সরস্বতীর শতদলেরই আরাধনা করেছে—তাঁর পদ্মগন্ধে বিভোর হয়ে শুধু গুনগুন করে গান করেছে আর করেছে। লক্ষ্মীর ঝাঁপির কড়ি দিয়ে কবিকে অভিবন্দনা করলে কবি তাতে অখুশি হয়ে ওঠে। কবিকে খুশি করতে হলে দিতে হয় অমূল্য ফুলের সওগাত। সে সওগাত তোমরা দিয়েছ আমায় অঞ্জলি পুরে। কবি চায় না দান, কবি চায় অঞ্জলি, কবি চায় প্রীতি, কবি চায় পূজা। কবিত্ব আর দেবত্ব এইখানে এক। কবিতা আর দেবতা—সুন্দরের প্রকাশ। সুন্দরকে স্বীকার করতে হয় সুন্দর যা তাই দিয়ে। রূপার দাম আছে বলেই রূপা অত হীন; হাটে-বাজারে মুদির কাছে, বেনের কাছে ওজন হতে হতে ওর প্রাণান্ত ঘটল; রূপের দাম নেই বলেই রূপ এত দুর্মূল্য, রূপ এত সুন্দর, এত পূজার! রূপা

কিনতে হয় রূপেয়া দিয়ে, রূপ কিনতে হয় হৃদয় দিয়ে। রূপের হাটের বেচা-কেনা অদ্ভুত। যে যত অমনি—যে যত বিনা দামে কিনে নিতে পারে, সে তত বড় রূপ-রসিক সেখানে। কবিকে সম্মান দিতে পারোনি বলে মনে যদি করেই থাক, তবে তা মুছে ফেল। কোকিল পাপিয়াকে বাড়িতে ডেকে ঘটা করে খাওয়াতে পারনি বলে তারা তো অনুযোগ করেনি কোনোদিন। সে-কথা ভাবেওনি কোনোদিন তারা। তারা তাই বলে তোমার বাতায়নের পাশে গান গাওয়া বন্ধ করেনি। তাছাড়া কবিকে হয়তো সম্মান করা যায় না—কাব্যকে সম্মান করা যায়। তুমি হয়তো বলবে, গাছের যত্ন না নিলে ফুল দেয় না। কিন্তু সে যত্নেরও তো ত্রুটি হচ্ছে না।—অনাত্মীয়কে লোকে সংবর্ধনা করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে; বন্ধুকে গ্রহণ করে হাসি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে।

উপদেশ আমি তোমায় দিইনি। যদি দিয়ে থাকি, ভুলে যেয়ো। উপদেশ দেওয়ার চাণক্য আমি নই। দিয়েছি তোমার অনাগত বিপুল সম্ভাবনাকে অঞ্জলি—তোমার মাঝের অপ্রকাশ সুন্দরকে প্রকাশ-আলোতে আসার আহ্বান জানিয়েছি শঙ্খধ্বনি করে। উপদেশের ঢিল ছুঁড়ে তোমার মনে বনের পাখিকে উড়িয়ে দেবার নির্মমতা আমার নেই, এ তুমি ধ্রুব জেনো। আমি ফুল-ঝরা দিয়ে হাসাই, শাখার মার দিয়ে কাঁদাইনে।

তোমায় লিখতে বলেছি, আজো বলছি লিখতে। বললেই যে লেখা আসে, তা নয়। কারুর বলা যদি আনন্দ দেয়, তবে সেই আনন্দের বেগে সৃষ্টি হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠে। তোমরা আমায় বলেছ লিখতে। সে-বলা আমায় আনন্দ দিয়েছে, তাই সৃষ্টির বেদনাও জেগেছে অন্তরে। তোমাদের আলোর পরশে শিশিরের ছোঁওয়ায় আমার মনের কুঁড়ি বিকচ হয়ে উঠেছে। তাই চট্টগ্রামে লিখেছি। নইলে তোমরা বললেই লেখা আসত না। তোমার মনের সুন্দর যিনি, তিনি যদি খুশি হয়ে ওঠেন, তাহলে সেই খুশিই তোমায় লিখতে বসাবে। আমার বলা তোমার সেই মনের সুন্দরকে অঞ্জলি দেওয়া। বলেছি, অঞ্জলি দিয়েছি। তিনি খুশি হয়ে উঠেছেন কিনা তুমি জানো। তুমি আজো অনেকখানি বালিকা। তারুণ্যের যে উচ্ছ্বাস, যে আনন্দ, যে ব্যথা সৃষ্টি জাগায়, সেই উচ্ছ্বাস, সেই আনন্দ, সেই ব্যথা তোমার জীবনে আসার এখনো অনেক দেরি। তাই সৃষ্টি তোমার আজো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না। তার জন্য অপেক্ষা করবার ধৈর্য অর্জন করো। তরুর শাখায় আঘাত করলে সে ফুল দেবে না, যখন দেবে সে আপনি দেবে। আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবিতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী করে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায়, তাদের ঘিরে রেখেছে বারো হাত লম্বা আটহাত চওড়া দেওয়াল। বাহিরের আঘাত এ দেওয়ালে বারেবারে প্রতিহত হয়ে ফিরল। এর বুঝি ভাঙন নেই অন্তর হতে

মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে আমরা বন্দিনী। দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা। দ্বার ভাঙার পুরুষতার নারীদের প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের দ্বার ভিতর হতে বন্ধ, বাহির হতে নয়। তোমারও যে কী হবে বলতে পারিনে। তার কারণ তোমায় চিনলেই তো চলবে না, তোমায় চালাবার দাবি নিয়ে জন্মেছেন যাঁরা তাঁদের আজো চিনিনি। আমার কেন যেন মনে হলো বাহার তোমার অভিভাবক নয়। ভুল যদি না করে থাকি, তাহলেই মঙ্গল। অভিভাবক যিনিই হন তোমার, তিনি যেন বিংশ শতাব্দীর আলোর ছোঁয়া পাননি বলেই মনে হলো। তোমায় যে আজ কাঁদতে হয় বসে বসে কলেজে পড়তে যাবার জন্য, এও হয়তো সেই কারণেই। মিসেস আর. এস. হোসেনের মতো অভিভাবিকা পাওয়া অতি বড় ভাগ্যের কথা। তাঁকেও যখন তাঁরা স্বীকার করে নিতে পারলেন না, তখন তোমার কী হবে পড়ার, তা আমি ভাবতে পারি নে! তোমার আর বাহারের ওপর আমার দাবি আছে—স্নেহ করার দাবি, ভালোবাসার দাবি, কিন্তু তোমার অভিভাবকদের ওপর তো আমার দাবি নেই। তবু ওপর-পড়া হয়ে অনেক বলেছি এবং তা হয়তো তোমার আম্মা ও নানীসাহেবাও শুনেছেন। বিরক্তও হয়েছেন হয়তো। আলোর মতো, শিশিরের মতো আমি তোমার অন্তরের দলগুলি খুলিয়ে দিতে পারি হয়তো, দ্বারের অর্গল খুলি কি করে?— তুমি আমার সামনে আসতে পারোনি বলে আমার কোনোরূপ কিছু মনে হয়নি। তার কারণ, আমি তোমাকে দেখেছি এবং দেখতে চাই লেখার মধ্য দিয়ে। সেই হল সত্যিকার দেখা। মানুষ দেখার কৌতূহল আমার নেই, স্রষ্টা দেখার সাধনা আমার। সুন্দরকে দেখার তপস্যা আমার। তোমার প্রকাশ দেখতে চাই আমি, তোমায় দেখতে চাইনে। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে যে দেখেছে, সেই বড় দেখা দেখেছে। এই দেখা আর্টিস্টের দেখা, ধেয়ানীর দেখা, তপস্বীর দেখা। আমার সাধনা অরূপের সাধনা। সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারের যে রাজকুমারীর বন্দিনী সেই রূপকথার অরূপাকে মায়া, নিদ্রা হতে জাগাবার দুঃসাহসী রাজকুমার আমি। আমি সোনার কাঠির সন্ধান জানি—যে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বন্দিনী উঠবে জেগে, রূপার কাঠির মায়ানিদ্রা যাবে টুঁটে, আসবে তার আনন্দের মুক্তি। যে চোখের জল বুকের তলায় আটকে আছে, তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যথা-হানা আমি। মানস সরোবরের বদ্ধ জলধারাকে শুভ শঙ্খধ্বনি করে নিয়ে চলেছি কবি আমি ভগীরথের মতো। আমার পনেরো আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর, সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ, আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সঙ্ঘ। নদীর জল চলছে সমুদ্রের সাথে মিলতে, দুধারে গ্রাম সৃষ্টি করতে নয়। যেটুকু জল তার ব্যয় হচ্ছে দুধারের গ্রামবাসীদের জন্য, তা তার এক আনা। বাকি পনেরো আনা গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। আমার পনেরো আনা চলেছে আর চলেছে সৃষ্টি-দিন হতে আমার সুন্দরের উদ্দেশে। আমার যত বলা আমার সেই বিপুলতরকে নিয়ে, আমার সেই

প্রিয়তম, সেই সুন্দরতমকে নিয়ে। তোমাকেও বলি, তোমার তপস্যা যেন তোমার সুন্দরকে নিয়েই থাকে মগ্ন। তোমার চলা, তোমার বলা যেন হয় তোমার সুন্দরের উদ্দেশে, তাহলে তোমায় প্রয়োজনের বাঁধ দিয়ে কেউ বাঁধতে পারবে না। তোমার অন্তরতমকে ধ্যান করো তোমার বলা দিয়ে। বাধা যেন তোমার ভিতর দিক থেকে জমা না হয়ে ওঠে। এক কাজ করতে পারো, নাহার? তোমার সকল কথা আমায় খুলে বলতে পার? কী তোমার ব্রত, কী তোমার সাধনা—এই কথা। আমার কাছে সঙ্কোচ কোরো না। আমি তাহলে তোমার গতির উদ্দেশ পাব, আর সেইরকম করে তোমায় গড়ে উঠবার ইশারা দিতে পারব। আমি অনেক পথ চলেছি, পথের ইঙ্গিত হয়তো দিতে পারব। তাই বলে আমি পথে চালাব, এ ভয় কোরো না।

বড় বড় কবির কাব্য পড়া এই জন্য দরকার যে তাতে কল্পনার জট খুলে যায়, চিন্তার বদ্ধ ধারা মুক্তি পায়। মনের মাঝে প্রকাশ করতে না পারার যে উদ্বেগ, তা সহজ হয়ে ওঠে। মাটির মাঝে যে পত্র-পুষ্পের সম্ভাবনা, তা বর্ষণের অপেক্ষা রাখে। নইলে তার সৃষ্টি-বেদনা মনের মাঝেই গুমরে মরে।

আমার কাছে দামি কথা শুনতে চেয়েছ। দামি কথার জুয়েলার আমি নই। আমি ফুলের বেসাতি করি। কবি বাণীর কমল-বনের বনমালী। সে মালা গাঁথে, সে মণি-মাণিক্য বিক্রি করে না। কবি কথাকে দামি করতে পারে না, সুন্দর করতে পারে। 'বৌ কথা কও' যে কথা কয়, কোকিল যে কথা কয় তার এক কানাকড়ি দাম নেই। ওরা দামি কথা বলতে জানে না। ওদের কথা শুধু গান। তাই বুদ্ধিমান লোক তোতাপাখি পোষে, ময়না পাখি পোষে, ওরা ওদের রোজ 'রাধা কেষ্ট' বুলি শোনায়। আমরা যা বলি, তার মানেও নেই, দামও নেই। তোমায় বুদ্ধিমান লোকের দলের জানিনে বলে এত বকে যাচ্ছি। শুনতে যদি ভালো না লাগে জানিয়ো, সাবধান হবো।

আমার জীবনের ছোট-খাট কথা জানতে চেয়েছ। বড় মুশকিল কথা ভাই। আমার জীবনের যে বেদনা, যে রঙ তা আমার লেখায় পাবে। অবশ্য লেখার ঘটনাগুলো আমার জীবনের নয়, লেখার রহস্যটুকু আমার, ওর বেদনাটুকু আমার। ঐখানেই তো আমার সত্যিকার জীবনী লেখা রয়ে গেল। জীবনের ঘটনা দিয়ে কৌতুক অনুভব করতে পারো। কিন্তু তা দিয়ে আমাকে চিনতে পারবে না। সূর্যের কিরণ আসলে সাতটা রঙ—রামধনুতে যে রঙ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সূর্য যখন ঘোরে, তখন তাকে দেখি আমরা শুভ্র জ্যোতির্ময় রূপে। সূর্যের চলাটা প্রতারণা করে আমাদের চোখকে—তার বুকের রঙ দেখতে দেয় না সে। কিন্তু ইন্দ্রধনু যখন দেখি, ওরেই দেখতে পাই ওর গোপন প্রাণের রঙ। ইন্দ্রধনু যেন সূর্যের লেখা কাব্য। মানুষের জীবনই মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রতারণা করে। রাধা ভালোবেসেছিল কৃষ্ণকে নয়, কৃষ্ণের বাঁশিকে। তোমরাও ঠিক ভালোবাসো আমাকে নয়—আমার সুরকে, আমার

কাব্যকে। সে তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। আবার আমায় নিয়ে কেন টানাটানি, ভাই? সূর্যের কিরণ আলো দেয়, কিন্তু সূর্য নিজে হচ্ছে দগ্ধ দিবানিশি। ওর কাছে যেতে যে চায় সেও হয় দগ্ধীভূত। আলো সওয়া যায়, শিখা সওয়া যায় না। আমি জ্বলছি শিখার মতো, আপনার আনন্দে আপনি জ্বলছি, কাছে এলে তা দেয় দাহ, দূর হতে দেয় আলো। তোমাদের কাছে ছিলাম যে-আমি, সেই-আমি আর চিঠির-আমি কি এক? তোমরা কবিকে জানতে চাও, না নজরুল ইসলামকে জানতে চাও, তা আগে জানিও; তাহলে আমি এর পরের চিঠিতে একটু একটু করে জানাব তার কথা। চাঁদ জোছনা দেয়, কথা কয় না—বহু চকোর-চকোরীর সাধ্য-সাধনাতেও না। ফুল মধু দেয়, গন্ধ দেয়, কথা কয় না—বহু ভ্রমরার সাধ্যসাধনাতেও না। বাঁশি কাঁদে, যখন গুণীর মুখে তার মুখে চুমোচুমি হয়; বাকি সময়টুকু সে এক কোণে নির্বাক, নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকে। একই ঝড়ের বাঁশ ভাগ্যদোষে বা গুণে কেউ হয়ে ওঠে লাঠি, কেউ হয় বাঁশি। বীণা কত কাঁদে, কথা কয় গুণীর কোলে শুয়ে, বাকি সময়টুকু তার খোলের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে সে নিস্পন্দিত হয়ে থাকে। গানের পাখি, তাকে গানের কথাই জিজ্ঞাসা করো, নীড়ের কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। নিজেই বলতে পারবে না যে, কোথায় ছিল তার নীড়। জন্ম নিয়ে গান শিখে উড়ে যাবার পর নীড়টার মতো অপ্রয়োজনীয় জিনিস আর তার কাছে নেই। নীড়ের পাখি তখন বনের পাখি হয়ে ওঠে। গুরুদেব বলেছেন, ফসল কেটে নেবার পর মাঠটার মতো অপ্রয়োজনীয় জিনিস আর নেই। তবু সেই অপ্রয়োজনের যদি প্রয়োজন অনুভব করে তোমাদের কৌতুক, তবে জানিয়ো।

চিঠি লিখছি আর গাচ্ছি একটা নতুন লেখা গানের দুটো চরণ :

'হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
কোন অমরার বিরহিনীরে চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির-নীরে এলে নাহিয়া।'

কবির আসা ঐ শেফালির পথ বেয়ে আসা। কার বিষাদের শিশির-জলে নেয়ে আসে তা সে জানে না। তার নিজের কাছেই সে একটা বিপুল রহস্য।

আমার লেখা কবিতাগুলো চেয়েছ। হাসি পাচ্ছে খুব কিন্তু। কী ছেলেমানুষ তোমরা দুটি ভাই বোন। যে-খন্তা দিয়ে মাটি খোঁড়ে মালী, সেটারও যে দরকার পড়ে ফুলবিলাসীর, এ আমার জানা ছিল না। যে পাতার কোলে ফুল ফোটে, সে-পাতা কেউ চায় না, এই আমি জানতাম। মালা গাঁথা হবার পর ফুল-রাখা পদ্ম-পাতাটার কোনো দরকার থাকে, এও একটা খুব মজার কথা, না? যাক, চেয়েছ—দেবো। তবে এ পল্লব শুকিয়ে উঠবে দুদিন পরে, থাকবে যা তা ফুলের গন্ধ। তাছাড়া অত কবিতাই

বা লিখব কোত্থেকে যে খাতা ভর্তি করে দেবো। বসন্ত তো সব সময় আসে না। শাখার রিক্ততাকে যে ধিক্কার দেয়, সে অসহিষ্ণু; ফুল ফোটার জন্যে অপেক্ষা করতে জানে যে, সে-ই ফুল পায়। যে অসহিষ্ণু চলে যায়, সে তো পায় না ফুল, তার ডালা চিরশূন্য রয়ে যায়। তোমাদের ছায়া-ঢাকা, পাখি-ডাকা দেশ, তোমাদের সিন্ধু পর্বত গিরিদরী-বন আমায় গান গাইয়েছিল। তোমাদের শোনার আকাঙ্ক্ষা আমায় গান গাইয়েছিল। রূপের দেশ ছাড়িয়ে এসেছি এখন রূপেয়ার দেশে, এখানে কি গান জাগে? বীণাপাণির রূপের কমল এখানকার বাস্তবতার কঠোর ছোঁয়ায় রূপার কমল হয়ে উঠেছে। কমলবনের বীণাপাণি ঢুকেছেন এখানের মাড়োয়ারি মহলে। ছাড়া যেদিন পাবেন, আসবেন তিনি আমার হৃৎকমলে। সেদিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই আমার।

আমার কবিতার উৎস-মুখের সন্ধান চেয়েছ। তার সন্ধান যতটুকু জানি নিজে দেখিয়ে দেবো।

আর কিছু লিখবার অবসর নেই আজ। মানস-কমলের গন্ধ পাচ্ছি যেন, কেমন যেন নেশা ধরছে; বোধ হয় বীণাপাণি তার চরণ রেখেছেন এসে আমার অন্তর-শতদলে। এখন চললাম ভাই। চিঠি দিও শিগগির। আমার আশিস নাও। ইতি—

তোমার
'নূরুদা'

পুনঃ

তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়ে এসেছি, সেসব ভুলে যেও। তোমার আম্মা ও নানী সাহেবার পাক কদমানে হাজার হাজার আদাব জানাবে আমার। শামসুদ্দিন ও অন্যান্য ছেলেদের স্নেহাশিস জানাবে। তুমি কি বই পড়লে এর মধ্যে বা পড়ছ, কি কি লিখলে, সব জানাবে। তোমার লেখাগুলো আমায় আজই পাঠিয়ে দেবে—চিঠি দিতে দেরি করো না। 'কালিকলম' পেয়েছ বোধ হয়। তোমায় পাঠানো হয়েছে। তোমার লেখা চায় তারা।

—'নূরুদা'

Written to Begum Shamsunnahar Mahmud

[Written to Begum Shamsunnahar Mahmud. It was first published in the *Jaishtha* issue of 'Bulbul' in 1343 BS under the title 'Letter'. A footnote at the end of the letter states: 'This letter was written several years ago by Kazi Nazrul Islam to a girl who ardently revered him.']

Krishnanagar
11-8-26
Morning

Dear Nahar,
I returned from Kolkata last night. I had gone to Kolkata right after coming from Chattogram. As soon as I arrived, I read your second letter—addressed to your *Bhabhi*, of course. The day I received your first letter, I immediately thought I'd go to Kolkata and reply from there. But amidst the clamor of Kolkata, I became so engrossed that I couldn't make time to reply to you. Besides, dear, you wanted to know and hear so many things, and in the hustle and bustle of Kolkata, saying all that just wouldn't come out. My voice now genuinely fears the clamor; my timid voice becomes mute amidst that noisy lack of leisure. Please don't be angry, my dear, for the delay in writing. From now on, I'll write on time, you'll see. Okay? I wonder how angry Bahar must be, what he's thinking. And as for you, there's no question – you're a child, you still cry because you couldn't read [my letter]! Bahar seems a bit reserved, and you're very sensitive, aren't you? What have you two siblings done that ever since I arrived, I feel as if I've left behind some closest relative somewhere behind? A painful anxiety constantly lingers in my mind. How strange and mysterious is the human heart! One who doesn't hesitate to deny blood relations unhesitatingly accepts a relationship formed on the path, with all their heart. The ties of home are of flesh and blood, of the body, but the ties of the path are of the innermost

heart. That's why we respect those of our home, we obey them, but we love those who are 'mine' from outside, and we give them the pain of disobedience. The pull of home is duty, the pull from outside is affection—sweetness. In every human heart, this unbound human of all times has tried to escape beyond the confines of home. This fugitive, born in a nest, denies that very nest first upon learning to fly! Sky, light, gardens, flowers—such unknown beings become his innermost companions. Especially songbirds, they are perpetual wanderers of unknown lands. The cuckoo doesn't build a nest; the purpose of the *'BOU KOTHA KAO*'s (Pied Cuckoo) nest is still unknown; no one has found the nest of the *UHU UHU CHOKH GELO* (Common Hawk-Cuckoo)! Their comings and goings are like a mystery. They are like birds of paradise; they seem to have no feet, as if they won't alight on the dusty earth; they are like floating songs. So they fly around, country to country, through spring-laden forests, flower-filled gardens, and fragrance-intoxicated air, mad with the joy of an unknown sorrow. They are like fragments of heavenly echoes—meteors of joy! Society has condemned them; the moralizing crow, with its ugly body and even uglier voice, has strongly protested them, pecking at their children and driving them away with cries of 'Get out from here!' Yet, it is this group of rule-breaking 'fallen ones' who have brought joy. The nest-building social birds could not bring joy, could not bring a glimpse of heaven, or the songs of the celestial realm…

Do you know why I've said so much? It's the joy of having found you that makes me utter these words, makes me sing. It's not an external finding, but an internal one. A songbird doesn't sing because it finds food; it sings upon finding flowers and light. It's the blossoming of buds and flowers in spring that makes a bird sing, not the fruit-ripening months of *Jaishtha* and *Ashar*. Even then a bird might sing, but it sings of the flower it saw bloom, the fragrance it smelled—it sings in that joy, not in the greed for ripe fruit. When flowers bloom, it finds song, but when fruit ripens, it finds hunger; I wander among people with an endless curiosity to connect, but I don't find flower-blossoming hearts, dear, I only find fruit-ripening, hungry hearts. It's because I've seen that

flower-blossoming spring and song-awakening light in you both that I feel such joy, such eagerness to express myself. My acquaintance with you is not for any selfish gain, nor is it based on any claim. I used to have a habit of throwing stones to pluck fruit when I was a 'bandit' in my childhood, but I don't anymore. If a flower blooms somewhere, if light smiles somewhere, it makes me sing; I sing. I found that light and that flower in Chattogram this time, that's why I sang. Whatever little compassion of dew is there in it that is mine and no one else's. Anyway, let me say the important things first.

I haven't been 'caught' yet, and this letter is proof of that. However, I might be moving towards getting 'caught'. Being caught and giving one up are not the same thing, you probably understand that. I want to give myself up; I am marching towards the enemy camp on my own. Perhaps I can explain its mystery. Not now. Even the vast ocean has its tides, day and night. These tides play in the ocean, and in nearby rivers; they don't play in dammed ponds or lakes. The human mind is vaster than the ocean. Won't tides play in it? If they don't, it's not a human mind. In those stone-banked, full ponds, one can wash clothes, one can even tie a pot around one's neck and drown if one wishes, but ships don't sail there, waves don't sway there, and tides don't play there...I want to return inwards, to my secret creative bower, where my eternal bride sits weaving garlands for me. Just as the ocean moves with the pull of the ebb tide, I, tired of singing and weary of flying, wish to return. Again, irrelevant talk has come up. In a flower-mad forest, practical talk doesn't come; only the pain of song comes. Don't blame me.

The binder is taking time to bind ***Agni-Veena***; as soon as it's bound, I'll send it along with other books. I've told D.M. Library. You should receive the books within another ten days. Please send me one photo of me taken at the mountains and by a waterfall. One group photo (with Hemanta Babu and the boys), one photo of me, Bahar, and another boy, and one photo of me and Bahar standing—please send them to me. Deduct all photo costs from my book sales money.

I'm not sure where I'll fly next. If I'm not held anywhere, I might go, and if I do, I'll let you know. Now, let me answer your letter. I heard your *Bhabhi* replied to your letter herself. I also heard that she wrote some things about me to you. Don't believe your *Bhabhi*. Women have always thought their husbands are fools. It's as if their lifelong pursuit is to catch their husbands' mistakes and weaknesses and tell everyone. But Nahar, please don't get angry. You haven't joined their group yet. Women love to exert authority too much at a young age. That's why I see, after one year of marriage, girls of sixteen or seventeen become mistresses of the house. It's as if they feel alive if they can scold their poor husbands, for whatever reason, at whatever time. So, they constantly follow their poor husbands like detective police. Look, dear, I spilled a bit of ink on a book while writing this letter, and listened to your *Bhabhi's* scolding and nagging. It's not just your *Bhabhi*; all women are like that. Husbands become utterly helpless in front of their wives.

Let me say one thing beforehand: I haven't kept any reservations in writing to you. Since you are a girl and a sister, I didn't feel it was necessary. If you think it is, please remind me. I didn't write this letter as a man writing to a woman. Please take this letter as a poet writing to someone who reveres him. If you find any flaws in the letter, please point them out.

You wrote that you couldn't give me "proper affection" and gave reasons: no men in the house and financial hardship. These words express great courtesy, but they are not from your heart. Because you know best that no one could have given me more affection and care than you did. You left no room for me to complain about my emptiness. You didn't give me any opportunity to think about your difficulties; I am not exaggerating at all. I can easily be at ease with everyone; it's my natural inclination, but I don't think I've been as at ease anywhere else as I have been with you. Truly, Nahar, if you genuinely have a thorn of hesitation in your mind because you feel you couldn't show me enough affection, then please remove it from your mind without hesitation. I don't have the time in my mind to calculate so much; I am absorbed in my own mind. Even while talking

wholeheartedly with people, I become absent-minded and lose track of what I'm saying. It's as if my innermost self-commands me to remain utterly silent. And you wrote about financial hardship. Money might please a Marwari, a landlord, a moneylender, or a beggar, but it doesn't please a poet. Have you read Rabindranath's poem *Puraskar* (The Reward)? It speaks of this. The poet went to the king's court, captivated the king, and in exchange for the jewels bestowed by the king, asked for the garland around the king's neck. The poet has never worshipped Lakshmi's owl; he has always worshipped *Saraswati's* lotus, absorbed in its lotus scent, only humming and singing. When a poet is greeted with the cowrie shells from Lakshmi's basket, the poet becomes displeased. To please a poet, one must give the invaluable gift of flowers. You have given me that gift, overflowing your cupped hands. A poet doesn't want charity; a poet wants offerings; a poet wants affection; a poet wants reverence. Here, poetry and divinity are one. Poetry and deity—the manifestation of beauty. Beauty must be acknowledged with beauty itself. Silver is so base because it has a price; it loses its life being weighed by grocers and merchants in the market; beauty is so precious because it has no price, beauty is so beautiful, so worthy of worship! Silver is bought with rupees, beauty is bought with the heart. The buying and selling in the market of beauty are strange. The more one can buy for nothing—the more one can buy for no price, the greater the connoisseur of beauty there is.

If you still feel you couldn't honor the poet, then erase that thought. The cuckoo and the *Papia* have never complained that you couldn't invite them home and feed them lavishly. They never even thought of that. They haven't stopped singing near your window because of that. Besides, perhaps a poet cannot be honored—poetry can be honored. You might say, if a tree is not cared for, it doesn't give flowers. But there's no fault in that care either. Strangers are welcomed with drums and fanfare; friends are received with smiles and with the heart.

I have not given you advice. If I have, forget it. I am not *Chanakya* to give advice. I have offered an offering to your immense un-manifested potential, inviting the unrevealed beauty

within you to come into the light with a conch shell's call. I do not have the cruelty to throw a stone of advice and scare away the wild bird in your mind; know this for sure. I make you laugh by showering flowers, I don't make you cry by striking branches.

I told you to write, and I am still telling you to write. It's not that writing comes just by being told. If someone's words bring joy, then creation might become possible with the force of that joy. You told me to write. That telling gave me joy, so the pain of creation also awakened within me. With the touch of your light and the dew, the bud of my mind has bloomed. That's why I wrote in **Chattogram**. Otherwise, writing wouldn't have come just because you told me. If the beautiful one in your mind is pleased, then that pleasure itself will make you sit down to write. My telling is an offering to that beautiful one in your mind. I have spoken, I have offered. You know whether He is pleased or not. You are still very much a girl. The exuberance, the joy, the pain of youth that awakens creation—it will be a long time before that exuberance, that joy, that pain comes into your life. That's why your creation has not yet burst forth. Acquire the patience to wait for it. If you strike the branch of a tree, it won't give flowers; when it gives, it will give on its own. The girls of our country are very unfortunate. I have seen so many girls born with so much talent, but all their potential withered due to the demands of society. The needs of the home have kept them captive. Those whom the vast outside desires are confined within walls twelve cubits long and eight cubits wide. The blows from outside have repeatedly been repelled by this wall. Perhaps there is no breaking it unless struck from within. That's why I tell women to be rebellious. They are holding the door shut from the inside, saying, "We are prisoners." Where is the brave woman today who dares to open the door? The god of the age desires her. Women don't need masculine force to break the door because their door is locked from the inside, not from the outside. I cannot say what will happen to you either. That's because it's not enough to know you; I haven't yet known those who were born with the right to guide you. For some reason, it seemed to me that Bahar is not your guardian. If I'm not mistaken, then it's for the best. Whoever your guardian is, it seems

they haven't been touched by the light of the twentieth century. That you have to sit and cry today to go to college is probably for that same reason. It is extremely fortunate to have a guardian like Mrs. R.S. Hossain. When they couldn't accept her, I can't imagine what will happen to your education! I have a claim on you and Bahar—a claim of affection, a claim of love—but I have no claim on your guardians. Still, I've said a lot presumptuously, and perhaps your *Amma* and *Nani Saheba* have heard it too. They might even be annoyed. Like light, like dew, I can perhaps make the petals of your inner self unfold, but how do I unlock the bolt of the door? It didn't bother me at all that you couldn't come to meet me. That's because I have seen you and I want to see you through your writing. That is the true seeing. I have no curiosity to see people; my pursuit is to see the Creator. My penance is to see beauty. I want to see your manifestation; I don't want to see you. One who has seen the Creator in creation has seen the greatest sight. This is the sight of an artist, of a meditator, of an ascetic. My pursuit is the pursuit of the formless. I am the daring prince who awakens the formless princess, imprisoned beyond seven seas and thirteen rivers, from the sleep of illusion. I know the secret of the golden wand—with its touch, the captive will awaken, the illusionary sleep of the silver wand will be broken, and her joyful liberation will come. I am the pain-bringer who liberates the tears trapped in the heart. Like **Bhagiratha**, I, the poet, am leading the confined waters of the **Manasarovar** with a sacred conch-shell sound. Fifteen *annas* of me are absorbed in dreams, brimming with the pain of creation, and one *anna* is doing politics, giving speeches, forming organizations. The river's water flows to meet the sea, not to create villages on its banks. The small amount of water it expends for the villagers on its banks is its one *anna*. The remaining fifteen *annas* fall into the sea. My fifteen *annas* have been flowing since the day of creation towards my beautiful one. All my words are about that vastest one, my dearest, my most beautiful one. I also tell you, may your penance remain absorbed with your beautiful one. May your actions, your words, be for the sake of your beautiful one, then no one can bind you with the bonds of necessity. Meditate on your innermost self with your

words. Let obstacles not accumulate from within you. Can you do one thing, Nahar? Can you tell me everything openly? What is your vow, what is your pursuit—tell me this. Don't hesitate with me. Then I will find the purpose of your movement, and I will be able to give you hints on how to develop accordingly. I have walked many paths, perhaps I can give hints of the path. But don't fear that I will make you walk on a particular path.

Reading the works of great poets is necessary because it unravels the knots of imagination and frees the confined flow of thought. The anxiety of not being able to express oneself in the mind becomes easier. The potential for leaves and flowers in the soil awaits the rain. Otherwise, its creative pain stifles and dies within the mind.

You asked to hear valuable words from me. I am not a jeweler of valuable words. I trade in flowers. A poet is the gardener of the lotus forest of words. He weaves garlands; he doesn't sell gems and jewels. A poet cannot make words valuable; he can make them beautiful. The words spoken by *BOU KOTHA KAO* (Pied Cuckoo), the words spoken by the cuckoo—they have no monetary value. They don't know how to speak valuable words. Their words are just songs. That's why intelligent people keep parrots, they keep mynah birds; they make them recite *Radha-Krishna* daily. What we say has no meaning, no value. I'm chattering on so much because I don't consider you part of the intelligent crowd. If you don't like listening, let me know; I'll be careful.

You asked to know the small details of my life. That's a very difficult question, dear. The pain, the color of my life, you will find in my writings. Of course, the events in the writings are not from my life, but the mystery of the writing is mine, its pain is mine. That's where my real biography is written. You can find amusement in the events of my life. But you won't recognize me through them. The sun's rays are actually seven colors—the colors reflected in a rainbow. But when the sun rotates, we see it as a pure, luminous form. The sun's movement deceives our eyes—it doesn't let us see the color of its heart. But when we see a rainbow,

we truly see the hidden colors of its life. A rainbow is like a poem written by the sun. Human life deceives humans the most. *Radha* loved not Krishna, but Krishna's flute. You too love not me—but my melody, my poetry. That is right in front of you. Why pull me apart again, dear? The sun's rays give light, but the sun itself is burning day and night. One who wishes to approach it also gets burned. Light can be tolerated, but a flame cannot. I am burning like a flame, burning in my own joy; if you come close, it gives burning, and from afar it gives light. Is the 'me' who was with you the same as the 'me' in this letter? Please let me know first if you want to know the poet or Nazrul Islam; then in the next letter, I will gradually tell you about him. The moon gives moonlight, it doesn't speak—not even with much pleading from many ***chakor*** and ***chakori*** (moon-loving birds). The flower gives honey, gives scent, it doesn't speak—not even with much pleading from many bees. The flute weeps when the master's mouth touches its mouth; the rest of the time it lies mute and silent in a corner. The same bamboo from a storm, by ill or good fortune, one becomes a stick, another becomes a flute. The veena weeps so much, it speaks when lying in the lap of the master; the rest of the time it remains motionless, lost within its own body. Ask a songbird about its song, don't ask about its nest. It itself cannot tell you where its nest was. After being born, learning to sing, and flying away, there is nothing more unnecessary to it than its nest. The nest-bound bird then becomes a bird of the forest. *Gurudev* (Rabindranath Tagore) said that after the harvest is cut, there is nothing more unnecessary than the field. Yet, if your curiosity feels a need for that un-necessity, then let me know.

I'm writing this letter and singing two lines of a newly written song:

"O momentary guest, you came at dawn, gazing at whom,
Treading the path of fallen shiuli flowers.
Which immortal beloved, separated, did you not look back at,
Bathing in the dew-water of whose sorrow did you come?"

The poet's coming is like coming by that *Sefali* path. He doesn't know whose sorrow's dew-water he has bathed. To himself, he is a great mystery.

You asked for my written poems. I'm laughing so much, though. How childish you two siblings are. I didn't know that even the spade with which a gardener digs the earth is needed by a flower-lover. I thought no one wanted the leaf in whose lap a flower blooms. It's also quite funny, isn't it, that the lotus leaf on which flowers are placed has any purpose after the garland is made? Anyway, since you've asked, I'll give them. However, these leaves will dry up in a couple of days; what will remain is the fragrance of the flowers. Besides, how many poems can I write to fill a notebook? Spring doesn't come all the time. One who denounces the bareness of a branch is impatient; one who knows how to wait for flowers to bloom is the one who gets flowers. The impatient one who leaves doesn't get flowers; their basket remains forever empty. Your shady, bird-filled country, your seas, mountains, valleys, and forests made me sing. Your desire to listen made me sing. I have left the land of beauty and come to the land of money; does song awaken here? The lotus of *Veena-pani's* beauty has become a silver lotus here due to the harsh touch of reality. *Veena-pani* of the lotus forest has entered the Marwari quarters here. When she is released, she will come to my heart-lotus. I have no choice but to wait for that day.

You asked for the source of my poems. I will show you as much as I know myself.

I don't have time to write anything else today. I seem to be smelling the fragrance of the mind-lotus; I feel a kind of intoxication; perhaps *Veena-pani* has placed her feet on my inner lotus. Now I must go, dear. Write to me soon. Take my blessings.
Yours,
'Nuruda'

P.S. Please forget all the troubles I caused you. Please convey my thousands of regards to your *Amma* and *Nani Saheba*. Convey my blessings and affection to Shamsuddin and the other boys. Let me know what books you've read or are reading, and what you've written. Please send me your writings today —don't delay in writing. You probably received ***'Kalikalam'*** (a literary magazine). It was sent to you. They want your writings.

Nuruda

Translated by Alamgir Mohammad

মিস ফজিলতুন্নেসা-কে লিখিত পত্র

১১, ওয়েলেসলি স্ট্রিট
সওগাত অফিস
কলিকাতা
শনিবার, রাত্রি ১২টা

আজ ঈদ। ঈদ মোবারক।

অসহায় হইয়া আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। যদি বিরক্ত করিয়া থাকি, মার্জনা করিবেন। আজ ১৪ দিন হইল মোতাহার সাহেবের কোনো চিঠি পাই নাই। তাহার শেষ চিঠি পাইয়াছি ১০ই মার্চ। তাহার পর আমি তাহাকে দুইখানা পত্র দিয়াছি ১০ই ও ১৮ই মার্চ। আজো কোনো উত্তর না পাইয়া ছটফট করিতেছি। জানি না তিনি ঢাকায় আছেন কি না, না অসুখ করিয়াছে—কত কি মনে হইতেছে। আপনার শারীরিক সংবাদটুকুও তাহার মারফতই পাইতাম। বড় উদ্বিগ্নে দিন কাটাইতেছি।

আপনি যদি দয়া করিয়া—জানা থাকিলে আজই দু লাইন লিখিয়া তাঁহার খবর জানান, তাহা হইলে সবিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব।

তিনি আমার ঐ চিঠি দুইখানা পাইয়াছেন কি-না জানেন কি? তিনি কি আমার উপর রাগ করিয়াছেন? না অন্য কারণ? জানা না থাকিলে জানাইবার দরকার নাই।

আমি সওগাতের লেখা লইয়া বড় ব্যস্ত আছি। কলিকাতায় আরো দুই চারিদিন আছি। পত্র সওগাতের অফিসের ঠিকানাতেই দিবেন।

আপনার শরীর খুবই অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। কেবলি মনে হয়, যেন আপনার শরীর ভালো নাই। দুদিনের পরিচয়ের এতো বড় আস্পর্ধাকে আপনি হয়তো ক্ষমা করিবেন না, তবু সত্য কথাই বলিলাম।

—আপনাকে দিয়া বাংলার অন্তত মুসলিম নারী-সমাজের বহু কল্যাণ সাধন হইবে—ইহা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। তাই আপনার অন্তত কুশল সংবাদটুকু মাঝে মাঝে জানিতে বড্ডো ইচ্ছা করে। যদি দয়া করিয়া দুটি কথায় শুধু কেমন আছেন লিখিয়া জানান—তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চির-ঋণী থাকিব। আমার ইহা বিনা অধিকারের দাবি।

আমি এখন বেশ ভালোই আছি। আর একটা কথা। আপনি বার্ষিক সওগাতের জন্য একটি গল্প দিয়াছেন 'শুধু দুদিনের দেখা' শীর্ষক। সওগাত সম্পাদক আমায়

তাহা দেখিয়া দিতে দিয়াছেন। কিন্তু আপনার অনুমতি ব্যতীত তাহার একটি অক্ষর বদলাইবারও সাহস নাই আমার, আমি লেখাটি পড়িয়াছি। যদি ধৃষ্টতা মার্জনা করেন—তাহা হইলে আমি উহার এক-আধটু অদল-বদল করিয়া ঠিক গল্প করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি। সামান্য এক আধটু বাড়াইয়া দিলেই উহা একটা ভালো গল্প হইবে। অবশ্য এ স্পর্ধা আমার নাই যে আপনার লেখার তাহাতে কিছুমাত্র সৌন্দর্য বা গৌরব বাড়িবে। মনে হয় গল্পটা বড্ডো তাড়াতাড়ি লিখিয়াছেন। উহা যেন আপনার অযত্ন-লালিতা।

অবশ্য আপনার অসম্মতি থাকিলে যেমন আছে তেমনটা ছাপিবেন সম্পাদক সাহেব। আপনার অমত থাকিলে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, কিছু মাত্র দুঃখিত হইব না তাহাতে।

আর আমার লিখিবার কিছু নাই। আপনার খবরটুকু পাইলেই আমি নিশ্চিত হইতে পারিব।

হাঁ আর একটি কথা। আমার আজ পর্যন্ত লেখা সমস্ত কবিতা ও গানের সর্বাপেক্ষা ভালো যেগুলি সেগুলি চয়ন করিয়া একখানা বই ছাপাইতেছি 'সঞ্চিতা' নাম দিয়া। খুব সম্ভব আর এক মাসের মধ্যেই উহা বাহির হইয়া যাইবে।

আপনি বাংলার মুসলিম নারীদের রাণী। আপনার অসামান্য প্রতিভার উদ্দেশে সামান্য কবির অপার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ 'সঞ্চিতা' আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে চাই। আশা করি এজন্য আপনার আর সম্মতিপত্র লইতে হইবে না। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার জীবনের সঞ্চিত শ্রেষ্ঠ ফুলগুলি দিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা ব্যতীত আপনার প্রতিভার জন্য কি সম্মান করিব?

সুদূর ভক্ত কবির এই একটি নমস্কারকে প্রত্যাখান করিয়া পীড়া দিবেন না—এই আমার আকুল প্রার্থনা।

দুই একদিনের মধ্যেই আমার লেখা সব বই পাঠাইয়া দিব আপনার জন্য। আপনার মতো বিদূষী মহিলার পড়ার তাহার উপযুক্ত নয়, তবু দিব। আপনার আঙিনায় ংবধংড়হ ভষড়বিৎ-এর গাছ দেখিয়াছিলাম যেন। তাহারও তো যত্ন নেন দেখিয়াছি। সুতরাং আমার লেখাও ফেলিবেন না, ভরসা করি।

একটু কষ্ট করিয়া আজই পত্র দিবেন। আপনার ভগ্নিদেরে ও ভাইকে স্নেহাশিস দিবেন।

ইতি—
নজরুল ইসলাম

Written to Miss Fazilatunnesa

11, Wellesley Street
Saugat Office
Calcutta
Saturday, 12 AM

Today is Eid. Eid Mubarak.

I am writing this letter to you in a state of helplessness. Please forgive me if I am bothering you. It has been 14 days now since I last received a letter from Motahar Saheb. I received his last letter on March 10th. After that, I wrote him two letters on March 10th and March 18th. I am restless even today, having received no reply. I don't know if he is in Dhaka, or if he is unwell—so many thoughts come to mind. I used to get news of your health through him as well. I am spending my days in great anxiety here.

If you would be so kind as to write just two lines today, if you know anything, to inform me of his well-being, I would be immensely grateful.

Do you know if he received those two letters of mine? Is he angry with me? Or, is there another reason? If you don't know, there's no need to inform me.

I am very busy with writing for the 'Saugat'. I will be in Calcutta for a few more days. Please send your letter to the 'Saugat' office address.

I had seen that your health was very poor. It constantly feels as though you are not well. You might not forgive such a great presumption after only two days of acquaintance, but I spoke the truth anyway.

I believe with all my heart that through you, the welfare of at least the Muslim women's society of Bengal will be greatly served. That is why I so deeply wish to know your well-being from time to time. If you would kindly write just two words, simply how you are, I would be forever indebted to you. This is my claim, without any right.

I am quite well now. And one more thing. You have given a story titled "**Shudhu Dui Diner Dekha**" for the Annual *Saugat*. The *Saugat* editor has asked me to look it over. But I do not have the courage to change a single letter of it without your permission. I have read the writing. If you forgive my audacity, I would try to make it a proper story by making a few minor alterations. Just a slight expansion would make it a good story. Of course, I do not presume that it would in any way add to the beauty or glory of your writing. It seems the story was written too hastily. It feels like something you neglected.

Of course, if you disagree, the editor will print it as it is. If you have an objection, please write clearly, I will not be upset in the least.

I have nothing more to write. I will be relieved once I receive news from you.

Oh, and one more thing. I am publishing a book titled *Sanchita* compiling the very best of all the poems and songs I have written to date. It is very likely to be released within another month.

You are the queen of Muslim women in Bengal. As a token of immense respect from a humble poet to your extraordinary talent, I wish to be honored by dedicating *Sanchita* to your name. I hope I will not need to ask for your consent for this. I am a small poet; what honor can I bestow upon your talent other than offering a floral tribute with the best flowers gathered from my life?

Please do not pain me by rejecting this one salutation from a distant devotee poet—this is my earnest prayer.

I will send all my written books to you within a day or two. They are not worthy of being read by a woman of your scholarship, yet I will send them. I remember seeing a 'season flower' plant in your courtyard. I have also seen you care for it. So I hope you will not discard my writings.

Please make an effort to send a letter today. Give my affectionate blessings to your sisters and brother.

Yours, Nazrul Islam

Translated by Alamgir Mohammad

মিসেস এম. রহমান-কে লিখিত পত্র

৯. সীতানাথ রোড
১৬.৮.৩৫

শ্রীচরণকমলেষু,

মা! তোমার চিঠি পেয়েছি পরশু। ছোট মাসিমার স্বর্গারোহণের দিন ছিল সেদিন। তোমার মন ছিল দুঃখের বর্ষা-সিক্ত! তাই বুঝি চিঠিতে অত কথার ফুল ফুটেছিল। প্রাচ্যের ঋষিরা মৃত্যুকে কখনো জীবনের শেষ বলে মানেননি, বড় করে দেখেননি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মীয়েরা পরমাত্মীয় হন, প্রিয়জন প্রিয়তর হন। জীবনে যে থাকে চোখের সামনে, মরণে সেই-ই পায় অন্তরের অন্তরতম লোকে অক্ষয় আসন, মৃত্যু জীবনের পরম পরিণতির একটা ধাপ মাত্র। মৃত্যুর সিঁড়ি বেয়ে আমরা অগ্রসর হই অমৃতলোকের পানে, ভগবানের সান্নিধ্যে। তবু মৃতজনের জন্য আমরা কাঁদি আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলে। ছোট মাসিমার মৃত্যু যদি কয়েক বছর আগে হতো খুব কাঁদতাম। এখন কাঁদি না। এখন আমার জীবনের যেন এই জীবনেই নবজন্মের সূচনা অনুভব করছি। মায়াময় সৃষ্টির বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। তাই কান্না পেলে হাসি। তোমাদের—বিশেষ করে তোমার স্নেহামৃত আমার এই ভাবী পরিণতির যে সহায়তা করেছে—তা হয়তো তুমিও জানো না। পূর্বজন্মে কি ছিলাম জানি না। এই জন্মে কোন কুলে কেন জন্মেছি জানি না। জানি আমার অনাগত জন্মকে। তাকেই আমি শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি। সেই অনাগত জন্মে জগজ্জননীর চরণে—আমার পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের তপস্যার সিদ্ধির দিনে তোমাকে আরো বেশি করে স্মরণ করি। সেই অনাগত জন্মকে। তাকেই আমি শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি। সেই অনাগত জন্মে জগজ্জননীর চরণে—আমার পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের তপস্যার সিদ্ধির দিনে তোমাকে আরো বেশি করে স্মরণ করব—আমার প্রথম গুরু বলে—আদি মাতৃমূর্তি বলে। রাঙাদা আমার উপর এতটা নির্ভর করেন—এ আমার সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমি জানি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আমি এখন রাঙাদা কেন—কারুরই কোনো পার্থিব উপকার করতে পারিনে। যা করে ওঁর জেঠিমা ও তোমাদের মেয়ে দুলি। স্নেহ-মায়ার দিক দিয়ে আমি প্রায় নির্লিপ্ত। সংসারের যেটুকু কাজ মহামায়া করিয়ে নিচ্ছেন, তা সে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা আর আমার পাপের ভোগ ও প্রায়শ্চিত্ত।

আমার বিচিত্র জীবনে সহস্রবার পড়েছি আবার উঠেছি। সেই ওঠা-পড়ার দ্বন্দ্বে যখন ক্ষতবিক্ষত, তখন তুমি এসেছিলে আদিজননীর প্রতিভূ হয়ে। দ্বন্দ্বের আজও

অবসান হয় নাই, কবে হবে মা-ই জানেন। কিন্তু এ মনে আর ভাবনা নাই মা। আমার পাপ-পুণ্য সকল কিছু নিবেদন করেছি মা অম্বিকার শ্রীচরণে। এখন 'যথা নিযুক্তোস্মি ওয়া করোমি' অবস্থা। তোমাদের সঙ্গে দেখা হলো, তোমাদের বহু ক্ষতি করলাম, আবার দেখা হলো—এসব তাঁরই লীলা। তোমাদের বহুজন্মের শত্রু—এখানে বহু ক্ষতি করে গেলাম। কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তোমরা সয়েছ আমার জন্য—সব স্মরণ করি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে। শুধু এই প্রার্থনা করি যেন আর কখনো তোমাদের কোনো ক্ষতি না করি, ব্যথা না দিই। আমার যারা ক্ষতি করেছে, নিন্দা করেছে বা আজো করে—তাদের কারুর উপরই আমার কোনো অনুযোগ অভিযোগ নেই আজ। আমার আনন্দ আমি সর্বান্তঃকরণে সকলকে ক্ষমা করতে পেরেছি। যে নিন্দা করে তাকেও ভালোবাসতে পেরেছি।

শ্রীমান—জীবন মহাপুরুষ কর্মযোগের জন্য জন্মেছে—এই আমার গুরুদেবের উক্তি। ওর যদি সংসারে আসক্তি জন্মে তবেই ও সংসারবাসী হবে। ওকে অনন্তকে মার চরণে নিবেদন করে দিয়েছিলাম। মা-ই রক্ষা করছেন—ও হাত দিয়ে মায়ের পূজা পাঠিয়ে দিও ভালো হলে। বৌদিকে প্রণাম দিও, আজ সকলে শ্রীমানকে দেখতে গেছিলেন, আমি শুধু করেছি ভগবানের চরণে। ভগবান দেখার পূর্ণ অধিকার আমায় না দিলেও নীরবে দূরে প্রার্থনা করার অধিকার কেড়ে নেননি। শ্রীমানকে এখন বাড়ি নিয়ে এসে এই কামনা করি। শ্রীমান অনন্ত এখন ভালোর দিকে। মাতৃভক্তের সন্তান। ওর ভয় নেই। তোমার শরীর কেমন তা এখন থেকেই বুঝতে পারছি। অন্যান্য খবর আর সকলের চিঠিতেই জানবে। প্রার্থনা করো যেন শীঘ্র সংসারের সকল ঋণমুক্ত হই। আমার কোটি প্রণাম নাও। মানসবাবুকে প্রীতি ও জীবনকে স্নেহাশিস দিও।

প্রণত,
নূরু

নজরুল

written to Mrs. M. Rahman

Mrs. M. Rahman
9, Sitanath Road
16.08.35

Yours Respectfully,

Mother! I received your letter the day before yesterday. It was the day of *Chotto Masima's* ascension to heaven. Your heart must have been heavy with the rain of sorrow! Perhaps that's why your letter bloomed with so many words. The sages of the East never considered death the end of life, nor did they see it as a significant event. Through death, relatives become ultimate relatives, and loved ones become even dearer. The one who is before our eyes in life finds an imperishable place in the innermost core of our being in death; death is merely a step in life's ultimate culmination. We advance by climbing the stairs of death towards the realm of immortality, closer to God.

Yet, we cry for the departed because our vision is limited. If *Chotto Masima* died a few years ago, I would have cried a lot. I don't cry now. Now, I feel the dawn of a new birth within this very life. I have been able to see far into the illusory creation. That's why I laugh when I feel like crying. The nectar of your affection—especially yours—has aided this future culmination of mine in a way that perhaps even you don't know. I don't know what I was in my previous birth. I don't know why I was born into this lineage at this birth. I know my unborn birth. I respect and believe in it. On the day of the fruition of my penance, my complete self-surrender at the feet of the Mother of the Universe in that unborn birth, I remember you even more. In that unborn birth, on the day of the fruition of my penance, my complete self-surrender at the feet of the Mother of the Universe, I will remember you even more—as my first *guru*, as the original mother figure. That *Rangada* depends so much on me—this is my good fortune. But I know that besides praying to God, I cannot offer any worldly help to *Rangada*, or anyone else, right now. It is his paternal aunt and your daughter, *Duli*, who do whatever they can. From the perspective of affection and attachment, I am almost

detached. Whatever work *Mahamaya* makes me do in this world is the will of that willful one, and the consequence and atonement for my sins. In my life that is full of varieties, I have fallen a thousand times and risen again. When I was bruised and battered in that struggle of rising and falling, you came as a representative of the Primal Mother. The struggle has not ended yet, when it will, only the Mother knows. But there are no more worries in this mind, Mother. I have surrendered all my merits and demerits at the sacred feet of Mother Ambika. Now, it is a state of *yatha niyuktosmi wa karomi* (I do as I am commanded). I met you, I caused much harm to you, and our meeting again—all this is His play. Your enemy of many births—I have caused much harm here. How much humiliation and suffering you have endured because of me—I remember all of it with a very pained heart. My only prayer is that I never cause you any more harm or pain. I have no complaints or grievances against those who have harmed me, criticized me, or still do today. My joy is that I have been able to forgive everyone wholeheartedly. I have been able to love even those who criticize me.

Sriman Jeevan was born for the great task of Karma—this is my Guru Deva's statement. If he develops attachment to worldly life, he will become a man of the world. I had surrendered him to the feet of Mother Ananta. The Mother herself is protecting him—when he gets well, send Mother's puja with his hand. Offer my regards to my Sister-in-law. Everyone went to see Sriman today; I only prayed at the feet of God. Even if God has not given me the full right to see, He has not taken away my right to pray silently from afar. I wish this now that Sriman has been brought home. Sriman Ananta is now getting better. He is the child of a devotee of the Mother. He has no fear. I can understand how your health is even now. You will know other news from everyone else. Please pray that I am soon freed from all worldly debts. Receive my millions of salutations. Give love to Manas Babu and blessings to Jeevan.

Sincerely

Nuru

Nazrul

Translated by Alamgir Mohammad

Plays and Dramas
নাটক-নাটিকা

আলেয়া

উৎসর্গ

নট-রাজের চির-নৃত্য-সাথি
সকল নট-নটীর নামে
“আলেয়া” উৎসর্গ করিলাম।

এই ধূলির ধরায় প্রেম ভালোবাসা–আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হতে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।
তিনটি পুরুষ, তিনটি নারী–চিরকালের নর-নারীর প্রতীক–এই আগুনে দগ্ধ হল, তাই নিয়ে এই গীতি-নাট্য।

তিনটি পুরুষ

মীনকেতু	–	রূপ-সুন্দর।
চন্দ্রকেতু	–	মহিলা-সুন্দর, ত্যাগ-সুন্দর।
উগ্রাদিত্য	–	শক্তি-মাতাল।

তিনটি নারী

কৃষ্ণা–চিরকালের ব্যর্থ-প্রেম নারী, জীবনে সে কাউকে ভালোবাসতে পারলে না–এই তার জীবনের চরম দুঃখ।

জয়ন্তী–যে-তেজে যে-শক্তিতে নারী রানী হয়, নারীর সেই তেজ সেই শক্তি।

চন্দ্রিকা–চিরকালের কুসুম-পেলব প্রাণ চঞ্চল নারী, যে শুধু পৌরুষ-কঠোর পুরুষকে ভালবাসতে চায়! মরুভূমির পরে যে বনশ্রী, সংগ্রামের শেষে যে কল্যাণ, এ তাই। এরই তপস্যায় পশু-নর মানুষ হয়, মৃত্যু-পথের পথিক প্রাণ পায়।...

নারীর হৃদয়–তাদের ভালোবাসা কুহেলিকাময়। এও এক আলেয়া। এ যে কখন কা'কে পথ ভোলায়, কখন কা'কে চায়, তা চির-রহস্যের তিমিরে আচ্ছন্ন।

যাকে সে চিরকাল অবহেলা করে এসেছে,– তাকেই সে ফিরে পেতে চায় তার চলে যাওয়ার পরে। যাকে সে চিরকাল চেয়েছে–সেই তখন তার চলে-যাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর পিছনে পড়ে যায়।

কুশীলবগণ

মীনকেতু	গান্ধার-রাজ
চন্দ্রকেতু	ঐ সেনাপতি
কৃষ্ণা	ঐ প্রধান মন্ত্রী
কাকলি	ঐ প্রধান গায়িকা
রঙ্গনাথ	ঐ বয়স্য
মধুশ্রবা	ঐ সভা-করি
জয়ন্তী	যশোল্মীরের রানী
চন্দ্রিকা	ঐ কনিষ্ঠ সহোদরা
উগ্রাদিত্য	ঐ সেনাপতি

সৈন্যগণ, প্রমোদ-উদ্যানের সুন্দরীগণ, যোগিনীগণ ইত্যাদি

প্রস্তাবনা

[অন্ধকার নিশীথিনী। আলেয়ার আলো মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিভিয়া যাইতেছে। দিশেহারা পথিক তাহারি পিছনে ছুটিয়া পথ হারাইতেছে।... আলেয়ার নৃত্য ও তাহারি অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে দিশেহারা পথিকের গীত]

[গান]

পথিক : নিতি নিতি মোরে ডাকে সে স্বপনে।
নিরাশার আলো জ্বালিয়া গোপনে ॥
জানি না মায়াবিনী কি মায়া জানে,
কেবলি বাহিরে পরান টানে,
ঘুরে ঘুরে মরি আঁধার গহনে ॥

শত পথিকে ও রূপে ছল হানে,
অপরূপা শত রূপে শত গানে।
পথে পথে বাজে তাহারি বাঁশি,
সে সুরে নিখিল-মন উদাসী,
দহে যাদুকরী বিধুর দহনে ॥

[গান শেষ করিয়া পথিকের প্রস্থান।]
[গান ও নৃত্য করিতে করিতে দুইটি প্রজাপতির প্রবেশ।]

[গান]

প্রজাপতিদ্বয় : দুলে আলো শতদল ঝলমল ঝলমল।
চল লো মেলি' পাখা রঙ্গিন লঘু চপল ॥

যদি অনল-শিখায় এ পাখা পুড়িয়া যায়
ক্ষতি কি–ভালোবাসায় জ্বলিতে আসা কেবল ॥

কাঁটার কাননে ফুল তুলিতে বেঁধে আঙুল,
মধুর এ পথভুল– ফুলঝরা বনতল ॥

চলিতে ফুল দলি, চাহে যে তারে ছলি
সেই সে পথে চলি, যে পথে আলেয়া ছল ॥

[গীত-শেষে প্রজাপতি দুইটি আলেয়ার নিকট যাইতেই আলেয়া নিভিয়া গেল। আলেয়া নিভিয়া যাওয়ার সাথে কয়েকটি রক্ত বাস পুষ্পতনু কিশোরী আসিয়া দাঁড়াইল। প্রজাপতি দুইটি তাহাদের দেখিয়া তাহাদের দিকে উড়িয়া গেল। প্রজাপতি ও সেই কিশোরীদের গান]

[গান]

কিশোরীরা : মোরা ফুটিয়া বঁধু
হের তোমরি আশায়।

প্রথম কিশোরী : আমি অনুরাগ-রাঙা
আমি গোলাব-শাখায় ॥

দ্বিতীয় কিশোরী : বন-কুন্তলে গরবী
আমি কানন-করবী।

তৃতীয় কিশোরী : আমি সরসী-কমলা
আমি ষোড়শী কমলা

চতুর্থ কিশোরী : আমি চম্পক খোঁপায় ॥

প্রজাপতিদ্বয় : নিভিল আলেয়া–আলেয়া পথ চলিতে,
তোমরা আসিলে কি গো মন ছলিতে।

কিশোরীরা : মোরা অনিবার্ণ-শিখা দীপ্তিমতী,
আমরা কুসুম রাঙা আমরা জ্যোতি।

প্রজাপতিদ্বয় : মোরা চাহি না ক প্রেম, চাহি
মোহিনী মায়ায় ॥

[গীত-শেষে প্রজাপতি দুইটি ও কিশোরীগণ অন্ধকারের যবনিকা ঠেলিয়া ঊষার দীপ্তি দেখাইয়া অন্য পথে চলিয়া গেল]

প্রথম অঙ্ক

[গান্ধার-রাজের প্রমোদ-উদ্যান ও দরদালান পশ্চাতে পর্বতমালা। পর্বতগাত্র বাহিয়া ঝর্নাধারা বহিয়া যাইতেছে। অনতিদূরে দেখা যাইতেছে গান্ধার রাজপ্রাসাদ-রুধির-পালঙ্ক প্রস্তরের... রাত্রি ভোর হইয়া আসিতেছে। পর্বত-চূড়ায় পাণ্ডুর-গণ্ড কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ। ধীরে ধীরে ঊষার রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিতেছে। ঝর্নাধারায় সেই রং প্রতিফলিত হইয়া গলিত রামধনুর মত সুন্দর দেখাইতছে।... প্রমোদ-উদ্যানের অলিন্দে বাহু উপাধান করিয়া নিশি-জাগরণ-ক্লান্ত সম্রাটের প্রমোদ-সঙ্গিনী তরুণীরা-কিশোরীরা স্খলিত অঞ্চলে ঘুমাইতেছে। সহসা রাজপুরীর তোরণদ্বারে প্রভাতী সুরে বাঁশি ফুকারিয়া উঠিল। ঘুমন্ত তরুণীর দল সচকিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া তন্দ্রালস করে তাহাদের বসনভূষণ সম্বৃত করিতে লাগিল।]

[ভোরের হাওয়ার গান ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ]

[গান]

ভোরের হাওয়া : পোহাল পোহাল নিশি খোল গো আঁখি।
কুঞ্জ-দুয়ারে তব ডাকিছে পাখি ॥

ঐ বংশী বাজে দূরে শোনো ঘুম-ভাঙানো সুরে,
খুলি' দ্বার বঁধুরে লহ গো ডাকি ॥

[প্রস্থান]

[গান]

সুন্দরীরা : ভোরের হাওয়া, এলে ঘুম ভাঙাতে কি
চুম হেনে নয়ন-পাতে।
ঝিরি ঝিরি ধীরি ধীরি কুণ্ঠিত ভাষা গুণ্ঠিতারে শুনাতে ॥
হিম-শিশিরে মাজি' তনুখানি
ফুল-অঞ্জলি আন ভরি' দুই পাণি,
ফুলে ফুলে ধরা যেন ভরা ফুলদানি–
বিশ্ব-সুষমা-সভাতে ॥

[সহসা শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। প্রধানা গায়িকা কাকলি গান করিতে করিতে চলিয়া গেল।]

[গান]

কাকলি : ফুল কিশোরী! জাগো জাগো, নিশি হ'ল ভোর।
দুয়ারে দখিন–হাওয়া-খোল পল্লব-দোর ॥
জাগাইয়া ধীরে ধীরে যৌবন তনু-তীরে
চলে যাবে উদাসী কিশোর ॥

[প্রস্থান]

[গান]

সুন্দরীরা : চিনি ও নিঠুরে চিনি
পায়ে দলে মন জিনি'
ভেঙো না ভেঙো না ঘুম-ঘোর।
মধুমাসে আসে সে যে ফুলবাস-চোর ॥

[একটু পরেই হাসিতে হাসিতে সম্রাট মীনকেতু ও পশ্চাতে সভাকবি মধুশ্রবার প্রবেশ।]

মীনকেতু : (তরুণী কিশোরীদের কাহারো গালে, কাহারো অধরে তর্জনী দিয়া মৃদু টোকা দিতে দিতে, কাহারো খোঁপা খুলিয়া দিয়া, কাহারো বেণী ধরিয়া টানিয়া ফেলিতে ফেলিতে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া) সুন্দর! কেমন কবি?

কবি : শুধু সুন্দর নয় সম্রাট, অপরূপ! ঐ লতার ফুল সুন্দর, কিন্তু এই রূপের ফুলদল অপরূপ!

মীনকেতু : (কবির পিঠ চাপড়াইয়া) সাধু কবি, সাধু! সত্যই এ অপরূপ!–জান কবি, ওদের সকলেই আমার স্বদেশিনী নন, এরা শত দেশের শত-দল। আমার প্রমোদ-কাননে এঁদের সংগ্রহ করেছি বহু অনুসন্ধান করে। (পশ্চাতে পর্বত-গাত্রে প্রবাহিতা ঝর্না দেখিয়া) পশ্চাতে ওই উদ্দাম জলপ্রপাত, আর সন্মুখে এইরূপ–যৌবনের উচ্ছল ঝর্নাধারা–মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি, তৃষ্ণার্ত ভোগলিপ্সু পুরুষ, যৌবনের দেবতা। (পায়চারি করিতে করিতে)–আমি চাই–আমি চাই–

কবি : "আমরা জানি মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া–"

মীনকেতু : হাঁ, ঠিক বলেছ কবি, চোখ পুরে রূপ চাই, পাত্র পুরে সুরা চাই। (হঠাৎ হাসিয়া তরুণী ও কিশোরীদের কাছে গিয়া) তুই কে রে?–বস্‌রা গোলাব বুঝি? বাঃ, যেমন রং তেমনি শোভা, ঠোঁটে গালে লাল আভা যেন ঠিকরে পড়ছে।...তুই–তুই বুজি ইরানী নার্গিশ?... হাঁ, নার্গিশ ফুলের পাপ্‌ড়ীর মতই তোর চোখ! ভুরু ত নয়, যেন বাঁকা তলোয়ার; আর তার নীচেই ওই চকচকে চোখ যেন তলোয়ারের ধার! ওঃ, তাতে আবার কালো কাজলের শান দেওয়া হয়েছে! একবার তাকালে আর রক্ষে নেই! (বুকে হাত দিয়া) একেবারেই ইস্‌পার উস্‌পার! (অন্য দিক দিয়া) আহা, তুমি কে সুন্দরী? তুমি বুঝি বঙ্গের শেফালি! (কৃত্রিম

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) শেফালি ফুলের মতই তোমার শোভা, শেফালি-বৃন্তের মতই তোমার প্রাণ বেদনায় রাঙা!– আর তুমি? তুমি বুঝি সুদূর চীনের চন্দ্রমল্লিকা? তোমার এত রূপ, কিন্তু তুমি অমন ভোরের চাঁদের মত পাণ্ডুর কেন? অ! তোমার বুঝি এদেশে মন টিক্‌ছে না? –তা কি করবে বল, টিকতেই হবে, না টিকে উপায় নেই! আমি যে তোমাদের চাই! গাও, গাও, মন টেকার গান গাও! যে-গান শুনে সকাল বেলার ফুল বিকেল বেলার কথা ভুলে যায়, ভোরের নিশি সূর্যোদয়ের কথা ভোলে; বনের পাখি নীড়ের পথ ভোলে–সেই গান।

[সুন্দরীদের গান ও নৃত্য]

সুন্দরীরা : যৌবন-তটিনী ছুটে চলে ছলছল্।
ধরণীর তরণী টলমল টলমল ॥
কূলের বাঁধন খোল্
আয় কে দিবি রে দোল্,
প্রাণের সাগরে রোল ওঠে ঐ কল কল্ ॥

তটে তটে ঘট-কঙ্কণে নট-মল্লারে ওঠে গান,
মুখে হাসি বুকে শ্মশান।
আজিও তরুণী ধরা রঙে রূপে ঝলমল,
রূপে রসে ঢলঢল্ ॥

[ম্লানমুখে কৃষ্ণার প্রবেশ]

মীনকেতু : ও কে? কৃষ্ণা? প্রধানমন্ত্রী–তারপর, এমন অসময়ে এখানে যে!

কৃষ্ণা : বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকার্যে আপনার আনন্দের বাধা হয়ে এসেছি, সম্রাট!

[সভাকবি এতক্ষণ এক ফুল হইতে আর এক ফুলের কাছে গিয়া কি যেন দেখিতেছিলেন, কৃষ্ণার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন]

কবি : এ ফুল-সভায় ত রাজসভার মন্ত্রীর আসার কথা নয়, দেবী!

মীনকেতু : (হাসিয়া) ঠিক বলেছ কবি, যেমন আমি এখানে এসেছি মীনকেতু হয়ে–সম্রাট হয়ে নয়।

কৃষ্ণা : আমিও ফুলবনে আসি, কবি! তবে তোমাদের মত আয়োজনের আড়ম্বর নিয়ে আসিনে। আমি কৃষ্ণা, নিশীথিনী! আমি নীরবে

আসি, নীরবে যাই! হয়ত-বা আমার চোখের শিশিরেই তোমাদের কাননের ফুল ফোটে! (সম্রাটের দিকে তাকাইয়া) আমি তাহলে যেতে পারি, সম্রাট!

মীনকেতু : রাজ্যের ব্যাপার রাজসভাতেই বলো কৃষ্ণা, এখানে নয়। কিন্তু! এসেছ যখন, গায়ে একটু ফুলেল হাওয়ার ছোঁয়াচ না-হয় লাগিয়েই গেলে। ওঃ ভুলে গিয়েছিলুম, ওতে বোধ হয় তোমার মন্ত্রীত্বের মুখোসটা খুলে কৃষ্ণার মুখোস বেরিয়ে পড়বে! রাত্রির আবরণ খুলে চাঁদের আভা ফুঁটে উঠ্‌বে।

কৃষ্ণা : (ধীর স্থির কণ্ঠে) সম্রাটের কি এটা জানা উচিত নয়, যে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সাথে এই নটিদের সামনে এই ব্যবহার আমাদের সকলেরই মহিমাকে খর্ব করে।

[সম্রাটের ইঙ্গিত-তরুণী ও কিশোরীর দল অভিনন্দন করিয়া চলিয়া গেল]

মীনকেতু : (কৃষ্ণার হাত ধরিয়া) ওরা নটি নয়, কৃষ্ণা ওরা আমার প্রমোদ-সহচারী। আমি রাজার মহিমার মুখোস খুলে এ প্রমোদ-কাননে আসি ওদের নিয়ে আনন্দ কর্‌তে।

কৃষ্ণা : (হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া) আমি জানি সম্রাট, যে, নারী জাতিকে অবমাননা করবার জন্যই আমায়, একজন নারীকে–আপনার রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে বিদ্রূপ করেছেন! অথবা এ হয়ত আপনার একটা খেয়াল! কিন্তু সম্রাট, আপনার যা খেলা, তা হয়ত অন্যের মৃত্যু!

মীনকেতু : (হাসিয়া) তুমি যে আজকাল একটুকু রহস্যও সহ্য করতে পার না কৃষ্ণা। যে দাড়িভরা হাঁড়িমুখের ভয়ে দেশ থেকে বুড়োগুলোকে তাড়ালুম, তারা দেখ্‌চি দল বেঁধে তোমার মনে আশ্রয় নিয়েছে। তোমার মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে চোখ তুলতেই দেখব, তোমার মুখে দাড়ির বাজার বসে গেছে।

কবি : বুড়োর দাড়ি এমনি করেই প্রতিশোধ নেয় সম্রাট। মুখের দাড়ি মনে গিয়ে বোঝা হয়ে ওঠে।

[গান]

এসেছে নব্‌নে বুড়ো যৌবনেরি রাজ-সভাতে।
কুঁজো-পিঠ বই বয়ে হায় কমল-ধরা ঠুঁটো হাতে।

ভরিল সৃষ্টি এবার দৃষ্টি খাটো যষ্টি-ধরা জ্যেষ্ঠতাতে।
নাতি সব সুর্পনখার নাকি কথার ভূষুণ্ডি মাঠ
আঁধার রাতে।
দাওয়াতে টান্‌তে হুঁকো, উনুন-মুখো,
নড়েও না কো ন্যাজ মলাতে।
ভাই সব বল হরি, কল্‌সি দড়ি, ঝুলিয়েছে নিজেই গলাতে ॥

মীনকেতু : (হাসিয়া) সত্য বলেছ মধুশ্রবা, বৃদ্ধত্ব আর সংস্কারকে তাড়ানো তত সহজ নয় দেখছি। ওরা কোন্ সময় যে শ্রীজ্ঞানামৃত বিতরণের লোভ দেখিয়ে তরুণ-তরুণীর মন জুড়ে বসে, তা দেবানা জানন্তি। আমি যৌবনের হাট বসাব বলে সাম্রাজ্যের বাইরে পিজরাপোল করে বুড়ো মনের লোকগুলোকে রেখে এলুম, তারা কি আবার ফিরে আস্‌তে আরম্ভ করেছে? কৃষ্ণার পানে তাকাইয়া দেখ কৃষ্ণা, আমি তরুণীদের কাছে কিছুতেই গম্ভীর হতে পারি নে। সুন্দরের কাছে রাজমহিমা দেখানোর মত হাসির জিনিস আর কিছু কি আছে? ধর, এই ফোটা ফুলের আর ওই সব উন্মুখ-যৌবনা কিশোরীদের কাছে এমন সুন্দর সকালটা যদি রাজ্যের কথা কয়ে কাটিয়ে দিই–ও কি কৃষ্ণা, হাস্‌ছ?

কৃষ্ণা : মার্জনা করবেন সম্রাট! আমিও আপনার ঐ আনন্দ হাসির তরঙ্গে মাঝে মাঝে ভেসে যাই, ভুলে যাই আপনি আমাদের মহিমান্বিত সম্রাট; আর আমি তাঁর প্রধানমন্ত্রী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) মনে হয় আপনি আমার সেই ভুলে-যাওয়া দিনের শৈশব-সাথি!

কবি : সম্রাট, একজনের মুখ যখন আর একজনের কর্ণমূলের দিকে এগিয়ে আসে, তখন লজ্জার দায় এড়াতে তৃতীয় ব্যক্তির সেখান থেকে সরে পড়াই শোভন এবং রীতি।

[প্রস্থান]

মীনকেতু : (হাসিয়া কবির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া–কৃষ্ণার পানে ফিরিয়া) তুমি আমায় জান কৃষ্ণা, আমি সিংহাসনে যখন বসি, তখন আমি ঐ–কেবল তোমরা যা বল–মহিমময় সম্রাট, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন যুদ্ধ করি তখন আমি রক্ত-পাগল সেনানী, কিন্তু সুন্দর ফুলবনে আমিও সুন্দরের ধেয়ানী, হয়ত-বা কবিই। যেখানে শুধু তুমি আর আমি, সেখানে তুমি আমায় সেই ছেলেবেলার মত করেই ডাক-নাম ধরে ডেকো!

কৃষ্ণা : জানি না, তুমি কি! এতদিন ধরে ত তোমায় দেখেছি, তবু যেন তোমায় বুঝতে পারলুম না। আকাশের চাঁদের মতই তুমি সুদূর, অমনি জ্যোস্নায় কলঙ্কের মাখামাখি।

মীনকেতু : তবুও ওই সুদূর কলঙ্কী-ই ত পৃথিবীর সাত সাগরকে দিবা-রাত্রি জোয়ার-ভাটার দোল খাওয়ায়!

কৃষ্ণা : সত্যিই তাই। এম্‌নি তোমার আকর্ষণ। (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা মীনকেতু, তুমি কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলে– মনে পড়ে?

মীনকেতু : (হাসিয়া) চাঁদ কাকে ভালোবাসে কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা : ও কলঙ্কী, ও হয়ত কাউকেই ভালোবাসে না।

মীনকেতু (হাততালি দিয়া) ঠিক বলেছ কৃষ্ণা, ওই কলঙ্কীকেই সবাই ভালোবাসে, ও কাউকে ভালোবাসে না!

[গান করিতে করিতে একটি মেয়ের প্রবেশ]

[গান]

মেয়েটি : কেন ঘুম ভাঙালে প্রিয়
যদি ঠেলিবে পায়ে ॥

বৃথা বিকশিত কুসুম কি যাবে শুকায়ে।
একা বন-কুসুম ছিনু বনে ঘুমায়ে ॥

ছিল পাশরি' আপন বেভুল কিশোরী হিয়া
বধূর বিধুর যৌবন কেন দিলে জাগায়ে।
প্রিয় গো প্রিয়–
আকাশ বাতাস কেন ব্যথার রঙে তুমি
দিলে রাঙায়ে ॥

মেয়েটি : রাজা, কাল রাতে তোমার অনুরাগ দিয়ে আমায় বিকশিত করেছিলে। আমার সেই বিকশিত ফুলের অর্ঘ্য তোমায় দিতে এসেছি। তুমি বলেছিলে...

মীনকেতু : (হাসিয়া) সুন্দরী, রাত্রে তোমায় যে-কথা বলেছিলুম, তা রাত্রের জন্যই সত্য ছিল। দিনের আলোকেও তা সত্য হবে এমন কথা ত বলিনি। রাত্রে যখন কাছে ছিলে, তখন তুমি ছিলে কুমুদিনী, আমি ছিলুম চাঁদ। এখন দিন যখন এল, তখন আমি হলুম সূর্য, আমি এখন সূর্যমুখীর, কমলের! যাও! চলে যাও! বিকশিত

হয়েছ, এখন সারাদিন চোখ বুঁজে থেকে সন্ধ্যেবেলায় ঝরে পড়ো! যাও!

[ম্লানমুখে দু'হাতে চোখ ঢাকিয়া মেয়েটির প্রস্থান]

কৃষ্ণা : (আহত স্বরে) মীনকেতু!

(মীনকেতু হো হো করে হেসে উঠ্‌ল।)

[গান করিতে করিতে আর একটি মেয়ের প্রবেশ। নাম তার মালা।]

[গান]

মালা : চাঁদিনী রাতে কানন-সভাতে আপন হাতে গাঁথিলে মালা ॥
নিবিড় সুখে সয়েছি বুকে তোমার হাতের সূচির জ্বালা ॥
এখনো জাগে লোহিত রাগে
রঙিন-গোলাবে তাহারি ব্যথা,
তোমার গলে দুলিব বলে
দিয়েছি কুলে কলঙ্ক কালা ॥
যদি ও-গলে নেবে না তুলে
কেন বধিলে ফুলের পরান,
অভিমানে হায় মালা যে শুকায়,
ঝরে ঝরে যায় লাজে নিরালা ॥

মীনকেতু : তুমি আবার কে সুন্দরী?

মালা : সম্রাট, চিনতে পারছ না? আমার নাম মালা! কাল সারারাত যে তোমার গলা জড়িয়ে ছিলুম। আমি ছিলুম কাঁটাবনের ছড়ানো ফুল, তুমি ত আমায় মালা করে সার্থক করেছ।

মীনকেতু : আঃ, তুমি যদি সার্থকই হয়ে গেলে, তবে আবার কেন? এখন তোমার সুতো থেকে একটি একটি করে ফুল ঝরে পড়ুক। ফুল ফুটলে ওকে যেমন মালা গেঁথে সার্থক করতে হয়, তেমনি রাত্রিশেষে সে বাসিমালা ফেলেও দিতে হয়।

[বুক চাপিয়া ধরিয়া মালার প্রস্থান]

কৃষ্ণা : উঃ! আর আমি থাকতে পারছিনে! মীনকেতু! তুমি কী?

মীনকেতু : হ্যাঁ, ওই ওর নিয়তি। রাত্রের বাসিফুলকে রাত্রিশেষেও যে আঁকড়ে পড়ে থাকে, তার সহায়-সম্বল ত নেই-ই তার যৌবন ও মরে গেছে।

কৃষ্ণা : নিষ্ঠুর! তোমার কি হৃদয় বলে–মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই?

মীনকেতু : (হাসিয়া) আমি মনুষ্যত্বের পূজা করি না, কৃষ্ণা! আমি যৌবনের পূজারী! ফুল আর হৃদয় দলে চলাই আমার ধর্ম।

কৃষ্ণা : তোমায় দেখে বুঝতে পারি মীনকেতু, কেন শাস্ত্রে বলে পাপের দেবতা মারের চেয়ে সুন্দর এ বিশ্বে কেউ নেই।

মীনকেতু : (হাসিয়া কৃষ্ণার গালে তর্জনী দিয়া মৃদু আঘাত করিতে করিতে) ঠিক বলেছ কৃষ্ণা, মারের চেয়ে, মিথ্যার চেয়ে, মায়ার চেয়ে কি সুন্দর কিছু আছে? চাঁদে কলঙ্ক আছে বলেই ত চাঁদ এত আকর্ষণ করে, তোমার কপালের ঐ কালো টিপটাই ত মুখের সমস্ত লাবণ্যকে হার মানিয়েছে। রামধনু মিথ্যা বলেই ত অত সুন্দর! যৌবন ভুল করে পাপ করে বলেই ত ওর উপর এত লোভ, ও এত সুন্দর!

[মুখে-চোখে বিলাস-ক্লান্তির চিহ্ন-যুক্ত মদোন্মত্তা এক নারীর টলিতে টলিতে প্রবেশ]

[গান]

মদালসা : কেন রঙিন নেশায় মোরে রাঙালে।
কেন সহজ ছন্দে যতি ভাঙালে ॥
শীর্ণা তনুর মোর তটিনীতে কেন
আনিলে ফেনিল জল-উচ্ছ্বাস হেন,
পাতাল-তলের ক্ষুধা মাতাল এ যৌবন
মদির-পরশে কেন জাগালে ॥

কৃষ্ণা : ও কুৎসিত নারীকে এখনি তাড়াও এখান থেকে! ও কে তোমার?

মীনুকেতু : (হাসিয়া) তুমি যে পাপের মিথ্যার কথার কথা বল্‌ছিলে, ও হচ্ছে তারই অপদেবতা! তোমাদের দেবতার মন্দির থেকে ফেরবার পথে ঐ অপদেবতাকে দেখলে ওকেও নমস্কার করতে ভুলিনে, কৃষ্ণা! ওর বাঁকা চোখ তোমার সত্যের সোজা চোখের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।

কৃষ্ণা : উঃ ভগবান! (বসিয়া পড়িল।)

মীনকেতু : (মেয়েটির দিকে তাকিয়ে) তুমি মদালসা না বসন্তসেনা? ওরির একটা-কিছু হবে বুঝি? কিন্তু আজ অতিরিক্ত মদ খেয়েছ এবং অলসও যে হয়েছ তা চলা দেখেই বুঝেছি।

মদালসা : কি প্রাণ, আর যে ফুরসৎই নেই? (কৃষ্ণাকে দেখে) একে আবার কোথা থেকে আমদানি কর্‌লে? আমরা কি চিরকালের জন্যে

রপ্তানি হয়ে গেলুম? আচ্ছা, এ রাজ্যি থাকবে না বেশি দিন। দেখি প্রাণ, তখন কার দাঁড়ে গিয়ে যব-ছোলা খাও!

মীনকেতু : আহা রাগ করো কেন সুন্দরী, মাঝে মাঝে পুণ্য করে পাপেরও মুখ বদ্‌লে নিতে হয়, এ-সব পুণ্যাত্মারা যখন বাসি হয়ে উঠ্‌বেন তখন তোমারই দুয়ারে আবার যাব।

[মদালসার টলিতে টলিতে প্রস্থান]

[প্রধানা গায়িকা কাকলি ও সখীদের গান]

[গান]

কাকলি ও সখীরা : ধর ধর ভর ভর এ রঙিন পেয়ালী
আঁধার এ নিশীথে জ্বালো জ্বালো জ্বালো দেয়ালী ॥
চাঁদনি যবে মলিন প্রখর আলোকে
প্রদীপ নব জ্বালো গো চোখে,
নতুন নেশা লয়ে জাগো জাগো খেয়ালী ॥

ভোলো ভোলো রাতের স্বপন,
প্রভাতে আনো নব জীবন!
শতদলে আঁখি-জলে করো গোপন,
হায় বেদনা ভরে কার তরে বৃথাই ধেয়ালী ॥

মীনকেতু : ঠিক সময় এসেছো তোমরা কাকলি। তোমার যৌবনের গান আর এদের যৌবনের প্রতীক্ষাই করছিলুম। এই ফুলফোটার গান শুনে বালিকা কিশোরী হয়, তরুণী যৌবন পায়, রাতের কুঁড়ি দিনের ফুল হয়ে হাসে, এই আমার রাজ্যের জাতীয় সংগীত।

কবি : ঠিক রাজ্যের নয় সম্রাট, এ আমাদের যৌবনের জাতীয় সংগীত।

মীনকেতু : (কবিকে সুরাপাত্র আগাইয়া দিয়া) নাও কবি, একটু অমৃত পান করে নাও, তোমার কণ্ঠে আরো–আরো অমৃত ঝরে পড়ুক। (কৃষ্ণার দিকে চাহিয়া কিন্তু কৃষ্ণা, তুমি অমন ম্লান মুখে বসে থেকো না। উৎসবের সহস্র প্রদীপের মাঝে একটা প্রদীপও যদি মিট্‌মিট্ করতে থাকে–

কৃষ্ণা : (মীনকেতুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) তখন তাকে একেবারে নিবিয়ে দেওয়াই সঙ্গত, সম্রাট!

মীনকেতু : (সুরার পাত্র কৃষ্ণার দিকে আগাইয়া দিয়া) আমি প্রদীপ নিবাই না কৃষ্ণা, ভালো করে জ্বেলে তু'লে তার আলোতে গিয়ে জাঁকিয়ে

বসি। এই নাও একটু স্নেহ-পদার্থ ঢেলে নাও, নিবু নিবু প্রদীপ দপদপ করে জ্বলে ওঠবে।

কৃষ্ণা : (পিছাইয়া গিয়া) আমি দীপশিখা নই সম্রাট, আমি কৃষ্ণা, নিশীথিনী। আরও–ও সুধা আপনারাই পান করুন।

কবি : বোতলকে মাতাল হতে কে দেখেছে কবে, সম্রাট! ওদের যে অন্তরে বাহির সুধা, ওদের সুধার দরকার করে না।

মীনকেতু : না হে কবি, উনি হচ্ছেন, "নীলকণ্ঠী"–শিব ত বল্‌তে পারিনে, শিবা বল্‌ব? নাঃ, তাহলে হয়ত এখনি বিশ্রী তান ধরে দেবে। কিন্তু কৃষ্ণা, তুমি যদি নিশীথিনীই হও আমি ত কলঙ্কী চাঁদ। চাঁদ উঠ্‌লে ত নিশীথিনীর মুখ অমন মন্ত্র-মুখ হয়ে থাকে না।

কৃষ্ণা : কিন্তু আজকের এ চাঁদ দ্বিতীয়ার চাঁদ, সম্রাট! এ চাঁদের কিরণে নিশীথিনীর মুখে যে হাসি ফুটে ওঠে, তা কান্নার চেয়েও করুণ।

কবি : বাবা, অমন ষোলকলায় পূর্ণ চাঁদও দ্বিতীয়ার চাঁদ হয়ে গেল! অঃ! ওর চৌদ্দটা কলাই বুঝি আজ অন্ধকারে ঢাকা!

কৃষ্ণা : হাঁ কবি, সময় সময় চাঁদের কলঙ্কটা এমনি বিপুল হয়ে ওঠে! (সম্রাটের দিকে তাকিয়ে) ও কলঙ্ক নয় সম্রাট, ও হচ্ছে দুঃখের পৃথিবীর ছায়া।

মীনকেতু : অঃ তুমি শুধু নিশীথিনাই নও–তুমি কুয়াশা! এই ক্ষীণ দ্বিতীয়ার চাঁদের জ্যোৎস্নাটুকুকেও মলিন না করে ছাড়বে না! যাক, ওটাও আমার মন্দ লাগে না। সুন্দরের মুখে হাসি যেমন মানায় ও চোখের মরীচিকাও তার চেয়ে কম মানায় না! (দূরে সূর্যোদয়) ওই সূর্য ওঠ্‌ছে, ওই সূর্য–ও যেন দুঃখের, জরার প্রতীক। ওর খরতাপে অশ্রু শুকায়, ফুল ঝরে, তরুণী ঊষার গালের লালি যায় ম্লান হয়ে, রাতের চাঁদ হয়ে ওঠে দীপ্তিহীন। নাঃ, আজকের মদে জলের ভাগই বোধ হয় বেশি ছিল–নেশাটা ক্রমেই পান্‌সে হয়ে আসছে। কই কবি, তোমার সেনাদল গেল কোথায়?

[গান]

তরুণীরা : আধো ধরণী আলো আধো আঁধার
কে জানে দুখ নিশি পোহাল কার ॥

আধো কঠিন ধরা, আধেক জল,
আধো মৃণাল-কাঁটা আধো কমল,
আধো সুর, আধো সুরা,– বিরহ বিহার ॥

আধো ব্যথিত বুকে আধেক আশা,
আধেক গোপন, আধেক ভাষা!
আধো ভালবাসা আধেক হেলা,
আধেক সাঁঝ আধো প্রভাত-বেলা,
আধো রবির আলো আধো নীহার ॥

[কবি ছাড়া আর সকলের প্রস্থান]

মীনকেতু : কবি!

কবি : যাচ্ছি সম্রাট! আকাশের দেবী ও মাটির মানুষের যখন নিরিবিলি দুটো কথা কওয়ার জন্য মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তখন সব চেয়ে মুস্কিল হয় ত্রিশঙ্কর। লজ্জায় দায় এড়াতে বেচারা স্বর্গেও উঠে যেতে পারে না, পৃথিবীতেও নেমে আসতে পারে না!

[প্রস্থান]

মীনকেতু : (চলে যেতে যেতে ফিরে এসে) যার আগে যাওয়ার কথা, সে-ই যে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা : আমি ভাবছি সম্রাট, এই ফুল দলে চলার কি কোনো জবাবদিহি করতে হবে না কারুর কাছে? এর কি সত্যিই কোনো অপরাধ নেই?

মীনকেতু : নেই কৃষ্ণা, কোনো অপরাধ নেই। আর যদি থাকেই ত সে অপরাধ আমার নয়, –সে অপরাধ এই চলমান পায়ের, আমার দৃপ্ত গতিবেগের। এই হচ্ছে চির-চঞ্চল যৌবনের চিরকালের রীতি, এই অপরাধে যৌবন যুগে যুগে অপরাধী।

[প্রস্থান]

কৃষ্ণা : (সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া) নির্মম! দস্যু! (কৃতাঞ্জলিপুটে আকুল কণ্ঠে, তবুও তুমি সুন্দর–অপরূপ। কিন্তু একি! কান্নায় আমার বুক ভেঙে আস্‌ছেন কেন? ও ত আমার হৃদয়ের কেউ নয়, শুধু এই রাজ্যের রাজা আমিও ওর কেউ নই। ও সম্রাট, আমি মন্ত্রী। তবু–এমন করে কেন? উঃ! এ কোন্ মায়ামৃগ আমায় ছলনা করতে এল? (মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।)

[কাকলি আসিয়া নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, কাকলি গান করিতে আরম্ভ করিলে কৃষ্ণা উঠিয়া বসিল।]

[গান]

কাকলি : আঁধার রাতে কে গো একেলা
নয়ন-সলিলে ভাসালে ভেলা ॥

কি দুখে আজি যোগিনী সাজি'
আপনারে লয়ে এ হেলা ফেলা ॥

সোনার কাঁকন ও দুটি করে
হের গো জড়ায়ে মিনতি করে।
ফেলিয়া ধুলায় দিও না গো তায়
সাধিছে নূপুর চরণ ধরে।
কাঁদিয়া কারে খোঁজ ওপারে
আজও যে তোমার প্রভাত বেলা ॥

কৃষ্ণা : দেখেছিস্ কাকলি, এই তার দৃপ্ত পদরেখা। (পথ হইতে একটি পদদলিত রাঙা গোলাব তুলিয়া লইয়া) এই তার পায়ে-দলা রক্ত গোলাব, এমনি করে ফুল আর হৃদয় দলে সে তার পায়ের তলার পথ রক্ত-রাঙা করে চলে যায়।

কাকলি : কেন ভাই, আলেয়ার পিছনে ঘুরে মর্‌ছ? হৃদয় দলে চলাই যার ধর্ম, কেন–

কৃষ্ণা : তুই ভুল বুঝেছিস্ কাকলি! আমি ওর কথা ভেবে কষ্ট পাই নারী বলে। বন্ধু বলে। তবু ও আলো কেন যেন কেবলি টান্‌তে থাকে। আমি প্রাণপণে বাধা দিই। মাঝে মাঝে হয়ত মনে হয়, ওই মিথ্যার পেছনে ঘোরার চেয়ে বুঝি বড় আনন্দ আমার জীবনে আর নেই। হৃদয়ের না হলেও ত শৈশবে বন্ধু ছিল।... আচ্ছা কাকলি, তুই যে গান গাইলি এ কার কাছে শিখেছিস?

কাকলি : কবি মধুশ্রবার কাছে।

কৃষ্ণা : কবি মধুশ্রবা। এমন চোখের জলের গান সে লিখলে? সে যে আনন্দের পাখি, সে ত দুঃখ-বেদনাকে স্বীকারই করে না! সবাই দেখছি তাহলে আলেয়ার পেছনে ঘুরছে!

কাকলি : এ কথা আমিও কবিকে বলেছিলুম। সে হেসে বল্‌লে, কাঁটার মুখে যে ফুলের সার্থকতা আমি তাকেই দেখি, আমার বুকের

তারগুলো ব্যথায় অত টন্‌টন্‌ করে ওঠে বলেই ত হাতে এমন বীণা বাজে!

কৃষ্ণা : (চিন্তিত হইয়া) হুঁ, আমি বুঝেছি কাকলি। কবি এক-একদিন কেমন করে যেন আমার দিকে চায়। (একটু ভাবিয়া) কিন্তু সে তার কথার ঝড়ে মনের মেঘকে কেবলই দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঠেলে দেয়। ও-ই সব চেয়ে সুখী! কোনো কিছু দাবি করে না, কেবল দিয়েই ওর আনন্দ।

[চন্দ্রকেতুর প্রবেশ]

সেনাপতি, তুমি এখানে! তুমি সীমান্ত রক্ষা কর্‌তে যাওনি? কাকলি তুই চল, আমি যাচ্ছি।

[কাকলির প্রস্থান]

চন্দ্রকেতু : তুমি কোন্‌ সীমান্ত রক্ষার কথা বল্‌ছ কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা : তুমি কি জান না, যশল্মীরের রানী জয়ন্তী গান্ধার রাজ্য আক্রমণ করেছে?

চন্দ্রকেতু : জানি কৃষ্ণা, শুধু আক্রমণ নয়, আমাদের সীমান্তরক্ষী সেনাদলকে পরাজিত করে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কৃষ্ণা : আমাদের অপরাজেয় সেনাদল পরাজিত হল একজন নারীর হাতে? আর তা জেনেও তুমি আজও রাজধানীতে বসে আছ?

চন্দ্রকেতু : আমার কর্তব্য আমি জানি কৃষ্ণা। নারীর বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করি নে। আমার সহকারী সেনাপতিকে পাঠিয়েছি, শুনছি সে-ও নাকি পরাজিত হয়েছে।

কৃষ্ণা : আমি এ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, আমি জান্‌তে চাই সেনাপতি, আমাদের অপরাজেয় সেনাদলের এই সর্বপ্রথম পরাজয়ের লজ্জা কার? কে এর জন্য দায়ী?

চন্দ্রকেতু : তুমি!

কৃষ্ণা : আমি!

চন্দ্রকেতু : হাঁ তুমি! (ব্যথাক্লিষ্ট কণ্ঠে) আমি কোন্‌ সীমান্ত রক্ষা করব কৃষ্ণা! জয়ন্তী গান্ধার সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত আক্রমণ করেছে, সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে কতটুকু শক্তির প্রয়োজন? কিন্তু এ হৃদয়ের পূর্ব সীমান্ত যে আক্রমণ করেছে তার সাথে যে পারিনে।

কৃষ্ণা : (দৃপ্ত কণ্ঠে) সেনাপতি, আমি শুধু কৃষ্ণা নই, আমি এ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী।

চন্দ্রকেতু : জানি কৃষ্ণা! তুমি যখন রাজ সভায় প্রধানমন্ত্রীর আসনে বস, তখন তোমায় অভিবাদন করি, কিন্তু যে তার অন্তরের বেদনার ভারে এই পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়ে, তার নাম হতভাগিনী কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা : (চমকিত হইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে) চন্দ্রকেতু, বন্ধু!

চন্দ্রকেতু : (আকুল কণ্ঠে) ডাক কৃষ্ণা, সেনাপতি নয়, বন্ধু নয়, শুধু আমার নাম ধরে ডাক। তোমার মুখে আমার নাম যেন কত যুগ পরে শুনলাম। আঃ! নিজের নামও নিজের কানে এমন মিষ্টি শুনায়! এমনি করে কৈশোরে তুমি আমার নাম ধরে ডাকতে, আর আমার রক্তে যেন আগুন ধরে যেত।

কৃষ্ণা : (ম্লান হাসি হাসিয়া) আজো তোমার মনে আছে সে কথা? আমারও মনে পড়ে চন্দ্রকেতু, একদিন তুমি, আমি আর মীনকেতু এই প্রমোদ-উদ্যানের পথে এক সাথে খেলা করেছি, তখনো রাজার সিংহাসন আর রাজ্যের দায়িত্ব এসে আমাদের আড়াল করে দাঁড়ায়নি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) তখন কে জানত, এই পথেই আমাদের নতুন করে খেলা শুরু হবে। (একটু ভাবিয়া হাসিয়া) আমি মীনকেতুর পাশে বসে তাকে বল্‌তাম, তুমি রাজা, আমি রানী, ফিরে দেখতাম তুমি ম্লান মুখে চলে যাচ্ছ, আমার চাঁদনী রাত যেন বাদ্‌লা মেঘে ছেয়ে ফেল্‌ত।

চন্দ্রকেতু : সত্য বল্‌ছ কৃষ্ণা? আমার অশ্রু তোমার চাঁদনী রাতকে মলিন করেছে কোনোদিন তাহলে?

কৃষ্ণা : করেছে বন্ধু! তুমি আমার বুকে মাধবী রাতের পূর্ণ চাঁদের রূপে উদয় হওনি কোনোদিন, কিন্তু চোখে বাদল রাতের বর্ষাধারা হয়ে নেমেছ।

চন্দ্রকেতু : (উত্তেজিত কণ্ঠে) ধন্যবাদ কৃষ্ণা! কিন্তু তোমার এও হয়ত মনে আছে যে আমি শৈশবের সে খেলায় বারবার ম্লানমুখে ফিরেই আসিনি! একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলুম, তোমার বিরুদ্ধে। তোমার মীনকেতুর বিরুদ্ধে তোমায় জোর করে ছিনিয়ে নিলুম, মীনকেতু যুদ্ধ করলে, কিন্তু আমার হাতে পরাজিত হল। বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে তোমার দিকে চেয়ে দেখলুম, তুমি কাঁদছ। বুঝলুম, তুমি বিজয়ীকে চাও না–তুমি চাও তাকেই যার

কাছে তুমি পরাজিতা লাঞ্ছিতা। তোমায় ফিরিয়ে দিলুম তোমার রাজার হাতে।

কৃষ্ণা : তুমি ভুল করেছ চন্দ্রকেতু! হয়ত সবাই এই ভুল করে। আমি মানি, মীনকেতুকে আমার ভালো লাগে। কিন্তু সে ভালো লাগা ভালোবাসা নয়। সিংহ দেখলে যেমন আনন্দ হয়, ভয় হয় এও তেম্‌নি। কিন্তু সে কথা থাক, সেদিন তোমার হাতে পরাজিত হয়ে মীনকেতু কি বলেছে, মনে আছে? সে হেসে বলেছিল, 'বন্ধু' আমি যদি কৃষ্ণাকে তোমার মত করে চাইতুম, তাহলে আমিও তোমায় এমনি করে পরাজিত করতুম। যাকে চাইনে তার জন্যে যুদ্ধ করতে শক্তি আসবে কোত্থেকে।' সে আরো বলেছিল, "চন্দ্রকেতু, আমি যদি সম্রাট হই, তোমাকে আমার সেনাপতি কর্‌ব।"

চন্দ্রকেতু : সেনাপতি আমায় সে করেনি, আমি আমার শক্তিতে সেনাপতি হয়েছি। কিন্তু কৃষ্ণা, কি নিষ্ঠুর তুমি, ও-কথাগুলো তোমার মনে না করিয়ে দিলেও ত চল্‌ত।

কৃষ্ণা : দুঃখ কোরো না বন্ধু, তোমায় বুকের প্রেম দিতে পারি নি বলেই ত চোখের জল দিই। আমি নারী, আমি জানি, হৃদয়হীনতা দিয়ে হৃদয়কে যত আকর্ষণ করা যায়, তার অর্ধেকও হয়তো ভালোবাসা দিয়ে আকর্ষণ করা যায় না। আমি ভালোবাসা পাইনি, তুমিও ভালোবাসা পাওনি–এইখানেই ত আমরা বন্ধু! কিন্তু তুমি ত আমার চেয়েও ভাগ্যবান। আমি যে কাউকে ভালোবাসতেই পারলুম না। তুমি ত তবু একজনকে ভালোবাসতে পেরেছ!

চন্দ্রকেতু : দোহাই কৃষ্ণা, বন্ধু বোলো না! বোলো না! আমি চাই না তোমার কাছে ঐটুকু। বন্ধু মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে, হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। (হাত ধরিয়া) কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা : (ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া) কিন্তু তা ত হয় না চন্দ্রকেতু!

[গান করিতে করিতে কাকলির প্রবেশ]

[গান]

কাকলী : যৌবনে যোগিনী আর কতকাল
রবি অভিমানিনী।
ফিরে ফিরে গেল কেঁদে মধুযামিনী ॥

লয়ে ফুল ডাকি এল বনমালি,
জ্বালিল আকাশ তারার দীপালি,
ভাঙিল না ধ্যান মন্দির-বাসিনী ॥

কৃষ্ণা : আমি চললুম, রাজসভায় যাওয়ার সময় হল, পথ ছেড়ে দাও!

চন্দ্রকেতু : আমি কোনো দিনই তোমার পথরোধ করে দাঁড়াইনি কৃষ্ণা! আজো দাঁড়াব না। আমি চিরকালের জন্য তোমার পথ থেকে সরে যাব। কিন্তু যাবার আগে আমার শেষকথা বলে যাব।

কৃষ্ণা : কাকলি, তুই চল, আমি যাচ্ছি।

[কাকলি প্রস্থান]

চন্দ্রকেতু : তুমি জান কৃষ্ণা, আমি জীবনে কোনো যুদ্ধে পরাজিত হইনি। একদিন শৈশবে যেমন জোর করে তোমায় ছিনিয়ে নিয়েছিলুম, ইচ্ছা করলে আজো তেমনি করে ছিনিয়ে দিনে পারি। আমার হাতে সাম্রাজ্য নেই, কিন্তু তরবারি আছে, বাহুতে শক্তি আছে,–কিন্তু না–তা নেব না। তোমাকে জয় করেই নেব।

কৃষ্ণা : যুদ্ধ-জয় আর হৃদয়-জয় সমান সহজ নয় সেনাপতি।

চন্দ্রকেতু : বেশ কৃষ্ণা, আমিও না-হয় হৃদয়ের ওই রাঙা রণভূমে পরাজিত হয়েই লুটিয়ে পড়ব! কিন্তু সেই পরাজয়ই হবে আমার শ্রেষ্ঠ যুদ্ধজয়। আমি জানি, আজ আমি যেমন করে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ছি তুমিও সেদিন পরাজিত–আমার বিদায়-পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে; কিন্তু সেদিন আমি তোমারই মত উপেক্ষা করে চলে যাব নিরুদ্দেশের পথে।

[প্রস্থান]

কৃষ্ণা : (মূঢ়ের মত সেইদিকে তাকাইয়া আকুল কণ্ঠে) কে আমার নাম রেখেছিল কৃষ্ণা? কৃষ্ণা নিশীথিনীর মতই আমার এক প্রান্তে সূর্যাস্ত, আর এক প্রান্তে পূর্ণ চাঁদের উদয়! না! সূর্যাস্ত কখন হল?–এ কি বল্‌ছি?

[রাজসভার সাজে সজ্জিত হইয়া মীনকেতুর প্রবেশ]

মীনকেতু : সত্যি কৃষ্ণা, কুহেলিকারও একটা আকর্ষণ আছে! আমি রাজসভায় যাচ্ছিলুম, যেতে যেতে তোমার ম্লানমুখ মনে পড়ল। মনে হল, এখনো তুমি তেমনি করে বসে আছ। রাজসভা আজ এখানেই আহ্বান কর। সভাসদগণকে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

[অভিবাদন করিয়া কৃষ্ণার প্রস্থান ও রঙ্গনাথের প্রবেশ]

মীনকেতু : এস, এস রঙ্গনাথ, বড় একা একা ঠেক্‌ছিল। তুমি বোধ হয় শুনেছ, আমি আমার এ প্রমোদ-কাননেই আজ রাজসভা আহ্বান করেছি। (হঠাৎ চমকিত হইয়া রুক্ষস্বরে) কিন্তু ও কি রঙ্গনাথ, তুমি আবার দাড়ি রাখতে শুরু করেছ? জান আমার আদেশ, কেউ দাড়ি রাখলে তাকে কি দণ্ড গ্রহণ করতে হয়? ও কুশ্রী জিনিস রূপকে কলঙ্কিত করে, যৌবনের সভায় ওর স্থান নেই।

রঙ্গনাথ : জানি সম্রাট, দাড়ি রাখতে চাইলে আমার দেহ আর মাথাটাকে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু চাঁদের কলঙ্কের মত দাড়িতে কি মুখের জৌলুস বাড়ে না, সম্রাট? তা ছাড়া কি করি বলুন, ত আমি ও দাড়ি চাইনে, কিন্তু দাড়ি যে আমায় চায়। বুঝি আমার আর জন্মের পতিত্যক্তা কালো বউ ছিল, তাই এজন্মে দাড়ি-রূপে এসে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিছুতেই গাল ছাড়তে চায় না, যত দূর করে দিই করে দিই তত সে আঁকড়ে ধরে। তা ছাড়া, সম্রাট, আমরা কামাব দাঁড়ি, আর নাপিত কামাবে পয়সা–এও ত আর সহ্য করতে পারিনে।

মীনকেতু : (হাসিয়া) আচ্ছা, এবার থেকে আমার নরসুন্দরকে বলে দেব, তোমার কাছে সে পয়সা কামাবে না, দাড়িই কামাবে।

রঙ্গনাথ : দোহাই সম্রাট! পয়সা কামিয়েই ওরা দাড়ির চেয়ে গালই কামায় বেশী, কিন্তু বিনি-পয়সায় কামান হলে হয়ত গলাটাই কামিয়ে দেবে! আর কৃপা করে যদি পাঠানই, তবে নরসুন্দরকে না পাঠিয়ে ক্ষুরসুন্দর কাউকে পাঠাবেন। ওর ক্ষুর তো নয় যেন খুরপো! সম্রাট একটা গান শুনবেন? গানটা অবশ্য আমার স্ত্রী রচনা করেছেন!

মীনকেতু : (উচ্চ হাস্য করিয়া) তোমার স্ত্রীর গান? তাও আবার তোমার দাড়ি নিয়ে? গাও, গাও–ও চমৎকার হবে।

রঙ্গনাথ : সে ত গান নয় সম্রাট–সে শুধু নাকের জল চোখের জল। আমার বড় দাড়ির অত্যাচার তার সয়েছিল কিন্তু কামান দাড়ির খোচানি আর সইতে না পেরে বেদনার আনন্দে কবি হয়ে গানই লিখে ফেল্‌লে।

[গান]

খুঁচি খুঁচি সূচি-সারি
হাঁড়ি মুখে কালো দাড়ি
যেন কণ্টক বৈঁচির বনে।
তারে ছাড়াতে বসন ছিঁড়ে, ক্ষুর ভাঙে রণে ॥

দেয় ভঙ্গ রণে ক্ষুর খুরপো হয়ে
তারে কাটতে পালায় মাঠে কাস্তে ভয়ে!
সে যে আঁধার বাদাড়-বন শ্মশ্রুর ঝোঁপ,
পাশে গুল্মলতার ঝাড় কণ্টক-গোঁফ।
(শ্যামের দাড়ি রে–)
শয়নে যাইতে মোর নয়ন ঝুরে লো সই
অঙ্গ কাঁপিয়া মরে ডরে। (সখি লো)
ও যে মুখ নয়, পিতামহ ভীষ্ম শুইয়া যেন
খর শর-শয্যার পরে! (সখি লো)
শজারুর সনে নিতি লড়াই
যাই রে দাড়ির বালাই যাই।
শ্যামের দীর্ঘ শ্মশ্রু ছিল যে গো ভালো
ছিল না খোঁচার জ্বালা
আমায় দাড়ির আঙুল বুলায়ে বুলায়ে
ঘুম পাড়াইত কালা।
আমার আবেশে নয়ন মুদে যে যেত!
সে পরশে নয়ন বুঁজে যে যেত।
আমি খড়ের পালুই ধরে শুইতাম যেন গো,
তাহে শীত নিবারিত, তারে কাটিল সে কেন গো!
শ্যামের মুখের মতন কে দিল এমন
দাড়িরূপী মুড়ো ঝ্যাঁটা গো,
কালার গণ্ড জড়ায়ে কিল্‌বিল করে
শত সে সতীন-কাঁটা গো,
আমি জ্বলে যে মলাম,
সখি আমায় ধর ধর, জ্বলে যে মলাম ॥

[কৃষ্ণা, মধুশ্রবা, চন্দ্রকেতু, কাকলি, বন্দিনীগণ, ছত্রধারিণী, করঙ্কবাহিনী ও অন্যান্য সভাসদগণের প্রবেশ]

[গান]

কাকলি ও বন্দিনীগণ : জাগো যুবতী। আসে যুবরাজ
অশোক-রাঙা বসনে সাজ।
আসন পাতো বনে অঞ্চল আধ,
বন্দনা-গীতি-ভাষা বাধো বাধো,
কপোলে লাজ ॥
উছলি' ওঠে যৌবন আকুল তরঙ্গে,
খেলিছে অনঙ্গ নয়নে বুকে অঙ্গে
আকুল তরঙ্গে।

আগমনী-ছন্দে মেঘ-মৃদঙ্গে,
ভবন-শিখী গাহে বন-কুহু সঙ্গে।
বাজে হৃদি-অঙ্গনে বাঁশরি বাজো।

[কাকলি ও বন্দিনীগণের প্রস্থান]

চন্দ্রকেতু : সম্রাট, জয়ন্তী আমাদের সীমান্ত-রক্ষী সেনাদলকে পরাজিত করে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমার সহকারী সেনাপতিকে তার গতিরোধ করতে পাঠিয়েছি। শুন্‌ছি সে-ও পরাজিত হয়েছে।

কৃষ্ণা : কিন্তু আমাদের এ পরাজয়ের অর্ধেক লজ্জা তোমার, সেনাপতি! তুমি নিজে সৈন্য পরিচালন করলে কখনো আমাদের এ পরাজয় ঘটত না।

চন্দ্রকেতু : তা জানি, কিন্তু আমি নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিনে।

মধুশ্রবা : তুমি জান না সেনাপতি, সব নারী নারী নয়। শৌর্যশালিনী নারীর পরাক্রম যে কোন পরাক্রমশালী পুরুষের পৌরুষের চেয়েও ভয়ঙ্কর। নদীর জল তরল স্বচ্ছ, কিন্তু সেই জল যখন বন্যার ধারারূপে ছুটে আসে, তখন তার মুখে ঐরাবতও ভেসে যায়।

রঙ্গনাথ : (অন্যদিকে তাকাইয়া) ঠিক বলেছ বাবা, মদ্দা-মেয়ে পুরুষের বাবা। সেনাপতি যদি একবার আমার স্ত্রীকে দেখতেন, তাহলে বুঝতেন, কেন মায়ের নাম মহিষ-মর্দিনী!

মীনকেতু : এই কি সেই যশল্মীরের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ্যেশ্বরের কন্যা, সেনাপতি? কিন্তু আমি ত শুনেছিলাম সে উন্মাদিনী। দিবারাত্র

নাকি সে রাজস্থানের মরুভূমিতে ঘূর্ণিবায়ুর সাথে নৃত্য করে ফেরে। ওর নাম ওদেশে মরু-নটী।

চন্দ্রকেতু : হাঁ সম্রাট, এ সেই রহস্যময়ী মরুচারিণী। মরুভূমির দুরন্ত বেদে ও বেদেনীর দল এর সহচর-সহচরী, সেনা-সামন্ত–সব। এদের নিয়ে সে মরু-ঝন্‌ঝার মত পর্বতে প্রান্তরে নৃত্য করে ফেরে।

[অধোমুখে সহকারী সেনাপতির প্রবেশ]

একি? সহকারী সেনাপতি? তুমি তাহলে সত্যই পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছ?

সহ-সেনাপতি : মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় সম্রাট, কিন্তু ও মায়াবিনী। কেমন করে কি হল বুঝতে পারলুম না, যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলুম আমার ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল ঝড়ের মুখে খড়-কুটোর মত উড়ে যাচ্ছে। মনে হল, আমাদের ওপর দিয়ে একটা দাবানল বয়ে গেল! ও নারী নয় সম্রাট, ও আগুনের শিখা! ওর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতে পারে–এত শক্তি বুঝি পৃথিবীর কোনো সেনানীরই নেই। সেদিন প্রত্যুষে সে যখন রণক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল, মনে হল, সমস্ত আকাশে আগুন ধরে গেছে। আমি মুখ-চোখ কিছুই দেখতে পাইনি, তবু চোখ যেন ঝলসে গেল। সহস্র কিরণ দিনমণির তার সহস্র-শিখা ফণা বিস্তার করে এগিয়ে এল, আমরা ফুৎকারে উড়ে গেলুম।

মীনকেতু : তোমায় সে বন্দি করলে না সেনাপতি?

সহ-সেনাপতি : না সম্রাট। আমি তখনো অচেতন অবস্থায় পড়েছিলুম। হঠাৎ কিসের মাতাল-করা সৌরভে আমার জ্ঞান ফিরে পেলুম। দেখলুম, সেই বিজয়িনী নারী আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে। ভয়ে আমার চক্ষু আপনি মুদে এল। আমি তার দিকে তাকাতে পারলুম না! সে আমায় বল্‌লে, তোমায় বন্দি করব না সেনাপতি, তোমার–তোমার সম্রাটকে বন্দি করতে এসেছি।

মীনকেতু : (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) কি বললে সেনানী! আমাকে সে বন্দি করতে এসেছে? (সিংহাসন ছাড়িয়া নামিয়া আসিয়া) মন্ত্রী, সেনাপতি, চিনেছি,–চিনেছি আমি এই নারীকে। এরই প্রতীক্ষায় আমার দুর্দান্ত যৌবন কেবলি ফুল আর হৃদয় দলে তার চলার পথ তৈরী করছিল। এরই আগমনের আশায় এত হৃদয়ের এত প্রেম-নিবেদনকে অবহেলা করে চলেছি। ও জয়ন্তী নয়, যশল্মীরের

অধীশ্বরী নয়, ও মরুচারিণী-মায়াবিনী, চিরকালের চির-বিজয়িনী! সে তার প্রতি চরণ-পাতে শুষ্ক মরুর বুকে মরুদ্যান রচনা করে চলে, পাষাণের বুক ভেঙে অশ্রুর ঝর্নাধারা বইয়ে দেয়, পাহাড়ের শুষ্ক হাতে নিত্য-নতুন ফুল ফোটায়–এ সেই নারী। মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদগণ! আমার অপরাজেয় সৈন্যদলের এই প্রথম পরাজয়–নারীর হাতে, সুন্দরের হাতে, এ আমারই পরাজয়, তোমাদের সম্রাটের পরাজয়, যৌবনের রাজার পরাজয়। এখনি ঘোষণা করে দাও, আমার সাম্রাজ্য জুড়ে উৎসব চলুক, আনন্দের সহস্র দীপালি জ্বলে উঠুক! বলে দাও, আজ তাদের রাজাকে পরাজিত করে তাদের রাজলক্ষ্মী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করছে। আমার এই রাজসভা এখনি উৎসব-প্রাঙ্গণে পরিণত হোক। কবি, নিয়ে এস তোমার বেণু, বীণা, সুরা ও নর্তকীর দল। আজ যৌবনের এই প্রথম পরাজয়ের পরম ক্ষণকে বরণ করতে যেন হাসি, গান, আনন্দের এতটুকু কার্পণ্য না করি! কৃষ্ণা, তুমি অমন ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে কেন? তোমাদের রাজ্যের বিজয়িনী রাজলক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা করে আনার দায়িত্ব যে তোমারই। আনন্দ কর, আনন্দ কর!

সভাসদগণ : জয়, গান্ধার-সাম্রাজ্যের ভাবী রাজলক্ষ্মীর জয়!

কৃষ্ণা : মার্জনা করবেন সম্রাট। আমি যদি সত্য-সত্যই এই সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হই, তাহলে আদেশ দিন, আমি সেই বিজয়িনীর গতিরোধ করব। আমি নারী, নারী কোন্ শক্তিতে যুদ্ধে জয়ী হয়, তা আমি জানি। ওর মায়ার আপনার তরুণ সেনাপতিদের চোখ ঝল্‌সে যেতে পারে, তারা পরাজিত হতে পারে, ওরা পুরুষ, কিন্তু আমি তার এই অভিযানের ঔদ্ধত্যের শাস্তিদান কর্‌ব।

মীনকেতু : পার্‌বে না কৃষ্ণা, পারবে না। যে নারী আমার সীমান্তের দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকারের বাধাকে অতিক্রম করে আমার চির-বিজয়ী সেনাদলকে এমন পরাস্ত করেছে, সে সামান্যা নারী নয়, সে চিরকালের বিজয়িনী।

কৃষ্ণা : সে যদি সম্রাটের মনের দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীর অতিক্রম করে হৃদয়-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে থাকে, ত, স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তবু সেই বিজয়িনীর সাথে আমার শক্তি-পরীক্ষার কোনো অধিকারই কি নেই, সম্রাট?

মীনকেতু : নিশ্চয় আছে, কৃষ্ণা। আমি আদেশ দিলুম তুমি যেতে পার তার শক্তি পরীক্ষায়।

চন্দ্রকেতু : সেনাপতি জীবিত থাকতে মন্ত্রীর সৈন্য পরিচালনার চেয়ে আমাদের বড় কলঙ্ক আর কি থাকতে পারে সম্রাট? মন্ত্রী রাজ্যই পরিচালনা করেন, সৈন্যদল চালনা করা সেনাপতির কাজ।

কৃষ্ণা : (সক্রোধে ও বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে) চুপ কর সেনাপতি। তুমি আজ হীন-বীর্য কাপুরুষ, তোমার শক্তি থাকলে আমাদের অজেয় সেনাদলের এই হীন পরাজয় ঘটত না।

চন্দ্রকেতু : কাপুরুষই যদি হয়ে থাকি সে অপরাধ আমি ছাড়া হয়ত আর কারুর।

মীনকেতু : ঠিক বলেছ চন্দ্রকেতু। মাঝে মাঝে অটল পৌরুষের মহিমাও খর্ব হয়, বিজয়ীর রথের চূড়ায় নীলাম্বরী আঁচল দুলে ওঠে বলেই ত পৃথিবী আজো সুন্দর! তুমি যে কারণে কাপুরুষের আখ্যা পেলে, ঠিক সেই কারণেই হয়ত আমারও বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই তরবারি ধারণ করতে পারছিনে।

চন্দ্রকেতু : আমি এখনো নিজেকে তত দুর্বল মনে করিনে, সম্রাট! যদি শক্তিই হারিয়ে থাকি, তাহলেও যে-শক্তি এখনো এই বাহুতে অবশিষ্ট আছে, পৃথিবী জয়ের জন্য সেই শক্তিকেই যথেষ্ট মনে করি। (প্রস্থানোদ্যত) আমি কি কোনো যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি, সম্রাট?

মীনকেতু : না সেনাপতি। তুমি যে আমার দক্ষিণ হস্তের তরবারি। কিন্তু সেনাপতি, আজ যে আমারি তরবারি-মুষ্টি শিথিল হয়ে গেছে, তুমি শক্তি পাবে কোত্থেকে? তুমি এতদিন অস্ত্রের যুদ্ধে, নর-সংগ্রামেই বিজয়ী হয়েছ, কিন্তু হৃদয়ের যুদ্ধে নারীকে জয় করার সংগ্রামেও ফেরা, সে তোমার চেয়ে শতগুণে শক্তিধর বীরপুরুষেরাও পারেননি, বন্ধু!

চন্দ্রকেতু : এ ত আমার হৃদয়-জয়ের অভিযান নয়, সম্রাট, এ অভিযান শুধু যুদ্ধ-জয়ের জন্য, সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য।

মীনকেতু : (একবার কৃষ্ণা ও একবার চন্দ্রকেতুর দিকে তাকাইয়া চতুর হাসি হাসিয়া) এইখানেই ত রহস্য চন্দ্রকেতু। যেখানে আসল যুদ্ধ চলেছে সেনাপতির, সে-রণক্ষেত্র ছেড়ে সে যদি এক শূন্য মাঠে গিয়ে তরবারি ঘোরায় তাহলে তার জয়ের আশাটা বেশ একটু মহার্ঘ্য হয়ে পড়ে না কি?

চন্দ্রকেতু : আজ তারই পরীক্ষা হোক সম্রাট। আমি দেখতে চাই সত্যই আমি শক্তি হারিয়েছি কি না।

[প্রস্থান]

কৃষ্ণা : আপনার আনন্দ-উৎসব চলুক সম্রাট, আমি কৃষ্ণা – আলোক-সভার অন্তরালেই আমার চিরকালের স্থান।

[প্রস্থান]

[সহসা আকাশ অন্ধকার করিয়া কাল-বৈশাখীর মেঘ দেখা দিল। ধুলায় শুকনো পাতায় প্রমোদ-উদ্যান ছাইয়া ফেলিল। মেঘের ঘন গর্জনে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল।]

রঙ্গনাথ : (সভয়ে চিৎকার করিয়া) সম্রাট! আকাশে দেবতাদের উৎসবের ঘণ্টা বেজে উঠেছে! অপ-দেবতার আয়োজন পণ্ড করতেই ব্যাটাদের এই কুমন্ত্রণা। বাবা, "যঃ পলায়তি সজীবতি!"

মীনকেতু : (হাসিয়া) ভয় নেই রঙ্গনাথ! ঐ ঝড়ই আমার না-আসা বন্ধুর পদধ্বনি। শুন্‌ছ না–বজ্রে বজ্রে তার জয়ধ্বনি, কালবৈশাখীর মেঘে তার বিজয়-পতাকা? চল, প্রাসাদের অলিন্দে বসে আজ মেঘ-বাদলেরই নৃত্যোৎসব দেখি গিয়ে।

[নৃত্য ও গান করিতে করিতে ঝোড়ো-হাওয়া ও ঘূর্ণির প্রবেশ]

[গান]

ঝোড়ো-হাওয়া : ঝন্‌ঝার ঝাঁঝর বাজে ঝন ঝন।
বনানী-কুন্তল এলাইয়া ধরণী কাঁদিছে
পড়ি' চরণে শন শন শন শন ॥
দোলে ধূলি-গৈরিক নিশান গগনে,
ঝামর কেশে নাচে ধূর্জটি সঘনে,
হর-তপোভঙ্গের ভুজঙ্গ নয়নে,
সিন্ধুর মঞ্জীর চরণে বাজে রণ রণ রণ রণ ॥

ঘূর্ণি : লীলা-সাথি তব নেচে চলি ঘূর্ণি।
বালুকার ঘাগরী, ঝরা পাতা উড়ুনী ॥

আলুথালু শতদলে খোঁপা ফেলি টানি;
দিকে দিকে ঝর্নার কুলুকুচু হানি।
সলিলে নুড়িতে নুড়ি পঁইচি বাজে
রিনিঝিনি রণঝন ॥

[গান করিতে ঝড় ও ঘূর্ণির প্রস্থান]
[মৃদঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে নটরাজ্যের প্রবেশ]

[গান]

নটরাজ : নাচিছে নটনাথ শঙ্কর মহাকাল
লুটাইয়া পড়ে দিবারাত্রির বাঘ-ছাল,
আলো-ছায়ার বাঘ-ছাল,
ফেনাইয়া ওঠে নীল কণ্ঠের হলাহল
ছিঁড়ে পড়ে দামিনী অগ্নি-নাগিনী দল।
দোলে ঈশান-মেঘে ধূর্জটি-জটাজাল ॥

বিষম ছন্দে বোলে ডমরু নৃত্য-বেগে
ললাট-বহ্নি দোলে প্রলয়ানন্দে জেগে ॥
চরণ-আঘাত লেগে জাগে শ্মশানে কঙ্কাল ॥

সে নৃত্য-ভঙ্গে গঙ্গা-তরঙ্গে
সংগীত দু'লে ওঠে অপরূপ রঙ্গে,
নৃত্য-উছল জলে বাজে জলদ তাল ॥

সে নৃত্য-ঘোরে ধ্যান নিমীলিত ত্রি-নয়ন
ধ্বংসের মাঝে হেরে নব সৃজন-স্বপন,
জ্যোৎস্না-আশিস ঝরে উছলিয়া শশী-থাল ॥

[নৃত্য ও গান করিতে করিতে বৃষ্টিধারার প্রবেশ]

[গান]

বৃষ্টিধারা : নামিল বাদল
রুমু রুমু ঝুমু নূপুর চরণে
চল লো বাদল-পরী আকাশ-আঙিনা ভরি
নৃত্য-উছল ॥

চামেলি কদম যূথি মুঠি মুঠি ছড়ায়ে
উতল পবনে দে অঞ্চল উড়ায়ে

তৃষিত চাতক-তৃষ্ণারে জুড়ায়ে
চল্ ধরাতল ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[সেনাপতি উগ্রাদিত্যের প্রবেশ। চোখে মুখে অস্বাভাবিক ভীষণতা। কণ্ঠে, চলাফেরায়, ব্যবহারে বর্বর বন্য পশুকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, বুকের তলা হইতে "বাঘনখ" অস্ত্র বাহির করিয়া সে এক মনে দেখিতে লাগিল। দূরে চন্দ্রিকার গান শুনিতেই চমকিয়া উঠিল]

[গান করিতে করিতে চন্দ্রিকার প্রবেশ]

[গান]

চন্দ্রিকা : এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল।
এ যে ব্যথা-রাঙা হৃদয় আঁখিজলে টলমল ॥
কোমল মৃণাল দেহ ভরেছে কণ্টক-ঘায়,
শরণ লয়েছি গো তাই শীতল দীঘির জল ॥

ডুবেছি অতল জলে কত যে জ্বালা স'য়ে
শত ব্যথা ক্ষত লয়ে হইয়াছি শতদল ॥

আমার বুকের কাঁদন, তুমি বল ফুল-বাস,
ফিরে যাও, ফেলো না গো শ্বাস,
দখিনা বায়ু চপল ॥

চন্দ্রিকা : এ কি, সেনাপতি! লুকিয়ে আমার গান শুনছিলে বুঝি?

উগ্রাদিত্য : (কর্কশ কণ্ঠে মুখ বিকৃত করিয়া) গান আমি কারুরই শুনিনে চন্দ্রিকা। আমি গাধার চিৎকার দশঘণ্টা ধরে শুনতে পারি, কিন্তু মানুষের চিৎকার–হ্যাঁ চিৎকার বই কি, তা তোমরা তাকে হয়ত গান বলে থাক–এক মুহূর্তও শুনতে পারিনে।

চন্দ্রিকা : বল কি উগ্রাদিত্য! গান হল চিৎকার? আর গাধার ডাক হল তোমার কাছে মানুষের–মানে আমার গানের চেয়েও সুন্দর? হলেই বা ওরা তোমার আত্মীয়, তাই বলে কি এতটা পক্ষপাত কর্‌তে হয়?

উগ্রাদিত্য : দেখ চন্দ্রিকা, তুমি যে কি সব কথা বল প্যাচ দিয়ে, আমি তার মানে বুঝি না, অবশ্য বুঝবার দরকারও নেই আমার। তোমার চলন বাঁকা, তোমার চোখের চাউনি বাঁকা, তোমার কথা বাঁকা!

চন্দ্রিকা : অর্থাৎ আমি অষ্টাবক্র মুনি, এই ত! (গান করিয়া) "বাঁকা, শ্যাম হে, বাঁকা তুমি, বাঁকা তোমার মন।"

উগ্রাদিত্য : উঃ, মানুষের কত বেশি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘট্‌লে এমন সুর করে চ্যাঁচাতে পারে। একরোখা চ্যাঁচানোর মানে বুঝি, তা সওয়া যায়, কিন্তু এই একবার জোরে একবার আস্তে একবার নাকি সুরে চ্যাঁচানো শুনে এমন রাগ ধরে!

চন্দ্রিকা : এও আবার লোকে আদর করে শোনে! এত পাগলও আছে পৃথিবীতে! ভাগ্যিস তোমার মত আরো দু' চারটি পাথুরে মস্তিষ্কের লোক নেই পৃথিবীতে, নইলে পৃথিবীটা এতদিন চিড়িয়াখানা হয়ে উঠ্‌ত উগ্রাদিত্য!– (চমকিয়া) ওকি! তুমি অমন করে বাঘ-নখ ধরেছ কেন? তোমার চোখে হিংস্র বাঘের মত অমন দৃষ্টি কেন? সাপ যেমন করে শিকারের দিকে তাকায়,–না আমার কেমন ভয় কর্‌ছে। আমি পালাই!

[ছুটিয়া পলায়ন]

[চন্দ্রিকার হাত ধরিয়া জয়ন্তীর প্রবেশ]

জয়ন্তী : ফিরে, তুই অমন করে ছুটছিলি কেন? ভূত দেখ্‌লি নাকি?

চন্দ্রিকা : (ভয়-জড়িত কণ্ঠে) হাঁ! না দিদি, ভূত নয়, বাঘ! নেকড়ে বাঘ!

জয়ন্তী : বাঘ? কোথায় দেখ্‌লি?

চন্দ্রিকা : (উগ্রাদিত্যকে দেখাইয়া) ঐ দাঁড়িয়ে! হালুম! ঐ দেখ, হাতে বাঘ-নখ, বাঘের মত গোঁফ, চোখ, মুখ শুধু ল্যাজটা হলেই পুরোপুরি বাঘ হয়ে যেত!

জয়ন্তী : তুই বড় দুষ্ট চন্দ্রিকা! ওর পেছনে দিনরাত অমন করে ফেউলাগা হয়ে লেগে থাকলে ও তাড়া কর্‌বে না?

চন্দ্রিকা : ফেউ কি সাধে লাগে দিদি? ফেউ ডাকে বলেই ত দেশের শিকারগুলো এখনও বেঁচে আছে। নইলে তোমার বাঘ এতদিন দেশ সাবাড় করে ফেল্‌ত।

জয়ন্তী : কিন্তু, ও ত আমার কাছে দিব্যি শান্ত হয়ে থাকে। ঐ দেখনা ওর বাঘ-নখ ওর বুকের ভিতর নিয়ে লুকিয়েছে!

চন্দ্রিকা : কি জানি দিদি, ঘোড়ার লাথি ঘোড়াই সইতে পারে! ও তোমার পোষা বাঘ কি না!

জয়ন্তী : উগ্রাদিত্য!

উগ্রাদিত্য : (তরবারি-মুষ্টি ললাটে ঠেকাইয়া অভিবাদন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল)

জয়ন্তী : (চন্দ্রিকার দিকে তাকাইয়া) দেখ্‌লি চন্দ্রিকা ও আজ আমার কাছে মাথা হেঁট করে অভিবাদন করলে না। ললাটে তরবারি ছুঁইয়ে সম্মান দেখালে। ও বলে, ওর শির ভূমি স্পর্শ করতে পারে শুধু তারির খড়্গে যে ওকে পরাজিত কর্‌বে।

চন্দ্রিকা : সে মহাষ্টমী কখন আসবে দিদি! আমার বড়্ডো সাধ, মহিষ-মর্দিনীর পায়ে মহিষ-বলি দেখ্‌ব!

জয়ন্তী : ছি চন্দ্রিকা! তুই বড়্ডো প্রগলভা হয়েছিস। উগ্রাদিত্য, তুমি এখন যাও, আমি দরকার হলে ডাক্‌ব। আর দেখ, চন্দ্রিকার উপর রাগ কোরো না। মনে রেখ, ও আমারই ছোট বোন।

উগ্রাদিত্য : জানি রানী! (আবার ললাটে তরবারি ছোঁয়াইয়া অভিবাদন করিয়া চন্দ্রিকার দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকাইয়া চলিয়া গেল।)

জয়ন্তী : আচ্ছা চন্দ্রিকা! এই যে ওকে রাতদিন অমন করে ক্ষেপাস, ধর ওরই সাথে যদি তোর বিয়ে হয়!

চন্দ্রিকা : বাঃ, দিদির চমৎকার পছন্দ ত! এ মুক্তোর মালা অমন জীবের গলাই ত ঠিক মানাবে।...আচ্ছা দিদি, ও অত নিষ্ঠুর কেন? যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছি, ও আহত সৈনিককেও হত্যা করতে ছাড়ে না! ও যেন বনের পশু। আদিম কালের বর্বর!

জয়ন্তী : ও সত্যই মৃত্যুর মত মমতাহীন। তাই ও জ্যান্ত আহত কারুর প্রতি কোনো মমতা দেখায় না। ওকে মারতে হবে–এইটাই ওর কাছে সত্য। ঐ হচ্ছে পরিপূর্ণ পুরুষ, চন্দ্রিকা। ওর মাঝে একবিন্দু মায়া নেই, করুণা নেই। ওর এক তিলও নারী নয়! –পশু, বর্বর, নির্মম পুরুষ!

চন্দ্রিকা : (হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গান করিতে লাগিল)

[গান]

বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে বাঁধ্‌ব গো।
পাষাণ বুকে নিঝর হয়ে কাঁদব গো ॥

কুলের কাঁটায় স্বর্ণলতার দুল্‌ব হার,
ফণীর ডেরায়, কেয়ার কানন ফাঁদ্‌ব গো ॥

ব্যাধের হাতে শুন্‌বো সাধের বংশী-সুর,
আস্‌লে মরণ চরণ ধরে সাধ্‌ব গো ॥

বাদল-ঝড়ে জাল্‌ব দীপ বিদ্যুৎলতার,
প্রলয়-জটায় চাঁদের বাঁধন ছাঁদব গো ॥

জয়ন্তী : আচ্ছা চন্দ্রিকা, সত্যি করে বল্ দেখি, ওর ওপর তোর এত আক্রোশ কেন? ওকে দেখতেও পারিসনে আবার ভুলতেও পারিসনে। ঘৃণা করার ছলে যে ওকে নিয়েই তোর মন ভরে উঠ্‌লো।

চন্দ্রিকা : (চমকিয়া উঠিয়া) সত্যিই ত দিদি, এমনি করেই বুঝি সাপের ছোবলে সাপুড়ের, বাঘের হাতে শিকারীর মৃত্যু হয়। (একটু ভাবিয়া) তা ও-সাপ যদি নাচাতেই হয় আমাকে, ওর বিষ-দাঁতগুলো আগে ভেঙে দেবো!

জয়ন্তী : ছি, ছি, শেষে ঢোঁড়া নিয়ে ঘর করবি?

চন্দ্রিকা : বিষ গেলে ওর কুলোপনা চক্র থাকবে ত। ফোঁস্-ফোঁসানী থাকলেই হল, লোকে মনে করবে জাত-গোখ্‌রো। (চলিয়া যাইতে যাইতে) সত্যি দিদি, আমার দিনরাত কেবলি মনে হয় ও কেন অমন বন্যপশু হয়ে থাকবে? ওকে কি লোকালয়ের মানুষ করে তোলার কেউ নেই? বড় দয়া হয় ওকে দেখলে। ও যেন সব চেয়ে নিরাশ্রয়, একা! ওর বন্ধু সাথি কেউ নেই! ঐ পাথুরে পৌরুষকে নারীত্বের ছোঁওয়া দিয়ে মুক্তি দিলে হয়ত মহাপুরুষ হয়ে উঠ্‌বে।

জয়ন্তী : হ্যাঁ, দস্যু রত্নাকর হঠাৎ বাল্মীকি মুনি হয়ে উঠ্‌বেন!

চন্দ্রিকা : বিচিত্র কি দিদি! সত্যি, বল ত, কেন এমন হয়? ও কেন এমন বর্বর হল শুধু এই চিন্তাটাই আমাকে এমন পীড়া দেয়। ওকে কেন এমন করে পীড়ন করি? বেচারা বুনো! (হাসিয়া উঠিয়া) এক একবার এমন হাসি পায়! মনে হয় আমার সমস্ত শরীরটা দাঁত বের করে হাস্‌ছে।

[গান]

তাহারে দেখ্‌লে হাসি, সে যে আমার দেখন-হাসি,
(ওগো) আমি কচি, সে যে ঝুনো, আমি ঊনিশ সে ঊন-আশি ॥

সে যে চিল আমি ফিঙে, আমি বাঁট সে যে ঝিঙে।
আমি খুশি সে যে খাসি, সে যে বাঁশ আমি বাঁশি।
ও সে যত রাগে, অনুরাগে পরাই গলে তত ফাঁসি ॥

জয়ন্তী : তুই তোর বাঁদরের চিন্তা কর! আমি চল্‌লুম, আমার অনেক কাজ আছে।

(প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্রিকা : আচ্ছা দিদি, আমি কি তোমার কোনো কিছু জানবার অধিকারী নই? তোমার অনেক কাজ আছে বললে, কিন্তু ঐ অনেক কাজের একটা কাজেও ত সাহায্য করতে ডাকলে না আমায়!

জয়ন্তী : (চন্দ্রিকার মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) পাগল! সবাই কি সব কাজের উপযুক্ত হয়! তোর প্রতি পরমাণুটি নারী, তাই শুধু হৃদয়ের ব্যাপার নিয়েই মেতে আছিস। আমার মধ্যে নারীত্ব যেমন, পৌরুষও তেমনি। তাই আমি এখন হাতে যেমন তরবারি ধরেছি, তেমনি সময় এলে চোখে বাণও হয়ত মারব। তুই আগাগোড়া নারী বলেই এই পা থেকে মাথা পর্যন্ত পশু উগ্রাদিত্যের এত চিন্তা করিস। আর আমি অর্ধ-নারী বলে পুরুষালি রাজ্যের চিন্তা নিয়ে মরি। তাই তুই হয়েছিস নারী, আর আমি হয়েছি রানী।

চন্দ্রিকা : (রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে) তুমি যা না তাই বলছ দিদি আমায়! আমার মরণ নেই তাই গেলুম ঐ বুনো জানোয়ারটাকে ভালবাসতে। আমি চল্‌লুম ফের তোমার বাঘকে খোঁচাতে।

[প্রস্থান]

জয়ন্তী : ওরে যাসনে। আঁচড়ে-কামড়ে দেবে হয়ত।...(ঐ পথে চাহিয়া থাকিয়া) পাগল! বদ্ধ পাগল!

[উগ্রাদিত্যের প্রবেশ]

উগ্রাদিত্য : আমার মনে ছিল না সম্রাজ্ঞী, আজ আমাদের অগ্নি-উৎসবের রাত্রি।

জয়ন্তী : আমার মনে আছে সেনাপতি। কিন্তু এবার এ নৃত্যে যোগদান করব শুধু আমি আর আমার যোগিনীদল। তুমি আমার সব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঐ পার্বত্য-গিরিপথ রক্ষা করবে। আমাদের এই উৎসবের সুযোগ নিয়ে শত্রুরা যেন আমাদের আক্রমণ করতে না পারে।

[উগ্রাদিত্যের পূর্বরূপ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান]

জয়ন্তী : কোথায় লো যোগিনীদল! আয়, আজ যে আমাদের অগ্নিবাসর।

[গান করিতে করিতে অগ্নিশিখা রঙের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া যোগিনীদলের প্রবেশ]

[গান]

যোগিনী দল : জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টীকা ॥

দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী
বিশ্ব-দাহন-তেজে জাগো দাহিকা ॥

ধূ ধূ জ্বলে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি!
জাগো মাতা কন্যা বধূ জায়া ভগ্নি!

পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা।
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা ॥

জয়ন্তী : আমি আগুন, তোরা সব আমার শিখা! আজ ফাল্গুন-পূর্ণিমা–আমার জন্মদিন। আগুনের জন্মদিন। এম্‌নি ফাল্গুন-পূর্ণিমায় প্রথম নারীর বুকে প্রথম আগুন জ্বলেছিল। সে আগুন আজও নিব্‌ল না! কত ঘরবাড়ি বনকান্তার মরুভূমি হয়ে সে অগ্নিক্ষুধার ইন্ধন হলে, তবু তার ক্ষুধা আর মিট্‌ল না। ও যেন পুরুষের বিরুদ্ধে প্রকৃতির যুদ্ধ-ঘোষণার রক্ত-পতাকা। নরের বিরুদ্ধে নারীর নিদারুণ অভিমান-জ্বালা।

[গান]

যোগিনী দল : জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টীকা ॥

জয়ন্তী : হাঁ, মীনকেতু গর্ব করে ঘোষণা করেছিল, সে নিখিল পুরুষের প্রতীক। যৌবন-সাম্রাজ্যের সম্রাট। ফুল আর হৃদয় দলে চলায় নাকি ওর ধর্ম। ওকে আমি জানাতে চাই যে, যৌবন শুধু পুরুষেরই নাই। ওদের যৌবন আসে ঝড়ের মত, তুফানের মত বেগে; নারীর যৌবন আসে অগ্নিশিখার মত রক্তদীপ্তি নিয়ে। আমি জানাতে চাই, পুরষের পৌরুষ দুর্দান্ত যৌবনকে যুগে যুগে নারীর যৌবনই নিয়ন্ত্রিত করেছে। নারীর হাতের লাঞ্ছনা-তিলকই ওদের নিরাভরণ রূপকে সুন্দর করে অপরূপ করে তুলেছে। মীনকেতু যদি হয় নিখিল পুরুষের প্রতীক, আমিও তাহলে নিখিল নারীর বিদ্রোহ ঘোষণা–তার বিরুদ্ধে–নিখিল পুরুষের বিরুদ্ধে।

[যোগিনীগণের অগ্নিনৃত্য]

[গান]

যোগিনী দল : জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা–

[দূরে তূর্য-নিনাদ, সৈনিকদলের পদধ্বনি, জয়ধ্বনি ও গান]

জয়ন্তী : ঐ উগ্রাদিত্য চলেছে আমার অজেয় মরুসেনা নিয়ে। চল আমরা দূরে দঁড়িয়ে ওদের জয়-যাত্রার ঐ অপরূপ শোভা দেখি গিয়ে। বিরাট-সুন্দরকে দেখতে হলে দূর থেকেই দেখতে হয়, নইলে ওর পরিপূর্ণ রূপ চোখে পড়ে না।

[জয়ন্তী ও যোগিনীদলের প্রস্তান]

[গান ও মার্চ করিতে করিতে যশল্মীর-সেনাদলের প্রবেশ]

টলমল টলমল পদভরে–
বীরদল চলে সমরে ॥

খর-ধার তরবার কটিতে দোলে,
রণন ঝনন রণ-ডঙ্কা বোলে।
ঘন তূর্য-রোলে শোক মৃত্যু ভোলে,
দেয় আশিস সূর্য সহস্র করে ॥

চলে শ্রান্ত দূর পথে
মরু দুর্গম পর্বতে
চলে বন্ধু-বিহীন একা
মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক-লেখা!
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী একি বলিদান,
জাগে নিশঙ্ক শঙ্কর তাজিয়া শ্মশান!
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছ ডরে।

তৃতীয় অঙ্ক

[গান্ধার রাজ্যের প্রমোদ-প্রাসাদ। মধুশ্রবা, তরুণী কিশোরীর দল, রঙ্গনাথ, কাকলি প্রভৃতি আসীন। মীনকেতু তখনো আসেনি; বৈতালিকের গান।]

[গান]

বৈতালিক : আসিলে কে অতিথি সাঁঝে।
পূজার ফুল ঝরে বন-মাঝে ॥
দেউল মুখরিত বন্দা-গানে
আকাশ-আঁখি চাহে মুখপানে,
দোলে ধরাতল দীপ-ঝলমল
নৌবতে ভূপালি বাজে ॥

[হাসিতে হাসিতে মীনকেতুর প্রবেশ। তরুণী ও কিশোরীদলের নৃত্য ও গান]

[গান]

তরুণী ও কিশোরীরা : মাধবী-তলে চল মাধবিকা দল
আইল সুখ-মধুমাস
পিককুল কলকল অবিরল ভাষে,
মধুপ মদালস পুষ্প-বিলাসে,
বেণু বনে ব্যাকুল উছাস ॥

তরুণ নয়ন সম আকাশ আ-নীল
তট-তরু-ছায়া ধরে নীর নিরাবিল,
বুকে বুকে দীরঘ নিশাস ॥

[গীত-শেষে কাকলি পরিপূর্ণ সুরার পাত্র আগাইয়া দিল]

মীনকেতু : (সুরার পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফিরাইয়া দিয়া) শুধু সুরা নয় কাকলি, সুরার সঙ্গে সুর চাই। তোমার বাণী বিনিন্দিত কণ্ঠের সুর। আজ যে আমার তাকেই দেখার দিন, যাকে কখনো দেখিনি।

[গান]

কাকলি : গহীন রাতে–
ঘুম কে এলে ভাঙাতে
ফুলহার পরায়ে গলে,
দিলে জল নয়ন-পাতে ॥

যে জ্বালা পেনু জীবনে
ভুলেছি রাতে স্বপনে,
কে তুমি এসে গোপনে
ছুঁইলে সে বেদনাতে ॥

যবে কেঁদেছি একাকী
কেন মুছালে না আঁখি
নিশি আর নাহি বাকি
বাসি ফুল ঝরিবে প্রাতে ॥

[সাধারণ নাগরিকের শ্বেতবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তরবারি শূন্য খাপ হস্তে সেনাপতি চন্দ্রকেতুর প্রবেশ]

মীনকেতু : (উঠিয়া পড়িয়া) একি! সেনাপতি? শ্বেত পতাকা জড়িয়ে এসেছ বন্ধু!

চন্দ্রকেতু : (মীনকেতুর পদতলে তরবারির খাপ রাখিয়া) সম্রাট! আমি আর সেনাপতি নই। আজ হতে আমার নাম শুধু চন্দ্রকেতু। আমার আর সেনাপতিত্ব করবার অধিকার নেই। আমি পরাজিত হয়েছি। পরাজিতের গ্লানি ভুলবার একমাত্র উপায় যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তাই স্বেচ্ছায় আমি নিজকে চির-নির্বাসন দণ্ড দিয়েছি। আজ আর আমার মনে কোনো গ্লানি নাই, মৃত্যু-লোকের পথ রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আমি অমৃত লোকের পথের দিশা পেয়েছি।

মীনকেতু : জিজ্ঞাসা করতে পারি কি বন্ধু, তোমার এই অমৃত-লোকের পথের দিশারীটি কে?

চন্দ্রকেতু : আমার, না–একা আমার কেন–সর্বলোকের বিজয়িনী এক নারী। তার নাম আমি কর্‌ব না। আজ আমি সত্যই বুঝতে পেরেছি সম্রাট, হৃদয়ের রণ-ভূমিতে যে জয়ী হয়, শত যুদ্ধজয়ের সেনাপতির চেয়েও সে বড়। হৃদয় জয় করতে না পারার বেদনা আমার বাহুকে যে এমন শক্তিহীন করে তুলবে, এ আমার কল্পনারও অতীত ছিল।

মীনকেতু : (চন্দ্রকেতুর পিঠ চাপড়াইয়া) দুঃখ কোরো না বন্ধু, ও পরাজয়ের মধুর আস্বাদ একদিন তোমাদের মীনকেতুকে–এই যৌবনের সম্রাটকেও পেতে হবে! সুন্দর হাতের পরাজয় কি পরাজয়? কিন্তু সেই বিজয়িনীর কাছে তুমি পরাজিত হলে অস্ত্রের যুদ্ধে, না বিনাঅস্ত্রের যুদ্ধে?

চন্দ্রকেতু : (ম্লান হাসি হাসিয়া) দুই যুদ্ধেই সম্রাট, যদিও ওখানে বিনাঅস্ত্রের যুদ্ধ করতে যাইনি। আমার সৈন্য নিয়ে গৈরিকস্রাবের মত যশল্মীর-সৈন্যের উপর গিয়ে পড়লুম। প্রায় পরাজিতও করে এনেছিলুম, এমন সময় আষাঢ়ের মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত দীপ্তি নিয়ে এল জয়ন্তী-যশল্মীরের অধীশ্বরী। এতরূপ আমি আর দেখিনি। এইটুকু দেহের আধারে এতরূপ কি করে ধরল, সকল রূপের স্রষ্টাই বল্‌তে পারেন। ও যেন বিশ্বের বিস্ময়। কিন্তু রূপের চেয়েও সুন্দর তার চোখ। ও চোখে যেন সূর্য-চন্দ্র লুকোচুরি খেল্‌ছে।

মীনকেতু : বড় বাড়িয়ে বলছ চন্দ্রকেতু। তারপর কি হল বল।

চন্দ্রকেতু : আমি তখনও সেনাপতি উগ্রাদিত্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত। জয়ন্তী যেমন অপরূপ সুন্দর, উগ্রাদিত্য তেমনি ভীষণ কুৎসিত। ওর শরীরে যেন সকল পশুর সকল দানবের শক্তি। ও যেন নিখিল অসুরের প্রতীক। বুঝলাম, দেবী-শক্তির সঙ্গে দানব-শক্তি মিশেছে এসে। এ শক্তি অপরাজেয়।

মীনকেতু : (অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে করিতে) হাঁ, এখন বুঝতে পেরেছি ও শক্তির উৎস কোথায়?

চন্দ্রকেতু : হয়ত-বা উগ্রাদিত্যের হাতেই পরাজিত হতুম, কিন্তু সে লজ্জা থেকে বাঁচালে এসে জয়ন্তী। সে উগ্রাদিত্যকে সরিয়ে দিয়ে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, 'তুমি ত এ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না সেনাপতি; তুমি ফিরে যাও।' আমি বললুম, 'আমি যুদ্ধস্থল থেকে কখনো পরাজয় নিয়ে ফিরিনি।' সে হেসে

বললে, 'তুমি হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত-বিক্ষত। আহত সেনানীকে আমার সেনানীর আঘাত করতে বাধে না, কিন্তু আমার বাধে! তোমার চোখ ত সৈনিকের চোখ নয়, ও চোখে মৃত্যু-ক্ষুধা কই, ও যে প্রেমিকের চোখ হতাশার বেদনায় ম্লান!" আমি যেন এক মুহূর্তে ঐ নারীর মনের আরশিতে আমার সত্যকার আহত মূর্তি দেখতে পেলাম। আমার হাত হতে তরবারি পড়ে গেল।

মীনকেতু : (অভিভূতের মত) হাঁ, এই সেই! এই সেই বিজয়িনী। আমার যেন মনে পড়ছে স্বর্গে আমি ছিলুম পঞ্চশর, শিবের অভিশাপে এসেছি মর্ত্যলোকে। ঐ বিজয়িনী ও জয়ন্তী নয়, ও রতি! (হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া) তা নয়, তা নয়। হাঁ, তারপর চন্দ্রকেতু, তুমি ফিরে এলে? ভ্রষ্ট তরবারি আবার কুড়িয়ে নিলে না?

চন্দ্রকেতু : ভ্রষ্টা শক্তিকে আর গ্রহণ করিনি। ওকে চিরকালের জন্য ঐ রণক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়ে এসেছি।

মীনকেতু : (হাসিয়া উঠিয়া) ভুল করেছ বন্ধু! রামের মতই রামভুল করে বসেছ! ও-শক্তি ভ্রষ্টা নয়, ও সীতার মতই সতী।

চন্দ্রকেতু : এইবার তারই অগ্নি-পরীক্ষা হবে! কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও লোকলজ্জায় ওকে গ্রহণ করতে পারব না। আমাদের মাঝে চির-নির্বাসনের যবনিকা পড়ে গেছে।

[সহসা দশদিক আলোময় হইয়া উঠিল। যশল্মীর–রাজ্যেশ্বরী জয়ন্তী ও সেনাপতি উগ্রাদিত্যের প্রবেশ ও শঙ্খ তূর্য-ধ্বনি।]

জয়ন্তী : (চন্দ্রকেতুর পানে তরবারি আগাইয়া দিয়া) না সেনাপতি! ওকে নির্বাসন দিলে রামের মত তোমারও চরম দুর্গতি হবে। এই ধর তোমার পরিত্যক্তা শক্তি। আমি অগ্নিশিখা। ওর অগ্নি-শুদ্ধি হয়ে গেছে।

চন্দ্রকেতু : (বিস্ময়-অভিভূত কণ্ঠে চমকিত হইয়া) সম্রাট! সম্রাট এই–এই সেই মহীয়সী নারী। এই জয়ন্তী!

[মীনকেতু তরবারি মোচন করিয়া জয়ন্তীর দিকে এবং জয়ন্তীও মীনকেতুর দিকে অভিভূতের মত বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। দূরে মধুর সুরে বংশী বাজিয়া উঠিল। সহসা মীনকেতুর হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। উগ্রাদিত্যের চক্ষু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত জ্বলিতে লাগিল।]

উগ্রাদিত্য : রাণী, আমি কি এদের বন্দি করতে পারি?

জয়ন্তী : উগ্রাদিত্য, পরাজিত হলেও ইনি সম্রাট। ওঁর সম্মান রেখে কথা বল।

উগ্রাদিত্য : মার্জনা কর রাণী, যে পরাজিত হয় তার বন্দি ছাড়া আর কোন সংজ্ঞা নেই। সম্রাট হলেও সে বন্দি।

জয়ন্তী : বন্দি করতে হয়, আমি নিজ হাতে বন্দি করব।

মীনকেতু : তুমি কোন্ পথ দিয়ে এলে রাণী?

জয়ন্তী : তোমার পরাজয়ের পথ দিয়ে সম্রাট! এখন তুমি কি স্বেচ্ছায় বন্দি হবে, না যুদ্ধ করবে?

মীনকেতু : যুদ্ধ? কার সাথে যুদ্ধ রাণী! যেদিন তুমি আমার রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করেছ, সেদিনই ত আমার পরাজয় হয়ে গেছে।

জয়ন্তী : শুধু ঐটুকুতেই শেষ হবে না সম্রাট। তোমাকে চরম পরাজয়ের লজ্জা স্বীকার করতে হবে আমার কাছে–নারীর শক্তির কাছে। তোমাকে শিকল পরতে হবে এবং সে শিকল সোনার নয়!

মীনকেতু : সুন্দর হাতের সোনার ছোঁয়ায় লোহার শিকলই সোনা হয়ে উঠ্‌বে। (হাত আগাইয়া) বন্দি কর, রাণী!

জয়ন্তী : কিন্তু বিনা যুদ্ধে তুমি হার মানবে? আমার কাছে না-হয় হার মানলে কিন্তু ঐ উগ্রাদিত্য, আমার সেনাপতি–ওর কাছেও কি পরাজয় স্বীকার করবে।

মীনকেতু : (উগ্রাদিত্যকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া) ও কে? ওকে ত দেখিনি! ও ত এ পৃথিবীর মানুষ নয়।

উগ্রাদিত্য : (হিংস্র হাসি হাসিয়া) আমি পাতাল-তলের দৈত্য, সম্রাট! আজ তোমাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতেই হবে। আজ আমাদের শক্তি পরীক্ষার দিন।

মীনকেতু : (জ্বলন্ত চোখে উগ্রাদিত্যের দিকে চাহিয়া) হাঁ। ওর সাথে যুদ্ধ করা যায়! ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত অপরাজেয় পৌরুষের গঠনে মোড়া! হাঁ, সত্যকার পুরুষ দেখ্‌লুম! আমার সমস্ত মাংস-পেশী ওকে দেখে লোহার মত শক্ত হয়ে উঠ্‌ছে। শিরায় শিরায় চঞ্চল রক্তের উন্মাদনা জেগে উঠ্‌ছে। নিশ্চয়ই! তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব সেনাপতি। কিন্তু কি পণ রেখে যুদ্ধ করবে তুমি?

উগ্রাদিত্য : (হিংস্র আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। জয়ন্তীকে দেখাইয়া) আমার পণ এই অমৃত-লক্ষ্মী সম্রাট। যার লোভে আমি পাতাল ফুঁড়ে ঐ অমৃতলোকে উঠে গেছি শক্তির ছদ্মবেশে। তাকে যদি আজ জয় করতে না পারি তাহলে আমার তোমার হাতে মৃত্যুই তার উপযুক্ত শাস্তি।

জয়ন্তী : (দৃপ্তকণ্ঠে) উগ্রাদিত্য! তুমি তাহলে ছদ্মবেশী লোভী, শক্তিধর নও।

উগ্রাদিত্য : আজ আমি সত্য বল্‌ব রানী। আমি অসুর-শক্তি নই, আমি লোভ-দানব। আমার বাহুতে যে অমিত শক্তি, তা আমার ঐ অপরিমাণ ক্ষুধারই কল্যাণে। আজ আমার সত্য প্রকাশের চরম মুহূর্ত উপস্থিত!

জয়ন্তী : মিথ্যাচারী! (মীনকেতুর পতিত তরবারি তুলিয়া মীনকেতুর হাতে দিয়া) আর আমার ভয় নেই সম্রাট, তুমি জয়ী হবে। ও শক্তির প্রতীক নয়, ও লোভীর ক্ষুধাজীর্ণ মূর্তি, তোমার এক আঘাতেই ও চূর্ণীকৃত হয়ে যাবে।

উগ্রাদিত্য : কি সম্রাট, তুমি কি ঐ বিক্ষিপ্ত অস্ত্রই গ্রহণ করবে, না রিক্তহস্তে আত্মরক্ষা করবে?

মীনকেতু : (হাসিয়া) আমি চন্দ্রকেতু নই, উগ্রাদিত্য। আমারি শিথিল মুষ্টির জন্য যে শক্তি পতিত হয়, তাকে আবার হাতে তুলে নিতে আমার লজ্জা নেই। তুমি লোভ-দানব, তোমার উদরে দশ মুখের ক্ষুধা, হস্তে বিশ হস্তে লুণ্ঠন আর প্রহরণশক্তি। তোমার সঙ্গে অহিংসযুদ্ধ করা চলে না। আমি অস্ত্র গ্রহণ করলুম।

উগ্রাদিত্য : তোমার পণ?

মীনকেতু : আমারও পণ ঐ অমৃত-লক্ষ্মী। (মীনকেতু চতুর্থ বার তরবারি আঘাত করিতেই উগ্রাদিত্য পড়িয়া গেল)

জয়ন্তী : (সহসা কাঁপিয়া উঠিয়া) সম্রাট! মীনকেতু! ওকি করলে তুমি, তোমায় দিয়ে একি করালুম আমি? ও যে আমার শক্তি, লোভ, ক্ষুধা, সব–ঐ লোভ, ঐ ক্ষুধার শক্তি নিয়েই যে তোমায় জয় করতে বেরিয়েছিলুম। উঃ! মীনকেতু! আজ আমার প্রথম মনে হচ্ছে, আমি রাজ্য শাসনের রানী নই, অশ্রুজলের নারী।

[চন্দ্রিকার প্রবেশ]

চন্দ্রিকা : একি! এ কোথায় এলুম! এই কি অন্ধপতির প্রেমে-অন্ধ গান্ধারীর দেশ। এই কি হৃদয়ের সেই চির-রহস্যময় পুরী? ওরা কারা দাঁড়িয়ে? মূক, মৌন, ম্লান। ঐ কি আলেয়ার পিছনে ঘুরে-মরা চির-পথিকের দল? ওরা সব যেন চেনা! ওদের কোথায় কোন্ লোকে যেন দেখেছি। (পতিত উগ্রাদিত্যকে দেখিয়া) ও কে?–দিদি? আর এ কে? – অ্যাঁ! উগ্রাদিত্য? এখানে এত রক্ত কেন? (আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া) উগ্রাদিত্য! কে তোমায় হত্যা করলে? দিদি! দিদি!

মীনকেতু : (শান্ত স্বরে) দেবী! উগ্রাদিত্যকে আমিই হত্যা করেছি! ও দৈত্য, অমৃত পান করতে এসেছিল! ওই ওর নিয়তি!

জয়ন্তী : চন্দ্রিকা! উগ্রাদিত্য চলে গেছে আমার সকল শক্তি অপহরণ করে। তুই পারবি চন্দ্রিকা ওকে বাঁচাতে তোর তপস্যা দিয়ে? নইলে আমি বাঁচব না! ওকে বাঁচাতেই হবে।

চন্দ্রিকা : দিদি! ওকে নিয়ে তোমার চেয়ে আমার প্রয়োজনই যে বেশি। ওকে না বাঁচালে আমাদের পৃথিবী যে চির-সন্ন্যাসিনী হয়ে উঠবে। এর জন্য যদি মৃত্যু-রাজার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাও দাঁড়াব গিয়ে! সাবিত্রীর মত আমার এই শবের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার তপস্যা আজ হতে শুরু হল। আজ হতে আমার নাম হবে কল্যাণী!

জয়ন্তী : (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) আশীর্বাদ করি, তুই রক্ষকুলবধূ প্রমীলার মত স্বামী সোহাগিনী হয়ে সহমরণ নয়, সহজীবন লাভ কর! (মীনকেতুকে নমস্কার করিয়া) বন্ধু! নমস্কার! আমি তোমায় বন্দি করতে এসেছিলুম, হয়ত-বা বন্ধন নিতেও এসেছিলুম। কিন্তু সে বন্ধন আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ছিন্ন হয়ে গেল! উগ্রাদিত্যের মৃত্যুর সাথে সাথে আমার হৃদয়ের সকল ক্ষুধা, সকল লোভের অবসান হয়ে গেল। আমি আজ রিক্তা সন্ন্যাসিনী! (একটু থামিয়া) আমি এই সুদূর পৃথিবীতে সন্ন্যাসিনী হতে আসিনি। বধূ হবার, জননী হবার তীব্র ক্ষুধার আগুন জ্বেলে তোমাকে জয় করতে এসেছিলুম। তোমাকেও পেলুম কিন্তু বুকের সে আগুন আমার নিভিয়ে দিয়ে গেল উগ্রাদিত্য!

মীনকেতু : জয়ন্তী! তুমিও কি তবে ওকে ভালোবাসতে? তাহলে জয় করেও কি আমার পরাজয় হল? উগ্রাদিত্য মরে হল জয়ী! যাকে পণ রেখে জয় করলুম–সে কি আপন হল না?

জয়ন্তী : কায়াহীন ভালোবাসা নিয়ে যারা তৃপ্ত হয়, তুমি ত তাদের দলের নও মীনকেতু। তুমি চাও জয়ন্তীকে, এই মুহূর্তের রিক্তাকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না। যে তেজ যে দীপ্তির জোরে তোমায় জয় করলুম–সেই ত ছিল উগ্রাদিত্য। তোমার হাতে তার পতন হয়ে গেছে! বন্ধু! বিদায়!

মীনকেতু : (আর্তকণ্ঠে) জয়ন্তী আর কি তবে আমাদের দেখা হবে না?

জয়ন্তী : হয়ত হবে, হয়ত-বা হবে না! যদি আমার মনে আবার সেই ক্ষুধা জাগে, যদি ঐ উগ্রাদিত্য প্রাণ পায়, কল্যাণীর সিঁথিতে সিঁদুর ওঠে, আমি আবার আস্‌ব। সেনাপতি নমস্কার!

[প্রস্থান]

মীনকেতু : (উন্মাদের মত চিৎকার করিয়া উঠিল) জয়ন্তী! জয়ন্তী!

[দূর হইতে জয়ন্তীর স্বর-ভাসিয়া আসিল "মীনকেতু"]

[যবনিকা]

Elf-Fire

Dedication

To the eternal dancing partner of Nataraj, the lord of dance, in the names of all actors and actresses, I dedicate "Aleya."

On this earth of dust, love is an Aleya. It is born in the wetlands of a moist heart. Its dharma is to lead the lost traveler astray from the path. The suffering soul, like a moth, leaps into its licking flame.

Three men, three women—symbols of the eternal man and woman—were consumed by this fire, and this lyrical drama is about them.

Three Men

Minaketu: Beautiful in form.

Chandraketu: Beautiful to women, beautiful in renunciation.

Ugraditya: Drunk with power.

Three Women

Krishna: The eternally failed lover, who could not love anyone in her life—this is her ultimate sorrow.

Jayanti: She possesses the very fire and power that makes a woman a queen.

Chandrika: The eternally vibrant, flower-like woman who only wants to love a masculine, hard-edged man. She is the forest beauty after the desert, the well-being after a conflict. In her penance, a brute becomes a human, and a traveler on the path of death finds life.

A woman's heart—her love is a mirage. This, too, is an Aleya. When she will lead them astray, when she will desire whom—this is shrouded in the darkness of eternal mystery.

The one she has always neglected, she wants back after he has gone. The one she has always desired is then left behind by her departing rival.

Cast of Characters:
Minaketu: King of Gandhara
Chandraketu: His commander-in-chief
Krishna: His chief minister
Kakoli: The chief singer
Ranganath: His companion
Madhushrava: The court poet
Jayanti: Queen of Yasholashmir
Chandrika: Her younger sister
Ugraditya: Her commander-in-chief
Soldiers, beautiful women of the pleasure garden, Yoginis, etc.

Prologue
[A dark night. The light of the Aleya flickers on and off. A lost traveler, chasing after it, loses his way... A song of the lost traveler as he dances after the Aleya and follows its lead.]

Traveler:
It calls to me always in my dreams,
Lighting a desperate, secret gleam.
I don't know what spells this sorceress weaves,
my heart is just pulled by what it perceives.
I wander and die in this dark, endless cave.
A hundred travelers, by her beauty, she deceives,
In a hundred forms, in a hundred songs.
Her flute plays on every path,
That tune makes all minds yearn in its aftermath.
It burns with a magical, pensive heat.
[The traveler exits, finishing his song. Two butterflies enter, singing and dancing.]
Two Butterflies:
The flower-light trembles, its hundred petals gleam,
Shimmering, shimmering,
Come, O come, let's spread our wings,
Colored, light, and quick on the stream.
If these wings burn away in the flame,
What's the loss? We came only to burn in the name of love.

In the forest of thorns, we pick the flower,
Our fingers tied to that lovely wayward path,
Where sweet petals fall.
We crush flowers as we walk, He who wants to deceive her,
On that path we walk,
On that path where the Aleya deceives.

[At the end of the song, as the two butterflies approach the Aleya, it goes out. As it extinguishes, several crimson-clad, lotus-like young women appear. The two butterflies see them and fly towards them. A song by the butterflies and the young women.]

Young Women: We blossom, my love, look, In hope of you.

First Young Woman: I am stained with passion, I am on a rose branch.

Second Young Woman: I am the pride of the forest locks, I am a forest flower.

Third Young Woman: I am the golden-colored rice flower, I am the sixteenth-day lotus.

Fourth Young Woman: I am in the Champa flower braid.

Two Butterflies: The Aleya is extinguished, the path is dark. Did you come to deceive our hearts?

Young Women: We are the unextinguishable flame,

We are flower-colored, we are light.

Two Butterflies: We do not want love, we want

The mesmerizing illusion.

[After the song, the two butterflies and the young women walk away, pushing aside the curtain of darkness and revealing the glow of the dawn.]

Act I

[The pleasure garden and court of the Gandhara King. In the background, a mountain range. A waterfall flows down the side

of the mountain. Not far away, the Gandhara Royal Palace... The night is turning to dawn. On the mountaintop, the pale moon of the seventh day of the fortnight. Slowly, the crimson hue of the dawn appears. The color is reflected in the waterfall, looking as beautiful as a melted rainbow... In the verandah of the pleasure garden, tired from a night of revelry, the emperor's young female companions sleep with their arms as pillows. Suddenly, a flute plays a morning tune at the palace gate. The sleeping young women startle awake and, with sleepy eyes, begin to straighten their clothing.]

[The morning breeze enters, singing and dancing.]

Morning Breeze: The night is over, open your eyes, my love, The birds are calling at your bower's door.

Listen to that flute playing far away, in a sleep-breaking tune, Open the door and welcome your love.

[Exits.]

[Song by the beautiful young women.]

Beautiful Women:

O morning breeze, did you come to break our sleep,
Kissing our eyelids?
To speak in a whispering, murmured language to our secretive hearts?
We cleanse our bodies with dewdrops,
And bring a handful of flowers,
As if the world is a flower vase,
Filled with flowers,
In the great court of cosmic beauty.

[Suddenly, the sound of a conch shell is heard. The chief singer Kakoli walks away, singing.]

Kakoli:

O young women, wake up, wake up, the night is over,
Open the door to the leafy bower for the southern breeze.
Slowly, slowly, it awakens the youth in our bodies,

And like a wandering youth, it will go away.
[Exits.]
[Song by the beautiful young women.]
Beautiful Women:

We know that cruel one, we know him.

He tramples hearts and wins them.

Don't break, don't break the drowsy spell.

In the spring, he comes, the flower-scented thief.

[A little later, Emperor Minaketu enters laughing, followed by the court poet Madhushrava.]

Minaketu: (Gently tapping the cheeks and lips of some young women with his finger, undoing some of their braids, and pulling others, looking at them with a lustful gaze) Beautiful! What do you say, Poet?

Poet: Not just beautiful, Emperor, but wondrous! The flower on that vine is beautiful, but this petal of beauty is wondrous!

Minaketu: (Slapping the poet's back) Well said, Poet, well said! This is truly wondrous!—You know, Poet, not all of them are from my country, they are a hundred flowers from a hundred lands. I have collected them for my pleasure garden after much searching. (Seeing the waterfall flowing down the mountain in the background) That wild waterfall behind me, and in front of me, a similar lively stream of youth—I stand in the middle, a thirsty, desirous man, a god of youth. (Pacing) I want—I want—

Poet: "We know, drunk, you run towards the underworld—"

Minaketu: Yes, you are right, Poet, I want to fill my eyes with beauty, my cup with wine. (Suddenly laughing, he goes to the young women) Who are you, girl? Are you a rose from Basra? Ah, what a color, what a bloom, the red glow on your lips and cheeks is as if it is dripping... And you—are you an Iranian Narcissus? Yes, your eyes are like the petals of a Narcissus! Your eyebrows are not eyebrows, but bent swords; and beneath them, those glittering eyes are like the blade of the sword! Oh, and they've been sharpened with black kohl! One look and there's no escape! (Puts his hand on his chest) It goes straight through! (Turning to

another) Oh, and who are you, beauty? Are you the Shefali from Bengal? (Sighs theatrically) Your beauty is like the Shefali flower, and your soul is as red with pain as the stem of the Shefali! — And you? Are you the moon-jasmine from distant China? You are so beautiful, but why are you as pale as the morning moon? Oh! Is it that your heart doesn't feel at home here? Well, what can you do, you have to stay, there's no other way! I want you! Sing, sing a song of staying! A song that makes the morning flower forget the afternoon, the morning night forgets the sunrise; the forest bird forgets the way to its nest — that is the song.

[Song and dance by the beautiful women.]

Beautiful Women:

The river of youth flows, rippling, rippling.

The young earth trembles, swaying, swaying.

Release the bond of the shore,

Come, who will make us swing?

The waves rise in the ocean of life, echoing, echoing.

On every shore, with bracelets and anklets, a song rises,

Laughter on the face, a crematorium in the heart.

Even today, the young earth shimmers with color and beauty,

Overflowing with form and rasa.

[Krishna enters, looking crestfallen.]

Minaketu: Who is that? Krishna? The chief minister — and at such an unusual hour!

Krishna: I have come to interrupt your joy with an important matter of state, Emperor!

[The court poet, who was until now going from one flower to another looking at something, starts in surprise upon hearing Krishna's voice.]

Poet: In this court of flowers, a minister from the royal court should not have come, O Goddess!

Minaketu: (Laughing) You are right, Poet, just as I have come here as Minaketu — not as the Emperor.

Krishna:

I, too, come to the garden of flowers, Poet! But not with the pomp and ceremony you all have. I am Krishna, the night! I come in silence, and go in silence! Perhaps it is in the dew of my eyes that the flowers of your garden blossom! (Looking at the Emperor) Can I go now, Emperor?

Minaketu:

Speak of matters of state in the royal court, Krishna, not here.

But! Since you have come, you might as well get a little touch of the floral breeze.

Oh, I forgot, that might make your minister's mask fall off and reveal Krishna's face!

The veil of night would come off, and the moonlight would blossom!

Krishna: (In a slow, steady voice) Shouldn't the Emperor know that this behavior towards his chief minister in front of these dancers diminishes the dignity of us all.

[The young women and girls, at a sign from the Emperor, bow and leave.]

Minaketu: (Taking Krishna's hand) They are not dancers, Krishna, they are my companions of pleasure. I come to this pleasure garden to enjoy with them, removing the mask of royal dignity.

Krishna: (Pulling her hand away) I know, Emperor, that to insult the female race, you have made me, a woman, and the chief minister of your kingdom, mocking me! Or maybe this is one of your whims! But, Emperor, what is a game for you might be death for another!

Minaketu: (Laughing) You can't even tolerate a little humor these days, Krishna. I see that the old men, whom I chased away from the country for fear of their bearded, serious faces, have gathered and taken refuge in your mind. I am afraid to look at your face; I feel like as soon as I look up, I'll see a bazaar of beards on your face.

Poet: That's how old age takes its revenge, Emperor. The beard on the face becomes a burden in the heart.

[Song.]

Old age has come to the court of young royalty.

With a hunched back, carrying a load,

Oh, with a hand that holds the earth and lips that are a stump.

The whole creation is now filled with the vision of that old man holding a short stick.

The grandchildren of those old men, they speak like buffaloes,

In the dark night! Smoking the hookah, their mouths are like an oven,

Not even a bud of emotion moves.

My brothers, say "Hari," the pot's rope, they hang it on their own necks.

Minaketu: (Laughing) You are right, Madhushrava, it seems it's not so easy to chase away old age and tradition. I see that those people with old minds, whom I left in a retirement home outside the empire to start a market of youth, are starting to return? Look, Krishna, at Krishna, I can't be serious in front of young women. Is there anything more laughable than showing royal dignity in front of beauty? Suppose, on such a beautiful morning, I spend it talking about matters of state in front of these blooming flowers and these young women in their prime—Oh, Krishna, why are you laughing?

Krishna: Forgive me, Emperor! I too sometimes get carried away by the wave of your joyful laughter, forgetting that you are our magnificent Emperor, and I am his chief minister. (Sighs deeply) It feels as if you are my childhood friend from those forgotten days!

Poet: Emperor, when one person's face moves toward another's ear, it is both proper and polite for a third person to move away to avoid an awkward situation.

[Exits.]

Minaketu: (Laughing, looking at the poet—then turning to Krishna)

You know me, Krishna.

When I sit on the throne, I am that—as you all say—dignified Emperor.

When I fight on the battlefield, I am a blood-mad commander.

But in a beautiful flower garden,

I am also a devotee of beauty, maybe even a poet.

Where it's just you and I, call me by my childhood name, just as you did then!

Krishna: I don't know what you are! I have seen you for so long, yet I still haven't been able to understand you. You are as distant as the moon in the sky, so beautiful, yet stained with a spot.

Minaketu: Even so, it is that distant, flawed moon that makes the seven seas of the earth rise and fall in its tides day and night!

Krishna: That's true. Such is your pull. (Thinks for a moment) Well, Minaketu, do you remember if you ever loved anyone?

Minaketu: (Laughing) Whom does the moon love, Krishna?

Krishna: That flawed moon, it probably loves no one.

Minaketu: (Clapping his hands) You're right, Krishna, everyone loves that flawed one, but he loves no one!

[A girl enters, singing as she walks.]

Girl:

Why did you break my sleep, my love,

If you were to trample me with your feet?

Why would the uselessly blossomed flower wither away?

I was a lone forest flower, sleeping in the woods.

You were a forgetful, innocent youth,

Why did you awaken the pensive youth of your bride?

My love, O my love—

Why did you stain the sky and the wind with the color of my pain?

Girl: King, last night you made me blossom with your passion. I have come to give you the offering of that blossomed flower. You said...

Minaketu: (Laughing)

Beauty, what I said to you last night was true only for last night. I didn't say it would be true in the light of day. When you were near last night, you were a water-lily, and I was the moon. Now that day has come, I have become the sun, and I am for the sunflower, for the lotus! Go! Go away! You have blossomed, now stay with your eyes closed all day and wither away in the evening! Go!

[The girl exits with a crestfallen face, covering her eyes with both hands.]

Krishna: (In a hurt voice) Minaketu!

(Minaketu bursts out laughing loudly.)

[Another girl enters, singing as she walks. Her name is Mala.]

Mala:

On a moonlit night, in the court of the forest,
You wove a garland with your own hands. In deep joy,
I bore the sting of your needle in my heart.
The pain of that is still awake in a crimson hue
In the colored roses. I wanted to hang on your neck,
And so I gave a dark stain to my clan.
If you won't take me and wear me on your neck,
Why did you kill the soul of the flower?
Oh, the garland withers in a huff,
And falls silently in shame.

Minaketu: Who are you again, beauty?

Mala: Emperor, don't you recognize me? My name is Mala! I was around your neck all last night! I was a scattered flower in a thorny bush, you made me worthwhile by making me a garland!

Minaketu: Ah, if you have become worthwhile, then why again? Now let each flower fall from your thread. Just as a flower must be made into a garland to be worthwhile, at the end of the night, that stale garland must also be thrown away.

[Mala exits, clutching her chest.]

Krishna: Oh! I can't stay anymore! Minaketu! What are you?

Minaketu: Yes, that is her fate. The one who clings to the stale flower of the night even at the end of the night, not only does she have no support, her youth is also dead.

Krishna: Cruel! Do you have a heart or humanity?

Minaketu: (Laughing) I don't worship humanity, Krishna! I am a devotee of youth! It is my dharma to crush flowers and hearts.

Krishna: Looking at you, Minaketu, I understand why the scriptures say there is no one more beautiful in this world than the god of sin, Mara.

Minaketu: (Laughing, gently tapping Krishna's cheek with his finger) You're right, Krishna, is there anything more beautiful than Mara, than falsehood, than illusion? The moon is so attractive precisely because it has a stain. That black spot on your forehead has beaten all the beauty of your face. The rainbow is beautiful because it's a lie! Youth is so enticing because it makes mistakes and sins, it is so beautiful!

[A tipsy woman, her face and eyes showing signs of a debauched exhaustion, stumbles in.]

[Song.]

Madalsa:

Why did you stain me with a colorful intoxication?

Why did you break a simple rhythm?

Why did you bring a foamy, watery joy to my withered, small river of a body,

Awakening the hungry, drunken youth of the underworld With your intoxicating touch?

Krishna: Chase that ugly woman away from here at once! Who is she to you?

Minaketu: (Laughing)

She is the anti-goddess of that sin and falsehood you were talking about! When you leave the temple of your gods, don't forget to

bow to this anti-goddess as well, Krishna! Her slanted eyes are far more beautiful than your straight eyes of truth.

Krishna: Oh God! (She sits down.)

Minaketu: (Looking at the girl) Are you Madalsa or Vasantasena? She might become one of them? But I see you've drunk too much and become lazy, I can tell by the way you walk.

Madalsa: What is it, my love, is there no time for me anymore? (Sees Krishna) Where did you import her from? Have we been exported forever? Well, this kingdom won't last long. Let's see, my love, when that happens, on whose door will you go to eat chickpea flour!

Minaketu: Oh, why are you angry, beauty? Sometimes to change the face of sin, you have to do some good deeds, too. When these pious souls become stale, I will come back to your door.

[Madalsa exists, staggering.]

[Song by the chief singer Kakoli and her friends.]

Kakoli and Friends:

Take, take, fill, and fill this colorful cup.
In this dark night, light, light, light a lamp.
When the moon's light becomes dim by the harsh light,
Light a new lamp in your eyes, my love. Wake up with a new intoxication, O fanciful one!
Forget, forget the dream of the night.
Bring a new life to the morning!
Conceal it with a hundred petals and with tears in your eyes.
Oh, for whom does the heart ache? For whom is this useless devotion?

Minaketu: You have come at the right time, Kakoli! I was waiting for the song of your youth and their youthful anticipation. This song of flowers blooming, where a young girl becomes a young woman, a young woman finds youth, and the bud of the night laughs as the flower of the day—this is the national anthem of my kingdom.

Poet: Not of the kingdom, Emperor, this is the national anthem of our youth.

Minaketu: (Offering a wine cup to the poet) Take this, Poet, drink a little nectar, let even more—even more nectar drip from your throat. (Looking at Krishna) But Krishna, don't sit with such a sad face. If one lamp among a thousand lamps of a festival flickers—

Krishna: (Taking the words out of Minaketu's mouth) Then it's best to extinguish it completely, Emperor!

Minaketu: (Offering the cup of wine to Krishna) I don't extinguish lamps, Krishna, I light them up better and sit in their light, full of energy. Here, pour a little of this loving substance, and the flickering lamp will light up with a flare.

Krishna: (Moves away) I am not a lamp, Emperor, I am Krishna, the night. And—you drink that nectar yourselves.

Poet: Who has ever seen a bottle get drunk, Emperor! Their inside and outside are already nectar, they don't need nectar.

Minaketu: No, no, Poet, she is a "Blue-Throated" one—I can't say Shiva, can I say Shivaa? No, then she might start singing in a painful tune. But Krishna, if you are the night, I am the stained moon. When the moon rises, the night's face doesn't stay so hypnotized.

Krishna: But today's moon is the moon of the second day of the fortnight, Emperor! The smile that blooms on the night's face in the light of this moon is more pathetic than tears.

Poet: My God, so even the moon that is full with sixteen kalas has become a moon of the second day! Oh! Is it that its fourteen kalas are covered in darkness today!

Krishna: Yes, Poet, sometimes the moon's stain becomes so enormous! (Looking at the Emperor) It's not a stain, Emperor, it's the shadow of the world's sorrow.

Minaketu: Oh, you are not only the night—you are mist! You will not leave even the little moonlight of this pale second-day moon untouched! But, I don't dislike that either. Laughter on a beautiful face is charming, but the mirage in its eyes is no less so! (Sunrise in the distance) There the sun is rising, that sun—it is a symbol of sorrow, of decrepitude. In its harsh heat, tears dry up, flowers fall, the blush on the face of dawn fades, and the moon of the night

becomes dim. No, today's wine must have had too much water in it—the intoxication is becoming bland. Where are your soldiers, Poet?

[Song.]

Young Women:
Half the earth is light, half is dark.
Who knows whose night of sorrow is over?
Half the earth is hard, half is water,
Half the lotus stem is thorns, half is lotus,
Half is tune, half is wine—separation and joy.
Half the heart is pained, half is hope,
Half is secret, half is language! Half is love, half is neglect,
Half is evening, half is morning,
Half is the sun's light, half is frost.

[All but the Poet leave.]

Minaketu: Poet!

Poet: I'm going, Emperor! When the goddess of the sky and the human of the earth want to have a private conversation, the most difficult position is that of Trisanku. To avoid an awkward situation, the poor fellow can neither go to heaven nor descend to earth!

[Exits.]

Minaketu: (He turns to leave, then turns back.) The one who was supposed to leave first is still standing, Krishna!

Krishna: I was thinking, Emperor, will there be no accountability for this trampling of flowers? Is there truly no sin in this?

Minaketu:

There is no sin, Krishna, there is no sin!

And if there is, it is not my sin—it is the sin of these walking feet, of my proud speed.

This is the eternal custom of eternal, restless youth; in this sin, youth is guilty through the ages.

[Exits.]

Krishna: (Staring after him) Cruel! Bandit! (With folded hands, in an agitated voice) And yet you are beautiful—wondrous! But what is this! Why is my heart breaking with tears? He is not my love, only the king of this kingdom, and I am not his love. He is the Emperor, I am the minister. Yet—why is this happening? Oh! What kind of an illusionary deer has come to deceive me? (She falls to the ground.)

[Kakoli comes and silently caresses her head. When Kakoli begins to sing, Krishna sits up.]

[Song.]

Kakoli:

Who are you, all alone in the dark night?
Floating a boat of tears.
With what sorrow do you become a Yogini today,
Casting yourself aside?
Look at the golden bracelets on your two hands,
They entreat you to stay. Do not throw them in the dust,
The anklets beg, clutching your feet.
Weeping, who do you seek on the other side?
Today is still your morning.

Krishna: Did you see, Kakoli? These are the proud footsteps. (Picking up a trampled red rose from the path) This is the blood-red rose he trampled with his foot. He walks away, staining his path red by trampling flowers and hearts like this.

Kakoli: Why do you chase after Aleya and die? It is his dharma to trample hearts, so why—

Krishna: You've misunderstood, Kakoli! I don't feel pain thinking about him as a woman. As a friend. Yet that light keeps pulling me. I resist with all my might. Sometimes I feel as if there is no greater joy in my life than chasing after that falsehood. Even if not of the heart, he was a childhood friend... By the way, Kakoli, from whom did you learn this song?

Kakoli: From the poet Madhushrava.

Krishna: The poet Madhushrava. He wrote such a tearful song? He is a bird of joy, he doesn't even acknowledge sorrow and pain! I see that everyone, then, is chasing after the Aleya!

Kakoli: I told the poet the same thing. He laughed and said, I see the worth of a flower at the mouth of a thorn, and my heart's strings ache so much that my hands play on the lute like this!

Krishna: (Thinking) Hmm, I understand, Kakoli. On some days, the poet looks at me in a certain way. (Thinking for a moment) But with the storm of his words, he just keeps pushing the cloud of his mind from the south to the north. He is the happiest of all! He demands nothing, his only joy is in giving.

[Chandraketu enters.]

Krishna: Commander-in-chief, you here! Haven't you gone to defend the border? Kakoli, you go, I am going too.

[Kakoli exits.]

Chandraketu: What border are you talking about, Krishna?

Krishna: Don't you know thatJayanti, the Queen of Yasholashmir, has attacked the Gandhara kingdom?

Chandraketu: I know, Krishna, not only an attack, she has defeated our border guards and is advancing towards the capital.

Krishna: Our invincible army defeated by a woman? And knowing this, you are still sitting in the capital?

Chandraketu: I know my duty, Krishna! I do not take up arms against a woman. I have sent my assistant commander-in-chief, and I hear he has been defeated as well.

Krishna: I am the chief minister of this empire, and I want to know, Commander-in-chief, whose shame is this first defeat of our invincible army? Who is responsible for this?

Chandraketu: You!

Krishna: I!

Chandraketu: Yes, you! (In a pained voice) What border should I defend, Krishna!Jayanti has attacked the eastern border of the Gandhara empire, how much strength is needed to resist that

attack? But I can't do anything against the one who has attacked the eastern border of this heart.

Krishna: (In a proud voice) Commander-in-chief, I am not just Krishna, I am the chief minister of this empire.

Chandraketu: I know, Krishna! When you sit on the throne of the royal court, I bow to you, but the one who lies in the dust of this path with the burden of her inner pain, her name is unfortunate Krishna!

Krishna: (Startled, in a gentle voice) Chandraketu, friend!

Chandraketu: (In an agitated voice) Call me Krishna, not Commander-in-chief, not friend, just call me by my name! It feels as if I am hearing my name from your lips after ages. Ah! My own name sounds so sweet to my ears! In our youth, you used to call my name like this, and fire would catch my blood.

Krishna: (Smiling wanly) You still remember that? I remember it too, Chandraketu, one day you, I, and Minaketu played together on the paths of this pleasure garden. Back then, the king's throne and the responsibilities of the kingdom had not yet come to stand between us. (Sighs deeply) Who knew then that a new game would begin for us on this very path? (Thinks for a moment, then smiles.) I would sit next to Minaketu and say to him, you are the king, I am the queen, and I would look back and see you walking away with a sad face, and my moonlit night would be covered by a rainy cloud.

Chandraketu: Are you telling the truth, Krishna? Did my tears ever dim your moonlit night then?

Krishna: Yes, friend! You never rose in my heart like the full moon of a Jasmine night, but you came down in my eyes like the rain of a stormy night.

Chandraketu: (In an agitated voice) Thank you, Krishna! But you probably also remember that I did not just walk away with a sad face in that childhood game! One day I declared a rebellion against you! Against your Minaketu! I forcefully snatched you away. Minaketu fought, but he was defeated by my hand. Filled with the pride of victory, I looked at you and saw you were

crying. I understood that you don't want the victor—you want the one by whom you are defeated and disgraced. I gave you back to your king.

Krishna: You made a mistake, Chandraketu! Perhaps everyone makes this mistake. I admit, I like Minaketu. But that liking is not love. Just as seeing a lion brings joy and fear, so does he. But let's not talk about that. Do you remember what Minaketu said after being defeated by you that day? He laughed and said, "Friend, if I loved Krishna the way you do, I would have defeated you in the same way. The strength to fight for someone you don't love comes from nowhere." He also said, "Chandraketu, if I become Emperor, I will make you my commander-in-chief."

Chandraketu: He didn't make me commander-in-chief, I became commander-in-chief by my own strength. But Krishna, how cruel you are, you could have not reminded me of those words.

Krishna: Don't be sad, friend, since I couldn't give you the love of my heart, I give you the tears of my eyes. I am a woman, I know, the heart can be attracted by heartlessness so much more than by love. I have not found love, you have not found love—that is where we are friends! But you are luckier than me. I could not love anyone at all. You, at least, have been able to love someone!

Chandraketu: For God's sake, Krishna, don't say "friend"! Don't say it! I don't want that much from you. Friendship can satisfy the hunger of the mind, but not the thirst of the heart. (Takes her hand) Krishna!

Krishna: (Slowly pulling her hand away) But that can't be, Chandraketu!

[Kakoli enters, singing.]

Kakoli:

How long will you remain a Yogini in your youth,
O resentful moon-maiden?
The night of spring came and went back, weeping.
The gardener came with a basket of flowers, calling,
The sky lit up a lamp of stars,
But the devotee sitting in the temple

Did not break her meditation.

Krishna: I'm leaving, it's time for the royal court, get out of my way!

Chandraketu: I have never stood in your way, Krishna! I won't stand in your way today either. I will move away from your path forever. But before I go, I will say my last words.

Krishna: Kakoli, you go, I am going too.

[Kakoli exits.]

Chandraketu: You know, Krishna, I have never been defeated in a war in my life. Just as I forcefully snatched you away in my youth, I can still do it. I may not have an empire, but I have a sword, I have strength in my arms,—but no—I won't take that. I will conquer you!

Krishna: Conquering a war and conquering a heart are not equally easy, Commander-in-chief.

Chandraketu: Very well, Krishna, then I will be defeated and fall on that red battlefield of the heart! But that defeat will be my greatest victory in battle. I know, just as I am kneeling at your feet today, you will one day be defeated—and fall in the dust of my departing path; but on that day, I will walk away, neglecting you as you did to me, on a path to nowhere.

[Exits.]

Krishna: (Staring after him like a statue, in an agitated voice) Who named me Krishna? Just like Krishna, the night, one end of me has a sunset, and the other has a full moonrise! No! When did the sunset happen? What am I saying?

[Minaketu enters, dressed for the royal court.]

Minaketu: It's true, Krishna, even a mirage has a pull! I was going to the royal court, and I remembered your sad face. It seemed to me that you were still sitting there. Convene the royal court here today. Arrange for the courtiers to be informed.

[Krishna bows and exits. Ranganath enters.]

Minaketu: Come, come, Ranganath, I was feeling so alone. You have probably heard, I have convened the royal court here in my

pleasure garden. (Suddenly starting and speaking in a harsh voice) But what's that, Ranganath, you've started growing a beard again? You know my order, what punishment one has to bear for growing a beard? That ugly thing stains beauty, it has no place in the court of youth.

Ranganath: I know, Emperor, if I want to grow a beard, my body and head can't be held in place. But like the stain on the moon, doesn't a beard increase the radiance of the face, Emperor? Besides, what can I do, the beard wants me, even though I don't want it. I think my wife in a past life was an unfaithful, dark woman, and in this life she has come as a beard to take her revenge! She won't let go of my cheeks, the more I push her away, the more she clings. Besides, Emperor, we shave beards, and the barber shaves money—I can't tolerate that anymore.

Minaketu: (Laughing) Alright, from now on, I will tell my barber to not shave money from you, but to shave the beard.

Ranganath: For God's sake, Emperor! When they shave for money, they shave the cheeks more than the beard, but if they shave for free, they might just shave off my throat! And if you must send someone, send a 'less-shaving' barber, not a 'barber.' His razor is not a razor, but a digging hoe! Emperor, would you like to hear a song? Of course, my wife wrote it!

Minaketu: (Laughing loudly) Your wife's song? And about your beard? Sing, sing—this will be a wonderful thing.

Ranganath: It's not a song, Emperor—it's just tears from the nose and eyes. She tolerated my long beard's torment, but couldn't tolerate the stinging of the shaved beard, so in the joy of pain, she became a poet and wrote a song!

[Song.]

A thousand stinging needles. A black beard on a cooking pot-face,
Like thorns in a jujube forest.
To remove it, clothing tears, razors break in battle.
The razor breaks in battle and becomes a hoe,
To cut it, the sickle runs away in fear! It is a dark thorny bush of beard,

Next to it, a thicket of tangled thorns.
(Oh, Shyam's beard!) When I go to sleep, my eyes droop,
O friend,
My body shudders in fear.
(O friend) It's not a face, it's as if Bhishma Pitamah is sleeping
On a bed of sharp arrows!
(O friend) I fight with a porcupine every day,
I am tired of this curse of a beard!
Shyam's long beard was good,
O friend, There was no stinging pain.
Stroking his beard,
He would put me to sleep, O dark one.
My eyes would close in ecstasy!
At that touch, my eyes would close!
It was as if I was sleeping in a bed of hay,
It kept out the cold, why did he cut it?
Who gave my darling's face such a Dirty broom of a beard, O friend?
It pricks my cheek,
Like a hundred rival wives,
O friend, I burn and die, Friend, take me, take me, I burn and die!

[Krishna, Madhushrava, Chandraketu, Kakoli, captive women, umbrella-bearers, urn-bearers and other courtiers enter.]

[Song.]

Kakoli and Captive Women:

Wake up, young woman!
The young prince is coming.
In crimson garments he is dressed.
Spread a mat with your veil in the forest,
Tie, tie a song of welcome,
Shame on your cheeks.
Youth overflows in a restless wave,
Erotic love plays in the eyes, in the heart, in the limbs,
In a restless wave.
With the rhythm of arrival, the drum of the clouds,

The forest peacock sings with the forest cuckoo.
Play, play the flute in the courtyard of the heart.

[Kakoli and the captive women exit.]

Chandraketu: Emperor Jayanti has defeated our border guard army and is advancing towards the capital. I have sent my assistant commander-in-chief to resist her advance. I hear he has been defeated as well.

Krishna: But half the shame of this defeat is yours, Commander-in-chief! If you had commanded the army yourself, this defeat would never have happened.

Chandraketu: I know that, but I do not take up arms against a woman.

Madhushrava: You don't know, Commander-in-chief, not all women are women. The might of a heroic woman is more fearsome than the masculinity of any mighty man. The water of a river is clear and transparent, but when that water rushes in a flood, even a forest can be washed away in its wake.

Ranganath: (Looking elsewhere) You're right, my friend, a mad woman is a man's father. If the Commander-in-chief had ever seen my wife, he would have understood why the mother's name is "Mahishmardini" (the slayer of the buffalo demon)!

Minaketu: Is this the daughter of the powerful Queen of Yasholashmir, Commander-in-chief? But I heard she was insane. I heard she wanders and dances with whirlwinds in the deserts of Rajasthan day and night. Her name is "Maru-Nati" (desert dancer).

Chandraketu: Yes, Emperor, she is that mysterious desert wanderer. Her companions and friends are the wild dancers of the desert, and her army and warriors—all of them. She wanders and dances in mountains and valleys with them like a desert storm.

[The assistant commander-in-chief enters, with his head bowed.]

Act Two

[Ugrāditya, the Commander-in-Chief, enters. An unnatural ferocity is on his face and in his eyes. In his voice, movements, and demeanor, he is reminiscent of a wild, barbaric beast. He looks around like a hungry tiger, pulls out his bagha-nakha (tiger-claw) weapon from his chest, and stares at it intently. He is startled when he hears Chandrikā's distant song.]

[Chandrikā enters, singing.]

[Song]

Chandrikā:

This is not a lotus blooming in the water for pleasure, my friend.
It is a heart red with pain, trembling in the water.
My delicate lotus-stalk body is filled with the wounds of thorns;
That's why I have sought refuge in the cool water of the pond.
I've been submerged in the deep water, enduring so much agony,
And with a hundred wounds of pain,
I have become a hundred-petaled lotus.
My heart's weeping, you call it the scent of a flower.
Go back, don't breathe in, you fickle southern wind.

Chandrika: What is it, Commander? Were you secretly listening to my song?

Ugraditya: (With a harsh voice, his face distorted) I don't listen to anyone's song, Chandrikā. I can listen to a donkey's voice for ten hours, but a human's screech—yes, a screech, although you might call it a song—I can't listen to for even a moment.

Chandrika: What are you saying, Ugraditya! Is a song a screech? And a donkey's bray is more beautiful to you than a human's, I mean, than my song? Even if they are your relatives, do you have to be so biased?

Ugraditya:

Look, Chandrika,
I don't understand the twisted things you say.
And I don't need to. Your gait is twisted, your gaze is twisted,
Your words are twisted!

Chandrika: So, I'm the sage Ashtavakra, is that it? (Singing) "Twisted, my dark one, you are twisted, your heart is twisted."

Ugraditya: Ugh, how much mental distortion must a person have to shriek in such a tune? I understand a single-minded shriek, I can tolerate that, but this screaming—loud one moment, soft the next, and then in a nasal tone—makes me so angry!

Chandrika: And people actually listen to this with affection! There are so many mad people in this world! It's a good thing there aren't two or four more stone-brained people like you, Ugraditya, or this world would have become a zoo by now! (Startled) What's that! Why are you holding the tiger-claw like that? Why do you look like a ferocious tiger in your eyes? The way a snake looks at its prey—no, I'm getting scared. I'm running away!

[Runs away.]

[Jayanti enters, holding Chandrika's hand.]

Jayanti: Come back, why were you running like that? Did you see a ghost?

Chandrika: (With a fearful voice) Yes! No, sister, not a ghost, a tiger! A wolf-tiger!

Jayanti: A tiger? Where did you see one?

Chandrika: (Pointing to Ugraditya) He's standing right there! Halum! Look, he has a tiger-claw in his hand, a tiger-like mustache, eyes, and face. If he just had a tail, he'd be a complete tiger!

Jayanti: You are so naughty, Chandrikā! If you keep pestering him day and night like this, won't he chase you away?

Chandrika: Do I pester him without reason, sister? It's because of the pestering that the prey in this country are still alive. Otherwise, your tiger would have devoured the whole country by now!

Jayanti: But he is so calm with me. Look, he has hidden his tiger-claw back inside his chest!

Chandrika: Who knows, sister, only a horse can bear a horse's kick! He is your tamed tiger, after all!

Jayanti: Ugraditya!

Ugraditya: (Saluting with the hilt of his sword to his forehead, he comes forward and stands)

Jayanti: (Looking at Chandrika) See, Chandrikā, today he didn't lower his head to greet me. He showed respect by touching the hilt of his sword to his forehead. He says his head can only touch the ground before the sword of one who will defeat him.

Chandrika: When will that great buffalo-subduer come, sister! I have a great desire to see a buffalo sacrifice at the feet of the buffalo-slayer!

Jayanti: Shame on you, Chandrikā! You have become so shameless. Ugrāditya, you may go now, I will call you if I need you. And remember, don't be angry with Chandrikā. Remember, she is my younger sister.

Ugraditya: I know, my queen! (Again salutes with the sword to his forehead, looks at Chandrikā with fiery eyes, and leaves.)

Jayanti: So, Chandrika, tell me honestly, why are you so furious with him? You can't stand to look at him, yet you can't forget him either. It's as if your heart is filled with him under the pretense of hatred.

Chandrika: (Startled) It's true, sister. This is probably how a snake-charmer dies from a snake's bite, or a hunter from a tiger's clutches. (After a moment of thought) If I have to make that snake dance, I'll first break its venomous fangs!

Jayantī: Shame, shame, will you live with a harmless snake in your home?

Chandrika: Even if the venom is gone, its serpentine coils will remain. As long as it can hiss, people will think it's a real cobra. (Walking away) Honestly, sister, I just keep thinking all day, why does he have to be such a wild animal? Is there no one to make him a civilized person? I feel so sorry for him when I see him. He's like the most helpless, lonely person! He has no friends or

companions! Perhaps if he gets a touch of a woman's touch, he might become a great man.

Jayanti: Yes, like the bandit Ratnakara suddenly becoming the sage Valmiki!

Chandrika: What's so strange, sister! Honestly, tell me, why does it happen? The thought of why he became such a barbarian torments me so much. Why do I torment him like this? The poor wild creature! (Bursts out laughing) Sometimes I just feel like laughing! It's as if my whole body is laughing, showing its teeth!

[Song]

I laugh when I see him, that's my way of seeing him,
(Oh) I am young, he is old; I am nineteen, he is ninety.
He is a kite, I am a fly;
I am a bamboo, he is a bamboo-shoot.
I'm happy, he's a scapegoat; he's a flute, I'm the music.
The more he rages, the more
I wrap him in the noose of my affection!

Jayanti: You can worry about your monkey! I'm leaving, I have a lot of work.

(Starts to exit.)

Chandrika: Oh, sister, don't I have the right to know anything about you? You said you have a lot of work, but you never ask for my help with any of it!

Jayanti: (Stroking Chandrika's head and body) Foolish girl! Not everyone is suited for every kind of work! You are a woman down to your very atom, so you only concern yourself with matters of the heart. The woman in me is as strong as the man. That's why I hold a sword in my hand, and when the time comes, I might shoot an arrow from my eye. Because you are a woman through and through, you are so concerned about this animal-like Ugraditya from head to toe. And because I am half-woman, I'm concerned about the kingdom of men. That's why you became a woman, and I became a queen.

Chandrika: (Getting angry and walking away) You can say whatever you want about me, sister! Since I have no death, I'll go love that wild animal. I'm going to go poke your tiger again!

[Exits.]

Jayanti: Don't go! He might scratch and bite you! ... (Gazing after her) Foolish girl! Absolutely foolish!

[Ugrāditya enters.]

Ugraditya:

I had forgotten, Empress, that tonight is our Fire Festival.

Jayanti: I remember, Commander. But this time, only I and my company of Yoginis will participate in this dance. You will guard the mountain pass with all my soldiers. Our enemies must not be able to attack us, taking advantage of our festival.

[Ugraditya salutes as before and exits.]

Jayanti: Where are my Yoginis! Come, today is our Fire Garb.

[A group of Yoginis enters, dressed in fiery red robes, singing.]

[Song]

Yogini Chorus:

Awake, woman, awake, fiery flame!
Awake,
Swaha, with a blood-mark on your forehead!
Spread your licking tongues in every direction,
Dance, you maddened one, naked in the directions,
Awake, you unfortunate, oppressed serpent,
Awake with the fire that burns the world!
Burn, burn, smoldering fire!
Awake, mothers, daughters, brides, sisters!
The redeemer of the fallen, the Ganga of heaven,
Awake like the crushed Yamuna with force!
Awake, eternal victor,
Jayantika!
Jayantika:
I am the fire, and you are all my flames!
Today is the full moon of

Falgun—my birthday!
The birthday of fire!
On such a Falgun full moon, the first fire ignited in the heart of the first woman.
That fire has not gone out yet!

Many homes, forests, and deserts have become fuel for that hungry fire, yet its hunger has not been sated. It is the blood-flag of nature's war against man! The unbearable fire of a woman's hurt against a man!

[Song]

Yogini Chorus:

Awake, woman, awake, fiery flame—
Awake,
Swaha, with a blood-mark on your forehead!

Jayanti: Yes, Minaketu proudly declared that he is the symbol of all men, the Emperor of the Kingdom of Youth. It is his religion, he says, to crush flowers and hearts. I want to show him that youth doesn't belong only to men! Their youth comes like a storm, like a gale; a woman's youth comes like a fiery flame, with a blood-like radiance. I want to show that the formidable youth of men has been controlled by women's youth throughout the ages. The mark of scorn from a woman's hand has made their unadorned form beautiful and wondrous. If Minaketū is the symbol of all men, then I am the declaration of rebellion of all women—against him—against all men!

[The Yoginis perform a fire dance.]

[Song]

Yogini Chorus: Awake, woman, awake, fiery flame—

[In the distance, the sound of trumpets, the footsteps of soldiers, and songs of victory and a march can be heard.]

Jayanti: There goes Ugrāditya with my invincible desert army! Let's go stand at a distance and watch the beautiful spectacle of their victory march. To see the truly great and beautiful, one must look from a distance, otherwise its complete form is not visible.

[Jayanti and the Yogini exit.]

[The Yashalakshmi soldiers enter, singing and marching.]

Yashalakshmi soldiers:

With trembling, trembling steps,
The heroes march to battle!
Sharp swords hang from their waists,
War drums beat with the clang of battle.
In the sound of the deep trumpet, grief forgets death,
The sun blesses them with a thousand rays.
They march on tired, distant roads,
Through deserts and difficult mountains.
They march alone, without friends,
Wiping the stain of shame from their foreheads with blood!
The Bhairavi trembles in the temple; is this a sacrifice?
The fearless Shankara awakens, abandoning the cremation ground!
The ḍambaru sounds, the sky trembles in fear.

Act Three

[The pleasure palace of the Gandharva kingdom. Madhushrava, a group of young maidens, Ranganath, Kākalī, and others are seated. Minaketū has not yet arrived; a song is sung by a minstrel.]

[Song]

Minstrel:

Who is this guest arriving at twilight?
The flowers of worship are falling in the forest.
The temple is filled with songs of praise,
The eyes of the sky look at your face.
The earth trembles with the glow of lamps,
The Nawbat plays the Bhoopali tune.

[Minaketu enters, laughing. The young maidens and girls dance and sing.]

[Song]

Young maidens & girls:

Let's go, group of Madhavikas, under the Madhavi tree,

The sweet season has arrived. The cuckoo birds chatter endlessly,
In the flower-play, a sweet, intoxicating scent spreads,
In the bamboo forest, a restless joy.
The sky, like a youthful eye, is dark blue,
The banks and trees hold their cool shade,
A long sigh in every heart.

[After the song, Kākalī offers a cup of wine to Minaketū.]

Minaketū: (Finishing the cup of wine and returning it) Not just wine, Kākalī, I need a tune with the wine! The tune of your enchanting voice. Today is the day I get to see the one I've never seen before.

[Song]

Kakali:

In the deep night,
Who has come to break my sleep?
To place a garland around my neck,
And bring tears to my eyes.
The pain I received in life, I'd forgotten in the dreams of night.
Who are you, who came secretly,
And touched that very pain?
When I cried alone,
Why didn't you wipe my tears?
The night is almost over,
The wilted flowers will fall in the morning.

[Commander Chandraketu enters, dressed in a white robe of a common citizen, with an empty sword scabbard in his hand.]

Minaketu: (Jumping up) What is this! Commander? You have come wrapped in a white flag, my friend!

Chandraketu: (Placing the empty scabbard at Minaketū's feet) Emperor! I am no longer a commander. As of today, my name is Chandraketu. I no longer have the right to be a commander. I have been defeated. The only way to forget the shame of defeat is to die on the battlefield. By a twist of fate, I was denied that, so I have voluntarily given myself the punishment of eternal exile. Today

there is no shame in my heart. The path to the land of death has been blocked, but I have found the way to the land of immortality.

Minaketū: May I ask, my friend, who is the guide on this path to immortality?

Chandraketu: She is the victorious one over all people, not just me—a woman. I will not name her. Today I truly understand, Emperor, that one who is victorious on the battlefield of the heart is greater than a commander who has won a hundred battles. The pain of not being able to conquer a heart would weaken my arm so much—this was beyond my imagination.

Minaketū: (Patting Chandraketu on the back) Don't be sad, my friend. The sweet taste of that defeat will one day come to you, Minaketū—the Emperor of Youth! Is a defeat by a beautiful hand really a defeat? But were you defeated by that victorious one in a battle of weapons, or without weapons?

Chandraketu: (Smiling faintly) In both battles, Emperor, even though I didn't go there to fight without weapons. I went with my army and fell upon the Yashalakshmī army like a landslide. I had almost defeated them when Jayantī, the queen of Yashalakshmī, arrived with a radiance like the midday sun in the rainy season. I have never seen such beauty. How such beauty could be contained in such a small body, only the creator of all forms can say. She is the wonder of the world. But more beautiful than her beauty were her eyes. It was as if the sun and moon were playing hide-and-seek in them.

Minaketu: You are exaggerating, Chandraketu. Tell me what happened next.

Chandraketu: I was still engaged in a duel with the commander Ugrāditya. Just as Jayantī is wonderfully beautiful, Ugrāditya is equally terribly ugly. It's as if the strength of all animals and all demons is in his body. He is the symbol of all asuras. I understood that the power of a goddess had merged with the power of a demon. This power is invincible.

Minaketu: (Pacing restlessly) Yes, now I understand the source of that power!

Chandraketu: I would have been defeated by Ugrāditya's hand, perhaps, but Jayantī came and saved me from that shame. She pushed Ugrāditya aside and looked at me for a long time, then said, "You cannot be victorious in this battle, Commander; you should go back." I said, "I have never returned from a battlefield with a defeat." She smiled and said, "You are wounded in the battle with your heart. My commander is not forbidden to strike a wounded soldier, but I am! Your eyes are not a soldier's eyes, where is the hunger for death in them? They are a lover's eyes, pale with the pain of despair!" In that moment, I saw my true wounded self in the mirror of that woman's heart. The sword fell from my hand.

Minaketu: (As if possessed) Yes, this is her! This is that victorious one! I remember, I was the five-arrowed god of love in heaven, and I came to the mortal world because of Shiva's curse. That victorious one is not Jayantī, she is Rati! (Suddenly starting) No, no. Yes, what happened then, Chandraketu, did you go back? Did you pick up the fallen sword again?

Chandraketu: I did not accept the fallen power again. I left it on that battlefield forever.

Minaketu: (Bursts out laughing) You made a mistake, my friend! You made a Rama-like mistake! That power has not fallen, it is chaste like Sita.

Chandraketu: This time she will have her fire test! But even if she passes the test, I cannot accept her because of public shame. The curtain of eternal exile has fallen between us.

[Suddenly, the ten directions are filled with light. The queen of Yashalakshmī, Jayantī, and the commander Ugrāditya enter with the sound of a conch and trumpets.]

Jayanti: (Offering the sword to Chandraketu) No, Commander! If you exile her, you will also suffer a terrible fate like Rama. Take this, your abandoned power. I am a fiery flame. Its fire-purification is complete.

Chandraketu: (Startled with a sense of wonder) Emperor! This — this is that great woman! This is Jayantī!

[Minaketū releases his sword and looks at Jayantī, and Jayantī also looks at Minaketū with a possessed, hungry gaze. In the distance, a flute begins to play a sweet tune. Suddenly, the sword falls from Minaketū's hand. Ugrāditya's eyes begin to burn like a hungry tiger's.]

Ugraditya: Queen, may I take them as captives?

Jayantī: Ugrāditya, even if he is defeated, he is an emperor. Speak with respect.

Ugraditya: Forgive me, Queen, a defeated person has no other definition than a captive. Even if he is an emperor, he is a captive.

Jayanti: If he has to be taken captive, I will do it with my own hands.

Minaketu: By which path did you come, Queen?

Jayanti: Through your path of defeat, Emperor! Now, will you be a voluntary captive, or will you fight?

Minaketu: Fight? With whom, Queen! The day you crossed the border of my kingdom, my defeat was already sealed.

Jayanti: It will not end just there, Emperor. You will have to admit the shame of ultimate defeat to me—to a woman's strength. You will have to wear chains, and those chains will not be of gold!

Minaketu: With the golden touch of a beautiful hand, iron chains will become gold. (Holding out his hands) Take me captive, Queen!

Jayanti: But will you give up without a fight? You may have surrendered to me, but will you accept defeat to that Ugrāditya, my commander?

Minaketu: (Startled upon seeing Ugrāditya) Who is he? I haven't seen him before! He is not a human from this world.

Ugraditya: (Smiling a ferocious smile) I am a demon from the underworld, Emperor! Today you must fight me! Today is the day to test our strength!

Minaketu: (Looking at Ugrāditya with burning eyes) Yes! I can fight him! From head to toe, he is wrapped in the structure of invincible manhood! Yes, I have seen a true man! All my muscles

and flesh are becoming as hard as iron upon seeing him. A wild passion is awakening in my veins! Certainly! I will fight you, Commander. But what wager will you place on this battle?

Ugraditya: (Becoming frenzied with a ferocious delight. Pointing to Jayantī) my wager is this immortal goddess, Emperor! It is for her that I broke through the underworld and ascended to the world of immortality in the disguise of strength. If I cannot conquer her today, then my death at your hands is my just punishment.

Jayanti: (In a proud voice) Ugrāditya! So you are a greedy one in disguise, not a powerful one!

Ugraditya: Today I will speak the truth, Queen! I am not a demon of power, I am a demon of greed. The boundless strength in my arms is only by the grace of my immense hunger. Today the ultimate moment of my true nature has arrived!

Jayanti: Liar! (Picking up Minaketū's fallen sword and placing it in his hand) I have no fear now, Emperor, you will be victorious! He is not the symbol of strength, he is the hunger-worn form of a greedy man, and he will be shattered with just one blow from you.

Ugraditya: What is it, Emperor, will you accept that abandoned weapon, or will you defend yourself with empty hands?

Minaketu: (Laughing) I am not Chandraketu, Ugrāditya! The power that falls from my loosened grasp, I am not ashamed to pick it up again. You are a demon of greed, ten mouths of hunger in your belly, and in your hands are twenty hands of plunder and striking power. It is not possible to fight a non-violent battle with you. I will accept the weapon.

Ugraditya: Your wager?

Minaketu: My wager is also that immortal goddess! (As Minaketu strikes his fourth blow with the sword, Ugraditya falls.)

Jayanti: (Suddenly trembling) Emperor! Minaketū! What have you done, what have I made you do? He was my power, my greed, everything—with the power of that greed that hunger, I set out to conquer you! Oh! Minaketū! Today I feel for the first time that I am not the queen of a kingdom, but a woman of tears.

[Chandrika enters.]

Chandrika: What is this! Where have I come? Is this the land of Gandhari, who was blind with love for her blind husband? Is this that eternal, mysterious city of the heart? Who are those people standing? Mute, silent, pale. Is that the group of eternal travelers who wandered after Aleya? They all look so familiar! I've seen them in some other world. (Seeing the fallen Ugrāditya) Who is that? —Sister? And who is this? —Oh! Ugrāditya? Why is there so much blood here? (Crying out) Ugrāditya! Who killed you? Sister! Sister!

Minaketu: (In a calm voice) Goddess! I am the one who killed Ugraditya! He was a demon who came to drink the nectar of immortality! This was his fate!

Jayanti: Chandrika! Ugrāditya has gone, taking all my power with him! Can you save him with your devotion, Chandrikā? Otherwise, I will not survive! He must be saved!

Chandrika: Sister! My need for him is greater than yours! If he is not saved, our world will become eternally barren! If I have to stand face to face with the King of Death for this, I will! My devotion to bring life back into this corpse begins today, like Savitri's. From today, my name will be Kalyani!

Jayanti: (Standing up) I bless you, may you, like the daughter-in-law of the Rakshasa clan, Promila, be a beloved wife and not commit sati, but achieve a life together! (Saluting Minaketu) Friend! Greetings! I came to take you captive, and perhaps I came to take a bond. But that bond has been severed today by a twist of fate! With Ugrāditya's death, all the hunger and all the greed of my heart have come to an end. Today I am a barren ascetic! (Pausing for a moment) I did not come to this distant world to be an ascetic. I came with the intense fire of hunger to be a bride, to be a mother, and to conquer you. I found you, but that fire in my heart has been put out by Ugraditya!

Minaketu: Jayantī! Did you also love him then? So, is my victory also a defeat? The one for whom I made a wager—did she not become mine?

Jayanti: You are not one of those who are satisfied with a bodiless love, Minaketu. You want Jayantī, and you cannot be happy with the barren me of this moment. The radiance and the fire with which I conquered you—that was Ugraditya. He has fallen at your hands! Friend! Farewell!

Minaketu: (With a pained voice) Jayanti, will we never see each other again?

Jayanti: Perhaps we will, perhaps we won't! If that hunger awakens in my heart again, if Ugrāditya gets his life back, and if sindoor is placed on Kalyani's forehead, I will come again. Commander, greetings!

[Exits.]

Minaketu: (Cries out like a madman) Jayanti! Jayanti!

[Jayantī's voice floats from a distance, "Minaketu."]

[Curtain]

Translated by Alamgir Mohammad

ঝিলিমিলি

প্রথম দৃশ্য

[মির্জা সাহেবের দ্বিতল বাড়ির ওপর-তালার প্রকোষ্ঠ। মির্জা সাহেবের ষোড়শী মেয়ে ফিরোজা রোগশয্যায় শায়িতা। সব জানালা বন্ধ, শুধু পশ্চিম দরজা খোলা। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে। পার্শ্বে বসিয়া মির্জা সাহেবের পত্নী হালিমা বিবি মেয়েকে পাখা করিতেছেন। বাদলায় ও বেলাশেষের অন্ধকারে ঘরের আঁধার গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। হালিমা বিবি উঠিয়া হারিকেন জ্বালিলেন!]

ফিরোজা : মা!

হালিমা : (ছুটিয়া আসিয়া ফিরোজার মুখের কাছে মুখ রাখিলেন) কি মা! সোনা আমার!

ফিরোজা : বাতি নিবিয়ে দাও!

হালিমা : কেন মা? বড্ডো আঁধার যে! ভয় করবিনে।

ফিরোজা : উঁ হুঁ। তুমি আমায় ধরে বসে থাক। (মা-কে জড়াইয়া ধরিল।) বাতি বিশ্রী লাগে।

হালিমা : তা ত লাগবেই মা! (দীর্ঘ-নিঃশ্বাস গোপন করিলেন।) আচ্ছা, আমি কাগজ দিয়ে আড়াল করে দিই। কেমন?

ফিরোজা : না। তুমি নিবিয়ে দাও। (রোগী শীর্ণ কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল।) দাও শিগ্‌গির!

হালিমা : কেঁদো না মণি, মা আমার! এই আমি নিবিয়ে দিচ্ছি। (বাতি নিবাইতে গেলেন। ততক্ষণে কতকগুলো বাদ্‌লা পোকা আসিয়া বাতি ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছিল। ফিরোজা তাহাই এক মনে দেখিতে লাগিল।)

ফিরোজা : নিবিয়ো না, মা! আমি বাদ্‌লা পোকা দেখবো।

হালিমা : (হাসিয়া ফিরিয়া আসিলেন) ক্ষ্যাপা মেয়ে! আচ্ছা নিবাবো না। পোকা যে গায়ে-মুখে এসে পড়বে মা, বাতিটা একটু সরিয়ে রাখি।

ফিরোজা : (চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।) না! আমি বল্‌ছি, বাদ্‌লা পোকা দেখবো!

হালিমা : (কন্যাকে চুমু দিলেন) লক্ষ্মী মা আমার! অত জোরে কথা কোয়ো না! ওতে অসুখ বেশি হয়! আমি বাতি সরাচ্ছিনে।

ফিরোজা : (চুপ করিয়া বাদ্‌লা পোকা দেখিতে লাগিল।) মা, আমায় একটা বাদ্‌লা পোকা ধরে দাও না!

হালিমা : ছি মানিক! পোকা ছুঁতে নেই। তুই আজ অমন করছিস্ কেন ফিরোজা?

ফিরোজা : (কান্না সুরে) দাও বলছি। নৈলে চেঁচিয়ে রাখবো না কিছু।

হালিমা : লক্ষ্মী, মা! কেঁদো না। এই দিচ্ছি। (একটা বাদ্‌লা পোকা ধরিয়া মেয়ের হাতে দিলেন। ফিরোজা হাতে করিয়া এক মনে বাদ্‌লা পোকা দেখিতে লাগিল।)

ফিরোজা : এই যা! পাখা খসে গেল! আ-হা রে! আচ্ছা মা! বাদ্‌লা পোকার খুব লাগল?

হালিমা : তা লাগল বৈকি!

ফিরোজা : তা হলে ছেড়ে দিই ওকে। মা, তুমি ওকে নিচে রেখে এস (হালিমা বাদ্‌লা পোকা নিচে রাখিয়া আসিলেন।)... মা, বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না?

হালিমা : হাঁ মা, খুব বৃষ্টি। শুন্‌ছ না ঝমঝমানি?

ফিরোজা : আমার খুব ভাল লাগে ঐ বৃষ্টির শব্দ।... মা, আব্বা* কোথায়?

হালিমা : বাইরে, দহলিজে** বোধ হয়।

ফিরোজা : এখন যদি আমি খুব জোরে কাঁদি, আব্বা শুনতে পাবেন?

হালিমা : ছি মা, কাঁদবে কেন? ওঁকে ডেকে পাঠাব?

ফিরোজা : না, না, ডেকো না। মা খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা মা, তুমি যদি এখন গান কর, আব্বা শুনতে পাবেন?

হালিমা : ওরে দুষ্টু! বুঝেছি তোমার মতলব।... না, মা, এখন কি আর গান করে? তোর আব্বা শুনলে রাগ করবেন।

*আব্বা—বাবা। **দহলিজ—বাহির-বাটী।

ফিরোজা : এত বৃষ্টিতে শুনতে পাচ্ছেন কি না! মা, লক্ষ্মী মা, সোনা-মা, আস্তে আস্তে গাও না! সেই বৃষ্টি ঝরার গানটা।

হালিমা : আচ্ছা, গাচ্ছি আস্তে আস্তে। এখন কি আর গান আসে রে ফিরোজা। সে কখন ছেলেবেলায় গেয়েছি গান। এখানে এসেই তা ভুলতে চেষ্টা করেছি। তোর আব্বা বড্ডো রাগ করেন গান শুনলে।

ফিরোজা : আচ্ছা মা, গান শুনেও কেউ রাগে? আব্বা আচ্ছা মানুষ যা হোক।

হালিমা : আগে কিছুদিন রাগ করতেন না।... গান ত প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম। কেবল তোর জন্যেই আজো দু'একটা মনে আছে।

ফিরোজা : আব্বা আগে রাগ করতেন না মা, তুমি গান করলে?

হালিমা : না.....তুই এখন গান শোন্।

ঝরে ঝরঝর কোন্ গভীর গোপন-ধারা এ শাঙনে।
আজি রহিয়া রহিয়া গুমরায় হিয়া একা এ আঙনে ॥

ঘনিমা ঘনায় ঝাউ-বীথিকায় বেণু-বন-ছায় রে
ডাহুকীরে খুঁজি' ডাহুক কাঁদে রে আঁধার গহনে ॥

কেয়া-বনে দেয়া তূণীর বাঁধিয়া
গগনে গগনে ফেরে গো কাঁদিয়া।

বেতস-বিতানে নীপ-তরুতলে
শিখী নাচ ভোলে পুছ-পাখা টলে।
মালতী লতায় এলাইয়া বেণী কাঁদে বিষাদিনী রে,
কাজল-আঁখি কে নয়ন মোছে তমাল-কাননে ॥

ফিরোজা : মা! জানলাটা খুলে দাও। আমি মেঘ দেখব!

হালিমা : লক্ষ্মী মা! জানলা খোলে না। ঠাণ্ডা লাগবে। আমি বরং একটা গান করি, তুমি শোন।

ফিরোজা : না মা। আর গান আমি সইতে পারব না। খোলো না মা, জানলাটা। (হালিমা দক্ষিণের জানালা খুলিতে গেলেন) ওটা না মা, ঐ পুব-দিককার জানলাটা খোলো। পুবের হাওয়ায় কদম ফোটে, না মা?

হালিমা : ও-দিককার জানলা খুললে তোর আব্বা আমায় আর জ্যান্ত রাখবেন না, ফিরোজা! এই দক্ষিণের জানলাই খুলি। (দক্ষিণের বাতায়ন

খুলিলেন। দূরে বনের আভাস দেখা যাইতেছে। বৃষ্টিধারায় বন ঝাপসা হইয়া আসিতেছে।)

ফিরোজা : (দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া পাশ ফিরিল। আবার পাশ ফিরিয়া আগেকার মত করিয়া শুইয়া জানালার দিকে তাকাইয়া থাকিল। বোধহয় সে কাঁদিতেছিল।) মা!

হালিমা : মা আমার! তুই কাঁদছিস্ ফিরোজ?

ফিরোজা : আচ্ছা মা, আব্বা তোমায় খুব ভালবাসেন?

হালিমা : বাতিটা এখন সরিয়ে রাখি? তোর চোখে লাগছে, না?

ফিরোজা : আচ্ছা রাখ। কিন্তু তুমি বল....

হালিমা : (বাতি সরাইয়া রাখিলেন।) এখন একটু চুপ করে ঘুমোও ত ফিরোজা। বক্‌লে আবার অসুখ বাড়বে।

ফিরোজা : আচ্ছা, তুমি না-ই বললে। আমি সব বুঝি। আব্বা কখ্‌খনো কাউকে ভালোবাসেন নি। নৈলে মানুষ কখনো এমন নীরস আর নিষ্ঠুর হয়!

হালিমা : তুই কি থামবিনে ফিরোজা লক্ষ্মী মা আমার, কেন মন খারাপ করছ এত, বল ত! আজ যে তোকে চুপ করে থাকতে বলে গেছে ডাক্তার।

ফিরোজা : আচ্ছা মা, কাল থেকে ঐ পুব-দিককার জানলাটা খুলবে ত, তখন ত আর আব্বা বক্‌বেন না?

হালিমা : (শিহরিয়া উঠিলেন। কান্নায় তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া আসিল।) ও কি কথা বলছিস ফিরোজ?

ফিরোজা : কাল আর ও-জানলা খুলতে বলব না মা! (বালিশে মুখ লুকাইল।)

হালিমা : (হঠাৎ পাথরের মত স্থির হইয়া গেলেন। কণ্ঠ তাঁহার অশ্রুবিকৃত হইয়া উঠিল।) বুঝেছি রে হতভাগী, সব বুঝেছি। তুই আমাদের বড় শাস্তি দিয়ে যাবি।... মা, এই আমি খুলে দিচ্ছি পুব-জানলা, তুই অত অধীর হস্‌নে। (পুব-জানালা খুলিয়া দিতেই সম্মুখের বাড়ির মৃদু-আলোকিত বাতায়ন দেখা গেল। বাতায়নপথে কে যেন ছটফট করিয়া ফিরিতেছে। দূর হইতে তাহাকে ছায়ামূর্তির মত দেখা যাইতেছিল। ছায়ামূর্তি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল যেন এই বাতায়ন-পানেই সে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। হালিমা আড়ালে চক্ষু মুছিলেন।)

ফিরোজা : (ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাতায়ন-পথে তাকাইয়া রহিল।) মা, বাঁশি বাজছে না? উঁহুঁ, কে যেন কাঁদছে! (অস্থির হইয়া) বাইরে কে কাঁদে মা? মা, মা, শোনো!

হালিমা : কই মা, কিছু না। ও বৃষ্টির ঝর্‌ঝরানি।...হুঁ...না...হাবিব বুঝি গান করছে এস্‌রাজ বাজিয়ে।

ফিরোজা : আহ্! বৃষ্টিটা যদি থামত, গানটা শুনতে পেতাম...বৃষ্টি থেমে আসছে–না মা?

হালিমা : হাঁ মা, বৃষ্টিটা ধরে এল।

ফিরোজা : মা–মা! এইবার শুনতে পাচ্ছি গান। আহ্! একটু শব্দ না হয় যেন। মা তুমি চুপ করে শোনো। (বাতায়ন হইতে গান ভাসিয়া আসিতেছিল।)

গান

হৃদয় যত নিষেধ হানে নয়ন ততই কাঁদে।
দূরে যত পালাতে চাই, নিকট ততই বাঁধে ॥

স্বপন-শেষে বিদায়-বেলায়
অলক কাহার জড়ায় গো পায়,
বিধুর কপোল স্মরণ আনায়
ভোরের করুণ চাঁদে ॥

বাহির আমার পিছল হল কাহার চোখের জলে।
স্মরণ ততই বারণ জানায় চরণ যত চলে।
পার হতে চাই মরণ-নদী
দাঁড়ায় কে গো দুয়ার রোধি,
আমায়–ওগো বে-দরদী–
ফেলিলে কোন্ ফাঁদে ॥

[গান শেষ হইলে বাতায়নের আলো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সেই আলোকে এক প্রিয়দর্শন তরুণের মূর্তি স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। সে স্থির দৃষ্টিতে এই দিকেই তাকাইয়া আছে।]

ফিরোজা : মা–মা-মণি! ঘরের বাতিটা খুব উজ্বল করে দাও। যেন আমায় খুব ভাল করে দেখা যায় ও-বাড়ি হতে। (বাহিরে কাহার পদশব্দ শোনা গেল।)

হালিমা : ওরে ফিরোজ! বন্ধ কর, বন্ধ কর, পুব-জানালা। তোর আব্বা আসছে। (মির্জা সাহেব গৃহে প্রবেশ করিতেই একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ নিবিয়া গেল। হালিমা আবার বাতি জ্বালাইলেন।)

মির্জা সাহেব : আর জান্‌লা বন্ধ করতে হবে না। আমি বহুক্ষণ থেকেই তোমাদের কীর্তি দেখছি। দেখ আর যা-ই কর, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চেষ্টা করো না। (হালিমা নিরুত্তর)... আর ঐ বাঁদর ছোঁড়াটাকেই বা কি বলি! এক গাছা কাঁচা বেত নিয়ে বেতিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত... (ক্রোধে বদ্ধমুষ্টি হইয়া দাঁত কড়মড় করিয়া উঠিলেন।) দিনরাত গান আর গান! বাঁশি আর এস্‌রাজ! স্থিরচিত্তে একটু 'কোরআন তেলাওত্' করবার কি নামাজ পড়বার জো নেই! হতচ্ছাড়া পাজি কোথাকার! ঐ বিশ্ব-বখাটে আবার বলে, পাশ করবে বি.এ.। ও ত ফেল করেই আছে। ঐ রত্নের সঙ্গে দেবো মেয়ের বিয়ে!

হালিমা : দেখ তোমার পায়ে পড়ি, আজ একটু আস্তে আস্তে কও, আজ ফিরোজা কেমন যেন করছে!

মির্জা সাহেব : (পুব-দিককার জানালাটা বন্ধ করিতে করিতে) হুঁ!... তা এমন করে জানলা খুলে তাকিয়ে থাকলে যে-কোনো আইবুড়ো মেয়েরই অসুখ করে।...দেখ, তুমিই ফিরোজার মাথা খেলে। আর ওই বুড়ো বয়সেও তোমার গান গাওয়ার অভ্যেস গেল না। কী ভুলই করেছি স্কুলে-পড়া মেয়ে বিয়ে করে!

হালিমা : সত্যি, এ ভুল না হলে দুই জনই বেঁচে যেতাম। আমি এ-কথা ভাবতে পারিনে যে, কোন কোন গ্রাজুয়েট গোঁড়ামিতে কাঠ-মোল্লাকেও হার মানায়!

মির্জা সাহেব : শরীয়তের বিধি-নিষেধ মানাকে তুমি গোঁড়ামি মনে কর, এ অভিযোগ ত বহুবার শুনেছি, হালিমা। আর কোনো নতুন কথা শোনাবার থাকে ত বল্!

হালিমা : আছে। তোমার মত শরীয়তের টিন-বাঁধানো হৃদয়ে তা কি লাগবে?...একটু আগে গানের খোঁটা দিচ্ছিলে। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমি গান গাইতে পারি জেনেই তুমি আমায় বিবাহ করে কৃতার্থ করেছিলে!

মির্জা সাহেব : ভুলি নি সে-কথা। কিন্তু তখন জানতাম না তোমার গান শুধু চোখের জল, শুধু ব্যথা। কেন গান শরীয়তে নিষিদ্ধ, তা আমার চেয়ে কেউ

বেশি বুঝবে না! শরীয়তে যিনি সংগীত নিষিদ্ধ করেছিলেন, তিনি জানতেন এর ব্যথা দেওয়ার পীড়া দেওয়ার শক্তি কত!

হালিমা : আমি এও জানি, যিনি এই শরীয়তের স্রষ্টা, তিনি গান শুনে আনন্দও পেয়েছেন। যাক, তর্ক করবার স্থান এ নয়। মেয়েটাকে একটু শান্তিতে মরতে দেবে কি?

মির্জা সাহেব : দেখ, জীবনে হয় ত শান্তি দিই নি তোমাদের। আমার বিশুষ্ক জীবনে তোমাদের জন্য হাসির ফুল ফুটাতে পারি নি, শুধু কাঁটাই ফুটিয়েছি। কিন্তু মরণেও তোমাদের অশান্তি হানব, এত বড় গালি আমায় না-ই দিলে!

(হালিমা চমকিয়া উঠিলেন, ফিরোজা পাশ ফিরিয়া জলসিক্ত চোখে তাহার বাবার দিকে তাকাইল–মির্জা সাহেব পায়চারি করিতে লাগিলেন।)

ফিরোজা : আব্বা! আমার পাশে এসে বসো।

মির্জা সাহেব : (কাঁপিয়া উঠিলেন)... হালিমা! তুমি ফিরোজাকে দেখো, আমি ডাক্তার ডাক্‌তে চললাম!

ফিরোজা : আব্বা! আব্বা! দেখছ না কি রকম ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল আবার। তুমি যেয়ো না। আমি আর ওষুধ খাব না। একটু কাছে এসে বসো আজ লক্ষ্মীটি।

মির্জা সাহেব : (হঠাৎ শুষ্ক হইয়া উঠিলেন।) কিন্তু আমি থাকলে ত তোমার অসুখ আরো বেড়ে উঠবে মা!

ফিরোজা : না, আজ আর বাড়বে না। তুমি এস (মির্জা সাহেব তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার ললাটে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন)... আব্বা, আজ আমি খুব যা-তা বক্‌ব, তুমি কিছু বলবে না বল।

মির্জা সাহেব : আচ্ছা মা, বল।

ফিরোজা : তুমি ঐ পুব-জান্‌লাটা খুলতে দাও না কেন?

মির্জা সাহেব : (হঠাৎ কঠোর হইয়া উঠিলেন) ও ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, বাঁদর!... কিন্তু মা, তুমি ভাল হয়ে ওঠ। ও যদি বি. এ. পাশ করতে পারে এবার, তাহলে ঐ বাঁদরের গলাতেই মোতির মালা দেবো–এও ত বলে রেখেছি।

ফিরোজা : কিন্তু আমি ত আর ভাল হব না আব্বা।

মির্জা সাহেব : (শিহরিয়া উঠিলেন) না, মা, ভাল হবে। এখনই ত ডাক্তার আসবে।

ফিরোজা : উঁহুঁ, কিছুতেই ভাল হব না আমি।...আচ্ছা আব্বা, তুমি ওকে এ-বাড়ি আসতে দাও না কেন?

মির্জা সাহেব : (হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া চিৎকার করিয়া) আমি ওকে খুন করব! শয়তান আমার মেয়েকে খুন করেছে।

[বাহির দ্বারে করাঘাত শোনা গেল]

হাবিব : আমি এসেছি। আমায় খুন করুন।...মা, একটিবার দোর খুলে দিন।

মির্জা সাহেব : খবরদার! কেউ দোর খুলো না। বেরোও পাজি এখান থেকে।

হাবিব : পাশের খবর বের হয়েছে।

মির্জা সাহেব : পাশ করেছ?

হাবিব : এখনও খবর পাই নি। তার করেছি। হয়ত এখুনি খবর আসবে।

মির্জা সাহেব : মিথ্যাবাদী! আগে খবর আসুক, তারপর এসো। এখন বেরোও। মেয়ের অসুখ বেড়েছে।

হালিমা : আহা, দাও না বাছাকে আসতে। একটু দেখে যাবে বই ত নয়! ক'দিন থেকে ছেলেটা যেন ছট্‌ফটিয়ে মরছে।

মির্জা সাহেব : হাঁ? আর সেই দুঃখে নতুন নতুন গান গাওয়া হচ্ছে। চুপ কর তুমি। (চিৎকার করিয়া) এখনো দাঁড়িয়ে আছে?

হাবিব : আছি। আমায় খুন করবেন বলেছিলেন। খুন করুন, তবুও একবার দোর খুলুন মির্জা সাহেব।

মির্জা সাহেব : দেখেছ ব্যাটার মতলব। নিশ্চয় সাথে পুলিশ নিয়ে এসেছে। আমায় বলিয়ে নিতে চায় যে, আমি খুন করব বলেছি। আমি কখ্‌খনো খুন করব বলি নি। তুমি লক্ষ্মী-ছেলের মত বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়।

ফিরোজা : কেন এত অপমান সইছ আমার জন্যে, তুমি যাও। আমি তোমায় পেয়েছি।

হাবিব : পেয়েছ?

ফিরোজা : হাঁ, পেয়েছি।

হাবিব : কিন্তু, আমি ত পাই নি।

ফিরোজা : কাল পাবে। আমি আজ তোমায় উদ্দেশে যাব পুব-জান্‌লা দিয়ে। তুমি তোমার বাতায়নের ঝিলিমিলি খুলে রেখো।

হাবিব : কিন্তু তোমার বাতায়ন ত রুদ্ধ।

ফিরোজা : যখন যাব, তখন আপনি খুলে যাবে।

হাবিব : তবে যাই আমি।

ফিরোজা : যাও। যাওয়ার কালে আমার ঝিলিমিলি-তলে সেই যাওয়ার গানটা শুনিয়ে যাও।

[হাবিবের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

শুকাল মিলন-মালা, আমি তবে যাই।
কি যেন এ নদী-কূলে খুঁজিনু বৃথাই ॥
রহিল আমার ব্যথা
দলিত কুসুমে গাঁথা,
ঝুরে বলে ঝরা পাতা–
নাই কেহ নাই ॥
যে-বিরহে গ্রহতারা সৃজিল আলোক,
সে-বিরহে এ-জীবন জ্বলি' পুণ্য হোক।
চক্রবাক চক্রবাকী
করে যেমন ডাকাডাকি
তেমন এ-কূলে থাকি
ও-কূলে তাকাই ॥

ফিরোজা : মা! মা! আমার কেমন করছে! তুমি আমায় ধর! আব্বা, তুমি যাও। তোমায় ভাল লাগে না। ...মা! মা! এত বাতি জ্বলে উঠল কেন? (মূর্ছিত হইয়া পড়িল)

হালিমা : ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, যাও ডাক্তারকে দেখ একটু। মা! সোনা মা আমার! লক্ষ্মী মা! ফিরোজ!

মির্জা সাহেব : ফিরোজ! মা! তুই ফিরে আয়! আমি হাবিবকে ফেরাতে যাচ্ছি।
[বিদ্যুৎবেগে বাহির হইয়া গেলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান স্বপ্নপুরী। সাদা মেঘের পাল-টাঙানো সপ্তমী চাঁদের পান্সিতে চড়িয়া হাবিব ও ফিরোজা ভাসিয়া চলিতেছে। শ্বেত-মরালীর সারি ডানা দিয়া দাঁড় টানিতেছে। তাহাদের ভিড় করিয়া ঘিরিয়াছে চকোর-চকোরী। ময়ূর-কণ্ঠী আলোতে হাবিবের মুখ

তাহাদের ভিড় করিয়া উঠিয়াছে। সারা আকাশ যেন যুঁই-বাগানের মত বিকশিয়া উঠিয়াছে।]

ফিরোজা : এ আমরা কোথায় এসেছি, হাবিব?

হাবিব : (হাসিয়া) ছি, নাম ধরে ডাক্‌তে নেই এখানে। এখানে আসতে হয় নাম হারিয়ে, সকল নামের দিশা ছাড়িয়ে। এখানে হাবিবও আসতে পারে না, ফিরোজাও আসতে পারে না।

ফিরোজা : তবে যে আমরা এসেছি।

হাবিব : একবার চাঁদের জ্যোস্না-মুকুরে ভাল করে নিজের মুখ দেখ দেখি!

ফিরোজা : (সভয়ে) এ কি, আমি যে আমায় চিনতে পারছিনে! এ আমি কে?

হাবিব : (হাসিয়া) কার মত বোধ হয়?

ফিরোজা : এ যেন–এ যেন সকলের মুখ! এ যেন শকুন্তলার, এ যেন মালবিকার, এ যেন মহাশ্বেতার মুখ! এ যেন লায়লির, এ যেন শিরীর মুখ!

হাবিব : সত্যিই তাই, তোমার মুখে আজ নিখিল-বিরহিণী ভিড় করেছে। এখানে আসতে হয় শুধু 'প্রিয়' আর 'প্রিয়া' হয়ে। এখানে নর-নারী অ-নামিক। এ-লোকে নর-নারীর পরিচয়-সঙ্কেত 'প্রিয়' আর 'প্রিয়া'। এখানে ডাকতে হয় শুধু 'প্রিয়তম' বলে।

ফিরোজা : (লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল, চাঁদকে ঘিরিয়া রামধনুর সাত-রঙা শোভা বিজলির মত খেলিয়া গেল!) যা! (কানে কানে) চকোর-চকোরী শুনতে পাবে যে!

হাবিব : শুনুক। ধরায় আমাদের যে কথা কানাকানি হয়ে আছে, তারায় তারায় আজ, তারি জানাজানির হুল্লোড় পড়ে গেছে। দেখছ না প্রিয়তম! কত নব নব তারা জন্ম লাভ করল সৃষ্টির নীহারিকা-লোকে, শুধু ঐ কানে-কথাটি শুনবার লোভে। ঐ কানে-কথা শুনবে বলেই ত চন্দ্রলোকে এত চকোর-চকোরীর ভিড়!

ফিরোজা : এ কোন্ লোক, প্রিয়তম? (চাঁদ দুলিয়া উঠিল)

হাবিব : দেখলে? চাঁদ দুলে উঠল তোমার 'প্রিয়তম' ডাকের নেশায়!... এ স্বপ্ন-লোক!

ফিরোজা : স্বপ্ন-লোক! তাহলে এ-স্বপ্ন টুটে যাবে? আবার তোমায় হারাব?

হাবিব : হয় ত হারাবে, হয় ত হারাবে না; জানিনে।...এ স্বপ্ন-লোক এত ক্ষণিক বলেই এত সুন্দর।... না, না, এ স্বপ্ন-লোক চিরদিনের, এ সুন্দরের আকঙ্ক্ষা লোক, এর কি মৃত্যু আছে? এর কি শেষ আছে?

ফিরোজা : তবে ভয় হয় কেন? এখনই এর শেষ হয়ে যাবে মনে করে?

হাবিব : ঐ শেষের ভয়–ঐ হারাবার ভয় আছে বলেই এত মধুর এ-লোক। তাই এমন জড়িয়ে ধরে আছি পরস্পরকে। চোখের পাতা ফেললেই এ স্বপ্ন টুটে যাবে ভয়েই ত এমন পলক-হারা হয়ে চোখে চোখে চেয়ে থাকি। ঐ হারাবার ভয়েই ত চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র এমন বিপুল আবেগে পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না–পায়ে পায়ে ঘুরে ফিরছে।

ফিরোজা : তাহলে এই বেহেশ্‌ত?

হাবিব : এই বেহেশ্‌ত।

ফিরোজা : তাহলে আর যারা বেহেশ্‌তে এসেছে তারা কই? শিঁরী, লায়লী, জুলেখা? আর ফরহাদ, মজনুঁ, ইউসুফ?

হাবিব : আমাকে ভাল করে দেখ দেখি।

ফিরোজা : (সভয়ে হাবিবকে জড়াইয়া ধরিল) ওগো, একি? তোমার এত বিপুলতা আমি সইতে পারব না। তুমি যেন নিখিল-পুরুষ, তুমি যেন অনন্তকাল ধরে কাঁদছ।

হাবিব : (হাসিয়া ফিরোজার কপোলে তর্জনি ও মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়া মৃদু আঘাত করিতে লাগিল)। ভয় নেই, প্রিয়তম! আর একবার দেখ, তুমি যাকে দেখতে চাইবে তাকেই দেখতে পাবে আমার মুখে।

ফিরোজা : (তাকাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল) আচ্ছা বেহেশতের হুর-পরী সব কই?

হাবিব : তুমি ইচ্ছা করলেই তারা আসবে। এখানে বাসনা দিয়ে তাদের সৃজন করতে হয়!

ফিরোজা : তারাও সব তাহলে আমাদের মধ্যে?

হাবিব : হাঁ, এখানে–এই স্বর্গলোকে–শুধু দুটি নরনারী–তুমি আর আমি–অনন্তকাল ধরে মুখোমুখি বসে আছে। তাদের চোখে পলক নেই। বুঝি পলক পড়লেই বিশ্ব কেঁদে উঠবে। হারিয়ে যাবে সুন্দর এ স্বর্গ-লোক। হারিয়ে যাব আমি আর তুমি।

ফিরোজা : (হাবিবকে জড়াইয়া ধরিল) প্রিয়তম!

হাবিব : (ফিরোজার কপোলে কপোল রাখিয়া) প্রিয়তম!

[চন্দ্র দোল খাইতে লাগিল! চকোর-চকোরী উন্মত্ত হইয়া উঠিল। হাবিব ও ফিরোজা চাঁদের সাথে দোল খাইতে খাইতে অস্ত গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[মির্জা সাহেবের অন্দরমহল। ফিরোজা পালঙ্কে মূর্ছিতা। ঘরে ডাক্তার, হালিমা, মির্জা সাহেব।...ভোর হইয়া আসিয়াছে। আকাশ তখনো মেঘাচ্ছন্ন। মেঘলা আকাশ চিরিয়া 'বৌ কথা কও' পাখির স্বর দূর হইতে দূরান্তরে মিশিয়া গেল। প্রদীপ-শিখা ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। হালিমা বারে বারে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন ও কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছেন। মির্জা সাহেব অস্থিরভাবে পায়চারী করিয়া ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ পুবের জানলাটা পরিপূর্ণরূপে খুলিয়া দিলেন। হাবিবদের বাড়ি প্রেতমূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখা গেল। হাবিবদের কামরার বাতায়ন রুদ্ধ। শুধু ঝিলিমিলি খোলা। ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়া নিবু-নিবু দীপশিখার মলিন আলো কান্নার মত করুণ হইয়া দেখা দিতেছে। ভিতরের আর কিছু দেখা যাইতেছে না। ডাক্তার বারে বারে নাড়ি দেখিতেছেন। শেষে হাতে একটা ইঞ্জেকশন দিয়া ডাক্তার কাহাকেও কিছু না বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে উঠিয়া গেলেন।]

ফিরোজা : (নড়িয়া উঠিল) মাঃ!

হালিমা : (ছুটিয়া গিয়া ফিরোজার উপর যেন হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন) মা! মা আমার! ফিরোজ! ফিরে এসেছিস্! মানিক আমার! আমার!

মির্জা সাহেব : ফিরোজ! মা! আবার চললাম খুঁজতে তাকে। ঐ সকাল হয়ে এলো। আল্লাহ্! এবারটি আমায় মাফ কর। আমি তোমার ইঙ্গিত বুঝেছি। হালিমা! মাকে আমার ধরে রেখো। আমি হাবিবকে খুঁজতে চললাম। (ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেলেন)

ফিরোজা : মা-মণি খুব কেঁদেছ বুঝি? ও কি! পুব-জানলা খুললে কে?

হালিমা : (ললাটে গভীর চুম্বন আঁকিয়া দিলেন) তোমার আব্বা।

ফিরোজা : মা, আব্বাকে ডাক।

হালিমা : তিনি যে হাবিবকে ডাকতে গেলেন, মা! আজ তোদের বিয়ে (মা ম্লান হাসি হাসিলেন)।

ফিরোজা : (উজ্জ্বল হাসি হাসিয়া) মা, তুমি আব্বাকে খুব ভালবাস?

হালিমা : (হাসিয়া) আজ তোর সাথে সাথে প্রথম ভালোবাসলুম। (মুখ ফিরাইলেন)।

ফিরোজা : (মা'র হাতে চুমু খাইল) দুষ্টু মেয়ে! তাহলে তোমাদেরও আজ বিয়ে হল। তাহলে আমি তোমাদের কে হলাম?

হালিমা : ক্ষ্যাপা মেয়ে! তুই আমাদের মা হলি। হল ত?

ফিরোজা : (হঠাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া হাবিবের ঝিলিমিলির পানে তাকাইয়া থাকিল) মা! মা! ও জানালা বন্ধ কেন?

হালিমা : অভিমানী ছেলে–রাত্রে কোথায় চলে গেছে। যাবে আর কোথায়? এখ্খুনি হয়ত আসবে। তোমার আব্বা ওকে না নিয়ে ফিরছেন না।

ফিরোজা : (শয্যায় ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর মত লুটাইয়া পড়িল) মা! মা গো! সে আর ফিরবে না। আমার স্বপ্নই তাহলে সত্য হল। ঐ অস্তচাঁদের চোখে তার অশ্রু লেগে রয়েছে। মা! মা! ও কি? ও কার গান? (দূরে হাবিবের ক্লান্ত কণ্ঠের করুণ বিলাপ-গীতি শোনা যাইতেছিল।)

গান

স্মরণ-পারের ওগো প্রিয় তোমায় আমি চিনি যেন।
তোমার চাঁদে চিনি আমি, তুমি আমার তারায় চেন ॥
নতুন পরিচয়ের লাগি'
তারায় তারায় থাকি জাগি'
বারে বারে মিলন মাগি'
বারে বারে হারাই হেন ॥

নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি, চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নের ঝিলিমিলি।
নিবাও নিবু-নিবু বাতি,
ডাকে নতুন তারার সাথী,
ওগো আমার দিবস-রাতি
কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন ॥

ফিরোজা : মা! মা! চাঁদের পার হতে ভেসে আসছে ও-গান। ও-গান স্বপন-লোকের, ও গান বেহশ্‌তের। মা–গো–!

হালিমা : হাবিব! হাবিব! ছুটে আয় বাপ আমার! তোর ফিরোজা চলে যায়। মা! মা আমার রে! (লুটাইয়া পড়িলেন)

হাবিব : (ঝড়ের বেগে দ্বারে করাঘাত হানিয়া) মির্জা সাহেব! দোর খুলুন! খোলা দ্বার! 'তার' পেয়েছি। আমি বি.এ. পাশ করেছি। খোলো দ্বার। (দ্বারে পদাঘাত করিল, দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল।) মা! মা! ফিরোজ কই, আমি পাশ করেছি। এই দেখ 'তার'–পারদর্শিতার সহিত পাশ!

হাবিব : (ক্রন্দন-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল) চলে গেছে?

হালিমা : চলে গেছে–ঐ পুব-জান্‌লা দিয়ে। বল্‌লে, 'চললাম ঐ জান্‌লার ঝিলিমিলি খুলতে।'

হাবিব : মা! আমি তাকে খুঁজতে চল্‌লাম। ঐ অস্ত-চাঁদের চোখে তার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছি। [ঝড়ের বেগে চলিয়া গেল]।

[যবনিকা]

Louver

First Scene

[The upper room of Mirza Saheb's two-storey house. Mirza Saheb's sixteen-year-old daughter, Firoza, lies sick in bed. All the windows are closed, only the west door is open. It is raining outside. Sitting next to her, Mirza Saheb's wife, Halima Bibi, is fanning her daughter. In the cloudy, late-afternoon light, the darkness in the room was growing thick. Halima Bibi gets up and lights a lantern.]

Firoza: Mother! Halima**:** (Rushing over and putting her face close to Firoza's) what is it, my dear?

Firoza: Turn off the light! Halima**:** Why, my child? It's so dark! You'll be afraid.

Firoza: No. You just hold me. (She holds on to her mother.) The light is ugly.

Halima: It will seem that way, my dear. (She hides a long sigh.) Okay, I'll cover it with paper. How about that?

Firoza: No. You turn it off. (The sick girl cries out in a weak voice.) Do it quickly!

Halima: Don't cry, my precious. Here, I'm turning it off. (She starts to turn off the light. By this time, several monsoon insects had come and were dancing around the light. Firoza begins to watch them intently.)

Firoza**:** Don't turn it off, Mother! I want to watch the monsoon insects.

Halima: (Smiling, she turns back) you crazy girl! Okay, I won't turn it off. But the insects will land on your face and body, so let me move the light a little.

Firoza: (Crying out and weeping) No! I said, I want to watch the monsoon insects!

Halima: (Kissing her daughter) my good girl! Don't talk so loudly! It'll make you sicker! I'm not moving the light.

Firoza: (She falls silent and watches the insects.) Mother, can you catch a monsoon insect for me?

Halima: No, my precious! You shouldn't touch insects. Why are you acting this way today, Firoza?

Firoza: (In a tearful tone) I said, give me one! Or I won't keep anything quiet!

Halima: Don't cry, my dear! Here, I'm giving you one. (She catches a monsoon insect and gives it to her daughter. Firoza holds it in her hand and watches it intently.)

Firoza: Oh no! Its wing fell off! Poor thing! Mother, did it hurt the monsoon insect a lot?

Halima: Of course, it did!

Firoza: Then let me let it go. Mother, you go and put it down. (Halima places the monsoon insect on the floor and comes back.) ...Mother, is it raining hard outside?

Halima: Yes, my dear, it's raining hard. Can't you hear the downpour?

Firoza: I really like the sound of the rain... Mother, where is father*?

Halima: Outside, in the courtyard** I think.

Firoza: If I cry very loudly now, will my father hear me?

Halima: My goodness, why would you cry? Should I call him?

Firoza: No, no, don't call him. You're a very good girl. Mother, if you sing now, will father hear?

Halima: Oh, you naughty girl! I understand what you're doing... No, my child, who sings now? Your father will get angry if he hears.

Firoza: Will he hear in all this rain? Mother, my good mother, my darling mother, sing that rainy song quietly!

Halima: Okay, I'll sing it quietly. But do I even remember how to sing anymore, Firoza? I sang that song so long ago in my

childhood. I've been trying to forget it since I came here. Your father gets so angry if he hears singing.

Firoza: Mother, does anyone get angry at hearing a song? What a strange person father is, anyway.

Halima: He didn't get angry a few days ago... I almost forgot how to sing. I still remember a couple of songs only because of you.

Firoza: Father didn't get angry before when you sang, Mother?

Halima: No... You listen to the song now.

[Halima sings a song]

A deep secret stream murmurs,
murmurs in this month of Shravan,
Today, the heart rumbles, rumbles in this lonely courtyard.
In the dense shade of the Jhao trees, in the shadows of the bamboo groves,
The Dahu cries out, searching for the Dahu, in the dark forest.
In the Kewra grove, a thunder-quiver tied,
It roams, crying, in the sky, in the sky.
In the thickets of cane, under the Kadamba tree,
The peacock forgets to dance, its tail feathers tremble.
On the Malati vine, with a disheveled braid, the sad woman cries,
Someone wipes the mascaraed eyes, in the Tamal forest.

Firoza: Mother! Open the window! I want to see the clouds!

Halima: My good girl! Don't open the window. You'll catch a cold. I'll sing another song for you to listen to instead.

Firoza: No, Mother! I can't bear another song. Please, Mother, open the window! (Halima goes to open the south window.) Not that one, Mother, open the one on the east side! The east wind makes the Kadamba flowers bloom, doesn't it, Mother?

Halima: If I open that window, your father won't let me live, Firoza! I'll open this south window. (She opens the south window. A glimpse of the forest can be seen in the distance. The rain is making the forest appear blurry.)

Firoza: (Sighing, she turns on her side. She turns back again and lies down just as before, staring at the window. It seems she was crying.) Mother!

Halima: My child! Are you crying, Firoza?

Firoza: Mother, does father love you very much?

Halima: Should I move the light now? It's bothering your eyes, isn't it?

Firoza: Okay, move it. But you tell me...

Halima: (She moves the light.) Now you should be quiet and go to sleep, Firoza. Talking will make you sicker.

Firoza: All right, don't say anything. I understand everything. Father never loved anyone. Otherwise, how can a person be so apathetic and cruel?

Halima: Will you be quiet, Firoza, my good girl? Tell me, why are you so sad? The doctor told you to be quiet today.

Firoza: Mother, will you open that east window from tomorrow, then father won't scold you?

Halima: (She shudders. Her voice breaks with tears.) What are you saying, Firoza?

Firoza: I won't ask you to open that window tomorrow, Mother! (She hides her face in the pillow.) **Halima:** (Suddenly becomes as still as a stone. Her voice becomes distorted with tears.) I understand, my unfortunate girl, I understand everything. You are leaving us with a great punishment... My child, I'm opening the east window for you, don't be so restless. (As she opens the east window, a dimly lit window in the house across the street becomes visible. A shadow is restlessly pacing back and forth in the window. From a distance, it looks like a silhouette. The silhouette stands still. It seems as if it is staring intently at this window. Halima wipes her eyes behind her daughter's back.)

Firoza: (She stares at the window with a yearning gaze.) Mother, isn't that a flute playing? No... Someone is crying! (Restlessly) Who is crying outside, Mother? Mother, Mother, listen!

Halima: Where, my child, I don't hear anything. That's the sound of the rain... Hmm... no... perhaps Habid is singing, Esraj Bajid is singing.

Firoza: Ah! If only the rain would stop, I could hear the song... The rain is stopping, isn't it, Mother?

Halima: Yes, my child, the rain has slowed down.

Firoza: Mother! Mother! Now I can hear the song. Ah! Don't make any noise. Mother, you listen quietly. (A song drifts in from the window.)

[Song]

The more the heart forbids,The more the eyes weep.The more I try to flee far away,The closer I am bound.At the end of a dream,At the time of farewell,Whose hair gets entangled at the feet?The memory of a tearful cheek is brought backBy the melancholy moon of dawn.My outer world became slipperyWith whose tears?The more my feet walk,The more memories warn me.I want to cross the river of death,Who stands at the door, blocking my way?O merciless one,In what trap have you thrown me?

[When the song ends, the light from the window becomes brighter. In that light, the figure of a handsome young man becomes clearly visible. He is staring intently in this direction.]

Firoza: Mother! My mother! Make the light in the room very bright! So that they can see me clearly from that house! (Someone's footsteps are heard outside.)

Halima: Oh, Firoza! Close it, close the east window! Your father is coming! (As Mirza Saheb enters the house, a gust of wind blows and extinguishes the lamp. Halima lights the lamp again.)

Mirza Saheb: You don't have to close the window anymore. I have been watching your actions for a long time. Look, do whatever you want, but don't try to eat grass by jumping over a horse. (Halima is silent.) And what can I even say about that monkey boy! I'll take a green cane and whip him from head to toe... (In his anger, he clenches his fists and grinds his teeth.) Day and night, it's just singing and singing! Flute and Esraj! Don't they have the courage to recite the Qur'an or say their prayers with a

calm mind! That wretch, that scoundrel! That good-for-nothing again says he'll pass B.A. He's already failed. And I'm supposed to marry my daughter to a gem like that!

Halima: Please, I beg you, speak a little more quietly today. Firoza is acting strangely today!

Mirza Saheb: (Closing the east window) Hmm!... Of course, any unmarried girl will get sick if she keeps staring out a window like this... Look, you're the one who's spoiling Firoza. And even in your old age, you haven't given up your habit of singing. What a mistake I made marrying a schoolgirl!

Halima: Truly, if you hadn't made this mistake, both of us would have been at peace. I can't believe that some graduates can even outdo an ignorant village Mullah in their fanaticism!

Mirza Saheb: You think obeying the rules of Sharia is fanaticism, Halima. I've heard that accusation many times. If you have anything new to say, then say it!

Halima: I do. But will it touch a heart sealed with the rules of Sharia like yours?... You were just taunting me about my singing. But you're forgetting that you married me and considered yourself fortunate because you knew I could sing!

Mirza Saheb: I haven't forgotten that. But I didn't know then that your songs were only tears, only pain. No one will understand better than me why music is forbidden in Sharia! The one who forbade music in Sharia knew how much power it had to cause pain and torment!

Halima: I also know that the creator of this Sharia also enjoyed listening to music. Anyway, this is not the place for an argument. Will you let this girl die in peace?

Mirza Saheb: Look, maybe I didn't give you peace in life. In my arid life, I couldn't make flowers of laughter bloom for you, I only made thorns bloom. But don't give me such a great curse that I would cause you unrest even in death!

(Halima shudders, Firoza turns on her side and with tear-filled eyes, and she looks at her father. Mirza Saheb begins to pace back and forth.)

Firoza: Father! Come and sit next to me.

Mirza Saheb: (He trembles)... Halima! You look after Firoza, I'm going to call the doctor!

Firoza: Father! Father! Can't you see the storm and rain are starting again? Don't go. I won't take any more medicine. Just come and sit close to me today, please.

Mirza Saheb: (He suddenly becomes stiff.) But if I stay, your illness will get even worse, my child!

Firoza: No, it won't get worse today. You come. (Mirza Saheb sits next to her bed and strokes her forehead.) ...Father, I'm going to talk a lot of nonsense today, but you won't say anything, right?

Mirza Saheb: Okay, my child, say what you want.

Firoza: Why don't you let me open that east window?

Mirza Saheb: (He suddenly becomes harsh) That scoundrel, that rascal, that monkey!... But my child, you get well. If he can pass his B.A. this time, I'll put a pearl necklace around that monkey's neck—I have even said that.

Firoza: But I'm not going to get well, Father.

Mirza Saheb: (He shudders) No, my child, you will get well. The doctor will be here any minute.

Firoza: No, I won't get well at all... Father, why don't you let him come to this house?

Mirza Saheb: (Suddenly getting up from the bed and shouting) I will kill him! That devil has killed my daughter!

[A knock is heard on the door outside]

Habib: I have come. Please kill me... Mother, please open the door just once.

Mirza Saheb: Be careful! No one open the door! Get out of here, you scoundrel!

Habib: The results for the exam have been released.

Mirza Saheb: You passed?

Habib: I haven't received the news yet. But I've sent a telegram. The news will probably come now.

Mirza Saheb: Liar! Let the news come first, then come. Get out now! My daughter's illness has gotten worse.

Halima: Oh, let the child in! He just wants to see her! The boy has been restless for days.**Mirza Saheb:** Huh? And because of that sorrow, you're singing new songs. You be quiet! (Shouting) Are you still standing there?

Habib: I am. You said you would kill me. Kill me, but at least open the door once, Mirza Saheb!

Mirza Saheb: Look at his intention! He must have brought the police with him. He wants me to admit that I said I would kill him. I never said I would kill anyone. You be a good boy and go home and lie down.

Firoza: Why are you enduring so much insult for my sake? You go. I have found you.**Habib:** You have found me?

Firoza: Yes, I have.

Habib: But I haven't found you.

Firoza: You will tomorrow. Today, I'll go to you through the east window. You keep the jhilimili of your window open.

Habib: But your window is closed.

Firoza: When I go, it will open on its own.

Habib: Then I'll go now.

Firoza: Go. As you leave, sing that farewell song below my jhilimili.

[Habib leaves, singing.]

[Song]

Our garland of meeting is withered, so I must go.
What am I searching for in vain by this riverbank?
My pain remains,Woven with crushed blossoms,
The fallen leaf hangs and says,
There is no one, no one.
May this life be blessed by burning with that separation,
The one that created light from the stars of grief.
Like the Chakravaka and ChakravakiCalling out to each other,
I stay on this bankAnd gaze at that bank.

Firoza: Mother! Mother! I feel so strange! Hold me! Father, you go. I don't like you... Mother! Mother! Why are so many lights lit? (She faints.)

Halima: Oh, I beg you, go and see the doctor! My child! My darling child! My good girl! Firoza!

Mirza Saheb: Firoza! My child! You come back! I'm going to bring Habib back!

[He rushes out like a storm.]

Second Scene

[Location: Dreamland. Firoza and Habib float along on the crescent moon of the seventh day, which is covered in white clouds. A flock of white swans rows with their wings. Chakovor and Chakovi birds surround them. In the peacock-throated light, Habib's face is illuminated. The entire sky seems to have blossomed like a garden of jasmine.]

Firoza: Where have we come, Habib?

Habib: (Smiling) Oh, you must not call by name here. You have to come here by losing your name, by leaving behind all names. Habib cannot come here, and Firoza cannot come here.

Firoza: But we have come.

Habib: Look closely at your face in the mirror of the moon's light!

Firoza: (Fearfully) what is this? I can't recognize myself! Who is this me?

Habib: (Smiling) who does it look like?

Firoza: It's as if—it's as if it's everyone's face! It's Shakuntala's, it's Malavika's, it's Mahashweta's face! It's as if it's Laili's, it's Shirin's face!

Habib: That's true, all the separated women of the world have gathered on your face today. You must come here as only 'beloved' and 'darling.' Here, men and women are nameless. In this world, the sign of a man and woman is 'beloved' and 'darling.' Here, you must call only 'my darling.'

Firoza: (Blushing with shame, the seven colors of the rainbow around the moon shimmered like lightning!) Go on! (In a whisper) The Chakovor-Chakovi birds will hear!

Habib: Let them hear. The secret we whispered on earth, today its joyous uproar is spreading from star to star. Look, my darling! How many new stars were born in the nebula of creation, just for the greed of hearing that whispered word. It's for the sake of hearing that whispered word that there is such a crowd of Chakovor-Chakovi in the moon world!

Firoza: What world is this, my darling? (The moon sways.)

Habib: Did you see? The moon swayed with the intoxication of you calling me 'my darling!'... This is the world of dreams!

Firoza: The world of dreams! Then will this dream break? Will I lose you again?

Habib: Maybe you will, maybe you won't; I don't know... This world of dreams is so beautiful because it is so fleeting... No, no, this is an eternal world of dreams, the world of desire for beauty, does it have death? Does it have an end?

Firoza: Then why am I afraid? Afraid that it will end now?

Habib: It's because there is that fear of ending—that fear of losing each other, that this world is so sweet. That's why we hold each other so tightly. We stare into each other's eyes without blinking, for fear that if we blink, this dream will break. It's for the fear of losing each other that the moon, sun, planets, and stars don't avoid each other's gaze with such great emotion—they revolve around each other step by step.

Firoza: So this is Paradise?

Habib: This is Paradise.

Firoza: Then where are the others who have come to Paradise? Shirin, Laili, Zulaikha? And Farhad, Majnun, Yusuf?

Habib: Look closely at me.

Firoza: (Fearfully, she hugs Habib) Oh, what is this? I can't bear this immensity of yours. It's as if you are all men, as if you have been crying for eternity.

Habib: (Smiling, he lightly taps Firoza's cheek with his index and middle fingers.) Don't be afraid, my darling! Look again, you will be able to see anyone you want to see in my face.

Firoza: (Looking, she lets out a sigh of relief.) Okay, where are all the Houris and fairies of Paradise?

Habib: They will come if you wish them to. You must create them here with your desire!

Firoza: So they are all within us?

Habib: Yes, here—in this heaven—only two lovers—you and I—sit facing each other for eternity. They do not blink. It's as if if they blink, the world will weep. This beautiful world of heaven will be lost. You and I will be lost.

Firoza: (Hugging Habib) my darling!

Habib: (Placing his cheek against Firoza's) my darling!

[The moon begins to sway! The Chakovor-Chakovi birds become frantic. Habib and Firoza, swaying with the moon, vanish.]

Third Scene

[Mirza Saheb's inner chamber. Firoza lies unconscious on a bed. In the room are the doctor, Halima, and Mirza Saheb... Dawn is breaking. The sky is still cloudy. Piercing through the overcast sky, the sound of the `Bou Katha Kao` bird (Tell me, bride) fades into the distance. The flame of the lamp is dimming. Halima repeatedly wipes her eyes with her pallu and looks at her daughter's face. Mirza Saheb paces back and forth restlessly and suddenly opens the east window fully. The house of Habib's family can be seen standing like a ghost. The window of Habib's room is closed. Only the jhilimili is open. A faint light from a flickering lamp can be seen through the gap in the jhilimili, looking sad like a tear. Nothing inside can be seen. The doctor repeatedly checks Firoza's pulse. Finally, holding a syringe, the doctor leaves without saying anything, wiping his eyes.]

Firoza: (She stirs.) Mother!

Halima: (Rushing over and collapsing on Firoza.) My child! My child! Firoza! You've come back! My precious! Mine!

Mirza Saheb: Firoza! My child! I'm going to look for him again! It's morning now. Oh, Allah! Forgive me this one time. I have understood your sign. Halima! Hold on to our daughter! I'm going to find Habib! (He rushes out like a storm.)

Firoza: Mother, you've been crying a lot, haven't you? What is it! Who opened the east window?

Halima: (She plants a deep kiss on her forehead.) Your father.**Firoza:** Mother, call father.

Halima: He has gone to call Habib, my child! Today is your wedding (the mother gives a faint smile).

Firoza: (Smiling brightly) Mother, do you love father very much?

Halima: (Smiling) today, along with you, I loved him for the first time. (She turns her face away.) **Firoza:** (She kisses her mother's hand.) You naughty girl! So, today is your wedding, too. Then what am I to you both?

Halima: You crazy girl! You are our mother. Aren't you?

Firoza: (Suddenly sitting up and staring at Habib's jhilimili.) Mother! Mother! Why is that window closed?

Halima: That moody boy—he went somewhere during the night. Where could he have gone? He'll probably be back soon. Your father won't return without bringing him back.

Firoza: (She falls on the bed like a severed pigeon.) Mother! Oh, Mother! He won't come back! My dream has come true, then. His tears are on the eyes of that setting moon. Mother! Mother! What is that? Whose song is that? (Habib's tired, sorrowful wailing is heard in the distance.)

[Song]

I recognize you, my darling, beyond the reach of memory.I know you by your moon, you know me by my star.For the sake of a new acquaintance,I stay awake from star to star,I ask for a reunion again and again,And again and again I lose you.Lighting a lamp in new eyes, I watch alone.Open, my darling, the jhilimili of your world's window.Extinguish the flickering lamp,The companion of a new star is calling,Why do my days and nightsCry with a farewell weeping?

Firoza: Mother! Mother! That song is floating in from beyond the moon! That song is from the world of dreams that song is from Paradise! Oh, Mother!

Halima: Habib! Habib! Come running, my child! Your Firoza is leaving! My child! Oh, my child! (She collapses.)

Habib: (Knocking on the door like a storm) Mirza Saheb! Open the door! The door is open! I have received the telegram! I passed my B.A.! Open the door! (He kicks the door, and the door breaks.) Mother! Mother! Where is Firoza? I passed! Look at this telegram—I passed with distinction!

Habib: (He screams in a tearful voice.) She's gone?

Halima: She's gone—through that east window! She said, "I'm going to open that window's jhilimili."

Habib: Mother! I'm going to find her! I've seen her sign in the eyes of that setting moon! [He leaves like a storm.]

[Curtain]

Translated by Alamgir Mohammad

পুতুলের বিয়ে

(ছোট মেয়েদের নাটক)

উৎসর্গ

সানি ও নিনি
—কল্যাণীয়েষু

—কুশীলব—

মেয়ে—

কমলি, টুলি, পঞ্চি, খেঁদি, বেগম, ঠাকুর-মা।

পুরুষ—

কমলির দাদামণি ও পুরুত ঠাকুর।
(পঞ্চি ময়মনসিংহের ও খেঁদি বাঁকুড়া জেলার অধিবাসিনী।)

(পুতুল খেলিতে খেলিতে মেয়েদের গান)

খেলি আয় পুতুল-খেলা
বয়ে যায় খেলার বেলা সই।
বাবা ঐ যান আপিসে ভাবনা কিসের,
খোকারা দোলায় ঘুমায় ঐ ॥

দাদা যায় ইস্কুলেতে, মা খুড়িমা
রান্না করেন ঐ হেঁসেলে,
ঠান্‌দি দাওয়ায় ঝিমোয় বসে
ফোক্‌লা বদন মেলে।
আয় লো ভুলি পঞ্চি টুলি
পট্‌লী খেঁদি কই ॥

কম্‌লি : তা হলে ভাই টুলি, তোকে আর টুলি বল্‌ব না। তুই আজ থেকে আমার বেয়া'ন হলি, কেমন? আজ যে চীনে-পুতুলের সঙ্গে তোর মেম-পুতুলের বিয়ে।

টলি : না ভাই কম্‌লি, তোর ঐ কদা-কুচ্ছিৎ চীনে-পুতুলটার সঙ্গে আমার মেম-পুতুলের বিয়ে দেবো না। বাবা! তোর ঐ পুতুলটা যা চোখ উল্টোয়! আমার পুতুল ওকে দেখ্‌লে ভয়ে আঁৎকে উঠবে। তার চেয়ে—তোর ঐ পুতুলটি, যার নাম রেখেছিস্ ডালিম কুমার—ঐটিকে আমি জামাই করব।

কম্‌লি : মা গো, কি হবে! তা হলে আমার চীনে পুতুলের বিয়ে হবে কি করে? ওকে যে কেউ বিয়ে কর্‌তে চায় না। অত বড় ছেলে আমার আইবুড়ো হয়ে থাক্‌বে? মা গো, লোকে বল্‌বে কি!

টুলি : তা ভাই, তুই বরং পঞ্চির মেয়ের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কর না।

পঞ্চি : কি কস্। পঞ্চির বেডি অত হস্তা না! ওই চীনা অলম্বুস্‌ডারে জামাই কর্‌বি নি। ওডা দেখ্‌বার যেমন ভূতের লাহান, নামও তেমনি রাখছে—ফুচুং। উয়ারে দেইহাই আমার মায়্যা এক্কুরে চিক্কুর পাইর‍্যা ফাল দিয়া উঠ্‌ব! টুলি আপন বেডিরে দেয় না ক্যান?

টুলি : বাপ্‌রে, ওকে আর ক্ষ্যাপাস্ নে ভাই! তার চেয়ে বরং বাঁক্‌ড়ি খেঁদিকে বলে দেখ, সে যদি মেয়ে দিতে রাজি হয়!

খেঁদি : বটে! সে হবেক্ নাই ভাই! আমার বিটিকে বিষ খাওয়াই মেরে ফেল্‌ব, তবু উ চীনাটাকে বিয়া দিব নাই! টুলি একটা চীনা মেয়্যা আনা করাক, উয়ার সঙ্গে তখন ঐ চীনা পুতুলের বিয়া দিবেক।

কম্‌লি : না ভাই, তোরা সব আমার খোকাকে অমন করে যা-না তাই বলিস্‌নে। খোকা একটু খ্যাঁদা আর চোখ একটু কুতুরে বলেই না তোরা ওকে চীনা মনে করিস্! ওকি আর সত্যিই চীনে? ওকে ত আমিই পেটে ধরেছি। এ দ্যাখ ও বুঝি কাঁদ্‌ছে। ষাট, ষাট, বালাই!—

ধন্ ধন্ ধন্ ধন্ মুরলি
এই ধনকে দেখ্‌তে নারে কোন্ বেরালি!
ওকে কে বলে রে খ্যাঁদা,
তার চোখে লাগুক ধাঁধা।
খ্যাঁদা কি বলতে দেবো?
সোনা দিয়ে নাক বাঁধিয়ে দেবো ॥

টুলি : তা হলে ভাই, ডালিম কুমারের সঙ্গেই আমার মেয়ের সম্বন্ধ পাকা হল কেমন?

কম্‌লি : আচ্ছা ভাই, তাই নয়ত হ'ল! তোর পুতুলের নাম কি ভাই? পুঁটুরানী, না? দে, বউকে একটু নাচাই।

পুঁটু নাচে কোনখানে
শতদলের মাঝখানে।
সেথায় পুঁটু কি করে,
ডুব্‌-গালিগালি মাছ ধরে।
মাছ ধরে আর ফুল পাড়ে
কুঁড়োজালি দিয়ে মাছ ধরে ॥

খেঁদি : এই বিয়া যে দিবি, নেমন্তন্ন করতে বেরাবি নাই? ইদিকে ম্যাঘে ম্যাঘে যে অনেক বেলা হঁয়ে গেল খ'।

কম্‌লি : খ ঠিক বলেছ ভাই খ! নাই ভাই সত্যি, চল,—পটলিকে আর বেগমকে নিয়ে আসি।

টুলি : ঐ দেখ বেগম আস্‌ছে।—হাঁ, দেখ্‌ কম্‌লি, বেগমের সুন্দর একটা জাপানী পুতুল আছে, ঐটের সঙ্গে তোর চীনের পুতুলের বিয়ে দে না!

কম্‌লি : বেশ মনে করে দিয়েছিস্‌ ভাই। সেই—কী যেন একটা ছড়া আছে—ছাই মনেও পড়ছে না!

টুলি : ও! সেই ছড়াটা তো?—

খুকুর দেবো বিয়ে বেগম-মহলে,
খুকু হবে বেগম সাহেব, বাঁদী সকলে।
খুকু হাতে পর্‌বে হীরের বালা
গলায় পর্‌বে মুক্তোর মালা।
সোনার খাটে থাক্‌বে শুয়ে রূপোর মহলে
শতেক বাঁদী বাঁধ্‌বে চুল নাইয়ে গোলাব-জলে ॥

(গান করিতে করিতে বেগমের আগমন)

কুলের আচার নাচার হয়ে
আছিস্‌ কেন শিকায় ঝু'লে।
কাঁচের জারে বেচারা তুই
মরিস্‌ কেন ফেঁপে ফুঁ'লে ॥

কাঁচা তেঁতুল পেয়ারা আম
ডাঁশা জামরুল আর গোলাপ-জাম
যেমনি তোরে দেখিলাম
অমনি সব গেলাম ভুলে ॥

কম্‌লি : আয় ভাই বেগম, তুই আজ এত দেরি কর্‌লি কেন ভাই?

বেগম : বাপরে। আব্বা যা বকেন ভাই, আমি বাইরে বেরুলে। আম্মাকে বলেন আমাকে পর্দার ভিতর বিবি করে রাখতে।

কম্‌লি : মা গো মা! কি হবে! অসৈরণ সইতে নারি! আট বছরের মেয়ে আবার বিবি হবে! যা না তাই! তোর সেই ছড়াটা কি রে বেগম?

বেগম : ও! সেইটে?—

মা গো মা,

আমি বিবি হব না!

আম কুড়োবো জাম কুড়োবো, কুড়োবো শুক্‌নো পাতা,

সোয়ামী কর্‌বে লাঙল-চাষ, আমি ধর্‌ব ছাতা।

টুলি : এই বেগম! শুনেছিস? আমার মেম-পুতুলের সাথে কম্‌লির ডালিমকুমারের আজ বিয়ে।

বেগম : সে কি ভাই! কম্‌লির ডালিমকুমার যে আমার জামাই হবে বলে কথা দিয়েছিল। আমার জাপানী পুতুলের কি হবে তা হলে?

কম্‌লি : তা ভাই, কি করি বল্‌। তোরা সবাই চাস্‌ ডালিমকুমারকে জামাই কর্‌তে। ও বেচারা ছেলে মানুষ, ক'টা বউ সাম্‌লাবে বল্‌ তো! তাতে আবার বিবি বউ! বউগুলো আমার ছেলের হাড় সেদ্ধ করে দেবে যে!

বেগম : তা আমি জানিনে ভাই। টুলি ত ফুচুংকে জামাই কর্‌বে কথা ছিল। আমার গেঁইসা পুতুল কি তা হলে কড়ে-রাঁড়ি হ'য়ে থাকবে?

পঞ্চি : কম্‌লি রে বোন্‌ডি। তোর পোলারে দুইট্যা মায়্যার সাথে বিয়া দিয়া দে।

কম্‌লি : তা ভাই ও মন্দ বলেনি। আমার ডালিমকুমার তোদের দু'জনার মেয়েকেই বিয়ে করুক। সে বেশ হবে। এক বউ শুয়ে থাক্‌বে আর এক বউ মশা তাড়াবে।

টুলি : কী? আমার মেয়ে সতীন নিয়ে ঘর করবে? আমি বেঁচে থাকতে নয়। আয় পুঁটু, তোর অন্য বর খুঁজিগে।

পঞ্চি : বাপ্‌পুরে। তোমার পুথুলটা যেন হক্কল বুঝবার পারছে! পুথুল, তার আবার হতিন!

টুলি : তুই বুঝবি কি লা? হতিস্ মেয়ের মা, তা হলে বুঝ্‌তিস্। পুঁটু, বল ত মা সেই ছড়াটা?

আয়না আয়না আয়না
সতীন যেন হয় না।

উদ্‌বেড়ালি ক্ষুদ খায়
স্বামী রেখে সতীন খায়।

খ্যাংরা খ্যাংরা খ্যাংরা
সতীনের মাথায় যেন হয় উকুন আর ড্যাংরা

বেড়ি বেড়ি বেড়ি
সতীন আবাগী চেড়ি!
খোরা খোরা খোরা
সতীনকে ধরে নিয়ে যায় যেন তিন মিন্‌সে গোরা।
হাতা হাতা হাতা
খাই সতীনের মাথা
থুত্‌কুড়ি থুত্‌কুড়ি থুত্‌কুড়ি
সতীন যেন হয় আঁটকুড়ি।

পাখি পাখি পাখি
নিচে মল সতীন আমি উপর থেকে দেখি।
ফুলগাছটি ঝিঁকুড়ি
সতীন আবাগী মেকুড়ি।
টেঁকিশালে শূ'ল আর ঠুস্ করে মল!
বঁটি বঁটি বঁটি
সতীনের ছেরাদ্দের কুট্‌নো কুটি।
অশথ্ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আল্‌তা পরি!

খেঁদি : এতও জানে খ! ছড়ায় ছড়ায় ছির্‌কুটে দিলেক।

বেগম : নে বাই, আর ঝগড়া কর্‌তে হবে না। আমি ঐ ফুচুং-এর সাথেই গেঁইসা পুতুলের বিয়ে দেবো।

টুলি : আঃ, তুই বাঁচালি ভাই বেগম। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক তোর।

কম্‌লি : নে ভাই, এইবার লগ্নের ব্যবস্থা দেখি। এখন যে একজন পুরুত ঠাকুরের দরকার। পাজি পুঁথি দেখবে কে?

টুলি : হাঁ ভাই, বেশ মনে করেছিস! আমাদের বাড়িতে পুরুত ঠাকুর এসেছেন। মায়ের কি ব্রত আছে। আমি গিয়ে বুড়োকে ধরে আনি।

বেগম : সব ত হল ভাই, আমার মেয়ের কপালেই ঐ চোখ উল্টানো চীনা পুতুলটা ছিল।

পঞ্চি : আরে যাইতে দে! পুতুলের তো বিয়া! ঐ চীনাডার সাথেই তোর জাপানী মায়্যাটার বিয়া দিয়া দে। আর কাইজ্যা করে না। দেহি রে কম্‌লি, তোর চীনা পুতুলডারে দেহি। মাইয়্যা গো, উয়ার চেহারাডা দেইহ্যা আমার একটা ছড়া গান মনে আইছে।—

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়
যাইতে যাইতে খ্যাচ্‌খ্যাচায়
প্যাঁচায় গিয়া উঠ্‌ল গাছ,
কাওয়ারা সব লইল পাছ।
প্যাঁচার ভাইশ্‌তা কোলা ব্যাং
কইল, চাচা দাও মোর ঠ্যাং।
প্যাঁচায় কয়, বাপ, বারিত্‌ যাও
পাছ লইছে সব হাপের ছাও।
ইদুর জবাই কইর‍্যা খায়
বোঁচা নাকে ফ্যাচ্‌ফ্যাচায় ॥

(সকলের হাসি)

বেগম : না ভাই! জামাইয়ের যে কেচ্ছা কর্‌ছে, আমি ওর সাথে মেয়ের বিয়া দেবো না।

খেঁদি : লে ভাই, তুরা যদি ঝগ্‌ড়াই করবি, বিয়া হবেক কখন্? ইদিকে লগনের বেলা যে বয়ে গেল! আচ্ছা ভাই, মুসলমানের পুতুলের সাথে তোর পুতুলের বিয়া হবেক কি করে খ।

কম্‌লি : না ভাই, ও-কথা বলিস্‌নে। বাবা বলেছেন, হিন্দু-মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা কর্‌লে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লাও যা, আমাদের ভগবানও তা। বাবা আমাকে একটা গান শিখিয়েছিলেন, টুলি, তুইও ত জানিস্ ও গানটা, গা না ভাই আমার সাথে।

[গান]

মোরা এক বৃন্তে দুটি ফুল হিন্দু-মুসলমান
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥

এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান?

এক সে দেশের খাই গো হাওয়া এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক সে ফুল ও ফল।

এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে, কেউ শ্মশানে ঠাঁই।
এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান ॥

টুলি : সত্যি ভাই, এক দেশে জন্ম, এক মায়ের সন্তান। অন্য ধর্ম বলে কি তাতে ঘেন্না করতে হবে?—এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে—আমি পুরুত ঠাকুরকে ডেকে আনি।

কম্‌লি : শীগগীর আস্‌বি কিন্তু ভাই। দাদা এলে কিন্তু সব তচ্‌নচ্ করে দেবে।

(গান করিতে করিতে কম্‌লির দাদামণির আগমন)

[গান]

হেড মাস্টারের ছড়ি, সেকেণ্ড মাস্টারের দাড়ি
থার্ড মাস্টারের টেড়ি, কারে দেখি কারে ছাড়ি।
হেড-পণ্ডিতের টিকির সাথে ওদের যেন আড়ি ॥

দাঁড়াইয়া ঐ হাই বেঞ্চে
হাসি রে মুখ ভেংচে ভেংচে,
খোড়া সেকেণ্ড পণ্ডিত যায় লেংচে
হুঁকো হাতে বাড়ি,
তার মুখ নয় তোলো হাঁড়ি,
মোর হেসে ছিঁড়ে যায় নাড়ি ॥

মণি : এই কম্‌লি, কি হচ্ছে? ওরে বাপ্ রে! কি সুন্দর সব পুতুল বের করা হয়েছে। দেখি, দেখি তোর পুতুল। আহা হাহা, ভাগ্নে আমার! এস এস, একটু আদর করি!

কম্‌লি : ওই যাঃ! আমার সায়েব পুতুলের ঠ্যাং ছিঁড়ে দিলে। হেই দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, লক্ষ্মীটি—আজ যে আমার পুতুলের বিয়ে। তোমাকে খুব করে খেতে দেবো, মা কালির দিব্যি করে বলছি।

মণি : হুঁম! মাস্টার মশাই-এর মার খেয়ে আজ ক্ষিদেটা বেশি রকমেরই হয়েছে! দে, তবে নিয়ে আয় খাবার।

কম্‌লি : ও মা, এখুনি খাবার কি! টুলি পুরুতকে ডাক্‌তে গেছে, পুরুত ঠাকুর আসুন, বিয়ে হোক, তারপর না খাবার।

মণি : আরে, পুরুত ঠাকুর আবার কি মন্ত্র পড়াবে? দে, আমিই মন্ত্র পড়াচ্ছি—

আশীর্বাদং শিরশ্ছেদং ধ্বংস নাশং
অষ্টাঙ্গে ধবল কুষ্টিং পুড়ে মরং।

খেঁদি : মা গো কি হবে! এই নাকি মন্তর হল খ!

মণি : এই বাঁকড়ি খেঁদি, চুপ কর্ বল্‌ছি, নৈলে তোর দাদাকে শুদ্ধু ডেকে আন্‌ব, মজাটা টের পাবি তখন!

বেগম : দোহাই মণিদা, ওকে আর ডাক্‌তে হবে না! বাপ্ রে, একা রামে রক্ষে নেই, তাতে আবার সুগ্রীব দোসর!

মণি : এই যে, বেগম! তুই কি খাওয়াবি? পোলাও মাংস কিন্তু! নৈলে তোর মেয়ের নাড়ি ভুঁড়ি বের করে দেবো, একেবারে হিরণ্যকশিপু বধ!

টুলি : এই যে ভাই পুরুত ঠাকুরকে এনেছি। বাবা, ঠাকুর কি আস্‌তে চান। পাঁচ সিকে পয়সার কড়ার করে তবে এনেছি। ও বাবাঃ! মণিদা যে! তা'হলেই হয়েছে, সব ভণ্ডুল করবে!

পুরুত ঠাকুর : বলি, কি গো দিদি ঠাক্‌রুনরা, বর কনে সব প্রস্তুত ত? এই সঙ্গে তোরাও কনে সেজে নে। আমারও এই সাথে একটা হিল্লে হয়ে যাক।

খেঁদি : মা গো, বুড়ার ভীমরথি হঁয়েছে খ। কুঁজার আবার সাধ যায় চিত হঁয়ে শু'তে খ।

পুরুত : কেন, আমায় বুঝি পছন্দ হ'ল না? আরে, রোজ চাল-কলা খেতে পাবি। আর, মাসে চারখানা করে নতুন কাপড়।

কম্‌লি : রক্ষে করুন ঠাকুর, আমরা কি হনুমান যে, চাল-কলার লোভ দেখাচ্ছেন! এখন পাঁজি-পুঁথি বের করে বিয়ের লগ্ন দেখুন।

মণি : পুরুত ঠাকুরের টিকিটি কি সুন্দর! যেন পারে যাবার টিকিট! আগায় আবার জবা ফুল বাঁধা, যেন, কুঁক্‌ড়ো ঝুল্‌ছে!

পুরুত : আরে রামঃ রামঃ ! এ লক্ষ্মীছাড়াটা কোত্থেকে জুট্‌ল! না দিদি ঠাকুরুন, আমার আর মন্ত্র পড়া হবে না। যা হনুমান জুটিয়েছ, ও চাল-কলা তো খাবেই, উল্টে জাত-ধর্ম পর্যন্ত নষ্ট করে দেবে!

মণি : ঠাকুর মশাই, ঠাকুর মশাই! আপনার চট্টোপাধ্যায় মশাই যে বঙ্কিম হয়ে চাতক পক্ষীর মতো হাঁ করে আছেন! বাবা, চটি ত নয় যেন জাঁতিকল! ওটা কি? গামছা? ওটা গামছা ত নয়, গাম ধাড়ি!

কম্‌লি : আঃ, কি হচ্ছে দাদা? না পুরুত মশাই, আপনি রাগ করবেন না। আপনি এখন দিন দেখুন।

পুরুত : হঁ, বর কনেকে নিয়ে এস, যোটক মিলিয়ে দেখি। বাঃ বাঃ ! চমৎকার বর কনে। এদের নাম কি?

কম্‌লি : বরের নাম ডালিমকুমার, কনের নাম পুঁটুরানী।

টুলি : আর একজোড়া বর কনে আছে পুরুত ঠাকুর। বরের নাম ফুচুং আর কনের নাম গেঁইসা।

পুরুত : এ রকম নাম ত সনাতন ধর্মে শোনা যায় না!

টুলি : হাঁ ঠাকুর মশাই, বর হচ্ছে চীনে, আর কনে হচ্ছে জাপানী।

পুরুত : তা হলে ঐ কম্‌লির দাদাই ওদের পুরুত হোক। ও-সব যাবনিক অনুষ্ঠান আমার জানা নেই।

মণি : বেশ, বেশ! এই কম্‌লি, শিগ্‌গির তুই তা হলে এক ঝুড়ি আর্‌সুলো, গোটা দুই টিকটিকি, তিনটে সোনা ব্যাং, পোয়াখানিক কেঁচো, এক

ডজন পচা ডিম আর খানিকটা নাপ্পি যোগাড় করে আন, বুঝলি? ভোজ হবে।

পঞ্চি : দ্যাহো দাদা, এইদুন এক চট্‌কনা লাগাইমু যে উৎকা মাইর‍্যা পইর‍্যা যাইব্যা। ওয়াক থুঃ! এ কি কয়, আমার বমি আইতেছে!

মণি : আরে, আরশোলার কাবাব, টিকটিকির চাট্‌নি, পচা ডিমের ঘণ্ট, তারপর এই—কোলাব্যাঙের কাট্‌লেট, এ-সব না হলে চীনেদের ভোজ হবে কি করে? আর, বেগম! তোরা ত ঈদের সময় সেমাই খা'স, কেঁচো দিয়ে কি চমৎকার চীনে সেমাই হবে।

বেগম : তৌবা, তৌবা! মণি দাদা, তুমি ভয়ানক দুষ্টু! পেটের ভাত পর্যন্ত উঠে আস্‌ছে!

পুরুত : হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ! টুলি, তুই ডেকে এনে আমার এই সর্বনাশটা করলি! আবার গঙ্গাস্নান করতে হবে দেখছি!

মণি : তা ত হবে, কিন্তু ঠাকুর মশাই, এখানে গো-বর তো পাওয়া যায় না, খানিকটা নর-বর এনে দেবো?

কম্‌লি : দাদা, আমি চললাম মাকে ডাক্‌তে। এখনি টের পাবে মজা!

মণি : আচ্ছা ভাই, এই আমি চুপ করলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে কিন্তু সন্দেশ রসগোল্লা চাই।

টুলি : এইবার ঠাকুর মশাই লগ্ন ক্ষণ দেখুন না।

পুরুত : আর দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু লগ্ন, সব প্রস্তুত ত?

কম্‌লি : হাঁ, সব প্রস্তুত। আমরা ততক্ষণ একটা বিয়ের গান গেয়ে নিই। আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন্।

মিলন-গোধূলি রাঙা হয়ে এল ঐ
সোনার গগনময়।
দাও আশিস অভয়, হে দেব জ্যোতির্ময় ॥
মিলিল আবার দুইটি প্রাণ
কত যুগ পরে, হে ভগবান
সার্থক কর, হে মনোহর, এ মিলন অক্ষয়।
যেন চির-সুখী হয়, হে দেব জ্যোতির্ময় ॥

মণি : এই! বিয়ে যে হবে, তোদের ব্যাণ্ড কই, নহবৎ কই? শোন, আমি কেনেস্তারা বাজাই, বুঝলি? আর, টুলি, তুই শিঙে ফোঁক। পঞ্চি, তুই ভেঁপু বাজা? বাজা, বাজা, বাজা!

(ক্যানেস্তারা ইত্যাদির বাদ্য)

কম্‌লি : দোহাই দাদা, থামো! তোমার রওশন-চৌকি মাথায় থাক্। আমাদের রওশন-চৌকি আমাদের বাড়িতেই আছে। যা তো ভাই বেগম, তুই গ্রামোফোনে তালিম হোসেনের সেই সানাই-এর রেকর্ডখানা বাজা তো।

টুলি : বা ভাই, বেশ মনে করিয়ে দিয়েছিস্! (রেকর্ড বাজিয়া উঠিল) ঐ যে রেকর্ডখানা বেজে উঠল। এতক্ষণে না বেবাড়ি বলে মনে হচ্ছে!

পুরুত : কই, বর কনেকে নিয়ে এস। বরের হাতে কনের হাত দাও। আহা হা হা, অত জোরে না। বরের হাত যে দেহ ছেড়ে চলে এল। হাঁ হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। এইবার বল ত বাবা ডালিমকুমার—

যদিদং হৃদয়ং তব

তদিদং হৃদয়ং মম।

মণি : অনুস্বারং আর বিসর্গং যদি সংস্কৃতং হয়তং তবে আমিং কেনং বসতং। এই! একবার তোদের ফুচুং আর গেঁইসাকে নিয়ে আয়, আমি মন্তর পড়ি। হ্যাঁ বল ত বাবা ফুচুং—

ওয়ানং মর্ণং আই মেটং এ লেমং ম্যানং

ক্লোজং টু মাই ফার্মং

পুরুত : বাপ রে বাপ, এ আবার কোন্ মন্তর রে বাবা! যেমন উনুন্‌মুখো দেবতা, তেমনি ছাইপাঁশ নৈবদ্যি।

কম্‌লি : দাদার মন্তর পড়া ঠিক হচ্ছে তো পুরুত মশাই?

পুরুত : আরে, ঐ হয়েছে! হোক্ না কাঠের বেরাল, ইঁদুর ধরলেই হ'ল। ঐ কারুর বিয়েতে হয় না!

কম্‌লি : নে ভাই টুলি, নে ভাই বেগম, থুড়ি বেয়ান, এইবার তোদের জামাইকে আশীর্বাদ কর!

বেগম : বাবা ফুচুং! উপরে আল্লা, নিচে তুমি। দেখো, আমার গেঁইসা যেন তোমার কাছে সুখে থাকে।

যেন গাইবাছুরে গোহাল ভরে
ধনে জনে ঘর ভরে,
আদর আহ্লাদ উপচে পড়ে।
যেন অষ্ট সুখে খায়
সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যায়।
ভিখ্-ফকিরে আঁজলা আঁজলা ভিক্ষা পায়।
শ্বশুর শাশুড়ির চৌদোল এসে
পঞ্চ বাজন বাজিয়ে নিয়ে যায়।

টুলি : বাবা! উপরে ভগবান, নিচে তুমি। তোমার হাতে মেয়েকে দিলুম। দেখো যেন কোনো কষ্ট দিও না।

রাজরাজেশ্বরী স্বামী হোক,
ভীমার্জুন ভাই হোক।
যেন উমার মত আদর পাস,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পাস,
জয়া বিজয়া দাসী পাস,
কুবেরের ভাণ্ডার পাস!
ঘরে ঘটিবাটি ঝল্‌মল করে,
আল্‌নায় কাপড় দল্‌মল্ করে।
বছর বছর পুত্র পাস।
হবে পুত্তুর মর্‌বে না।
চোখের জল পড়বে না।
(উলু ও শঙ্খধ্বনি)

বেগম : এই পঞ্চি, তুই সেই লাল টুক্‌টুক্ গানখানা গা না ভাই।

পঞ্চির গান

লাল টুক্‌টুক্ মুখে হাসি মুখখানি টুল্‌টুল্।
বিনি পানে রং দেখে যা লাল-ঝুঁটি বুল্‌বুল্ ॥

দেখ্‌তে আমার খুকুর বিয়ে
সূয্যি ওঠেন উদয় দিয়ে,
চাঁদ ওঠে ঐ প্রদীপ নিয়ে
গায় নদী কুল্‌কুল্‌ ॥

খেঁদি : আমি আর কি আশীর্বাদ করব খ, তুরাই যে সব বলে ফেল্লি।
জন্ম জন্ম এয়ো হবি,
জামায়ের সুয়োরানী হবি।
আকালের লক্ষ্মী হবি।
সময়ে পুত্রবতী হবি।
সোনার কল্‌সি টলমল
ঘটে ঘটে গঙ্গা-জল।
একূল থেকে ওকূলে যাবি,
দুইকূল শীতল কর্‌বি।
মায়ের কুলে ফুল বাপের কুলে ফল
শ্বশুর কুলে তারা
তিন কুলে পড়্‌বে জল গঙ্গা যমুনার ধারা।
মা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরণ বাসুকি
তিন কুল ভরে দাও ধনে জনে সুখী।

পঞ্চি : আমি ভাই আর কি কইমু—

চুল মেল্‌বা সোনার খাডে,
নাইবা ধুইবা পদ্মার ঘাডে।
ভাত খাইবা সোনার থালে

বেন্নন খাইবা রূপার বাডিতে।
আঁচাইবা ডাবর-ভরা
পান খাইবা বিরা বিরা।
সুপারি খাইবা ছরা ছরা,
খয়ের খাইবা চাক্কা চাক্কা।
চুন খাইবা খুট্‌নি-ভরা,
পেচ্‌কি ফেলাইবা লাদা লাদা।
(উলু ও শঙ্খধ্বনি)

কম্‌লি : নে ভাই, লগ্নের বেলা যে বয়ে গেল, এখন সকলে মিলে বর কনেকে বরণ করি। তার আগে ভাই বেগম একটা ওদের বিয়ের গান গাক।

বেগমের গান

শাদী মোবারকবাদী শাদী মোবারক।
দেয় মোবারক-বাদ আলম্‌ রসুলে-পাক আল্লা হক ॥

আজ এ খুশির মহ্‌ফিলে
দুল্‌হা ও দুল্‌হিনে মিলে
মিলন হল প্রাণে প্রাণে
মাশুক আর আশক ॥
আউলিয়া আম্বিয়া সবে
এস এ মিলন-উৎসবে,
দোওয়া কর আজ এ খুশির
গুলিস্তান গুল্‌জার হোক ॥

কম্‌লির ঠাকুরমা : ওরে ও—ও—ও কম্‌লি, ওলো ও টুলি, ওরে ভুলি রে, ও নবা—

টুলি : ওরে কম্‌লি, ঐ শোন্‌ ঠাকুমা ডাকাডাকি করছে। এই বেলা আশীর্বাদের গানটা গেয়ে নে।

[গান]

সাবিত্রী সমান হও, লহ লহ এই আশিস।
শ্বশুর শাশুড়ির মা বাপের কুলের তারা হয়ে হাসিস।
লহ লহ এই আশিস ॥

রামের মত স্বামী পাস, সতী হস সীতার সম,
দশরথ কৌশল্যার মত শ্বশুর শাশুড়ি অনুপম।
লক্ষ্মণ সম দেবর পেয়ে সুখের সায়রে ভাসিস।
লহ লহ এই আশিস ॥

গোয়ালে গরু, মরায়ে ধান,
সিথেয় সিঁদুর, মুখে পান,
আল্‌তা পায়ে চির-এয়োতি
যায় সুখে দিন এক সমান।
অন্নপূর্ণা জগৎ-জীবের মা হয়ে ফিরে আসিস
লহ লহ এই আশিস ॥

সভা-উজ্জ্বল জামাই পাস,
ধরার মত সহ্য পাস,
জন্মায়ন্তে কাল কাটাস।
পাকা চুলে পরিস্‌ সিঁদুর হয়ে থাকিস্‌ স্বামীর সো।
বেঁচে থাকিস যতকাল অক্ষয় থাক তোর হাতের নো।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে গঙ্গাজলে দেহ রাখিস্‌।
লহ লহ এই আশিস।
(উলু ও শঙ্খধ্বনি)

[সমাপ্ত]

The Doll's Wedding

(A Play for Young Girls)

Dedication
To Sunny and Neenee
—With blessings

Cast of Characters

Girls:

Komli, Tuli, Ponchi, Khudi, Begum, Thakur-ma (Grandma)

Men:

Komli's Dadamani and Priest Thakur

(Ponchi is from Mymensingh, and Khudi is from Bankura district.)

(The girls sing while playing with their dolls)

Come, let's play with dolls,
The time for play is flying by, my friend.
Father is off to the office, what's there to worry about?
The little boys are sleeping in the swing.
Brother is going to school, Mother happily
Cooks in the kitchen.
Grandma sits and dozes,
her toothless mouth agape.
Come, Tuli, Ponchi, Tuli,
And Patli, where are you, Khudi?

Komli: So, sister Tuli, I won't call you Tuli anymore. From today, you're my 'beyan' (the bride's mother), alright? Today is the wedding of my China-doll with your Mem-doll.

Tuli: No, sister Komli, I won't give my Mem-doll in marriage to your ugly, Chinese-looking doll. Oh dear! Your doll's eyes are so bulging! My doll will get scared just by looking at it. Instead, your doll named Dalim Kumar, I'll make him my son-in-law.

Komli: Oh, what's to be done! Then how will my China doll get married? No one wants to marry him. Will such a big boy of mine remain a bachelor? Oh, what will people say!

Tuli: Then, sister, why don't you arrange a match for him with Ponchi's daughter?

Ponchi: What are you saying! Ponchi's daughter isn't that ugly! I won't make that Chinese lump my son-in-law. He looks like a ghost, and his name is "Phuchung"! My girl will get a fright and jump with a shriek just by seeing him! Why doesn't Tuli give her own girl?

Tuli: Oh dear, don't provoke him, sister! Instead, why don't you talk to Khudi from Bankura and see if she agrees to give her daughter!

Khudi: Really! That will not happen, friend! I'll feed my daughter poison and kill her, but I won't give her in marriage to that Chinaman! Tuli should bring a Chinese girl, then that Chinese doll can marry her.

Komli: No, sisters, don't all say such things about my little boy. Just because he's a bit clumsy and his eyes are a bit squinty, you think he's Chinese! Is he really Chinese? I was the one who gave birth to him. Look, I think he's crying. Hush, hush, shoo, bad things away!

A little chant:

Don, don, don, don, Murli
Which wildcat can't stand this Don!
Who calls him clumsy?
May their eyes be clouded.
Will I let anyone call him clumsy?
I'll adorn his nose with gold!

Tuli: So, friend, the match is fixed between Dalim Kumar and my daughter, alright?

Komli: Okay, sister, so be it! What's your doll's name, friend? Pooni Rani, isn't it? Let's make the bride dance a bit.

Pooni dances,
Where?
In the middle of a hundred petals.
What does Pooni do there?
She dives and catches fish.
She catches fish and picks flowers,
She catches fish with a scoop-net.

Khudi: You're having a wedding, but aren't you going out to invite people? It's getting very late in the day.

Komli: You're right, sister! No, really, come on, let's go and get Patli and Begum.

Tuli: Look, there comes Begum. Hey, listen, Komli, Begum has a beautiful Japanese doll, why don't you marry your Chinese doll to her?

Komli: You reminded me well, sister. There's a rhyme about that, what was it? Oh, I can't remember!

Tuli: Oh! That rhyme?

Khuku will be married in Begum's palace,
Khuku will be Begum Saheba, all the maids her slaves.
Khuku will wear diamond bracelets on her hands,
And a pearl necklace on her neck.
She will sleep on a golden bed in a silver palace,
A hundred maids will tie her hair after bathing her with rosewater.

(Begum arrives, singing)

With all the traditions tossed aside,
Why are you hanging in a basket?
Poor you, in a glass jar,
Why are you crying and puffing?
Raw tamarind, guava, mango,

Jambul and rose-apple,
The moment I saw you,
I forgot everything.

Komli: Come, sister Begum, why are you so late today?

Begum: Oh my! My father scolds me so much when I go out. He tells my mother to keep me a 'bibi' (a married lady in seclusion) behind a veil.

Komli: Oh my, oh my! What will happen! I can't stand this injustice! An eight-year-old girl a bibi? What nonsense! What's that rhyme of yours, Begum?

Begum: Oh! That one?

Oh mother, oh mother,
I won't be a bibi!
I'll gather mangoes, gather jambuls, gather dry leaves,
My husband will plow, and I'll hold the umbrella.

Tuli: Hey Begum! Did you hear? Today is the wedding of my Mem-doll with Komli's Dalimkumar.

Begum: What, sister! Komli's Dalimkumar had promised to be my groom. What will happen to my Japanese doll then?

Komli: Well, what can I do, sister? You all want Dalimkumar to be your son-in-law. He's just a boy, how many wives can he handle? And a bibi wife at that! The wives will boil my boy's bones!

Begum: I don't know about that, sister. Tuli was supposed to marry Phuchung. Will my Gamsa doll remain an unmarried old maid then?

Ponchi: Komli, my dear sister! Marry your boy to both the girls.

Komli: She didn't say anything bad, sister. My Dalimkumar can marry both of your daughters. That will be great. One wife can sleep while the other one shoos away mosquitoes.

Tuli: What? My daughter will live with a co-wife? Not while I'm alive. Come, Pooni, let's find you another groom.

Ponchi: Good heavens! It's as if your doll understands everything! A doll, and she has to deal with a co-wife!

Tuli: You wouldn't understand! If you were a mother, you would understand! Pooni, tell her that rhyme!

Ayna ayna ayna,
May there be no co-wife.
The owl eats rice,
The co-wife eats the husband.
Khyangra khyangra khyangra,
May the co-wife's head have lice and sores.
Beri beri beri,
The co-wife is a wretched woman!
Khora khora khora,
May three horses take the co-wife away!
Hata hata hata,
I eat the co-wife's head!
Thutkuri thutkuri thutkuri,
May the co-wife be barren!
Pakhi pakhi pakhi,
Co-wife below, I watch from above!
The flower plant is a creeper,
The co-wife is a wretched cat!
In the mill, a pestle goes 'shoo' and 'thud'!
Bunti bunti bunti,
Pounding the co-wife's remains.
I cut down the banyan and build a house,
I cut the co-wife and wear her blood!

Khudi: Oh, she knows so much! She cursed her with all those rhymes!

Begum: Stop it, friends, no more fighting. I'll marry my Gamsa doll to that Phuchung.

Tuli: Ah, you saved me, Begum! May you be blessed with wealth and sons!

Komli: Alright, sisters, let's see about the auspicious moment for the wedding. We need a priest now. Who will read the almanac?

Tuli: Yes, you're right! A priest has come to our house. My mother is performing some vow. I'll go and get the old man.

Begum: Everything is settled, but my daughter's fate was sealed with that Chinese doll with the bulging eyes.

Ponchi: Oh, let it be! It's just a doll's wedding! Marry your Japanese girl to that Chinese one. Don't argue anymore. Show me Komli, show me your Chinese doll. Oh my, looking at his face reminds me of a rhyme!

The owl goes with splayed legs,
As it goes it makes a squawking sound.
The owl climbs up a tree,
The crows all take its butt.
The owl's nephew, a tree frog,
Said, "Uncle, give me my legs."
The owl says, "Go home, my son,
The snakes have taken all the butts."
The rats are killed and eaten,
The flat-nosed one grumbles.

(Everyone laughs)

Begum: No, sister! She's insulting my groom, I won't let my daughter marry him.

Khudi: Oh, friends, if you keep fighting, when will the wedding happen? The auspicious moment is flying by! By the way, how can a Muslim's doll be married to your doll?

Komli: Don't say that, sister. Father says Hindu and Muslim are all the same. If you hate someone of another religion, God becomes unhappy. Their Allah is the same as our Bhagavan. My father taught me a song, Tuli, you know it too, sing it with me, sister.

We are two flowers on one stem, Hindu and Muslim,
The Muslim is its pupil, the Hindu is its soul.
In the lap of the same Mother Sky,
The sun and moon swing like two children.
The same blood under our chests, the same umbilical cord's pull?
We breathe the air of the same country, drink the water of the same land,

From the breast of the same mother, grow the same flowers and fruits.
In the soil of the same country, we get our place,
Some in the cremation ground, some in the graveyard.
We call our mother in the same language, sing in the same tune.

Tuli: It's true, sister. Born in the same country, children of the same mother. Why should we hate someone because of their religion? Oh, it's getting late. I'll go and call the priest.

Komli: Come back quickly, though, sister. If my brother comes, he'll mess everything up.

(Komli's Dadamani arrives, singing)

Headmaster's cane, second master's beard,
Third master's cowlick, whom do I see, whom do I leave?
With the head-pandit's topknot, they're like enemies.
Standing on that high bench,
I laugh with a crumpled face,
The lame second pandit walks with a limp,
With a hookah in his hand,
His face is not a brass pot,
My insides are bursting from laughter.

Moni: Hey, Komli, what's going on? Oh my! What beautiful dolls have been brought out. Let me see, let me see your doll. Aww, my nephew! Come, come, let me give you some affection!

Komli: Hey, get away! You're tearing off my doll-master's leg! Oh, Dadada, I fall at your feet, please, dear, today is my doll's wedding. I'll give you a lot to eat, I swear on Mother Kali.

Moni: Hmm! After getting beaten by the master, my hunger is extra strong today! Go, bring the food then.

Komli: Oh mother, food now? Tuli went to call the priest, let Priest Thakur come, let the wedding happen, then comes the food.

Moni: Oh, what mantras will the Priest Thakur chant? I'll chant the mantras myself—

Ashirvads shirschhed dhvansh nash
Ashtange dhaval kustha pure mong
Blessings, head-chopping, destruction, ruin,
On eight limbs, white leprosy, the pyre is ready.

Khudi: Oh my, what will happen! Is this a mantra?

Moni: You, Khudi from Bankura, be quiet, I'm telling you, or I'll call your grandfather as well, then you'll understand!

Begum: Please, Moni-da, don't call him! Oh my, one demon is bad enough, why call another?

Moni: Hey, Begum! What will you feed me? Pulao and meat, remember! Or I'll pull out your daughter's guts, a real Hiranyakashipu killing!

Tuli: Hey, I've brought Priest Thakur! My god, Thakur didn't want to come. I had to coax him with a five-taka coin. Oh my! It's Moni-da! Everything will be ruined now!

Priest Thakur: Tell me, my dear girls, are the bride and groom ready? You all should also get dressed as brides. Let me have a marriage too, while I'm at it.

Khudi: Oh my, the old man has gone senile! The hunchback wants to lie straight in the pyre!

Priest: Why, don't you like me? Listen, you'll get rice and bananas to eat every day. And, four new saris every month.

Komli: Please, Thakur, have mercy, are we monkeys that you're tempting us with rice and bananas? Now, take out the almanac and find the auspicious time for the wedding.

Moni: How beautiful the priest's topknot is! It's like a ticket for a journey! And a red flower tied to the front, like a cock's comb!

Priest: Oh, Ram, Ram! Where did this ill-fated boy come from! No, dear girls, I won't chant any more mantras. You've gathered a Hanuman, he'll not only eat the rice and bananas but also destroy the caste and religion!

Moni: Priest-mashay, Priest-mashay! Your Chattopadhyay-mashay is standing there bent over like a Chatak bird with his mouth open! My god, that's not a lungi, it's a rag! What's that? A *gamcha*? That's not a *gamcha*, it's a dirty cloth!

Komli: Oh, what are you doing, Dada? No, *Priest-mashay*, please don't be angry. Please find the day now.

Priest: Yes, bring the bride and groom, let's match their horoscopes. Excellent! A wonderful bride and groom. What are their names?

Komli: The groom's name is Dalimkumar, and the bride's name is Pooni Rani.

Tuli: And there's another pair of bride and groom, Priest Thakur. The groom's name is *Phuchung*, and the bride's name is *Gamsa*.

Priest: Such names are not heard in *Sanatan* Dharma!

Tuli: Yes, Thakur-mashay, the groom is Chinese and the bride is Japanese.

Priest: In that case, let Komli's Dada be their priest. I don't know anything about those foreign rituals.

Moni: Excellent, excellent! Hey Komli, quickly go and get a basket of armadillos, two lizards, three golden tree frogs, a quarter-pound of earthworms, a dozen rotten eggs, and a little bit of moss, do you hear? We'll have a feast!

Ponchi: Listen, Dada, I'll slap you so hard you'll fall down dead right here. What is he saying? I'm going to vomit!

Moni: Oh, what's a Chinese feast without armadillo kebabs, lizard chutney, rotten egg hash, and... frog cutlets? And Begum! You eat *semai* during Eid, a wonderful Chinese *semai* can be made with earthworms.

Begum: Toba, Toba! Moni-dada, you're terribly wicked! My food is coming back up!

Priest: Hari Krishna, Hari Krishna! Tuli, you've brought me here to bring about this disaster! I'll have to take a dip in the Ganges again, I see!

Moni: That's true, but Priest-mashay, cow dung is not available here, shall I get you some human dung?

Komli: Dada, I'm going to call Mother. You'll see what fun you'll have!

Moni: Alright, sister, I'll be quiet. But I want *sandesh* and *roshogolla* within one hour.

Tuli: Now, Priest-*mashay*, please find the auspicious moment.

Priest: The auspicious moment is within the next ten minutes, is everything ready?

Komli: Yes, everything is ready. We'll sing a wedding song until then. You get ready.

The twilight of union,
Has turned red in the golden sky.
Give your blessings, give your protection, O divine light.
Two souls have united again,
After so many ages, O *Bhagavan*.
Make this union fruitful, O beautiful one, make it eternal.
May they be forever happy, O divine light.

Moni: Hey! To have a wedding, where's your band, where's your *shehnai*? Listen, I'll play the canister, understand? And Tuli, you blow the horn. Ponchi, you play the trumpet. Play, play, play!

(Sounds of canister, etc.)

Komli: Please, Dada, stop! Keep your wedding music to yourself. We have our own music at our house. Go, Begum, play that record of Talim Hossain's *shehnai*.

Tuli: Wow, sister, you reminded me well! (The record starts playing) Oh, the record has started playing. Now it feels like a wedding!

Priest: Where are the bride and groom, bring them. Give the bride's hand to the groom. Oh my, not so hard! The groom's hand has come off his body! Yes, yes, that's right. Now, say, my boy Dalimkumar—

Yad-idang hridayang taba
Tad-idang hridayang mama

(What is your heart,

That is my heart.)

Moni: Anuswar and visarga, if that is Sanskrit, then I'm a king. Hey! Bring your Phuchung and Gamsa here once, I'll chant a mantra. Yes, say, my boy Phuchung—

Wang marnang I went to a leg of mango,

Claw my farm.

Priest: Oh my god, what kind of a mantra is this! Just like the furnace-faced deities, so is this garbage offering!

Komli: Is Dada's chanting correct, Priest-mashay?

Priest: Oh, it's fine! It doesn't matter if it's a wooden cat, as long as it catches rats! A wedding is a wedding!

Komli: Come, Tuli, come, Begum, I mean, bride's mothers, now bless your son-in-law!

Begum: My boy Phuchung! Allah is above, you are below. See that my Gamsa stays happy with you.

May the cowshed be filled with cows and calves,
The house with wealth and people,
May affection overflow.
May she eat with eight pleasures,
Sleep on a golden bed.
May beggars and fakirs receive fistfuls of alms.
May her in-laws arrive in a palanquin,
To the sound of five instruments.

Tuli: My boy! Bhagavan is above, you are below. I'm giving my daughter to your hands. See that you don't give her any pain.

May she have a husband like a king of kings,
May she have brothers like Bhima and *Arjuna*.
May she get affection like *Uma*,
May she have servants like Nandi and *Bhringi*,
May she have maids like Jaya and *Vijaya*,
May she have a treasury like Kubera's!
May the pots and pans in the house shimmer,
May the clothes on the clothesline shine.
May she have a son every year.
May she have a grandson and not die,
May her eyes not shed tears.

(Ululation and conch shells blow)

Begum: Hey, Ponchi, sing that bright red song, sister.

Ponchi's song:

A bright red smile on a bright red face,
Look at the color of the betel leaf, like a red-tufted bulbul.
To see my Khuku's wedding,
The sun rises in the east,
The moon rises with a lamp,
The river sings a rippling song.

Khudi: What more can I bless you with, friends, you've said it all.

May you be a happily married woman in every life,
May you be the queen of your groom,
May you be the Lakshmi of a drought,
May you be a mother in time,
The golden pitcher overflows,
The Ganges water in every pot.
You will go from this shore to that shore,
And make both shores peaceful.
A flower in mother's lap,
A fruit in father's lap,
A star in the in-laws' lap,
The water of the Ganges and Yamuna will flow over all three laps.
Mother Ganga, Indra, Chandra, Varuna,
Fill all three laps,
With wealth and people.
Ponchi: What more can I say, friends—
I'll let down my hair on a golden bed,
Bathe in the Padma river ghat.
I'll eat rice from a golden plate,
I'll eat butter in a silver bowl.
I'll have a pot full of pickles,
I'll have a lot of betel leaves,
I'll have plenty of betel nuts,
I'll have many slices of khair,
I'll have a full box of lime,
I'll spit out gobs and gobs of betel juice.

(Ululation and conch shells blow)

Komli: Oh, sisters, the auspicious time is passing, let's all welcome the bride and groom now. But before that, Begum, sing a wedding song for them.

Begum's song:
Shadi Mubarak, Shadi Mubarak,
The Holy Prophet gives his blessings, Allah Haq.
Today in this happy gathering,
The bride and groom are united,
Soul to soul,
The beloved and the lover.
Come, all the saints and prophets,
To this festival of union,
Pray today for this happy garden to be filled with flowers.

Komli's Grandma: Oh! Komli, oh Tuli, oh Phuli, oh Naba—

Tuli: Oh Komli, listen, Grandma is calling. Let's quickly sing the blessing song now.

Song:

Be like Savitri, take, take this blessing.
Shine like a star in your in-laws', mother's, and father's families, and smile.
Take, take this blessing.
May you have a husband like Ram, be a chaste wife like Sita,
May you have unparalleled in-laws like Dasaratha and Kausalya.
With a brother-in-law like Lakshman, float in the ocean of happiness.
Take, take this blessing.
Cows in the cowshed, rice in the granary,
Vermilion in the part of your hair, betel leaf in your mouth,
Forever happily married with sindoor on your feet,
May your days pass in happiness.
Be the Annapurna of the world, and come back,
Take, take this blessing.
May you get a groom who brightens the gathering,
May you have patience like the earth,
May you live your life a hundred times over.

May you have vermilion in your hair even when it turns gray,
and be a wife to your husband.
May your hand's shell bangle be eternal for as long as you live.
With a son in your husband's lap, may you lay down your body
in the Ganges water.
Take, take this blessing.

(Ululation and conch shells blow)

Translated by Alamgir Mohammad

বিদ্যাপতি

(নাটক)

চরিত্র

১. শ্রী শ্রীদুর্গা
২. শ্রী শ্রীগঙ্গা
৩. শ্রীবিদ্যাপতি (কবি)
৪. রাজা শিবসিংহ (মিথিলার রাজা)
৫. লছিমা (রানী-শিবসিংহের স্ত্রী)
৬. অনুরাধা (বিষ্ণু-উপাসিকা)
৭. বিজয়া (বিদ্যাপতির ছোট বোন)
৮. ধনঞ্জয় (রাজার বয়স্য)

প্রথম দৃশ্য

কাল—পঞ্চদশ শতাব্দী

[মিথিলার কমলা নদীর তীরে বিসকি গ্রাম। তাহারই উদ্যান বাটিকার শ্রীদুর্গা-মন্দির। কবি বিদ্যাপতি দুর্গা স্তব করিতেছেন।]

(স্তব)

জয় জগত-জননী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-বন্দিতা,
জয় মা ত্রিলোক তারিণী।
জয় আদ্য শক্তি পরমেশ্বরী নন্দন-লোক-নন্দিতা
জয় দুর্গতি হারিণী ॥
তোমাতে সর্বজীবের বসতি, সর্বাশ্রয় তুমি মা,
ক্ষয় হয় সব বন্ধন পাপ তাপ তব পদ চুমি মা।
তুমি শাশ্বতী, সৃষ্টি-স্থিতি তুমি মা প্রলয়কারিণী ॥
তুমি মা শ্রদ্ধা প্রেমভক্তি তুমি কল্যাণ সিদ্ধি,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুমি তন জন ঋদ্ধি।
জয় বরাভয়া ত্রিগুণসরী দশ প্রহরণ ধারিণী
জয় মা ত্রিলোক-তারিণী ॥

অনুরাধা : ঠাকুর! ঠাকুর!

বিদ্যাপতি : (মন্দির-অভ্যন্তর হইতে) কে?

অনুরাধা : আমি অনুরাধা, একটু বাইরে বেরিয়ে আসবে?

বিদ্যাপতি : (মন্দির দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া—বিরক্তির সুরে) একটু অপেক্ষা করলেই পারতে অনুরাধা! এত বড় ভক্তিমতী হয়ে তুমি মায়ের নাম-গানে বাধা দিলে?

অনুরাধা : আমায় ক্ষমা করো ঠাকুর। অত্যন্ত প্রয়োজনে আমি তোমার ধ্যানভঙ্গ করেছি। আমার কৃষ্ণ গোপালের জন্য আজ কোথাও ফুল পেলাম না। তোমার বাগানে অনেক ফুল, আমার গিরিধারীলালের জন্য কিছু ফুল নেব? আমার গোপালের এখনও পূজা হয়নি।

বিদ্যাপতি : তুমি তো জান অনুরাধা, এ বাগানে ফুল ফোটে শুধু আমার মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। এ ফুল তো অন্য কোন দেব-দেবীকে দিতে পারিনে! (মন্দির-দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। মন্দির অভ্যন্তরে স্তব পাঠের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।)

অনুরাধা : (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) ঠাকুর! ঠাকুর! তুমি কি সত্যই এত নিষ্ঠুর? তবে কি আমার ঠাকুরের পূজা হবে না আজ? আমার কৃষ্ণগোপাল! আমার প্রিয়তম! তুমি যদি সত্য হও আমার প্রেম যদি সত্য হয়, তা হলে আজ এই বাগানের একটি ফুলও অন্য কারুর পূজায় লাগবে না। এই বাগানের সকল ফুল তোমার চরণে নিবেদন করে গেলাম। (প্রস্থান)

বিদ্যাপতি : (গুণ গুণ স্বরে)

মা! আমার মনে আমার বনে
ফোটে যত কুসুম দল
সে ফুল মাগো তোরই তরে
পূজতে তোরই চরণতল ॥

বিজয়া : দাদা! পূজার ফুল এনেছি। দোর খোল।

বিদ্যাপতি : (দ্বার খুলিয়া) দে। বিজয়া, মা এখন কেমন আছেন রে?

বিজয়া : আমার তো ভাল মনে হচ্ছে না দাদা, কেমন যেন করছেন। আচ্ছা দাদা, অনুরাধা কাঁদতে কাঁদতে গেল কেন? তুমি কেন যেন দু'চোখে তাকে দেখতে পার না।

বিদ্যাপতি : হাঁ, আমি ওকে এক চোখেমী করে এক চোখেই দেখি। আমি পূজো সেরেই আসছি। [বিজয়া চলিয়া গেল। বিদ্যাপতি মন্দির-দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। ভিতর হইতে স্তব পাঠের শব্দ শোনা গেল।]

বিদ্যাপতি : নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ—

(অন্তরীক্ষ হইতে প্রত্যাদেশ।)

ক্ষান্ত হও বিদ্যাপতি ও ফুল শ্রীকৃষ্ণ-চরণে নিবেদিত। বিষ্ণুআরাধিকা যে ফুল শ্রীহরির চরণে নিবেদন করে গেছে, সে ফুল নেবার অধিকার আমার নেই।

বিদ্যাপতি : মা! মা! এ তোর মায়া, না সত্য?

শ্রীদুর্গা : শোনো পুত্র! তুমি হয়ত জাননা যে, আমি পরমা বৈষ্ণবী। জগৎকে বিষ্ণুভক্তি দান করি আমিই।

বিদ্যাপতি : তোর ইঙ্গিত বুঝেছি মহামায়া। তবে তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ইচ্ছাময়ী। আমি আজ থেকে বিষ্ণুরই আরাধনা করব।

[গান]

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপ্‌ব আমি শ্যামের নাম
মা হল মোর মন্ত্রগুরু, ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম ॥

বিজয়া : (কাঁদিতে কাঁদিতে) দাদা! দাদা! শীগ্‌গির এস। মা আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

বিদ্যাপতি : বিজয়া! বিজয়া! মা নেই, মা চলে গেলেন? (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শান্ত স্বরে) হ্যাঁ,—মা আমার নেই। আমি এই মুহূর্তে মাতৃহারা হলাম। আমার ভুবনের মা আমার ভবনের মা দু'জনেই একসঙ্গে ছেড়ে গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মিথিলার রাজ-অন্তঃপুরের উদ্যান-বাটিকা]

বিদ্যাপতি : মিথিলার রাজা শিবসিংহের জয় হোক!

রাজা শিবসিংহ : স্বাগত বিদ্যাপতি! বন্ধু! তোমার মাতৃশোক ভুলবার যথেষ্ট অবসর না দিয়ে স্বার্থপরের মত রাজধানীতে ডেকে এনেছি। আমার অপরাধ নিয়ো না সখা।

বিদ্যাপতি : মহারাজ! আমি আপনার দাসানুদাস। শুধু আমি কেন, আমরা পুরুষানুক্রমে মিথিলার রাজঅনুগ্রহে ও আশ্রয়ের স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় লালিত পালিত। আপনার আদেশ আমার সকল দুঃখের ঊর্ধ্বে।

রাজা : তুমি জান সখা, রাজসভার বাইরে তুমি ওভাবে কথা বললে আমি কত বেদনা পাই। আমরা সহপাঠী বন্ধু, আমাদের যে বন্ধুত্বকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে এই তুচ্ছ রাজ-সিংহাসন। আর তোমরা তো রাজঅনুগৃহীত নও বন্ধু, মিথিলার রাজারাই তোমাদের কাছে ঋণী, অনুগৃহীত। তোমরা পুরুষানুক্রমে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মিথিলার রাজা ও রাজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছ।

বিদ্যাপতি : আমায় ক্ষমা করো সখা। এই রাজসভার বাইরে যখন তোমায় দেখি, তখন ইচ্ছা করে তোমায় আগের মত করেই বক্ষে জড়িয়ে ধরি। তবু কিসের যেন সঙ্কোচ এসে বাধা দেয়।

রাজা : বিদ্যাপতি! রাজা ও মন্ত্রির সম্পর্ক ছাড়াও আমরা আজ বেদনার তীর্থে হয়ে গেছি এক পরমাত্মীয়। তুমি হারিয়েছ তোমার মাকে; আমিও হারিয়েছি আমার দেবতুল্য পিতা দেবসিংহকে।

রানী লছমী : তুমি তো শুধু রাজমন্ত্রিই নও বিদ্যাপতি। তুমি রাজকবিও। মিথিলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি।

বিদ্যাপতি : মহারানী এখানে আছেন, তা তো বল নাই সখা।

রাজা : রানী লছিমা দেবীর অনুরোধেই তোমায় এত তাড়া দিয়ে এনেছি বন্ধু। তোমার কণ্ঠের গান না শুনলে নাকি ওঁর সে-দিনটাই হয় ব্যর্থ। এত শ্রদ্ধা তোমার ওপর, তবু মাঝের ঐ পর্দাটুকু উঠল না। ঐ নিরর্থক লজ্জার আবরণ আমাকেই লজ্জা দেয় বেশি।

বিদ্যাপতি : দেবীরা চিরকাল যবনিকার অন্তরালেই থাকতে ভালবাসেন, বন্ধু! ওঁরা হলেন অন্তর-লোকের অসূর্যম্পর্শা, বাইরের আলোর রূঢ়তা ওদের জন্য নয়।

রাজা : তবু যাকে দেখা যায় না, অথচ কথা শুনতে পাওয়া যায় তাকে যে লোক চিরকালই ভয় পেয়ে থাকে বিদ্যাপতি!

রানী লছমী : তার মানে আমি পেত্নী, এই তো! বেশ, আমি তাই। কবি! আর কথা নয়, এবার আলাপন হোক শুধু গানে গানে।

বিদ্যাপতি : মহারানীর আদেশ শিরোধার্য। কোন্ গান গাইব, দেবী?

রানী : আমার সেই প্রিয় গান—'জনম জনম হাম রূপ নেহারিনু', ও-গানটা আমার কাছে কখনো পুরানো হল না।

বিদ্যাপতি :

[গান]

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।
দেখি সাধ না ফুরায় গো!
হিয়া কেন না জুড়ায় গো
হিয়ার উপরে পিয়া
হিয়া তবু না জুড়ায় গো!

[দূরে অনুরাধার গান]

সখি লো—
অব মথুরাপুরে মাধব গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

[অনুরাধার গীত]

সখি লো—
অব মথুরাপুরে মাধব গেল।
গোকুল-মালিক কে হারিয়া নেল ॥
(হরি হরিয়া নিল কে)
গোকুল উছলল করুণাক রোল
নয়নক সলিলে বহয়ে হিলোল।
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী,
শূন ভেল দশদিশি শূন ভেল সগরী।
কৈছন যায়ব যমুনা-তীর
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটির।
নয়ন কি নিঁদ গেল, বয়নে কি হাস,
সুখ গেল পিয়া সাথে, দুখ হাম পাশ।

পাপ পরান মম আন নাহি জানত
কানু কানু কহি সুরে
বিদ্যাপতি কহে নিকরুণ মাধব
রাধারে কাঁদায়ে রহি দূরে ॥

রানী : রাজা! কে যায় পথে অমন করুণ সুরে গান গেয়ে? ওকে এখানে ডাক না!

বিদ্যাপতি : মহারানী! আমি ওকে জানি। আমি যেখানে যাই, ও আপনি এসে হয় আমার প্রতিবেশিনী। ওর নাম অনুরাধা। গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণ ওর জপমালা।

রানী : তা হলে তুমিই ওকে ডেকে আন না, কবি!

বিদ্যাপতি : আমি যাচ্ছি দেবী, কিন্তু জানি না ও আসবে কিনা।

[বিদ্যাপতির প্রস্থান]

রাজা : রানী! এখন বোধহয় বুঝতে পেরেছ—বিদ্যাপতি হঠাৎ কেন বিষ্ণু উপাসক হয়ে উঠল!

রানী : সত্যিকার ভাল না বাসলে কারুর কণ্ঠ এত মধুময় এত আবেগবিহ্বল হয় না। ও যেন মূর্তিমতী কান্না।

(গান গাহিতে গাহিতে অনুরাধার প্রবেশ)

সজল নয়ন করি পিয়াপথ হেরি হেরি
তিন এক হয় যুগ চারি।
[যেন শত যুগ মনে হয়
তারে এক তিল না হেরিলে শত যুগ মনে হয়]
বিধি বড় দারুণ তাহে পুন ঐ ছল
পূরাহ করলুঁ মুরারি!
আন অনুরাগে পিয়া দূরদেশ গেলা
পিয়া বিনু পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।
নারীর দীরঘ শ্বাস পড়ুক তাহার পাস
মোর প্রিয়া যার পাশে বৈসে,
পাখি যদি হউ পিয়া পাশে উড়ি যাও
সব দুখ কহু তার পাশে।
আনি দেহ মোর পিউরাখহ আমার জিউ
কো আছ করুণা বনে।

বিদ্যাপতি : বিদ্যাপতি কহে ধৈরয ধর চিত
তুরিতহি মিলব কান ॥

রানী লছমী : অনুরাধা, কি মিষ্টি নাম তোমার! তুমি আমার কাছে থাকবে? বিদ্যাপতি! তুমি যদি অনুমতি দাও, অনুরাধাকে আমার কাছে রেখে শ্যাম-নাম শুনি।

বিদ্যাপতি : আমি তো ওর অভিভাবক নই; দেবী! ও আমার ছোট বোন বিজয়ার বন্ধু।

রানী লছমী : ওর বাপ-মা কোথায় থাকেন?

বিদ্যাপতি : গতবার দেশে যখন মড়ক লাগে, তখন ওর বাপ-মা দু'জনেই মারা যান। সে বিসকি গ্রাম মহারাজ আমায় দান করেছেন, ওর বাবা ছিলেন সেই গ্রামে বিষ্ণু-মন্দিরের পুরোহিত। এখন ওর অভিভাবিকা বন্ধু সব বিজয়া।

লছমী : ওর বিয়ে হয়নি?

বিদ্যাপতি : না। (হাসিয়া) ও বলে বিয়ে করবে না।

অনুরাধা : বা রে, আমি বুঝি তোমার গলা ধরে বলতে গেছলুম যে, আমি বিয়ে করব না। না মহারানী, ঠাকুর জানেন না। আমার বিয়ে হয়েছে।

বিদ্যাপতি : তোমার বিয়ে হয়েছে? কার সাথে?

অনুরাধা : সে তুমি জান না, বিজয়া জানে।

লছমী : আমিও হয়ত জানি। তুমি থাকবে ভাই আমার কাছে? আমার সখি হয়ে, আমার বোন হয়ে? আর তার বদলে আমি তোমার বরকে ধরে এনে দেবো।

অনুরাধা : তা কি প্রাণ ধরে দিতে পারবে রানী। যে ঠাকুর আমার, সে যে তোমারও।

বিদ্যাপতি : মহারাজা! ওদের নিভৃত আলাপনের কমল-বনে আমাদের উপস্থিতি মত্ত মাতঙ্গের মতই ভীতিজনক। আমরা একটু অন্তরালে গেলেই বোধ হয় সুশোভন হত।

রাজা : চল বিদ্যাপতি, তোমার ইঙ্গিতই সমীচীন। (পশ্চাতে রানীর ও অনুরাধার হাসির শব্দ) কবি! এইখানে এস! এই ঝোপের আড়াল থেকে ওদের দুই দেবীকে দিব্য চক্ষে দর্শন করা যাবে।

বিদ্যাপতি : মহারাজ, যে নিজে থাকতে চায় গোপন, তাকে জোর করে প্রকাশের বর্বরতা আমার নেই।

রাজা : আঃ! কবি হয়ে তুমি কি করে এমন বদরসিক হলে বলত? ঐ দেবীর দল যখন চিকের আড়াল থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের দেখতে থাকেন তাতে কোন অপরাধ হয় না, আর আমরা একটু আড়াল

আবডাল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আরে এস এস।

চতুর্থ দৃশ্য

রানী : [একটু দূরে] অনুরাধা, তোমার কবিকে দিও আমার এই কণ্ঠহার!

অনুরাধা : রানী!

রানী : রানী নয় অনুরাধা, লছমী। তুমি আমায় লছমী বলে ডেকো। রানীর কারাগারে আমার ডাক-নামের হয়েছিল মৃত্যু। তোমার বরে সে নাম আমার বেঁচে উঠুক।

অনুরাধা : লছমী! তুমি সত্যি লছমী। রূপে লছমী, গুণে লছমী, গোলকের অধিশ্বরী—লক্ষ্মী।

লছমী : আর তুমি বুঝি ব্রজের দূতী?

অনুরাধা : বেশ, তোমার দূতিয়ালিই করব। এই চাকরিই আমি মেনে নিলাম। তোমার কণ্ঠহার আমি যথাস্থানে পৌঁছে দেব, নিশ্চিন্ত থেকো।

[অনুরাধার গান]

ধন্য ধন্য রমণী ধন্য জনম তোর
সব জন কানু কানু করে ঝুরে
সে কানু তোর ভাবে বিভোর।

[উদ্যান-অন্তরালে বিদ্যাপতি ও রাজা শিবসিংহ]

রাজা : বিদ্যাপতি! বিদ্যাপতি! দেখেছ? ওদের দুইজনের মুখে গোধূলির আলো পড়ে ঠিক বিয়ের কনের মত সুন্দর দেখাচ্ছে। বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতি, আরে তুমি যে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গেলে!

বিদ্যাপতি : অপরূপ পেখলু বামা।
কনকলতা অবলম্বনে উঠল
হরিণী হীন হিমধামা ॥
[একি অপরূপ রূপ-ফাঁদ!
স্বর্ণলতিকা ধরি উঠিয়াছে যেন কলঙ্কহীন এক চাঁদ]
নলিন নয়ান দুটি অঞ্জনে রঞ্জিত
একি ভুরু-ভঙ্গী বিলাস,
চকিত চকোর মোড় বিঁধি যেন বাঁধিল

দিয়া কালো কাজর পাশ।
গুরু গিরিবর পয়োধর পরশিছে
গ্রীবার গজমোতি হারা

কাম কম্বু ভরি কনক শম্ভু পরি
ঢালে যেন সুরধনী-ধারা।
পুণ্য প্রয়াগ-জলে যে করে যজ্ঞ শত
পায় এরে সেই বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহে, গোকুল-নায়ক
গোপীজন-অনুরাগী ॥

রাজা : সাধু! সাধু কবি! বিদ্যাপতি! একি তোমার গান, না তোমার আত্মার গান?

পঞ্চম দৃশ্য

বিদ্যাপতি ভবন

বিদ্যাপতি : বিজয়া!

বিজয়া : দাদা! ডাকচো!

বিদ্যাপতি : হাঁ, অনুরাধা কোথায় রে?

বিজয়া : কি জানি, সে কি বাড়ি থাকে? কেন মরতে ওকে এনেছিলুম। সকাল হতে না হতে রানীর যানবাহন এসে ওকে নিয়ে যায়। ও মাঝে মাঝে পালিয়ে আসে আমার কাছে, আর অমনি সাথে সাথে আসে রানীর চেড়িদল। রানীর অনুগ্রহ তাকে গ্রহের মত গ্রাস করেছে।

বিদ্যাপতি : হুঁ। হ্যাঁরে বিজয়া, সেদিন অনুরাধা বলছিল ওর বিয়ে হয়ে গেছে। সত্যিই কি ওর বিয়ে হয়েছিল?

বিজয়া : (সক্রোধে) জানি না। আচ্ছা দাদা, তুমি কবি, সাধক। তুমি তো মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পাও, অনুরাধার দিকে কখনো চোখ ফিরিয়ে দেখেছ কি?

বিদ্যাপতি : তা দেখি নি! কিন্তু ভুল তো তুইও করে থাকতে পারিস, বিজয়া! ওর স্বামী যদি থাকেই, সে পৃথিবীর মানুষ নয়, ওর স্বামী গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণ।

বিজয়া : হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ঐ নামের ছলনা করে ও যাকে পূজা করে, আমি তাকে জানি। তুমি ইচ্ছা-অন্ধ, তাই দেখতে পাও না।

বিদ্যাপতি : তার মানে, তুই বলতে চাস, ওর প্রেমের জ্যোতি আমার চোখে পড়ে আমার দৃষ্টিকে ঝলসে দিয়েছে, এই তো?

বিজয়া : হ্যাঁ, ওর প্রেমের জ্যোতি এত প্রখর যে, সেই জ্যোতির পশ্চাতে বেদনাতুর নারী-মূর্তিকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না! আমি চললাম দেখি হতভাগিনী কোথায় গেল!

[দূরে অনুরাধার গান]

সখিলো মন্দ প্রেমে পরিণামা।
বৃথাই জীন করলু পরাধীন,
নাহি উপকার একঠামা।

কেন বিধি নিরমিল এই পোড়া পিরীতি,
কাহে গড়িল মোরে করি কুলবতী।
বলিতে না পারি, হায় চলিতে না পারি,
পিঞ্জর মাঝে যেন বন্দিনী সারী ॥

বিদ্যাপতি : অনুরাধা!

বিজয়া : ঠাকুর!

বিদ্যাপতি : একি, তোমার চোখে জল কেন রাধা?

অনুরাধা : জল? কই, না তো। বিজয়া! বিজয়া! (চলিয়া গেল)।

বিদ্যাপতি : আমায় একি পরীক্ষায় ফেললে, প্রেমের ঠাকুর! তোমাদের নিবেদিত যে-প্রাণ সে-প্রাণ কেন, এত বিচলিত হয় মানবীর চোখের জল দেখে?

বিজয়া : দাদা! রানীর নাকি হুকুম, অনুরাধাকে এখন রাত্রেও রানীর কাছে থাকতে হবে। এ রানীর অত্যাচার। তুমি মিথিলার প্রধানমন্ত্রী, এর প্রতিকারের কি কোন শক্তি নেই তোমার?

বিদ্যাপতি : অনুরাধাকে ডাকো তো। আমি সব শুনে ব্যবস্থা করছি।

বিজয়া : তোমার ব্যবস্থা করতেই হবে, দাদা। নৈলে আমিই রাজার কাছে আবেদন করব।

[বিদ্যাপতির গুন্ গুন্ স্বরে গান]

অনুরাধা : আমায় ডাকছিলে ঠাকুর? বিজয়া আমায় পাঠিয়ে দিলে।

বিদ্যাপতি : রাধা। রানী কি তোমায় রাত্রেও তাঁর কাছে থাকতে বলেছেন?

অনুরাধা : হ্যাঁ। রানী বলেন, দূতীর দূতিয়ালির প্রয়োজন রাত্রেই বেশি। তবে এ ওঁর আদেশ নয়, আব্‌দার।

বিদ্যাপতি : কিসের দূতিয়ালি, রাধা?

অনুরাধা : ঠাকুর! তুমি আমায় কী মনে কর! পাগল, নির্বোধ বা ঐরকম একটা কিছু, না? তুমি যে এত যত্ন করে রোজ তোমার নবরচিত গানগুলি শেখাও, তুমি কি মনে কর আমি তার মানে বুঝি না? আর আমি কি শুধু রানীর দূতিয়ালিই করি? আমি কি তোমার দূতিয়ালি করিনে?

বিদ্যাপতি : আমি তোমার কাছে আর আত্মগোপন করব না, রাধা। সত্যিই তোমার সুরের সেতু বয়ে হয় আমাদের মিল। তবে, তুমি তো জান, আমার এ প্রেম নিষ্কলুষ, নিষ্কাম।—তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

অনুরাধা : বল।

বিদ্যাপতি : তুমি কি সত্যিই আমায় ভালবাস?

অনুরাধা : না।

বিদ্যাপতি : না? আঃ, তুমি আমায় বাঁচালে অনুরাধা।

অনুরাধা : তোমায় আমি ভালবাসি না, কিন্তু আমি ভালবাসি তাকে, যাকে তুমি ভালবাস। ঠাকুর! ঠাকুর! আমাকে এই বর দাও যেন জন্মে জন্মে তোমার ভালবাসার জনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারি। তুমি যাকে ভালবেসে সুখ পাও, তারই দাসী হতে পারি। আর দিনান্তে একবার শুধু ঐ চরণ বন্দনা করতে পারি।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! এমনি করেই তুমি বৃন্দাবনে ললিতারূপে শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করেছিলে। কোনদিন শ্রীকৃষ্ণকে নিজের করে চাও নি। শ্রীকৃষ্ণের যাতে প্রীতি, সেই শ্রীমতীর সাথে বারে বারে তাঁর মিলন ঘটিয়েছিলে। তোমার সংযম ও তোমার প্রেমের কাছে সেদিন ভগবানের প্রেমও বুঝি হয়েছিল ম্লান।

বিজয়া : অনুরাধা! আজ কি গান শিখলি সই? একি, তুই মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে পড়ে কাঁদছিস্? (সক্রোধে) দাদা!

বিদ্যাপতি : ভয় নেই বিজয়া; আমি ওকে আঘাত করিনি। (হাসিয়া) ওর দশা হয়েছে!

বিজয়া : অনুরাধা! তুই যদি ফের দাদার কাছে আসিস্, তাহলে তোর ওপর বড় দিব্যি রইল। চলে আয় ওখান থেকে।

[বিজয়ার গান]

তোরে সেই দেশে লয়ে যাব—
যথা না শুনিবি শ্যামনাম।
যথা শ্যামের স্মিরিতি নাই
শ্যামের পিরীতি নাই,
যথা বাজে না শ্যামের বাঁশি
নাই ব্রজধাম ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজ-গৃহ, রাজ-উদ্যান—প্রভাত

রাজা : আমার মুখের দিকে অমন হা করে চেয়ে কী দেখছ ধনঞ্জয়?

ধনঞ্জয় : ভয় নাই মহারাজ! আপনি মেঘ নন, আর আমি চাতক পক্ষী নই। মহারাজ যদি অভয় দেন, তা হলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা : (হাসিয়া) তুমি আমার বয়স্য। তোমার তো সাত খুন মাপ। বল কি বলতে চাও—

ধনঞ্জয় : মহারাজ! বৃন্দাবনের আয়ান ঘোষের সাথে আপনার কি কোন কুটুম্বিতা ছিল?

রাজা : তার মানে?

ধনঞ্জয় : তার মানে আর কিছু নয়, মহারাজ। চেহারা তো তার দেখিনি, তবে তার বুদ্ধির সঙ্গে আপনার বুদ্ধির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

রাজা : (সক্রোধে) ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয় : দোহাই মহারাজ! আমার মাথা কাটা যাক, তাতে দুঃখ নেই; কিন্তু আপনার অরসিক বলে বদনাম রটলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে!

রাজা : (হাসিয়া) আচ্ছা বল, কি বলছিলে?

ধনঞ্জয় : আমি বলছিলাম মহারাজ, আপনার ঐ প্রধানমন্ত্রী বিদ্যাপতির কথা। ছিলেন দুর্গা-উপাসক ঘোর শাক্ত, হলে পরম বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্ত।

ছিলেন রাজমন্ত্রী কঠোর রাজনীতিক, হলেন কবি, শান্ত কোমল প্রেমিক।

রাজা : তাতে তোমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হল, ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয় : কিছু না, মহারাজ! ক্ষতিবৃদ্ধি যা হবার, তা হচ্ছে রাজার, আর তাঁর রাজ্যের। এ-ক্ষতিও হচ্ছিল এতদিন গোপনে, তাকেও দিনের আলোকে টেনে আন্‌লে বিন্দে-দূতী।

রাজা : বিন্দে-দূতী? সে আবার কে?

ধনঞ্জয় : আজ্ঞে ঐ হল, আপনারা যাকে বলেন অনুরাধা, আমাদের মত দুর্জন তাকেই বলে বিন্দে-দূতী!

রাজা : অর্থাৎ সহজ ভাষায় তোমার কথার অর্থ এই যে, কবি বিদ্যাপতি হচ্ছেন নন্দলাল, আমি হচ্ছি আয়ান ঘোষ, আর শ্রীমতী হচ্ছেন—

ধনঞ্জয় : দোহাই মহারাজ! মাথা আর ঘাড়ের সন্ধিস্থলে বিচ্ছেদের ভয় যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ও পাপ কথা কোন্ সাহসে উচ্চারণ করি?

রাজা : ধনঞ্জয়, আয়ান ঘোষের গোপবুদ্ধি আর তোমাদের রাজার ক্ষাত্রবুদ্ধিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তোমরা কি বোঝ জানি না, আমি কিন্তু সব শুনি, সব দেখি, সব বুঝি।

ধনঞ্জয় : মহারাজ পরম উদার। আপনার ধনবল, জনবলও অপরিমাণ, তবু জটিলা কুটিলার মুখ বন্ধ করতে তা কি যথেষ্ট?

রাজা : দেখ ধনঞ্জয়, চোর যতক্ষণ ঘরের আশে পাশে ঘোরে, ততক্ষণ বলবান গৃহস্থ তাকে ভয় করে না। তবে তাকে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, সে ঘরের সিঁদ না কাটে। তা ছাড়া, এইসব নখদন্তজীব কবিদের নিরুপদ্রব প্রেমকে আমার ভয় নেই। ওরা দূরে থেকে খানিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে, দুটো কবিতা কি গান লিখবে, ব্যস। ওর চেয়ে এগিয়ে যাবার দুঃসাহস ওদের নেই! তুমি কি এর বেশি কিছু লক্ষ্য করেছ?—

ধনঞ্জয় : আজ্ঞে, তা মিথ্যে বলতে পারব না। মহারানী প্রত্যহ রাজসভায় এসে চিকের আড়াল টেনে বসেন হয় রাজকার্য দেখতেই এবং সে চিক্ গলিয়ে একটা চামচিকেরও যাবার উপায় নেই। তবু বিদ্যাপতি ঐ পর্দামুখী আসনটা অনেকেরই চক্ষুশূল স্বরূপ হয়ে উঠেছে।

রাজা : ধনঞ্জয়! আমি লক্ষ্য রেখেছি বলেই ওদের মাঝের পর্দাটুকু আজও অপসারিত হয়নি। তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো, আর সকলকে জানিয়ে দিও যে, ওদের চেয়ে আমার দৃষ্টির পরিসর অনেক বেশি। ওরা দেখে

শুধু রাজ-সভা আর রাজ-অন্তঃপুর আর আমাকে দেখতে হয় সমগ্র রাজ্য।

ধনঞ্জয় : আচ্ছা মহারাজ! তারই পরীক্ষা হোক।

রাজা : কি পরীক্ষা করবে বল তুমি?

ধনঞ্জয় : কোনো রকমে দিন কতকের জন্য রানীকে ঠেকিয়ে রাখুন, তিনি যেন রাজসভায় না আসেন। তারপর রানীর অবর্তমানে বিদ্যাপতিকে কিছু নতুন পদ রচনা করে গাইতে বলুন। আপনার অনুগ্রহে প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছেন প্রধান নায়ক, আর রাজসভা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাবাজীর আখড়া। মহারাজা দাসের অপরাধ নেবেন না।

রাজা : তোমার ইঙ্গিত বুঝেছি। আচ্ছা ধনঞ্জয়, তাই হবে।

ধনঞ্জয় : যাবার বেলায় একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই মহারাজ, একদা শ্যাম বনে গিয়ে শ্যামারূপ ধারণ করে আয়ান ঘোষের চোখে ধুলো দিয়েছিলেন!

রাজা : আমার চোখের পর্দা আছে ধনঞ্জয়। এ চোখে কেউ ধুলো দিতে পারবে না।

সপ্তম দৃশ্য

[বিদ্যাপতির বাড়ির পুষ্পোদ্যান]

অনুরাধা : ঠাকুর! আজ ক'দিন থেকে তোমার মুখে হাসি নাই, চোখে দীপ্তি নাই, কণ্ঠে গান নাই! কি হয়েছে তোমার?

বিদ্যাপতি : কেন তুমি ছলনা করছ অনুরাধা? তুমি তো সবই জান। আজ দু'দিন ধরে রাজসভায় আমার লাঞ্ছনার আর সীমা নেই। এই দু'দিন রাজাকে একটি নূতন পদও শুনাতে পারিনি। আর তাই নিয়ে শত্রুপক্ষ আমায় বিদ্রূপবানে জর্জরিত করছে।

অনুরাধা : হা হরি! এ দু'দিনে একটা গানও লিখতে পারলে না? তোমার সুরের ঝর্না হঠাৎ এমন শুকিয়ে গেল কেন?

বিদ্যাপতি : আমার কাব্যের প্রেরণা, সুরে প্রাণ লছিমা দেবী। যেদিন তাঁর উপস্থিতি অনুভব না করি, সেদিন আমার দুর্দিন। সেদিন আমার কাব্যলোকে, সুরলোকে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ!

অনুরাধা : আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো রানীকে একটুও দেখতে পাওনা, তবু কি করে বুঝতে পার যে রানী রাজসভায় এসেছেন? রানী কি কোন ইঙ্গিত করেন?

বিদ্যাপতি : না রাধা, লছিমা তো ইঙ্গিতময়ীরূপে দেখা দেননি আমায়, তিনি আমার অন্তরে আবির্ভূতা হন সঙ্গীতময়ীরূপে। তাঁর আবির্ভাব অনুভব করি আমি আমার অন্তর দিয়ে। যেদিন রানী রাজসভায় আসেন, সেদিন অকারণ পুলকে আমার দেহ মন বীণার মত বেজে ওঠে। শতগানের শতদল ফুটে ওঠে আমার প্রাণে। আমি তখন আবিষ্টের মত গান করি। ও আমার আত্মার গান নয়, ও-গান পরম আত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের গান।

অনুরাধা : ঠাকুর আমার প্রণাম নাও। তোমার পা ছুঁয়ে আমি ধন্য হলাম। আমি কাল ভোরেই দেখাব তোমার কবিতা-লক্ষ্মীকে।

বিদ্যাপতি : পারবে? পারবে তুমি অনুরাধা? (হঠাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া) এ কি করে সম্ভব হবে জানিনে, তবু জানি রাধা— এ শুধু তোমার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। তুমিই আমার বন্ধ স্রোত-সুরধুনীকে মুক্ত করতে পার।

অনুরাধা : উতলা হয়ো না ঠাকুর! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আমি দূতী, আমার অসাধ্য কিছু নেই।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা, তুমি হয়ত মনে করছ, আমি কি ঘোর স্বার্থপর, পাষণ্ড, তাই না?

অনুরাধা : নিশ্চয়ই! পাষাণ না হলে ঠাকুর হবে কি করে? শুধু নেবে, দিতে জানবে না, মাথা খুঁড়ে মরলেও থাকবে অটল, তবে তো হবে দেবতা, তবেই না পাবে পূজা!

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! আমি যদি তোমার প্রেমের একবিন্দুও পেতাম, তা হলে আজ আমি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতাম।

অনুরাধা : না ঠাকুর, তা হলে তুমি হতে আমার মতই উন্মাদ। সকলের আকাঙ্ক্ষা সমান নয়, ঠাকুর! কেউ বা পেয়ে হয় খুশি, আর কেউ বা খুশি হয় না পেয়ে—

বিদ্যাপতি : তোমার প্রেমই প্রেম অনুরাধা, যা পেয়ে শৃঙ্খলের মত জড়িয়ে থাকে না, যে প্রেম দেয় আনন্দ লোকে—অনন্ত মুক্তি।

অনুরাধা : অত শত ঘোর-প্যাঁচের কথা বুঝিনে, ঠাকুর! আমি ভালোবেসে কাঁদতে চাই, তাই কাঁদি। বুকে পেলে কান্না যাবে ফুরিয়ে, প্রেম যাবে শুকিয়ে—তাই পেতে চাইনে। বুকের ধনকে বিলিয়ে দিই অন্যকে। আমি চললাম ঠাকুর, কাল ভোরে এসে তোমায় উঠাব, তুমি প্রস্তুত থেকো।

[অনুরাধার গান]

হাম অভাগিনী, দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া যাম বহি গেলা।
মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে যত দুখ নাহি জানে লোকে।
জনম অবধি মোর এই পরিণাম
আমিই চাহিব শুধু, চাহিবে না শ্যাম।

বিদ্যাপতি : ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন ধনি রাই,
কানু সম্‌ঝাইতে হাম চলি যাই ॥

অষ্টম দৃশ্য

রাজঅন্তঃপুর

[অনুরাধার গীত]

এ ধনী কর অবধান
তোমা বিনা উন্‌মত কান ॥
(কানু পাগল হল গো—
তোমারে না হেরি' কানু পাগল হল গো)

রানী : কানু পাগল হল, না তুই পাগল হলি অনুরাধা?

অনুরাধা : (গান) শুন শুন গুণবতী রাধে!
মাধবে বধিয়া তুই কি সাধিবি সাধে?
(তুই কোন সাধ সাধিবি?
মাধবে বধিয়া তুই কোন্ সাধা সাধিবি?)

রানী : সতীনকে কাঁদাব! বুঝলি?

অনুরাধা : (গান) এত-হুঁ নিবেদন করি তোরে সুন্দরী
জানি ইহা করহ বিধান

হৃদয়-পুতলী তুহুঁ সে শূন্য কলেবর
তুহুঁ বিদ্যাপতি-প্রাণ।

রানী : আ মল! বিদ্যাপতি বিদ্যাপতি বলে ছুঁড়ি যে নিজেই পাগল হলি! বিদ্যাপতির বিদ্যাবান দিয়ে নিয়ে ঘর জুড়ে বসলেই তো পারিস্!

অনুরাধা : তা হলে তোমার কি দশা হবে সখি?

রানী : এক কৃষ্ণকে নিয়ে ষোল হাজার গোপিনী যদি সুখী হতে পারে, আমরা দু'জন আর সুখী হতে পারব না?

অনুরাধা : সেই প্রেমময়ী গোপিনীদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি, ভাই! আমরা তাঁদের পায়ের ধুলো হবারও যোগ্য নই।

রানী : সে কথা যাক্। অনুরাধা, আমার একটা কথা জানতে বড় সাধ হয়। সে কি একবারও তোকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে না?

অনুরাধা : একবারও না।

রানী : না ভাই লক্ষ্মীটি, লুকোস্‌নে। মহারাজের আদেশে আমি আজ দু'দিন রাজসভায় যেতে পাইনি। তাকে একবার দেখতে পাইনি, তার গান শুনিনি। মনে হয় যেন তাকে কত জনম দেখিনি।

অনুরাধা : তারও ঐ দশা! রোজ নতুন গান লিখেই চিৎকার করে আমায় ডাকতে থাকে—ঐ নামটা লিখে নেবার জন্য। আজ দু'দিন ধরে বেচারি একেবারে নিশ্চুপ।

রানী : হুঁ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আচ্ছা, গান লিখিয়ে সে আমার কাছে গাইতে বলে না?

অনুরাধা : উঁহু।

রানী : দূর পোড়ার মুখী! সত্যি বল না ভাই, মাথা খাস্।

অনুরাধা : তুমি যদি কাল ভোরে ঠিক এইখানে—এই মাধবীকুঞ্জে তাকে দেখতে—।

রানী : তোর মনের কথা হয়ত বুঝেছি। আচ্ছা অনুরাধা, বিদ্যাপতি তোর বর হলে তুই কি করিস বল্‌ত।

অনুরাধা : রান্না করি, কান্না করি। মাঝে মাঝে ঝগড়া করি, কাজে বাগড়া দিই, আর রাত্তির বেলায় পা টেপাই।

রানী : দোহাই তুই থাম্। তোর মুখে যে পোকা পড়বে। তুই কি লো?

অনুরাধা : তোমার বোন—সতীন। আর সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে। আচ্ছা ভাই লক্ষ্মী, তুমি যদি ওকে পাও তা হলে কি কর?

রানী : আমার ঠাকুর ঘরে রেখে পূজা করি।

অনুরাধা : মাগো, কি শাস্তি!

রানী : শাস্তি কি লো?

অনুরাধা : শাস্তি নয় তো কি? রাতদিন পাষাণ মূর্তি হয়ে তোমার মন্দিরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, হাঁটু ভেঙে গেলেও বসতে পারবে না, একে শাস্তি ছাড়া কি বলব?

রানী : তবে কি তুই বলিস্ বুকে পুরে রাখতে, কিম্বা দিন রাত মান-অভিমানের পালা গাইতে?

রাজা : রানী, তোমাদের পালা-গানে কি আমি দোয়ার্কি করতে পারি। যেয়োনা অনুরাধা, আমাদের মতন দু'চারজন দুর্জন বাধা জমায় বলেই প্রেমের আকর্ষণী সংগীত এত বেড়ে যায়। প্রেম যখন গদাই-লস্করী ঢিমেতালে চলতে থাকে, তখন তার শত্রুপক্ষই ন্যাজ মলে তাকে তাতিয়ে তোলে।

অনুরাধা : মহারাজা কি আমায় লছিমা দেবীর ছোট বোন মনে করেছেন?

রাজা : আরে, সে সৌভাগ্য হলে তো তোমায় ডাইনে নিয়ে বসতাম। লছিমা দেবী বামে বসে হতেন বামা—আর তুমি হতে ডাইনে।

অনুরাধা : আর এই দুই অবলার মাথায় চাঁটি দিয়ে মহারাজ হতেন তবলা বাদক; না? তা মহারাজ যখন এমন মধুর অধিকারই দিলেন, তখন আবার বলতে ইচ্ছে করছে—আমি তাহলে আপনাকে নিয়ে সেতারের সুর বাঁধা অভ্যাস করতাম।

রাজা : রানী, তোমার এই সখিটি যেমন মুখরা, তেমনি রসিকা। আর হবে না? কবির কাছে তালিম পাচ্ছে।

রানী : রাজা, রাজা, তুমি হাসছ—, কিন্তু তোমায় এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন? তোমার চোখে মুখে কোন রক্ত নেই!

রাজা : ঠিক মড়ার মত, না রানী? ওটা তোমার চোখের ভুল। রানী আমার একটা কথা রাখবে?

রানী : বল।

রাজা : আমাকে কাল ভোরেই যেতে হবে আমার রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে। আমি যখন থাকব না, তখন যেন আমার প্রিয় সখা বিদ্যাপতির কোন অযত্ন না হয়।

রানী : আমি বুঝতে পারছি, রাজা। তুমি অসুস্থ, তুমি একটু চুপ করে শোও। তোমার সেবা করার কর্তব্য থেকে আমায় বঞ্চিত করো না।

রাজা : কর্তব্য—সেবা—তাই কর রানী। লোকে যা চায় ভগবান তার সব কিছু দেন না। এইভাবে বঞ্চিত করেই তিনি টেনে নেন সেই হতভাগ্যকে তাঁর শান্ত কোলে। যাকে ভালবাসার কেউ নেই, সে যদি ভগবানের চরণে আশ্রয় না পায় তার মত দুর্ভাগা বুঝি আর কেউ নেই।

রানী : তুমি কবে ফিরবে?

রাজা : বহুবার তো' গেছি রানী, আবার ফিরে এসেছি—আবার হয়ত আসব তোমার সেবা নিতে। তোমায় বঞ্চিত আমি করব না।

রানী : রাজা! কেন তুমি অমন করছ? তোমার সেই বুকের ব্যথাটা বুঝি আবার বেড়েছে! ভোর হয়ে এল, তুমি একটু চুপ করে শোও, আমি আসছি এখনই।

নবম দৃশ্য

[রাজ-উদ্যান—প্রভাত]

বিদ্যাপতি : মহারাজ! আমি গান শুনাতে এসেছি। আজ আমার গানের বাঁধ, প্রাণের বাঁধ, সুরের বাঁধ ভেঙে গেছে। ভগীরথের মত সুরের অলকানন্দাকে আমি আহ্বান করে এনেছি।

রাজা : এস! এস বন্ধু, এস বিদ্যাপতি! এত আনন্দ তো তোমার কোনদিন দেখি নি বিদ্যাপতি! আজ তিন দিন ধরে তুমি ছিলে বাণীহীন, মূক। হঠাৎ আজ ভোরে তোমার এত কবি-প্রেরণা এল কোত্থেকে, বল তো?

বিদ্যাপতি : তা জানি না, মহারাজ, আমার প্রাণ শুনাতে চায় গান। নিখিল জগৎকে আজ সে গানে গানে পাগল করে দিতে চায়; ডুবিয়ে দিতে চায়, ভাসিয়ে নিতে চায়। আজ আর তোমার আদেশের অপেক্ষা রাখব না রাজা, আজ গান গাইব স্বেচ্ছায়।

[গান]

আজ রজনী হাম ভাগে পোহায়নু—
পেখলুঁ—পিয়া-মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি' মানলুঁ
দশ দিশি ভেল নিরদ্বন্দ্বা ॥
আজ মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজ মঝ দেহ ভেল দেহা।
আজ বিধি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥

রাজা : অপূর্ব! সাধু কবি, সাধু! তুমি শুধু রাণীর কণ্ঠহার পেয়েছিলে, আজ তোমার রাজার কণ্ঠহার দিয়ে ধন্য হলাম। লজ্জিত হয়ো না কবি, তোমার বুকের তলে যে লুকান থাকে রানীর দেওয়া কণ্ঠহার, সে কথা আর কেউ না জানলেও আমি জানি। এই রাজ-উদ্যানে এত ভোরে তুমি আমি ছাড়া তো আর কেউ নেই, বন্ধু। আর, অন্তরালে যদি কেউ থাকেনই, তিনি তোমার অনাত্মীয় নন। বিদ্যাপতি, অন্তরীক্ষের দেবী চোখের সুমুখে এসে আবির্ভূতা না হলে মানুষের কণ্ঠে এমন গান আসে না। দেবীর দয়া বন্ধু এ দেবীর দয়া।

বিদ্যাপতি : মহারাজ কি আমায় বিদ্রূপ করছেন? তা করুন, তবু আমার আজকের আনন্দকে মলিন করতে পারবেন না। এ আনন্দ এই শুভ্র প্রভাতের মতই অমলিন।

রাজা : তা জানি বলেই তোমায় শ্রদ্ধা করে আজও বাবু বলেই সম্ভাষণ করি বিদ্যাপতি।... আজ থেকে আমার রাজ্যে তুমি পরিচিত হবে 'কবি-কণ্ঠহার' নামে।

দশম দৃশ্য

ধনঞ্জয় : এই কণ্ঠহার-এর মাঝে এই অধম কণ্টক-হাড় কি আসতে পারে, মহারাজা?

রাজা : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! এস ধনঞ্জয় এস! আজ আমার সভাকবির পরিপূর্ণ প্রকাশের শুভ প্রভাত। এই শুভ প্রভাতে আমি কবিকে দিয়েছিলাম আমার কণ্ঠহার। প্রার্থনা কর যেন আমার সভাকবির আসন হয় বিশ্ব কোবিদ-সভায় সর্বোচ্চ স্থানে।

ধনঞ্জয় : ও-রকম প্রার্থনা আমি করব না, মহারাজ! মানুষের আসনের উচ্চতার একটা সীমা আছে, তাকে অতিক্রম করে বসলেই আমরা তাকে বলি শাখা-মৃগ। যাক। মহারাজের আজকের আনন্দটা কি সত্যকার?

বিদ্যাপতি : তুমি তা বুঝবে না, ধনঞ্জয়। যে প্রদীপ তিলে তিলে পুড়ে বুকের সমস্ত স্নেহ রসকে জ্বালিয়ে অপরকে দান করে আলো, সেই প্রদীপই জানে এই আত্মদানের—আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার কি অপার আনন্দ।

রাজা : ঠিক বলেছ কবি—আরতির প্রদীপ নিববার আগে যেমন করে শেষবার তার উজ্জ্বলতম শিখা মেলে দেবতার মুখ দেখে নিতে চায়; তেমনি করে আমার অন্তর-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখে নিতে চাচ্ছে আমার শ্রান্ত প্রাণ-শিখা। তুমি এমন গান শুনাতে পার কবি, যা আমার অন্তিম সময়েরও শুনতে ইচ্ছা করবে?

ধনঞ্জয় : এইবার কিন্তু অরসিকের মত কথা আরম্ভ হল এবং কাজেই আমাকে সরে পড়তে হল।

রাজা : ধনঞ্জয় চলে গেছে? আঃ বাঁচলাম! বিদ্যাপতি, আমায় একটু ধরবে? এখানে উঠে এলাম কি করে জানিনে, আর বোধ হয় এখান থেকে উঠে যেতে পারব না।

বিদ্যাপতি : তুমি এমন করছ কেন সখা? তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

রাজা : সখা! প্রেমের বৃন্দাবন; আমরা—আমি, তুমি, লছমী, অনুরাধা—জনম জনম ধরে লীলা-সহচর-সহচরী। সেই প্রেমলোকের গান যেদিন তুমি প্রথম শুনালে, সেইদিন আমার মনে পড়ে গেল প্রেম-লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে। তুমি কাকে লক্ষ্য করে সে গান লিখেছিলে জানিনে, কিন্তু তোমার গানের মন্ত্রে আমি উপাসনা করতে লাগলাম—রাধাশ্যামের যুগলমূর্তি। আমি আমার উপাস্য দেবতাকে

পেয়েছি, তাই আর বিরহ সহ্য করতে পারছিনে, বন্ধু! আমি আমার কানুর বাঁশরি শুনতে পেয়েছি।

বিদ্যাপতি : রাজা! বন্ধু!

রাজা : (হাসিয়া) তুমি ঠকে গেলে বন্ধু! তুমি গড়লে তরণী, আর আমি তাই চুরি করে গেলাম বৈতরণী পেরিয়ে। বিদ্যাপতি! তুমি কাঁদছ? কেঁদোনা সখা, তুমিও আসবে দু'দিন পরে আমাদের চির-লীলানিকেতন বৈকুণ্ঠধামে। কাল সারারাত্রি ঘুমোই নি, আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে ডেকেছি আর কেঁদেছি। ভোরে সেই দুরন্তের আহ্বান ভেসে এল কানে—'ওরে আয়, আমার প্রিয় আমার বুকে চলে আয়'! রানী বলছিলেন—রাজবৈদ্যকে খবর দিতে, এমন সময়ে এলে তুমি ভবরোগের বৈদ্য।

একাদশ দৃশ্য

রাজা : তুমি এখন গাও সখা আবার মাধবের নাম-গান—

[বিদ্যাপতির গান]

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী-তিল দেহ সমর্পিনু—
দয়া জানি ছাড়িবি মোয় ॥
গণইতে দোষগুণ-লেশ না পাওবি
যব তঁহি করতি বিচার,
তুঁহু জগন্নাথ জগত কহাওসি
জগ বাহির নহি মুই ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশুপাখি জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গ
চরম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি বহু তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিকয়া কাতর
তর-ইতে ইহ ভবসিন্ধু—
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

রাজা : আহা, আবার বল সখা—আবার বল :

মাধব! তর-ইতে—ইহ ভবসিন্ধু—
তুয়া পদ-পল্লব কর অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু! দীনবন্ধু।
আঃ, আমার মাথা কার কোলে?

রানী : রাজা! আমি দাসী—লছমী!

রাজা : কে কাঁদে আমার পায়ে পড়ে?

অনুরাধা : রাজা! আমি,—অনুরাধা। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুউপাসক, পরম প্রেমিক—তুমি, আমায় পায়ের ধুলা দিয়ে যাও, আমি ঐ চরণধূলির প্রসাদে—মুক্ত হয়ে যাই!

রাজা : অনুরাধা! আমি যে কৃষ্ণকে পেয়েছি ধ্যানে। সে কৃষ্ণকে তুমি যে রেখেছ বুকে পুরে। অনুরাধা—অনুরাধা—কি মধুর নাম! এই তো আমার বৃন্দাবন। বিদ্যাপতি, নারায়ণ, লছমী, অনুরাধা—কৃষ্ণনাম গান—এরই মাঝে যেন জন্মে জন্মে আসি—শ্রীকৃষ্ণ মাধব মা-ধ-ব... (মৃত্যু)

বিদ্যাপতি : অনুরাধা, লছমী ॥ রাজা! রাজা!

দ্বাদশ দৃশ্য

বিসকি গ্রাম—বিদ্যাপতির ভবন—শ্রীদুর্গা-মন্দির

[অনুরাধার গান]

মাধব! কত আর রোধব রাধা!
হা হরি হা হরি কহতহি বার বার
অব জিউ সব সমাধা ॥
ধরণী ধরিয়া ধনি যতনহি বৈঠতি
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজাহি-বিরহিনী জপমাহা তপিনী
বৈরী সদন—শরধারা ॥
অরুণ নয়ান-লোর তিতল কলেবর
বিলোলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করাইতে সংশয়
সহচরী গণতহি শেষা ॥

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! তুমি একা এখানে গান করছ? বিজয়া কোথায়?

অনুরাধা : জানি না ঠাকুর। তোমায় রানী ডাকছেন। একবার যাবে?

বিদ্যাপতি : রানী আমায় ডাকছেন? এত রাত্রে? কেন বলত?

অনুরাধা : ভয় হচ্ছে, না আনন্দ?

বিদ্যাপতি : দুই-ই। রাজা শিবসিংহের স্বর্গারোহণের পর এক বৎসর কাল রানীর প্রতিভূ হয়ে রাজ্য চালালাম, এই এক বৎসর অনবগুণ্ঠিতা রানীর মুখের দিকে চাইতে পারিনি। কেবলই ভয় হয়েছে, যদি রানীর চোখে চোখ পড়ে—আর চোখ ফিরাতে না পারি। তাই নতনেত্রে—কর্তব্য করে গেছি। রাজ-সিংহাসনে দেখেছি শুধু দু'খানি নিরাভরণ রাঙাচরণ, আর মনে হয়েছে ও-চরণ সত্য সত্যই সকল দেবতার আরাধেয়। এই এক বৎসর রানী আমায় কেবল আদেশই করেছেন রানীর মত মহিমাগম্ভীর কণ্ঠে। তাই অনুরাধা, আজ এই অন্ধকার নিশীথে তাঁর ডাক শুনে ভয় আনন্দ দুই-ই হচ্ছে।

অনুরাধা : তা হলে আমি কি বলব গিয়ে?

বিদ্যাপতি : আমি তোমার কথার ইঙ্গিতে বুঝলাম অনুরাধা যে, আমার যাওয়া উচিত নয়। তুমি সর্বদা রানীর কাছে থাক? তুমি হয়ত রানীর ভাবান্তর লক্ষ্য করেছ। রাজা জীবিত নেই, রানীই এখন রাজ্যেশ্বরী, স্বাধীনা। হুঁ তুমি বলো অনুরাধা, আমি যেতে পারব না। তোমাকে দিয়ে মিথ্যা বলাব না।

অনুরাধা : ঠাকুর, একটু পা দু'টো এগিয়ে দাও দেখি। থাক্ থাক্, তোমরা পাথরের জাত, আমিই এগিয়ে প্রণাম করি।

[গান]

নাথ দরশ সুখে বিধি কৈল বাদ
অঙ্কুরে ভাঙল বিধি অপরাধ।
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল,
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল!

[হঠাৎ ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি]

বিজয়া : দাদা! ভীষণ বৃষ্টি নামল যে। ঘরে বৃষ্টির ছাট আসছে। দোর জানালাগুলো বন্ধ করে দেই?

বিদ্যাপতি : না, খোলা থাক। অন্ধকারের কালোর সাথে মেঘের কালো মিলে কি অপরূপ কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করেছে প্রকৃতি, দেখেছিস বিজয়া?

বিজয়া : তুমি দেখ দাদা, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি চললাম।

[প্রস্থান]

[বিদ্যাপতির গান]

এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওর!
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিষন্তিয়া।
কান্ত পাঁহুন কাম দারুণ সঘনে খরশর হন্তিয়া ॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী থির বিজুরি পাঁতিয়া,
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঁয়ায়বি হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥

ত্রয়োদশ দৃশ্য

[দূরে লছিমার গান]

সজনী! কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিস পাওব
মরু সনে নাহি জাতিয়াই ॥
এখন তখন করি দিবস গোঁয়ায়নু—
দিবস দিবস করি মাসা,
মাস মাস করি বরিখ গোঁয়ায়নু
খোয়ায়নু এ তনুক আশা ॥

[বিদ্যাপতির গীত]

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জরব কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঁয়ায়বঁ কি করবঁ সো পিয়া লেহে ॥

বিদ্যাপতি : কে? রানী?

লছিমা : আমি লছিমা, চরণের দাসী।

বিদ্যাপতি : তুমি? এই নিশীথ-রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির মাঝে তুমি একা এলে?

লছিমা : হ্যাঁ, একা। আর থাকতে পারলাম না বলেই তো আমার দুখের দোসরের অভিসারে বেরিয়েছি। বিদ্যাপতি! চার বছর ধরে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আজ তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে এলাম। রাজা যেদিন আমাদের সকল প্রেমকে ম্লান করে চলে গেলেন, সেইদিন থেকে এই এক বছর তোমায় ভুলতে চেয়েছি, তোমার প্রেম, তোমার গান—তোমার সকল কিছুকে উপেক্ষা করতে—অবহেলা করতে চেয়েছি। যত ভুলতে চেয়েছি, তুমি হয়েছ তত নিকটতম। একি

দুর্বার আকর্ষণ তোমার! আমি ক্ষতবিক্ষত হলাম নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে, আর পারিনে। আমায় ঠাঁই দাও ওই চরণে।

বিদ্যাপতি : রানী! তুমি কি সেই লছিমা, না তার কঙ্কাল, প্রেত? সত্যই তুমি আজ একা তোমার প্রেম তোমায় ছেড়ে গেছে!

রানী : বিদ্যাপতি! প্রিয়তম! সত্যই আজ আমি নিঃসম্বল, তুমি ছাড়া ত্রিজগতে আজ আমার আর কেউ নেই, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না!

বিদ্যাপতি : রানীর মহিমা প্রেমের মহিমাকে তুমি এমন করে পদদলিত করবে লছিমা, এ আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। শোনো রানী,—আমি চেয়েছিলাম তোমাকেই—রাজা যদি জীবিত থাকতেন হয়ত তোমাকেই, শুধু তোমাকেই চাইতাম। কিন্তু আজ আর তোমাকে চাই না, রাজার মৃত্যু তাঁর অচিন্ত্যনীয় ত্যাগ আমাকে সত্যকার প্রেমের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। পাথর কুড়াতে গিয়ে আমি পেয়েছি পরশ-মানিক। তাঁর ছোঁয়ায় আমার সকল কাম হয়ে গেছে সোনা। তোমার মধ্য দিয়েই আমি পেয়েছি সত্য করে লছিমা দেবীকে—নারায়ণীকে, নারায়ণকে।

রানী : নিষ্ঠুর! তুমি আমায় প্রত্যাখান করছ? তুমি তাহলে এতদিন গানে গানে সুরে সুরে আমায় ডেকে প্রতারণা করেছ? নির্মম ব্যাধের জাত তোমরা, বাঁশির সুরে ডেকে হরিণীকে বধ করাই তোমাদের ধর্ম।

বিদ্যাপতি : দেবী! আমি তোমায় প্রতারণা করিনি। প্রত্যাখ্যানও করছিনে। তুমি যা চাও আমার সে প্রেম তো তুমি পেয়েছ।

রানী : না পাইনি; পেলে আমার অন্তরে এ হাহাকার থাকত না। শোনো বিদ্যাপতি, আমি চাই না শূন্য প্রেম যাকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না, আমি চাই তোমাকে—তোমার প্রাণ-মন দেহ-আত্মা তোমার সকল কিছুকে।

বিদ্যাপতি : আমি তো বলেছিলাম, আমার কামনা একদিন ছিল—আজ আর নেই। এই কামনা-শূন্য দেহ নিয়ে শব সাধনা করে তোমারও মুক্তি হবে না, আমারও হবে অধোগতি। তোমার এই প্রেম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর, তুমি সুখি হবে, শান্তি পাবে। আর তা না পারলেও তোমার প্রেম যদি সত্য হয়, আমাকে ভালবেসে তুমি শ্রীভগবানের করুণা লাভ করবে।

রানী : আমি চাই না, চাই না অন্যকিছু, চাই না মোক্ষ, চাই না মুক্তি। আমি চাই তোমাকে। স্বর্গে হোক, নরকে হোক, যেখানে হোক আমি কেবল

তোমাকে বিদ্যাপতি, তোমাকে। আমি তোমাকে পেতে চাই আমার বক্ষে, আমার চক্ষে আমার প্রতি অঙ্গ দিয়ে তোমার প্রতি অঙ্গের পরশ পেতে।

বিদ্যাপতি : লছিমা! লছিমা! ছাড়! ছাড়! যেতে দাও, পালিয়ে যেতে দাও আমাকে এখান থেকে।... তুমি প্রেম-পথভ্রষ্টা মায়াবিনী রূপ ধরে আমায় শ্রীভগবানের পথ থেকে ফিরাতে এসেছ। একি জ্বালাময় তোমার স্পর্শ! উঃ—আমি পালিয়ে গিয়ে এই তপস্যাই করব লছিমা; যেন তোমাকে এই নীচ থেকে ঊর্ধ্বে টেনে তুলতে পারি।

রানী : বিদ্যাপতি! বিদ্যাপতি! নিষ্ঠুর!

চতুর্দশ দৃশ্য

[ভীষণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বিদ্যাপতি ছুটিয়া চলিয়াছেন]

অনুরাধা : ঠাকুর! ঠাকুর! ও-পথে নয় এই দিকে, এই দিকে—এস!

বিদ্যাপতি : কে? কে তুমি চলেছ, আমার আগে দীপ জ্বালিয়ে—পথ দেখিয়ে?

অনুরাধা : (তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া) আমি বিষ্ণুমায়া!

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! অনুরাধা! নিয়ে চল, নিয়ে চল আমায় এই ঝড়-বৃষ্টি কৃষ্ণরাতের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। নিয়ে চল সেইখানে, যেখানে নেই মানুষের লালাসিক্ত কামনা-রিক্ত ভালবাসা। যেখানে আছে অনন্ত প্রেম, অনন্ত ক্রন্দন, অনন্ত অতৃপ্তি।

অনুরাধা : এস কবি, এস সাধক! এই অশান্ত কৃষ্ণ নিশীথিনীর পরপারেই পাবে অশান্ত কিশোর চিরবিরহী শ্রীকৃষ্ণকে। ঐ শোন তাঁর মধুর মুরলিধ্বনি। (দূরে করুণ বাঁশির সুর)

বিদ্যাপতি : অনুরাধা, দাঁড়াও, দাঁড়াও! কে যেন আমায় পা জড়িয়ে ধরেছে। উঃ রাধা! রাধা! আমায় কৃষ্ণ-সর্পে দংশন করেছে। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল! সকল দেহ আমার বিষে জ্বলে গেল।

অনুরাধা : (ছুটিয়া আসিয়া) ঠাকুর! ঠাকুর! দেখছ! ঐ কৃষ্ণ-সর্পের মাথায় কি অপূর্ব মণি জ্বলছে। ও কৃষ্ণ-সর্প নয়, ঠাকুর! তোমায় দংশন করেছে কৃষ্ণবিরহ। ঐ বিরহিণী যাকে দংশন করে, তার মুক্তির আর বিলম্ব থাকে না। ঠাকুর! আমার শ্রীকৃষ্ণ! আমার গিরিধারীলাল! আমার প্রিয়তম! (শেষ কথা কয়টি বলিতে বলিতে অনুরাধা নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।)

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! অনুরাধা! কোথায় নিরুদ্দেশ হলে তুমি? অনুরাধা! বুঝেছি, বুঝেছি তুমি বিষ্ণুমায়া! আমি মনে মনে চেয়েছিলাম গঙ্গায় ডুবে

লছমীর স্পর্শ-পাপ স্খলন করতে—তাই তুমি ভুলিয়ে এনেছ গঙ্গার বিপরীত পথে—আলেয়ার আলো দেখিয়ে। বুঝেছি তোমার মায়ায় ভুলেছিলাম আমি আমার আরাধ্য দেবীকে, সেই পাপে আমার এই শাস্তি—এই সর্প-দংশন, এই ভীষণ মৃত্যু! কিন্তু আমি যাব, আবার গঙ্গার পথেই যাব। যতক্ষণ শেষ নিঃশ্বাস থাকবে আমার, ততক্ষণ ছুটব পতিত-পাবনীকে স্মরণ করে—(ছুটিয়া চলিলেন।)

রানী : অনুরাধা! অনুরাধা! কেন আমায় ভাগীরথীর কূলে ডেকে আনলি? বল মায়াবিনী তোর কি ইচ্ছা?

অনুরাধা : তোমার জন্ম-জন্মান্তরের চাওয়াকে যদি চাও লছমী, তাহলে আমার সাথে এস। পারবে আমার সাথে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে?

রানী : তোর ইঙ্গিত বুঝেছি অনুরাধা! এই কলুষিত চিত্ত নিয়ে আমি শরণ নিয়েছিলাম আমার মুখর দেবতার—তাই দেবতা হলেন বিমুখ। তাই চাস্ এই পতিত-পাবনীর জলে আমার এই দেহের বিসর্জন। তবে তাই হোক। আমি যেন জন্মান্তরে—পরজন্মে, আমার বিদ্যাপতি—আমার নারায়ণকে আমার একান্ত করে পাই। মা গো পতিতপাবনী।

(দুইজনে গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।)

বিদ্যাপতি : মা গো ॥ পতিতপাবনী ভাগিরথী আমি তোর কোলের আশায় এত পথ ছুটে এলাম, তবু তোর কোলে আমার এই পাপতাপিত—বিষ-জর্জরিত দেহ রাখতে পারলাম না, মা। অঙ্গ আমার অবশ হয়ে এল। আর চলতে পারি না, মা! মাকে ডেকে, মৃত্যু উপেক্ষা করে সন্তান এল এতদূর পথ, আর তুই এতটুকু পথ আসতে পারলি না মা, ভক্ত ছেলের ডাকে? মা! মা! মা! গো! (দূরে গঙ্গার কলকল শব্দ) একি! একি! কোথা হতে ভেসে আসে দু'কূলপ্লাবী জোয়ারের কলকল সংগীত? তবে কি মা সন্তানের অন্তিম প্রার্থনা শুনেছিস্! মা মকরবাহিনী, সকল কলুষনাশিনী মা গো! একি শীতল স্নিগ্ধ স্পর্শ তোর মা! আমার সকল মন-প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। কাল-কেউটের দংশন-জ্বালা জুড়িয়ে গেল, মা, তোর মাতৃ-করস্পর্শে। কে? কে? তুমি বা পরমেশ্বরী?

মা ভাগীরথী : বিদ্যাপতি! পুত্র আমার! আমার শাপ-ভ্রষ্ট সন্তান তুমি, তোমার ডাকে আমি তোমাকে কোলে তুলে নিতে এসেছি তোমার আপন ঘরে নন্দন-লোকে।

[লছিমা ও অনুরাধা দূরে স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে—দূরে লছিমার গান নিকটতর হইতে লাগিল।]

সজনী, আজি শমন দিন হয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁজিল
হেরি প্রাণ দেহে নাহি রয় ॥
বরষিছে পুন পুন অগ্নি-দহন যেন
জানিনু জীবন অন্ত।
[বিদ্যাপতির গীত]
বিদ্যাপতি কহে, শুন শুন লছমী, মরণে মিলন মধুময় ॥

লছমী : কে? বিদ্যাপতি?

বিদ্যাপতি : লছমী? তুমি?

অনুরাধা : হ্যাঁ ঠাকুর! নিয়ে এসেছি তোমার জীবন-মরণের সাথি লছমীকে। পবিত্র সুরধুনী-ধারায় স্নাত হয়ে তোমরা উভয়ে হয়েছ নির্মল। তাই মায়ের কোলে, মরণকে পুরোহিত করে হল তোমাদের মিলন। (বলিতে বলিতে অনুরাধা ভাসিয়া যাইতে লাগিল।)

লছমী : অনুরাধা! সখি! আর তুই কি আমাদের ছেড়ে এমনি দূরে ভেসে যাবি?

অনুরাধা : লছমী! সখী! আমি যেন জনম জনম কালস্রোতে ভেসে এমনি যুগমিলন দেখে মরতে পারি! (ভাসিয়া যাইতে যাইতে অনুরাধার কণ্ঠে গান ভাসিয়া আসিল—)

তোমার যাহাতে সুখ
তাহে আমার সুখ
সুন্দর মাধব আমার।
কোটি জনম যেন তুহার সুখের লাগি
ডারি দেই এ জীবন ছার ॥

[ভীষণ স্রোত আসিয়া সকলকে ডুবাইয়া দিল।]

[যবনিকা পতন]

Vidyapati

(A Play)

Characters:

1. **Sree Durga** - Goddess Durga
2. **Sree Ganga** - Goddess Ganga
3. **Sree Vidyapati** - The poet
4. **King Shiv Singh** - The King of Mithila
5. **Lakshma** - The Queen, Shiv Singh's wife
6. **Anuradha** - A Vishnu devotee
7. **Vijaya** - Vidyapati's younger sister
8. **Dhananjay** - The King's companion

Scene One

Time: The fifteenth century

(On the bank of the Kamala River in Mithila, at the village of Biski. In the garden of the estate is the temple of *Sree Durga*. The poet Vidyapati is offering hymns to *Durga*.)

(Hymn) Hail to the mother of the universe, worshipped by *Brahma*, *Vishnu*, and *Maheshwar*. Hail, Mother, the savior of the three worlds. Hail, the primordial power, the great goddess, the delight of the divine realm. Hail, the remover of distress. All beings dwell in you, Mother, you are the refuge of all. All bonds, sins, and sorrows are destroyed by touching your feet, Mother. You are eternal, Mother, you are the creator, the preserver, and the destroyer. You are faith, devotion, and love. You are auspiciousness and success. You are righteousness, wealth, desire, and salvation, Mother. Hail, the bestower of boons, the embodiment of the three qualities, the one with ten weapons. Hail, Mother, the savior of the three worlds.

Anuradha: *Thakur*! *Thakur*!

Vidyapati: (From inside the temple) who is it?

Anuradha: It's me, Anuradha. Could you please come out for a moment?

Vidyapati: (Opening the temple door and coming out, in an annoyed tone) you could have waited a little, Anuradha! Being such a devout person, you interrupted the Mother's hymn?

Anuradha: Forgive me, Thakur. I have disturbed your meditation out of urgent need. I couldn't find any flowers today for my Krishna-Gopala. Your garden has many flowers; may I take some for my Giridharilal? My Gopala hasn't been worshipped yet.

Vidyapati: You know, Anuradha, the flowers in this garden bloom only to be offered at my Mother's feet. I cannot give these flowers to any other god or goddess! (He closes the temple door. A faint hum of the hymn can be heard from inside.)

Anuradha: (With a tearful voice) *Thakur*! *Thakur*! Are you really so cruel? Will my Lord not be worshipped today? My *Krishna-Gopala*! My beloved! If you are true, and if my love is true, then not a single flower from this garden will be used for anyone else's worship today. I offer all the flowers of this garden at your feet. (She exits.)

Vidyapati: (Muttering) Oh Mother, the flowers that bloom in my mind, in my forest, I offer them to you, Mother, to worship your feet.

Vijaya: Brother! I have brought flowers for the worship. Open the door!

Vidyapati: (Opening the door) Give them to me. Vijaya, how is Mother now?

Vijaya: I don't think she's well, brother, she's acting strange. And brother, why was Anuradha crying when she left? Why can't you stand the sight of her?

Vidyapati: Yes, I see her with only one eye. I will be out after finishing my prayers. (Vijaya leaves. Vidyapati closes the temple door. The sound of the hymn can be heard from inside.)

Vidyapati: Namastasyai namastasyai—

(A voice from the heavens) Stop, Vidyapati. These flowers are dedicated to the feet of Sree Krishna. I have no right to accept the flowers that a Vishnu devotee has offered to the feet of Sree Hari.

Vidyapati: Mother! Mother! Is this your illusion or the truth?

Sree Durga: Listen, my son! Perhaps you do not know that I am the supreme Vaishnavi. It is I who bestow devotion to Vishnu upon the world.

Vidyapati: I understand your signal, great Mother. Let your wish be fulfilled, oh wish-granting one. From today, I will worship Vishnu.

(Song) I will sit on my Shyama Mother's lap and chant Shyama's name. My Mother became my mantra-guru, and Radha-Shyama became my Lord.

Vijaya: (Crying) Brother! Brother! Come quickly! Mother has left us for heaven.

Vidyapati: Vijaya! Vijaya! Mother is gone? Mother has left? (He sighs deeply and says calmly) Yes, my Mother is no more. At this moment, I have become an orphan. The Mother of the universe and the mother of my home have both left me at once.

Scene Two

(The garden of the royal palace in Mithila)

Vidyapati: Hail to the King of Mithila, Shiv Singh!

King Shiv Singh: Welcome, Vidyapati! My friend! I selfishly summoned you to the capital without giving you enough time to mourn your mother's loss. Forgive my offense, my friend.

Vidyapati: Maharaj! I am your humble servant. Not just me, but we have been nurtured and raised for generations under the cool, comforting shade of Mithila's royal grace and patronage. Your command is above all my sorrows.

King: You know, my friend, how much it pains me when you speak like that outside the royal court. We are friends and classmates; this trivial royal throne stands between our friendship. And you are not patrons of the king, my friend, the

kings of Mithila are indebted and graced by you. For generations, you have served as chief ministers, guiding the kings and the kingdom of Mithila.

Vidyapati: Forgive me, my friend. When I see you outside this royal court, I want to embrace you like I used to, but some kind of hesitation holds me back.

King: Vidyapati! Beyond the relationship of king and minister, we have now become true kinsmen in the pilgrimage of sorrow. You have lost your mother; I too have lost my god-like father, Dev Singh.

Queen Lakshma: You are not only the royal minister, Vidyapati. You are also the royal poet. The greatest poet of Mithila and indeed of India.

Vidyapati: You didn't tell me the Queen was here, my friend.

King: It is at the request of Queen Lakshma Devi that I have hurried you here, my friend. She says her day is wasted if she doesn't hear your songs. Despite such reverence for you, that curtain between you two has not lifted. That veil of meaningless shyness embarrasses me the most.

Vidyapati: The ladies always prefer to remain behind a veil, my friend! They belong to an inner world, untouched by the sun's harsh light. The rudeness of the outside light is not for them.

King: Yet, the person who is not seen, but whose voice is heard, is always feared by people, Vidyapati!

Queen Lakshma: That means I'm a ghost, is that it? Fine, I am. Poet! No more talk. Let the conversation now be only in song.

Vidyapati: The Queen's command is my head's adornment. Which song shall I sing, Devi?

Queen: My favorite song— "Janama Janam Hama Roop Nehārinū," I never tire of that song.

Vidyapati: (Song) I have seen your beauty since birth, but my eyes are not satisfied. I have kept you in my heart for millions of ages, but my heart found no rest. My wish to see you is never fulfilled! Why does my heart not find peace? You are in my heart, beloved, but still, my heart finds no rest!

(Anuradha's song from a distance) Oh friend— the boatman of Mathura has left.

Scene Three

(Anuradha's song) Oh friend— the boatman of Mathura has left. Who has stolen the lord of Gokul? (Who has stolen Hari?) Gokul is overflowing with a wail of sorrow, Tears flow from our eyes in a flood. The temple is empty, the city is empty, the ten directions are empty, and my lap is empty. How will I go to the Yamuna's bank? How will I see the garden cottage? My eyes have lost sleep, my face has lost its smile, and Happiness has left with my beloved, only sorrow remains with me. My sinful heart knows nothing else, except to weep for him. Vidyapati says, the cruel boatman has made Radha cry from afar.

Queen: King! Who is that singing so sorrowfully on the path? Call her here!

Vidyapati: Your Majesty! I know her. Wherever I go, she becomes my neighbor. Her name is Anuradha. Her chant-beads are Giridharilal, Sree Krishna.

Queen: Then you call her here, Poet!

Vidyapati: I am going, Devi, but I don't know if she will come. (Vidyapati exits)

King: Queen! Perhaps you now understand why Vidyapati suddenly became a devotee of Vishnu!

Queen: If one doesn't truly love, no one's voice can be so sweet and full of emotion. She is like the embodiment of tears. (Anuradha enters, singing) With tear-filled eyes, I keep watching the path of my beloved, a moment feels like four ages. (One moment feels like a hundred ages, if I don't see him for a single moment, it feels like a hundred ages.) My fate is very cruel, and that rogue Murari has fulfilled its wish! My beloved has gone to a distant land for another's love, my heart is like an empty cage without my beloved. May the long sigh of a woman fall on the one she is sitting beside, If I were a bird, I would fly to my beloved's

side, and tell him all my sorrows. Bring my body, my beloved, keep my life safe, who knows if you have mercy?

Vidyapati: Vidyapati says, have patience, mind, you will meet your lord soon.

Queen Lakshma: Anuradha, what a sweet name you have! Will you stay with me? Vidyapati! If you give me permission, I will keep Anuradha with me and listen to the name of Shyama.

Vidyapati: I am not her guardian, Devi! She is my younger sister Vijaya's friend.

Queen Lakshma: Where do her parents live?

Vidyapati: When the plague hit the country last year, both her parents passed away. The king gifted me that village of Biski. Her father was the priest of the Vishnu temple in that village. Now her guardian and friend is Vijaya.

Lakshma: Is she not married?

Vidyapati: No. (Laughing) She says she won't get married.

Anuradha: Oh, I suppose I went to you and said I wouldn't get married! No, your Majesty, Thakur doesn't know. I am married.

Vidyapati: You're married? To whom?

Anuradha: You don't know that, Vijaya knows.

Lakshma: Maybe I know too. Will you stay with me, sister? As my friend, my sister? In return, I will bring your husband and give him to you.

Anuradha: Can you do that, Queen, from the bottom of your heart? The Lord who is mine, is also yours.

Vidyapati: Your Majesty! Our presence in the beautiful garden of their private conversation is as frightening as a mad elephant. It would be more appropriate for us to retreat a little.

King: Let's go, Vidyapati. Your suggestion is right. (The sound of the Queen's and Anuradha's laughter from behind.) Poet! Come here! From behind this bush, we can witness these two goddesses with our divine eyes.

Vidyapati: Your Majesty, I do not have the barbarity to force someone who wishes to remain hidden into the light.

King: Ah! How can you be so tasteless, being a poet, tell me? When those goddesses watch us for hours from behind the screen, no offense is committed, but if we peep a little from behind a bush, a great sin will occur? Come on, come on!

Scene Four

Queen: (A little far away) Anuradha, give this necklace of mine to your poet!

Anuradha: Queen!

Queen: Not Queen, Anuradha, call me Lakshma. My real name died in the prison of a queen. May that name live again through your favor.

Anuradha: Lakshma! You are truly Lakshma. Lakshma in form, Lakshma in virtue, the eternal goddess of Goloka—Lakshmi.

Lakshma: And you are the messenger of Braj?

Anuradha: Fine, I will be your messenger. I accept this job. I will deliver your necklace to its rightful place, rest assured. (Anuradha's song) Blessed, blessed is the woman, blessed is your birth, everyone calls out for Kanu, and That Kanu is lost in thought of you.

(Vidyapati and King Shiv Singh from behind the bush)

King: Vidyapati! Vidyapati! Do you see? The twilight's light on their faces makes them look as beautiful as wedding brides. Vidyapati, Vidyapati, why have you become silent and still?

Vidyapati: What a beautiful woman I see! A golden vine ascends, a fawn without the moon's stain. (What a beautiful trap of beauty! A golden vine, clinging, is like a spotless moon.) Her lotus-like eyes are adorned with kohl. What a play of her eyebrows! It seems a startled partridge has been caught in the black snare of kohl. The elephants of Mount Guru touch the pearl necklace on her neck, As if the divine stream of Ganga is pouring over a golden Shiva. The one who performs a hundred sacrifices in the sacred water of Prayag is fortunate enough to see her. Vidyapati says, the Lord of Gokul, is enamored of the Gopis.

King: Excellent! Excellent, Poet! Vidyapati! Is this your song, or the song of your soul?

Scene Five

Vidyapati's House

Vidyapati: Vijaya!

Vijaya: Brother! You called?

Vidyapati: Yes. Where is Anuradha?

Vijaya: How would I know? Does she even stay at home? Why did I even bring her here to die? As soon as morning breaks, the Queen's carriage comes and takes her away. She sometimes escapes and comes to me, and right after her, the Queen's maids arrive. The Queen's favor has swallowed her like a planet.

Vidyapati: Hmm. Hey Vijaya, that day Anuradha said she was married. Was she really married?

Vijaya: (Angrily) I don't know! Listen, brother, you are a poet, a yogi. You can see into the deepest core of people's hearts. Have you ever looked at Anuradha?

Vidyapati: No, I haven't looked at her! But you might be mistaken, Vijaya! If she has a husband, he is not a man of this earth; her husband is Giridharilal, Sree Krishna.

Vijaya: Yes, yes, I know who she worships under the guise of that name. You are willfully blind, that's why you can't see.

Vidyapati: So, you mean to say that the light of her love has blinded me and seared my vision, is that it?

Vijaya: Yes, the light of her love is so intense that you cannot see the sorrowful woman behind that light! I'm leaving. I'll go see where that unfortunate girl has gone! (Anuradha's song from a distance) Oh friend, a bad love leads to a bad outcome. My life has been made dependent for nothing, without any benefit at all. Why did fate create this burning love? Why did it make me a woman of a respected family? I cannot speak, oh! I cannot walk, I am like a captive parrot in a cage.

Vidyapati: Anuradha!

Vijaya: Thakur!

Vidyapati: What's this, Radha? Why are there tears in your eyes?

Anuradha: Tears? Where? No. Vijaya! Vijaya! (She exits)

Vidyapati: What a test you have put me through, oh God of love! Why is a soul dedicated to you so disturbed by seeing a human woman's tears?

Vijaya: Brother! The Queen has ordered Anuradha to stay with her even at night. This is the Queen's tyranny! You are the chief minister of Mithila, do you have no power to remedy this?

Vidyapati: Call Anuradha. I will listen to everything and make arrangements.

Vijaya: You have to make arrangements, brother! Otherwise, I myself will appeal to the King. (Vidyapati hums a song to himself)

Anuradha: You called me, Thakur? Vijaya sent me.

Vidyapati: Radha! Has the Queen asked you to stay with her at night too?

Anuradha: Yes. The Queen says a messenger's work is needed most at night. But this is not her command; it is her plea.

Vidyapati: A messenger for what, Radha?

Anuradha: Thakur! What do you take me for? Crazy, an idiot, or something like that? The new songs you so carefully teach me every day, do you think I don't understand their meaning? And do I only work as the Queen's messenger? Do I not work as your messenger?

Vidyapati: I will not hide myself from you anymore, Radha. It's true that our union happens through the bridge of your voice. But you know, my love is pure, without lust. I want to ask you something?

Anuradha: Go ahead.

Vidyapati: Do you really love me?

Anuradha: No.

Vidyapati: No? Ah, you saved me, Anuradha.

Anuradha: I don't love you, but I love the one you love. Thakur! Thakur! Give me this boon, that I may love with all my soul the object of your love in every birth. May I be the handmaiden of the one whose love brings you joy. And at the end of the day, may I worship only those feet.

Vidyapati: Anuradha! This is how you offered yourself to Sree Krishna in Vrindavan in the form of Lalita. You never wanted Sree Krishna for yourself. You repeatedly brought about his union with Srimati, the one who was his delight. Your self-control and your love may have even dimmed the love of God that day.

Vijaya: Anuradha! What song did you learn today, friend? What's this, you're crying on the ground? (Angrily) Brother!

Vidyapati: Don't be afraid, Vijaya; I didn't hurt her. (Smiling) Her state is this!

Vijaya: Anuradha! If you come to my brother again, I swear upon you. Come away from there! (Vijaya's song) I will take you to that land— where you won't hear the name of Shyama. Where there is no remembrance of Shyama, no love for Shyama, where Shyama's flute doesn't play, and there is no Braj.

Scene Six

The Royal House, the Royal Garden—Morning

King: Why are you staring at my face like that, Dhananjay?

Dhananjay: No fear, Maharaj! You are not a cloud, and I am not a Chatak bird. If Your Majesty grants permission, I will ask one question.

King: (Laughing) You are my companion. You have immunity for seven murders. Say what you want to say—

Dhananjay: Maharaj! Were you in-laws with Ayana Ghosh of Vrindavan?

King: What do you mean?

Dhananjay: It means nothing else, Maharaj. I haven't seen his face, but your mind has a strange resemblance to his mind.

King: (Angrily) Dhananjay!

Dhananjay: I beg you, Maharaj! Let my head be cut off, I have no sorrow; but if the reputation of being tasteless is spread about you, I will be ashamed to have my head on my shoulders!

King: (Laughing) Alright, say what you were saying?

Dhananjay: I was talking about your chief minister, Vidyapati. He was a Durga devotee, a fierce Shakta; now he's a supreme Vaishnava, a Krishna devotee. He was a minister, a stern politician; now he is a poet, a gentle and soft lover.

King: What difference does that make to you, Dhananjay?

Dhananjay: None, Maharaj! The difference that is to be made is happening to the King and his kingdom. This harm was also happening in secret until now, but the messenger of love has brought it into the light of day.

King: The messenger of love? Who is that again?

Dhananjay: Sir, she is the one you call Anuradha, and we rascals call the messenger of love!

King: That is, in simple language, you mean to say that the poet Vidyapati is Nandalal, I am Ayana Ghosh, and Srimati is—

Dhananjay: I beg you, Maharaj! As long as there is the fear of separation between my head and neck, with what audacity can I utter that sinful word?

King: Dhananjay, there is a big difference between the mind of Ayana Ghosh and the warrior's mind of your King. I don't know what you all understand, but I hear everything, see everything, and understand everything.

Dhananjay: Maharaj is very generous. Your wealth and military are immeasurable, but are they enough to shut the mouths of the gossips?

King: Look, Dhananjay, as long as a thief roams around the house, the strong householder doesn't fear him. But he has to keep an eye on him so he doesn't break into the house. Besides, I have no fear of the harmless love of these poets who live by their fingernails and teeth. They will sigh a little from a distance, write a couple of poems or songs, and that's it. They don't have the audacity to go beyond that! Have you noticed anything more than that?

Dhananjay: Yes, I cannot lie. The Queen comes to the royal court every day and sits behind a screen, perhaps to see the royal work, and not even a bat can get through that screen. But the seat behind that curtain has become an eyesore for many.

King: Dhananjay! Because I have been observing, that curtain between them has not been removed even today. You all can rest assured and let everyone know that the scope of my vision is much wider than theirs. They only see the royal court and the royal inner chambers, while I have to look after the entire kingdom.

Dhananjay: Alright, Maharaj! Let's put that to the test.

King: What test will you perform, tell me?

Dhananjay: Somehow, keep the Queen away from coming to the royal court for a few days. Then, in the Queen's absence, ask Vidyapati to compose and sing some new poems. With your favor, the chief minister has become the chief hero, and the royal court has become a gathering place for mystics. Maharaj, do not take offense at your servant's words.

King: I understand your hint. Very well, Dhananjay, so be it.

Dhananjay: Before I leave, let me remind you of one thing, Maharaj, once in the forest of Shyama, he took on the form of Shyama and threw dust in the eyes of Ayana Ghosh!

King: There is a curtain over my eyes, Dhananjay. No one can throw dust in these eyes.

Scene Seven

(Vidyapati's home garden)

Anuradha: Thakur! For the past few days, there is no smile on your face, no radiance in your eyes, no song in your voice! What has happened to you?

Vidyapati: Why are you deceiving me, Anuradha? You know everything. For the last two days, there has been no limit to my humiliation in the royal court. For these two days, I haven't been able to sing a new poem to the King. And my enemies are ridiculing me about it.

Anuradha: Oh Hari! You couldn't write a single song in two days? Why has the fountain of your music suddenly dried up?

Vidyapati: The inspiration for my poetry, the life of my music, is Queen Lakshma. The day I don't feel her presence, it's a bad day for me. On that day, a famine appears in my world of poetry and music!

Anuradha: But Thakur, you never even get to see the Queen, so how do you know she has come to the royal court? Does the Queen give any signals?

Vidyapati: No, Radha, Lakshma has not appeared to me in the form of a signal; she reveals herself in my heart as the embodiment of music. I feel her presence with my heart. The day the Queen comes to the royal court, my body and mind play like a veena with an inexplicable joy. A hundred lotus-like songs bloom in my soul. I then sing like one possessed. That song is not the song of my soul, it is the song of Sree Krishna, the supreme soul.

Anuradha: Thakur, accept my प्रणाम. I feel blessed to touch your feet. Tomorrow morning, I will make your poetry-goddess appear.

Vidyapati: Can you? Can you, Anuradha? (He suddenly composes himself) I don't know how this is possible, but I know, Radha, that only you can make it happen. Only you can free the stream of my frozen music.

Anuradha: Don't be impatient, Thakur! Your wish will be fulfilled. I am a messenger, nothing is impossible for me.

Vidyapati: Anuradha, you must think I am utterly selfish, a hypocrite, right?

Anuradha: Of course! How can you be a Thakur if you aren't heartless? You just take, you don't know how to give, even if someone beats their head to death, you remain unmoved—only then can you be a god, only then can you be worshipped!

Vidyapati: Anuradha! If I had received even a drop of your love, I could have become the greatest poet in the world today.

Anuradha: No, Thakur, then you would have become as mad as me. Everyone's desires are not the same, Thakur! Some are happy by getting, and others are happy by not getting—

Vidyapati: Your love is true love, Anuradha, the kind that doesn't bind you like a chain when you get it, the kind of love that gives infinite freedom in the realm of joy.

Anuradha: I don't understand all that complicated stuff, Thakur! I want to love and cry, so I cry. If I get him in my heart, the tears will run out, the love will dry up—so I don't want to get him. I give the treasure of my heart to others. I am leaving, Thakur. I will wake you up tomorrow morning, so be ready. (Anuradha's song) I am an unfortunate woman, I have no friend. The name of Kanu carried me away. To whom shall I tell the sorrow in my heart? No one in the three worlds knows such sorrow. This has been my fate since birth, I will only want, and Shyama will not want.

Vidyapati: Vidyapati says, listen, beautiful Rai, I am going to explain it to Kanu.

Scene Eight

The Royal Inner Chamber (Anuradha's song) Oh beautiful woman, pay heed. Kanu is mad without you. (Kanu has become mad, Kanu has become mad without seeing you.)

Queen: Kanu has become mad, or you have become mad, Anuradha?

Anuradha: (Singing) Listen, listen, virtuous Radha! What wish will you fulfill by killing Madhava? (What wish will you fulfill? What wish will you fulfill by killing Madhava?)

Queen: I will make my co-wife cry! Understand?

Anuradha: (Singing) I have this much to tell you, beautiful woman, Know that this is the decree. The puppet of the heart, you are that body, you are the soul of Vidyapati.

Queen: Oh my! The girl has gone crazy, saying "Vidyapati, Vidyapati"! You could just marry Vidyapati and fill your house with his knowledge!

Anuradha: What would happen to you then, friend?

Queen: If sixteen thousand gopis can be happy with one Krishna, can't we two be happy?

Anuradha: I bow a hundred times to the feet of those loving gopis, sister! We are not even worthy of the dust of their feet.

Queen: Forget that. Anuradha, I have a great desire to know one thing. Does he never ask about me?

Anuradha: Never.

Queen: No, my dear little Lakshmi, in secret. At the command of the Maharaj, I haven't been able to go to the royal court for two days. I haven't seen him once, haven't heard his song. It feels like I haven't seen him for ages.

Anuradha: He is in the same state! He writes a new song every day and calls out to me loudly to write down that name. For two days, the poor man has been completely silent.

Queen: Hmm. (Sighs) does he not ask me to sing the song he writes?

Anuradha: No.

Queen: Get away, you devil! Tell me the truth, or I'll break your head!

Anuradha: If you see him tomorrow morning, right here—in this Madhavi bower—

Queen: I think I understand what's in your heart. Well, Anuradha, if you had him as your husband, what would you do, tell me?

Anuradha: I would cook, I would cry. I would sometimes fight, interfere with his work, and at night, I would massage his feet.

Queen: I beg you, stop! A worm will fall into your mouth! What are you, girl?

Anuradha: Your sister—a co-wife. A co-wife teases, a co-wife burns and kills. Well, sister Lakshma, if you get him, what would you do?

Queen: I would keep my Thakur in my prayer room and worship him.

Anuradha: Oh my, what a punishment!

Queen: What punishment, girl?

Anuradha: What else but punishment? You'd have to stand in your temple like a stone idol day and night, unable to sit even if your knees break. What else can I call that but punishment?

Queen: So you're saying I should keep him in my heart, or sing songs of anger and hurt day and night?

King: Queen, may I interfere in your song? The attraction of love's music increases only because of obstacles from a few rascals like us. When love moves along at a slow, leisurely pace, its enemies prod it from behind to make it heat up.

Anuradha: Does Maharaj consider me the younger sister of Lakshma Devi?

King: Oh, if I had that good fortune, I would have made you sit on my right. Lakshma Devi would sit on the left and be my wife on the left side, and you would be on the right.

Anuradha: And the Maharaj would become the tabla player, beating on the heads of these two helpless women, right? Well, since the Maharaj has given me such a sweet right, I feel like saying—I would practice tuning a sitar with you.

King: Queen, this friend of yours is as talkative as she is witty. And why wouldn't she be? She's being taught by a poet.

Queen: King, King, you are laughing—but why do you look so tired? There is no color in your face!

King: I look like a corpse, right, Queen? That's just an illusion of your eyes. Queen, will you grant me one request?

Queen: Say it.

King: I have to cross the border of my kingdom tomorrow morning. When I am not here, please make sure that my dear friend Vidyapati is not neglected.

Queen: I understand, King. You are unwell, just lie down quietly for a while. Don't deprive me of my duty to serve you.

King: Duty—service—do that, Queen. God does not give everything a person wants. By depriving them in this way, he draws that unfortunate person into his peaceful lap. The one who

has no one to love, if he does not find refuge at the feet of God, there is no one more unfortunate than him.

Queen: When will you return?

King: I have gone many times, Queen, and I have returned—and I may return again to receive your service. I will not deprive you.

Queen: King! Why are you acting like this? Has that pain in your chest increased again? It's almost morning, lie down quietly for a while, I will be right back.

Scene Nine

(The Royal Garden—Morning)

Vidyapati: Maharaj! I have come to sing a song. Today, the dam of my song, the dam of my soul, the dam of my music has broken. Like Bhagiratha, I have summoned the Alaknanda of music.

King: Come! Come, my friend, come, Vidyapati! I have never seen you so happy, Vidyapati! For three days you were speechless, mute. How did you get so much poetic inspiration this morning, tell me?

Vidyapati: I don't know, Maharaj, but my soul wants to sing. Today, it wants to make the entire world crazy with songs; it wants to drown them, it wants to carry them away. Today I will not wait for your command, King, today I will sing of my own free will.

(Song)

I have spent this night in good fortune—

I have seen the moon of my beloved's face.

My life and youth have been fulfilled.

The ten directions have become without conflict.

Today I consider myself a home, today my body has become a body.

Today fate has been kind to me, all doubts have been dispelled.

Let that cuckoo call a hundred thousand times now,

Let a hundred thousand moons rise.

Let the five arrows become a hundred thousand arrows,

let the Malaya breeze blow gently.

Now when I am with my beloved, I will not consider this body my own.

Vidyapati says, my dear woman, your new love is not a small part of my fortune.

King: Wonderful! Excellent, Poet, excellent! You only received the Queen's necklace, but today I am blessed to give you my King's necklace. Do not be ashamed, Poet, even if no one else knows about the Queen's necklace hidden in your heart, I know. Besides you and me, there is no one else in this royal garden this morning, my friend. And, if there is someone in the background, they are not a stranger to you. Vidyapati, unless a goddess from the heavens appears before one's very eyes, a person's voice cannot produce such a song. This is the grace of the goddess, my friend, the grace of the goddess.

Vidyapati: Is Maharaj mocking me? You can, but you cannot tarnish my joy today. This joy is as pure as this bright morning.

King: I know that, which is why I still respectfully address you as Babu, Vidyapati... From today, you will be known as 'Poet-King of Necklaces' in my kingdom.

Scene Ten

Dhananjay: Can this humble, thorn-like bone fit inside this necklace, Maharaj?

King: Of course, of course! Come, Dhananjay, come! Today is the auspicious morning of the complete manifestation of my court-poet. On this auspicious morning, I gave the poet my necklace. Pray that the seat of my court-poet may be the highest in the assembly of world-poets.

Dhananjay: I will not offer such a prayer, Maharaj! The height of a person's seat has a limit, and if he goes beyond it, we call him a monkey. Anyway. Is the Maharaj's joy today genuine?

Vidyapati: You won't understand that, Dhananjay. The lamp that burns itself out, bit by bit, to give its light to others, that lamp

alone knows the immense joy of this self-sacrifice—of giving oneself away completely.

King: You said it right, Poet—just as a lamp for worship, before it goes out, wants to see the face of God with its brightest flame for the last time; in the same way, my weary life-flame wants to see the face of my inner-god Sree Krishna. Can you sing me a song, Poet that I would want to listen to even in my last moments?

Dhananjay: Now you're starting to talk like a tasteless person, so I have to leave.

King: Dhananjay is gone? Ah, what a relief! Vidyapati, will you hold me for a moment? I don't know how I got up here, and I don't think I can get up from here.

Vidyapati: Why are you acting like this, my friend? Are you unwell?

King: My friend! The Vrindavan of love; we—I, you, Lakshma, Anuradha—are companions in the play of love, birth after birth. The day you first sang the song of that world of love, I remembered Sree Krishna, the lord of the world of love. I don't know for whom you wrote that song, but by the mantra of your song, I began to worship the dual form of Radha-Shyama. I have found my deity, and so I can no longer bear this separation, my friend! I have heard the flute of my Kanu.

Vidyapati: King! My friend!

King: (Smiling) you have been deceived, my friend! You built the boat, and I stole it to cross the river Vaitarani. Vidyapati! Are you crying? Don't cry, my friend, you too will come in a couple of days to our eternal home, Vaikuntha. I couldn't sleep all night, I was calling out and crying for my beloved Sree Krishna. In the morning, I heard the call of that mischievous one floating to my ears—'Oh, come, my beloved, come to my chest!' The Queen was saying—to call the royal physician, but you came at such a moment, the physician of worldly suffering.

Scene Eleven

King: Now sing for me, my friend, again the name of Madhava—

(Vidyapati's song) Madhava, I plead with you so much. I give you my body, with tulsi leaves and tilak— may you not forsake me out of kindness. You will not find a trace of my sins or virtues when you make a judgment. You are called Jagannath, the Lord of the universe, I am a speck of dust, not outside the universe. Whether born as a human or a beast, or even as an insect, In the final crisis of transmigration, my mind seeks the touch of you. Vidyapati says, I am very distressed, save me from this ocean of existence— by holding onto the lotus of your feet, O friend of the poor, grant me a single moment.

King: Ah, say it again, my friend—say it again: Madhava! Save me from this ocean of existence— by holding onto the lotus of your feet, O friend of the poor, grant me a single moment! Ah, my head is in whose lap?

Queen: King! I am your handmaiden—Lakshma!

King: Who is crying at my feet?

Anuradha: King! It is I—Anuradha! The greatest Vishnu devotee, the supreme lover—you, give me the dust of your feet. By the grace of that dust, may I become free!

King: Anuradha! I have found the Krishna in my meditation. That Krishna you have kept in your heart. Anuradha—Anuradha—what a sweet name! This is my Vrindavan. Vidyapati, Narayan, Lakshma, Anuradha—the chanting of Krishna's name—may I be born again and again amidst this—Sree Krishna Madhava Madh-a-va... (He dies)

Vidyapati: Anuradha, Lakshma! King! King!

Scene Twelve

Biski Village—Vidyapati's House—Sree Durga Temple
(Anuradha's song) Madhava! How much longer can Radha hold back? She says 'Oh Hari! Oh Hari!' again and again. Now her soul is at its end. The woman, holding onto the earth, cannot sit still, she cannot get up again. She is a born-separated one, her chant-beads are hot like fever, and her bed is her enemy. Tears fill her red eyes, her body is wet, and her long hair is unkempt. It is a

dilemma to bring her out of the temple, her friends are at their wits' end.

Vidyapati: Anuradha! Are you singing alone here? Where is Vijaya?

Anuradha: I don't know, Thakur. The Queen is calling you. Will you go for a moment?

Vidyapati: The Queen is calling me? At this late hour of the night? Why, tell me?

Anuradha: Are you afraid, or joyful?

Vidyapati: Both. After the heavenly ascent of King Shiv Singh, I governed the kingdom as the Queen's representative for a year. In this one year, I could not look into the face of the veiled Queen. I was only afraid that if my eyes met the Queen's eyes—I might not be able to look away. So I performed my duty with my eyes lowered. On the royal throne, I only saw two unadorned pink feet, and I felt that those feet were truly worthy of worship by all the gods. For this one year, the Queen only commanded me in the majestic voice of a Queen. So, Anuradha, today, hearing her call in this dark night, I feel both fear and joy.

Anuradha: So, what should I go and tell her?

Vidyapati: From the hint in your words, Anuradha, I understand that I should not go. You are always with the Queen? You must have noticed a change in the Queen's mood. The King is no more, the Queen is now the ruler, and she is independent. Hmm, you tell her, Anuradha, that I cannot go. I will not make you lie.

Anuradha: Thakur, take two steps forward and let me see! Alright, alright, you are of the stone race, I will come forward and bow to you. (Song) Fate has prevented me from the joy of seeing my Lord, Fate's sin has broken in the bud. The ocean of happiness has become a desert, The Chatak bird died looking at the clouds! (Suddenly, a fierce storm and rain)

Vijaya: Brother! A terrible rain has started! The rain is splashing inside the house. Should I close the windows?

Vidyapati: No, let them be open. Have you seen, Vijaya, how the darkness of the night and the darkness of the clouds have merged to form a beautiful image of Krishna?

Vijaya: You can look, brother, I am sleepy, and I'm going. (She exits)

(Vidyapati's song) Oh friend, my sorrow has no end! It is the month of Bhadra, with heavy rain, and my temple is empty. Storms roar loudly, filling the world with thunder. The beloved has left, and the arrows of love are striking me hard. Lightning strikes a hundred times, and the peacock dances madly. The mad frogs call, the water bird's chest is bursting. The dense darkness fills the night, and lightning flashes. Vidyapati says, how will I pass the days and nights without Hari?

Scene Thirteen

[Lachima's song from a distance]

My friend! What shall I tell Madhav? I am separated. How will I cross this ocean, this desert? It feels like I don't belong here. I am passing my days with "now" and "then" Days turn into months, Months into years, and this body loses hope.

[Vidyapati's song] If a sprout withers in the heat of the sun, what can a rain cloud do? If this new youth is spent in separation, what will I do for my beloved's love?

Vidyapati: Who is it? Rani? **Lachima:** I am Lachima, a slave at your feet. **Vidyapati:** You? Alone, in the middle of this stormy night? **Lachima:** Yes, alone. I couldn't stay any longer, so I have come on a pilgrimage for my companion in sorrow. Vidyapati! For four years, I have fought a war with myself, and today I have come to surrender to you. From the day the King left, tarnishing all our love, for a year I have tried to forget you—to scorn and neglect your love, your songs, all of you. But the more I tried to forget you, the closer you became. What an irresistible attraction you have! I am shattered from fighting myself, and I can't do it anymore. Give me a place at your feet.

Vidyapati: Rani! Are you the same Lachima, or are you her skeleton, a ghost? Is it true that you are alone today? Has your love left you?

Rani: Vidyapati! My dearest! It is true that I am helpless today. I have no one else in the three worlds besides you. Please, don't cast me away!

Vidyapati: Lachima, that you would trample the glory of a queen and the glory of love like this was beyond my dreams. Listen, Rani—I wanted you, and if the King had been alive, perhaps I would have only wanted you. But today I no longer want you. The King's death and his unimaginable sacrifice have shown me the path of true love. While gathering stones, I found the touchstone. His touch has turned all my worldly desires into gold. Through you, I have truly found Goddess Lachima—Narayani, Narayana.

Rani: Cruel! Are you rejecting me? So, all this time, have you been deceiving me by calling out to me in songs and melodies? You are from a race of ruthless hunters. It is your way to lure a deer with a flute's melody and then kill it.

Vidyapati: Goddess! I have not deceived you, nor am I rejecting you. The love you want from me, you have already received.

Rani: No, I haven't; if I had, this desolate cry wouldn't be in my heart. Listen, Vidyapati, I don't want an empty love that cannot be touched or held. I want you—your soul, your mind, your body, your spirit, all of you.

Vidyapati: I told you, I once had a desire for you—but it is no more. With this body devoid of desire, your liberation will not be achieved, and I will be led to ruin. Offer this love of yours to Krishna; you will find happiness and peace. And if you can't do that, if your love is true, by loving me, you will still receive the grace of the Supreme Lord.

Rani: I don't want, I don't want anything else. I don't want salvation, I don't want liberation. I want you. Be it in heaven or hell, wherever it is, I want only you, Vidyapati, you. I want to

have you in my breast, in my eyes, to feel the touch of your every limb with my every limb.

Vidyapati: Lachima! Lachima! Let go! Let go! Let me go, let me flee from here! ... You have come in the form of a beautiful enchantress, lost on the path of love, to turn me away from the path of the Supreme Lord. What a burning touch this is! Oh! I will run and perform this penance, Lachima, so that I may be able to pull you up from this lowly place to a higher one.

Rani: Vidyapati! Vidyapati! Cruel one!

Fourteenth Scene

[In the midst of a terrible storm, Vidyapati is running.]

Anuradha: Master! Master! Not that way, this way—come!

Vidyapati: Who? Who are you, walking ahead of me with a lamp, showing me the way?

Anuradha: (Laughing sharply) I am Vishnu-maya!

Vidyapati: Anuradha! Anuradha! Take me, take me through this storm and rain, through this darkness of a Krishna-night. Take me to that place where there is no lustful, desire-ridden human love. Where there is infinite love, infinite sorrow, infinite dissatisfaction.

Anuradha: Come, poet, come, seeker! Beyond this restless dark night, you will find the restless young, eternally separated Krishna. Listen, there is the sweet sound of his flute. *(A sad flute tune is heard from a distance)*

Vidyapati: Anuradha, wait, wait! It seems someone has grabbed my foot. Oh! Radha! Radha! A black serpent has bitten me. It is burning, burning! My whole body is burning with venom.

Anuradha: *(Running over)* Master! Master! Do you see? What a beautiful gem is glowing on the head of that black serpent! It is not a black serpent, Master! It is the pain of separation from Krishna that has bitten you. For whom the forlorn one bites, their liberation is not delayed. Master! My Krishna! My Giridhari-lal! My beloved! *(Saying the last few words, Anuradha disappears.)*

Vidyapati: Anuradha! Anuradha! Where have you disappeared to? Anuradha! I understand, I understand you are Vishnu-maya! I wanted to drown myself in the Ganges to wash away the sin of Lachima's touch, and so you misled me onto the opposite path of the Ganges, showing me a deceptive light. I understand that in your illusion, I forgot my revered goddess. This is my punishment for that sin—this snakebite, this terrible death! But I will go, I will go back to the path of the Ganges. As long as my last breath remains, I will run, remembering the redeemer of the fallen. *(He starts running.)*

Rani: Anuradha! Anuradha! Why did you call me to the bank of the Bhagirathi? Tell me, enchantress, what is your intention?

Anuradha: If you want what you have sought for lifetimes, Lachima, then come with me. Can you jump into the Ganges with me? **Rani:** I understand your hint, Anuradha! With this polluted heart, I sought refuge in the god of my face, so the god turned away. Therefore, you want this body of mine to be offered into the water of the redeemer of the fallen. So be it. In my next birth, my next life, may I find my Vidyapati—my Narayana—for myself alone. O Mother, redeemer of the fallen. *(Both of them jump into the waters of the Ganges.)*

Vidyapati: Oh, Mother! Redeemer of the fallen, Bhagirathi, I ran all this way hoping for your embrace, yet I couldn't lay this sinful, poison-ridden body in your lap, Mother. My limbs are becoming numb. I can't walk anymore, Mother! A child called out to his mother, defying death, and came this far. And you couldn't come this short distance, Mother, at the call of your devoted son? Mother! Mother! Mother! Oh! *(The gurgling sound of the Ganges is heard in the distance)* What is this? What is this? From where does the gurgling music of the flood, overflowing both banks, come? Have you heard your child's final prayer, Mother! Mother, who rides the crocodile, the destroyer of all impurities! What is this cool, loving touch of yours, Mother! My entire heart and soul seem to have found peace. The burning pain of the black cobra's bite has been soothed, Mother, by your maternal touch! Who? Who are you, O Supreme Goddess?

Mother Bhagirathi: Vidyapati! My son! You are my son who was cursed to fall from grace. At your call, I have come to take you into my lap, to your own home in the gardens of heaven. *[Lachima and Anuradha are seen floating in the current from a distance – Lachima's song begins to get closer.]* My friend, today is the Day of Judgment. New, fresh sorrows surge from all directions; I see my soul cannot remain in my body. It rains repeatedly as if fire is burning, I know life is ending.

[Vidyapati's song] Vidyapati says, listen, Lachima, in death, union is sweet. **Lachima:** Who? Vidyapati? **Vidyapati:** Lachima? Is that you? **Anuradha:** Yes, Master! I have brought Lachima, the companion of your life and death. Bathed in the holy current of the celestial river, both of you have become pure. Therefore, in the mother's lap, with death as the priest, your union has occurred. *(While saying this, Anuradha begins to float away.)*

Lachima: Anuradha! My friend! Will you leave us and float away so far? **Anuradha:** Lachima! My friend! May I, floating in the stream of time for countless births, die watching such a union of two souls! *(As she floats away, a song drifts from Anuradha's throat)* Whatever brings you happiness, In that is my happiness, My beautiful Madhav. May I, for a million births, Give this worthless life for your happiness. *[A terrible current comes and drowns everyone.]*

[Curtain Falls]

Translated by Alamgir Mohammad

বিয়ে-বাড়ি

('প্রীতি-উপহার' সেট রেকর্ডের কথা ও গাথা)

[১]

ভোর থেকেই শানাই-এর করুণ অথচ মধুর তান উৎসবের সূচনা জানিয়ে দিচ্ছে।

বাঙালি ঘরের বিয়ে-বাড়ি।

শুরু হয়েছে লোকজনের আনাগোনা, হাঁক-ডাকা, ব্যস্ততা। ছাদে টাঙানো হলো শামিয়ানার মণ্ডপ, দুয়ারে সাজানো হলো নব-পল্লব। দলে দলে আসছে নিমন্ত্রিত অভ্যাগত–চলছে অভ্যর্থনা আর অভিনন্দন। চাকর-বাকরদের বিশ্রাম নেই, ঘন ঘন আসছে ডিবে-ভরা পান আর কল্‌কে-ভরা সুগন্ধি তামাক। বাড়িতে এসেছে নববধূ, তাই বধূ বরণের জন্য এত আয়োজন, এত সমারোহ।

গৃহস্বামী অর্থাৎ বরের বাপকে আপনারা অনায়াসেই কল্পনা করে নিতে পারেন। মোটাসোটা নধর দেহ, পরিপুষ্ট ভুঁড়ি আর প্রশস্ত টাক। তাঁর ভুঁড়ির পরিধি দেখেই মনে হয়, তাকিয়ে ঠেস দেওয়া অভ্যাস, আর টাক দেখে আপনারা নিশ্চয়ই চিনেছেন, ইনি টাকাওয়ালা লোক।

বাড়ির কর্তা তিনি, সুতরাং কাজ আর কথার ভিড়ে তাঁর আর অবকাশ নেই। গায়ের গেঞ্জি তাঁর ঘামে ভিজে গেছে, কাঁধে একখানা তোয়ালে, কোঁচাটি গুটানো।

এই দেখা গেল, চোখে চশমা এঁটে পেন্সিল হাতে তিনি বাজারের ফর্দ দেখছেন, পরক্ষণেই দেখতে পাবেন, অমায়িক হেসে বিনয়-নম্র কণ্ঠে নবাগত কোনো অভ্যাগতকে বলছেন–'আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য আমার ...' সে কথা অসমাপ্ত রেখেই আবার হয়তো তিনি চিৎকার করতে করতে অন্দরের দিকে ছুটলেন–'ওরে রামা, তামাক দিয়ে গেলি না এখনো...'

অন্দরে তখন নতুন বৌকে ঘিরে মেয়ে মজলিস বসেছে এবং সেই মজলিস সরগরম করে তুলেছেন বরের মা।

বনিয়াদী পরিবারের গিন্নি, গৌরাঙ্গী, চেহারায় স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতায় লাবণ্য।

বয়স একটু হয়েছে বৈ কি–চল্লিশের কাছাকাছি, তবু অস্তমিত যৌবনের শেষ আভাটুকু এখনো উজ্জ্বল করে রেখেছে তাঁর দেহ। গরদের শাড়ির চওড়া লাল-পাড়ের নীচে আয়ত দুটি চোখের তারায় আর পানে-রাঙা ঠোঁটের কিনারে প্রফুল্লতা টলটল করছে।

পাড়ার মেয়েদের তিনি হেসে বৌ দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু অদূরে যে তাঁর নতুন বেয়াই এসে দাঁড়িয়েছেন, সেদিকে এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি।

নতুন বেয়াই মৃদু হেসে সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে ডাকলেন –

'বেয়ান! বলি বেয়ান!

আলাপের যে ফুরসৎই নেই, এসো, এসো, এসো বেয়ান।

(আহা) বেয়ান যেন জিয়ান রসের কড়া-পাকের ভিয়ান!'

কিন্তু কথায় হটবার পাত্রী বেয়ান নন। ঘোমটাখানি কপালের নিচে আর একটু নামিয়ে দিয়ে বেয়ান জনান্তিকে বললেন–

'রসের কতা কে বলে ও? ময়রা মিনসে বুঝি?'

তারপর যেন নিতান্তই অপ্রস্তুত হয়েছে, এই ভাব দেখিয়ে বললেন–

'কে ও? বেয়াই? মাফ করো ভাই,

গরু-খোঁজা করে আমি তোমায় ফিরছি খুজি!'

এই সময়ে বাইরে থেকে ব্যস্ত কণ্ঠের ডাক শোনা গেল–

'ওগো গিন্নি, আরে, গিন্নি কোথায় গো?'

বরের বাপ অন্দর-মহলে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে গিন্নিকে বললেন–

'ও, বেয়াই-এর সঙ্গে ভিড়ে গেছ বুঝি?'

কিন্তু রসিকতায় তিনিও কম যান না। উভয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে বলে উঠলেন–

'আহা, এরা যেন রাধাকেষ্ট, আমি মাঝে আয়ান।'

মেয়ের বাপ উকিল, কথার ব্যবসায় করেন। কিন্তু তবু আজ নতুন-পাওয়া সুরসিকা বেয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে, কড়া হাকিমের সুমুখে কাঁচা-উকিলের মতোই তাঁর কথার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি তিনি নতুন বেয়াইকে বললেন–

'বেয়াই, হাবাগোবা, গোবেচারি দেখতে মোদের এ বেয়ান,

কিন্তু কথায় হার মেনে যায় গুপ্তিপাড়ার ঘোড়েল শেয়ান।'

বেয়ানও পর পাল্টা দিলেন–

'বেয়াই, তুমি জানো-য়ার লোক, অর্থাৎ জানো অনেক কিছু,

ল্যাজের মতন উপাধিও ঝুলছে নামের পিছু!

আমরা মুখ্খু-সুখ্খু পাড়াগেঁয়ে, নেই তো তেমন বুদ্ধিগেয়ান।'

বরের বাপ দেখলেন রসালাপ জমে উঠেছে মন্দ নয়। কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি বললেন–

'দুই বেয়ান না থাকলে বেয়াই রস জমে না ভালো।'

মেয়ের বাপ এবার একটু লজ্জিত হয়ে চাপা গলায় বললেন–

'আমার গিন্নি? আরে রাম! কদা, কুচ্ছিৎ, কালো।'

কথাটা কিন্তু নতুন বেয়ানেরও কানে গিয়েছিল। খোসামোদপ্রিয়তার দিক থেকে মেয়েদের সঙ্গে অপিসের বড়বাবুদের তুলনা করা যেতে পারে। এক বেয়ানের নিন্দা

করা মানেই আর এক বেয়ানের স্তুতিবাদ। মেয়েদের মনস্তত্ত্ব ধরা পড়ে এইখানেই। নতুন বেয়ান মনে মনে খুশি হয়ে বেয়াইকে বললেন–

'খাসা তোমার মুখ মিষ্টি,
কথা ত নয়, সুধাবৃষ্টি।'

বরের বাপ দরাজ হাসির শব্দে অন্দর-মহল মুখরিত করে বলে উঠলেন–

'কারণ, তুমি বর্তমানে বেই-মশায়ের ধেয়ান॥'

[২]

নিশীথ-রাতি!

ফুল-শয্যা কাজ চুকে গেছে, থেমেছে কোলাহল, শঙ্খ আর উলুধ্বনি। উৎসবের বাতি এসেছে স্তিমিত হয়ে। সারা বাড়িটার চোখে এখন শ্রান্তির তন্দ্রা। নিরালা ঘরে পুষ্প-শয্যায় বর আর বধূ বসে।

বাসর-রাতে প্রথম পরিচয়ের অবসর ছিল না। শ্যালিকা আর সখিদের হাসি, গান, কৌতুক-আলাপনের মাঝে তাদের দু'জনের ভিরু কথা গিয়েছিল হারিয়ে।

কিন্তু আজ এসছে চুপি-চুপি কথা কইবার লগ্ন, পরস্পরকে পেয়েছেও একান্ত নিকটে। জীবনের এই মিলন-মদির সৌরভ-সুন্দর রাত্রিটি কি এমনি নীরবেই কেটে যাবে? তাই দু'জনের চোখে নেই আজ ঘুম!

ফিকে-নীল বাতির আলোয় নব-বধূর লাজ-রক্তিম চন্দন-পরা মুখের পানে তাকিয়ে বর ভাবছিলো, মালা-বদলের রাত্রি আজ, কিন্তু কোন ফুলের মালা এই রূপের প্রতিমার কণ্ঠে মানাবে? বধূকেই সে শুধালে–

'কোন ফুলেরি মালা দিই তোমার গলে লো প্রিয়া?'

বনে বনে ফুলের ছোঁয়ায় বুলবুল পাখি যেমন গান গেয়ে ওঠে, তেমনি আমারও মনের–

'বুলবুল গাহিয়া ওঠে তব ফুলের পরশ নিয়া।'

বধূ ধীরে ধীরে জবাব দিলে–

'হাতে দিও হেনার গুছি, কেশে শিরীষ ফুল,
কর্ণে দিও টগর-কুঁড়ি অপরাজিতার দুল।
কুন্দ-কলির মালা দিও, না-ই পেলে বকুল,

কিন্তু কি হবে শুধু ফুল নিয়ে? রাতের ফুল যে ভোরের আগেই ঝরে যায়, তাই বধূর কণ্ঠে মৃদু-মিনতি বেজে উঠল–

'ফুলের সাথে হৃদয় দিতে হয় না যেন ভুল।'

বর তখন বাহু-বেষ্টনে বধূকে কাছে টেনে নিয়ে বললে,–'ফুলের মালা তো দিলাম। কিন্তু–

'কোন ভূষণে রাণী ও রূপের করি আরতি?
হয় সোনার বরণ মলিন, হেরি তোমার রূপের জ্যোতি!'
আবেশ-মধুর-কণ্ঠে বধূ চুপি-চুপি বললে–
'চাইনে আমি স্বর্ণ-ভূষণ–
তোমার বাহুর-বাঁধন প্রিয় সেই তো গলার হার,
হাতে দিও মিলন-রাখী, খুলবে না যা আর।'

এমন নিরালা রাত যে কানে-কানে কথা কইবার জন্যেই এসেছে। না-ই বা দিলে কানে হীরার দুল,–

'কানে দিও কানে-কানে কথার দুটি দুল,
নিত্য নূতন ভূষণ দিও প্রেমের কামনার।'

বধূর আনত মুখখানি তুলে ধরে বর বললে, 'হৃদয় তো' তোমাকে দিয়েছি সাজিয়েছি প্রেমের কামনার নব-ভূষণ দিয়ে। কিন্তু কানে-কানে কতা কইবার সময় কি বলে তোমায় ডাকবো বলো তো? কোন নামে বোঝাব তুমি আমার কে? কপালে চন্দন, সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় রাঙা চেলীর ঘোমটা–তোমার এই চির-নতুন রূপ দেখে কি তোমার পুরানো নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে করে? বলো–

'কোন নামেতে ডাকি, সাধ না মেটে কোনো নামে,
তব নাম-গানে সব কবি হার মানে ধরাধামে।'

বধূ বললে–

'সুখের দিনে সখী বলো, সেই তো মধুর নাম
দুখের দিনে বন্ধু বলে ডেকো অবিরাম।'

'আমি তো শুধু বাসর-সঙ্গিনী হয়ে আসিনি, জীবনের আনন্দ-বেদনায় তোমার পাশে চিরকাল আছি। সুখের উৎসবে তোমার সখী হবে, তোমার হাসি দেখে আমার মুখে হাসি ফুটবে, আর দুঃখ বন্ধু হয়ে দেবো সান্ত্বনা, তোমার চোখের জলে আমারও চোখের জল মিশবে। আর এমন নিরালা রাত্রে যখন বাইরে জাগবে শুধু চাঁদ, আর ঘরে তুমি আমি, সেই–

'নিরালাতে রাণী বলো শ্রাবণ-অভিরাম।'

তারপর?–

ভীরু-কপোতীর মতো লজ্জানত মুখখানি স্বামীর বুকে লুকিয়ে বধূ চুপি চুপি বললে–

'বুকে চেপে প্রিয়া বলো, সেই তো আমার নাম!'

[৩]

মিলন-রাত্রি মানুষের স্বপ্নের মতো ক্ষণস্থায়ী,–গ্রীষ্মকালের দিনে যেন আধ-গেলাস জল! পার করতে না করতেই ফুরিয়ে যায়, থাকে শুধু পিপাসা!

ফুল-শয্যার রাত্রিও ভোর হলো!

চুপি চুপি দরজা খুলে, বাসি-ফুলের বিছানা থেকে নতুন বৌ উঠে বাইরে এসেছে। জাগর-ক্লান্ত চোখে এখনো অলস-আবেশ, ঠোঁটে এখনো রাঙা মদিরতা,–কিন্তু সারা দেহে লজ্জা, মুখে অবগুণ্ঠন।

'পিছন থেকে কে বলে উঠলো,

'চাও চাও চাও নববধূ অবগুণ্ঠন খোলো,

আনত নয়ন তোলো।'

কে এলো? কে এলো দক্ষিণের হাওয়ার মতো চঞ্চল উচ্ছ্বাসে, খরস্রোতা নদীর মতো কল্লোল তুলে?

পেছনের মানুষটি এবার বধূর সামনে এসে বললে,–

'সই, আমি যে ননদী! খরতর নদী, লজ্জা কি?'

ননদ এসেছে ভাব করতে,–নতুন বৌ-য়েরই সমবয়সী।

বৌ তবু ঘোমটা খোলে না, লজ্জায় মুখ নামিয়ে বসে বসে শুধু আঙুলে জড়ায় আঁচল।

ননদী কিন্তু সত্যিই 'খরতর নদী'। এতো সহজে সে বৌকে রেহাই দেবে কেন? কাল রাতে বন্ধ-ঘরের দরজার বাইরে তাদেরই দু'জনের সঙ্গে আর একটি কৌতূহলী প্রাণী যে জেগেছিল, শুনেছিল কানে-কানে কথা, দেখেছিল প্রাণে-প্রাণে আলাপ, বৌ তো আর তা জানে না।

চোখের কোণে কৌতুকের বিদ্যুৎ আর ঠোঁটের কিনারে দুষ্টু হাসির তীক্ষ্ণ তীর ঝিকমিকিয়ে ননদ বললে–

'লজ্জায় ফুল-শয্যায় কাল ছিল না তো নত ঐ আঁখি!

সবই বলে দেবো' যদি বৌ কথা না বলো'

এই শাসনবাণী শুনে বেচারী নতুন বৌয়ের নতমুখ আরো নত হয়ে পড়ল। গত রাতের গোপনতা ননদের কাছে তা হলে ধরা পড়ে গেছে? ছিঃ ছিঃ! কিন্তু ননদীর মনের সঙ্গী-হারা পাখি তখন মিনতি-ভরা সুরে গাইছে,–'বৌ কথা কও!' বধূর চিবুক ধরে মুখখানি তুলে সে বললে–

'বউ কথা কও ডাকে পাখি

তবুও নীরব রবে নাকি?'

হঠাৎ ননদের চোখে পড়ে গেল, বধূর গালে কার অনুরাগ এখনো রাঙা হয়ে আছে। কৌতূহল-ভরে সে বলে উঠলো,

'দেখি, দেখি গালে লালী ও কিসের?'
তারপর মুখ টিপে হেসে বললে–
'ও! লজ্জায় বুঝি লাল হলো?'
ননদীর পরিহাস-বাণে জর্জরিত হয়ে নিরূপায় বৌ তখন উঠে ত্রস্ত পদে পাশের ঘরে লুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে, নূপুর উঠলো রুণঝুনিয়ে। কিন্তু ননদ তবু পিছু ছাড়ে না পলাতকা বধূর আঁচল ধরে বললে–
'ও কি, অধীর-চরণে যেয়ো না যেয়ো না
আনঘরে লুকাইতে দেখে যদি কেউ?
সখি, পাশের ও-ঘরে মানুষ যে রহে
তারও অন্তরে বহে বিরহের ঢেউ!'
সুতরাং, পালানো আর হলো না। পাশের ঘরে রয়েছে বর। এই দিনের বেলায় গত রাত্রির মিলন-স্মৃতি তারো বুকে তো বিরহের ঢেউ তুলেছে। যার জন্যে এত লজ্জা, বৌ কি লজ্জার মাথা খেয়ে তারই ঘরে গিয়ে লুকাতে পারে?
লজ্জা বাঙালির ঘরের বৌদের অলঙ্কার।
কিন্তু ননদ যেন বনের চপল কুরঙ্গী, বৌ তো সে নিজেও, তবু এতোখানি লজ্জার ধার সে ধারে না।
এত সাধাসাধির পরেও বৌ যখন না খুললে ঘোমটা, বা না কইলে কথা, তখন সে বললে–
'লজ্জাই যদি তব ভূষণ
সজ্জায় তবে কি প্রয়োজন?'
তারপর জোর করে বধূর ঘোমটা খুলে দিয়ে, বন্ধুর মতো সামনে এগিয়ে এসে স্নিগ্ধ হেসে বললে,
'ওরে-সুখে সুখি হব, দুখে দুখি
বোসো মুখোমুখি, লাজ ভোলো।'

[৪]

চারু-দর্শনা এই দুরন্ত মেয়েটির দৌরাত্ম্যে লজ্জা করবার আর উপায় কই? বধূ তখন আনত-মুখ তুলে বললে–
'হার মানি ননদিনী–
মুখের-মুখের বাণী শুনি তোর
লজ্জাও লাজ সখি ভোলে,
পুলকে প্রাণ-মন দোলে।'
হার মেনে বৌ ননদের সঙ্গে করলে সন্ধি। দুই সখিতে হলো ভাব, শুরু হলো আলাপ।

ননদ শুধালে, 'এতো লজ্জা কেন ভাই তোমার?'
কেন লজ্জা, বৌ কি নিজেই তা জানে?
শুভ-দৃষ্টির সময় সেই যে চোখের পলকে চোখে-চোখে চাওয়া, তারপর থেকেই তার আঁখিপাতা ক্ষণে ক্ষণে অকারণে নুয়ে আসে,–কতো কথা বলতে মন হয়ে ওঠে ব্যাকুল, মুখে তবু ফোটে না কথা! সে বুঝতে পারে না, কে তাকে এতো লজ্জা দেয়–প্রথম পুরুষ, না প্রথম প্রেম?'
ননদের কানে-কানে বৌ চুপি চুপি জবাব দিলে–
'পলকের চাহনিতে কে জানে কেমনে
প্রাণে এলো এতো মধু, এতো লাজ নয়নে!
বাহিরে নীরব কথার কুহু
অন্তরে মুহু মুহু বোলে।'
অথচ, এতদিন তো সে এমন লাজুক ছিল না। তার কুমারী-মন আকাশের পাখির মতো গান গেয়ে উড়ে বেড়াত, লাজের মানা মানত না। বৌ বলতে লাগল–
'তোরই মতো ছিনু সই বনের কুরঙ্গী,
মানি নাই কোনো দিন লাজের ভ্রূভঙ্গী।'
কিন্তু এখন আমি যে বৌ।
তবু, মুখরা-বেহায়া ননদীর শাসনে বারে বারে বধূর লজ্জা টুটে যায়!
এবার বধূর পরিহাসের পালা।
ননদের গলা জড়িয়ে মৃদু হেসে সে বললে, 'কথায় তোর সাথে পারবার জো নেই ভাই ঠাকুর-ঝি! কিন্তু কথায় তোর এত ধার কেন বল তো?
'মধুয়া-মুখরা ওলো মিষ্টি-মুখের তোর
সব মধু খেয়েছে কি ঠাকুর-জামাই চোর?'
ননদী তখন কপট রোষে বধূর গালে ঠোনা মারলে।
কিন্তু নব-পরিচিতা এই মুখরা কৌতুকময়ী মেয়েটিকে বৌ ভালোবেসে ফেলেছে, সমস্ত অপরিচয়ের বেড়া ভেঙ্গে সখি হয়ে যে কাছে এলো, তার কাছে লজ্জা কিসের?
হেসে গুণ্ঠনহীনা বধূ বললে–
'তব অভিনব বাণী হিলোলে
গুণ্ঠন আপনি খোলে।'

[৫]

ঘুমন্ত বাড়ি জাগল, আবার শুরু হলো দিনের কলরব।
সারা বাড়ি আনন্দে মেতে উঠল। দুটি মানুষের মিলনকে কেন্দ্র করে যে রঙিন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে আরো অনেকেরই মনে লেগেছে রোম্যান্সের

রঙ। শুধু শিক্ষিত এবং অভিজাত নয়, যারা অশিক্ষিত গরিব, তাদেরও মন বিয়ে-বাড়ির এই আনন্দ-হিল্লোলে অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

বরের বাড়ির চাকর গোবিন্দের আজ এক মিনিটিও ফুরসৎ নেই; ভোর থেকেই হাজার কাজে সে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যদিন হলে এত ফরমাস তামিল করতে গোবিন্দ নিশ্চয়ই ঘোরতর আপত্তি জানাত, কিন্তু আজ তার যেন ক্লান্তি নেই। আজ তার উৎসাহের উৎস গেছে খুলে, কাজ করতে করতে তার গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে!

গোবিন্দের এই সানন্দ উৎসাহের মূলে, অবশ্য মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, একটি গূঢ় কারণ আছে। পাশ দিয়ে কেউ এসেন্স মেখে চলে গেলে, সেই সুগন্ধের ক্ষীণ আভাসে যেমন কিছুক্ষণের জন্যে লোকের নেশা ধরে, তেমনি দুটি মানুষের মদির-মিলন স্মরণ করে গোবিন্দেরও মনে লেগেছে নেশা।

এতো কাজের ভিড়েও সে মনে মনে এরই মধ্যে তার দোসর খুঁজে নিয়েছে। তাকে হয়তো আপনারা লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু গোবিন্দের দৃষ্টি তার প্রতি অনুক্ষণ সজাগ। সে বিন্দে, কনে-বাড়ির ঝি, নতুন বৌ-এর সঙ্গে এসেছে। আঁট-সাঁট গড়ন, পরণে খড়কে-ডুরে শাড়ি, মাথায় চূড়ো-খোপা, কপালে উল্কি এবং মুখে পান দোক্তা আর ধারালো হাসি।

অতি সাধারণ এই মেয়েটার কাছে নিজেকে খেলো করতে অন্য সময়ে অশিক্ষিত গোবিন্দের আত্মাভিমানে হয়তো ঘা লাগতো কিন্তু আজকের দিনে এহেন বিন্দে, গোবিন্দের চোখে একটি বিশেষ রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে, তাই দুটো কথা কইবার অছিলায় সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে বিন্দের আশে-পাশে।

অনেক বেলায় বিয়ে-বাড়ির হাঙ্গামা যখন একটু থামলো, নিরিবিলি অবসর পেয়ে গোবিন্দ এসেছে সদর ছেড়ে খিড়কির রোয়াকে–বিন্দের সঙ্গে ফের আলাপ করতে। কাঁধের গামছাখানা দিয়ে মুখের ঘাম চট করে একবার মুছে নিয়ে গোবিন্দ ডাকলে, 'শুনতিছ! ও বিন্দে! ও কনে বাড়ির ঝি! এ্যাঃ, কথাটা মোটেই কানে যাচ্ছে না! বলি একবার ফিরে চাইয়েই দ্যাখো!

ও বিন্দে! ঘাড় ফিরোয়ে চাও তোমার ঐ চোখ মেলে।

সত্যি বলতিছি, তুমি সগ্যে যাবা আমার মতন লোক পেলে?

কিন্তু বিন্দের আজ গুমোর বেড়েছে, অত সহজে সে আলাপ কর্তে চায় না। মুখ-ঝামটা দিয়ে সে বলে উঠলো–

'তুই বরের বাড়ির চাকর সেই সম্পক্কে বেহাই
তাই পেলি আজ রেহাই।
নইলে পোড়ার মুখে দিতাম ঢেলে বাসি-আকার ছাই ॥'

গোবিন্দ বেচারি একটু থমমত খেয়ে এক গাল হেসে বললে–

'কেডা কলো বিন্দে মোগো সম্পক্ক নাই?
আমি তোমার ননদের যে একমাত্র ভাই।'
তাকি ভুলে গেলে?
নাঃ, লোকটা নেহাৎই নাছোড়বান্দা! চোটে উঠে বিন্দে বললে–
'মর মিনসে, সয় না সবুর হাড়-জ্বালাতে ফের এলে।'
কিন্তু মায়াও হচ্ছিল বিন্দের। মুখের দুটো মিষ্টি-কথার প্রত্যাশায় যে এমন করে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে আজ সে নাই বা ফিরিয়ে দিল? আর, বিয়ে-বাড়ির এই হাসি-খুশির রঙ কি বিন্দের যৌবনকেও একটু রঙিন করে তোলেনি? গোবিন্দের কাঙাল-চোখ আর ঘর্মাক্ত মুখের পানে তাকিয়ে সে গলাটা কোমল করে বললে–
'ঘেমে নেয়ে উঠেছ যে বিরহেরি বোঝা ঠেলে
একটু দাওয়ায় বোসো'–
গোবিন্দ খুশি হয়ে বলে উঠলো–
'বাতাস করবা নাকি?'
বিন্দে এবার হেসে ফেলে বললে–
'আঃ চুপ, চুপ করে ঐ দাওয়ায় বোসো
প্রেম-পাগলের দাওয়াই যে ঐ–'
এদিক-ওদিক চেয়ে বিন্দে গোবিন্দের হাত ধরে তাকে রোয়াকে বসিয়ে দিল। গোবিন্দের খুশির আর সীমা নেই। আকর্ণ দন্ত-বিকাশ করে সে বলে উঠলো–
'আজ হ্যাঁকোচ-প্যাঁকোচ করতিছে প্রাণ পুলকের-ই ঠেলায়।'
বিন্দে ভাবলে আনন্দ তো শুধু সেই দুটি মানুষেরই, যারা পরস্পরকে ভালোবেসে কাছে পেয়েছে আর নিরিবিলি ঘরে ফুল-ছড়ানো বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে সারারাত মনের কথা কয়েছে। বাঁকা চোখে চেয়ে, ঠোঁটে হাসির ইশারা ফুটিয়ে সে বললে–
'আর, এক-যাত্রায় পৃথক ফল আমাদেরই বেলায়।'
কিন্তু ঝি-চাকর হলেও তাদের মন বলে কি কিছু নেই? চারিদিকের এই আনন্দ-সমারোহের মাঝে তাদেরও যৌবন-ও কি গান গেয়ে উঠতে চায় না? বিন্দে ডুরে-শাড়ি আঁচল দুলিয়ে, চূড়ো-খোঁপা হেলিয়ে বলে উঠলো–
'মোরা গিলবো অঢেল আনন্দ আজ একটু ছাড়া পেলে'
গোবিন্দ তাড়াতাড়ি একটা উপমা দিলে–
'যেমন দুর্ভিক্ষেরই দেশের মানুষ গো-গেরাসে গেলে ॥'

[৬]

আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ, আর দীঘিতে ফুটেছে কুমুদী।

ঘরে বর আর বধূ। দুটি জীবন-স্রোত এসে মিলেছে প্রেমের তীর্থে। একটি প্রাণের সাথে মিলেছে আর একটি প্রাণের ছন্দ! জন্ম নিল তাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম কবিতা।

জীবনের এই পরিপূর্ণতার লগ্নে বর আর বধূ একত্রে কণ্ঠ মিলিয়ে বললে–

'মোরো ছিলাম একা, আজ মিলিনু দুজন।

পাপিয়ার পিয়া-বোল কপোত কূজন ॥'

এ মিলন যেন পাপিয়ার 'পিয়া' ডাক, আর কপোত-কপোতীর কূজনের মতোই মধুর, সম্পূর্ণ! দুজনের এই মিলন এ যেন পরস্পরের কাছে পরস্পরের আবির্ভাব। বর যেন এতদিন ছিল উষর প্রান্তরের মতো নিঃসঙ্গ, সেখানে সহসা এলো শ্যামলতার বন্যা, ফুটলো ফুল! বর তাই বললে–

'তুমি সবুজের স্রোত এলে ঊষর দেশে।'

আর স্বামী নারীর জীবনে পরম আশির্বাদ! বধূর লাজ-মৃদু কণ্ঠে সেই পরম সার্থকতার ভাষাই ফুটলো–

'তুমি বিধাতার-বর এলে বরের বেশে।'

বধূর সীমন্তিনী কঙ্কণ-পরা কল্যাণী-মূর্তির পানে চেয়ে বর বললে–'তুমি তো' শুধু 'বউ' নও–

'তুমি গৃহে কল্যাণ'

বঁধু তোমনি নম্র-কণ্ঠে বললে–'তুমিও ত' শুধু আমার প্রতিদিনের জীবনের সংসারের স্বামী নও। তোমার প্রেমের পূজায় আমি যে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। তুমি যে আমার দেহ-মনের স্বামী!

'তুমি প্রভু মম ধ্যান।'

বাইরে চাঁদ আর কুমুদী পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো। জীবনের সঙ্গে জীবনের, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের আকাশ-ধরণী তাদের চোখে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে!

ঘরের ভিতর দুটি তরুণ-কণ্ঠে সেই কথাই বেজে উঠলো–

'সুন্দরতর হলো সুন্দর ত্রিভুবন।

* * *

এইবার আশীর্বাদের পালা। পুরনারীদের কলগুঞ্জন শোনা গেল। গুরুজনেরা এসেছেন এই মিলনকে আশীর্বাদ করতে। প্রথমে এলেন ঠানদি। পাকা আমের মতো টসটসে চেহারা, মাথার পাকা চুলে অন্তরের শুভ্র প্রসন্নতা প্রকাশ পেয়েছে, মুখে বার্ধক্যের রেখা। ঠানদির বয়সের হিসেব নেই, কিন্তু মন আজো আছে সেই বাইশ বছরের কোঠায়। মিষ্টি হেসে ঠানদি নবদম্পতির সামনে এসে বললেন–

'ভাই নাত-জামাই!
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি–
তুমি বৌর-তীর্থে নেড়া হও।
মোর নাতনীর ভ্যাড়া হও।
বাইরে গোঁফে চাড়া দেবে
ঘরে বৌ-এর ঘোড়া হও।
ফোঁসফোসাবে বাইরে শুধু
বৌ-এর কাছে ঢোঁড়া হও।
বাইরে পুরুষ অটল পাষাণ
বৌ-এর ঘরে নোড়া হও।
দিনের বেলা ফরফরাবে
রাত্তির বেলা খোঁড়া হও।
সুয্য-চাঁদের আয়ু পেয়ে
চিরকালটা ছোঁড়া রও।
নাতনীর আমার ভ্যাড়া হও,
ন্যাড়া হও ॥
কার আজ্ঞে? না কামরূপ কামাখ্যা-দেবীর আজ্ঞে ॥
ঠানদির পরে এলেন মা ধান-দুর্বা নিয়ে। বাঙালি-ঘরের নারীর যা চিরন্তন কামনা, যা চিরকালের আদর্শ, তারই কথা তিনি তাঁর ঘরের লক্ষ্মীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। অন্তরের মধুর মমতা তাঁর কণ্ঠ হতে ঝরে পড়তে লাগল–
'তুমি হও মা চির-আয়ুষ্মতী
সাবিত্রী সমান সতী।
অচঞ্চলা লক্ষ্মী হয়ে
চিরকাল এই ঘরে রও,
শ্বশুর শাশুড়ীর আদরিণী
স্বামীর সুয়োরাণী হও।
তোমায় পেয়ে বিধির বরে
যেন এ ঘর ধনে-জনে ভরে।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
রাখব দেহ গঙ্গাজলে।
সিঁথেয় সিঁদুর মুখে পান
আলতা পায়ে চির-এয়োতি
যায় সুখে দিন এক সমান ॥

এরপর আশীর্বাদ করতে এলেন দিদি। তাঁর নতুন বোনটির চিবুক ধরে তিনি স্নেহ-স্নিগ্ধ সুরে বললেন–

'তুমি বৌ শুধু নও, ঘরের আলো,
এই আলোতে মোদের ঘরের
কেটে যাবে আঁধার কালো
রাঙা হতে শাদা শাঁখা
অন্নপূর্ণার আশীষ মাখা
ক্ষয় যেন না হয় ও-হাতে
অম্লান থাক সিঁদুর সাথে
এই চাই ভাই, ঘরে পরে
পড়বে সবার সুনজরে।
আলতা সিঁদুর নোয়া পরে
থাক তিন কুল আলো করে।
জানবে না ক দুঃখ শোক
অন্তে পাবে স্বর্গ-লোকে ॥'

তারপর বাজল মঙ্গল-শঙ্খ, পুরনারীরা দিল উলুধ্বনি, আর আকাশের দিব্যলোক বিধাতার প্রসন্ন আশীর্বাদ হয়ে মাটির বুকে নেমে এলো।

'বিয়ে-বাড়ি' শীর্ষক এই গ্রামোফোন রেকর্ড-নাটকের ('হিজ মাস্টার্স ভয়েস, কোম্পানির রেকর্ড নম্বর এন ৭৩২৬ - ৭৩২৮ দ্রষ্টব্য) গানগুলোর অধিকাংশই নজরুলের 'সন্ধ্যামালতী' শীর্ষক গীতিগ্রন্থে সংকলিত।

The Wedding House

(From the record "**Preeti-Upahar**: Tales of the Set Recorder")

[1]

From early morning, the poignant yet sweet strains of the *shehnai* announce the start of a celebration. It's a wedding at a Bengali household.

Guests are beginning to arrive, a bustle of shouts, calls, and activity. A canopy has been strung up on the roof, and the doorway is decorated with new leaves. Invited guests arrive in groups, greeted with welcomes and congratulations. The servants are tirelessly busy, bringing fresh tobacco-filled hookahs and trays of betel leaves. A new bride has arrived, and all this fuss, this ceremony, is for her welcome.

You can easily picture the master of the house, the groom's father. He has a plump build, a well-fed belly, and a broad, bald head. Just by the circumference of his belly, you can tell he's in the habit of leaning back against a pillow. And from his bald head, you can surely guess he's a wealthy man.

As the head of the house, he's constantly busy with work and chatter. His vest is soaked with sweat, a towel is draped over his shoulder, and his loincloth is hitched up.

One moment, you'll see him with glasses perched on his nose, a pencil in hand, checking the market list. The next, he'll be humbly and affably greeting a newly arrived guest, "Please, please, come in, what a fortunate day for me..." He'll leave that sentence unfinished and run inside, shouting, "Hey, Rama, you still haven't given them tobacco yet...!"

Inside, the new bride is surrounded by a group of women, a lively gathering animated by the groom's mother. She's the mistress of a venerable family, fair-skinned, with the grace of health and prosperity in her face.

She's getting on in years, close to forty, but the last glow of her fading youth still brightens her body. In the deep pupils of her large eyes below the wide red border of her *garad* sari, and at the corners of her betel-stained lips, joy overflows.

She was smiling and showing off the bride to the neighborhood women, but she hadn't noticed that the new bride's father had been standing nearby all this time. The new *beyai* (co-father-in-law) called out to her with a soft smile, "Oh *beyan*! My dear *beyan*! You have no time for conversation. Come, come, come, my *beyan*! It seems my *beyan* is the sharpest of them all!"

But the *beyan* (co-mother-in-law) is not one to be outdone. Pulling her veil down a little lower, she whispered as if to herself, "Who's talking about wit? Is it a confectioner I hear?" Then, pretending to be utterly flustered, she exclaimed, "Who is it? My *beyai*? Forgive me, brother, I was looking for a cow and found you instead!"

Just then, a voice called out in a busy tone from outside, "Oh mistress, where is the mistress?"

The groom's father entered the inner rooms, stopped, and said to his wife, "Oh, busy with the *beyai*, are we?"

But he was no less witty. He looked at both of them, smirked, and declared, "They are like Radha and Krishna, and I am the poor Ayana in between."

The bride's father is a lawyer, a man whose profession is words. But today, standing before his witty new *beyan*, he was like a fresh lawyer before a stern judge—he lost his train of thought. He quickly said to his new *beyai*: "My *beyai*, our *beyan* may seem like a simple village girl, but she could outsmart the shrewdest of lawyers from all of Bengal."

The *beyan* immediately shot back, "My *beyai*, you are a man of knowledge, which means you know many things, and you have titles like 'learned' hanging after your name! But we are just simple village folk, we don't have much sense."

The groom's father saw that the banter was getting good, but something was missing. He looked around and said, "The banter isn't as much fun without both *beyans*."

The bride's father now looked a little embarrassed and whispered, "My mistress? Oh, God! She's as ugly and black as coal."

The new *beyan* overheard this, of course. In their love for flattery, women can be compared to office bigwigs. To criticize one's *beyan* is to praise the other. This is where the female psyche is revealed. The new *beyan*, pleased, said to the *beyai*, "How sweet your mouth is, what you say is not words, but a shower of nectar."

The groom's father, with a hearty laugh that filled the inner rooms, exclaimed, "Because right now, you are the vision in front of the groom's father!"

[2]

It's midnight. The ceremony of the flower bed is over. The clamor, the conch shells, and the ululations have stopped. The festive lights have dimmed. The entire house is now in a state of weary slumber. In the private room, on the flower-strewn bed, sit the groom and the bride.

On the wedding night, there was no time for their first private acquaintance. Amidst the laughter, songs, and playful banter of the sisters-in-law and friends, their shy words were lost.

But tonight is the night for quiet conversation. They are alone, intimately close to each other. Will this fragrant and intoxicating night of their union pass in silence? No, for there is no sleep in their eyes tonight!

In the pale blue light of the lamp, the groom looks at his bride's shy, blushing, sandalwood-adorned face and wonders what kind of flower garland would suit this beautiful image. He asks her, "Which flower garland should I place around your neck, my love?"

Like a nightingale that sings upon the touch of a flower in the forest, so his heart's own nightingale sings upon the touch of the flowers. The bride responds softly, "Give me jasmine buds in my hand, and a shirisha flower in my hair. Adorn my ears with the buds of the tagar flower and the aparajita vine. Give me a garland

of *kunda* buds, and if you don't find them, then *bakul*. But what good are only flowers? The flowers of the night wilt before dawn."

And so, with a gentle plea, the bride whispers, "Don't forget to give your heart along with the flowers."

The groom pulls the bride closer into his embrace and says, "I have given you a garland of flowers, but what other ornament will I use to adore your beautiful form? Even the color of gold fades when I see the light of your beauty!"

In a voice sweet with emotion, the bride whispers, "I don't want golden ornaments. Your arm around me is my necklace, my love. Give me a thread of union on my wrist that will never come undone."

This silent night is meant for whispered conversations. "Don't give me diamond earrings," she says. "Give me two earrings of whispered words in my ears. Give me new ornaments of love's desire, forever."

The groom lifts the bride's downward gaze and says, "I have given you my heart and adorned you with the new ornaments of love's desire. But tell me, what should I call you when we whisper? What name will express who you are to me? The sandalwood on your forehead, the vermilion in your hair, the red veil on your head—seeing this eternally new form of yours, I don't feel like calling you by your old name. Tell me, what should I call you? No name can satisfy me; all poets of this world lose to your name."

The bride replies, "On days of happiness, call me 'friend,' that's the sweetest name. In times of sorrow, call me 'friend' without ceasing. I have not come just to be your partner on the wedding night; I am here with you forever in life's joys and sorrows. In happy times, I will be your friend. My face will light up when I see you smile. In sorrow, I will be your friend and offer comfort. My tears will mingle with yours. And on a silent night like this, when only the moon is awake outside, and it is just you and I inside, call me 'queen,' a delightful name from the month of Shravan."

"And then?"

Like a shy dove, the bride hides her lowered face in her husband's chest and whispers softly, "Press me to your chest, my love, and that will be my name!"

[3]

The night of union is fleeting, like a human dream, like half a glass of water on a summer day. It is gone as soon as you touch it, leaving only thirst behind. The night of the flower bed also gave way to morning.

Quietly opening the door, the new bride leaves the bed of wilted flowers and comes out. In her weary eyes from a sleepless night, there is still a lazy intoxication. There is a red sweetness on her lips, but her whole body is shy, and her face is veiled.

From behind, someone calls out, "Look, look, new bride, open your veil! Lift your shy eyes!"

Who is this? Who has come in with the restless exuberance of a southern breeze, making a clamor like a fast-flowing river? The person behind her now comes forward and says to the bride, "I am your sister-in-law! A fast-flowing river. What's all this shyness?"

The sister-in-law has come to playfully tease her. She is about the same age as the new bride. Still, the bride doesn't lift her veil, she just sits, shyly looking down, twisting the end of her sari.

But the sister-in-law is truly a "fast-flowing river." Why would she let the bride off so easily? She knows something the bride doesn't: last night, another curious soul was awake outside their closed door, listening to their whispers and watching the profound conversations of their souls.

With a mischievous spark in her eye and a sharp arrow of a smile on her lips, the sister-in-law says, "There was no shyness in those eyes on the flower bed last night! I will tell everyone everything if you don't speak, bride!"

Upon hearing this warning, the poor new bride's lowered face dropped even further. Her secret from last night has been

discovered by her sister-in-law! How embarrassing! But the bird in the sister-in-law's heart, longing for a companion, sings in a pleading voice, "Speak, bride!" She lifts the bride's chin and says, "The bird calls out, 'Speak, bride!' Will you still remain silent?"

Suddenly, the sister-in-law notices the red mark of someone's affection still on the bride's cheek. Curious, she exclaims, "Let me see, let me see, what is this redness on your cheek?" Then, pinching her cheek and smiling, she says, "Oh! Did it turn red from shyness?"

Wounded by the sister-in-law's playful barbs, the helpless bride tries to escape. She gets up and hurriedly hides in the next room to protect herself, her anklets jingling. But the sister-in-law doesn't let go of the runaway bride, grabbing her sari and saying, "Hey, don't run away in such a hurry to hide in the other room! What if someone sees you? Friend, there's a person in that room who also has a wave of separation in his heart!"

So, there's no escape. The groom is in the next room. On this day, the memory of their union last night has also created a wave of separation in his heart. Could the bride, whose shyness is the cause of all this, dare to go and hide in his room? Shyness is the ornament of a Bengali bride. But the sister-in-law is like a playful deer from the forest. She is also a bride herself, but she doesn't care for this much shyness.

After so much pleading, when the bride still doesn't lift her veil or speak, the sister-in-law says, "If shyness is your ornament, then what need is there for adornment?" Then, forcibly lifting the bride's veil, she comes forward like a friend and says with a kind smile, "I'll be happy in your happiness and sad in your sorrow. Sit down, face-to-face, and lose your shyness."

[4]

What a way to be shy! There's no way to be shy with this beautiful and mischievous girl's tyranny. The bride lifts her bowed face and says, "I give up, my sister-in-law. Listening to your words, my

shyness itself becomes shy. My heart and soul are swaying with joy."

Giving up, the bride makes a truce with her sister-in-law. The two become friends and start talking. The sister-in-law asks, "Why are you so shy, my dear?"

Does the bride herself know why she's shy? Ever since that moment of the auspicious glance, when their eyes met for a fleeting second, her eyelids have been lowering on their own. She longs to say so many things, but no words come to her lips. She doesn't understand who makes her so shy: the first man, or the first love?

The bride whispers in her sister-in-law's ear, "Who knows how such sweetness and such shyness entered my heart and eyes from that single glance? Outside, the words are silent, but inside, they call out again and again."

And yet, she wasn't this shy before. Her maiden heart used to fly and sing like a bird in the sky, not caring for shyness. The bride says, "I was like you, a playful deer from the forest. I never cared for the frown of shyness." But now, I am a bride.

Even so, the bride's shyness is broken again and again by the teasing of her witty and shameless sister-in-law! Now it's the bride's turn to tease. Wrapping her arms around her sister-in-law's neck, she says with a soft smile, "I can't beat you with words, my dear sister-in-law! But tell me, why are you so full of words? Did the thief, your brother-in-law, steal all the honey from your sweet mouth?"

The sister-in-law, with mock anger, playfully pinches the bride's cheek. But the bride has already fallen in love with this witty and mischievous girl. She has broken the barrier of all unfamiliarity and come close to her as a friend. What is there to be shy about?

The shameless bride smiles and says, "With your new words, my shyness opens on its own."

[5]

The sleeping house wakes up, and the daytime clamor begins again. The entire house is filled with joy. Centered on the union of two people, a colorful atmosphere has been created, and as a result, many other hearts have been touched with a romantic hue. It's not just the educated and the elite, but also the uneducated and the poor whose hearts become restless with the joy of this wedding.

Gobinda, a servant in the groom's house, has no time to rest today; he's been spinning like a top since morning, doing a thousand jobs. On any other day, Gobinda would surely have complained bitterly about doing so many chores, but today, he feels no tiredness. The source of his enthusiasm has opened up, and he feels like singing while he works!

Of course, there is a hidden psychological reason behind Gobinda's joyful enthusiasm. Just as a faint hint of fragrance from someone passing by can intoxicate a person for a moment, so the intoxicating union of two people has put Gobinda's mind into a daze. Amidst all the work, he has already found his partner. You may not have noticed her, but Gobinda's eyes are constantly on her.

She is Binde, the maid from the bride's house who came with the new bride. She has a neat figure, wears a rough sari, her hair is in a bun, she has an *ulki* tattoo on her forehead, and her mouth is full of betel leaf and a sharp smile.

On any other day, the uneducated Gobinda's self-respect might have been hurt to make himself look cheap in front of this very ordinary girl. But today, Binde has taken on a special form in Gobinda's eyes. That's why he keeps circling around Binde in his free time, looking for an excuse to talk to her.

When the wedding commotion finally dies down a bit, Gobinda, finding a quiet moment, leaves the main room and comes to the kitchen porch—to talk to Binde again. Wiping the sweat from his face with his towel, Gobinda calls out, "Listen! Hey, Binde! Hey, girl from the bride's house! What? Can't you hear me at all? Hey, at least turn around and look at me once! Hey, Binde! Turn your

neck and look with those eyes of yours! I'm telling you the truth, would you leave with a man like me if you had one?"

But Binde is more arrogant today. She doesn't want to talk so easily. She says, shooing him away, "You are the groom's servant, so you're getting a pass today. Otherwise, I would have thrown a handful of burnt ash at your face!"

Poor Gobinda is a little taken aback and says with a half-smile, "What did you say, Binde, that we have no connection? I am your sister-in-law's only brother!" You've forgotten that?

No, this man is utterly persistent! Binde gets angry and says, "Go away, you man! Can't you stand still? You came again to annoy me!"

But Binde was also feeling a little affectionate. Why would she send him away today, a man who has come to her expecting a few kind words? And hasn't the color of this wedding's joy and laughter made Binde's youth a little more colorful as well? Looking at Gobinda's hungry eyes and sweaty face, she softens her voice and says, "You are sweating, pushing the burden of separation... sit on that porch for a bit."

Gobinda is delighted and exclaims, "Will you fan me?"

Binde laughs, "Ah, be quiet! Sit on that porch. That is the only medicine for a love-crazed person..."

Looking around, Binde takes Gobinda's hand and makes him sit on the porch. Gobinda's joy knows no bounds. He grins from ear to ear and exclaims, "Today my heart is trembling with the push of joy!"

Binde thinks that joy is only for those two people who have found each other in love and have spent the whole night talking about their hearts on a flower-strewn bed in a private room. She looks at him with a crooked eye, a hint of a smile on her lips, and says, "But we get a different result on our journey."

But just because they are a maid and a servant, does that mean they have no heart? In the midst of all this festivity, don't their young hearts want to sing as well? Binde shakes the end of her

coarse sari and tosses her bun, exclaiming, "We will also drink in this endless joy today if we get a little break."

Gobinda quickly comes up with an analogy: "Just like the people of a famine-stricken country, who get a taste of grass and greenery!"

[6]

A full moon has risen in the sky, and lilies have bloomed in the pond. Inside the room are the groom and the bride. Two streams of life have come together at the sacred place of love. The rhythm of one heart has joined another. And so, the greatest poem of life was born.

At this moment of life's fulfillment, the groom and bride say together, "We were alone, but today, we two are joined together. The cry of the cuckoo and the cooing of the doves."

This union is as sweet and complete as the cuckoo's cry and the cooing of the doves. This union is like a new revelation of each other to each other. The groom was like a lonely, barren land until today. Suddenly, a flood of greenery came, and flowers bloomed! The groom says, "You have come like a stream of green to my barren land."

And a husband is the ultimate blessing in a woman's life! In the bride's shy and gentle voice, the language of that ultimate fulfillment blossoms. She says, "You have come as a blessing from the creator, in the guise of a groom."

Looking at the bride's auspicious form, with her vermilion hairline and bangle-adorned hands, the groom says, "You are not just a bride; you are the welfare of this home."

The bride, in a humble voice, says, "You are not just the husband of my daily life and family. I have surrendered myself to your love. You are the lord of my body and soul! You are the lord of my meditation."

Outside, the moon and the lilies look at each other and smile. For them, the sky and the earth have become more beautiful with the union of life with life, and love with love! Inside the room, in the

voices of two young people, the same words ring out, "The beautiful three worlds have become more beautiful."

Now, it's time for blessings. The murmurs of the older women are heard. The elders have come to bless this union. First comes the grandmother. She has a plump figure like a ripe mango, and the white hairs on her head express the bright serenity of her heart, with the wrinkles of old age on her face. There's no account of her age, but her heart is still at twenty-two. With a sweet smile, the grandmother comes before the newlyweds and says, "Oh, my grandson-in-law! I pray to God that you become bald for the sake of my granddaughter. Become a fool for my granddaughter. Roar outside, but inside the house, be her horse. Fume and fret outside, but with my granddaughter, be docile. Outside, be a man, a firm rock. In the bride's room, be a mortar. Be a hero in the daytime, but at night, become a cripple. With the lifespan of the sun and the moon, always remain a young man! Be a fool for my granddaughter, be bald!"

At whose command? At the command of the goddess Kamakhya from Kamrup!

After the grandmother, the mother comes with paddy and grass. She reminds her daughter, the Lakshmi of her house, of the eternal desire and ideal of a Bengali wife. The sweet affection from her heart pours out through her voice: "May you be blessed with a long life like Savitri, and be as chaste. Remain in this house forever as a steadfast Lakshmi. Be beloved by your in-laws and the favorite of your husband. May this house be filled with wealth and people by the grace of God, because of you. May I place your body in the Ganges water, after you have given a son to your husband's lap. May your vermilion remain in your hair, betel leaf in your mouth, and *alta* on your feet, so that you live your life happily forever."

Next, the sister comes to bless them. She holds her new sister-in-law's chin and says in an affectionate voice, "You are not just a bride, but the light of our house. With this light, the dark shadows of our house will be gone. May the red of the conch shell be stained with the blessings of *Annapurna*. May the vermilion stay

with you, never fading. May it never be exhausted in your hands. This is what I wish for, my brother. May you be in everyone's good graces at home and outside. Wearing *alta*, vermilion, and bangles, may you light up three generations. May you never know sorrow or pain, and at the end, may you find the world of heaven."

Then, the auspicious conch shells are blown, and the older women raise their ululations, and the serene blessings from heaven descend to the earth.

The songs of this gramophone record play entitled "The Wedding House" (see His Master's Voice record number N 7326-7328) are mostly collected in Nazrul's songbook titled "Sandhyamalati."

Translated by Alamgir Mohammad

সাপুড়ে

কাহিনী

সভ্যজগতের সুসমৃদ্ধ জনপদ হইতে বহুদূরে, কখনও ঘননীল শৈলমালার সানুদেশে, ভীষণ, নির্জন দুর্গম অরণ্যের মধ্যে, কখনও বা তরঙ্গ-ফেনিল বঙ্কিম গিরি-নদীর তীরে, দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, যাযাবর সাপুড়ের দল তাহাদের ক্ষণস্থায়ী নীড় রচনা করে।

এমনই এক ভবঘুরে সাপুড়ে দলের ওস্তাদ সে। নাম তাহার জহর। দলের সে বিধাতা, একচ্ছত্র অধিপতি। দলের প্রত্যেকটি লোক তাহাকে ভয় করে যমের মতো, ভক্তি করে দেবতার মতো। শুধু দলের একটিমাত্র লোক, তাহার এই অপ্রতিহত প্রভুত্বগৌরবে ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, মনে-মনে দারুণ অবজ্ঞা করে জহরকে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহসও তাহার হয় না। এই লোকটির নাম বিশুন, তাহারও দুই একজন অনুচর আছে।

মনে-মনে সে মৃত্যু কামনা করে জহরের, কখনও-বা কেমন করিয়া জহরকে চূর্ণ করিয়া একদিন সে সর্দার হইয়া উঠিবে, সেই কল্পনায় চঞ্চল হইয়া উঠে।

সেদিন নাগ-পঞ্চমী।

জহর পাহাড়তলীতে গিয়াছিল বিষধর সর্পের সন্ধানে। তাহার তুবড়ি বাঁশিতে, সে বাজাইতেছিল একটানা মোহনিয়া সুর—বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে, গমকে গমকে, তীব্র মধুর উন্মাদনা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল! সেই সুরে আকৃষ্ট হইয়া বনের ভিতর হইতে একটি বিষধর কালীয় নাগ ফণা দুলাইতে দুলাইতে বাহির হইয়া আসিল। দারুণ উত্তেজনায়, জহরের চোখের তারা দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ হাতের বাঁশি সে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং সেই কালীয় নাগের উদ্ধত ফণার সুমুখে তাহার অকম্পিত করতল পাতিয়া ধরিল। মুহূর্তে একটি তীব্র দংশন! দেখিতে দেখিতে জহরের সর্বশরীর সেই সাপের বিষে একেবারে নীল হইয়া গেল। দলের সমস্ত লোক সভয়ে, স্তম্ভিতবিস্ময়ে জহরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। জহর কিন্তু নিষ্কম্প, নির্বিকার—উদ্বেগের চিহ্নমাত্রও তাহার মুখে ফুটিয়া উঠে নাই। ধীরগম্ভীরকণ্ঠে, সে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং ধীরে-ধীরে শীঘ্রই বিজয়ী বীরের মতো সগৌরবে বিষমুক্ত হইয়া উঠিল। বিমুগ্ধ, বিস্মিত জনতা সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মুখ কালো করিয়া, বিশুন ধীরে ধীরে নীরবে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ঠিক এমনই করিয়া আজ পর্যন্ত জহর নিরানব্বই বার নিজের দেহে সর্পদংশন করাইয়া, অবলীলাক্রমে বিষমুক্ত হইয়াছে। এইবার শততম এবং শেষতম সর্পদংশন। এই সর্বশেষ সর্পের বিষ, মন্ত্রবলে আপন দেহ হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিলেই, তাহার কঠোর ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে; সেই সর্পমন্ত্রে সিদ্ধকাম হইবে। এই মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়াই জহরের জীবনের পরমতম লক্ষ্য, একমাত্র মহাব্রত।

এই সাধনার জন্য সে কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াছে। আজীবন চিরকুমার থাকিয়া, নিষ্কামভাবে সংযতচিত্তে ব্রত পালন করিয়া চলিতেছে।

জহরের অগণিত গুণমুগ্ধ শিষ্য, যখন উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় সহসা সেদিন রাত্রে, তাহার জীবনে একটি অভাবনীয় ঘটনার সূত্রপাত হইল। পরিণামে এই ব্যাপারটি যে তাহার সাধনার ভিত্তিমূলকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া যাইবে, তাহা কি সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল?

ভবঘুরের মতো জহর তখন নানা দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নারীজাতির সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমশ জহরের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, নারীজাতি সাধনার পথে সাংঘাতিক বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। ক্রমে নারীজাতির সম্বন্ধে অন্তরে সে বিজাতীয় বিতৃষ্ণা পোষণ করিতে শুরু করিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন সে দেখিল, ক্ষীণস্রোতা একটি নদীর জলে কলার ভেলার উপরে, পরমাসুন্দরী এক বালিকার মৃতদেহ ভাসিয়া চলিয়াছে। সর্পদংশনে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের নাকি দাহ করিতে নাই। স্রোতের জলে মৃতদেহ ভাসাইয়া দেওয়াই নাকি বহুকালের প্রচলিত প্রথা। জহর কি আর করে, সাপুড়ে জাতির স্বধর্ম রক্ষা করিতে গিয়া, সে নদীর জল হইতে মৃতা বালিকার দেহ তুলিয়া লইয়া, মন্ত্রবলে তাহাকে পুনর্জীবিতা করিল।

জীবন দান করিল বটে কিন্তু, এই বালিকাটিকে লইয়া সে কি করিবে? কে যে তাহার আত্মীয়, কে তাহার স্বজন—কিছুই সে বলিতে পারে না। বিষের প্রকোপে তাহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

জহর বড় বিপদে পড়িল। বেচারি নিরীহ, নিরাশ্রয়া মেয়েটি, নিরুপায়ের মতো করুণ কাতর দৃষ্টি মেলিয়া জহরের দিকে তাকাইয়া থাকে। জহর তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারে না, কেমন যেন দয়া হয় মেয়েটির উপর। দারুণ ঘৃণা ধীরে ধীরে মধুর মমতায় রূপান্তরিত হইয়া আসে। সে-ই শেষে আশ্রয় দিয়া ফেলিল এই মেয়েটিকে—অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কি হইতে পারে! জহর তাহার সংস্কারবশে, বালিকার নারীবেশ একেবারেই সহ্য করিতে পারিল না। সে স্থির করিল, ইহাকে সে পুরুষের বেশে সাজাইয়া পুরুষের মতো মানুষ করিবে। সে তাহাকে একরকম উগ্র

ঔষধ পান করাইল, যাহাতে এই ঔষধের গুণে, তাহার মধ্যে নারী-সুলভ কোনো চেতনা জাগ্রত না হয়।

জহর তাহার নাম রাখিল চন্দন—পুরুষের নাম। কিশোরবেশী চন্দনকে সঙ্গে লইয়া জহর এইবার অন্য এক সাপুড়ের দলে যোগদান করিল। সেই দলের বৃদ্ধ সর্দার, জহরের আশ্চর্য চরিত্রবল দেখিয়া এত বেশি মুগ্ধ হইল যে তাহার মৃত্যুর পূর্বে জহরকে সে সেই দলের সর্দার করিয়া দিয়া গেল। ক্রমে জহর এই অর্ধসভ্য ভবঘুরে সাপুড়ের দলের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া উঠিল।

চন্দন যে বালক নয়, দলের কেহই সে কথা জানে না। জহরের এক প্রিয়তম শিষ্য ঝুমরো, তাহার একমাত্র প্রিয় সহচর। চন্দনকে ঝুমরো বড় ভালোবাসে।

এই ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী জহর, নিরানব্বইটি বিষধর সর্পদংশনের কঠোর পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া যখন তাহার সাধনার প্রান্তসীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তখন সহসা এক সচকিত মুহূর্তে শিহরিয়া উঠিয়া সে অনুভব করিল যে, তাহার সংযম-সাধনার উত্তুঙ্গ শিখর হইতে বোধকরি তাহার পদস্খলন হইতে বসিয়াছে।

সেদিন রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে অকস্মাৎ এক তীব্র মধুর বেদনার মতো চন্দনের রমণীয় সুকুমার রূপ-মাধুরী, তাহার বুকের মধ্যে আসিয়া বিঁধিল এবং ক্ষণিকের জন্য তাহাকে উন্মাদ অস্থির করিয়া তুলিল। প্রাণপণ চিত্তসংযমের দ্বারা কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাহার এই সাময়িক মোহকে অতিক্রম করিল। উন্মাদের মতো ছুটিয়া গিয়া সে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা মনসার পদপ্রান্তে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিনিদ্র চক্ষে এই অপরিসীম আত্মগানির জন্য অনুতাপে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। দেবী প্রতিমীর কাছে ক্ষতবিক্ষত অন্তরের সকরুণ প্রার্থনা জানাইয়া, সে প্রায়শ্চিত্ত করিল।

কিন্তু যে সুপ্ত কামনার আগুন একবার জ্বলিয়াছে, এত সহজে কিছুতেই সে যেন নির্বাপিত হইতে চাহিল না। ঠিক সেইদিনই খবর পাওয়া গেল, রাজার সিপাহীরা সাপুড়েদের উপর বিষম অত্যাচার শুরু করিয়াছে, কারণ দেশে নাকি ভয়ানক ছেলে চুরি হইতেছে। সকলের ধারণা সাপুড়েরাই এই কার্য করিতেছে।

এই খবর পাইবামাত্র, জহর সদলবলে তাহাদের ডেরা তুলিয়া, বহু পথ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে বিজন, ভীষণ, শ্বাপদসঙ্কুল এক অরণ্যের মাঝখানে তাহাদের তাঁবু ফেলিল। বন্য, হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁবুর চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া অনেকেই তখন প্রচুর স্ফূর্তি করিতেছে। এই বিরাট আমোদের মজলিস জমাইয়া তুলিয়াছে, দিল খোলার দল। তাহাদের নৃত্যগীতোৎসব তখন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। জহর, ঝুমরো, চন্দন, বিশুন, বিশুনের পুত্র তেঁতুলে,

নীল-চশমাধারী দলের যাদুকর, গণকঠাকুর, ঘণ্টাবুড়ো, সকলেই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে, মুগ্ধ আনন্দে এই অপূর্ব উৎসব উপভোগ করিতেছে।

এমন সময় কি যেন একটা তুচ্ছ কারণে, বিশুনের পুত্র তেঁতুলের সঙ্গে ঝুমরোর ভীষণ কলহ বাধিয়া গেল। কলহ প্রথমে মুখে-মুখেই চলিতেছিল, তাহার পর হইল হাতাহাতি, তাহার পর ক্রমে মরামারি। চন্দন ছিল দূরে দাঁড়াইয়া। তেঁতুলে অকথ্য অপমান করিবে ঝুমরোকে—এ তাহার অসহ্য। সেও ছুটিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল, ইহাদের মাঝখানে। কিন্তু টানাটানি ধ্বস্তাধ্বস্তিতে হঠাৎ যেই মুহূর্তের জন্য তাহার বক্ষাবরণ ছিন্ন হইয়া গেল, দলের সকলে সবিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া দেখিল—চন্দন পুরুষ নয়—পুরুষের ছদ্মবেশে পরমাসুন্দরী এক তরুণী।

এই সময় কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আর একটি সুন্দরী ঘটনাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার নাম মৌটুশী। সে নিজের উত্তরীয়টি তাড়াতাড়ি খুলিয়া চন্দরের গায়ে জড়াইয়া দিল। কিশোর চন্দনকে, সে কুমারী-হৃদয়ের নীরব প্রেমের পূজাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিল—আজ যখন দেখিল, চন্দন তাহারই মত এক তরুণী, তখন তাহার লজ্জারুণ প্রণয় স্বপ্নের প্রাসাদ একেবারে ভাঙিয়া গেল। যে গভীর উদার প্রেম তাহার হৃদয়ে এতদিন ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মধুর সখিত্বে রূপান্তরিত হইয়া উঠিল। জহর আসিয়া, লজ্জাবনতমুখী চন্দনকে টানিয়া, একেবারে তাহার তাঁবুর ভিতরে লইয়া গেল। দলের সমস্ত লোক একেবারে অবাক। কেহ স্বপ্নেও কোনো দিন কল্পনা করিতে পারে নাই—জহরের মতো একজন জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী মন্ত্র-সাধক, এমন করিয়া এই সুন্দরী যুবতীটিকে যুবক সাজাইয়া নিজের সঙ্গে রাখিয়াছে।

শুধু বিস্মিত হইল না একজন—সে ঘণ্টাবুড়ো। এই বেদিয়ার দলে যে একটা অদ্ভুত প্রকৃতির রহস্যময় মায়াবীর রূপে বাস করে। অনবরত মদ্যপান করে, আর খড়ি পাতিয়া সকলের ভবিষ্যৎ গণনা করে, কিন্তু সব কথা কখনো পরিষ্কার করিয়া বলে না।

এই ব্যাপারে ঘণ্টাবুড়ো, পরম বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া, সহসা এক অদ্ভুত ক্রুর অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

এদিকে নিভৃতে, তাঁবুর এককোণে, থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জহর ভীতা হরিণীর মতো চন্দনকে সবলে আকর্ষণ করিয়া বলিতেছে, 'চন্দন, চন্দন, তুই আমার—একমাত্র আমার!'

তাহার এতদিনকার রুদ্ধ আত্মসংযমের বাঁধ ভাঙিয়া পড়িয়াছে—দুকূলপ্লাবী বন্যার মতো সেই উন্মত্ত আবেগ, সেই দুর্দমনীয় দুর্বার বাসনা তাহাকে যেন অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

চন্দন বৃথাই নিজেকে প্রাণপণে তাহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টার পর চন্দন কিছুতেই যখন জহরকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন সে তাহার সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করিবার জন্য মিনতি কাতরকণ্ঠে জহরকে স্মরণ করাইয়া দিল—তাহার মহাব্রতের কথা, তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য, নাগ-মন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভের কথা।

কথাগুলি জহরের বুকে গিয়া নির্মম মহাসত্যের মতো ধ্বক করিয়া বাজিল। সত্যই ত! এ কি করিতেছে সে! জহর যেন অকস্মাৎ তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। মনসা দেবীর প্রতিমার পানে সে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার তাকাইল, তাহার পর কিসের যেন একটা অব্যক্ত মর্মযন্ত্রণায় কাতর হইয়া, তাঁবু হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আজই—এই রাত্রেই সে তাহার শততম সর্পদংশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবে। আর বিলম্ব নয়।

বিষধর একটি সর্পের সন্ধান করিয়া, জহর যেমনই তাহার কর্ম সিদ্ধ করিতে যাইবে, অমনিই বিশুন কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সংবাদ দিল—চন্দনকে লইয়া ঝুমরো পলায়ন করিয়াছে। মৌটুশীর আগ্রহ এবং সাহায্যেই নাকি তাহারা এই দুঃসাহসের কাজ করিয়াছে।

জহরের ব্রত আর সাঙ্গ করা হইল না। যে কঠোর সংযমের বন্ধনে নিজেকে সে পুনর্বার পাথরের মতো স্তব্ধ নির্বিকার করিয়া তুলিয়াছিল, বিশুনের এই মর্মান্তিক সংবাদে প্রখর স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো সে সংযম কোথায় ভাসিয়া গেল। ক্রোধে, উন্মাদের মতো অধীর হইয়া, জহর ছুটিয়া চলিল চন্দন-ঝুমরোর সন্ধানে। কিন্তু দলের কেহই তাহাকে তাহাদের সন্ধান দিতে পারিল না, তীব্র উত্তেজনায় সর্বশরীরে তখন তাহার যেন আগুন ধরিয়া গেছে।

উন্মত্তের মতো তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া, সে ঝাঁপি খুলিয়া বাহির করিল,—বিষধর কালীয়নাগ! সেই ভীষণ কালীয়নাগকে লইয়া, সে ছুটিয়া আসিল মহাকাল-মন্দিরে—তাহার পর সেই কালীয়নাগকে মন্ত্রপূত করিয়া ঝুমরোর উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দিল।

ঝুমরো ও চন্দন তখন গভীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া, গান গাহিতে গাহিতে নিরুদ্দেশের পথে চলিয়াছে। দূরে, বহুদূরে চলিয়া গিয়া, তাহারা দুজনে একটি মধুর সুখের নীড় রচনা করিয়া, পরমানন্দে প্রেম-মধুযামিনী যাপন করিবে অনন্তকাল ধরিয়া— মুদিত বিহ্বল চক্ষুর সম্মুখে তখন তাহাদের এই সুখ-স্বপ্নের মোহন মেদুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

অপূর্ব আনন্দে বিভোর হইয়া, যখন তাহারা একেবারে আত্মহারা হইয়া গেছে, তখন সহসা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সেই মন্ত্রপূত কালীয়নাগ আসিয়া ঝুমরোকে দংশন করিয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বিষের বিষম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ঝুমরো সেখানে বসিয়া পড়িল।

চন্দন একেবারে স্তম্ভিত নির্বাক। নিঃসহায়, নিরুপায়ের মতো সে দাঁড়াইয়া রহিল। ঝুমরোকে বাঁচাইতে হইলে, এখন তাহার আবার সেই জহরের কাছে গিয়া দাঁড়ানো ছাড়া আর উপায় নেই।

অবিরল অশ্রুধারে, চন্দন চোখে দেখিতে পাইতেছে না—সে চলিয়াছে সেই পরিত্যক্ত তাঁবুর দিকে। কিন্তু কেমন করিয়া, কোন মুখে সে আবার জহরের কাছে গিয়া দাঁড়াইবে?

জহর তখন নিশ্চল প্রস্তরের মতো বসিয়া আছে। অশ্রুমুখী চন্দন আসিয়া দাঁড়াইল তাহার কাছে। ম্লানমুখে, মৃদুকম্পিতকণ্ঠে সে কহিল, ঝুমরো তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাহাকে যদি সে বাঁচাইয়া দেয়, তাহা হইলে ঝুমরোর প্রাণের বিনিময়ে, সে জহরের কাছে আত্মবিক্রয় করিতেও প্রস্তুত। জহর একটি কথাও বলিল না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে চলিল চন্দনের পিছু পিছু। নীরবে সে গিয়া দাঁড়াইল ঝুমরোর বিষাক্ত নীলবর্ণ মৃতদেহের পাশে।

ঝুমরো বাঁচিয়া উঠিল।

চন্দনের আনন্দের অবধি নাই। কিন্তু চন্দনের সময় নাই, সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—ঝুমরোর প্রাণের বিনিময়ে, সে আত্মবিক্রয় করিয়াছে, জহরের কাছে। এখন সে জহরের। ঝুমরোকে সে উত্তেজিত করুণ, ভগ্নকণ্ঠে বলে, 'তুই দূরে চলে যা ঝুমরো, আমার চোখের সমুখে থাকিস্ নে—আমি তোর নাই'।

যে তাহার প্রাণাধিক প্রিয়, একান্ত আপন, জীবন সর্বস্ব, তাহাকে সে চায় না। চন্দনের উদ্‌গত অশ্রু আর বাধা মানে না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় হৃদপিণ্ড যেন ছিঁড়িয়া যায়, তাহাকে তাড়াইয়া দিতে।

অদূরে দাঁড়াইয়া, জহর এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছে। যে কালীয়নাগ মন্ত্রবলে ফিরিয়া আসিয়া ঝুমরোকে বিষমুক্ত করিয়াছে, সে তখনও তাহার হাতে।

জহর একবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকাইল, একবার তাকাইল ঝুমরোর দিকে—একবার মনে মনে কি যেন ভাবিল।

অকস্মাৎ সে নির্বিকারভাবে সেই কালীয়নাগের দংশন নিজের বুকে পাতিয়া গ্রহণ করিল। ঝুমরো চিৎকার করিয়া কহিল, 'ওস্তাদ কি করিল।'

চন্দন ও ঝুমরো দুজনেই ছুটিয়া জহরের কাছে গেল। জহর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ঝুমরো শিগগির একে নিয়ে চলে যা আমার সমুখ থেকে—আমি বিষ হজম করবো, এই আমার শেষ সাপ—তারপর আমি মন্ত্র পড়বো। মেয়ে মানুষের সামনে মন্তর নষ্ট হয়। ওকে এখান থেকে নিয়ে যা—এ জঙ্গল থেকে, এ দেশ থেকে নিয়ে যা।' চন্দন আর ঝুমরো অগত্যা চলিয়া গেল। ওস্তাদ দেখিল তাহারা দূরে চলিয়া গেছে, কিন্তু নাগমন্ত্র আর সে উচ্চারণ করিল না। স্মিতহাস্যে আপন মনে সে বলিয়া উঠিল, 'মন্তর, ও সাপের মন্তর আর নয়—এইবার আমার মন্তর—'শিবু-শম্ভু-শিব-শম্ভু'!

কালীয়নাগের বিষে তাহার সর্বশরীর ক্রমশ নীল হইয়া আসিতে লাগিল, চোখ দুইটি স্তিমিত নিস্তেজ হইয়া গেল; কিন্তু তাহার সমস্ত মুখের উপরে মনে হইল, কিসের যেন এক অপার্থিব আনন্দের ভাস্কর দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার বিক্ষুব্ধ আত্মার সমস্ত বিক্ষোভ যেন শান্ত হইয়া গিয়াছে, জীবনব্যাপী মর্মযন্ত্রণার যেন অবসান হইয়াছে।

সর্বশেষ সর্পের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র-সাধনায় পরিণামে সে সিদ্ধকাম হইল কি?

সংগীতাংশ

এক

হলুদ-গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল,
এনে দে, এনে দে, নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল,
কুস্‌মি রং শাড়ি চুড়ি বেলোয়াড়ি
কিনে দে হাট থেকে,
এনে দে মাঠ থেকে
বাবলা ফুল, আমের মুকুল।
নৈলে রাধব না, বাঁধব না চুল ॥
কুঙ্কুম পাহাড়ে, শাল-বনের ধারে
বস্‌বে মেলা আজি বিকেল বেলায়।
দলে দলে পথে চলে সকাল হতে
বেদে-বেদেনী নূপুর বেঁধে পায়।
যেতে দে ঐ পথে বাঁশি শুনে শুনে পরান বাউল ॥
নৈলে রাধব না, বাঁধব না চুল ॥

—কোরাস

দুই

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ,
ঐ পাহাড়ের ঝর্না আমি ঘরে নাহি রই গো
উধাও হয়ে বই ॥
চিতা বাঘ মিতা আমার,
গোখ্‌রো খেলার সাথি,
সাপের ঝাঁপি বুকে ধরে
সুখে কাটাই রাতি।
ঘূর্ণি হাওয়ার উড়নি ধরে নাচি তাথৈ থৈ ॥

—কানন

তিন

কলার মান্দাস্ বানিয়ে দাও গো,
শ্বশুর সওদাগর,
ঐ মান্দাসে চড়ে যাবে বেউলা লখিন্দর,
কলার মান্দাস।
ওগো কুল-বালা নে এই পলার মালা,
বর তোর ভেঁড়া হয়ে রইবে মালার ভয়ে
ও বৌ, পাবি নে জীবনে সতীন জ্বালা ॥

আমার বেদেনী গো, পাহাড় দেশের বেদিনী।
গলার ঘ্যাগ, পায়ের গোদ, পিঠের কুঁজ,
বের করি দাঁতের পোকা, কানের পুঁজ;
ঔষধ জানিলো, হেঁৎকা স্বামীর
কোঁৎকা খায় যে কামিনী ॥

পেত্নী পাওয়া মিনসে গো
ভূতে-ধরা বৌ গো।
কালিয়া পেরেত মামদো ভূত
শাক-চুন্নি হাম্‌দো পূত
পালিয়ে যাবে, বেদের কবচ লও গো ॥

বাঁশের কুলো, বেতের ঝাঁপি, পিয়াল পাতার টুকি।
নাও ওগো বৌ, হবে খোকা-খুকি ॥
নাচ, নাচ, নাচ—বেদের নাচ? সাপের নাচ?
সোলেমানী পাথর নেবে? রঙিন কাঁচ?

—কোরাস্

দেখি লো তোর হাত দেখি।
হাতে হলুদ-গন্ধ, এলি রাঁধ্‌তে রাঁধতে কি?
মনের মতন বর পেলে, নয় কন্যা ছয় ছেলে।
চিকন আঙ্গুল দীঘল্ হাত, দালান-বাড়ি ঘরে ভাত,
হাতে কাঁকন পায়ে বেঁকী।
ও বাবা! এ কোন ছুঁড়ি? সাত ননদ তিন শাশুড়ি।
ডুবে ডুবে খাচ্ছ জল, কার সাথে তোর পিরীত বল।
চোখের জলে পারবি তারে বাঁধতে কি?
দেখ লো তোর হাত দেখি।

—কৃষ্ণচন্দ্র দে

চার

(কথা) কইবে না কথা কইবে না বৌ,
তোর সাথে তার আড়ি-আড়ি-আড়ি।
(বৌ) মান করেছে, যাবে চলে আজই বাপের বাড়ি ॥

বৌ কস্‌নে কথা কস্‌নে,
এত অল্পে অধীর হস নে,
ও নতুন ফুলের খবর পেলে
পালিয়ে যাবে তোকে ফেলে,
ওর মন্দ স্বভাব ভারী ॥

—কানন

পাঁচ

মৌটুশী— পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম
হিজল-ফুলের মালা।
কি করি এ মালা নিয়ে বল চিকন-কালা ॥

চন্দন— নই আমি সে বনের কিশোর,
(তোর) ফুলের শপথ, নই ফুল-চোর,
বন জানে আর মন জানে লো, আমার বুকের জ্বালা ॥

ঝুমরো— ঘি-মউ-মউ আর-কাঁঠালের পিঁড়িখানি আন্,
বনের মেয়ে বন-দেবতায় করবে মালা দান।
লতা-পাতার বাসর-ঘরে
রাখ ওরে ভাই বন্ধ করে,
ভুলিস্‌নে ওর চাতুরীতে ওলো বনবালা ॥
—মেনকা, কানন, পাহাড়ী

ছয়

ফুট্‌ফুটে ঐ চাঁদ হাসেরে
ফুল-ফুটানো হাসি।
হিয়ার কাছে পিয়ার ধরে
বলতে পারি আজ যেন রে
তোমায় নিয়া পিয়া আমি
হইব উদাসী ॥
—পাহাড়ী ও কানন

The Snake-Charmer

The Story

Far from the civilized world, sometimes at the foot of a deep blue mountain range, in a dense, lonely, and impassable forest, or on the bank of a winding, foamy mountain river, in the vast plains extending to the horizon, the nomadic snake-charmer troupe sets up their temporary home.

He is the master of one such wandering snake-charmer troupe. His name is **Jahar**. He is the leader of the troupe, its sole authority. Every member of the troupe fears him like death and respects him like a god. Only one person in the troupe is consumed by jealousy for his unchallenged authority, secretly harbors contempt for Jahar, but lacks the courage to openly defy him. This man's name is **Bishnu**, and he also has a couple of followers.

He secretly wishes for Jahar's death and gets excited by the thought that one day he will overthrow Jahar and become the leader himself.

That day was *Nag Panchami*.

Jahar had gone to the foothills of the mountain in search of venomous snakes. He was playing a monotonic, enchanting tune on his gourd flute. From every hole of the flute, in every swell, a sharp, sweet frenzy would rise and vibrate! Attracted by the tune, a venomous black cobra emerged from the forest, swaying its hood. In fierce excitement, Jahar's eyes lit up. He suddenly threw his flute far away and placed his steady palm directly in front of the cobra's raised hood. In a moment, there was a sharp bite! In front of everyone's eyes, Jahar's entire body turned blue from the snake's venom. The entire troupe surrounded Jahar in fear and stunned amazement. But Jahar remained motionless, unmoved—not a trace of anxiety appeared on his face. In a slow, deep voice, he began to chant incantations, and slowly but surely, he was freed from the venom like a triumphant hero. The astonished,

mesmerized crowd erupted in a roar of victory. With a dark face, Bishnu slowly and silently slipped away from the spot.

In this manner, Jahar has, until today, willingly been bitten by venomous snakes ninety-nine times and has effortlessly healed himself. This is to be his hundredth and final snakebite. If he can draw out the venom of this final snake from his body with the power of his incantations, his arduous vow will be completed; he will become an accomplished master of the snake-charming art. Becoming such a master is the ultimate goal of Jahar's life, his one great vow. For this spiritual discipline, he has maintained strict celibacy. He has remained a lifelong bachelor, observing his vow with a controlled mind and a dispassionate heart.

While Jahar's numerous devoted disciples eagerly await that auspicious day, an unforeseen event suddenly unfolds in his life one night. Could he have ever imagined in his dreams that this incident would strongly shake the very foundation of his spiritual practice?

Like a wanderer, Jahar was traveling through various countries. By staying away from the company of women, Jahar had gradually developed a firm belief that women are a dangerous obstacle on the path of spiritual practice. He began to harbor a deep-seated revulsion towards women in his heart.

Then, one day, he suddenly saw the body of an extremely beautiful girl floating on a raft made of banana plants in a slow-flowing river. It is said that those who die from snakebites should not be cremated. It is a long-standing tradition to float the bodies in the river. What else could Jahar do? To uphold the custom of his snake-charmer tribe, he lifted the dead girl's body from the river and brought her back to life with his chants.

He gave her life, but what was he to do with this girl? She could not say who her relatives or family were. The venom had erased her memory. Jahar was in a great dilemma. The poor, innocent, helpless girl would look at Jahar with a pitiful, desperate gaze. Jahar could not abandon her; he felt a strange compassion for the girl. The great revulsion in his heart slowly transformed into a

sweet affection. In the end, he gave shelter to this girl—what could this be but a cruel mockery of fate?

Due to his ingrained beliefs, Jahar could not bear the girl's female attire. He decided that he would dress her as a boy and raise her like a man. He gave her a kind of potent medicine so that its effect would prevent any female consciousness from awakening within her.

Jahar named her **Chandan**—a boy's name. Taking the teenage Chandan with him, Jahar joined another snake-charmer troupe. The old leader of that troupe was so impressed by Jahar's incredible strength of character that he made Jahar the leader before his death. In time, Jahar became the sole ruler of this semi-civilized nomadic snake-charmer troupe.

No one in the troupe knew that Chandan was not a boy. Jahar's dearest disciple, **Jhumro**, was her only close companion. Jhumro loves Chandan very much.

This vow-observing Jahar, who had passed the rigorous test of ninety-nine venomous snakebites with pride, had now reached the final stage of his spiritual practice. He suddenly shivered in a startled moment and felt that his foot might be slipping from the pinnacle of his self-control.

That night, before going to sleep, the enchanting and delicate beauty of Chandan suddenly pierced his heart like a sharp, sweet pain and made him restless and agitated for a moment. With a great effort of will, he overcame this temporary delusion in a short time. He ran out like a madman and sat at the feet of their goddess, Manasa, weeping with sleepless eyes throughout the night in repentance for this immeasurable self-loathing. He sought atonement by offering a sorrowful prayer from his wounded heart to the goddess's idol.

But the fire of suppressed desire that had been ignited was not so easily extinguished. On that very day, news was received that the king's soldiers had begun a terrible persecution of the snake-charmers because there were a lot of child kidnappings in the country. Everyone believed that the snake-charmers were responsible for this.

As soon as he received this news, Jahar, along with his troupe, packed their tents and, after traveling a long way, set up their camp in the middle of a lonely, terrible forest full of wild animals. To ward off attacks from wild, ferocious beasts, many were then making merry by lighting a fire around the tents. The "Dil Kholar Dal" (The Free-Spirited Troupe) was creating this huge atmosphere of fun. Their festival of song and dance had become wild. Jahar, Jhumro, Chandan, Bishnu, Bishnu's son **Tentule**, the bespectacled magician of the troupe, **Ganaktakur**, and **Ghantaburo**, everyone was enjoying this wonderful festival on a moonlit night with rapturous joy.

Just then, for some trivial reason, a fierce quarrel broke out between Jhumro and Tentule. The quarrel was at first verbal, then it turned into a fistfight, and then it became a brawl. Chandan was standing at a distance. It was unbearable for him to see Tentule insult Jhumro with unspeakable words. He also ran and jumped in between them. But during the pushing and pulling, the moment his chest covering was torn, everyone in the troupe was stunned and speechless to see that Chandan was not a boy—but an extremely beautiful young woman disguised as a man.

At this moment, another beautiful girl named **Mautukshi** came running to the scene. She quickly took off her upper garment and wrapped it around Chandan. She had offered the silent worship of a maiden's heart to the teenage Chandan. Today, when she saw that Chandan was a young woman just like her, the palace of her shy love dream completely shattered. The deep, generous love that had been accumulating in her heart all this time transformed into a sweet friendship. Jahar came and, pulling the shamefaced Chandan, took her directly inside his tent. The entire troupe was astonished. No one could have ever imagined that a self-controlled ascetic and mystic like Jahar would have kept this beautiful young woman with him, disguised as a young man.

Only one person was not surprised—Ghantaburo. This bizarre and mysterious trickster lived in the Bedia (snake-charmer) troupe. He constantly drank alcohol and predicted everyone's future with sticks, but he never said everything clearly. In this

matter, Ghantaburo, shaking his head like a great wise man, suddenly let out a strange, cruel, cackling laugh.

Meanwhile, in a secluded corner of the tent, trembling all over, Jahar forcefully pulls Chandan to him and says like a frightened deer, "Chandan, Chandan, you are mine—only mine!" The dam of his lifelong self-control had broken—that mad passion, that irresistible, indomitable desire, had blinded him. Chandan tried desperately to free herself from his embrace.

After many attempts, when Chandan could not deter Jahar, she pleaded in a soft, trembling voice to awaken his sleeping conscience. She reminded him of his great vow, his one cherished goal in life—to achieve mastery in snake-charming.

Her words struck Jahar's heart like a ruthless, harsh truth. He suddenly regained his senses. He looked at the idol of the goddess Manasa with a strange gaze, and then, in an inexpressible agony, he ran out of the tent. Today—tonight—he would pass his hundredth snakebite test and complete his life's great vow. No more delay.

As Jahar was about to find a venomous snake and perform his act, Bishnu came running and gave him the news that Jhumro had run away with Chandan. It was supposedly with Mautukshi's interest and help that they had done this daring deed.

Jahar's vow was not completed. The bond of strict self-control with which he had made himself as still and unmoved as a stone, that self-control was washed away like a sand dam in a strong current by Bishnu's heartbreaking news. In a fit of mad rage, Jahar ran off in search of Chandan and Jhumro. But no one in the troupe could give him their whereabouts. His entire body was on fire with intense agitation.

He entered the tent like a madman, opened his box, and took out a venomous black cobra! He ran to the temple of Mahakal with that fierce black cobra. Then, after chanting incantations over the cobra, he released it in the direction of Jhumro.

Jhumro and Chandan, ecstatic with deep joy, were singing as they walked on an unknown path. They would go far, far away, and

build a sweet, happy nest, where they would spend their honeyed nights of love for all eternity. The enchanting, sweet shadows of this happy dream were gathering before their closed, overwhelmed eyes.

When they were completely lost in an extraordinary joy, the charmed black cobra suddenly appeared like a thunderbolt without a cloud and bit Jhumro before disappearing. Unstable from the terrible pain of the venom, Jhumro sat down on the spot.

Chandan was completely stunned and speechless. She stood there, helpless and without options. To save Jhumro, she had no choice but to go back to Jahar.

With an incessant stream of tears, Chandan could not see clearly—she was walking towards the abandoned tent. But how could she face Jahar again?

Jahar was sitting as still as a stone. Tearful Chandan came and stood before him. With a pale face and a soft, trembling voice, she said that Jhumro was dearer to her than life. If he would save him, she was ready to sell herself to Jahar in exchange for Jhumro's life. Jahar did not say a word. Like a sleepwalker, he followed Chandan. He silently stood beside Jhumro's poisonous, blue, lifeless body.

Jhumro came back to life.

Chandan's joy was boundless. But Chandan had no time; she was bound by a promise—in exchange for Jhumro's life, she had sold herself to Jahar. Now she belonged to Jahar. With an agitated, pitiful, broken voice, she says to Jhumro, "Go far away, Jhumro, don't stay in front of my eyes—I am no longer yours." She doesn't want the one who is dearer than her life, her own, her everything. Chandan's tears can no longer be held back. Her throat becomes choked. Her heart feels as if it is being ripped apart as she drives him away.

Standing nearby, Jahar watches this pathetic scene. The black cobra that had returned under the power of the incantation and freed Jhumro of the venom was still in his hand. Jahar looked at

Chandan with a strange gaze, then at Jhumro, and then thought to himself about something.

Suddenly, he calmly let the black cobra bite him in the chest. Jhumro screamed, "What did you do, master!"

Both Chandan and Jhumro ran to Jahar. Jahar shouted in an angry voice, "Jhumro, take her away from my sight quickly—I will digest the venom. This is my last snake. Then I will chant the incantations. Incantations are spoiled in the presence of women. Take her away from here—from this jungle, from this country." Chandan and Jhumro reluctantly left. The master saw that they had gone far, but he did not chant the snake incantation. With a faint smile, he said to himself, "The incantation... that snake incantation is no more. This time, my incantation is 'Shibu-Shambhu-Shibu-Shambhu!'"

The black cobra's venom gradually turned his entire body blue; his eyes became dim and lifeless. But his entire face seemed to reflect the brilliant light of some unearthly joy. It was as if all the turmoil of his agitated soul had been calmed, and the lifelong agony of his existence had come to an end.

Did he succeed in the ultimate incantation of the final snake?

Songs

1

A single yellow marigold flower, a red palash flower,
Bring them, bring them!
Otherwise, I will not cook, will not tie my hair!
Bring a red sari, and glass bangles
Buy them from the market,
bring them from the field, Babla flower,
mango blossoms!
Otherwise, I will not cook, will not tie my hair!
A fair will be held this afternoon
At the foot of Kumkum mountain,
on the edge of the Sal forest.
From morning, troupes of men and women
With anklets on their feet, are walking on the road.

Let me go on that path, listening to the flute, my heart is wild!
Otherwise, I will not cook, will not tie my hair!

—Chorus

2

Leaning against the sky, the mountain is sleeping there, I am the spring of that mountain, I will not stay at home! I will flow wildly! Leopards are my friends, cobras are my playmates, I hold the snake box to my chest and spend the nights happily. I dance in the whirlpools of the wind!

—Kanan

3

Make a banana raft for me, oh, merchant father-in-law, On that raft, Behula and Lakhindar will go, A banana raft! Oh, Kul-bala (a woman from a respectable family), take this garland of flowers, Your groom will become a ram out of fear of this garland, Oh bride, you will not have to suffer the pangs of a co-wife in your life!

Oh, my Bedeni (snake-charmer woman), Bedeni of the mountain country, I remove the goiter from the neck, the lumps from the feet, the hump from the back, I remove the worms from the teeth, the pus from the ears; I know the medicine for a meek husband, who eats the woman's taunts!

Oh, the man possessed by a female ghost, oh, the bride possessed by a ghost! The Kalaiya ghost, the Mamdo ghost, The Shakchunni ghost, the Hamdo ghost, they will run away, take the charm of the Bedes! Take the bamboo fan, the cane box, the basket of piaal leaves, Take them, oh bride, you will have children! Dance, dance, dance—the dance of the Bedes? The dance of the snakes? Will you take the Solaimani stone? The colored glass?

—Chorus

Let me see, oh girl, let me see your hand! There is a smell of turmeric on your hand, have you been cooking? If you get a husband you like, you will have six children, not nine daughters. Thin fingers, long arms, a brick house, rice at home, Bangles on your hand, anklets on your feet. Oh father! Who is this girl? Seven sisters-in-law and three mothers-in-law!

You are having a secret affair, tell me, who are you in love with? Can you bind him with your tears? Let me see, oh girl, let me see your hand!

—Krishna Chandra De

4

(Dialogue) The bride will not speak, she will not speak, She is mad at him. (Bride) She is offended, she will go to her father's house today!

Oh bride, please speak, don't be so restless and laugh so much, if he gets the news of new flowers, He will run away and leave you, His character is very bad!

—Kanan

5

Mautukshi – I picked up a garland of Hijal flowers from a slippery path, Tell me, dark and slender one, what should I do with this garland?

Chandan – I am not that teenager of the forest, I do not swear by your flowers, I am not a flower-thief, The forest and my heart know the fire in my chest!

Jhumro – Bring the ghee, the honey, the jackfruit wood stool, The forest girl will give a garland to the forest god. Keep her locked in the flower bed of vines and leaves, My brother, don't forget her cleverness, oh wild girl!

—Menka, Kanan, Pahari

6

That full moon is smiling, A flower-blossoming smile. Holding my beloved close to my heart, I can say today, That with you, my love, I will become a carefree wanderer.

—Pahari and Kanan

Translated by Alamgir Mohammad

সেতু-বন্ধ

–কুশলীবগণ–

ইট, কাঠ, পাথর, লোহা, যন্ত্র, যন্ত্রী,
ভারবাহী পশু ও মানুষ, পীড়িত মানবাত্মা,
সেতু, মেঘ, বৃষ্টিধারা, তরঙ্গ,
পদ্মা, জলদেবী, মীনকুমারি,
ঝড়, বজ্রশিখা
বন্যা...

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেঘলোক

[মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে 'মেঘ'-এর প্রবেশ। 'মেঘ'-এর নীলাঞ্জল অনুলিপ্ত অঙ্গ, উচ্ছৃঙ্খল ঝামর চুল স্কন্ধদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। চূড়ায় বঙ্কিম শিখীপাখা ফিকে-নীল ফিতা দিয়া বাঁধা। ললাটে বহ্নিশিখা-রং এর প্রদীপ রক্তচন্দন যেন বজ্রাগ্নি। স্নিগ্ধ নয়নে ঘন কাজল ঝলমল করিতেছে,– যেন এখনি জল ঝরিয়া পড়িবে। গলায় হলুদ-রাঙা রাখি দিয়া বাঁধা গম্ভীর নিনাদী মৃদঙ্গ। পরনে পেন্সিল দিয়া ঘষা শ্লেট রং-এর ধড়া ও ঢিলা নিমাস্তিন্। দুই হাতের মণি-বন্ধে কাঁচা সোনার বলয়-কঙ্কণ। মৃদঙ্গে আঘাত হানার বিরতিতে দুই বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সুবর্ণ-কঙ্কণ-বলয় বিজুরির ঝিলিক হানিতেছে। পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া সাত-রঙা বিরাট জলধনু।

অন্তরীক্ষ হইতে স্নিগ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠের একতান-সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে–সেই গানের তালে তালে 'মেঘ'-এর মৃদঙ্গ বাদন ও নৃত্য।]

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু ॥

সে নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।
আকাশে শূল হানি'
শোনাও নব-বাণী

তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু ॥

ললাট-শশী টলি' জটায় পড়ে ঢলি',
সে শশী-চমকে গো বিজলি ওঠে ঝলি'

ঝাঁপে নীলাঞ্জলে মুখ দিগঙ্গনা,
মূরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।

আঁধারে পথ-হারা
চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা,
ধরা নিরম্বু ॥

[গান করিতে করিতে একদল নৃত্যপরা কিশোরীর বেশে 'বৃষ্টিধারা'র প্রবেশ। তাদের পরনে মেঘ-রং কাঁচুলি, ধানী-রং ঘাগরা –পাড় জরির। নীল জমিনে সাদা ডোরা-কাটা কাপড়ের হালকা উত্তরীয়। পায়ে ছড়া নূপুর, কারুর পায়ে পাঁইজোর গুজ্‌রি। সবুজ আলতা-ছোপানো পদতল। হাতভরা সোনালি-রঙ রেশমি চুড়ি, কঙ্কণ, কেয়ূর। শ্রোণীতে ফোটা-কদমের ঢিলে চন্দ্রহার। বুকে যুঁই-চামেলীর মালা। আঁখি-পাতার কূলে কূলে চিকন কাজললেখা। কপোল কেতকিপরাগ-পাণ্ডুর। জোড়া ভুরু লুলিতে অলকে হারাইয়া গিয়াছে। ভুরু-সন্ধিতে কাঁচপোকার টিপ। কর্ণমূলে শিরীষ-কুসুম। কারুর কটিতটে ছোট্ট গাগরি, কারুর হাতে ফুল-ঝারি। কেহ বিলম্বিতবেণী, কেহ আলুলায়িত কুন্তলা। বিলম্বিত-বেণী কিশোরীরা আনমনে স্খলিত মন্থরগতিতে পদচারণা করিয়া ফিরিতেছে, মুক্ত কুন্তলা-বালিকারা নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে, জড়াজড়ি করিয়া– ঘুরিয়া ফিরিয়া। এক কোণে একটি বালিকা একরাশ কেয়াফুল বুকে জড়াইয়া পা ছড়াইয়া উদাস চোখে চাহিয়া আছে। 'বৃষ্টিধারা'র নৃত্য-গানের ছন্দে ছন্দে অন্তরীক্ষ হইতে রাশি রাশি যুঁই, চামেলি, বেলি, বকুল, দোপাটি, টগর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ঐ গানের তালে তালে 'মেঘ'-এর মৃদঙ্গ বাদন ও নৃত্য।]

বৃষ্টি-ধারার গান

অধীর অম্বরে গুরু গরজন মৃদঙ্ বাজে
রুমু রুমু ঝুম্ মঞ্জরীর-মালা চরণে আজ উতলা যে।

এলোচুলে দুলে দুলে বন-পথে চল আলি,
মরা গাঙে বালুচরে কাঁদে যথা বন্-মরালি।

উদারি' গাগরি-ঝারি
দে লো করুণা ডারি,
ঘুঙট উতারি' বারি
ছিটালো গু মোট সাঁঝে ॥

তালিবন হানে তালি, ময়ূরী ইশারা হানে;
আসন পেতেছে ধরা মাঠে মাঠে চারা-ধানে।

মুকুলে ঝরিয়া পড়ি' আকুতি জানায় যূথি,
ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা তূতী।
কাজল-আঁখি রসিলি
চাহে খুলি' ঝিলিমিলি,
চল লো চল সেহেলি
নিয়ে মেঘ-নটরাজে ॥

[বৃষ্টিধারার বালিকাদের নাম– রেবা, চিত্রা, কঙ্কা, চূর্ণা, মঞ্জু, নীরা, নীপা, কৃষ্ণ, চম্পা, অশ্রু, মন্দা]

মেঘ : ওগো নৃত্যপরা নূপুরিকাল দল! তৃষ্ণাতুরা ধরার আবেদন কি এতদিনে পৌঁছল তোমাদের দরবারে? চাতকির চঞ্চু যে বিশুষ্ক হয়ে উঠ্‌ল তোমাদের করুণা যেচে যেচে!

মন্দা : (সেই আন্‌মনা বালিকাটি, যে একরাশ কেয়া বুকে করে বসে ছিল) সত্যি বলেছ রাজা, দিদিদের আর নূপুর পরাই হয় না। কাজল ঘষে ঘষে চোখে জল ভরে এল, তবু কাজল পরাই আর শেষ হয় না! আমি ত কোন্ সকালে উঠে কেতকি-বিতানে এসে পথ চেয়ে বসে আছি। (বেণী জড়াইতে জড়াইতে) বেণীটাও জড়াবার ফুরসৎ পাই নি!

রেবা : আরে বাপু সব-তাতেই অতিরিক্ত তাড়া-হুড়ো। আমরা বলি, নট-রাজের মাদলই আগে বেজে উঠুক, ঝলুকই আগে বিজলির ইঙ্গিত–তা না–মেঘ না চাইতেই জল! ভোর না হতেই বেরিয়েছেন পাড়া বেড়াতে! একবার তমালতলায়, একবার কদম-শাখায়, একবার পাহাড়তলীর শাল-বীথিকায়, একবার কেয়াবনের নাগ-পল্লিতে–

মন্দা : আর তোমরাই বা কিসে কম রেবা-দি? ঘুমুর বাঁধছ ত বাঁধছই। ঝিল্লি বেচারি সন্ধে থেকে সুর দিয়ে হয়রান! কেশ এলো করছ ত করছই! কত যে বিজুলি-ফিতে ছিড়ল-কত যে লোধ ফুলের প্রাণ গেল গাল রাঙাবার রেণু জোগাতে!

বিন্দু : তুই থাম্ মন্দা! আচ্ছা রাজা, আজ যে অসময়ে তোমার মৃদঙ্গে তালি পড়ল! আমরা সব কেউ সাগর দোলায় কেউ শৈল-শিরে ঘুমুচ্ছি হঠাৎ জেগে দেখি কিরণ মালা পূর্বে-হাওয়ায় পাল্কি নিয়ে হাজির, হাতে তার নীপের শাখা।

মেঘ : তোমাদের অভিযানে বেরুতে হবে, বিন্দু। বৃষ্টিধারার সকলে। অভিযানে বেরুতে হবে? আবার কার বিরুদ্ধে অভিযান, রাজা? এবার কোন্ দৈত্যপুরী ভাঙবে?

মেঘ : গন্ধর্ব-লোকের পদ্মাদেবী আমাদের স্মরণ করেছেন। তাঁর বুকের ওপরে বাঁধ বাঁধবার জন্যে নাকি দুর্দান্ত যন্ত্রপতির ষড়যন্ত্র চলেছে। পদ্মা এ অপমান সইবেন না। তিনি আমাদের সাহায্য চান।

চিত্রা : ওমা, কি হবে? যন্ত্রপাতির স্পর্ধা কম নয়! তার রাজ্য পশ্চিম হতে ক্রমেই পূর্বে প্রসারিত হয়ে চলেছে উন্মত্ত বুভুক্ষায়–তা দেখছি, তাই বলে সে ঔদ্ধত্য যে পদ্মাকেও লাঞ্ছনা হান্‌তে এগুবে–এ বার্তা শুধু নূতন নয় রাজা–অদ্ভুত।

কঙ্কা : এই অতিদর্পীকে একটা অতি বড় শাস্তি না দিলে আর চলে না, রাজা!

চূর্ণী : –তোমার ব্রহ্মাস্ত্র নিশিত বজ্র, তোমার সেনাপতি পবন, তার মারণসেনা বন্যা তুফান ঝঞ্ঝা-সব প্রস্তুত ত রাজা?

মঞ্জু : হাঁ, সব প্রস্তুত বই কি! ওলো চূর্ণী, রাজার কঠিন বজ্র যে এখন শ্রীমতী বিদ্যুল্লতার গলায় কোমল হার হয়ে ঝলমল করছে। বলি রাজা, তোমার হাতের বজ্র ভেঙে কি শেষে প্রিয়ার গলার হার গড়ালে? হা কপাল! যেমন রাজা, তেমনি সেনাপতি! সেনাপতি পবনদেব ওদিকে ফুল-কুমারীর মহলে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছেন! মালতীর কানে ফুঁ, মল্লিকার গালে সুড়সুড়ি, কামিনীর চোখের পাতায় চুমকুড়ি, কমলের খোপা ধরে টান–এই ত বীরবলের কীর্তি! উপযুক্ত রাজার উপযুক্ত সেনাপতি!

মেঘ : (হাসিয়া) সত্যিই আমার সেনাপতির ধনুর্বাণ কামদেব চুরি করেছেন? মঞ্জু! আর আমার বজ্রাগ্নি লুকিয়েছে (মঞ্জুর কপোলে মৃদু অঙ্গুলি আঘাত হানিয়া) তোমাদের ঐ কালো আঁখি-কোণে!

নীরা : বেশ ত রাজা, তালে এ অভিযানে আর তোমার হিমালয় ছেড়ে যাবার দরকার কি? শুধু আমরাই যাই না কেন, দেখি এ আঁখির আগুনে যন্ত্ররাজ দগ্ধ হয় কি-না!

মেঘ : অমন কাজ করো না নীরা, করো না! ও হতভাগ্য, যত পুড়বে তত খাঁটি হবে, তত ওর শক্তি বাড়বে। তোমাদের আঁখির আগুনে ওর কঠিন হিয়া গলবে না, নীরা! কত অশ্রুই না ঝরছে নিরন্তর অনন্ত আকাশ গলে ওর প্রতপ্ত ললাটে, তবু ঐ অশান্ত দৈত্য-শিশু শান্ত হল না। পুড়িয়ে ওর কিছু করতে পারবে না, আগুনই ওর প্রাণ। ওকে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

দীপা : তোমায় যদি পথে পথে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারি রাজা, ঐ দৈত্যটাকে আর পারব না?

কৃষ্ণা : ওরে নীপা, আমাদের রাজা হল দেবতা–ওপরের মানুষ, তাই ওকে পল্‌কা হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ানো দুরূহ নয়, কিন্তু ওটা যে হল দৈত্য, তাই ত ও এত ভার! ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়েই ত ও এমন করে চোখ-কান বুঁজে মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে আছে! তাই ত ও স্থানু। ওকে ভাসানো অত সহজ হবে না!

অশ্রু : ঠিক বলেছিস্ কৃষ্ণা! ফুল সুন্দর বলেই একটু ছোঁওয়ায় ঝরে পড়ে যায়, একটু ফুঁয়ে উড়ে যায়! আর ঐ দৈত্যটা কুৎসিত, তাইত ও হয়ে উঠল বোঝা, ওর আসন হল অটল। ওর পায়ে মাথা খুঁড়লে শুধু ললাটই হবে ক্ষত, আসন এক বিন্দু টলবে না!

মেঘ : দেব-দানবের এ-যুক্তি চিরন্তন, অশ্রু! ঐ মায়াবি দৈত্যটা হাজার রূপ ধরে হাজার বার আমাদের স্বর্গ আক্রমণ করেছে, প্রতিবারেই ওদের আক্রমণ আমরা প্রতিহত করেছি। আমাদের একমাত্র ভয়, ওরা ঘোর মায়াবী! কোন্ ছিদ্র দিয়ে যে স্বর্গপুরী প্রবেশ করবে–তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওদের রূপার কাঠির ছোঁওয়ায় কত রূপের পুরী পাষাণ-পুরী হয়ে উঠ্‌ল। ও কাঠি যাকে ছোঁবে, সেই হয়ে যাবে জড়। ও-রূপার কাঠি যাদু জানে! ওরা যদি তাই দিয়ে একবার এ-স্বর্গ ছুঁতে পারে, তাহলে এর সমস্ত আনন্দ এক মুহূর্তে পাষাণ হয়ে যাবে, এর পারিজাতমালা শুকিয়ে উঠবে!

অশ্রু : তাহলে কি উপায় হবে রাজা! ও যদি আমাদের আনন্দ-পুরী ছুঁয়ে দেয়? তুমি খুব বিপুল করে করে প্রাচীর গাঁথ না কেন আমাদের স্বর্গ ঘিরে!

মেঘ : ওরে বাস্ রে! তাহলে কি আর রক্ষা আছে! ওরা ত তাই চায়। তারই জন্যে ত ওরা আমাদের নিরন্তন রাগিয়ে তুলছে। প্রাচীর তুললেই ত ওদের ভাঙবার পশুত্বটাকে প্রচণ্ড করে তোলা হবে। আমরা একটা

কিছু আড়াল তুললেই ওরা সেইটে অবলম্বন করে উঠে আসবে স্বর্গে। অবলম্বন পাচ্ছে না বলেই ত ওরা মাঝপথ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে ফিরে যাচ্ছে, এ স্বর্গলোকের সীমা খুঁজে পাচ্ছে না।

চম্পা : কিন্তু রাজা গন্ধর্বলোক ত প্রাচীর তুলেই ওদের আক্রমণ প্রতিহত করতে চাচ্ছে।

মেঘ : মূর্খ ওরা, তাই ওদের আজ কি দুর্দশা হয়েছে দেখ। যন্ত্ররাজের যে পথ কিছুতেই মাটি ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারছিল না, দেয়াল তুলে গন্ধর্বলোক সেই পথকে স্বর্গের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে! ঐ দেয়াল ধরেই ওরা ওদের ওপর এসে পড়েছে দলে দলে।

মন্দা : রাজা, এইবার যদি ওরা স্বর্গে এসে পড়ে?

মেঘ : ভয় নেই মন্দা। আমাদের এ অলখ-পুরীর দশ দিক মুক্ত। তাই ত ওরা দিশাহারা হয়ে পড়েছে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বন্ধ দ্বার দুর্গেই পড়ে শত্রুর পরিপূর্ণ আক্রোশ। আড়ালের ইঙ্গিতে শত্রুকে আহ্বান করার মত দুর্বুদ্ধি আর নেই। নিম্নে দৃষ্টিপাত করে দেখ, কি বীভৎস ঐ যন্ত্রী-সেনাই–ইট, কাঠ, পাথর, লোহা, চুন, সুরকি, ধুলো-বালি!–ওদের সংখ্যা করা যায় না–কেবল স্তূপ আর স্তূপ! প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে! সব প্রাণহীন! আরো প্রাণহীন বলেই অন্যেরে প্রাণে মারতে ওদের বাজে না! ঐ দেখ, গন্ধর্বলোকের প্রাচীর ধরে ওরা কি রকম ছেয়ে ফেলেছে ওদের দেশ–মারীভয়ের মত! এ সুবিধা যদি না করে দিতে গন্ধর্বলোক, তাহলে ও পাপ অন্ধকারের নিচেই পড়ে থাকত মুখ থুব্‌ড়ে।

চিত্রা : কিন্তু রাজা, যন্ত্ররাজের ঐ সেতু-বন্ধকে এত ভয়েরই বা হেতু কি? অম্‌নি সেতুবন্ধ দিয়েই ত সীতার উদ্ধার হয়েছিল!

মেঘ : উদ্ধারই বটে, চিত্রা! ঐ সেতুবন্ধে পদার্পণের পাপে আগুনে পুড়েও সীতার কলঙ্ক পুড়ল না–শেষে পাতাল প্রবেশ করে উদ্ধার খুঁজতে হল।

রেবা : বুঝেছি রাজ, সকল বন্ধন ও বন্ধনী হতে মুক্ত রাখাই হয় ত আমাদের স্বর্গপুরীর শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা!

মন্দা : আচ্ছা রাজা, যন্ত্ররাজ্যের এই সেতুবন্ধের উদ্দেশ্য কি?

মেঘ : এই সেতুবন্ধ যে পাতালপুরীর সীতার উদ্ধার করবে না মন্দা, ও করতে চায় স্বর্গলক্ষ্মীকে বন্দিনী। ঐ সেতুবন্ধ স্বর্গ প্রবেশের লঙ্ঘন-সোপান।

ঐ সেতুবন্ধে লৌহ-বর্ম দিয়ে সে স্বর্গলক্ষ্মীর কেশাকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যাবে–তাই বলে তার সমুদ্ধত কৃষ্ণ-পতাকা!

কৃষ্ণা : তাহলে ওকে দুঃশাসনের মত মারও খেতে হবে, রাজা!

মেঘ : ঠিক বলেছ কৃষ্ণা, অনাগত সেদিন এলো বলে। এখন চল, পদ্মা দেবীর নিরাশা-শুষ্ক কূল পানে। যন্ত্রপাতির আয়োজন দেখে তারপর সেনাপতি পবন-দেবকে খবর দেওয়া যাবে। সে ততক্ষণ ফুলমহলায় বিশ্রাম করে নিক্।

(নৃত্য-গান করিতে করিতে মেঘ ও বৃষ্টি-ধারার প্রস্থান।)

হাজার তারার হার হয়ে গো
দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই
নাচাই শিখী কদম-তলে ॥

"বৌ কথা কও" বলে পাখি
করে যখন ডাকাডাকি,
ব্যথার বুকে চরণ রাখি'
নামি বধূর নয়ন-জলে ॥

ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি
আঁখির জলে করুণ করি,
নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' চলি
আকাশ-বধূর নীলাম্বরি।

লুটাই নদীর বালুতটে,
সাধ করে যাই বধূর ঘটে,
সিনান-ঘাটের শিলা-পটে
ঝরি চরণ-ছোঁওয়ায় ছলে ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যন্ত্রপতির রাজসভা! বিশাল লৌহমঞ্চে বিশালকায় যন্ত্রপতি উপবিষ্ট। পশ্চাতের আঁধার-কৃষ্ণ যবনিকা জুড়িয়া ভীতপ্রদ রক্তাক্ত অট্টালিকার পর অট্টালিকা–জীবজন্তু-তরুলতা-পরিশূন্য। বিরাট অমঙ্গলের প্রতীকসম ঊর্ধ্বে প্রসারিত-পক্ষ বিপুল শকুনি–ভীষণ দৃষ্টিতে নিম্নে চাহিয়া আছে। যন্ত্রপতির কঠিন মুখে রক্ত আলো পতিত হইয়া তাহাকে আরো ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। মস্তকে লৌহ-মুকুট। মুকুটমণি-ইলেকট্রিক-টর্চ। সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া লৌহ-জালীর সাঁজোয়া। দক্ষিণ করে স্থূল লৌহদণ্ড, বামকরধৃত দীর্ঘ শৃঙ্খলে বদ্ধ ক্ষুধিতদৃষ্টি সিংহ, হিংস্রমতি শার্দূল, শাণিত-নখর ভল্লুক ও কুটিল-ফণা ভুজঙ্গী-পদতলে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। প্রাসাদ-চূড়ায় কৃষ্ণপতাকায় "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা" কাটিয়া তাহারি নিচে লেখা হইয়াছে– "বিদ্বেষ শোষণ পেষণ!"]

"যন্ত্র"–বিপুল স্থূলকায়, কদাকার, অন্ধদৃষ্টি। বড় বড় নখদন্ত। দক্ষিণ হস্তে জাঁতা-কল, বাম হস্তে প্রকাণ্ড সিগার-বেয়াদবের মত তাহারই পুঞ্জীভূত ধূম দিয়া অবিরত বাহির করিতেছে। মস্তকে চিম্‌নি-আকৃতির লম্বা টুপি। পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া বিরাট চক্র। রক্ত-বস্ত্র, রক্ত-দেহ। তাহার পৃষ্ঠে চক্রের সাথে সাথে সেও অনবরত ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

ইট, কাঠ, পাথর, যেন নেশা খাইয়া ঝিমাইতেছে। কেবল লৌহের উজ্জ্বল কঠিন-দৃষ্টি। ইটের পরনে পিরান ও সুর্কি-রং চাহারখানার ঢিলে আরবি্ পায়জামা। মাথায় লালরঙা চৌকো টুপি, খর্বকায়, অলস-দৃষ্টি সিমেন্ট-রং-রঞ্জিত মুখ। পায়ে চৌকো বুট।

কাঠ। স্থূল কর্কশ বস্ত্র শীর্ণকায় দীর্ঘাকৃতি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বিশুষ্ক মুখ। শির নাঙ্গা ম্লান দৃষ্টি, নখ চুল বড় বড়।

পাথর-মুখ চোখ বস্ত্র ধূমল বর্ণ। স্থূল কদাকার, কতকটা কচ্ছপের মত। যেন শুধু পেট আর মাথা। শিরে জবড়জং কৃষ্ণ-উষ্ণীষ। হাত পা ভারি ভারি। মুখ চ্যাপটা, চোখ ছোট।

লোহা। আলকাতরা-রং-দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ-দেহ, কঠোর-দৃষ্টি, বদ্ধ-মুষ্টি তিক্ত-কণ্ঠ। আঁট-সাট জামা।

[যন্ত্র, ইট, কাঠ, পাথর, লোহা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বন্দনাগীত গাহিতেছে]

গান

নমো হে নমো যন্ত্রপতি নমো নমো অশান্ত।
তন্ত্রে তব ত্রস্ত ধরা, সৃষ্টি পথভ্রান্ত ॥

বিশ্ব হল বস্তুময়
মন্ত্রে তব হে,
নন্দন-আনন্দে তুমি
গ্রাসিলে মহাধ্বান্ত ॥

শঙ্কর হে, সে কোন্ সতী-শোকে হয়ে নৃশংস
বসেছ ধ্যানে, হয়েছ জড়, সাধিতেছ এ ধ্বংস।

রুক্ষ তব দৃষ্টি-দাহে
শুষ্ক সব হে,
ভীষণ তব চক্রাঘাতে
নির্জিত যুগান্ত ॥

যন্ত্র : আর ত আমাদের পথ এগোয় না রাজা, সামনেই খরস্রোতা পদ্মা—স্বর্গের নিষেধ-বাণীর মত।

যন্ত্রপতি : ওকে ওর গতি লঘু করতে বল।

যন্ত্র : জানি রাজা, বহু স্রোতঃস্বতী তোমার আদেশ পালন করেছে, কিন্তু পদ্মা তাদের সম্রাজ্ঞী!

যন্ত্রপতি : তুমি ভুলে যাচ্ছ সেনাপতি যে, আমিও সম্রাট। ওকে বল—এ আমার আদেশ!

যন্ত্র : যে-মন্দাকিনী ইন্দ্ররাজের ঐরাবতকে তৃণকণার ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—এ তারই জ্যেষ্ঠা কন্যা। তার তরঙ্গ-সেনার হুহুঙ্কারে প্রলয়-নর্তনে ধরণী প্রকম্পিত!

যন্ত্রপতি : ধরণী প্রকম্পিত হতে পারে—আমি নয়। ওকে খবরটা পৌঁছে দাও—ওর বুকের ওপর দিয়ে প্রস্তুত হবে আমার পথ!

যন্ত্র : সে খবর সে শুনেছে, রাজা। তার তরঙ্গ-সেনা পর্যন্ত এ খবর শুনে ফেনা ছুঁড়ে বিদ্রূপ করে।

ইট : মনে হয়, যেন গায়ে থুথু দিয়ে অপমান করলে!

যন্ত্র : আরে বাপু, তুমি থাম! —রাজা, এ অভিযানে তোমায় অধিনায়কত্ব করতে হবে।

যন্ত্রপতি : তুমি কি ওর হাঙ্গর-কুমির দেখে ভয় পেয়ে গেলে সেনাপতি?

যন্ত্র : না রাজা, আমার ভয় শক্ত-কিছু নিয়ে নয়, ভয় আমার ঐ তরল তরঙ্গ-সেনাকে। ও যদি কামড়াত, তাহলে আমার ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু ও ত কামড়ায় না–শুধু সমস্তক্ষণ ঠেলে! ধরতে গেলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে যায় গলে!

পাথর : আজ্ঞে, বেটা একে মনসা, তাতে আবার ধুনোর গন্ধ ঐ পবন ব্যাটা! ও যখন এসে যো দেয়, তখন আমার এই কাবুলি বপুখানিকেও তুর্কি নাচন নাচিয়ে ছাড়ে!

ইট : আজ্ঞে, আর আমাকে ত সুর্কি-গুঁড়ো করে দেয়!

কাঠ : আমার খাতির ততোধিক! কান ধরে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে খাওয়াতে যখন দেয় রাম-ছুট, তখন দুপাশের লোক বলে–মড়া ভেসে যাচ্ছে।

লোহা : (সগর্বে) আমি বরং গলায় কলসি বেঁধে ডুবে মরি, তবু ওদের মত ভেসেও যাই না, ভেঙেও পড়ি না।

পাথর : হ্যাঁ, তাই থাপ্পড় কষিয়ে তোমার মুখটা দেয় নয়ের মত করে বেঁকিয়ে–তার পরে বেশ করে বালি চাপা দিয়ে–দেয় জ্যান্ত কবর!

যন্ত্র : চুপ কর সব!–তোমাদের সমবেত শক্তি দিয়ে ওকে প্রতিরোধ করতে হবে–একলা যে যাবে তাকেই অকূলে ভাসতে হবে!

কাঠ : ভাসতে হয় ত সকলকেই হবে সেনাপতি, তবে এবার সকলে একসাথে ভাসব–এই যা সান্ত্বনা! বাবা, পদ্মার যে চেহারা দেখে এসেছি তা মনে করলে এখনো কাঠ হয়ে যেতে হয়! স্রোত ত নয়–যেন লাখে লাখে পাহাড়ে অজগর ফোঁসাচ্ছে–মোচড় খাচ্ছে। তার পর কুমিরগুলো যেন খেজুর-গুঁড়ির ঢেঁকি। (অন্য দিকে চাহিয়া) হাঙরগুলোর মুখ কিন্তু আমাদের সেনাপতিরই মত!

যন্ত্র : দেখ, তুমি বড় হাল্‌কা। তোমাদের দুর্বলতায় রাজা ক্রুদ্ধ হচ্ছেন।

যন্ত্রপতি : সেনাপতি, আমি এখন চল্‌লাম। তোমরা প্রস্তুত হও–পদ্মাকে শাসন করতেই হবে। [প্রস্থান]

পাথর : আচ্ছা সেনাপতি, রাজার অত আক্রোশ কেন ঐ জলধারার ওপর? ওকে কি না বাঁধলেই নয়? আমরা ওকে কি ডিঙিয়ে যেতে পারিনে? তা হলে খাসা হত কিন্তু! ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। তখন একবার দেখে নিতাম–ওর তরঙ্গ-সেনা কত লাফাতে পারে? আমরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়ালে বোধ হয় ওকে আলগোছে ডিঙিয়ে যেতে পারি।

যন্ত্র : সে চিন্তার ভারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। তোমাদের যা বলি তাই কর এখন।–আমাদের যন্ত্রপতি স্বর্গ জয় করতে চান, তাঁর যন্ত্ররথের পথের বাধা ঐ বিপুল স্রোতধারা–ও যেন স্বর্গের গড়খাই–ওর তরঙ্গ যেন স্বর্গের সীমান্তরক্ষী সৈন্য। ওকে জয় করতে পারলেই স্বর্গজয় সহজ হয়ে উঠ্‌বে।

ইট : স্বর্গের সরস্বতীকে ও আগেই বন্দি করেছি সেনাপতি, তার বীণার তারকে বেতার-যন্ত্রের কাজে লাগিয়েছি–তার পদ্মবনকে করেছি কাঠ-গুদাম! স্বর্গে আর আছে কি?

যন্ত্র : (পাথরের প্রতি) দেখ, তোমায় ভারিক্কি বলেই জানতাম–তোমাতেও দেখছি হাল্‌কা কাঠের ছোঁয়াচ লাগল!–(কাঠের প্রতি) দেখ, তোমার হালকা হওয়ায় কিন্তু একটা সুবিধাও আছে। তোমায় তরঙ্গ সহজে ডুবাতে পারে না। ভেসে এক জায়গায় কূলে ঠেকবেই।

পাথর : আজ্ঞে, ডুবলে কিন্তু ভরাডুবি!

যন্ত্র : আঃ, থাম তুমি! (কাঠের প্রতি) দেখ, তোমায় নৌকা হয়ে দেখে আসতে হবে–কোথায় পদ্মার তরঙ্গ-সেনা উদাসীন, কোথায় ওর গতিবেগ লঘু।

লৌহ : আচ্ছা সেনাপতি, পদ্মাকে কি বন্দিনী করবে?

যন্ত্র : –না। তা করতেও পারব না, আর পারলেও করতাম না। আমরা পদ্মাকে চাই না–চাই স্বর্গ-লক্ষ্মীকে। এই স্রোতের জল সেই স্বর্গের প্রাণধারা। এই প্রাণ-ধারার গতিবেগ সংযত করা ছাড়া একেবারে বন্ধ করলে যার জন্যে এই অভিযান, হয়-ত সেই স্বর্গলক্ষ্মীকেই হারাব–এবং পাব দক্ষ-যক্ষের সতীকে। আমাদের রাজমন্ত্রী কৌটিল্যকে তা হতে দেবেন না।

কাঠ : কই সেনাপতি, মন্ত্রী কৌটিল্যকে ত দেখতে পেলুম না কখনো।

যন্ত্র : সবচেয়ে মূল্যবান যে, তাকে রাখ্‌তে হয় সবচেয়ে গোপনে। মন্ত্রী কৌটিল্যই হল আমাদের রাজ্য-রক্ষার রক্ষাকবচ। আমরা সকলে, মায় রাজা পর্যন্ত, ঐ কৌটিল্যেরই অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

পাথর : ঠিক বলেছ সেনাপতি দুর্বুদ্ধি, যিনি, তিনি থাকেন দেখার অতীত হয়ে। ষড়যন্ত্রকে দেখতে যাওয়া দুরাশা!

ইট : আমারও তাই যেন হয়, সেনাপতি, জগৎটাকে সৃষ্টি যেই করুক–ওর মালিক যেই হোক–ওকে চালায় কিন্তু শয়তান!

যন্ত্র : ওহে, তোমাদের কথাবার্তায় রাজদ্রোহের গন্ধ পাচ্ছি। রাজার এবং ভগবানের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করলে তার শাস্তি কি, জান?

কাঠ : জেল কিংবা নরক।–এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ!

যন্ত্র : এই! চুপ! চুপ! ঐ রাজা আসছেন, শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

যন্ত্রপতি : সেনাপতি! আজই যাত্রা কর পদ্মাতীরে তোমায় সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। সৈন্য পরিচালনের ভার আমিই গ্রহণ করব। (ইট, কাঠ, পাথর, লোহার প্রতি) প্রিয় সৈনিকগণ। তোমাদেরি আত্মদানে আমার এই বিশাল সাম্রাজ্য। এর যা কিছু গৌরব, যা কিছু প্রতিষ্ঠা–সব তোমাদেরই। আমাদের এ যুদ্ধ স্বর্গমর্ত্যের চিরন্তন যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জড় ও জীবের, বস্তু ও প্রাণের, মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয়ের। অমৃতে আমাদের অধিকার নেই, তাই আমরা অমৃতকে তিক্ত করে তুলতে চাই। যে-বেদনায় আজ মহাজড়, সেই বেদনার বিক্ষোভে দেবতার আনন্দকে পঙ্কিল করে তুলতে চাই। প্রকৃতিকে আমরা বশীভূত করেছি–এইবার স্বর্গরাজ্য জয়ের পালা। আমাদের পথের প্রধান প্রতিবন্ধক ঐ মুক্ত স্রোতঃস্বতী– আনন্দলোকের গোপন প্রাণ-ধারা। ওকে বাঁধব না–ওর বুকের ওপর দিয়ে চলে যাব আমাদের চলার চিহ্ন এঁকে।–স্বর্গের আনন্দ-লক্ষ্মী করবে এই জড়-জগতের পরিচর্যা–এই দম্ভের দীপ্ত তিলক তোমরা পরাও এই মর্ত্য-লোকের লাঞ্ছিত ললাটে। অহঙ্কারের এই উদ্ধত পতাকা স্বর্গের বুকে প্রতিষ্ঠা কর, বীর!

সকলে : জয় যন্ত্রপতি কি জয়! জয় যন্ত্রপতি কি জয়!!

যন্ত্র : সৈন্যগণ, গাও আমাদের সেই যাত্রাপথের কুচ-কাওয়াজের গান!

গান

চরণ ফেলি গো মরণ ছন্দে
মথিয়া চলি গো প্রাণ।
মর্তের মাটি মহীয়ান করি
স্বর্গেরে করি ম্লান ॥

চিতার বিভূতি মাখিয়া গায়
লজ্জা হানি গো অন্নদায়,
বাঁধিয়াছি বিদ্যুল্লতায়,
দেবরাজ হতমান ॥

পাতাল ফুঁড়িয়া করি গো মাতাল
রসাতল-অভিযান ॥

তৃতীয় দৃশ্য

[সিংহাসনারূঢ়া মকর-বাহিনী পদ্মা। পরনে জল-তরঙ্গ শাড়ি, হাওয়ায় কেবলি ঝিলমিল করিতেছে গায়ে কাঁচা রৌদ্র-কিরণের উড়ুনি। কাশ-বন চামর ঢুলাইতেছে। বেলা-ভূমে হাঙ্গর কুম্ভীর প্রহরীর কার্য করিতেছে। দুই তীরে বালুচরের শ্বেত পর্দা ঝুলানো। অগণিত মীন-সেনা সিংহাসনের চারি পাশে পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। জলদেবীগণ বন্দনা-গান গাহিতেছে।]

গান

নমো নমো নম হিম-গিরি-সূতা
দেবতা-মানস-কন্যা।
স্বর্গ হইতে নামিয়া ধূলায়
মর্ত্যে করিলে ধন্যা ॥

আছাড়ি' পড়িছ ভীষণ রঙ্গে
চূর্ণি' পাষাণ ভীম তরঙ্গে,
কাঁপিছে ধরণী ভ্রূকুটি ভঙ্গে,
ভুজগ-কুটিল বন্যা ॥

কুলে কুলে তব কন্যা কমলা
শস্যে-কুসুমে হাসিছে অচলা,
বন্দিছে পদ শ্যাম-অঞ্চলা
ধরণী ঘোরা অরণ্যা ॥

[জলদেবীদের নাম–তরঙ্গিণী, সলিলা, অনিলা, তটিনী, নির্ঝরিণী, বালুকা]

পদ্মা : তোদের এ গান থামা, তরঙ্গিণী। এ বন্দনা-গান আজ আমার গায়ে বিদ্রূপের মত বিঁধছে!

তরঙ্গিণী : জানি মা, তোমার বেদনা কত বিপুল। কিন্তু যন্ত্রপতির এ স্পর্ধার দণ্ড কি আমরা দিতে অসমর্থ, মা?

পদ্মা : আপাতত ত তাই মনে হচ্ছে তরঙ্গিণী। কত বাধাই না দিলাম। যন্ত্রপতির অগণিত সেনা-সামন্ত আজো আমার বালুচরের তলে তাদের সমাধি রচনা করে পড়ে রয়েছে, তবু ত তাকে আটকে রাখতে পারলাম না। সে আমার বুকের ওপর দিয়ে তাঁর উদ্ধত যাত্রাপথ করে গেল। (অদূরে সেতু-বন্ধ দেখা যাইতেছিল, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ঐ দেখেছিস্ তার সেতু-বন্ধ? ও যেন কেবলি আমার মাথার ওপর চড়ে বিদ্রূপ করছে! অসহ্য তরঙ্গিণী, অসহ্য এ অপমান!

সলিল : কি চতুর ঐ যন্ত্রপতি, মা! কাপুরুষ–আমাদের ভয়ে, আমাদের নাগালের বাইরে ওর পথ রচনা করেছে। পেতাম ওকে তরঙ্গের মুখে, তা হলে ওর ঐ আকাশস্পর্শী স্পর্ধার মুখের মত শাস্তি দিয়ে ছাড়তাম!

বালুকা : তাহলে এতদিন ঐ বালুচর হত ওর সমাধি।

পদ্মা : যুদ্ধ জয় শুধু শক্তি দিয়ে হয় না, সলিলা, শক্তির চেয়ে বুদ্ধিরই বেশি প্রয়োজন বড় যুদ্ধে।

অনিলা : আচ্ছা মা, ওর পথ না হয় আমাদের নাগালের ঊর্ধ্বেই রইল, কিন্তু ও-পথের মূল ত রয়েছে আমাদেরি বুকের ওপর প্রোথিত। সে-মূলকে কি আমরা উপ্‌ড়ে' ফেলতে পারিনে?

পদ্মা : আমার শক্তিহীন তরঙ্গ-সেনাকে সে কথা জিজ্ঞেস কর্ অনিলা। সেটা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমবার–প্রথমবার কেন, বহুবারই আমরা তাদের ও পথমূলকে উচ্ছেদ করেছি, কিন্তু আর পারা গেল না। ওর বিপুল ভারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি আর আমার তরঙ্গ-সেনার রইল না!

নির্ঝরিণী : আচ্ছা মা, আমরা ত পারলাম না। কিন্তু আমাদের এ-অপমান–এই পরাজয় দেখে স্বর্গের দেবতারা কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন, তাই ভাবছি। তুমি আকাশের দেবতাদের আহ্বান কর না একবার!

পদ্মা : আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যও চেয়েছি, নির্ঝরিণী। দেবরাজ তাঁর মেঘ-রথে চড়ে দেখেও গেছেন সব। তিনিও যে যন্ত্রপতির এই অতি বিপুল স্থূলকায় দেখে বিস্মিত–হয়ত বা ভীতও হয়েছেন। আমার মরাল-দূতী এই সেদিন ফিরে এসেছে। তিনি বলেছেন, এর জন্য তাঁকে বড় রকম প্রস্তুত হতে হবে। পরাজয়ের লজ্জাকে তাঁর অতিমাত্রায় ভয়!

তটিনী : কিন্তু মা, অসুরের হাতে দেবরাজের পরাজয় ত বহুবারই হয়ে গেছে।

পদ্মা : বারে বারে পরাজিত হয়েই ত তাঁর এত ভয়, তটিনী! তাঁর পরাজয়ের পথ অনুসরণ করে যদি অসুরের দল আবার স্বর্গ আক্রমণ করে!

[হঠাৎ ঊর্ধ্বে মেঘের দামামা-ধ্বনি শোনা গেল। পদ্মাদেবী উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন]

পবন : (হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া) দেবী! স্বর্গে দামামা বেজে উঠেছে। আমার অগ্রজ দেবরাজ সেনাপতি ঝঞ্ঝা তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে পড়লেন বলে। আদেশ দিন দেবী, আমি আমাদের সৈন্য-সামন্তদের প্রস্তুত হতে বলি।

পদ্মা : (উত্তেজনায় দণ্ডায়মান হইয়া) তুমি প্রস্তুত হও সেনাপতি! এখনি তরঙ্গ-সেনাদলকে কূলে কূলে দামামা-ধ্বনি করতে বল। সকলে যেন তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকে। আমি দেবরাজ সেনাপতিকে অভ্যর্থনা করে আনি। জয় মা ভবানী! (পদ্মা শ্বেত-মরালীর ডানায় চড়িয়া ঊর্ধ্বে উড়িয়া গেলেন। তরঙ্গ-সেনা, হাঙ্গর, কুমির, মীনদল, জলদেবীগণ অতি ব্যস্ততা-সহকারে বাহির হইলা গেল। পশ্চিম গগন অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণমেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে মেঘ সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ঊর্ধ্বে ভীষণ শনশন শব্দে ঝঞ্ঝা আসিয়া উপস্থিত হইল। পদ্মার জল সম্ভ্রমে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যেন দেবরাজ সেনাপতিকে অভি-বন্দনা জ্ঞাপন করিল।)

[ঝঞ্ঝার উচ্ছৃঙ্খল ঝামর-কেশ। ত্রস্ত স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া ধরায় লুটাইয়া পড়িতেছে। হস্তে ধূলি-গৌরিক পতাকা। কর-খর্পরে ধূমায়িত অগ্নি। বক্ষদেশে বিদ্যুতের যজ্ঞোপবীত। চরণে খর-ধ্বনি নূপুর। নয়নে বজ্রাগ্নি-জ্বালা। বাহুতে ছিন্ন শৃঙ্খল দিগন্ত-ছাওয়া কুটিল-ভ্রূমর ভঙ্গি। নিযুত বাসুকি কোটি ফণা বিস্তার করিয়া ছত্র ধরিয়াছে। তাহাদের নিঃশ্বাসের শব্দে স্বর্গ-মর্ত্য শিহরিয়া উঠিতেছে।–যেন দ্বিতীয় প্রলয়ের শঙ্কর]

অন্তরীক্ষে গান

হর হর শঙ্কর! জয় শিব শঙ্কর!
দানব-সন্ত্রাস জয় প্রলয়ঙ্কর!
জয় শিব শঙ্কর ॥

নিপীড়িত জন-মন-মন্থন দেবতা!
আন অভয়ঙ্কর স্বর্গের বারতা!
জাগো মৃত্যুঞ্জয় সংঘাত-সংহর।
জয় শিব শঙ্কর ॥

এস উৎপীড়িতের রোদনের বোধনে
বজ্রাগ্নির দাহ লয়ে রোজ-নয়নে।

ভীম কৃপাণে লয়ে মৃত্যুর দণ্ড
দৈত্যারি-বেশে এস উন্মাদ চণ্ড,
ধ্বংস-প্রতীক মরু-শ্মশান-সঞ্চর!
জয় শিব শঙ্কর ॥

[ঊর্ধ্বে ঝঞ্ঝা, পদ্মা, বজ্রশিখা, মেঘ, পবন। নিম্নে তরঙ্গ-সেনা, সেতু, জলদেবীগণ, মীনকুমারিগণ, ভারবাহী পশু ও মানুষ, পীড়িত মানবাত্মা।]

ভারবাহী মানুষ : (অন্তরীক্ষে লক্ষ্য করিয়া) জাগো দেবতা! আর এ ভার বইতে পারিনে। যন্ত্র-রাজা আমাদের ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে আমাদের সর্বস্ব হরণ করেছে। আমাদের আত্মাকে হত্যা করে আমাদের পশু করে তুলেছে। আমাদের পিঠ হয়েছে কুজ, আমাদের দেহ হয়েছে রোগ-জীর্ণ, খর্ব। আমাদের কর্তব্য হয়েছে ওদের ভার বহন। জাগো দেবতা, জাগো!

ভারবাহী পশু : জাগো রুদ্র জাগো! নিপীড়িত কুলিরও অধম হয়েছি আমরা। যন্ত্ররাজের পশুত্ব আমাদেরও নিচে গিয়ে পৌঁছেছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগত-প্রাণ আমরা। আমরা দিবসে হই তার ভারবাহী, নিশীথে হই ক্ষুধার আহার্য। জাগো রুদ্র, এই অপমৃত্যুর হাত হতে আমাদের রক্ষা কর!

পদ্মা : ঐ শোনো, শোনো দেবরাজ-সেনাপতি! নিম্নে পীড়িত মানবাত্মা, ভারবাহী পশুর ক্রন্দন-ধ্বনি। আমারই কূলে ওরা ওদের শান্ত নীড় রচনা করেছিল। যন্ত্রপতি ওদের ধরে আমারই সর্বনাশ করিয়েছে। হানো তোমার বজ্রাঘাত, আর আমি সইতে পারিনে!

ঝঞ্ঝা : মাভৈঃ! ভয় নাই দেবী। যন্ত্ররাজের পাপের ভারা পূর্ণ হয়েছে। ওকে আরও অগ্রসর হতে দিতে দিলে আমাদের স্বর্গের সদর-দ্বারে গিয়ে সে হানা দিবে। আমি বিধাতার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছি। (বজ্রকে দেখাইয়া) ঐ দেখ তার মৃত্যুদণ্ড—জ্বলন্ত অগ্নি-শিখায় লিখা!— পবন! মেঘরাজ!— তরঙ্গসেনা!— বন্যাধারা! সকলে প্রস্তুত ত?

[ঊর্ধ্বে ও নিম্নে সমবেত কণ্ঠের বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সেতু-বন্ধ কাঁপিয়া উঠিল।]

এইবার আমাদের প্রলয়-নাচের পালা শুরু হোক। ...দেবী! তুমি নিম্নে গিয়ে তোমার তরঙ্গ-সেনা বন্যাধারাকে পরিচালিত কর।...পবন! তুমি তোমার পরিপূর্ণ গতিবেগ নিয়ে সেতু-বন্ধের ঊর্ধ্বদেশ আক্রমণ কর। বন্যা-ধারাকে, তরঙ্গ-সেনাদলের পশ্চাতে থেকে শক্তি দাও, সাহস দাও, পরিচালিত কর, ওদের মাঝে আরো আরো গতিবেগ সঞ্চারিত কর। মেঘ! তুমি সাগর শূন্য করে সকল গিরি-শির রিক্ত করে জলধারা বর্ষণ কর! তরঙ্গ-সেনা তোমার শক্তিতে, অধীর উন্মাদনায় উন্মত্ত ফেনায়মান হয়ে উঠুক!... বজ্রশিখা! তুমি তোমার অগ্নিদণ্ড নিয়ে সেতু-বন্ধের শিরোদেশে, পদমূলে আঘাতের পর আঘাত কর।–ধরণীধর বাসুকীকে খবর দাও, সে তার ফণা আস্ফালন করে ধরণীকে কাঁপিয়ে তুলুক। ভেঙে ফেলুক ঐ অসুরের দম্ভ সেতু-বন্ধ!

[ঊর্ধ্বে নিম্নে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল–"জয় গন্ধর্ব-লোকের জয়! জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়! জয় মা ভবানী! জয় শঙ্কর!... পৃথিবী টলমল করিয়া উঠিল। ঘন ঘন বজ্রপাত ও অবিরল ধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পদ্মার ঢেউ ভীম নর্তনে দুই কূল প্লাবিয়া তুলিল। তরঙ্গ-সেনাদলের গিরি-মাটি-রাঙা উত্তরীয় পবন-বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। জলদেবীগণ, মীনকুমারিগণ, হাঙ্গর, কুমির সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিল সকলে সেতুবন্ধে আঘাত করিতে লাগিল। ক্রমে শত শত ভারবাহী মানুষ ও পশুর দল হাতুড়ি শাবল গাঁইতি এবং শৃঙ্গ লইয়া সেতু-বন্ধকে আক্রমণ করিল। সেতুবন্ধ কাঁপিয়া উঠিল।]

সেতু : জয়, যন্ত্ররাজের জয়! সাবধান স্বর্গ-বিলাসীর দল! ও-আঘাত আমার অচেনা নয়। বহুবার ওর শক্তি পরীক্ষা করেছি। (হঠাৎ বজ্রাঘাতে টল্‌মলায়মান হইয়া) উঃ! যন্ত্ররাজ! পারিনে। দেবতাই বুঝি জয়ী হল।

(বাষ্পরথে সসৈন্যে যন্ত্ররাজের আগমন)

যন্ত্ররাজ : জাগো যন্ত্ররাজ-সেনা, জাগো! আজ স্বর্গের চক্রান্তকে চিরদিনের মত ব্যর্থ করতে চাই। আজকার জয় দিয়ে স্বর্গরাজ্য জয়ের কল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে হবে। জাগো যন্ত্রী, জাগো সেনাদল!

[ইট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি যন্ত্ররাজ সেনার ও সেনাপতি যন্ত্রের ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।...দেবাসুরের ভীষণ রণ-কোলাহল ক্লেদে ধরণী আকাশ পঙ্কিল ধূম্রাক্ত হইয়া উঠিল।]

ঝঞ্ঝা : কোথায় নিশিত পাশুপতাস্ত্র! জাগো! দেবতার উদ্যত দণ্ড হয়ে যন্ত্র-রাজের বক্ষ ভেদ কর। সাবাস্! (পাশুপতাস্ত্র নিক্ষেপ ও যন্ত্ররাজের পতন। সঙ্গে সঙ্গে সেতুবন্ধও ভীষণ শব্দে পদ্মা-গর্ভে নিপতিত হইল।)

পদ্মা : জয় মা ভবানী। জয় দেব-শক্তির! গন্ধর্ব-লোকের জয়! (যন্ত্র-রাজের বুকে ত্রিশূল হানিয়া) আজ হতে মর্ত্যে পশুর রাজত্বের অবসান হল। [যন্ত্ররাজের বিকট আর্তনাদে আকাশ যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল]

ঝঞ্ঝা : জয় দেবরাজ ইন্দ্রের! জয় মন্দাকিনী-সূতা পদ্মাদেবীর! আজ গন্ধর্ব-লোকের সাথে স্বর্গও অসুর-ত্রাস থেকে মুক্ত হল। জয় শিব শঙ্কর!

[তরঙ্গ-সেনাদল দলে দলে আসিয়া পতিত সেতু-বন্ধের উপর পড়িয়া তাহাকে গ্রাস করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিপুল সেতু-বন্ধ পদ্মা-গর্ভে লীন হইল। উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ-দল গগন-চুম্বন-প্রয়াসী হইয়া উঠিল।...দেখিতে দেখিতে মেঘ কাটিয়া গিয়া পূর্ব গগন রাস-রঙ্গা রামধনু-শোভিত হইয়া উঠিল। অস্তপাট সোনার গোধূলি-রঙে রাঙিয়া উঠিল। সূর্যদেব সহস্র কর বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে আশির্বাদ করিলেন। পদ্মা তরঙ্গ-শিরে একরাশ ছিন্ন শতদল হইয়া স্বর্গের পানে তুলিয়া ধরিলেন, ঝঞ্ঝার ধূর্জটি-কেশে পরাইয়া দিলেন। দূর মেঘ-লোকে বিজয়-দামামা-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।]

যন্ত্র : (মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে) আমার মৃত্যু নাই। দেবী! আজ তোমারই জয় হল। দেবতার মত দানবও বলে,–"সম্ভবামি যুগে যুগে।" আমি আবার নতুন দেহ নিয়ে আসব। আবার তোমার বুকের ওপর দিয়ে আমার স্বর্গজয়ের সেতু নির্মিত হবে।

পদ্মা : জানি যন্ত্ররাজ! তুমি বারেবারে আস্‌বে, কিন্তু প্রতিবারেই তোমায় এমনি লাঞ্ছনার মৃত্যু-দণ্ড নিয়ে ফিরে যেতে হবে!

[যবনিকা]

The Bridge

Characters:

- **Megh (Cloud):** A divine figure representing rain and the sky.
- **Bṛṣṭidhārā (Raindrops):** A group of young female dancers.
- **Yantrapati (Machine-Lord):** The main antagonist, representing industrialization and destruction.
- **Yantra (Machine):** Yantrapati's general.
- **Iṭa (Brick), Kāṭha (Wood), Pāthara (Stone), Lohā (Iron):** The soldiers of Yantrapati's army.
- **Padmā (River Padma):** A river deity, representing nature and life.
- **Jaladebī (Water Nymphs):** Attendants of Padmā.
- **Matsyakumārī (Mermaid), Hāṅgara (Shark), Kumīra (Crocodile):** Padmā's soldiers.
- **Jhañjhā (Storm):** The general of the divine army.
- **Pabana (Wind):** A divine figure.
- **Brajraśikhā (Lightning-bolt):** A divine figure.
- **Plābanā (Flood):** A divine figure.
- **Bhārābāhī Paśu (Beasts of Burden) and Mānuṣa (Humans):** The oppressed masses.
- **Mīnākumārī (Mermaids):** Padmā's attendants.

Act One
Scene One: The Cloud-World

[Megh enters, playing an mridanga drum. Megh has a body smeared in blue-black pigment, and unruly, cascading hair that covers his shoulders. A peacock feather crown is tied with a pale blue ribbon. On his forehead, a lamp the color of fire-red

sandalwood glows like a thunderbolt. His tranquil eyes are adorned with thick *kohl* that shimmers, as if on the verge of tears. Around his neck, a deep-sounding *mridanga* is tied with a yellow-ochre *rakhi* thread. He wears a loose tunic and pants, the color of slate drawn with a pencil. On his wrists are raw gold bangles. As he pauses his drumming, his arms are raised, and the golden bangles flash like lightning. A seven-colored rainbow-shaped water-bow stretches across his back. A single, smooth, deep-voiced melody drifts from space. Megh dances and plays the drum in time with the song.]

Song:

The thunder roars in the deep sky,
Shiva dances a beautiful, spontaneous dance.
In the whirlpools of his dance,
The ocean rushes to the courtyard of the sky.
Striking the sky with a trident,
Proclaim a new message,
The souls of creatures tremble with fear.
Be pleased, O *Shambhu*!
His moon-like forehead sways and falls into his matted hair,
From the shock of that moon, lightning flashes.
The damsels of the directions cover their faces with blue *kohl*,
The pure night faints in fear.
The path-lost *chataki* bird weeps endlessly,
Praying for a stream of water,
The earth is without support.

[While the song is being sung, a group of dancing maidens in the guise of *Bṛṣṭidhārā* (Raindrops) enters. They are dressed in cloud-colored blouses and paddy-colored skirts with *zari* borders. A light scarf of blue fabric with white stripes is draped over them. They wear ankle bells on their feet and anklets on some. Their soles are stained with green *alta*. Their arms are full of gold-colored silk bangles, bracelets, and armlets. They wear a crescent-shaped waist chain made of dots of *kadam* flowers. They have garlands of jasmine and chameli around their necks. A thin line of *kohl* is on the edges of their eyelids. Their cheeks are pale with *ketaki* pollen. Their two eyebrows are lost in their graceful

forelocks. On the arch of their brows is a tiny *bindi* like a green bug. *Shirish* flowers are behind their ears. Some have a long braid, and some have loose tresses. The braided maidens walk slowly and gracefully, lost in thought. The loose-haired maidens dance around, embracing each other and spinning. In one corner, a maiden clutches a pile of *ketaki* flowers to her chest and stares blankly, her legs outstretched. In time with the dance-song of the *Bṛṣṭidhārā*, heaps of jasmine, *chameli*, *beli*, *bakul*, *dopati*, and *tagar* flowers fall from the sky. Megh's drumming and dancing continue in rhythm with that song.]

***Bṛṣṭidhārā's* Song:**

A deep roar sounds in the restless sky, the *mridangam* rings.
Jingling anklets sound on our feet today,
We are excited.
With loose hair, we walk on the forest path, my friend,
Like wild swans weeping on the sandbars of a dry river.
Pouring out our pitchers,
Give us your compassion,
Lowering our veils, splashing water,
We are drenching the clouds in the evening.
The date palms clap their hands, the peacocks gesture;
The earth has made a seat in the fields of new paddy.
Jasmine bows down and falls in its buds, expressing its longing,
The burning, sandalwood-colored parrot calls from a dull branch.
With *kohl*-lined eyes, the lover
Looks through the lattice,
Come, my friend, let's go,
To the Cloud-Lord's dance.

[The names of the maidens of *Bṛṣṭidhara*: Reba, *Chitra*, *Kanka*, *Churni*, *Manju*, *Neera*, *Nipa*, *Krishna*, *Champa*, *Ashru*, *Manda*.]

Megh: O, dancing maiden-troop! Has the prayer of the thirsty earth finally reached your court? The beaks of the chataki birds are becoming parched from begging for your compassion!

Mandā: (The dreamy maiden who was sitting clutching the pile of *ketaki* flowers) you are right, O King. My sisters never finish putting on their ankle bells. They rub kohl until their eyes fill with

tears, but still, they never finish applying it! I have been sitting here since morning in this ketaki grove, waiting. (While braiding her hair) I haven't even had a moment to braid my hair!

Reba: Oh, there's always such a rush! We say, let the drummer of Nataraja first play, let the lightning signal first—but no—water without the cloud's wish! You've gone out for a stroll before dawn! Once in the tamarind grove, once on the kadam branch, once in the sal groves at the foot of the hill, once in the snake-village of the ketaki forest—

Mandā: And how are you any less, Reba-didi? You keep tying your ghunghrus (ankle bells)! Poor Jill is exhausted from playing the melody since evening! You keep loosening your hair! How many lightning ribbons were torn—how many lives of lodh flowers were lost to provide pollen to redden your cheeks!

Bindu: You be quiet, Manda! O King, why did your mridanga play at this unusual hour today! We were all sleeping, some on a swing of the ocean, some on a mountain peak, when we suddenly woke up to see Kiranmala (a sunbeam) arrive with a gust of easterly wind, a nipa branch in her hand.

Megh: You must embark on a campaign, Bindu.

All of *Bṛṣṭidhara*: Embark on a campaign? Against whom this time, King? Which demon city will be broken now?

Megh: Padmadevi of Gandharvaloka has remembered us. A conspiracy of ferocious machinery is at work to build a dam on her chest. Padmā will not endure this insult. She seeks our help.

Chitra: Oh my, what will happen? The audacity of the machines is not small! We've seen their kingdom gradually expand from west to east with a wild hunger—but to think they would dare to insult Padma as well—this news is not just new, King, it's astonishing.

Kankā: This overly arrogant one must be given an enormous punishment, King!

Churni: So, your divine thunderbolt is sharpened, your general is the Wind, and his army of death, the floods, storms, and tempests—are they all ready, King?

Manju: Yes, of course, they are all ready! Oh, Churni, the King's hard thunderbolt now shines as a soft necklace on the neck of the beautiful Vidyullatā (lightning-creeper). Tell me, King, did you break your thunderbolt and finally make it into a necklace for your beloved? Oh, my fate! Like master, like general! The general Pabana-deva is over there, loitering in the palace of the flower-maidens! A puff of air in the ear of the Malati flower, a tickle on the cheek of the Mallika, a tiny kiss on the eyelashes of the Kamini, a tug on the lotus's hair-bun—these are the heroic deeds of our brave man! A worthy general for a worthy king!

Megh: (Laughing) is it true that Kamadeva (the god of love) has stolen my general's bow and arrow? Manju! And my thunder-fire is hidden (tapping Manju's cheek lightly with his finger) in those dark corners of your eyes!

Neera: Well then, King, why do you need to leave the Himalayas for this campaign? Why don't we just go alone and see if the king of machines gets burned by the fire in these eyes or not!

Megh: Don't do such a thing, Neera, don't! The more that unfortunate one burns, the purer he will become, and the more his power will increase. Your eye-fire will not melt his hard heart, Neera! How many tears have continuously fallen from the melting, endless sky onto his burning forehead, yet that restless demon-child has not found peace. You cannot do anything to him by burning him; fire is his life. He must be broken and swept away.

Nipa: If we can carry you away on our paths, King, will we not be able to do the same to that demon?

Krishna: Oh, Nipa, our King is a god—a heavenly being, so it's not difficult to carry him away on a light breeze, but that one is a demon, and that is why he is so heavy! In fear of being swept away, he is closing his eyes and ears and clinging to the earth!

That is why he is so stubborn. It will not be so easy to wash him away!

Ashru: You've said it exactly right, Krishna! Flowers are beautiful, which is why they fall with a slight touch and fly away with a little puff of wind! But that demon is ugly, which is why he is a burden, and his seat is unwavering. If you hit your head at his feet, only your forehead will be bruised, his seat will not move even a bit!

Megh: This logic of gods and demons is eternal, Ashru! That magical demon has attacked our heaven a thousand times in a thousand forms, and each time, we have thwarted their attacks. Our only fear is that they are very cunning! There is no telling through which crack they will enter our heavenly city. The touch of their silver staff has turned many beautiful cities into stone cities. That staff, if it touches someone, will turn them into a lifeless object. That silver staff knows magic! If they can once touch this heaven with it, then all its joy will turn to stone in an instant, and its parijat garlands will wither away!

Ashru: So what is to be done, King? What if it touches our city of joy? Why don't you build a very huge wall around our heaven?

Megh: Oh, my! Will we be saved then? They want exactly that! That's why they are constantly enraging us. If we build a wall, it will unleash their beastly nature of breaking things. If we put up some kind of barrier, they will use it as a foothold to climb into heaven. Because they don't have a foothold, they are returning disappointed from the middle of the path, unable to find the boundary of this heavenly world.

Champā: But King, Gandharvaloka wants to repel their attack by building a wall.

Megh: They are fools, that's why look at the misery that has befallen them today! The path of the king of machines, which could not rise above the earth, has been brought to the gates of heaven by Gandharvaloka's wall! Using that wall as a support, they have come upon them in droves, like a plague!

Manda: King, what if they come to heaven this time?

Megh: Have no fear, Manda! The ten directions of our secret city are open. That is why they are lost and cannot find their way. The enemy's complete fury falls on closed-door forts. There is no greater foolishness than inviting the enemy with a barrier. Look down and see the monstrous army of machines—brick, wood, stone, iron, lime, surki, dust, and sand! Their number cannot be counted—just heaps and heaps! My heart feels suffocated! They are all lifeless! Because they are so lifeless, they do not hesitate to kill the lives of others! Look how they have overrun their land by holding on to the wall of Gandharvaloka—like an epidemic! If Gandharvaloka had not provided this convenience, that sin would have remained face down in the darkness below.

Chitra: But King, what is the reason to be so afraid of the machine-king's bridge? The rescue of Sita happened with a bridge like that!

Megh: It was a rescue indeed, Chitra! For the sin of stepping on that bridge, even when she was burned by fire, Sita's stigma did not burn away—in the end, she had to enter the underworld to find salvation.

Reba: I understand, King, the best way for our heavenly city to protect itself is to remain free from all ties and bonds!

Manda: Well, King, what is the purpose of this bridge of the machine-kingdom?

Megh: This Bridge will not rescue the Sita of the underworld, Manda; it wants to capture the goddess of heaven. That bridge is a trespassing-staircase to enter heaven. He wants to pull the heavenly goddess by her hair with an iron armor on that bridge—that is why his black banner is so erect!

Krishna: Then he will have to be beaten like Dusshasana, King!

Megh: You're right, Krishna, that day is about to come. Now, let's go to the despair-dry shore of Padmadevi. We will see the preparations of the machines and then inform our general, Pabana-deva. Let him rest in the flower palace until then.

[Megh and the Bṛṣṭidhārā exit, dancing and singing.]

Song:
Becoming a necklace of a thousand stars,
I swing on the neck of the sky's lute.
I hang swings on the tamal branches,
And make the peacocks dance under the kadam trees.
When the bird says "Bou Kotha Kou" (Bride, speak),
And calls out,
I step on the pain in my heart,
And descend in the tears of the bride.
I make the harsh eye of the terrible one
Compassionate with my tears,
I wring and wring out the blue sari
Of the sky-bride.
I fall on the sandbars of the river,
I lovingly go to the bride's house,
On the stone slabs of the bathing ghat,
I fall by the touch of her feet.

Act Two

Scene Two: The Court of the Machines

[*Yantrapati* is seated on a huge iron stage, a colossal figure. The dark-black curtain behind him shows one frightening, blood-red building after another—devoid of any living beings, trees, or creepers. A huge, ominous, wide-winged vulture is perched high above, looking down with a fearsome gaze. The hard face of *Yantrapati* is bathed in a red light, making him look even more terrible. He has an iron crown on his head. The gem of the crown is an electric torch. An iron mesh armor covers his entire body. In his right hand is a thick iron rod. A long chain is held in his left hand, and tied to it are a hungry-eyed lion, a ferocious tiger with sharpened claws, a bear, and a crooked-hooded snake, all lying asleep at his feet. On the top of the palace, a black flag with "Equality, Friendship, Freedom" is crossed out and "Hatred, Exploitation, Oppression" is written below it. The *Yantra* is colossal, crude, and blind. It has large claws and teeth. In its right hand is a grinding machine, and in its left, a huge cigar, from which it continuously exhales its condensed smoke like a

vagabond. It has a long chimney-like hat on its head. A giant wheel is on its back, and it also spins around with the wheel. Bricks, Wood, and Stone appear to be drowsy, as if intoxicated. Only the shiny, hard gaze of Iron is visible. Brick is wearing a red and white checkered shirt and loose Arab-style pants. He has a square red hat on his head, a short stature, and a lazy gaze, with a face smeared in a cement-like color. He wears square boots on his feet. Wood is tall and thin with a rough, coarse cloth. He has a prickly beard, a dried-out face, and a bare head. His eyes are dull, and his nails and hair are long. Stone's face, eyes, and clothes are the color of dust. He is stout and clumsy, somewhat like a turtle. He seems to have only a belly and a head. A black, chaotic turban is on his head. His hands and feet are heavy. His face is flat, and his eyes are small. Iron is tall, pitch-black, and robust. He has a hard gaze and a clenched fist, with a bitter voice. He wears tight-fitting clothes. Yantra, Brick, Wood, Stone, and Iron are singing a hymn with folded hands.]

Song:

We bow to you, O *Yantrapati*, we bow, O restless one.
The earth is terrified by your craft, creation is lost on its path.
The world has become material
By your spell,
And you have swallowed the great darkness
Of heavenly joy.
O Shankar, for which Sati's sorrow have you become so brutal
And seated yourself in meditation, becoming an inert being, practicing this destruction?
Everything has dried up in the fire of your rough gaze,
The aeons are tortured by your terrible wheel's strike.

Yantra: Our path is no longer advancing, King, ahead is the swift-flowing Padma—like the forbidden decree of heaven.

Yantrapati: Tell her to slow her pace.

Yantra: I know, King, many rivers have obeyed your command, but Padma is their queen!

Yantrapati: You are forgetting, general, that I am also an emperor. Tell her—this is my command!

Yantra: The Mandakini that once swept away Indraraj's Airavata (elephant) like a blade of grass—this is her elder daughter. The earth trembles at the roar and doomsday dance of her wave-soldiers!

Yantrapati: The earth may tremble—not I. Deliver her the message—my path will be prepared over her chest!

Yantra: She has heard that message, King. Even her wave-soldiers mock us by spitting foam upon hearing this news.

Iṭa: It feels as though she's spitting on us to insult us!

Yantra: Oh, you shut up! King, you must lead this campaign yourself!

Yantrapati: Have you become afraid, general, seeing her sharks and crocodiles?

Yantra: No, King, my fear is not of something hard; my fear is of her liquid wave-soldiers. If they were to bite, I would have nothing to fear, but they don't bite—they just keep pushing! When you try to catch them, they melt and slip through your fingers!

Pathara: Yes, sir, this one is like a Manasa (a river deity), and then there's the smell of that Pabana fellow! When he comes to join in, he makes even this big Kabuli body of mine dance a Turkish dance!

Iṭa: Yes, sir, and he grinds me into surki powder!

Kaṭh: My condition is even worse! He grabs me by the ear and makes me take a nose dive, and when he gives me a hard push, people on both sides say, "A dead body is floating away!"

Lohā: (Proudly) I'd rather tie a pot around my neck and drown than float away or break like them!

Pathar: Yes, that's why he gives your face a twisted look like an iron nail with a cold chisel—and then he buries you alive by covering you well with sand!

Yantra: Be quiet, all of you! You must resist her with your combined strength—whoever goes alone will be left to drift helplessly in the deep water!

Kaṭh: If we have to float, we will all have to, General, but this time we will all float together—that's the only comfort! Oh my god, when I think of the appearance of Padma that I saw, I still turn into wood! The current is not a current—it's as if millions of anacondas are hissing on the mountains—twisting and turning. And then the crocodiles are like date-palm mill-stones! (Looking the other way) But the faces of the sharks are just like our general's!

Yantra: Look, you are very light-hearted. The King is getting angry at your weakness.

Yantrapati: General, I am leaving now. You all get ready—Padma must be disciplined. [Exits]

Pathar: Well, General, why is the King so angry with that river? Is it not possible not to dam her? Can't we just get past her? That would have been great! We would catch the fish without touching the water. Then we would see how much her wave-soldiers could leap! If we all stood hand in hand, I think we could just gently step over her.

Yantra: Leave the burden of that thought to me. Just do as I tell you now. Our Yantrapati wants to conquer heaven; the obstacle in the path of his machine-chariot is that huge stream—it's like the moat of heaven. Its waves are like the border guards of heaven. If we can conquer her, the conquest of heaven will become easy.

Ita: We have already captured the Saraswati (goddess of knowledge) of heaven, General; we have used the strings of her veena for our wireless machine—we have turned her lotus forest into a wood warehouse! What is left in heaven?

***Yantra*:** (To Pāthara) Look, I used to think of you as heavy and dignified—I see you've also been touched by the light-heartedness of wood! (To Kāṭha) Look, there's one advantage to your lightness. The waves cannot drown you easily. You will float and end up on a shore somewhere.

***Pathar*:** Yes, but if I drown, it will be a complete drowning!

***Yantra*:** Ah, be quiet! (To Kāṭha) Look, you must become a boat and go see—where Padma's wave-soldiers are indifferent, and where her speed is slow.

***Loha*:** Well, General, will you capture Padma?

***Yantra*:** No. We cannot, and even if we could, we would not. We don't want Padma—we want the heavenly goddess. The water of this stream is the lifeblood of that heaven. If we completely stop its flow instead of controlling its speed, we might lose the very heavenly goddess for whom this campaign is being waged—and we will get the Sati of Daksha Yajna instead. Our royal minister Kautilya will not let that happen.

***Kaṭh*:** General, I have never seen the minister Kautilya.

***Yantra*:** The most valuable thing must be kept the most secret. Minister Kautilya is the protective shield of our kingdom. All of us, even the King, are the direct manifestations of that Kautilya's existence.

***Pathar*:** You are right, General. A bad intellect, the one who is, remains beyond sight. It is a futile hope to try to see a conspiracy!

***Iṭa*:** I feel the same way, General. No matter who created this world, or who its owner is, it is run by the devil!

***Yantra*:** Hey, I'm smelling a hint of treason in your conversations! Do you know what the punishment is for discussing the faults and shortcomings of the king and God?

***Kaṭha*:** Jail or hell. Look at me, it says; look at me, it says!

***Yantra*:** Hey! Be quiet! Be quiet! The King is coming, if he hears this, you won't be saved.

***Yantrapati*:** General! You will set out for the banks of the Padma today with your army. I will take charge of the army myself. (To Brick, Wood, Stone, and Iron) My dear soldiers! This vast empire of mine is built on your self-sacrifice. Whatever its glory, whatever its establishment—it is all yours. This war of ours is the eternal war between heaven and earth. This war is of the inert and the living, of matter and life, of death and the conqueror of death. We have no right to immortality, so we want to make immortality

bitter. With the anguish of the great inertia, we want to pollute the joy of the gods. We have subjugated nature—now it's time to conquer the heavenly kingdom. The main obstacle in our path is that free-flowing river—the secret lifeblood of the world of joy. We will not dam her—we will draw the mark of our passage over her chest. The goddess of joy will serve this material world—you, the brave ones, put the bright mark of this arrogance on the humiliated forehead of this mortal world! Establish this arrogant flag of pride on the chest of heaven, O heroes!

All: Victory to Yantrapati! Victory to Yantrapati!

***Yantra*:** Soldiers, sing our marching song for the journey!

Song:
We step with the rhythm of death,
And we crush life.
We make the earth of the mortal world glorious,
And make heaven dull.
With the ashes of the funeral pyre on our bodies,
We shame the giver of food,
We have bound the lightning,
The king of the gods is humbled.
We dig through the underworld and make it intoxicated,
On our way to Rasatala (the bottomless pit).

Act Three
Scene Three: The Banks of the Padma

[Padma is seated on a throne, carried by a crocodile. She is wearing a sari of water-waves, and a scarf of raw sunlight shimmers on her. Akas-bush fans her. Sharks and crocodiles act as guards on the beach. White curtains of sand are hung on both banks. Countless fish-soldiers are walking around the throne. Water nymphs are singing a hymn.]

Song:
We bow, we bow, and we bow to the daughter of the snowy mountain,
The daughter of the gods' minds.

You have descended from heaven to the dust,
And made the mortal world blessed.
You fall with a fierce rhythm,
Crushing stones with your terrible waves,
The earth trembles at the breaking of your brow,
You are a crooked, serpent-like flood.
On your banks, your daughter, Kamalā,
Smiles in the crops and flowers, the unmoving earth,
And the green-robed earth, without a forest, worships your feet.

[The names of the water nymphs: Tarangini, Salilā, Anilā, Taṭinī, Nirjharinī, Bālukā.]

Padma: Stop this song, Tarangini. This hymn of praise pierces me like a mockery today!

Tarangini: I know, Mother, how immense your pain is. But are we unable to punish this audacity of the machines, Mother?

Padma: For now, it seems so, Tarangini. How many obstacles did I not put up? The countless soldiers of the machines still lie on the sandbanks below, creating their graves, yet I could not stop them. He made his arrogant path over my chest. (Pointing a finger at the bridge that was visible in the distance) Have you seen his bridge? It seems to be climbing on my head and mocking me! It is unbearable, Tarangini, this insult is unbearable!

Salilā: How cunning that Yantrapati is, Mother! A coward—he has built his path beyond our reach, fearing us. If we could get him in the mouth of a wave, we would punish him like the face of his sky-high arrogance!

Bāluka: Then for all this time, his grave would have been in this sandbar.

Padma: Victory in war is not just achieved with strength, Salilā, in a big war, intelligence is more necessary than strength.

Anila: Well, Mother, his path may be beyond our reach, but its foundation is planted on our chest. Can we not uproot that foundation?

Padma: Ask my powerless wave-soldiers that, Anilā. We have failed. The first time—no, many times—we have uprooted that foundation, but we cannot do it anymore. My wave-soldiers no longer have the strength to wash away his enormous weight!

Nirjharini: Well, Mother, we could not do it. But I wonder how the gods of heaven can sit so peacefully seeing this insult—this defeat of ours. Why don't you call upon the gods of the sky once?

Padma: I have asked for help from Indraj (the king of the gods), Nirjharini. The king of the gods has also come and seen everything in his cloud-chariot. He was also astonished, or perhaps even afraid, to see the extreme massiveness of Yantrapati. My wild swan messenger returned just the other day. He said that he has to prepare for this in a big way. He is extremely afraid of the shame of defeat!

Taṭini: But Mother, the king of the gods has been defeated by the demons many times before.

Padma: That is why he is so afraid, Taṭinī! What if the demons attack heaven again, following his path of defeat!

[Suddenly, the sound of a cloud-drum is heard from above. Padmā perks up.]

Pabana: (Arriving, panting) Goddess! The drums have sounded in heaven! My older brother, the god-king Jhañjhā (Storm), is about to arrive with his army. Give the command, Goddess, I will tell our soldiers to get ready.

Padma: (Standing up in excitement) You get ready, General! Tell the wave-soldiers to beat the drums on the shores immediately. Let everyone be ready with their weapons. I will go and welcome the god-king general. Victory to Mother Bhavani! (Padmā flies up on the wings of a white swan. The wave-soldiers, sharks, crocodiles, fish-troops, and water nymphs all exit in great haste. The western sky becomes dark, and a black cloud appears. In a moment, the cloud covers the entire sky. With a terrible rushing sound from above, Jhañjhā arrives. The water of the Padma becomes still with reverence and wonder, as if to salute the god-king general.)

[Jhañjhā's unruly, cascading hair falls from his startled shoulders and touches the ground. In his hand is a flag of dust and red chalk. Smoking fire is in his hand-skull. A sacrificial thread of lightning is on his chest. On his feet are hard-sounding ankle bells. A fire of thunder is in his eyes. On his arms are broken chains, shaped like a crooked archer's bow covering the horizon. Countless Vāsukīs (serpents) hold an umbrella with their expanded hoods. The sky and earth tremble at the sound of their breath—like a second Shiva of the doomsday.]

Song from the Sky:

Hari Hari Shankara! Jai Shiva Shankara!

The terror of the demons, Jai Pralayankara! (The bringer of doomsday)

Jai Shiva Shankara!

O God, who churns the minds of the oppressed people!

Bring the fearless message of heaven!

Awaken, O conqueror of death, the destroyer of conflict!

Jai Shiva Shankara!

Come in the knowledge of the oppressed's cries,

With the fire of the thunderbolt in your daily eyes.

With the terrible sword, holding the staff of death,

Come in the guise of the enemy of the demons, O mad, fierce one,

The symbol of destruction, the wanderer of the desert-cremation ground!

Jai Shiva Shankara!

[Above: *Jhanjha*, Padmā, *Brajrasikha*, Megh, Pabana. Below: Wave-soldiers, the Bridge, Water Nymphs, and Mermaids, Beasts of Burden and Humans, the Oppressed Humanity.]

The Oppressed Humans: (Looking towards the sky) Awaken, O God! We can no longer bear this burden. The machine-king has snatched away everything from us in exchange for our hunger's food. He has killed our souls and turned us into beasts. Our backs

have become humped, our bodies sick and short. Our duty has become to carry their burden. Awaken, O God, awaken!

Beasts of Burden: Awaken, O Rudra, awaken! We have become even lower than the oppressed class. The brutality of the machine-king has reached even below us. We are at the verge of death from hunger and thirst. We are their burden-bearers by day and their prey for hunger at night. Awaken, O Rudra, save us from this unnatural death!

Padma: Listen, listen, O god-king General! Below are the cries of the oppressed human souls and the beasts of burden. They built their peaceful nests on my shores. Yantrapati has captured them and made them destroy me. Strike with your thunderbolt, I can no longer bear this!

***Jhanjha*:** Fear not, Goddess! The burden of Yantrapati's sins is complete. If we allow him to advance further, he will strike at the main gate of our heaven. I have come with the signal of the creator. (Showing the thunderbolt) Look, there is his death-staff—written with a burning flame! Pabana! Meghraj! Wave-soldiers! Flood-streams! Are you all ready?

[A huge cheer of a combined voice from above and below rises. The Bridge trembles.]

Now let the dance of our doomsday begin! Goddess! You go below and lead your wave-soldiers and flood-streams. Pabana! You attack the top of the Bridge with your full speed! Give strength and courage to the flood-streams and wave-soldiers from behind, and infuse more speed into them! Megh! You empty the ocean and all the mountain peaks and pour down streams of water! Let the wave-soldiers become mad, frenzied, and foaming with your power! Brajraśikhā! You take your fire-staff and strike the head and feet of the Bridge again and again! Send a message to Vāsukī, the bearer of the earth, to shake the earth by flaring his hoods! Let that arrogant demon's bridge be broken!

[From above and below, loud cheers of "Victory to Gandharvaloka! Victory to Indraj, the king of the gods! Victory to Mother Bhavani! Jai Shiva Shankara!" start to rise. The earth

trembles. Frequent thunderbolts and continuous rain begin to fall. In a moment, the waves of the Padma rise in a terrible dance and flood both banks. The red, mountain-and-earth colored scarves of the wave-soldiers are lifted by the wind's speed. Water nymphs, mermaids, sharks, and crocodiles all become wild and start striking the Bridge. Gradually, hundreds of oppressed humans and beasts of burden with hammers, crowbars, and horns attack the Bridge. The Bridge trembles.]

The Bridge: Victory to Yantrapati! Be careful, you pleasure-loving group from heaven! This strike is not unknown to me. I have tested its strength many times. (Suddenly trembling from a thunderbolt) Ugh! Yantrapati! I can't. It seems the gods have won.

[*Yantrapati* arrives with his army in a steam-chariot.]

***Yantrapati*:** Awaken, Yantrapati's soldiers, awaken! Today, I want to foil the conspiracy of heaven forever. With today's victory, the idea of conquering the heavenly kingdom must be turned into reality. Awaken, machines, awaken, soldiers!

[Brick, Wood, Stone, etc., and Yantra, the general, start to cheer loudly... The terrible war-cry of the gods and demons makes the earth and sky muddy and smoky.]

***Jhanjha*:** Where is the sharpened divine weapon? Awaken! Become the raised staff of the gods and pierce the chest of the machine-king! Well done! (Throws the divine weapon, and Yantrapati falls. Simultaneously, the Bridge also falls into the chest of the Padma with a terrible sound.)

Padma: Victory to Mother Bhavani! Victory to the power of the gods! Victory to Gandharvaloka! (Striking a trident into the chest of Yantrapati) From today, the reign of the beasts in the mortal world is over! [Yantrapati's enormous cry of agony makes the sky feel as if it is tearing into pieces.]

***Jhanjha*:** Victory to Indraj, the king of the gods! Victory to Padmadevi, the daughter of the Mandakini! Today, along with Gandharvaloka, heaven is also free from the terror of the demons! Jai Shiva Shankara!

[Troops of wave-soldiers come and fall upon the broken Bridge, devouring it. In a moment, the huge Bridge is absorbed into the chest of the Padma. The excited waves rise up as if to kiss the sky... In a moment, the clouds clear, and the eastern sky becomes a rainbow of pleasure and color. The western sky becomes painted with the golden twilight. The Sun God blesses the earth by showering it with a thousand rays. Padma holds up a heap of torn lotuses on her wave-head towards heaven and places it in Jhañjhā's matted hair. The sound of victory-drums is heard from the distant cloud-world.]

***Yantra*:** (In a death-stricken voice) I am not dead, Goddess! Today you have won. Like a demon, a god also says, "I will be born again in every age." I will come again in a new body. Again, my bridge to conquer heaven will be built over your chest.

Padma: I know, Yantra! You will come again and again, but each time, you will have to return with a death-sentence of this very humiliation!

[Curtain]

Translated by Alamgir Mohammad

Appendix
Kazi Nazrul Islam : A Chronology of Life

Sajed Kamal

1899 May 24, Kazi Nazrul Islam born at the village of Churulia in the district of Bardhaman, West Bengal, India. Mother, Zaheda Khatun; father, Kazi Fakir Ahmad, the Imam (the head of a mosque) and the custodian of the Haji Pahlwan's mazar (a Muslim shrine) in his village; brothers, Kazi Shahebjan and Kazi Ali Hussain, and sister, Umme Kulsum (three surviving out of the total of seven sons and two daughters of Fakir Ahmad).

1908 March 20, Nazrul's father dies at the age of 60.

1909 Passes the Muslim lower primary education examination in a maktab (a Muslim primary school).

1910 Discontinues formal schooling due to financial hardship. Earns his livelihood as a teacher at a maktab, muazzin (a caller for prayer at a mosque), and a custodian of the village shrine, etc.

1911 Joins a *leto* group (folk musical troupe) with the encouragement and help from his uncle, Kazi Bazle Karim, a singer-song-writer-composer, himsrlf a *Goda Kobi* (the leading Poet) of his troupe. Bazle Karim wrote in Bengali as well as Urdu and Farsi. Nazrul succeeded him as the *Goda*. Nazrul's talent impressed many others, including the reputed, Sheikh Chokor Ail *Goda Kobi*, who also encouraged him to develop his *leto* career. During his four years or so with *leto* troupes, along with songs, Nazrul also wrote scripts for *leto* dramas, one of his scripts was based on the Bengali epic poem, *Meghnad Badh* (The Slaughter of Meghnad) by Madhusudan Dutt (1824-1873). Most of Nazul's writings for *leto* have been lost.

1911 Studies at Mathrun Nabinchandra Institution (class VI).

1912 Works in the household of a railway guard, in a bakery shop, etc.

1913-14 Meets Kazi Rafizullah, a police sub-inspector, who arranges for Nazrul to study free of charge at Darirampur High School in Mymensingh. Completes class VII, then returns to Churulia.

1915-17 Admitted to Searsol Raj High School in Raniganj, Bardhaman, in class VIII. Kazi Manzoor Hussain, a distant relative, helped making the arrangements for free schooling and accomodation. Studies through class X, until the pre-test examination required prior to the matriculation examination.

At Searsol Raj meets Satish Kanjilal, a teacher with some mastery in classical music, who actively encouraged Nazrul to continue to develop his musical talent.

Also meets Nibaranchandra Ghatak, a teacher and member of an underground revolutionary organization committed to go as far as armed struggle against the British colonial government. Attracted by the thought of utilizing the training later for the freedom movement, Nazrul and his schoolmate Shailajananda Mukhopadhyaya (the latter day reknowned literateur) decide to join the army. They travel to Calcutta. Nazrul passes the recruitment examination, Shailajananda doesn't Nazrul joins the army in the 49th Bangali Paltan. Trained in Nawshera, stationed Karachi.

1919 First publication, *Bounduler Atma-kahini* (Life Story of a Vagabond), a short story, in Saogat magazine, Ist year, 7th issue, in Calcutta, Mohammad Nasiruddin, editor. The first article published, *Turki Mahilar Ghomta Khola* (The Unveiled Face of a Turkish Woman), in Saogat, Ist year, 12th issue.

First poem published, *Mukti* (Freedom), in the *Bangiyo Mussalman Sahitya Patrika* (Bengal Muslim Literary Magazine).

Nazrul Havildar (seargrnt) in the army in Karachi.

1920 Returns to Calcutta, first staying in the same Hostel with Shailajananda Mukhopadhyaya, then in a rented apartment with Comrade Muzaffar Ahmad.

First song published, *Udbodan* (Inauguration), in *Saogat*, 2nd year, 6th issue. April, *Bandhanhara* (Free from Bonds), a novel, begins its serialized publication in *Muslim Bharat* (Muslim India) July, appointed a joint-editor, with Muzaffar Ahmad, of Daily *Navajoog* (The Daily New Age, from the Sanskrit "nava"–new, "yuga"–age or era), founded by A. K. Fazlul Huq.

1921 Goes to Daulatpur in Comilla with Ali Akbar Khan (not to be confused with the present day sarod master).

June 18 married to Syeda Nargis A'sar Khanam, a niece of Ali Akbar khan. Disagreements between Nazrul and Nargis' family on the night of the wedding. Nazrul leaves Daulatpur on June 19, never to see Nargis again.

(Their only correspondence was through letters, one each way, in 1937–Nargis' letter to Nazrul and the latter's reply. Divorce confirmed in 1937. Nargis remarried to Azizul Hakim in 1938.)

October, visits Santiniketan with Mohammad Shahidullah and meets Rabindranath Tagore for the first time.

December, writes *Bidrohi* (The Rebel).

1922 "Bidrohi" published in the January 6th issue of *Saptahik Bijli* (Weekiy Lightning).

"Bidrohi" also published in *Mushim Bharat*.

March, Nazrul's first book, *Byathar Dan* (Offerings of Pain), a collection of short stories, published in Calcutta.

August 11, A bi-weekiy *Dhumketu* (The Comet) premieres, Nazrul is the editor.

September 26, Nazrul's poem, "*Anandamoyeer Agamoney*" (Coming of Goddess Durga), published in *Dhumketu*. October 13, India's complete freedom from the British government. demanded in Dhumketu.

October 13, *Agni Bina* (The Fiery Bina), a collection of poems, published in Calcutta. Proscribed by the government.

October 25, *Jooga Bani* (The Message of the Age), a collection of essays, published in Calcutta. Proscribed by the government.

Novenber 8, a warrant for arrest issued against Nazrul on charges of sedition.

November 23, Nazrul arrested in Comilla.

1923 January 16, Nazrul delivers *Rajbandir Jabanbandi* (Depostiton of a Political Prisoner) in the court of the Chief Presidency Magistrate Swinho, in Calcutta; sentenced to 1 yesr of hard labor imprisonment.

January 27, *Rajbandir Jabanbandi Published* in *Dhumketu*, the final issue, in Calcutta February 22, Rabidranath Tagore dedicates his song-drama, Basanta (Spring) to Nazrul.

Dolan Champa (name of a faintly fragrant monsoon flower), a collection of poems and songs, published in Calcutta.

April–May, Nazrul goes on a hunger strike to protest the mistreatment of political prisoners by the jail authority. Revolutionary, populist novelist and short story writer Sharatchandra Chattopadhaya visit Nazrul in jail, requesting him to end his humger strike. Similar requests form many others, including the liberationist political leader Deshbandhu Chittaranjan Das. Rabindranath Tagore sends Nazrul a telegram from Shilong, "Give up hunger strike, our literature claims you." Nazrul stays on hunger strike for 40 days.

December, Nazrul released from jail.

1924 Married to Pramila (Duli), the only daughter of Giribala Sengupta. The couple settle in Hooghly.

Their first son, Azad Kamal (also named Krishna Muhammad), is born. Azad dies the same year.

Bisher Banshi (The Poison Flute) and *Bhangar Gan* (The Song of Destruction), both collections of songs and poems, published in Calcutta. Both are proscribed.

1925 May, meets Gandhi in the Faridpur Congress. November 10, "The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress" formed. Nazrul announces and publishes the Party pamphlet.

December 16, the premiere issue of *Langal* (The Plough), the Party magazine, contains Nazrul's set of poems on equality.

1926 The family moves to Krishnanagar

Langal's name is changed to *Gono-Bani* (Voice of the People).

May, writes and sings *Kandari Hushiar* (Helmaman Be Aware) for the inaugural song of the Krishnanagar Congress. Their second son, Arindam Khalid (Bulbul), born.

Composes his first ghazal, "*Bulbuli tui phul shakhate dis ne aji dol.*"

1927 February, comes to Dhaka to attend and speak at the annual conference of the *Muslim Sahitya Samaj* (Muslim Literary Society).

Nazrul faces tremendous financial hardship, especially due to non-payment for his writings by several publishers; faces health crisis as well as growing threats and harassment by both the British government and the Hindu and Muslim conservative members of the society; even subjected to physical attacks.

March, *Saogat* sponsors a "variety performance" to benefit Nazrul and his family. Held at Albert Hall in Calcutta, attended by Nazrul.

July, sufia N. Hossain (later Sufia Kamal), a young poet of 16, moved by the news of Nazrul's continual, even worsening, hardship and harassment, appeals "as his [Nazrul's] mother, his sister" in a letter to *Saogat* editor

Mohammad Nasiruddin to come to his rescue, to "tie him with affection."

Nazrul accepts Nasiruddin's offer to join the salaried staff of Saogat, commuting from krishnanagar.

1928 Mother dies.

Two separate editions of *Sanchita* published.

November, Nazrul honored by the *Haragachha Tarun Sanghya* (Haragachha Youth Organization) in Rangpur.

For both financial and health considerations, Nazrul's friends and well-wishers associated with *Saogat* help the family to move to Calcutta. On behalf of family, *Saogat* rents an apartment in the same building until the family moves to Pan Bagan a few months later.

December, Nazrul honored by the Rajshahi Muslim Club in Rajshahi.

Decemer, Nazrul attends the conference of the *Nikhil Bharat Krishak o Sramik Dal* (All India Farmers and Workers Party); sings the inaugural song. December, Nazrul sings the inaugural song at the meeting of the All India Socialist Youth Congress at Calcutta, presided by Pandit Jawaherlal Nehru.

1929 Son, Kazi Sabyasachi, born, January, Nazrul attends the inaugural ceremony of the *Muslim Shiksha Samity* (Muslim Education Association) in Chittagong, honored by several organization Chittagong the same year. including the Bulbul Society. Honored at the annual conference of the Bogra Akkelpur Youngmen's Muslim Association.

December 15, a grand National Civic Reception for Nazrul held at Albert Hall, Calcutta, organized by the *Saogat Sahitya Majlis* (Saogat Literary Society). Acharya Prafulla Chandra Ray, an eminent Bengali scientist, presiding; and Netaji Subhash Chandra Bose, the celebrated political leader and freedom fighter the chief guest.

1930 Son, Kazi Aniruddha, born. *pralayshikha* (The Doomsday Flame) a collection of poems and songs, and *Chandrabindu* (The Nasal Mark), a collection of songs, published in Calcutta; both are proscribed.

May 7, Bulbul dies of smallpox. Even by this early age of three and a half, Bulbul had shown signs of astounding musical talent.

For a period lasting several years in the 30s. Nazrul's career flourishes with a variety of roles, including as a recording artist with gramophone companies, a composer, music director, singer, song and story writer, actor, etc. in films, plays, and radio programs. Nazrul's association with gramophone companies brought him a few years of financial success. It was difficult for Nazrul to get a recording contract because of the British authority who would not allow the recording of his songs on political grounds. Even the admirers of Nazrul were subject to scrutiny. Harendra Dutta sang and recorded a song of Nazrul but kept Nazrul's name out of the label fearing that the british authority of the recording company (His Master's Voice) would not permit the recording. But the recording companies finally gave in to the immense popularity of Nazrul and, sensing profit in it, started offering him contracts.

Nazrul's association with recording companies possibly began during 1928, flourishing during the 30s. Over the years, the recording companies which Nazrul associated with included Megaphone, Hindustan, Senola and His Master's Voice (HMV). The chief trainer of HMV was Ustad Jamiruddin Khan, a reputed master of Hindustani classical and semiclassical music, Nazrul trained under him, and upon Ustad Jamiruddin Khan's death in 1932, succeed him as the chief trainer, in addition to his current position as the chief composer. Nazrul also associated himself closely with many other eminent musicians, including Ustads Kader Bux, Manju Saheb, Dabir Khan,

Mastan Gama, Pandits Jnanendraprasad Goswami and Suresh Chakravarty.

1931 June, travels to Darjeeling, accompanied by Barshabani editor, Jahanara Chowdhury; meets with Tagore.

1932 Presides over the *Sirajganj Bangiyo Muslim Tarun Sammelan* (Sirajganj Bengali Muslim Youth Conference).

1936 Presides over the Faridpur Muslim Students Conference.

1938 Presides over the *Bangiyo Mussalnan Sahitya Sammelan* (Bengali Muslim Literary Conference) in Calcutta.

Pramila Nazrul afflicted with paralysis of the lower half of her body.

Financial crisis re-emerging compounded by Pramila's medical expenses. Nazrul resorts to mortgaging the royalties of his gramophone records and literary works for a mere sum of 4000 rupees.

1940 Assumes the chief editorship of the republished *Nava joog*. Attends the year-end celebration program of Dhaka Radio.

1941 March, presides over the annual conference of Bangaon Sahitya Sabha (Bangaon Literary Society).

April 5 & 6, presides over the Silver Jubilee celebration of the *Bangio Mussalman Sahitya Samiti*; delivers his final address, "*Jodi ar banshi na baje*" (If the flute doesn't play and more).

May 25, Nazrul's 43rd birthday celebrated in Calcutta; Poet Jatindra Mohan Bagchi, presiding.

August 7, Tagore dies in Calcutta. Nazrul reads his poem, "Rabihara" (Loss of Rabi) on All India Radio, Calcutta, soon afterwards.

1942 July 10, while participating in a children's program on All India Radio, Calcutta, Nazrul is struck by the loss of his power of speech. His mental capacities affected. July 19, taken to health retreat Madhupur for a change.

October 7, admitted to Lumbini Park Mental Hospital, Calcutta, for three months. No improvements.

1943 *Nazrul Niramoy Samiti*, a committee to care for Nazrul formed; Shyamaprasad Mukhopadhaya, president.

1945 Calcutta University awards Nazrul the "Jagattarini Gold Medal."

1947 August, the end of British rule in India. India divided into India and Pakistan.

1952 July, the *Nazrul Niramoy Samiti* sends Nazrul and Pramila to an asylum in Ranchi for treatment for four months. No Improvements.

1953 May, the Samiti sends them to London, then to Vienna for treatment. No improvements. Return to Calcutta on December 15.

1960 Awarded the "*Padmabhushan"* title by the Government of India.

1962 June 30, Pramila dies. Buried in Churulia.

1971 March 25, Bangladesh's liberation war against Pakistan's colonial rule begins in the face of planned genocide of the Bengalis.

Decembre 16, the Pakistani military forces surrender to the joint command of the *Bangladesh Mukti Bahini*–the freedom fighters–and the Indian army. Bangladesh assumes its sovereignty.

1972 May 24, Nazrul brought to Bangladesh under a state arrangement, accompanied by Uma Kazi, the wife of his son Kazi Sabyasachi.

1974 Son Kazi Aniruddha dies.

1975 Dhaka University confers an honorary D. Lit. on Nazrul.

1976 Bangladesh citizenship conferred on Nazrul. A warded the "*Ekushe Padak"* by Bangladesh Government. August 29, Sunday, 10 A.M., Nazrul dies in P.G. Hospital in Dhaka. Buried in Dhaka.

Books by Nazrul Islam

1. *Byathar Dan* (Offering of Pain), short stories, 1922
2. *Agni Bina* (The Fiery Lute), poems, 1922
3. *Jooga Bani* (The Message of the Age), essays, 1926 Proscribed in 1922
4. *Dolan Champa* (name of a faintly fragrant monsoon flower), poems and songs. 1923
5. "*Rajbondir Jabanbandi*" (Deposition of a Political Prisoner), an address, 1923
6. *Bisher Banshi* (The Poison Flute), poems and songs, 1924) Proscribed in 1924
7. *Bhangar Gan* (The Song of Destruction), songs and poems, 1924 Proscribed in 1924
8. *Rikter Bedan* (The Sorrows of Destitute), short stories, 1925)
9. *Chhayanat* (The Raga of Chhayanat), poems and songs, 1925
10. *Chittanama* (On Chittaranjan), poems and songs, 1925
11. *Samyabaci* (The Proclaimer of Equality), poems, 1925
12. *Puber Hawa* (The Eastern Wind), poems and songs, 1926
13. *Jhinge Phul* (The Cucurbitaccus Flower), essays, 1926
14. *Durdiner Jatri* (The Traveller through Rough Times), essays, 1926
15. *Sarbahara* (The Proletariat), poems and songs, 1926
16. *Rudra Mangal* (The Violent Good), essays, 1927
17. *Phanimanasa* (The Cactus), poems, 1927
18. *Sindhu Hindol* (The Undulation of the Sea), poems and songs, 1927
19. *Bandhan Hara (Free from Bonds), novel, 1927*

20. *Sanchita* (Collected poems), 1925
21. *Bulbul* (The Nightingle), songs, 1928
22. *Jinjir* (Chain), poems and songs, 1928
23. *Chakrabak* (The Flamingo), poems, 1929
24. Sandya (Evening), songs, 1929
25. *Chokher Chatak* (Thirsty for Sight), songs, 1929
26. *Mrityukshuda* (Hunger for Death), novel, 1930
27. *Rubaiyat-e-Hafiz* (Rubaiyat-e-Hafiz), translation, 1930
28. *Nazrul Geetika* (Collected Nazrul Songs), 1930
29. *Jhilimili* (Window Shutters), plays, 1930
30. Pralaya Shikha (Doomsday Flame), poems and songs, 1930 Proscribed in 1930
31. *Kuhelika* (Mystery), novel, 1931
32. *Nazrul Swaralipi* (The Notation of Nazrul Songs), 1931
33. *Chandrabindu* (Nasal Mark), songs, 1931
34. *Shiulimala* (Garland of Shiuli), stories, 1931
35. *Aleya* (Mirage), Song drama, 1931
36. *Sursaki* (The Serving Maid of Melodies), songs, 1932
37. *Banageeti* (Wilderness Songs), 1931
38. *Zulfiquar* (The Sword of Ali), songs, 1931
39. *Putuler Biye* (Doll's Marriage), children's play, 1933
40. *Satbhai Champa* (The Seven Brothers of Champa), juvenile poems, 1933
41. *Gul Bagicha* (Flower Garden), songs, 1933
42. *Kabye Ampara* (Verse Translation of the Ampara), 1933
43. *Geeti Satadal* (One Hundred Songs), 1934
44. *Surmukur* (Notations), 1934
45. *Ganer Mala* (Garland of Songs), 1934
46. *Maktab Shahitya* (A Textbook for Maktab), 1935 47.
47. *Nirjhar* (Fountain), poems, 1939

48. *Natun Chand* (The New Moon), poems, 1939
49. *Swaralipi* (Notations), 1949
50. *Marubhashkar* (The Sun in the Desert), poems, 1951
51. *Bulbul Dwitiya Bhag* (Bulbul, Part Two), songs, 1952
52. *Sanchayan* (Collected Poems), 1955
53. *Shesh Saogat* (The Last Offerings), poems and songs, 1958
54. *Rubaiyat of Omar Khayyam*, translation, 1958
55. *Madhumala* (Garland of Honeysuckle) a musical play, 1960
56. *Dhumketu* (The Comet), essays, 1961
57. *Jhar* (Storm), juvenile poems and play, 1960
58. *Pile Patka Putuler Biye* (Doll's Marriage), juvenile poems and play, 1964
59. *Ranga Jaba* (Red China Rose), songs on the goddess Kali, 1966